

উত্তরাখণ্ড

মনোজ মজুমদার



উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার

ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ



ମିତ୍ର ଓ ଘୋସ ପାବଲିଶାର୍ସ ପ୍ରାଃ ଲିଃ
୧୦, ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଦେ ସ୍ଟ୍ରୀଟ, କଳି—୭୩

প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ ১৩৮৬
আজিংশ মুদ্রণ : জৈষ্ঠ ১৪০৩

প্রচন্দপট আকন
শ্রীঅধিত ও

UTTARADHIKAR

A novel by Samarc Majumder, Published by Mitra & Ghosh Pub.
Pvt. Ltd. of 10 Shyama Charan De Street, Calcutta—700073 ..

ISBN : 81-7293-001-1

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা মাত্

মির্জা ও মোব পাবলিশার্স আঃ নং: ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০৭৩ ইইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাপিত ও এসসি অফিসেট ৩০/২ বি. ইরামোহন ঘোষ দেন
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫ ইইতে সন্দীপ চ্যাটোজী কর্তৃক মুদ্রিত।

॥ এক ॥

শেষবিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। যেন কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাতাসে একটা ঠাণ্ডা আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য ক'দিন থেকেই আকাশের চেহারাটা দেখবার মতো ছিল। চাপ-চাপ কুয়াশার দসল বাদশাহি মেজাজে গড়িয়ে যাচ্ছিল সবুজ গালচের মতো বিছানো ঢাঁ-গাছের ওপর দিয়ে ঝুঁটিমারীর জঁসলের দিকে। বিছিরি, মন-খারাপ করে-দেওয়া দুপুরগুলো গোটানো সুতোর মতো টেনে টেনে নিয়ে আসছিল স্যাতসেতে বিকেল-ঘণ্টা সেলেটের মতো হয়েছিল সারাদিনের আকাশ। বৃষ্টির আশঙ্কায় প্রত্যেকটা দিন যেন সূচৱে উগায় বসে থাকত এই পাহাড়ি জায়গাটায়, কেবল বৃষ্টিই যা হচ্ছিল না।

কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। হয়তো ভুটানোর পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পুরো হাতওয়ালা হলুদ পুলওভার পরে অনি দেবল দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনে পাতাবাহারের গাছগুলোর ওপর নেতৃত্বে-গড়া হলুদ রোদটা কোথায় হারিয়ে গেল টুক করে। আরও দূরে, আঙরাভাসা নদী জড়িয়ে বিরাট ঝুঁটিমারীর জঁসলের মাখায় লাল বলের মতো যে-সৃষ্টি হঠাতে উকি দিয়েছিল একবার, যাকে সকাল থেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল ও, কেমন করে বাড়িমন্টনের কর্কের মতো ঝুলে পড়ল ওপাশে, একবাশ ছায়া ছাড়িয়ে দিল চারধারে। অনিব খুব কান্না পাচ্ছিল।^১

খালিপায়ে বাড়ির গেছনে চলে এল অনি। ঘাসগুলো কেমন ঠাণ্ডা, ন্যাতানো। পায়ের তলায় শিরশিরি করে। চিট না পরে বেকলে মা রাগ করবেন, কিন্তু অনি জানে এখন ওদের কাউকে পাওয়া যাবে না। এই বিরাট কোয়ার্টারটার ঠিক মধ্যখানের ঘরে এখন সবাই বসে গোছগাছ করছে। এদিকে নজর দেবার সময় নেই কারও।

এই বাড়িটার চারপাশে তথু গাছপালা। দাদু এখানে এসেছিলেন প্রায় পঁয়তাঙ্গিশ বছর আগে। সবকটা গাছের অলাদা আলাদা গঢ়া আছে, মন ভালো থাকলে দাদু সেগুলো বলেন। এই যে-বিরাট ঝাঁপড়া কঁঠাল গাছ ওদের উঠানের ওপর সারাদিন ছায়া ফেলে রাখে, যার গোড়া অবধি রসালো মিষ্টি কঁঠাল খোকা খোকা হয়ে ঝুলে থাকে, সেটা বড় ঠাকুরী লাগিয়েছিলেন। প্রায় চতুর্থ বছর বয়স হয়ে গেছে গাছটার। প্রথমদিকে নাকি মাটির মিচে কঁঠাল হত, পেকে গেলে ওপরের মাটি ফেটে যেত-গুকে চারদিক ম-ম করত তখন। রাত্রির বেলায় শেয়াল আসত দল বেঁধে সেই কঁঠাল থেতে। বড় ঠাকুরী শুয়ে শুয়ে চিংকার করতেন তখন। শেষ পর্যন্ত দাদু কঁঠাল গাছের ওপরে একটা চিনের ছোট ড্রাম বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই ড্রামের মধ্যে একটা ঘটা দড়িতে বাঁধা থাকত। দড়িটা চিনের ছাদের নিচ দিয়ে ঘরে চুকিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ভালো থাকলে দাদু হেসে বলেন, ‘রাতদুপুরে ঘূর ভেঙে গেলে দেখতাম তোমার ঠাকুরী শুয়ে সেই দড়ি টানছেন আর বাইরে প্রচণ্ড শব্দ করে ড্রামটা বাজছে। শেয়ালের সাধা কী এর পরে আসে!’

উঠানের শেষে গোয়ালঘর যাবার খিড়কিদরজার গায়ে যে-তালগাছটা, যার ফল কোনোদিন পাকে না, ছোট ঠাকুরী লাগিয়েছিলেন। মেজোপিসিকে তিনদিনের রেখে বড় ঠাকুরী মারা যান। ছোট ঠাকুরী বড় ঠাকুরীর বোন। এই তাল গাছটা কোনো কর্মের নয়। পিসিমা বলেন, ‘ব্যাটাছেলে গাছ। বাবা কাটতে দেন না ছোটমা লাগিয়েছিল বলে, ছায়া-ফায়া সব বাজে কথা। ছোটবাকে তো বাবা খুব ভালোবাসতেন।’ গাছটাকে অনেকবার ফেটে ফেলার কথা হয়েছিল। বাবুই পাখিরা সারা গাছে বাসা করে আছে। সারাদিন রঙিন পাখির কিচুরিমিচি, দেখতেও ভালো লাগে। তা ছাড়া ছায়া হয় উঠানে-এইসব বলে দাদু কাটতে দেননি। তাই পিসিমা বলেন, ছায়া-ফায়া সব বাজে কথা। সভিই বাবুই পাখি বাসা করে বটে। এক-একদিন সকালে সারারাত ঝড়ের পরে অনি দেখেছে মাটিতে পড়া বাসাগুলো হাতে নিয়ে, কী নরম! অথচ পাখগুলোর অঙ্গেগ নেই, আবার বাসা করতে লেগে গেছে। বাড়িকানু একদিন ওকে বলেছিল, ‘কস্তুরশাই-এর দুই বউ, কঁঠালগাছ আর তালগাছ।’ বেশ মজা

ଲେଗେଛିଲ ଅନିର ।

ଖିଡ଼କିଦରଜା ଦିଯେ ବେଶତେଇ ଓ କାଳିଗାଇ-ଏର ହାସ୍ତ ଡାକ ଘନତେ ପେଲ । ଏମନ ମାନୁଷେର ମତେ ଡାକେ ଗରୁଟା, ବୁକେର ମଧ୍ୟେ କେମନ କରେ ଉଠେ । କାଳୀ ଦୌଡ଼ିଯେ ଆହେ ଗୋଯାଲଘରେର ସାମନେ । ଓର ଛେଲେମେଯରା କୋଥାଯା? ବେଶ ଗରୁ ବାଡ଼ତେ ଦେନ ନା ମା । ଚାରଟେ ବେଶ ହେଁ ଗେଲେ ଲାଇନ ଥେକେ ପାତରାସ ଆସେ, ହାଟେ ଶିଯେ ବିଭିନ୍ନ କରେ ଦେୟ । ମେ ଟାକା ମାଯେର କାହେ ଜମା ଥାକେ-ଗରୁଗୁଲୋ ସବ ମାଯେର । କାଳୀକେ ବିଭିନ୍ନ କରା ହବେ ନା କଥିଲେ । ଦୂଧ ଦିବ ବା ନା-ଦିବ, ଓ ଏଥିନ ବାଡ଼ିର ଲୋକ ହେଁ ଗିଯେଇଁ । ଅନି ଦେଖିଲ କାଳୀ ବଡ ବଡ ଚୋଖେ ଓର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆହେ । ଓର ଚୋଖ ଦୂଟେ ଆଜ ଏତ ଗଣ୍ଡିର କେନ? ବୁକେର ମଧ୍ୟେ କେମନ କରେ ଉଠିଲ ଅନିର । ଓ କି କିଛୁ ବୁଝାତେ ଗେରେହେ ଗରୁରା କି ଟେର ପାୟ? ହାତ ବାଡ଼ାଳ ଅନି, ନସେ ସମେ ମୁଖୁଟା ଓପରେ ତୁଳେ ଧରିଲ କାଳୀ । ଗଲାର କୁଲିଲେ ହାତ ବୋଲାଲ ଅନି ଅନେକକଣ । ନାକ ଦିଯେ ଶବ୍ଦ କରଛେ କାଳୀ । ରୋଜ ଯେରକମ ଆଦର କରେ ଖାବାର ମୁଖେ ନେଯ, ଆଜ ସେରକମଟା ନା । ଯେନ ଓ ସଭ୍ୟିଇ ବୁଝାତେ ପାରହେ ଅନି । ବଡ ବଡ ମାଥା ସମାନ ଆକନ୍ଦ ଗାହିଗୁଲୋ ଘୋଯାଲଘରେର ଚାରପାଶେ ବେଡ଼ା ଦିଯେ ଲାଗାନେ ହେୟେ । ଅନି ସେଣିଲୋ ପେରିଯେ ଆସତେ ଘାଡ଼ ଘୁରିଯେ ଦେଖିଲ, କାଳୀ ଘୁରେ ଦୌଡ଼ିଯେ ଓକେ ଏକଦୃଷ୍ଟେ ଦେଖିଛେ । ଅନି ଦୌଡ଼ ଲାଗାଲ ।

ଗୋଯାଲଘରେ ପେହନଦିକେ କୋନେ ବାଡ଼ିଯର ନେଇ । ବଡ ବଡ ଜଙ୍ଗଲେ ଗାହେର ସମେ ଆମ କୁଳ ଛଡ଼ିଯେ ଆହେ । ଏଥିନ ଆଲୋ ପ୍ରାୟ ନେଇ ବଲନେଇ ଚଲେ । ଦୌଡ଼ ଆସତେ ଆସତେ ଅନିତ ମେହି ଡାହକ୍ଟାର ଗଲା ଘନତେ ପେଲ । ରୋଜକାର ମତେ କେମନ ନିଃସ୍ଵର୍ଗ ଗଲାର ବାକିକଢ଼ା କୁଳଗାହଟାର ତଲାୟ ବସେ ଏକଟାନା ଡେକେ ଯାଛେ । ଡାହକ୍ଟାର ଗଲାର କାହଟା ସାଦା ଥାଲାର ମତେ । ଅନେକଦିନ ଦେବେହେ ଅନି । ବାଡ଼ିକାକୁ ବଲେ ଡାହକେର ମାଂସ ଖେତେ ନାକି ଖୁବ ଭାଲୋ । ଶୁଣି ଦିଯେ ମାରାର ଚେଟା କରେଓ ପାରେନି ବାଡ଼ିକାକୁ । ଭୀଷଣ ଚାଲାକ ଡାହକଟା । ଏଥିନ ପ୍ରାୟ-ସଙ୍କେ-ହୁଣ୍ୟ ସମୟଟାଯି ଡାହକଟାର ଗଲାର ଶବ୍ଦେ କୋନ ବିଷୟ ଲାଗଛିଲ ଚାରପାଶ । ଅନି ଆଗ୍ରାଭାସା ନଦୀର ଗାୟେ-ରାଖା କାପଡ଼କାଚାର ପାଥରଟାର ଓପରେ ଏମେ ଦୀଭାଳ । ଚକଟକେ ଟେଣ୍ଡିଗୁଲୋ ଯେନ ଓଦେର ଝୁଲେ ନତୁନ-ଆସା ଗଣ୍ଡି-ଦିନମିଶିର ମତେ ଦ୍ରୁତ ହେଁଟେ ଯାଛେ କୋନୋଦିନ ନା ତାକିଯେ । ସୁକେ ପଡ଼େ ନିଜେର ଛାଯା ଦେଖିଲ ଓ ଆଗ୍ରାଭାସାର କାଲୋ ଜଲେ । ମାକେ ଲୁକିଯେ ଓରା ପ୍ରାୟଇ ଏହି ନଦୀତେ ଶାନ କରେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁଡ଼ି-ବିଛାନେ ହାଟୁଙ୍ଗରେ ନଦୀ । ଏଇ ନିଚେ ଲାଲ ଲାଲ ଚିନ୍ଦିଗୁଲୋ ଗୁଡ଼ି ମେରେ ପଡ଼େ ଥାକେ, ହାତ ବାଡ଼ାଲେଇ ହଲ, ରୋଜକାର ମତେ ଅନି ଆର ଧରାତେ ପାରବେ ନା । ଯାବାର ବାକି ଦିନଗୁଲୋ କେମନ ଦ୍ରୁତ, ମୁଖେ ଭିତର ନରମ ଚକୋଲେଟେର ମତେ ଦ୍ରୁତ ମିଲିଯେ ଯାଛେ । ଅନିର ଭୀଷଣ ଥାରାପ ଲାଗଛେ, ଭୀଷଣ ।

ଏଥିନ ଏଥାନେ କେଉ ନେଇ । ଆଗ୍ରାଭାସାର ଦୁଧାରେ ବଡ ବଡ ଆମଗାହିଗୁଲୋତେ ଫିରେ-ଆସା ପାଖିରା ଜୋରାଲୋ ଗଲାର ଟ୍ୟାଚାମେଟି କରେ ନିଜେ ଶୈଥାବାର । ଅନ୍ତରୁ ଏକଟା ଆସଟେ ଗନ୍ଧ ଉଠିଛେ ନଦୀର ଗା ଥେକେ । ଚତ୍ତାରୀ ପନେରୋ ଫୁଟ, ତୀଏ ଶ୍ରୋତେର ଏହି ନଦୀ ଚଲେ ଗେହେ ନିଚେ ଚା-ଫ୍ୟାଟିରିର ଭିତର ଦିଯେ । ଫ୍ୟାଟିରିର ବିରାଟ ହିଲଟା ଚଲଛେ ଏଇ ଶ୍ରୋତେ । ବଲତେ ଗେଲେ ସର୍ବାହିନୀ ହରିମ୍ପନ୍ଦରେ ମତେ ଏହି ନଦୀର ଟେଣ୍ଡିଗୁଲୋ । ଅର୍ଥ ଓରା ପାଯେର ତଲାୟ ନତୁନ-ବାଡ଼ି ପାଥର ରେଖେ କତବାର ପାର ହେଁ ଯାଯ । ଓପାଶେର ଲାଇନେର ମଦେସିଯା ମେଯେର ଦଲ ଯଥନ ନଦୀ ପେରିଯେ ଏପାରେ ଆସେ ତଥନ ଓଦେର ହାଟୁ ଅବଧି ନାମା କାଲୋ ପାହାଡ଼େର ସେରଟା ପଦ୍ମପାତାର ମତେ! ଶ୍ରୋତେ ଭାସେ । କାପଡ଼ଟାକେ ଓରା ବଲେ ଆଗ୍ରା । ନଦୀର ନାମ ତାଇ ଆଗ୍ରାଭାସା । ଏତେ ଶ୍ରୋତ ଆର ଜଳ କମ ତାଇ ବଡ ମାଛେର ଏଦିକେ ଆସେ ନା । ତବୁ ଏକଟା ଜଳଜ ଆସଟେ ଗନ୍ଧ ବେରୋଯ ନଦୀର ଗା ଥେକେ । ଚୋଖ ବନ୍ଧ କରିଲେ ଜଲେର ଶବ୍ଦ ବଞ୍ଜନିର ମତେ ବେଜେ ଯାଯ ।

ପୁଲଭାର ଓଟିଯେ ଉବୁ ହେଁ ଟଟ କରେ କାପଡ଼କାଚା ପାଥରଟା ତୁଳେ ଧରିଲ ଅନି । ହାଲକା ଚ୍ୟାପଟା ପଥର । ସାମାନ୍ୟ ଯୋଲା ଜଳ ସରେ ଗେଲେ ଅନି ଦେଖିଲ ଏକଟା ବିରାଟ ଦାଢ଼ାଓୟାଲା କାଲୋ କାଂକଡ଼ା, ଶୋଲ ଗୋଲ ଚୋଖ ତୁଲେ ଜଲେର ତଲାୟ ବସେ ଓକେ ଦେଖିଲ ସେଟା । ତାରପର ନାଚେର ମତେ ପା ଫେଲେ ଫେଲେ ସରେ ଯେତେ ଲାଗି ସେଟା ନଦୀର ଭିତରେ । ଏକଗାହ ଚନ୍ଦୋମାହେର ବାକ୍ଷା ବ୍ୟାଲବିଲ୍ ଯେତେ ଚଲେ ଗେଲ । ଛୋଟ ସାଦା ପାଥରେର ଫାଁକ ଦିଯେ ଲୋକ ଶୁଦ୍ଧାଓୟାଲା ଏକଟା ଲାଲ ଚିନ୍ଦିକୁ ଦେଖାତେ ପେଲ ଅନି । ହଠାତ୍ ମାଥାର ଓପର ଥେକେ ପାଥରେର ଛାଦଟା ଉଠେ ଯେତେ ବେଚାରା ବୁଝାତେ ପାରିଛିଲ ନା କୀ କରିବେ । ବା ହାତେ ପାଥରଟାକେ ନାମିଯେ ଦିଯେ ଆବାର ଉଠେ ବସିଲ ତାର ଓପର । ହାତେର ମୁଠୋଟେ ଚିନ୍ଦିଟା ଛଟକ୍ଟ କରଛେ । ପେଟେର ତଲାୟ ଅଜମ୍ବ ପାଯେର ମତେ ଶୁଦ୍ଧଗୁଲୋ ନାଚାଛେ ଏଥିନ । ନାକେର କାହେ ନିଯେ ଏଲ ଅନି, ଚମରକାର ଜଲେର ଗନ୍ଧ । କୀ ଭୀଷଣ କଟ ହଜ୍ଜେ ବୁକେର ମଧ୍ୟେ,

এই চিংড়িটাকে আর কোনোদিন সে দেখতে পাবে না। হাতের মুঠোটাকে জলের মধ্যে রাখল অনি। আঙুলের ফাঁক গলে জল চুকছে। চিংড়িটা মোচড় দিলে খুব। হাত ওপরে তুলতেই জল বেরিয়ে যেতেই চিংড়িটা লাফ দিল হঠাৎ। আর সেই সময় গলার শব্দ পেল ও। চোখ ভুলে তাকাতেই অনি দেখল ওপারে জলের রাস্তা দিয়ে টুকরি-কাঁধে দুটো মদেসিয়া মেয়ে ঘাটে আসছে। ফ্যাটিরিয়ে বোধহয় ছুটি হল। মেয়ে দুটো মা-মেয়েও হতে পারে। তপুপিসির মতো ছোট্টার বয়স। টুকরিটা পাড়ে রেখে ওরা চট করে ঠাণ্ডা জলে নেমে পড়ল। জল ছিটিয়ে মুখ ডেজাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনিকে দেখল। ছোট মেরেটাকে বড়কে আঙুল দিয়ে অনিকে দেখাল, ‘বুড়ো বাবাকে শাথি।’

বড়জন বিরাট খৌপাসমেত মাধ্যাটা সুরিয়ে অনিকে দেখে হাসল, ‘কর-লে, ও ছোট্টার শোফ নাই হলেক।’ অনি বুঝল, ওর গোফ হয়নি এখনও, বাচ্চা ছেলে। বড়টা ছোটকে কিছু করে নিতে বলছে। কথাটা শনে ছোট্টা পেছন ফিরে কাপড় আঙুরা গুটিয়ে জলের মধ্যে প্রায় হাঁট ডেকে বসে পড়ল। এই প্রাকৃতিক শব্দ, যার সঙ্গে এই নির্জন আঙুরাভাসা নদীর কোনো সম্পর্ক নেই, কানে যেতেই অনি ঘুরে দাঁড়াল আর তারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে অঙ্ককার নেমে-যাওয়া মাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। পেছনে হঠাত মেয়ে দুটো হেসে উঠলা খুলে, ‘সরমাতিস রে-এ হেউয়া-হি-হি-হি।’ ওদের গলার শব্দেরই কি না বোঝা গেল, একদম চূপ।

উঠেনে চূকে অনি দেখল হারিকেন জ্বালানো হয়ে গেছে। ঝর্ছেড়া চা-বাগানে এখনও ইলেকট্রিক আসেনি। তখু ফ্যাটিরিয়ে ডায়নামো চালিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। মহীতোষ বাড়ির পেছনে সম্প্রতি একটা ছোট টিনের চালাঘর করেছেন। বড় শৌখিন মানুষ মহীতোষ, কলকাতা থেকে ডায়নামো আনার ব্যবস্থা করেছেন। এখন যে-কোনো দিনই সেটা এসে যেতে পারে। অয়ারিং হয়নি, এমনি তার বুলিয়ে ঘরে-ঘরে বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা পাকা। এই রাতিবেগায় তালগাছের মাথায় জমে থাকা অঙ্ককার, কাঠালগাছের ডালে-ডালে যে অল্পত রহস্যের ভূট্টা দলা পাকিয়ে বসে থাকে-অনিন ভীষণ ইচ্ছে করে ইলেকট্রিক জুলে সেগুলোকে কেমন দেখবে। মহীতোষ ডায়নামো বসালে এটাই হবে এই তত্ত্বাত্ত্বের প্রথম ইলেকট্রিক আসেনি। কিন্তু মুশ্কিল হল, করে আসবে ডায়নামোটা! ওরা চলে বাবার পর এলে অনিন কী লাভ হবে! বাবা কেন কলকাতায় তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখছে না! এই তো কিছুদিন আগে ওদের বাড়িতে প্রথম রেডিও এল। ওদের বাড়ি মানে ঝর্ছেড়ায় প্রথম রেডিও এল। মহীতোষ নিজে ছুটিতে গিয়েছিলেন কলকাতায় বেড়াতে। ফেরার সময় বড়সড় রেডিও সেটটা কিনে নিয়ে এলেন। তখু রেডিও সেট নয়, সঙ্গে একটা আলাদা শিক্কার। বাইরের ঘরে রেডিও বাজত, সেই রেডিও শুনতে ভিড় করে আসতেন বাবুরা। মহীতোষ ওর সঙ্গে একটা তার জুড়ে শিক্কারটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন পক্ষাশ গজ দূরে-আসাম রোডের কাছে। বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে বেঁধে শিক্কারটা বুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর রাস্তা জুড়ে বসে যত মদেসিয়া কুলিকামিন ভিড় করে উন্ত, ‘অল ইত্তি রেডিও, কলকাতা।’

রেডিও আসার পর বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গেল। সরিষ্পেখের সকাল-বিকেলে রেডিওর পাশে বসে থাকেন একগাদা বুড়ো নিয়ে, খবর শুনবেন। ছোট কাকু আধুনিক গান শুনবে চুপিচুপি, কেউ না থাকলে। রাতিবেগান নাটক হলে শিক্কারটা ভিতরবাড়িতে চালান করে দিয়ে মহীতোষ উক্তগ্রামে রেডিও বাজিয়ে দেন। সেদিন সক্রে মধ্যে বান্না শেষ করার তাড়া দেখা দেয় মা-পিসিদের মধ্যে; আটটা বাজলেই সব হাত-পা গুটিয়ে বাবু হয়ে ভিতরের বারান্দায় সতরঞ্জি পেতে বসেন নাটক শুনতে। তখন বলা নিষেধ-অনি নাটক শুনতে শুনতে ঘূরিয়ে পড়ে এক-একদিন। এখন অবশ্য তখু এ-বাড়ি নয়-নাটক শুনতে আশেপাশের সব কোঢাটারের মেয়েরা সক্রে মধ্যে চলে আসে অনিদের বাড়ি। একটা সতরঞ্জতে আর কুলোয় না এখন। সঙ্গের বাচ্চাত র একজোট করে মা বলেন, ‘অনি, যাও, এদের সঙ্গে খেলা কর।’ বিছিরি লাগে তখন। বৰং বাইরে র ঘূটঘূটি অঙ্ককারের দিকে তাকিয়ে ছুপাপ বসে নাটক শুনতে শুনতে বেঁচে রেডিও ফাটিয়ে একটা গল, যখন চিক্কার করে কাঁদে-আমার সাজানো বাগান পক্ষিয়ে গেল’ তখন বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। মাকে আঢ়লে চোখ মুছতে দেখে নিজেরই কান্না পেয়ে যায়।

এখন বাইরের ঘরে রেডিও বাজছে না। সরিষ্পেখের বা মহীতোষ ফেরেননি এখনও তুলসীগাছের নিচে প্রদীপ জ্বালা হয়ে গিয়েছে। ভিতরের বারান্দায় উঠতেই মা বললেন, ‘হ্যারে- কোথায় ছিলি

এতক্ষণ?' অনি কোনো কথা বলল না। দৌড়ে আসার জন্য ওর ফরসা মুখ লাল-লাল দেখছিল। রান্নাঘরে যেতে যেতে আমায় আবার বললেন, 'বিদে পেয়েছে?' অনি ঘাড় নাড়ল, তারপর বাইরে চলে এল। বাইরের ঘরে বিরাট হারিকেন জ্বলে দেওয়া হয়েছে। সামনে পাতাবাহার গাছের পাশে ওয়ে-ক্লাবঘর, তার দরজা খুলে বাঁটফাট দিয়ে ঝাড়িকাকু হ্যাজাক জ্বালাচ্ছে উরু হয়ে বসে। ওপাশে অঙ্ককারে ভুবে-থাকা আসাম রোড দিয়ে হ্যাঙ্কশ করে একটা পর একটা গাড়ি ঝুলিয়ে দিল ঝাড়িকাকু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চতুর্টা দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাজাকের তলায় ঝাড়িকাকুকে কেমন বেঁটে লাগছে। হাঁটু অবধি ঢোলা হাফপ্যান্ট আর ফতুয়া গায়ে দিয়ে মুখ উঁচু করে ঝাড়িকাকু হ্যাজাকটা দেখছে।

ঠিক এই সময় অনি সাইকেলের ঘটিগুলো শুনতে পেল। চা-বাগানের ডিউর দিয়ে সাদা নুড়ি-বিছানো যে-রাস্তাটা ফ্যাট্টির মুখে গিয়ে পড়েছে, সাইকেলগুলো সেই রাস্তা দিয়ে আসছিল। অঙ্ককার হয়ে-যাওয়া চোরাচের এখন সবে জ্বলে ওঠা-তারার আলো একটা আবছা ফিকে ভাব এনেছে, যার জন্য এতদূরে ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়েও অনি-চা-গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে বসানো শেডটিগুলোকে বুরতে পারল। দশ-বারোটা সাইকেলের পরপর আসছে খটি বাজাতে বাজাতে মাঝে-মাঝে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিছে ওরা। প্রায় দেড় মাইল লম্বা এই রাস্তার দুধারে ঘন চা-গাছ আর শেডটি। সঙ্গের পর একা বরং একা কেউ যায় না।

ভোঁর ছটার বেজে গেলে বাবুরা দল দেখে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরেন। এখন একটু একটু হাওয়া দিছে। সামনে মাঠে একা দাঁড়িয়ে-থাকা লম্বাটে কাঠালিচাপা গাছে একদল বিকি করাত চালানোর মতো শব্দ করে যাচ্ছে। সাইকেলের ঘটিগুলো আরও জোর হল। তারপর একসময় ওরা মোড় ঘুরে চা-বাগানের গেট পেরোতেই অনি ওদের দেখতে পেল। পরপর সাজানো কোয়ার্টারের সামনে পড়ে-থাকা বিরাট মাঠের মধ্যে চুকে সাইকেলগুলো এবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এক-একটা টর্চের আলো ধারালো তলোয়ারের মতো লম্বা হয়ে এক-একটা কোয়ার্টারের দিকে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাবাকে দেখতে পেল অনি। আবছা আবছা বাবার জামা-প্যান্ট দেখা যাচ্ছে। সাইকেলের গতি কমিয়ে টর্চের আলো নিবিয়ে দিলেন মহীতোষ। তারপর বাড়ির সামনে লম্বা দেখিতে সাইকেলটিকে খাড়া করে বারান্দায় উঠে এলেন। বছর বতিশের মূরক মহীতোষ প্যান্ট পরেন, ফুলপ্যান্ট। এই চা-বাগানের কেউ তা পরে না। হাঁটু অবধি মোজা গর্টারে বাঁধা, থাকি হাফপ্যান্ট আর হাফহাতা বুরুশাট-এই হল এখানকার বাবুদের পোশাক। পাতিবাবু শশাবা-বুঁয়াদের কাজ রোচুরে ঘুরে ঘুরে, তাঁরা অবশ্য মাথায় একটা সোলার হাটু ঝুলোন।—কিন্তু মহীতোষ এই বয়সে হাফপ্যান্ট প্রতে রাজি নন। ফুলপ্যান্টের পায়ের কাছটা ক্লিপ দিয়ে শুটিয়ে রাখেন সাইকেল চড়ার সময়। সারামুখে নিটোল করে দাঁড়িগোফ কামানো মহীতোষের মাথার চুল নিয়োদের মতন কোকড়া। হাসতে গেলে গজন্ত দেখা যায়। বারান্দায় উঠে মহীতোষ ছেলেকে দেখে বললেন, 'আজ রাত্রে নদী বন্ধ হবে, বুঝলি!' বলে অনির মাথায় হাত বুলিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অনি। নদী বন্ধ হবে যানে আঙরাভাস। আজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর আগে গত বছর, তখন অনি অনেক ছেট ছিল, আঙরাভাসকে বন্ধ করা হয়েছিল। সেটা হয়েছিল শেষরাতে। অনিনা সবাই ঘুমিয়ে ছিল। ওধু পরদিন সকালে ঝাড়িকাকু এক ড্রাম ভরতি চিংড়ি আর কাঁকড়া এনে দেখিয়ে যখন বলল যে নদী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে ওগুলো ধরা গে— তখন একদৌড়ে আঙরাভাসের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ আফসোস হয়েছিল অনির। খটখট করছে নদী, কোথাও এক ফেঁটা জল নেই। ভিজে শ্যাওলা আর নুড়িগাথরের ওপর কয়েকটা কুকুর কী শুরুছিল। পায়ে পায়ে নদীর ঠিক মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ছিল অনি। চারদিকে তকনো পাথর, ছবিতে দেখা কঙালের মতো লাগছিল নদীটাকে। এমন সময় পায়ের তলায় কী সূড়সূড় করতে অনি দেখল একটা ছেট লাল কাঁকড়া গর্ত থেকে মুখ বের করছে। অনিকে দেখেই সেটা সূড় করে ভিতরে চুকে গেল। এখনে-ওখানে কিছু চুনোমাছ, গেঁড়ি শুকিয়ে পড়ে আছে। অনির খুব আফসোস হচ্ছিল তখন, যদি সে দেখতে পেত হঠাৎ জল শেষ হয়ে যাওয়াটা! মাছগুলো তখন কী করছিল? তারপর আবার রাড়ির হলে জল ছাড়া হয়েছিল নদীতে। সেটা ও অনি দেখতে পায়নি। পরদিন সকালে গিয়ে দেখল ঠিক আগের মতো যে-কে সে-ই। কুলকুল করে স্নোত বইছে। ওধু কাপড়কাচার পাথরের নিচে কোনো মাছ ছিল না এই

যা। বছরে একবার এইরকম হয়। শুশানের কালীবাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে-আসা আঙরাভাসা নদীটাকে অয়োরকটা মাঠের পাশে দূতাগ করে দেওয়া হয়েছে। এক ভাগ গেছে নিচে ধানের জমির গা দিয়ে দুন্দুব কুলিগাইনের পাড় ঘেঁষে ডুড়য়া নদীতে। আর অন্য বাঁকটার মুখে সিমেট্ট্রি, বাঁধমতো করে তার তলা দিয়ে জল আনা হয়েছে ফ্যাট্টরিতে। স্রোতটা এদিকেই বেশি। ফ্যাট্টরির সেই বিরাট হাইলটায় যখন আবর্জনা জমে জমে পাহাড় হয়ে যায় তখন বাঁধের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। জল তখন ওপাশে চলে যায়-একটা খটখটে। ফ্যাট্টরিতে তখন হাইল পরিষ্কার করবার কাজ চলে। আজ আবার নদী বন্ধ হবে। কখন? উচ্চেজনায় পায়ের তলা শিরশির করে উঠল অনির। আজ দেখতেই হবে। অনি ঘুরে দোড়াতে গিয়ে আর-একটা টর্চের আলো দেখতে পেল। মহীতোষ বাড়িতে এনে রেডিও চালিয়ে দিয়েছেন। কী একটা আসর হচ্ছে এখন। অনি দেখল একটা টর্চের আলো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। এই আলোটাকে অনি চেনে। অঙ্ককারে নেমে পড়ল অনি। পায়ের তলায় ভিজে-থাকা শিশির আর ঠাণ্ডা বাতাসে ওর শীত করছিল। এগিয়ে-আসা টর্চের দিকে ও দোড়াতে লাগল। ক্রমশ অনি অঙ্ককার ঝুঁড়ে এগিয়ে-আসা একটা বিরাট লয়াচওড়া শরীর দেখতে পেল। হাঁটুর নিচ অবধি ধূতি, দেলা পাঞ্জাবি, হাতে লাঠি-নারিংশেখর আসছেন। পেছনে ওর ব্যাগহাতে বকু সর্দার। সরিংশেখর হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠৎ। তারপর পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ জুলে সোজা করে ধরলেন সামনে। লম্বা আঁকশির মতো আলোটা ছুটিস্ত অনিকে টেনে নিয়ে আসছিল। যেন এক লাফে দুরত্বটা অতিক্রম করে অনি দাদুর বুকের ওপর বাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ বিনিয়ে অনিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সরিংশেখর বললেন, ‘কী হয়েছে দাদু?’

ফিসফিস গলায় বুকে মুখ রেখে অনি বলল, ‘আজ আমি নদীর বন্ধ হাওয়া দেখব।’

পঁয়তালিশ বছর কাকুরি করার পর আর ছাইদিন বাদে সরিংশেখর অবসর নেবেন। এই তো আজ বিকেলে সাহেবের সঙ্গে ওর বাংলায় বসে কথা হচ্ছিল। একটা ফাইল সই করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সরিংশেখর। কাজকর্ম মিটে গেলে হে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, ‘রিটায়ার করে কী করবে ঠিক করেছে বড়বাবু?’ সরিংশেখর হেসেছিলেন, ‘দেখি।’ সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ে গিয়েছিল বছর পাঁচেক আপেকার কথা। এই চেয়ারে বসে ম্যাকফার্সন সাহেবকে সেদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন সরিংশেখর। প্রায় বাইশ বছর একসঙ্গে কাজ করেছিলেন তুম। ম্যাকফার্সনের ছেলে ডেমভকে জন্মাতে দেখেছেন উনি। বিলিতি কোম্পানির এই চা-বাগানে চিরকাল ক্ষচ সাহেবরাই ম্যানেজারি করেছে। ম্যাকফার্সনের মতে এত বেশিদিন কেউ সৃষ্টিহৃদয়ে থাকেননি। সরিংশেখরের দেখা ম্যানেজারদের মধ্যে ম্যাকফার্সন সবচেয়ে গাই-ডিয়ার লোক। এই তো সেদিন অনি জন্মাতে মিসেস ম্যাকফার্সন একগাদা প্রেজেন্টশন নিয়ে ওর নাতির মুখ দেখে এলেন। চা-বাগানের ম্যানেজারদে যেসব নিয়মকানুন মানতে হয় সেগুলো প্রায়ই মানতেন না মিসেস ম্যাকফার্সন। বাবুদের সঙ্গে ওঁদের বেশি মেলামেশা বারণ। কেউ তা করলেই তেলিপাড়া ঝুঁকে কথা উঠবে। তারপর সেটা চলে যাবে কলকাতার সদর দপ্তরে। নিদিষ্ট ম্যানেজারের নামের পাশে লাল ঢে়া পড়বে। সরিংশেখরের প্রশ্ন শেন ম্যাকফার্সন চটপেট বলেছিলেন, ‘রিটায়ার মানে একদম বিশ্রাম। কোনো কাজকর্ম করব না। ডেসমন্ড অটেলিয়া থেকে লিখেছে একটা মাসারি ফার্ম করেছে ক্যাটলের-ওটাই দুজনে দেখাশোনা করব।’ ছেলেকে সেই ছেটবেলায় শালীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সাহেব অ্যান্ডেলিয়ায়। মিসেস ম্যাকফার্সন বলেছিলেন, ‘চিঠি লিখব কিন্তু আমি-তুমি উত্তর দেবে নাৰু। আই ওয়াট এতো ডিটেল।’ তা যাবার দুদিন আগেও ডউমাকে কীসব সেলাই শিরিয়ে গিয়েছেন মিসেস ম্যাকফার্সন। আর গিয়ে অবধি প্রত্যেক মাসে একটা করে চিঠি লেখেন উনি। সবকিছু লিখতে হয় সরিংশেখরকে। এমনকি সাহেবের বাংলোর গেটের পাশে যে-বাতাবিলেবু গাছটা-সেটার কথাও। ওদিকে মেমসাহেবে এখন একা। ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। সাহেব মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে ডুবে মারা গেছেন। এইসব ব্যাপার। বছর কুড়ি আগে তোলা মেমসাহেবের যুবতী অবস্থার একটা ছবি আছে সরিংশেখরের কাছে। ডুড়য়া থেকে একটা বিরাট কালবোস মাছ ধরে উপহার দিয়েছিলেন তিনি সাহেবকে। মেমসাহেবে সেই মাছটা দুহাতে সামনে ধরে ছবি তুলিয়ে সরিংশেখরকে প্রেজেন্ট করেছিলেন। কী সুন্দর দেখতে ছিলেন মেমসাহেব- পায়ের পাতা অবধি গাউন-পরতেন তখন। সেই মাছ ধরতে গিয়েই সাহেব মারা গেলেন।

আজ বিকেলে হে সাহেব আফসোস করলেন, ‘তুমি চলে গেলে আমি কী করে চালাব জানি না।

কোম্পানি আর এক্সটেন্ড করতে চাইছে না-তোমার বয়স কত হল বাবু?'

'বাষটি !' উত্তর দিয়েছিলেন সরিষ্ঠেখর।

'জানি, তোমারও ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, কী করা যাবে বলো! ওয়েল, তোমার জলপাইগড়ির বাড়ি বানাতে যা যা দরকার তৃমি বাগান থেকে নিয়ে যেও !' হে সাহেবে বলছেন।

ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ, তা হচ্ছে বইকী ! এমন তো হ্যানি যখন বড়বউ চলে গেল ! ছোটবউ যাবার সময় খুব কষ্ট হয়েছিল এখন মনে পড়ে। শোক জীবনে কম পাননি তো। বড় মেয়ে বিধবা হল তেরো বছর বয়সে। এই তিন মাস আগে মেজো মেয়ে মরে গেল দুয় করে বাজাকাঙ্ক্ষা রেখে। বড় ছেলে পরিতোষ ব্যাখ্যাটে হয়ে কোথায় চলে গেছে-ওকে ওধরোতে পারলেন না উনি। কিন্তু এইসব দুঃখ পাওয়া কেমন সহ্য মধ্যে ছিল ! অন্য কাউকে টের পেতে দেননি। এমনিতেই সকলে বলে লোকটা পাবাণ ! দয়ামায়া নেই একবিন্দু। ঠিক বুবতে পারেন না নিজেকে উনি। কিন্তু চলে যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে বুকের ভিতরটা তত ভার বোধ হচ্ছে কেন ?

পঁয়তালিম্ব বছর আগে উনি যখন স্বর্গছেড়া চা-বাগানে ছোটবাবুর চাকরি নিয়ে এসেছিলেন তখন আসাম রোডে সন্দে হলৈই বাঘ ডাকত। সাকুল্যে দূজন বাবু ছিল এই চা-বাগানে। চা-বাগান বললে ভুল বলা হবে, তখন তো সবে চা-গাছ লাগানো হচ্ছে। তিনকড়ি মঙ্গল কুলি চালান নিয়ে আসছে রাঁচি থেকে। স্বর্গছেড়ার তিন রাস্তার মোড়ে চা-বিন্ডি-সিগারেটের কোনো দোকান ছিল না তখন। আর আজ বেশ রমরমে চারধার। তিন তিল করে জায়গাটা শহরে শহরে হয়ে গেল। চা-বাগানে বাবুদের সংখ্যা বেড়েছে, তাই ছুটির ভোঁ বাজলৈই কেউ আর সিটে থাকতে চায় না। আজ ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন নতুন ছোকরাটার ওপর। গ্রাজয়েট ছেলে। হে সাহেব অফিসারের ঘরে আলো জ্বলছে। কে আছে-কোতুহল হল দেখার। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সরিষ্ঠেখর উকি দিলেন। নতুন ছোকরা মনোজ হালদার মাথা ঝুকিয়ে ডিকশনারি দেখছে। ওকে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিল ছেলেটি।

'কী ব্যাপার, এখন বাড়ি যাওনি?' সরিষ্ঠেখর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তো-তো করেছিল মনোজ, 'এই, মানে চিঠিটা শেষ করে-।' হাত বাড়িয়ে বাংলায় লিখা একটা চিঠি ভুলে ধরেছিলেন উনি। চিঠিটা পড়ে মাথার ভিতর দপদপ করতে লাগল। আজ দুপুরে উনি ছোকরাকে বলেছিলেন, ফয়ারড সাপ্তাই দেয় যে-কন্ট্রুক্টর, তাকে চিঠি লিখে সাবধান করে দিতে যে ওর লোকজন ঠিকমতো সাপ্তাই দিচ্ছে না। মনোজ বাংলায় লিখেছে সেটা।

'বাংলায় কেন?' কোনোরকমে বললেন তিনি।

'এই, ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করে নিছিলাম।' হাসল মনোজ।

রাগে গা গরম হয়ে গেল সরিষ্ঠেখরের। কী অবস্থা ! একটা চিঠি লিখতে এদের কলম ভেঙে যায়, আবার গ্রাজুয়েট বলে চুক্কেছে ! তিন মিনিটের কাজ তিন ঘণ্টায় হয় না-এই হল ইয়ংম্যান ! অথচ তিনি তো মাত্র ফাঁট ক্লাস অবিধি পড়া বিদ্যা নিয়ে এসেছিলেন। বাবা মারা যেতে পরীক্ষার ফি যোগাড় করতে পারেননি। আজ অবধি তার ইংরেজির ভুল কোনো সাহেব-ম্যানেজার ধরতে পারেননি। মাত্র আট টাকা মাইনেতে চুক্কেছিলেন তিনি। এরা তো চুক্কেই আড়াইশো টাকা হাতে পায়।

'আলোটা নিবিয়ে বাড়ি চলে যাও !' বলে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। ইচ্ছে হচ্ছিল সোজা বাংলায় গিয়ে সাহেবকে বলে সাসপেন্ড করেন ওকে। কিন্তু অনেক কষ্ট সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। আর তো কটা দিন আছেন এখানে, মিছিমিছি এই ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করার দায়ভোগ করবেন কেন? অবশ্য ভাবিয়ৎ যা নষ্ট হবার তা তো হয়েই গেছে ওর। শুধু লোকে বলবে, বুড়োটা যাবার আগে চাকরি থেয়ে গেল। বড় বড় ঝোলা সাদা গোফে হাত মাথালেন উনি। কোনোকিছু অস্থাভবিক ব্যাপার ঘটলেই উনি আও মুঝ্যের মতো ঠাঁটের দুপাশে ঝোলা গোফে অজান্তেই হাত বোলান।

অফিস থেকে বেরিয়ে আঙরাভাসার ওপর পাতা হোট পুল পেরিয়ে ফ্যাট্টির সামনে এলেন উনি, পেছনে বকু সর্দার। বকু প্রায় তিরিশ বছর আগে ওর সঙ্গে। বকুর ছেলে এবার বিলগুড়ির মিশনারি কুল থেকে পরীক্ষা দেবে। কী নেশা হয়েছিল সরিষ্ঠেখরের, জোর করে বকুর ছেলে মাঝের কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। মিশনারিয়া নাম রেখেছে জ্বলিয়েন। মদেসিয়া ছেলের সাহেবে নামে বকু

সর্দার কিন্তু আপত্তি করেনি। অবশ্য স্বর্গহেঁড়ায় এলে সবাই ওকে মাঝে বলেই ডাকে। তা এই ছেলে পাশ করলে বাবুদের চাকরিতে নেবার জন্য বকু ওকে সম্প্রতি ধরেছে। ব্যাপারটা অন্য কুলিসর্দাররা কেমন চোখে দেখেছে তা জানেন না সরিষ্ঠেখর। এখন অবধি এই বাগানে কোনো লেবার-ফ্রাবল হয়নি কখনো—কিন্তু বকু যেভাবে হেলে ব্যাপারে কথা বলছে—। ঘাড় ঘূরিয়ে পেছনে তাকালেন উনি। মাথায় সাদা কাপড় পাগড়ির মতো বাঁধা, হাঁটুর ওপর গুটিয়ে পরা খাটো ধূতি, খালিগায়ে বকু একটা লাঠির ডগায় সরিষ্ঠেখরের ব্যাগটা কুলিয়ে কাঁধে নিয়ে হাঁটছে। সাহেবের কানে বকুর ছেলের কথা পৌছেছে। ইঙ্গিতে আকারে বোৰা যায়, জুলিয়েনের চাকরি প্রায় হয়ে গেছে বললেই হয়। কেমন অবস্থি হতে লাগল তাঁর। ভাগিস উনি ক'দিন পরেই রিটায়ার করে যাচ্ছেন। মহীতোষৱা বুঝবে পরে। বাগানের বাবুদের পোকে শান্তী ছেলে থাকলে বাইরে থেকে লোক নেওয়া চলবে না—মোটামুটি এই প্রস্তাৱ এতদিনে কার্যকৰ করেছেন সরিষ্ঠেখর। এতে সুবিধা হল, নতুন যারা ঢেকে তাদের জন্মাতে দেখেছেন, উনি, ফলে কোনোদিন মাথা তুলে কেউ প্রতিবাদ কৰার সাহস পায়নি। এই প্রস্তাৱটাকেই আঁকড়ে ধরেছে অন্যান্য চা-বাগানের কুলিয়া তারাও তাদের ছেলেমেয়েদের আগে সুযোগ দেবার দাবি জানাচ্ছে। লাঠি দিয়ে সামনের পাথৰের নৃত্ব সরিয়ে সরিষ্ঠেখর হাসলেন, স্বাধীনতা এসে যাচ্ছে। ওর রিটায়ার কৰার দিন পনেরোই আগস্ট।

ফ্যাট্টেরি সামনে আসতেই নতুন চায়ের গন্ধ পেলেন উনি। নিজে পঁয়তাঞ্চিশ বছর এখানে কাজ করে গেলেন, কিন্তু চায়ের অভ্যেস কখনো হল না তাঁর। তবে এই ফ্যাট্টেরি সামনে দিয়ে যেতে তাঁর খুব ভালো লাগে। নতুন পাতার রস নিংড়ে যখন চা বাৰুবন্দি হবার চেহারা নিয়ে ফ্যাট্টেরিতে স্থপ হয়ে থাকে তখন হেটে যেতে যেতে নাক ভারী হয়ে উঠে যিটি গুঁকে। প্রচণ্ড একটা টানা আওয়াজ আসছে ফ্যাট্টেরি থেকে। আঙুরাভাসার জলে ফ্যাট্টেরি হইলটা স্বীরে। ডায়নামো ফিট করে ইলেক্ট্ৰিক আলে জুলে দেওয়ায় জায়গাটা কেমন ম্যাড়মেড়ে দেখা আছে। ফ্যাট্টেরি সামনে ডিসপেনসারি। হলুদ রঙ-কৰা একতলা-বাড়ির সামনে আলো জুলছে; ডিসপেনসারিৰ খেলা দৰজা দিয়ে ডাঙ্কাৰ ঘোসালকে দেখতে পেলেন উনি। একটা বাচা ছেলের হাতে ব্যাকেজ বেঁধে দিচ্ছেন। মাথা-ভৱতি পাকা চুল এই লোকটিৰ ডাঙ্কাৰি ডিয়ি থাকুক বা না-থাকুক, ওর দিনবারাত হেটে যাবার ক্ষমতাকে শুল্ক কৰেন সরিষ্ঠেখর।

‘বাড়ি যাবে নাকি হে ডাঙ্কাৰ?’ গলাবীকারি দিলেন উনি।

চকিতে মুখটা ঘূরিয়ে ডাঙ্কাৰ ঘোষাল বাইরের দিকে তাকালেন, তারপর দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, ‘নমকার, স্যার।’

‘কী হে, উঠবোঁ’

‘এই হয়ে এল, আপনি এগোন, আমি আসছি।’ ডাঙ্কাৰ হাসলেন।

পা বাড়ালেন সরিষ্ঠেখর, কিন্তু এগানো হলো না তাঁর। ডিসপেনসারিৰ পাশের অঙ্ককারে ঘাপটি মেঝে কোথায় বসেছিল, ছিলা-ছাড়া তীব্রের মতো ছিটকে এসে গড়ল সরিষ্ঠেখেরের পায়ে। এসে দুহাতে পায়ের পাতা জড়িয়ে ধৰে ঢুকুৰে উঠল, ‘তুই কিনো চলি যাবি রে-এ-এ।’

‘হাহ করে উঠলেন সরিষ্ঠেখর, কিন্তু ছাড়াতে পারলেন না। দুহাতে শক্ত করে ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে, মাথাটা টুকু কেঁকে এক-একবাৰ। লাঠিতে ভৱ রেখে নিজেকে সামলালেন একবাৰ। তারপর অসহায় চোখে পেছনে দাঁড়ানো বকুর দিকে তাকালেন। হলদে দাত বেৰ কৰে বকু হাসল। তারপর মাথা দোলাল।

‘এই ওঠ, ওঠ বলছি!’ হেঁকে ওঠেন সরিষ্ঠেখর।

‘তু কাহা যাহাতিস রে-এ-এ-এ-এ।’ মুখ তুলল কামিনটা। একমুখ ডাঙ্কাচোৱা মেখা, মাথায় কাঁচাপাকা প্রায় নৃত্ব-হয়ে-আসা চুল, খালিগায়ে কোনোৱকমে জড়ানো শাড়ি কুচকুচে কালো কামিনটাৰ তেতুলেৰ খোসাৰ মতো আঁতুল সরিষ্ঠেখেৰেৰ পায়ে চেপে বসেছিল। শেষ পৰ্যন্ত বকু সর্দার এগিয়ে এসে যেয়েটোকে ছাড়িয়ে নিল। সরিষ্ঠেখেৰ দেখলেন, কোনোৱকমে উঠে দাঁড়াল ও, দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। চিনতে পারলেন এবাৰ, তিন নম্বৰ কুলি-লাইনেৰ এককালেৰ সাড়া-জাগানো কামিন সেৱা। ইঁড়িয়া টেনেছে খুব। মদেসিয়া মেঝেৰ নাম সেৱা বিশ্বাস কৰতে পাৱেননি উনি তিৰিঃ। বছর আগে। হঞ্জ নিতে এসেছিলে এক শনিবাৰ। টিপসই নিয়ে টাকা দিছিল ক্যাশিয়াৰ ব্ৰজেনবাবু অফিসেৰ

বারান্দায় বসে। আগের শনিবার পেয়েটের একটা গোলমাল হয়েছিল বলে সরিষ্পেখের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাথায় ফুলগৌজা আটোসাঁটো শরীরের লম্বা এই মেয়েটাকে চোখে পড়েছিল ভিড়ের মধ্যে। ডুরে শাড়ি, লাল ব্রাউজ, আর শাড়ির হাঁটু অবধি নামা আঙুর-জড়ানো শরীরটা নিয়ে রঙচঙ করছিল মেয়েটা। অন্য সুবাই যখন সরিষ্পেখেরকে দেখে চৃপাচ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল তখন এই মেয়েটা চোখ ঘুরিয়ে তিন-চারবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়েছিল ওর দিকে তাকিয়ে। ব্রজেনবাবু যখন নাম ডাকলেন তখন বুঝতে পারেননি সরিষ্পেখের প্রথমটায়। মেয়েটা যখন তিনব দুলিয়ে শালিক পাখির মতো হেঁটে এল, তখন বুঝতে পারেননি সরিষ্পেখের ব্রজেনবাবুকে জিজাসা করেছিলেন, 'কী নাম বললেন?'

সঙ্গে সঙ্গে কপট শব্দ করেছিল গলায় মেয়েটা, হাত নেড়ে ব্রজেনবাবুকে নাম বলতে নিষেধ করেছিল। তারপর আচমকা হেসে উঠে বলেছিল, 'সেরা-সেরা ওরাও। ফাস্টো কেলাস।'

এখন কী বলবেন এই মাতালপ্রায় ঝুঁড়ি-হয়ে-যাওয়া সেরাকে। দুটো পায়ে শরীরের ভর ঠিক রাখতে পারছে না। টলতে টলতে বাঁ হাত ঘূরিয়ে সেরা কী বলতে চেষ্টা করল আর একবার। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যেন এই প্রথম বকু সর্দারকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখ-চৰতি খুতু মাটিতে ছিটকে ছিটকে ফেলল সেরা। সরিষ্পেখের বুঝলেন, ও এখন হঠাৎ রেগে গেচে। বোধহয় এখন সরিষ্পেখের ওর মাথায় নেই। রেগে যাওয়ায় সেরার জরাজীর্ণ শুখ-চোখ আরও কদাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ সেই দৃশ্যটা চোখের মধ্যে চমকে উঠল তাঁর। বকু সর্দার হয়নি। অফিসে পিয়ানোর চাকরি করে বলে অনে কুলিদের থেকে মর্যাদা দেবি এই যা। সেরা সম্পর্কে তখন অনেক গল্প জেনে গেছেন। দুএকজন আসিস্টেন্ট ম্যানেজারের বাংলোয় রাতে ওকে দেখা গেছে; যারা একটু লাঞ্জুক তারা, সক্রের পর অঙ্ককারে রাস্তায় দাঁড়ানো সেরাকে জিপে তুলে নিয়ে বুঁটিমারী-ক্ষেত্রে ঘটাত্তানেক কাটিয়ে আসে-এইসব। কিন্তু মাংগার মা যখন ওর কাছে কেবলে পড়ল বাড়িতে এসে তখন ছেটবউ বলেছিল, 'দূর করে দাও-না মেয়েছেলেটাফে! বিশাস নেই কিছু-'

কী বিশাস নেই সেটা আর জিজাসা করেননি তিনি। চা-পাতি তুলতে গিয়ে সারাদিন সেরা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে পাতিবাবুর সঙ্গে গল্প করে এ-খবর ছেটবউ-এর কানে এসেছিল। ইমিতটা মে এবার তাঁর দিকে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বকুকে ধূমক দিয়েছিলেন সেদিনই-কিন্তু চৃপাচ মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল মাংগার বাবা। শেখ পর্যন্ত ব্রজেনবাবুকে এক শনিবার বলে রেখেছিলেন, সেরা টাকা নিতে এলে যেন ওর সঙ্গে দেখা করে।

সেদিন সঙ্গেবেলায় তাঁর অফিস-ঘরে বসে তিনি অবাক হয়ে সেরাকে দেখলেন। কথাটা শুনেই নাকের পাটার পেতলের ফুলটা নেচে উঠল সেবার। কোমরে দুহাত রেখে মুখভর্তি খুতু ছড়িয়েছিল অফিস-ঘরের মেঝেতে। চিক্কার করে বলেছিল, বকুর প্রতি ওর কোনো লাভ নেই। কী জন্মে থাকবে- ওটা তো যেড় যা-না আছে টাকপয়সা, না তাগদ। তা ছাড়া কত বড় বড় রইস আদৰ্শি ওর চারপাশে ঘূরঘূর করছে, বকুর মতো তেলাপোকার দিকে নজর দেবার সময় কেোথায়? এই এখন, সেরার কোরের হাত রেখে দাঁড়ানো দড়ি-পাকানো চেহারাটা দেখে চট করে সেই ছবিটা মনে পড়ে গেল ওর। মেয়েদের এক-একটা ভঙ্গি আছে সময় যাকে কেড়ে নিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এবং সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতে সেগুলো তাদের শরীরে ফিরে আসে আচমকা। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে অভিমান এত দীর্ঘ সময় ধরে একইভাবে গোপনে কী আকর্ষ সততায় বেঁচে থাকে যা কোনো পুরুষমানুষ লালন করতে পারে না। কবে কোন যৌবনে বকুর প্রতি ওর যে অভিমান ঘৃণা বা অহংকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, এখন এতদিন পরে নেশার চড়াত্ত মুহূর্তে সেগুলো ফিরে পেল সেরা-পেয়ে বোধহয় আজ সারারাত বুদ হয়ে থাকবে। ভৱিবিকেলে আচমকা ধূম ভেঙে গেলে মনে হয় না এই সবে সকাল হয়েছে।

নিজের মনে হেসে আবার হাঁটতে লাগলেন সরিষ্পেখের। পেছনে বকু সর্দার। সেরা তখনও টলছে। ওরা যে চলে যাচ্ছে সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। সাদা ঝুঁড়ি-বিছানো বাগানের পথ দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। ফ্যাট্টির আলো ফুরিয়ে যেতেই টর্চ জ্বাললেন তিনি। পাঁচ-ব্যাটারির জেরালো-আলো। ঘুটঘুটে অঙ্ককার চমকে চমকে সামনের পথখটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। দুপাশে ছেট শুকনো নালার ধারে থরে থরে চা-গাছ। রাস্তাটার বাঁকে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকালেন উনি। দুরে খিম হয়ে থাকা ফ্যাট্টির হলদে-মেরে-যাওয়া আলোয় ডিস্পেনসারি-বাড়িটা আনাড়ি হাতের তোলা ছবির মতো মনে হচ্ছে। আবার সামনে একা রোগাটে শাড়ি জড়ানো শরীর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে।

সরিষ্ঠেশ্বর লক্ষ করলেন, বকু পেছন ফিরে দেখল না। মাথা নিচু করে পেছন পেছন আসছে তাঁর। দুপাশের চা-গাছের মধ্যে দিয়ে চলে-যাওয়া অঙ্ককার রাস্তায় টর্চ জ্বলে যেতে-যেতে সরিষ্ঠেশ্বর লক্ষ করলেন, বকু পেছন ফিরে দেখল না। মাথা নিচু করে যেতে-যেতে সরিষ্ঠেশ্বর হঠাত এক অস্তুত ত্রাণ পেলেন। ছোটবউ কবে চলে গেছে? তখন তেও তাঁর মধ্যায়োবন। এই এতদিন ধরে তিনি কী ভীষণ এক! আর আচর্য, কথটা এমন করে কই কখনো মনে পড়েনি তাঁর। এই স্বর্গহেঁড়া চা-বাগানে তাঁর শিক্কগুলো কত গভীর লেমে গেছে-নিজের কথা মনে পড়ার সুযোগই দেয়নি; এখন ছেলেরা বড় হয়ে গিয়েছে। দুটো সুরল কথা বলার মতো সম্পর্ক নেই আর। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে তাঁর কাছেই আছে। ওর দেখাতনা সেই করে। কিন্তু তাকেও তো সহজ হয়ে কিছু বলতে পারেন না তিনি। এই বয়সে নিজের চারদিকে এত রকমের দেওয়াল নিজেই খাড়া করে রেখেছেন দিনদিন-আজ বর কষ্ট হল সরিষ্ঠেশ্বরের। ভারী পা টেনে টেনে চা-বাগানের রাস্তা ছেড়ে কোয়াটারের সামনে মাঠে এলেন উনি। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে হঠাত চেয়ে দেখলেন, এটা ছোট শরীর সারা গায়ে তাঁর টর্চের আলো মেঝে দুর্গঠাকুরের পায়ে ছুড়ে দেওয়া অঞ্জলির মতো ছুটে আসছে। হঠাত আলো নিবিয়ে ফেললেন তাঁর শীত বোধ হল যেন। দুহাত বাড়িয়ে নিজের বিশাল দেহে নরম শরীরটাকে প্রায় লুফে নিয়ে কী গাঢ় মহত্তায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হয়েছে দাদু?’

এখন তাঁর চারপাশে কোনো দেওয়াল নেই। আকাশ হাতের কাছে, বুকের ওপরে।

ক্লাবঘরে মাঝে-মাঝে শোরগোল উঠছে। পটাপট তাস ফেলার শব্দ, এর ওর ভূল বুবিয়ে দেবার চেষ্টায় কান পাতা দায় ওখানে। হ্যাজাকের পূর্ণ আলো দৱজা-জানালা দিয়ে ঠিকেরে পড়েছে বাইরের অঙ্ককারে। মহীতোষ ওখানে আছেন। তাস-পাগল লোক। বিজ টুর্নামেন্টে আশেপাশের চা-বাগান থেকে অনেক ট্রফি জিতে এনেছেন মালবাবুকে পার্টনার করে। সরিষ্ঠেশ্বরের যৌবনকালে কোনো ক্লাবঘর ছিল না স্বর্গহেঁড়ায়। মহীতোষবা খালি-পড়ে-থাকা খড়ের ছাদ দেওয়া ঘরটাকে ক্লাবঘর বানিয়ে নিয়েছেন মেরামত করে। অবশ্য স্বর্গহেঁড়া বাজারে এখন বিবাট ক্লাবঘর হয়েছে। তিখার মাটেটস আর কল্ট্যাক্টররা এসে জাঁকিয়ে বসেছে চা-বাগানের পাশে স্বর্গহেঁড়া বাজারে। ওটা খাসমহলের এলাকা। মাঝে-মাঝে মহীতোষবা ঐ ক্লাবে তাস খেলতে যান। শুধু বিজ নয়, পয়সা বাজি রেখে রাখি, এমনকি কালীপূজার রাতে তিনতাস খেলাও হয়ে থাকে ওখানে। সরিষ্ঠেশ্বর ব্যাপারটা একদম পছন্দ করেন না। ফলে মাঝে-মাঝে ইচ্ছে হলেও রাখি বা তিনতাস নিজেদের ক্লাবে খেলেন না মহীতোষবা।

‘আনি বারাদ্দার দাঁড়িয়ে ক্লাবঘরের দিকে একবার তাকাল। বাবার গলা শোনা যাক্ষে, মালবাবুকে কল ভূল দেবার জন্য বকছেন। এখন যদি অনিকে দেখতে পান, চিন্তকাৰ করে উঠবেন, কী চাই এখানে-যাও! অথচ মহীতোষকে বলার দরকার ছিল। সরিষ্ঠেশ্বর অনুমতি দিয়েছেন তবে মা বলেছেন, ‘বেশ যাও, বাবাকে বলে যেও।’ আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু বাবাকে বলার ব্যাপারটা ভালো লাগেনি অনির। ক্লাবঘরে যাওয়া নিয়ে ধৰ ওর। ও আবার ভিতরের ঘরে ফিরে এল। এটা সরিষ্ঠেশ্বরের ঘর। একপাশে খাটে বিছানা সাজানো। লম্বা ইঞ্জিনেয়ারে উনি বসে আছেন। বিবাট পেটেমোটা হারিকেনটা একটা স্টান্ডের ওপর জুলছে। সামনে-রাখা টিপয়ের ওপর একটা দাবার বোর্ড। কালো ঘটি খুব পছন্দ সরিষ্ঠেশ্বরের। বা হাতের তালুতে মুখ রেখে একদৃষ্টি তাকিয়ে আছেন বোর্ডের দিকে। হঠাত দেখলে মনে হবে খেলা চলতে চলতে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী একটু উঠে গেছে। কিন্তু অনি জানে এটা দাদুর অভেস। এই একা একা দাবা খেলো। ছোটবাবু মারা যাবার পর থেকে দাদু একই দাবা খেলেন। আগে ফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধুঁয়ে ছোটবাবু চলে আসতেন এখানে। জলখাবার থেতেন দাদুর সঙ্গে। তারপর দাবাখেলার বোর্ড পাতা হত। প্রায় দাদুর বয়সি মানুষ মাথা জুড়ে টাক, ভঙ্গের পর আর বাঁধানো দাঁত পরতেন না বলে মুখটা বিশ্বী দেখাত। দাদুর সঙ্গে অনেকদিন এই চাঁপানে কাটিয়েছিলেন উনি। বলতে গেলে দাদুর বক্স বলতে উনিই ছিলেন। খেলতে খেলতে কাপি হত ওর, আর চট করে উঠে-আসা কফ গিলে ফেলে দাদুর দিকে অপরাধীর ভঙ্গিতে ভাকাতেন ছোটবাবু। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়তেন সরিষ্ঠেশ্বর, ‘নিজেই নিজের মৃত্যু ডাকছ হে, আমার কী, শুধু সঙ্গের পর এই খেলাটা বক্স হবে এই যা।’ যেদিন ছোটবাবু মারা গেলেন অনির মনে পড়েছিল এই কফগোলার কথাটা। নিচ্যাই কফগুলো জমে জমে ছোটবাবুর পেটটা ভরতি হয়ে গিয়েছিল। সেদিন চা-বাগানের সোকজন ছোটবাবু বাড়িতে ভেঙে পড়েছিল। অনেকদিনের

মানুষ। কিন্তু সরিষ্পেখর যাননি। অনিদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন ছোটবাবুকে কাঁধে করে মহীতোষীরা। মা ঘোমটা টেনে এসে বলেছিলেন, উনি তো নেই। তারপর সঙ্গে পেরয়ে গেলে ছোটবাবুকে নিয়ে ওরা অনেকক্ষণ চলে যাবার পর চোরের মতো বাঢ়ি ফিরেছিলেন সরিষ্পেখর। এক হাতে অনিকে ঝড়িয়ে ধরে দাবার বৰ্ড পাততে পাততে সেই সবে রাত-হওয়া হারিকেনের আলোয় ফিসফিস করে বলেছিলেন, ‘বাটা চলে গেল। বুঝলে!’

‘তুমি এলে না কেন?’ অনি জিজ্ঞাসা করেছিল।

‘মাথা-খারাপ! যদি ডাক দেয়, বলে চলো, বিশ্বাস আছে কিছু!’ শুটি সাজাতে সাজাতে বলরেন সরিষ্পেখর। আর হঠাত সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল অনির। বাড়িকাকু বলেছিল, মানুষ মরে গেলে তৃত হয়।

এখন সরিষ্পেখর একা একমনে দাবা খেলছেন। সম্প্রতি দাঁত বাঁধিয়েছেন তিনি। বাঁদিকের টেবিলে একটা পেয়ালার জলে ডুবে ওর খোলা দাঁত হাসছে। তোবড়ানো গাল দেখতে দেখতে অনির মনের হল ছোটবাবুর সঙ্গে দাদুর মুখের এখন কী ভীষণ মিল! হঠাত কী হল, অনি দৌড়ে তিতেরে চলে এন। আর ঠিক তখন দূরে ফ্যাটারিতে আটটার তো বেজে উঠল। বাড়িকাকু খবর এনেছিল আটটায় নদী বক হবে।

রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা বললেন, ‘অনি, হাওয়া দিছে বুব, চটি পরে গলায় মাফলার জড়িয়ে যাও।’

তর সইছিল না অনির। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে বটে তবে তার জন্যে মাফলার পরার দরকার হয় না। মায়ের সবভাতেই বাড়িবাড়ি। অবশ্য ওর টনসিলের ধাত আছে একটু, ডাঙুরবাবু ঠাণ্ডা কিছু খেতে নিয়েখ করেছেন। তাই বলে এই হাওয়ায় আর কী হবে! এগাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও মায়ের দিকে তাকাল। বারান্দার সিলিং থেকে খোলালো শিকে রাখা হারিকেনের আলোয় মাকে কেমন দেখাচ্ছে। লাল শাড়ি পরেছে মা। কাপড়টা যেন সব আলো ওয়ে নিছে এখন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনির বুকের তিতর কেমন করে উঠল। আশ্টে আশ্টে ও তিতরের ঘরে চুকে আলনা থেকে মাফলারটা টেনে গলায় জড়িয়ে নিল।

বাড়িকাকু একটা খালুই-হাতে উঠানে দাঁড়িয়ে ছিল। শীত-ফিত বেশি লাগে না ওর। পূজোর পর থেকে একটা শালোয়ান ফুতুয়ার ওপর জড়িয়ে নেয়। এখন যে-কে সেই। ‘তাড়াতাড়ি চল।’ বাড়িকাকু ডাকল।

উঠানে নেয়ে এন অনি। পিসিমার গলা পেল ও। নিজের হোট ঘরে বসে এতক্ষণ পূজো করছিলেন, এইবার ‘গুরুদেব দয়া করো দীনজনে’ বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অনিকে দেখতে পেয়ে বলে উঠানে, ‘তাড়াতাড়ি চলে আসিস বাবা, যা পচা শরীর তোর। বাড়িটারও খেয়েদের কাজ নেই, হেল্পটাকে নাচাল।’

বাড়িকাকু কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অনি নেয়ে গেছে উঠানে। বাড়িকাকু কী বিড়বিড় করে টর্চের আলো জ্বালাল। ছেষ্ট টর্চ। প্রায়ই বিগড়োয়। ফ্যাকাশে আলো পড়েছে মাটিতে। আকাশ মেঘলা বলেই অরুকার বেশি লাগচ্ছে। এমনকি সামনের গোয়ালঘর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ওরা হাঁটতে লাগল। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া নিছে। অনি বাড়িকাকুর পিছনে যেতে-যেতে হঠাত হাত বাড়িয়ে ওর ফুতুয়ার কোণটা চেপে ধরল। এরকম অঙ্কারে এর আগে কোনোদিন হাঁটেনি ও।

গোয়ালঘরের পেছনে লম্বা গাছগুলোর তলা দিয়ে যেতে-যেতে ওরা চিন্কার ঊনতে পেল। দ্রুত পা চালাচ্ছিল বাড়িকাকু। প্রায় ছুটতে ছুটতে ওরা আঙুরভাসার পাড়ে এসে দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই একটা অসুত দৃশ্য চোখে পড়ল অনির। পুরো নদীটা জড়ে যতদূর দেখা যায়, সেই ধোপার ঘাট পর্যন্ত, অসুস্থ হারিকেন আর টর্চের আলো জোনাকির মতো নাচছে। আচমকা দেখলে মনে হয় যেন দেওয়ালির রাতটাকে কে উপুড় করে দিয়েছে নদীতে। সমস্ত কুলিলাইন ভেঙে পড়েছে এখানে। আঙুরভাসার দিকে তাকিয়ে কেমন বিশ্বি লাগল অনির। জল এখন পায়ের তলায়। কাপড়কাচা পাথরটা ভেজা নুড়ির ওপর পড়ে আছে। জল মাঝখানে। তাও কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। লাফ দিয়ে নেয়ে পড়ল বাড়িকাকু। একটি বিরাট লম্বা বানমাছ ঠিক সামনেটায় খলবল করছিল। একটা মদেসিয়া মেঘে মাছটার দিকে এগোবার আগেই বাড়িকাকু বাঁ হাতে সেটাকে তুলে খালুইতে মুকিয়ে নিল। মেঘেটা চিন্কার করে গাল দিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকল বাড়িকাকু। অনি ভেজা নুড়ির ওপর

সাবধানে হেঠে এল। পায়ের কাছে একটা পাথরঠোকা মাছ জল না পেয়ে লাফাছে। দুই-তিনবারের চেষ্টায় ওটাকে ধরে অনি ঝাড়িকাকুর খালুইতে ফেলে দিল।

‘তোর তো রবারের চাটি জল লাগলে কিছু হবে না তুই টুচ্চি ধর। যেখানে ফেলতে বলব সোজা করে আলো ফেলবি।’ হাত ঝাড়িয়ে টুচ্চি দিল ঝাড়িকাকুর। জল এখন নেমে গেছে পুরোপুরি। শ্যাওলা আর ভাঙা ডালপালা নদীর বুকে ছড়িয়ে আছে এখন। মরো-মাঝে কাদা জমেছে। স্রোতের সময় কাদা দেখা যায় না। অজ্ঞ পোকামাকড় উঠছে এখন। এরা সব কোথায় ছিল কে জানে! তিনটি মেয়ে দল বেঁধে হাতে কুপি জেলে মাছ খুঁজছে। অনি দেখল ওরা খুব হিঁহি করে হাসছে। আলো পড়ে ওদের কালো শরীর চকচক করছে। ঝাড়িকাকুকে খেপাছে ওরা। একটা গর্তের মুখে টুচ্চি ফেলতে বলল ঝাড়িকাকুর। নদীর কিনারে চাপটা পাথরের গা-ঘেঁষে গর্তের মুখে। আলো ফেলে অনি দেখল তিন-চারটে মোটা মোটা পা গর্তের মুখে বেরিয়ে আছে। পকেট থেকে একটা শক্ত সূতো বের করে তার ডগায় একটু শ্যাওলা বাঁধলো ঝাড়িকাকুর। তারপর টানটান করে সূতো ধরে শ্যাওলাটাকে গর্তের মুখে নাচিয়ে নাচিয়ে ভিতরে ঢেকাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনি দেখল চট করে পাণ্ডলো ভিতরে চুকে গেল। গর্তের মধ্যে জমা জলে একটু বুদ্ধ উঠল। আলোটা নিবিয়ে দিল অনি। যাঃ, চলে গেল। কিন্তু ঝাড়িকাকু চাপাগলায় বলল, ‘আঃ, নেবাল কেন?’ আবার আলো জ্বালাল অনি। চাপা নিষ্ঠাসের শব্দ কানে যেতে অনি দেখল মেয়ে তিনটে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে কোতুহলী চোখে ব্যাপারটা দেখছে। ঝাড়িকাকুও ওদের দেখেছে, কিন্তু এখন তার মনোযোগ গর্তের দিকে। গর্তের মুখটাতে শ্যাওলাটাকে নাচাচ্ছে একমে। হাত টন্টন করতে লাগল অনির। মুখ ঘুরিয়ে ও নদীর চারপাশে তাকাল। আজ রাতে আর নদীতে কোনো মাছ পড়ে থাকবে না। লঞ্চেন কুপি আর টর্টের আলোয় নদীটা পরিষ্কার। হঠাতে তিনটে মেয়ে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই অনি চট করে মুখ ফেরাল। ঝাড়িকাকু একগাল হেসে হাতটা মাথার ওপরে তুলে ধরেছে। আর সূতোর শেষে মাটি থেকে ওপরে একটা বিরাট কাঁকড়া খলবল করে ঝুলছে। শেষ পর্যন্ত সেটা সূতো হেঁড়ে পাথরের নুড়ির ওপর পড়তেই ঝাড়িকাকু খালুইটা ওর ওপর চেপে ধরল। তারপর অতি সন্তুষ্ণে খালুই-এর তলা দিয়ে বেরিয়ে আসা মোটা দাঢ়া দুটো ধরে কাঁকড়াটাকে বের করে আনল। টর্টের আলোয় কুচকুচে কালো কাঁকড়াটাকে মুগ্ধভিত্তে দেখল অনি। অত বড় কাঁকড়া এব আগে কখনো দেখেনি সে। দুটো গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে অনিকে দেখছে ওটা। খালুই-এর ভিতরে টপ করে ফেলে দিল ঝাড়িকাকু। কাঁকড়াটাকে ফেলে দিয়ে সেই হাতে পাশে দাঢ়ানো তিনটে মেয়ের একটার তিবুকে টোকা দিয়ে দিল। টর্টের আলোটা সম্মেহিতের মতো ঘুরিয়েছিল অনি। ফ্যাকাশে আলোটা মেয়েটির মুখে পড়তেই ও দেখল কেমন থত্যত হয়ে গেল মেয়েটি। সঙ্গীরা খিলবিল করে হেসে উঠতেই ও লাজুক লাজুক মুখ করে মাথা নামাল।

আধশস্তর মধ্যেই খালুই ভৱতি হয়ে গেল। বান, কাঁকড়া, পাথরঠোকা, চিংড়ি আর পেটমোটা পুটি এরকম কত মাছ। ঝাড়িকাকু বলল, ‘তুই এখনে দাঢ়া, আমি মাছগুলো ঝাড়িতে রেখে আসি।’ হঠাতে অনির কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। এই অঙ্ককারে যদিও নদীতে প্রচুর মদেসিয়া আলো জ্বেল ঘূরছে, তবু ওর শরীর শিরশিরি করতে লাগল। আবছা আলো-অঙ্ককারে মানুষগুলোর মুখ স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছে না, কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে চারপাশ। ওরা ওদের ঘাটে কাপড়কাচা পাথরটার ওপর ফিয়ে এল। অনির পায়ের পোড়ালি অবধি কাধা মাখা, রবারের চাটি চপচপ করছে। ঝাড়িকাকুর ফতুয়া ধরে ও পাড়ের দিকে তাকাল। ফুলগাছ ডুমুরগাছ আর বুনো ফুলের গাছগুলোর মধ্যে চূপচাপ যে-অঙ্ককার জমে আছে সেদিকে চেয়ে ওর বুকের মধ্যে তিরিতির করে উঠল। হঠাতে একটা লশা মুর্তি সেই অঙ্ককারে চলে গেল, পেছন পেছন আর-একজন শাড়ি-পরা। মুখ দেখতে পেল না ও। মুর্তি সেই অঙ্ককারে মিলিয়ে গেল। কারা ওরা? এটা তো ওদের দিকের পাড়। মদেসিয়ারা এখন নিচয়ই এদিকে আসবে না। ফিসফিস করে ও বলল-‘ঝাড়িকাকু’। মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল ঝাড়িকাকু। কাঁচাপাকা সাতদিন না-কমানো দাঢ়ি, হাফপ্যাট আর ফতুয়া পরা বেঁটেখাটো এই মানুষটাকে অনির এখন খুব আপন মনে হচ্ছিল। এক হাতে ওকে ঝাড়িয়ে ধরে কাছে টেনে ঝাড়িকাকু বলল, ‘কী হয়েছে?’

‘ওরা কারা?’ ফিসফিস করে বলল অনি। ভালো করে অঙ্ককারে চোখ বুলিয়েও কিছু ঠাওর করতে

পারল না ঝাড়িকাকু। অনির হাত থেকে টর্চ নিয়ে অঙ্কারে আলো ফেলল ও। ফ্যাকাশে আলো বেশি দূরে গেল না।

‘কী দেখছিস?’ ঝাড়িকাকু জিজ্ঞাসা করল।

‘একজন, তারপর আর-একজন। কারো মাথা নেই।’ অনি প্রায় কেবল ফেলে আর কি।

‘ও কিছু না’, ঝাড়িকাকু মাথা নাড়ল, ‘রামলাম বল। ওরা হলে চলে যাবেন। মাছ বড় ভালোবাসেন তো।’ বলতে বলতে ঝালুইসুন্ধ হাত জোড়া করে নমস্কার করল। অনি মনে মনে রাম রাম বলতে শুরু করে দিল এবার। এখানে এই নদীতে এত লোক, তবু সাহস হচ্ছে না কেন?

ঠাণ্ডা বাতাস যা এতক্ষণ বইছিল এলোমেলো, হঠাতে গাছের পাতা নাচিয়ে দিল এবার। না-ঘূরুতে-পারা পাখিগুলো নির্জন নদীতীরে হঠাতে আসা একদল মানুষের চিংকারে কিচিমিচির করছিল এতক্ষণ, ডালপালা নড়ে উঠেই ডানা বাপটাতে লাগল। হিমবাতাস নদীর মধ্যে নেমে একটা শৌশ্রী শব্দ তুলে চিরন্তির মতো গাছপালার ফাঁক গলে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছিল। পুলওভার থাকা সত্ত্বেও অনির শীতবোধ হল।

ঝাড়িকাকু বলল, ‘ডাক্তারবাবুর ছেলে হরিশ বড় মাছ খেতে ভালোবাসত।’ ঝাড়িকাকুর মুখের দিকে তাকাল অনি। অঙ্কার কালির মতো লেপটে আছে। ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুকে অনি ভালো করেই চেনে। ডাক্তারবাবু আর দিদিমা, ওদের বাড়িতে কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তা হলে কার কথা বলছে ঝাড়িকাকু! কে হরিশ! এই নামের কাউকে চেনে না তো ও!

‘হরিশ কে? আমি দেখিনি তো!’ অনি বলল।

‘তুই দেখবি কী করে?’ হাসল ঝাড়িকাকু, ‘তুই তো এই সেদিন হলি। তোর বাবার চেয়ে বছর তিনের ছোট ছিল হরিশ। সেই যেবার ডুড়ুয়া নদীতে যখন খুব জল বেড়ে গেল, রাত্তির ওপর জল উঠে বাস বক্ষ হল, সেবার এই কুলগাছের মাথা থেকে ধূপ করে পড়ে গেল ছেঁড়াটা। খুব ডার্নপটে ছিল তো! আমি তখন এই ঘাটে বসে বাসন মাজিছি। কাজ শেষ করে বাসন মাজতে তিনটে চারটে বেজে যেত। ডরদুপুরবেলা বাসন মাজিছি বসে, হঠাতে হরিশ এল। গাছটায় কুল হত তখন, পাতা যেখা যেত না। তা হরিশ তলার ডালের কুলগুলো শেষ করে দিয়েছিল পাকার আগেই। হরিশ লাফ দিয়ে তরতর করে মগডালে চলে গিয়ে হাত ঝাড়িয়ে কুল ছিড়ে অর্ধেক খেয়ে আমাকে ঢিল মারছিল। ডাক্তারবাবুর ছেলে আর্মি কী বলব বল! এই মগডালে বসে বসে ও আমাকে বলল, ডুড়ুয়াতে জল কমে গেলে বানমাছ মারতে গেলে কেমন হয়? বানমাছ ধরার বিংড়শি আমার কাছে ছিল হরিশ জাপত। কর্তব্যাবু কৃত বন্ধনের সৃতো আর বিংড়শি শব্দের থেকে পোষ্ট অফিস দিয়ে আনাতেন। আমি দুটো বিংড়শি চেয়ে নিয়েছিলাম। মুশকিল হত বানমাছ বড়দি রান্না করতে চাইত না কিছুতেই। ধরলে খাব কী করে? হরিশের মা রান্না করে ভালো। বড়দি বলত, ঢাকার যেয়ে তো, তাই পারে। আমি একদিনি খেয়েছিলাম, বড় ঝাল! তা আর্মি বললাম, ‘বউদি যদি যেতে দেয় যাব তো।’ কথাটা বলে ফোস করে একটা নিশ্চাস ছেড়ে অঙ্কারে দাঁড়ানো কুলগাছটার দিকে তাকাল ঝাড়িকাকু।

পিসিমাকে বড়দি ঝাড়িকাকু। বাবা ছোটকাকুও বড়দি বলে। এই সেদিন আগে পর্যন্ত শুনে শুনে অনি ও বলত বড়দিপিসি। তখন কি ছোট ঠাকুরা ছিল না? না সেই কমুড়ো নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল বলে মরে গিয়েছিল। মা তখন ছিল না এটা বুবতে পারছে অনি। পিসিমা বলেন, চরিশ বছর বয়সে বাবার বিয়ে হয়েছিল। বাবা যখন কুল খেতে তখন নিচয় ছোট ছিল। অনি বলল, ‘তারপর?’

কথা বলার সময় ঝাড়িকাকুর একটা পিতলে বাঁধানো দাঁত দেখতে পাওয়া যায়। মোজ ছাই দিয়ে দাঁত মাজে বলে চকচক করে। ঝাড়িকাকু বলল, ‘বাসন মাজতে মাজতে হঠাতে পেলাম বুকফটা চিংকার। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি হরিশ পড়ে যাচ্ছে। অত উচু ডাল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে হরিশ, আমি চেয়ে চেয়ে দেখিলাম। পড়ে গিয়ে কেমন দলা পাকিয়ে গেল ও। আমি চিংকার করে সবাইকে ডেকে আনলাম। ডাক্তারবাবু দুপুরে খেতে এসেছিলেন। চিংকার শুনে ছুটে এলেন। সাহেবের গাড়ি করে জল পাইগুড়ি নিয়ে গেল যদি বাঁচানো যায়, পাগলের মতো সবাই ছুটল ওকে নিয়ে। ডুড়ুয়ার জল বেড়েছে সকাল থেকে রাস্তার ওপরে জল, এত জল আগে কখনো হয়েনি। সক্ষেবেলা যঁড়ি নিয়ে ফিরে এল ওরা, যেতে পারেনি। তা হরিশ চলে যাবার তিনিদিন পরই ঘটে গেল ব্যাপারটা। তখন কর্তব্যাবু লোক দিয়ে এই ঘাটে খড়ের ছাউনি করে দিয়েছিলেন। বৃষ্টিবাদলায় ডিজতে হবে না বলে। সেদিন

রাস্তিরে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বাসনগুলো নিয়ে এসেছিলাম মেজে ফেলতে। চাঁদের রাত হলে রাত্রেই বাসন মাজতাম। রাত হয়ে গেলে নদীতে কেউ আসে না। কিন্তু আমার ভয়টয় করত না। বাসন মাজা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ শুনি মাথার উপর খড়ের চালে মচমচ শব্দ হচ্ছে। এঘাটের ওপর তো কোনো গাছপালা নেই, ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য মুখ বাড়িয়েছে তো আমার শরীর ঠাণ্ডা। হরিষ বাঁশের চালায় পা ঝুলিয়ে বসে হাসছে। আমায় দেখে বলল, ‘কী মাছের কাঁটা ফেললি রে নদীতে, কালবোস আমায় দিবিঃ?’ কেমন খোনা-খোনা শব্দ। কিন্তু একদম হরিষ। আমি একছুটে বাড়ি এসে বড়দিকে বললাম। বাসন-টাসন সব রাইল নদীর পাড়ে। বড়দি তক্ষনি এক প্লেট ভাজা মাছ আমাকে দিয়ে বলল ঘাটে রেখে আসতে। আমি রাম রাম বলতে বলতে মাছ নিয়ে আবার এসে এখানে রেখে দৌড়ে ফিলে গেলাম। বাসন নেবার কথা মনে নেই। আর চালার দিকেও তাকাইনি। পরদিন সকালে দেখি বাসনগুলো তেমনই আছে, প্রেটাও, শুধু মাছগুলো নেই। তারপর থেকে যদিন ডাঙারবাবু পিয়ি দেননি ততদিন ওর মা ওর জন্যে এক প্লেট মাছ নদীর ধারে রেখে যেত। আমি অবশ্য আর সঙ্গের পর এখানে আসিনি।’ অনিকে জড়িয়ে ধরে টর্চ জ্বেলে হাঁটতে লাগল ঝাড়িকাকু, ‘নে চল।’

এতক্ষণ হাওয়া দিচ্ছিল, এখন টুপটুপ করে কয়েক ফোটা পড়ল। ‘তাড়াতাড়ি পা চালা।’ ঝাড়িকাকু বেশ দ্রুত হাঁটছিল। দুপাশে অঙ্ককার রেখে ফ্যাকাশে আলোর বৃক্ষে পা ফেলে ওরা এগিয়ে আসছিল। এখন চারপাশে শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া কিছু নেই। অবশ্য ঝাড়িকাকুর হাতে খালুইতে বড় কাঁকড়াটা ভীষণ শব্দ করছে। ওরা গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে আসতে হঠাৎ কালীগাই-এর গঁথীর গলার ডাক শুনতে পেল। যেন পরিচিত কেউ যাচ্ছে বুঝতে পেরেছে ও। জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে সাড়া দিল ঝাড়িকাকু। অনিন মনে হচ্ছিল, এখন যে-কোনো মুহূর্তেই হরিষ ওদের সামনে এসে হাত বাড়িয়ে মাছ চাইতে পারে। আর ঠিক তখন অঙ্ককারে একটা আকন্দগাছের পাশে দুটো মৃত্তিকে নড়ে উঠতে দেখে অনি দুহাতে ঝাড়িকাকুকে জড়িয়ে ধরল। ঝাড়িকাকুও দেখতে পেয়েছিল ওদের। ঝানিক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে মাথা দোলাল একবার। তারপর অনিন হাত ধরে সোজা হেঠে খিড়কিদরজা দিয়ে ভিতরে চুকে বলল, ‘তোর যা ভয়, ও তো প্রিয়।’ চমকে গেল অনি। প্রিয়! মনে কাকুঃ কাকু এত রাত্রে ঐ অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে কী করছে? সঙ্গে শাড়ি-পরা মেয়েটা কে? চট করে নদীর পাড়ে দেখা দুটো মৃত্তির কথা মনে পড়ে গেল ওর। অঙ্ককারে মনে হয়েছিল যদের মাথা নেই। তাহলে ঝাড়িকাকু আর একটা মেয়ে নদীর পাড়ে গিয়েছিল মাছধরা দেখতে? মেয়েটা কে জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অনিন।

উঠোনে ওদের দেকেই মা আর পিসিমা একসঙ্গে বকাবকা শুরু করলেন। পিসিমা বকছিলেন ঝাড়িকাকুকে, কেন এতক্ষণ ও অনিকে নিয়ে নদীতে ছিল, আর মা অনিকে। অনি যখন টিউবওয়েলের জলে পা ধুচ্ছে ঠিক তখন নদীর মধ্যে প্রচও শোরগোল হচ্ছে শুনতে পেল। কারা ভয় পেয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করছে। একবার ফিরে তাঁক্যে ঝাড়িকাকু আবার ছুটে গেল অঙ্ককারে টর্চ জ্বেলে। কী হয়েছে জনতে ওরা উঠোনে এসে দাঁড়াল। উঠোনের এখনটায় অঙ্ককার তেন নেই। শিকে টাঙ্গনো হারিকেনের আলো অনেকটা জায়গা জড়ে ছাড়িয়ে পড়েছে। ঝাড়িকাকু চলে যেতে ওরা দেখল তিন-চারতে লঠন গোয়ালঘরের পিছনদিকে ছুটে ডাঙারবাবুর ‘কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল।

এমন সময় প্রিয়তোষ খিড়কিদরজা খুলে ভিতরে এল। পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি হয়েছে রে?’

‘কী জানি।’ প্রিয়তোষ হাঁটতে হাঁটতে বলল।

‘তুই কোথায় ছিলি?’ পিসিমা আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

চটপট পা চালিয়ে কাকু ততক্ষণে ভিতরে চলে গিয়েছে। অনি দেখল থমথমে-মুখে পিসিমা মায়ের দিকে তাকালেন। মা চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিলেন। পিসিমা মনে মনে বিড় বিড় করে বললেন, ‘বড় বেড়ে যাচ্ছে, বাবা শুনলে রাঙ্কে রাখবে না।’

একটু বাদেই ঝাড়িকাকু ফিরে এল হাঁপাতে। ওর কাছে শোনা গেল ব্যাপারটা। মাছ ধরার নেশায় সবাই নেমে পড়েছে নদীতে। তা এ লাইনের বৰশী, বয়স হয়েছে বলে চেতে ভালো করে দেখে না, পা দিয়ে দিয়ে কাদা সরিয়ে পাকাল মাছ খুজছিল। কয়েকটা মাছ ধরে নেশাটা বেশ জমে গিয়েছিল ওর। ইডিয়া খেয়েছে আজ সঙ্গে থেকে। হঠাৎ একটা লম্বা মোটা জিনিসকে চলতে দেকে মাছ ভেবে কোমরে হাত দিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সেটা ছোবল মেরেছে হাতে। নেশার ঘোরে ওর

কোমর ছাড়েনি বংশী। সাপটা দু-তিনটে ছোবল মারার পর খেয়াল হতেই চিন্কার করে কেঁদে উঠেছে। ততক্ষণে সাপটা অঙ্গকারে ঝুকিয়ে পড়েছে ছাড়া পেয়ে। এখন কেউ বলছে সাপটা নিশ্চয়ই জলঢোঢ়া, বিষফিষ নেই। কেউ বলছে, ছোবল মেরেছে যখন তখন নিশ্চয়ই শোবরো। বংশী বলছে, সাপটার রঙ ছিল কৃতুচ্ছ কালো। তা নেশার চোখ বলে কথাটা কেউ ধরছে না। হাতে দু-তিনটে দড়ি ঘাঁধা হয়ে গেছে। হাঁটতে পারছে না বংশী। ডাঙাৰবাবুকে আনতে লোক গেছে কোয়াটোৱে।

ব্যাপারটা শুনে পিসিমা বললেন, ‘জ্যোতিৰ’। বলে অনির চিৰুকে হাত দিয়ে চমু খেয়ে নিলেন, ‘তখন বলেছিলেন নদীতে নিয়ে যাস না বাড়ি, যদি এই ছেলেৰ কিছু হত-তুমি কালই সোয়া পাচানার পুজো দিয়ে দিও মাধুৰী।’

এমন সময় জুতোৰ আওয়াজ উঠল ভিতরেৰ ঘৰে। বাড়িকাৰু সুড়ৎ করে রান্নাঘৰে চলে গেল। মা হাত বাড়িয়ে থাথাৰ ঘোষটা টেনে দিলেন। সৱিশেখৰ এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। বাড়িতে বিদ্যাসাগৰি চঠি পৱেন, আওয়াজ হয়। অনিকে বললেন, হ্যা বে, ভবানী মাটোৱ এসেছিল একটু আগে, কাল তোৱ কুলে পৰীক্ষা?’

পিসিমা বললেন, ‘ও তো আৱ ওই কুলে পড়েছে না, পৰীক্ষা দিয়ে কী হৰে?’

সৱিশেখৰ বললেন, ‘তা হোক, কাল পৰীক্ষা দিতে যাবে ও।’ বলে আৱ দাঁড়ালেন না।

এই সময় কান্নাৰ রোল উঠল নদীৰ ধাৰে। অনিকে দুহাতে জড়িয়ে ধৰে পিসিমা বললেন, ‘কালই পাচসিকেৰ পুজো দিও মাধুৰী।’

শেষ পৰ্যন্ত রাত্ৰিবেলায় বৃষ্টি নামল।

খানিক আগেই ওদেৱ খাওয়াদাওয়া হয়ে গিয়েছে। দাদুৱ সঙ্গে বসে খাওয়া অনিৱ অভেয়। খেতে, খেতে দাদু বলেছিলেন, ‘আজ ঢালবে, তোমোৱ তাড়াতাড়ি কাজকৰ্ম ছুকিয়ে নাও।’ দাদুৱ খাওয়াৰ সময় হাতপাৰা নিয়ে পিসিমা সামনে বসে থাকেন। গৱমকালে তো বটেই, শীতকালেও এৱকমটা দেখেছে অনি। হাতপাৰা ছাড়া দাদুৱ খাওয়াৰ সময় পিসিমাৰ বসা মানায় না। কাজ-কৰা উচু চওড়া পিড়িতে বসে সৱিশেখৰ খান, পাশেই ছোট মাপেৰ পিড়িতে অনি। আজ বাইৱেৰ হাওয়াৰ জন্য জানালা-দৰজা বন্ধ। কাচেৰ জানালা দিয়ে হঠাৎ চমকালো বিগতৈৰ আলো ঘৰে এল। মা মাথায় ঘোষটা দিয়ে খাবাৰ দিছিলেন।

পিসিমা বললেন, ‘বংশীটা মৰে গেল।’

আমসত্ত্ব দুধে মাখতে মাখতে সৱিশেখৰ বলৱেন, ‘দুখটা আজ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—কতবাৰ বলেছি ঠাণ্ডা দুধ দেবে না।’

মা তাড়াতাড়ি একবাটি গৱম দুধ নিয়ে এসে বললেন, ‘একটু দেলে দেব বউদি!'

পিসিমা বললেন, ‘দাও।’

সৱিশেখৰ বিৱাট জামবাটিটা এগিয়ে দিয়ে খানিকটা দুধ নিলেন, নিয়ে বললেন, ‘কে বংশী?’ ‘লাইনেৰ বংশী। আগে জল এনে দিত আমাদেৱ।’

‘কি হয়েছিল?’

‘মাছ ধৰতে গিয়ে লতায় কেটেছে।’

কথাটা শুনে সৱিশেখৰ চট করে অনিৱ দিকে তাকালেন, তাৰপৱ জানালা দিয়ে বাইৱেৰ দিকে। বাইৱেৰ তখন ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকালে। আলোৱ আলোৱ ঝলসে যাছে গাছপালা। সেইদকে চোখ রেখে সৱিশেখৰ বললেন, ‘বড় ভালো মাংস কাটত লোকটা, এক কোপে মাথা নামিয়ে দিত।’

কথাটা শুনে চট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল অনিৱ। সৱিশেখৰ আজকাল আৱ মাংস খান না। বাড়িতে মাংস এলে আলাদা রান্না হয়। একদিন পিসিমা দাদুৱ মাংস খাওয়াৰ গল্প কৰছিলেন। যৌবনে তিন সেৱ মাংস একাই খেতেন উনি। মা বলেছিলেন, ‘তিন সেৱ।’

পিসিমা হাত নেড়ে বলেছেন, ‘হবে না কেন? নদীৰ ধাৰে গাছে ঝুলিয়ে বংশী পাঁঠা কাটাত। তাৰপৱ সেই মাংসেৰ অৰ্দেক বাড়িতে রেখে বাকিটা অন্য বাবুদেৱ বাড়ি বাবা দিয়ে দিতেন। আমাদেৱ বাড়িতে খাওয়াৰ লোক তেমন ছিল না। মহী ছুটিতে বাড়ি এলে ওকে ধৰলে চার পাঁচজন। বাবাই অৰ্দেক খেতেন।’

ମା ହେସେ ବଲଲେନ, 'ଏକଟା ଅର୍ଧେକ ପାଠୀର ମାଂସ କୀ କରେ ତିଳ ସେଇ ହୟ ବଡ଼ଦି?'

ଅନିଓ ହେସେ ବଲଲ । ପିସିମା ନାକି ହିସେବ ପାରେ ନା-ଦାନୁ ବଲେନ । 'ସେଇ ବାବା ମାଂସ ଛେଡ଼େ ଦିଲେନ ଏକଦିନ,' ପିସିମା ବଲଲେନ, 'ଭୀଷଣ ପାଷାଣ ଲୋକ ଛିଲେନ ବାବା । ଏଥନ କୀ ଦେଖିଛି, ଏକଦିନ ଶେଷନ ଜୋରେ ବକେଛିଲେ ଯେ ବାଢ଼ି ପ୍ଯାଟେ ହିସି କରେ ଫେଲେଛିଲ । ଗମଗମ କରାନ୍ତ ଗଲା । ତଥନ ଶାକ-ବାଜର କ୍ଷେତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଗର୍ବ-ଛାଗଲ ଚକଳେ ବାବା ରେଗେ କାହିଁ ହୟେ ଯେତେନ । ପାଠୀ ନିୟେ ବାବା ସେଟାର କାମେର ମଧ୍ୟେ ଛୁକିଯେ ଦିତେନ । ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମରେ ଯେତ ଜୀବଟା । ତଥନ ଯାର ପାଠୀ ତାକେ ବଳା ହତ ଦୋଷ କରେଛେ ତାହିଁ ଶାଙ୍କି ଦିଯେଇ । ବାବାକେ ଯଥ ପେତ ସବାଇ, କିଛୁ ବଲତ ନା । ବଞ୍ଚି ଏସେ ସେଇ ପାଠୀର ମାଂସ କେଟେ ବାଡ଼ି-ବାଡ଼ି ଦିଯେ ଆସନ୍ତ । ଯାର ପାଠୀ ତାର ବାଡ଼ିଓ ବାଦ ଯେତ ନା ।' ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମି ଆର ସରରେ ଦିତାମ ନା, ପାପେର ତାଣୀ ହେବେ କେ? ଏର ମଧ୍ୟେ ହେବେଛେ କୀ, ବାଗାନେ କେ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏସେହେ, ବାବା ଦେଖତେ ଶିଯେ ନମକାର କରଲେନ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲେଛିଲେ, 'ତୋର ତୋ ବହଦିନ ଥ୍ରାୟାଚିତ୍ତ କରତେ ହେବେ ଦେଖଛି!'

ବାବା ବଲଲେନ, 'କେନ, କୀ ଜନ୍ୟେ?'

ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାତ ନେଡ଼େ ବଲେଛିଲେ, 'ତୋର ଗାୟେ ଖୁଲିର ଗନ୍ଧ ।'

ଚୁପ କରେ ଫିରେ ଏସେହିଲେ ବାବା । ଆର ଛାଗଲ ଧରତେନ ନା, ମାଂସ ଖାଓଯା ଛେଡ଼େ ଦିଲେନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ତାଓ ଛାଡ଼ା କୀ-ଏକଦିନ ଖେତେ ବସେଛେ, ମାଂସ ଦେଇଯା ହେବେଛେ । ଏକଟୁ ମୁଖେ ଦିଯେଇ ଟାନ ଦିଯେ ଛୁଡ଼େ ଫେଲେ ଦିଲେନ । ଚିନ୍ତକାର କରେ ବଲଲେନ, ମାଂସ ରେଖେଛେ ନା ବୌଟିଯି କରେଛେ! ନା ହେବେଛେ ନୁନ ନା ବାଲ । ଆର ଆମାକେ ମାଂସ ଦେବାର କଟ ତୋରେ କରତେ ହେବେ ନା ।' ଆମି ତୋ ଭୟ-ଭୟ ମହିକେ ବଲଲାମ, 'ଖେଯେ ଦ୍ୟାଖ ତୋ!' ମହି ବଲଲ, 'କଇ, ଖାରାପ ହୟାନି ତୋ । ଆସଲେ ଏକଟା ବାହାନା ଦରକାର ତୋ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କଥାଯ ଛେଡ଼େ ଦିଲେ ଲୋକେ ବଲବେ କୀ!'

ଏଥନ ଦାନୁର ଶରୀରେର ଦିକେ ତାକାଲେ ଅନିର ମନେଇ ହେଇ ନା ଏସବ ହତେ ପାରେ । ଏକମାଥା ପାକା ଚଳ, ଠୋଟେର ଦୁପାଶେ ଝୁଲେ-ଥାକା ସାଦା ପୋଫ, ବିରାଟ ଝୁଲେ ମେଦ କିଛୁଟା ଝୁଲେ ପଡ଼େଛେ, ବା ହାତେ ସୋନାର ତାଗା ଆର ହାଁଟୁ ଅବଧି ଧୂତିପରା ଏହି ଲୟାଚ୍‌ଡୋ ମାନୁଷଟାକେ ଅନିର ବଡ଼ ଭାଲୋ ଲାଗେ । ଦାନୁର ସଙ୍ଗେ ରୋଜ ଶୋଯ ଓ । ଛେଲେବେଲା ଥେବେଇ । ଆର ଶ୍ଵେତ ଶ୍ଵେତ ଯତ ଗଲ୍ଲ । ପିସିମା ବଲେନ, 'ଶ୍ଵେତ ଶ୍ଵେତ ଓ ପୁଟ୍ଟେସ ପୁଟ୍ଟେସ କରେ ବାବାକେ ସବ ଲାଗାଯ ।' ଆସଲେ ଦାନୁ ଯଥନ ରୋଜ ଜିଜାସା କରେନ, 'ଆଜ କୀ ବ୍-ବଲ' ତଥନ କୋନ କଥାଟା ବାଦ ଦେବେ ବୁଝାତେ ନା ପେରେ ସବ ବଲେ ଫେଲେ ଅନି ।

ଆଜ ରାତେ ଦାନୁର ଘର ଥେକେ ନିଜେର ବାଲିଶ ନିୟେ ଏଲ ଓ, ତାରପର ସୋଜା ମାଯେର ବିଛାନାୟ ଶ୍ଵେତ ପଡ଼ିଲ । ମହିତୋର ଖାନିକ ଆଗେ କ୍ଲାବ ବନ୍ଦ କରେ ଫିରେଛେ । ରୋଜ ଦଶଟା ଅବଧି କ୍ଲାବ ଚଲେ, ଆଜ ବୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ଏକଟୁ ଆଗେଇ ଭେତେ ଗେଛେ; ଶ୍ଵେତ ଶ୍ଵେତ ଅନି ଦାନୁର ଗଲା ଶନତେ ପେଲ, ଓବେଇ ଡାକଛେନ । ଉଠି ଏଲ ଓ, ଦରଜାଯ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆପ୍ତେ ଆପ୍ତେ ଆପ୍ତେ ବଲଲ, 'ଆମି ମାଯେର କାହେ ଶୋବ ।' ବିଛାନାୟ ବାବୁ ହୟେ ବସେ ସରିବଶେଖର ଓକେ ଦେଖିଲେନ, ତାରପର ହେସ ଧାଡ଼ ନାଡ଼ିଲେନ । ଆର ଏହି ସମୟ ବମବାର କରେ ବୃଷ୍ଟି ନେମେ ଶେଲ । ବାଡ଼ିର ଟିନେର ଛାଦେ ଯେନ ଅଭ୍ୟାସ ପାଥର ପଡ଼ୁଛେ, କାନେ ତାଲା ଲେଗେ ଯାବାର ଯୋଗାଡ଼ । ଅନି ଏକଚାନ୍ଦ ମାଯେର ଘରେ ଫିରେ ଏଲ । ବିଛାନାୟ ଶ୍ଵେତ ବାଲିଶେ ମୁଖ ଚେପେ ଓ ବୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶନତେ ଲାଗଲ । ମାରୋ-ମାରୋ ଶବ୍ଦ କରେ ବାଜ ପଡ଼ୁଛେ । ମାଥାର ପାଶେ କାଚେର ଜାନିଲା ଦିଯେ ବିଦୁତେର ହଠାତ୍-ଜାଗା ଆଲୋଯ ପାଶେର ସବଜିକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବ୍ଦ ପେଣ୍ଗାଟା ହିଡ଼ିସ ରାକ୍ଷସୀର ମତୋ ହାତ-ପା ନାଡ଼େ ହାଓ୍ୟାର ପାପଟେ । ଭୟ ଚୋଖ ବନ୍ଦ କରେ ଫେଲି ଅନି । ତାରପର ତଥନ କେମନ କରେ ଜଲେର ଶବ୍ଦ ଶନତେ ଓ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େଛିଲ ବୁଝାତେ ପାରେନ ।

ମହିତୋର ଗଲା ଶନତେ ପେଯେ ଓ ଧତମତ ଥେଯେ ଶିଖିଛିଲ । ମାଧୁରୀ ଓକେ ତାଲୋ କରେ ଓହିୟେ ଦିଜିଲେନ ବଲେ ଘୁମଟା ଭେତେ ଗେଲ । ଓ ମନେ ପଡ଼ିଲ ଓ ଆଜ ମାଯେର ଘରେ ଶ୍ଵେତ ଥେଯେ ଆହେ । ବାଇରେ ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛେ ସମାନ ତାଲେ । ଚୋଖ ଏକଟୁ ଝୁଲେ ଅନି ଦେଖିଲ ଘରେର କୋଣାର ବାଖ ହାରିକେନେର ଆଲୋ କମିଯେ ଦେଖ୍ୟା ହେବେଛେ । ପାଶେ-ଶୋଯା ମାଯେର ଶରୀର ଥେକେ କୀ ମିଟି ଗନ୍ଧ ଆସଛେ, ଅନିର ଖୁବ ଇଚ୍ଛେ ହିଲ ମାକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ । ଠିକ ଏମନ ସମୟ ମହିତୋର ହଠାତ୍ ବଲଲେନ, 'ଓ ଆଜ ଏଖାନେ ଶ୍ଵେତ ଥେବେଛେ ଯେ?'

ମାଧୁରୀ ହାସିଲେନ, କିଛୁ ବଲଲେନ ନା ।

'କୀ ବ୍ୟାପାର?' ମହିତୋର ଆବାର ଜିଜାସା କରଲେନ ।

'ବୋଧହୟ ମନ-କେମନ କରଛେ?' ମାଧୁରୀ ବଲଲେନ ।

অনির বুক দুর্মদুর করতে লাগল। এখন যদি মহীতোষ ওকে তুলে দানুর ঘরে পাঠিয়ে দেন, তা হলে—? বাবাকে বিছিরি লোক বলে মনে হতে লাগল অনির। ওর ইচ্ছে হল মাকে আঁকড়ে ধরে।

‘যুমিয়েছে?’ মহীতোষের চাপা গলা শুনতে পেল অনি। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ বক্ষ করে ফেলল। মড়ার মতো পড়ে থাকল অনি। ও অনুভব করল বুকের ওপর মায়ের একটা হাত এসে পড়ল। তারপর হাতটা ক্রমশ ওর চিবুক, গলা, চোখের ওপর দিয়ে আলতো করে বুলিয়ে গেল। মা বললেন, ‘হ্যাঁ।’

‘বড়দি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে?’ মহীতোষ বললেন।

‘হ্যাঁ, এতদিনের অভ্যেস। বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে। অনি না গেলে কী আর হত। পরে গেলেও পারত।’ একটু বিষণ্ণ গলা মাধুরীর।

‘না, এখনই যাক। জলপাইগুড়িতে ভালো খুল আছে, নিচু ক্লাস থেকে ভরতি হলে ভিত্তটা ভালো হবে। আমি ভাবছি, অনি হবার সময় বড়দিই তো সব করেছিল, এবার কী হবে!’ একটু চিন্তিত গলা মহীতোষের, ‘তুমি কি বড়দিকে বলেছ?’

‘দেরি আছে তো। এই শোনো, তোমার ছোট ভাই-এর বোধহয় কিছু গোলমাল হচ্ছে।’ মাধুরী বেশ মজা-করে বললেন।

‘কী হল আবার?’ একটু নিশ্চৃং গলা মহীতোষের।

‘তুমি বাবাকে বলবে না তো?’

‘ব্যাপারটা কী?’

‘বড়দি আজ খুব রেগে গিয়েছিল। ঝাড়িকে জিঞ্জাসা করেছিল বড়দি। প্রিয় নদীর ঘাটে যায়নি জল বক্ষ হবার পর। অথচ ও অঙ্ককারে জগলে ছিল। ঝাড়ি বলেছে, ওর সঙ্গে একটা শাঢ়ি-পরা যেয়ে ছিল। বোঝো।’

‘শাঢ়ি-পরা যেয়ে? কী যা-তা বলছ!?’ মহীতোষ প্রায় উঠে বসলেন।

‘আঃ, আস্তে কথা বলো। শুদ্ধামবাবুর যেয়ে তপু।’

‘ও কুচবিহারে চলে যায়নি?’

‘না।’

‘এইভাবে ছেলেদের মাথা ধাবে নাকি?’

‘তা তোমার ভাইটি যদি মাথা বাড়িয়ে দেয়, ওর দোষ কী?’

‘বাবা শুনলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন ওকে।’

‘তুমি কিছু বোলো না। যার যা ইচ্ছে করুক, আমাদের কী দরকার? শুদ্ধামবাবু শুনেছি যেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছে, হলে ভালো।’

‘তুমি তো বলে খালাস, বাবা চলে গেল প্রিয় এখানেই থাকবে, তখন সামলাবে কে? আমার এসব ভালো লাগে না। আসলে যেয়েটাই খারাপ, মালবাবু বলছিল কুচবিহারে ও নাকি কী গোলমাল করেছে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে। মালবাবুর বড় শালী কুচবিহারে থাকে-তা সে-ই বলেছে। আমি প্রিয়কে বলব সাবধান হতে।’

‘না, তুমি কিছু বলবে না। যা করার বড়দিই করবে।’

কিছুক্ষণ অনি আর কিছু শুনতে পেল ‘না।’ ও তপুপিসির মুখটা মনে করল। খুব সুন্দর দেখতে তপুপিসি, গায়ের রঙ কী ফরসা! আজ নদীর ধারে আকদণ্ডগাছের পাশে তা হলে তপুপিসিই ছিল? ও বুরতে পারছিল কাকু আর তপুপিসি নিচ্ছয়ই খারাপ কিছু করছে, যেটা মহীতোষ পছন্দ করছেন না, দানু শুনলে রেগে যাবেন। কী সেটা? কাকুকে ভালো লাগে না ওর। টানতে টানতে ওর কান কাকু লয়া করে দিয়েছে। বাঁ কানটা। আয়নায় ছোট-বড় দেখায় দুটো।

‘আমি তা হলে ঘুমোলাম।’ মহীতোষের গলা পেল অনি।

‘হ্যাঁ।’ বলে মাধুরী অনির দিকে ফিরে শুলেন। ওয়ে এক হাতে অনির গলা জড়িয়ে ধরলেন। একটু বাদেই মহীতোষের নাম ডাকতে শরু করল। অনির গলার কাছে মায়ের হাতের বালার মুখটা একটু চেপে বেসেছিল। ধার আছে মুখটায়। ওর চিনচিন করেছিল গলার কাছটা। কিন্তু তবু সিটিয়ে শুয়ে থাকল অনি। চোখ বক্ষ করে ও মাথার ওপর টিমের ছাদে পড়া বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে মায়ের শরীর

থেকে আসা মা-মা গন্ধটার মধ্যে সাতার কাটতে লাগল চোরের মতো। গলার ব্যথাটা কখন হারিয়ে গেল একসময় টের পেল না অনি।

পাতাবাহার গাছগুলো সার দিয়ে রাস্তার দুপাশে লাগানো, রাস্তাটা ওদের বৃত্তি থেকে সোজা উঠে এসে আসাম রোডে পড়েছে। অনি দেখল বাসী আর বিশ বইপত্র-হাতে ওর জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের স্কুলে কোনো ইউনিফর্ম নেই। তবু মহীতোষ ওর জন্য সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট করে দিয়েছেন, অনি তা-ই পরে স্কুলে যায়। ওর স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরা যে যেমন খুশি পরে আসে। জুতো পরার চল ওদের মধ্যে নেই, অন্তত স্কুলে জুতো পরে কেউ আসে না। অনি চাটি পরে যায়। মা আর পিসিমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। সরিষ্ঠেশ্বর আর মহীতোষ অফিসে চলে গেছেন সকালে। একটু বাদেই জলখাবার থেকে আসার সময়। সরিষ্ঠেশ্বর আসেন না, বকু সর্দার এসে ওর খাবার নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরবার আগে পিসিমা ঠাকুরঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করিয়েছেন। তারপর পুজোর বেলপাতা ওর বুকপকেটে ভালো করে রেখে দিয়েছেন। অনি আজ জীবনের প্রথম পরীক্ষা দেবে। সকালে কাকু পরীক্ষার কথা শুনে বলেছে, ‘যত বুজুর্গকি ত্বানী মাস্টারের।’

আজ সকাল থেকেই কেমন পরিষ্কার সোনালি রোদ উঠেছে। গাছের পাতা এমনকি ঘাসগুলো অবধি নতুন নতুন দেখাচ্ছে। ওরা আসাম রোড দিয়ে হাঁটতে লাগল। পি. ড্রু. ডি.-র পিচের রাস্তার দুধারে লশা লশা গাছ, যার ডালগুলো এখনও ডেজা, মাথার ওপর বেঁকে আছে। দুপুরবেলায় ছায়ায় ভরে থাকে এই রাস্তা। বাঁদরলাঠি ফণ এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে।

চা-বাগানের সীমানা ছাড়ালেই হাট। দুপাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাঝে-মাঝে চালাঘর করা। বাঁদিকে মাছমাংসের হাট, চালও বসে, ডানদিকে ঘোরকাটার মাঠ। আজ অবশ্য সব ফাঁকা। রিবিবার সকাল থেকে শিঙগিজি করতে থাকে লোক। বানারহাট ধূপগুড়ি থেকে হাট-বাস বোাই ব্যাপারিবা এসে হাজির হয় বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে। একটু বেলায় আসে খন্দেরো। তখন চোঙায় করে কলের গান বাজায় অনেকে। কী জমজমাট লাগে চারধার। ফাঁকা হাট দুপাশে রেখে ওরা হেট্ট পুলের ওপর এল। দুপাশে রেলিং দেওয়া, নিচে প্রচণ্ড শব্দ করে আঙুরভাসা নদী বয়ে যাচ্ছে ফ্যাট্টিরির দিকে। পুলের ওপর দাঁড়িয়েই লকগেটা দেখতে পাওয়া যায়। ওপাশে পুরুরের মতো থইথই জল দাঁড়িয়ে। গেটের তলা দিয়ে অজস্র ফেনা তুলে ছিটকে বেরিয়ে আসছে এখারের ধারা। বিশ বলল, ‘একদিন ম্বান করার সময় এখানে এসে নামব আর আমাদের ঢাটে গিয়ে উঠব।’

বাপী বলল, ‘যাঃ, মরে যাবি একদম-কী স্নোত।’

বিশ কিছু বলল না, কিন্তু অনি ওর মুখ দেখে বুঝল বিশ নিচ্যাই এইরকম একদিন করবে। যা ডানপিটে ছেলে ও! তালগাছে উঠে বাবুইপাখির বাচা ধরতে চেয়েছিল একদিন। মা ভীষণ রাগ করবে বলে অনি কোনোরকমে ওকে বারণ করেছে। আজ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনির চট করে হয়িশের কথা মনে পড়ে গেল। গায়ের মধ্যে শিরশিরি করে উঠল অনির।

পলু ছাড়ালেই ভরত হাজামের দোকান। ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া, নিচে একটা টুল পাতা। ভরত খন্দেরকে টুলে বসিয়ে চুল ছাঁটে। ওদের বাড়িতে মাসে দুবার যায় ভরত। দাদু দুবারই টুল ছাঁটান। কাঁঠালতলায় পিঁড়ি পেতে এক এক করে বসতে হয় ওদের। একটা কাপড় আছে ভরতের যার রঙ কোনোকালে হ্যাতো সাদা ছিল, দাদু বলেন ওটাতে ছারপোকা আর উকুল গিজগিজ করছে। খালিগায়ে বসে ওরা। মহীতোষ বলেন, ব্যাটা বাটিছাঁট ছাড়া আর কিছু জানে না। বুড়ো ভরত অনিকে চুল ছাঁটার সময় মজার-মজার গল্প বলে। সবসময় মাথা নিচে করে বসে থাকতে পারে না। নড়লেই টাটি মারে ভরত। সঙ্গে সঙ্গে ছাড়াও কাটে, ‘নাচ বৃড়িয়া নাচ, কাকে পর নাচ।’ হেসে ফেলে অনি। ছেলেবেলায় ছেটকাকাকেও টুল কেটে দিত ভরত। এখন তেমাথার মোড়ে যে নতুন ‘মডার্ন আর্ট সেলন’ হয়েছে, ছেটকাকা সেখানে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে আগোন। কিন্তু চোখে কম দেখলেও সরিষ্ঠেশ্বরের ভরতকে ছাড়া চলে না। ছেট ঠাকুরার বিয়ের সময় নাকি ভরত হাজাম ছিল।

এখন সেলনটা ফাঁকা। ভরতের তিনপায়া কুকুরটা টুলের ওপর উঠে বসে আছে। দোকানে ভরত নেই। আর একটু এগোলেই ছেট ছেট কয়েকটা টেশনারি দোকান, বিলাসের মিষ্টির দোকানে বিরাট কড়াই-এ দুধ ফুটছে। এর পরেই রাস্তাটা গুলতির বাঁটোর মতো দুভাগ হয়ে গিয়েছে। ঠিক মধ্যেখানে একটা বিরাট পাথরে সম্পত্তি লেখা হয়েছে গোহাটি, নিচে বাঁদিকে একটা তীর, ডানদিকে লেখা নাখুয়া। বাঁদিকের রাস্তাটায় আর একটু গেলে জমাজমাট তিনমাথার মোড়। কতরকমের দোকানপাট,

রেস্টুরেন্ট, পেট্রল পাম্প, সবসময় লোক গিজগিজ করছে। ডানদিকের রাস্তাটা ধরে এগোলেই বড় বড় কাঠোর গোলা ঢোকে পড়ে। কাছেই একটা স-মিলে কাজ হচ্ছে। করাত-টানার শব্দ হচ্ছে একটানা। ফরেন্ট অফিস এদিকটাতেই। রেঞ্জার সাহেবের অফিসের সামনে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকে মিশনারিদের একটা বাগানওয়ালা বাড়ি। ওখানে মদেসিয়া ছেলেমেয়েদের অক্ষর-পরিচয় হয়। রাস্তা বাঁক নিতেই ছেট মাঠ আর মাঠের গায়ে ওদের ঝুল।

ত্বরণী মাস্টার ঝুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। একথরের ঝুল। বারান্দায় মাঝে-মাঝে ক্লাস নেন উনি। ওদের নতুন-আসা দিদিমণি ভেতরের ঘরে ক্লাস ওয়ানদের পড়ান, ঘরের আর-এক পাশে বাঁ বারান্দায় ক্লাস টু-কে পড়ান ত্বরণী মাস্টার। নতুন দিদিমণি পি. ডুর. ডি. অফিসের বড়বাবুর বোন। কদিন আগে ত্বরণী মাস্টারের অস্থিরে সময় হতে উনি এসে ঝুল দেখাশুনা করছেন। ভীষণ গঁজি।

বর্গছেড়ার তালেবর মানুষজন সম্প্রতি নতুন একটা ঝুলবাড়ি তৈরি করছেন হিন্দুপাড়ার মাঠে। বেশ বড়সড় ঝুল। এই কদিন ওদের এই একচালাতেই ক্লাস হচ্ছে। মাইমেপত্র কোনো ছাত্রকে দিতে হয় না। ক্লাব থেকে চাঁদা তুলে ত্বরণী মাস্টারের মাইনে দেওয়া হয়। নতুন দিদিমণি এখনও মাইনে নেন না।

আসলে এই ঘরটা বারোয়ারি পুজোর জন্যে বাবানো হয়েছিল। দরজাটা তাই বেশ বড়। দুর্গাপুজোর খ্যাতি আছে বর্গছেড়ার। পুজোর একগুচ্ছ আগে থেকে ঝুল বৰ্ক হয়ে যায়। বুড়ো হারান ঘোষ তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে এসে যান ঠাকুর গড়তে। সেই থেকে উৎসব লেগে যায় বর্গছেড়ায়। ত্বরণী মাস্টার তখন চলে যান দেশে। বাংলাদেশে। মাঝে-মাঝে ত্বর কথা বুঝতে পারে না অনি। কথা না শুনলে চুল ধরে মাথা নামিয়ে পিঠের ওপর শব্দ করে যখন কিল মারেন ত্বরণী মাস্টার তখন বিড়বিড় করে নিজের ভাষায় কী বলেন কিছুতেই বুঝতে পারে না অনি। তবে অনি কোনোদিন মারটার খায়নি। দাদু বলেন উনি যশ্যমনসিংহ না কী জেলার লোক। ভীষণ রাগী লোক।

ত্বরণী মাস্টার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখলেন। তারপর ওরা কাছে যেতে বিশ্঵র দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বেড়াতে যাও বুঝি, বেশ বেশ, তা এবার ভিতরে গিয়ে আমাকে উদ্ধার করো বাবা সব।’ ঘরে চুকে অনির মনে হল আজ সবাই কেমন যেন আলাদা, অনেকের কপালে দই-এর টিপ। ত্বরণী মাস্টার আজ ক্লাস ওয়ান টু-দের পাশাপাশি বসতে বললেন। লঘা লঘা ডেকের সঙ্গে বেঞ্চি। সামনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড এক দুই করে প্রশ্ন লেখা। বাঁদিকে ক্লাস ওয়ানের জন্য, ডানদিকে ক্লাস টু। আজকে ত্বরণী মাস্টারের গলা ভীষণ ভারী এবং রাগী লাগছিল। সবাইকে বলে দিলেন, যে একটা কথা বলবে তাকে ইট মাথায় করে তেমাথা অবধি দৌড়ে ঘুরে আসতে হবে।

এমন সময় নতুন দিদিমণি ঝুলে এলেন। সাদা শাড়ি জামা, নাকের ডগায় তিল থাকায় সবসময় মনে হয় কিছু উড়ে এসে ওখানে বসেছে। দিদিমণি এসে প্রথমে রোলকল করলেন। তারপর ত্বরণী মাস্টারের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কী বললেন। ত্বরণী মাস্টারের মুখটা কেমন মজার-মজার হয়ে গেল। ঘাড় নেড়ে কী যেন বলে ওদের দিকে তাকালেন, ‘এখন তোমরা দিদিমণির কাছে গান করবে। একটার পর পরীক্ষা।’ বলে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন।

গানের কথা শুনে সবাই শুনুন করে উঠল। গোপালাসি বসেছিল অনির পাশে। অনেক বড় গোপালাসি। ঝুলে শাড়ি পরে আসতে পারে না বলে ক্রুক পরে। অনিকে গোপমাসি বলল, ‘গান গাইতে আমার খুব ভালো লাগে। দেবিস গানের পরীক্ষা নেবে। তুই পারবি?’

ঘাড় নাড়ল অনি, ‘না।’

‘এমন কী আর, শুধু জোরে জোরে সুর করে বলবি, সে হয়ে যাবে খন। আমি তো হাটের দিনে গান শুনে শুনে শিখে গিয়েছি।’ কথা বলতে বলতে চুপ করে গেল গোপমাসি। দিদিমণি ওর দিক তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টি। তারপর একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন উনি, ‘আর কদিন বাদেই, তোমরা হয়তো জান, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। জান তো?’

‘হ্যাঁ দিদিমণি।’ পুরো ঘরটা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

‘স্বাধীনতা মানে আমরা আর পরাধীন থাকব না। ইংরেজদের হকুম আমাদের মানতে হবে না। আমরাই আমাদের রাজা।’ দিদিমণি হাত নেড়ে বললেন, ‘এখন সেই দিনটি হল পনেরোই আগস্ট। এই পনেরোই আগস্ট হবে উৎসবের দিন। আমরা ঝুলের সামনে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলব। শহর থেকে একজন গণ্যমান্য লোক আসবেন তোমাদের কিছু বলতে। তখন তোমরা সবাই মিলে

একটা গান গাইবে। আমাদের হাতে সময় আছে মাত্র পাঁচ দিন। এর মধ্যে তোমরা গানটা মুখস্থ করে নেবে। প্রথম আমি গাইছি তোমরা শোনো।' দিদিমণি এবার সবার দিকে তাকিয়ে নিলেন। একসঙ্গে অনেক কথা বলায় ওর নাকের ডগায় তিলের উপর একটু ঘাষ জমতে দেখল অনি। আঁচল দিয়ে সেটা মুছে নিলেন উনি। তারপর একটু কেশে গলা পরিকার করে নিয়ে হাতের বইটা সামনে খুলে ধরে খুব নরম গলায় গাইতে লাগলেন, 'ধন্যধন্য পুঞ্জভারা, আমাদের এই বস্তুরাগ...।'

সমন্ত ঘর চুপচাপ, গান গাইছেন গভীর-দিদিমণি। এত সুন্দর যে উনি গাইতে পারেন অনি তা জানত না। সকলে কেমন মুঝ চোখে তাকিয়ে আছে, এমনকিং গোপামাসিও। এক-একটা লাইন ঘুরেফিরে গাইছেন উনি, কী সুন্দর লাগছে। একসময় অনি গানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর যেই দিদিমণি কেমন করুণ করে গাইলেন-'ও মা তোমার চৰণ দুটি বক্সে আমার ধরি', তখন হঠাত অনির শীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল, ওর হাতের লোমকৃপগুলো কাটা হয়ে উঠল, এই মুহূর্তে মা কাছে থাকলে অনি তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখত।

দিদি তখনও গেয়ে যাচ্ছেন, অনির শীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ফুলের পেছনের রাস্তাটা চলে গেছে খুঁটিমারীর জগলের ভিতর দিয়ে নাথুয়ার দিকে। বেশ চন্দননে রোদ উঠেছে। রাস্তাটা তাই ফাঁকা। সামনের বকুলগাছটায় একটা লেজবোলা পাথি ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকছে। তার লেজের হলদে নীল লস্ব পালকে রোদ পড়ে চকচক করছে। পাশেই একটা লস্ব ইউক্যালিপটাস গাছ। ওরা বলে সাহেবগাছ। সাহেবগাছের একদম ওপরডালে মৌচাক বেঁধেছে মৌমাছিরা। গাছের তলায় গেলেই শব্দ শোনা যায়। ওরা কি ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে? শিশ বলে, মৌচাকের মধ্যে মধু জ্বা আছে। শুলভি দিয়ে একদিন ভাঙ্গে ও মৌচাকটাকে। দিনের বেলা বলে ও পারছে না, চাক ভেঙে দিলে মৌমাছিরা নাকি ছেড়ে দেবে না। ভীষণ হল। অনির কোনো ভাই নেই; গানটায় ভাই-এ ভাই-এ এত সেই বলেছেন দিদিমণি। আচ্ছ ওর ভাই নেই কেন? পিসিমা গল্প করার সময় বলেন, তুই যেমন মায়ের পেটে এসেছিলি-তেমনি একটা ভাই তো মায়ের পেটে আসতে পারে! অনি দেখল রেতিয়া সামনের রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছে ওদের চেয়ে বয়সে বড়, এক নম্বর লাইনের মদেসিয়া ছেলে। ও চোখে দেখতে পায় না। অথচ পা দিয়ে রাস্তা বুরো রোজ বাজারে চলে আসে। বাজারে গিয়ে মতি সিংয়ের চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঁধিয়ে চুপ করে বসে থাকে। মতি সিং ওকে রোজ চা খাওয়ায়। সারা মুখে বসন্তের দাগ, ছেলেটা খোড়াতে খোড়াতে যাচ্ছে। হঠাত অনির খুব দুঃখ হল ওর জন্য। দিদিমণি যে এমন মন-কেমন-করা গান গাইছে বেচারা শুনতে পেল না। অথচ ওর খুব বুদ্ধি। এখন যদি অনি ছুটে ওর কাছে যায়, গিয়ে জিজাসা করে, এই বল তো আমি ওকে, সঙ্গে সঙ্গে রেতিয়া মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাবে, ওর বসন্তের দাগওয়ালা কপালে ভাঁজ পড়বে, দুটো সাদা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তারপর হঠাত সব সহজ হয়ে গিয়ে ওর হলদে ছাতা-লাগা দাঁতগুলো শিউলি ফুলের বৌটার মতো হাসি বিলিক দিয়ে উঠবে, ও মুখ নিচু করে বলবে, 'অনি।'

একসময় গান শেষ হয়ে গেল। এত সুন্দর গান এমন কথা অনি শোনেনি আগে। ও দেখল, ভবানী মাটোর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বোবাই যাচ্ছে উনি গান শুনছিলেন, তাই ওর মুখটা অন্যরকম দেখাচ্ছিল। এরপর দিদিমণি ওদের গানটা শেখাতে আরঞ্জ করারেন। গোপামাসির গলা সবার ওপরে। এমনিতে অনি কোনেদিন সবার সামনে গান গায়নি। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর গলা ঝুলতে লাগল। গানের লাইনগুলোর সব মানে বুবাতে পারছিল না, এই যা।

কেমন ঘোরের মধ্যে সময়টা কেটে গেল। একসময় দিদিমণি থাকলেন। এখন টিফিন। অনি টিফিনের সময় কিছু খায় না। কেউই খায় না। দুটোয়ে ছুটি। বাড়ি ফিরে পিসিমার আলোচালের ভাত সুন্দর নিরামিষ তরকারি দিয়ে একসঙ্গে বসে খায়। এতক্ষণে ওর নজর পড়ল সামনের ঘর ফাঁকা। সবাই বাইরের মাঠে রোদুরে হইহই করছে। স-মিলের করাতের শব্দ এখানে আসছে। একটা কাঠঠোকরা পাথি সামনের সাহেবগাছে বসে একটানা শব্দ করে যাচ্ছে।

অনি দেখল গোপমাসি বাইরে থেকে ফিরে এল। এসে গুরু পাশে বসল, 'কেমন গাইলাম রে'

অনি হাসল। সবাই মিলে একসঙ্গে গান করেছে, অথচ গোপমাসি এমন তাৰ করছে যেন একাই গেয়েছে।

'আমি বড় হলে খুব গাযিকা হব, জানিস, কাননবালা।'

କଥାଟା ବଲେ ଚୋଖ ବନ୍ଧ କରିଲ ଗୋପାମାସି । ଗୋପାମାସି ତୋ ବଡ଼ଇ ହେଁ ଶିଯୋଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଶାଢ଼ି ପରେ ନା-ଏହି ଯା ।

‘ତୁଇ ନାକି ଚଲେ ଯାବି ଏଥାନ ଥେକେ’ ହଠାତ୍ ଗୋପାମାସି ବଲଲ ।

‘ହୁଁ ।

‘ଆର ଆସବି ନା?’

‘ଆସବ ତୋ! ଛୁଟି ହଲେଇ ଆସବ ।’

‘ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରବି ତୋ?’

‘ବାଃ, କେନ କରବ ନା!’

ଘାଡ଼ ନିଚୁ କରେ ଗୋପାମାସି ବଲଲ, ‘ତୋରା ଛେଲେରା କେମନ ଟୁକ୍ଟୁକ କରେ ଚଲେ ଯାମ । ଆମି ଦ୍ୟାଖ ଏହି ଏକ କ୍ଳାସେ ସାରାଜୀବନ ପଡ଼େ ଥାକିଲାମ । ପାଶ କରଲେଓ କୀ ହବେ, ଆମାର ତୋ ପଡ଼ା ହବେ ନା ଆର ।’

‘ନ୍ତରନ କୁଳ ହଛେ, ମେଥାମେ ପଡ଼ବେ ।’ ଅନି ବଲଲ ।

ଟୌଟ ଓଲଟାଲେ ଗୋପାମାସି, ‘ମା ପଡ଼ାତେ ଦେବେ ନା । ହୋଣ୍ଡା ହୋଣ୍ଡା ମାଟୀର ଆସବେ ଯେ ସବ! ଅଥଚ ଦେଖ କ୍ଲାସ ଓହାମେର ପରୀକ୍ଷା ଏକେବାରେ ଆମି ପାଶ କରେ ଗେଛି ।’ ହଠାତ୍ ଓର ଦିକେ କିଛୁକଣ ତାକିମେ ଗୋପାମାସି ବଲଲ, ‘ଦ୍ଵାର୍ଢା, ତୋର ଖାତାଟା ଦେ ଦେବି ।’

କିଛୁ ବୁଝାତେ ନା ପେରେ ଅନି ନତନ ଖାତାଟା ଏଗିଯେ ଦିଲ । ଗୋପାମାସି ବଲଲ, ‘ଆମି ତୋ ଫଳ କରବଇ । ପାଶ କରଲେ ତୋ ମା ବାଡ଼ି ଥେକେ ବେରୁତେ ଦେବେ ନା । ଆମି ତୋର ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତର ଲିଖେ ଦିଛି । । ତୁଇ ଚପ କରେ ବସେ ଥାକ ।’

ଅନିର ଖୁବ ଯଜା ଲାଗଲ । ବୋର୍ଡର ଦିକେ ତାକିମେ ଅଶ୍ରୁଗୁଲେ ଦେଖେ ଗୋପାମାସି ଓ ର ଖାତାଯ ଉତ୍ତର ଲିଖିଛେ । ଏଇବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓ ଜାନେ, କିନ୍ତୁ ମେଥାମେ ଲେଖାର ହାତ ଥେକେ ବେଚେ ଯାଛେ ବଲେ ଓର ସାଇକେଲେ ଆନନ୍ଦ ହଜିଲ । ଗୋପାମାସି ଲିଖିଛେ-ଓ ଜାନାଲା ଦିଯେ ବାଇରେ ତାକାଲ ଆବାର । ଓଭାରସିଯାରାବାରୁ ସାଇକେଲ ଚେପେ ଆସିଲେ ହାତୀ ମୋଦୁରେ ଖୁଟିମାରୀର ଦିକ୍ ଥେକେ । ମାଥାଯ ମୋଲାର ହାଟ । ଖାକି ହାଫପ୍ଲାଟେର ନିଚେ ଇଯା ମୋଟା ମୋଟା ପା । ପାହା ଦୂଟୋ ସିଟେର ପାଶେ ବୁଲେ ପଡ଼େଛେ । ଦୁହାତେ ସାମନେର ହ୍ୟାନ୍ଡେଲେ ଶରୀରେର ଭର ରେଖେ ଚୋଖ ବନ୍ଧ କରେଇ ବୁଝି ଚାଲାଇଛେ । ଚୋଖ ଏତ ଛୋଟ ଆର ମୁଖ୍ଟା ଏତ ଫୋଲା ଯେ ବୋବା ଯାମ ନା ତାକିମେ ଆହେନ ନା ଘୁମୋଛେନ । ହଠାତ୍ ଏକଟା ପ୍ରଚନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ହତେଇ ଚମକେ ଉଠିଲ ଅନି । ଏକଟା ମୋଟା ପା ଆକାଶେ ଭୁଲେ ଅନଟାଯ ନିଜେକେ କୋନୋରକମେ ସାମଲାଇଛେନ ଓଭାରସିଯାରାବାରୁ ମାଟିତେ ଭର ଦିଯେ । ପେଛନେର ଚାକା ଚପସେ ଗେହେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଇହି ଶବ୍ଦ ଉଠିଲ । ମାଟେ ଯାରା ଖେଳଛିଲ ତାମ୍ବା ବ୍ୟାପାରଟା ଦେଖେଛେ । ଭବାନୀ ମାଟୀର ଗଲା ଶୋନ ଗେଲ, ଅବୋଧ୍ୟ ଭାଷାଯ ଗାଲାଗାଲ ଦିଲେଛନ ବୋଧହୟ, ସବାଇ ହଡ଼ମୁଡ଼ କରେ ଘରେ ଫିରେ ଏଲ । ବିଶ୍ଵ ଛଢା କାଟିଛିଲ, ‘ଓଭାରାବାବୁର ଚାକା, ଚଲତେ ଗେଲେଇ ବୈକା ।’

ଚୋରେର ଯତନ ଖାତାଟା ଦିଯେ ଦିଲ ଗୋପାମାସି, ‘ନେ, ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା ପାରଲାମ ନା । ଯା ଶକ୍ତ! ଏତେହି ପାଶ କରେ ଯାବି ।’

ଖାତାଟା ଖୁଲେ ଦେଖିଲ ଅନି । ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହାତେର ଲେଖା ଗୋପାମାସିର । ଖାତାର ଓପରେ ଓ ନାମ ଲିଖେ ଦିଯାଇଛେ ।

ପରୀକ୍ଷା ଆରଣ୍ୟ ହେଁ ଗେଲ । ଗୋପାମାସି କୀ ସବ ଲିଖିଛେ ନିଜେର ଖାତାଯ । ଲେ-ବ ଭଞ୍ଜିତେ ଅନି ବୁଝିଲ, ମନ ନେଇ । ଭବାନୀ ମାଟୀର ଏକଟା ଲ୍ବା ବେତ ହାତେ ନିଯେ ମାଥାଖାନେ ବସେ । ସବାଇ ମୁଖ ନିଚୁ କରେ ଲିଖିଛେ । ଭବାନୀ ମାଟୀର ଅନିକେ ଦେଖିଲେନ, ‘କୀ ଅନିମେସ, ଲିଖ ଲିଖ ।’

ପାଶ ଥେକେ ଗୋପାମାସିର ଚାପା ଗଲା ଶୁନିଲେ ପେଲ ଅନି, ‘ଆରେ ବୋକା, ଛବି ଆକ ନା ପେହନ ପାତାଯ । ଚପ କରେ ବସେ ଥାକିଲେ ଧରା ପଡ଼େ ଯାବି ନା!’

ଏତକ୍ଷଣେ ଅନିର ଭୟ-ଭୟ କରିଲେ ଲାଗଲ । ଓ ବୁଝାତେ ପାରିଲ ବ୍ୟାପାରଟା ଅନ୍ୟାଯ ହେଁ ଶିଯାଇଛେ । ଆସ୍ତେ-ଆସ୍ତେ ଖାତାଟା ଖୁଲେ ଓ ପେଛନେର ପାତାଯ ଚଲେ ଏଲ । ତାରପର ମାଥା ଖୁକିଯେ ପେଲିଲ ଏକଟା ଗୋଲ ଦାଗ ଆକଲ । ତାର ମଧ୍ୟେ ଆର ଦୂଟୋ ଗୋଲ, ଗୋଲେର ମଧ୍ୟେ ଗୋଲ । ତାରପର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼େ ଯାଓଯାଇଲେ ଗୋପାମାସି ଯେ-ଉତ୍ତରଟା ଶକ୍ତ ବେଳିଲି ମେଟୋ ଚଟ କରେ ଲିଖେ ଫେଲିଲ ।

ଏକମୟ ସମୟଟା ଶେଷ ହେଁ ଗେଲ । ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ । ସକଳେ ଏକ ଏକ କରେ ଖାତା ଜମା ଦିଯେ ଗେଲ ।

অনি কাছে দাঁড়াতেই ওর হাত থেকে খাতা নিলেন ভবানী মাস্টার, 'সব উভয় দিয়েছ?'

ঘাড় নাড়তে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনি। ওর কেমন শিরশির করতে লাগল। ভবানী মাস্টারের ভাঙচোরা মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে দাদুর মুখটা ভেসে উঠল। ঘাড় নাড়ল ও, 'না।' 'কোনটা পার নাই?'

হঠাতে অনির ঠোট কাঁপতে লাগল। ভবানী মাস্টার একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘর প্রায় ফাঁকা। সবাই চলে যাচ্ছে। দরজায় বিশু আৰ বাচী দাঁড়িয়ে, শুরা অনির জন্যে অপেক্ষা কৰছে। গোপমাসি নেই। মাটিৰ দিকে মুখ নামাল অনি। ওৱা চিবুক থৰথৰ কৰছিল। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে উঠল শেষ পৰ্যন্ত।

'কী হল-আৱে কাঁদ কেন?' ব্যন্ত হয়ে উঠলেন ভবানী মাস্টার।

'আমি লিখিনি-' কান্না-জড়ানোৰ গলায় বলল অনি।

এক হাতে ওকে জড়িয়ে কাছে আনলেন ভবানী মাস্টার, 'কী লিখ নাই?'

'গোপমাসি নিজে থেকে লিখে দিয়েছে। আমি লিখতে বলিনি।' জোৱে কেঁদে উঠল শ্ৰ।

ডান হাতে খাতাটা খুললেন ভবানী মাস্টার। উভয়গুলো দেখলেন। মুহূৰ্তে ঊঁৰ কপালেৰ রং দুটো নাচতে লাগল। তাৱপৰ অনিৰ দিকে তাকালেন, 'তুমি এগুলান 'দেখছ?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

'বাঃ, ভালো। এখন চোখ ধিক জল যোৱে। গোপটাৰ মাথায় গোৱৰ থাকলে সাহ হত, তাও নাই। ও যা ভুল কৰছে তুমি তা পৰ্য কৰো। বসো।' কথাটা বলে অনিৰ হাত ধৰে সামনে বসিয়ে দিলেন উনি। তাৱপৰ দৱজাৰ দিকে তাকিয়ে বিশুদ্ধেৰ দেৰতে পেয়ে ধমক দিলেন, 'এই তোৱা বাগানে থাকিস না। আয় বস, এই দেখল একটা যোগ একদম বুল। ফুপিয়ে ফুপিয়ে ও সেটা ঠিক কৰল।

শেষ পৰ্যন্ত ভুল ঠিক কৰা হয়ে গোলে ও খাতাটা মাস্টারেৰ হাতে দিল। চটপট দেখে নিলেন উনি। দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাঃ, ফাঁক্স।'

তাৱপৰ অনিৰ দিকে ফিরে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধৰলেন উনি। অনি বুৰাতে পারছিল না ও কী কৰবে। ঊঁৰ শৰীৰ থেকে আসা ঘামেৰ গৰু, নসিৰ গঞ্জে অনিৰ কষ্ট হচ্ছিল। ভবানী মাস্টার ওৱা মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস কৰে বললেন, 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজেৰ কাছে সৎ থাকলে জীবনে কোনো দুঃখই দুঃখ হয় না। তুমি অনেক বড় হৰা একদিন, কিন্তু সৎ থাকবা, আমাকে কথা দাও।'

কথাগুলো শুনতে অনি আবাৰ কেঁদে ফেলল। তাৱপৰ ঐ নসিৰ গৰু, ঘামেৰ গৰু মাথা বুকে মাথা রেখে ও কান্না-জড়ানো গলায় কী বলে ধৰথৰ কৰে কাঁপতে লাগল।

কুলেৰ মাঠে বিকলে ফুটবল খেলো হয়, কিন্তু অনিৰে সেখানে যাওয়া হয় না। ওদেৱ কোয়ার্টাৰ থেকে কুলেৰ ফুটবল মাঠ অনেক দূৰ। তাছাড়া গেলেই যে থেলতে যাবে এমন নয়। একদিন অনিৰা গিয়ে দেখেছিল তাদেৱ বয়সি কেউ খেলছে না। হাফপ্যাণ্ট বা ধূতি গুটিয়ে পৱে বড় বড় মানুষ হইহই কৰে ফুটবল খেলছে ওখানে। তাদেৱ বিশাল বিশাল লোমশ পা দেখে ওৱা ভয়ে ফিরে এসেছিল। বাগানেৰ কোয়ার্টাৰেৰ সামনে অচেল খোলা জমি। মাঝে-মাঝে উচুনিচু অবশ্য, তাছাড়া দুটো কাঠালটাৰাপার গাছ শক্ত হয়ে বসে আছে মধ্যখানে-তাও খেলাটেলা যেত, কিন্তু মুশকিল হল ওদেৱ বয়সি ছেলে এই কোয়ার্টাৰগুলোতে বেশি নেই। অনিৰে বাতাবিলেৰু গাছ থেকে গোলগাল একটা লেৰু নিয়ে ওৱা মাঝে মাঝে খেলে, কিন্তু সেটা ঠিক জমে না।

অনিৰা বাড়িৰ সামনেৰ মাঠে গোল হয়ে বসে ধনধান্য পুশ্পভোঁড়া গাইছিল। মোটামুটি কথাগুলো এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। গান কৰে গাইলে যে-কোনো কবিতা চট কৰে মুখস্থ হয়ে যায়। হঠাতে ওৱা শুনলো গো গো কৰে শব্দ ঠুঁচে সামনেৰ রাস্তায়। সাধাৰণত যেসব লৱি বা বাস এই রাস্তায় বোজ চলাচল কৰে এ শব্দ তাৱ থেকে আলাদা। কি গঁথীৱ, যেন সমস্ত পৃথিবী কঁপিয়ে শব্দটা গড়াতে গড়াতে আসছে। খালিকবাটাই ওৱা দেখতে পেল ত্ৰিপলে মোড়া ভাৱী ভাৱী মিলিটাৰি ট্ৰাক একেৰে পৱ এক ছুটে আসছে। মুখ-থ্যাবড়া গাড়িগুলো দেখতে বীভৎস, অনেকটা খেপে-যাওয়া বুলডগেৰ যতো। প্ৰতোকটি গাড়িৰ নাকেৰ ডগায় সৰু লোহাৰ শিক লিকলিক কৰছে। ট্ৰাকগুলো থেকে বেখাপামতো কিছু বাইৱে বেইয়ে আছে, তবে সেগুলোৰ ওপৰ ভালো কৰে ত্ৰিপল ঢাকা। তাৱ পৱই ওৱা দেখতে লাইভৱতি কালো কালো বিকট চেহারার মিলিটাৰি দল। ট্ৰাকে বসে হইহই কৰে চিৎকাৰ কৰছে।

এই ধরনের চেহারার মানুষ ওরা কখনো দেখেনি। এত দূর থেকেও ওদের সাদা দাঁত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ বিশ্ব ‘ওরে বাবা গো’ বলে চোচো দোড় দিল নিজের বাড়ির দিকে। ওর দেখাদেখি বাপীও ছুটল। মিলিটারি ট্রাক দেখলে কেউ বাড়ির বাইরে যাবে না—এরকম একটা আদেশ ছাটদের জন্যে দেওয়া আছে। কিন্তু কী করে অনিয়া বুবাবে কখন ওরা আসবে! দোড়তে গিয়ে নি টের পেল ওর দুটো পা যেন জমে গেছে। পা-বিনিয়ন শুরু হয়ে পেল হঠাৎ। গলার কাছটায়, টেনসিলের ব্যাখ্যাটাই বোধহয়, কেমন করে উঠল ঘূর্ণত গাড়িগুলো দেখতে দেখতে ও নিজের অজানে ধনধান্য পুঞ্জেরা ফিসফিস করে গাইতে লাগল। আর গাইতে গাইতে ওর শরীরের শিরশিরানিটার কমে যাওয়া টের পেল। অনিয় অবাক হয়ে দেখল একটা গাড়ি ঠিক ওদের বাড়ির সামনে ব্রেক করে থেমে গেছে। গাড়িটা থামতেই একটা লোক লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল। এত লম্বা লোক অনি কোনোদিন দেখেনি, দূনবর লাইনের ভেতুয়া সর্দারের চেয়েও লম্বা। আর তেমনি মোট। এনিক ওদিকে মুখ দুরিয়ে জ্যায়গাটা দেখে নিল লোকটা, তারপর অনিকে লক করে হনহন করে এগিয়ে আসতে লাগল। অনি দেখল লোকটার হাতে দোল খাচ্ছে হাঁটার তালে। ভয়ে সিটকে গিয়ে অনি প্রায় কান্নার সুরে ধন্যধান্য পুঞ্জেরা বিড়বিড় করে যেতে লাগল বারংবার।

‘ওয়াতার, ওয়াতার; পানি!'

অনি চোখ খুলে দেখল সামনে একটা ওয়াটার বটল খুলছে আর তার পেছনে পাহাড়ের মতো উচ্চ একটা লোক যার গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। লোকটা হাসছে, কী সাদা দাঁতগুলো। লোকটা খুকে দাঁড়িয়ে আবার বলল, ‘ওয়াতার, পিঙ্গি !’ জল চাইছে লোকটা, অনি পা দুটোয় কুমশ সাড় ফিরে পেল। ও তাকিয়ে দেখল পেছনের সব কোয়ার্টারের জানালা-দরজা বক্স হয়ে গেছে। শুধু ওদের বাড়ির জানালায় অনেকগুলো মুখ কী ভীষণ ভয় নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এগিয়ে—দেওয়া ওয়াটার বটলটা হাতে নিয়ে অনি নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ও টের পেল এখন আর একদম ভয় করছে না, বুকের মধ্যে একটুও শিরশিরানি নেই। বরং নিজেকে খুব কাজের বলে মনে হচ্ছে, বেশ বড় বড় লাগছে নিজেকে।

বারান্দায় উঠতেই দরজা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হাত অনিকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে ঢেনে নিল। সবাই মিলে বলতে লাগল, ‘কী ছেলে রে বাবা, একটুও ভয় নেই, যদি ধরে নিয়ে যেত, আসুক আজ বাবা, হবে তোমার’ ইত্যাদি। বেঁকেছুরে নিজেকে ছাড়িয়ে অনি বাড়িকাকুর দিকে ওয়াটার বটলটা এগিয়ে দিয়ে গঞ্জির মুখে বলল, ‘জল নিয়ে এস শিগ্নির, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।’

অনির গলায় স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে, মাধুরী অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। অনি যে এই গলায় কথা বলতে পারে মাধুরীর জানা ছিল না। ওয়াটার বটলটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন উনি।

পিসিমা বললেন, ‘হ্যারে, তোকে কী বলল রে?’

অনি বলল, ‘কী আর বলবে, জল চাইল !’

পিসিমা আবার বললেন, ‘তোকে কি তয় দেখাল ?’

বিরজ হয়ে অনি বলল, ‘তয় দেখাবে কেন? জল চাইতে হলে কি তুমি ভত দেখাও?’

এমন সময় মাধুরী ওয়াটার বটলটা নিয়ে ফিরে এলেন। কঁকলে মোড়া বটলটা এখন বেশ ভারী। মাধুরী জলের সঙ্গে একটা প্রেটে বেশকিছু বাতাসা দিলেন। বাতাসাটা নিয়ে অনি মায়ের দিকে তাকাতে মাধুরী হাসলেন, ‘শুধু জল দিতে নেই রে, যা !’ এক হাতে জল অন্য হাতে বাতাসা নিয়ে অনি গটগট করে বাইরে বেরিয়ে এল। এইজন্যে মাঝে ওর এত ভালো লাগে।

মাঠের মধ্যে গাছের মতো লোকটা একা দাঁড়িয়ে ছিল। অনিকে আসতে দেখে একগল হাসল। হাসি দেখে অনির সাহস আরও বেড়ে গেল। কাছাকাছি হতে লোকটা হাত বাড়িয়ে ওয়াটার বটলটা নিয়ে বলল, ‘থ্যাক্স !’ কথাটা অনি ঠিক বুল না, কিন্তু ভঙ্গিতে বেশ মজা লাগল। ও বাতাসার প্রেটটা এগিয়ে ধরতে লোকটা চোখ কুঁচকে সেটাকে দেখে বলল, ‘হোয়াতিজ দ্যাট ?’ মানেটা ধরতে না পারলেও অনি বুঝতে পারল লোকটা কী বলতে চাইছে। এখনও ওদের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দ শেখান, কিন্তু বাতাসার ইংরেজি কোনোদিন শব্দে

বলে মনে করতে পারল না। বৱং বাতাসা থেকে মিষ্টি, আৰ মিষ্টিৰ ইংৰেজি সুইট-এটা বলে দিলেই তো হয়! শব্দটা শুনে লোকটা ঠোঁট দুটো গোল করে অবাক হবাৰ ভান করে বলল, ‘মো গড় ইংলিশ়! আই টু। ওকে, ওকে।’ বলে এক থাবায় বাতাসাগুলো নিয়ে মুখে পুৱে চিবোতে লাগল। স্বাদ জিতে যেতে লোকটাৰ মাথা দুলতে লাগল চিবোনোৰ তালে তালে। তাৰপৰ ঢকচক করে কয়েকটা ঢোক জল খেয়ে নিতোই পেছন থেকে ট্ৰাকেৰ লোকগুলো হইহই করে ডাকতে শুণু কৰল। অনি দেখল পেছনেৰ লোকগুলোকে ইংৰেজি নয়, অন্য কোনো ভাষায় জবাৰ দিয়ে একহাতে অনিকে শুন্যে তুলে নিয়ে ট্ৰাকেৰ দিকে হাঁটতে লাগল। লোকটাৰ গায়েৰ ঘেমো বেটিকা গৰু আৰ ট্ৰাকেৰ একদল নিয়োৱ হইহই, পেছনেৰ বাৰান্দায় বেৰিয়ে আসাৰ পিসিমাৰ আৰ্তিচকৰাৰে অনিৰ শৱীৰ ধৰথৰ কৰে কেঁপে উঠল, ওৱ হাত থেকে প্ৰেটটা টুপ কৰে পড়ে গেল। ওৱ মনে হল ও ছেলেধৰাৰ কৰলে পড়েছে, এখন এ ট্ৰাকে চাপিয়ে পৃথিবীৰ কোনো দূৰাত্মে ওকে নিয়ে যাবে ওৱা। বাবা মা দাদু কাউকে কোনোদিন দেখতে পাৰে না ও। প্ৰচণ্ড আকেশে লোকটাৰ চোখদুটা দুই আঙুল টিপে অৰু কৰে দিতে গিয়ে অনি শুন্য ওকে মাথায় তুলে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা অস্তুত ভাষায় ভীষণ চেনা সুৱে গান গাইছে। গাইবাৰ ধৰন দেখে বোৱা যায়, খুব মগ্ন হয়ে গাইছে ও। ওৱ ভাষা বোৱা অসম্ভব, কিন্তু সুন শুনে অনিৰ মনে হল পুজো কৰাৰ সময় পিসিমা এইৰকম সুৱে শুণগুন কৰেন। অনিৰ হাত লোকটাৰ স্পিং-এৰ মতো চুলৰ ওপৰ এসে থেমে গেল। ট্ৰাকেৰ কাছে এসে লোকটা কিছু বলতে ট্ৰাকেৰ ওপৰ দাঁড়ানো লোকগুলো হইহই কৰে উঠে হাত বাড়িয়ে অনিৰ দিকে চার-পঁচাটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। লোকটাৰ কাঁধৰে ওপৰ থাকায় অনি ট্ৰাকেৰ সৰষটই দেখতে পাচ্ছে। একগাদা কহল পাতা, বদুক, কাচেৰ বোতল ছড়ানো। প্যাকেটগুলো ওৱ হাতে শুছিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে লোকটা ওকে মাটিতে নামিয়ে দিল। তাৰপৰ বিৱাট থাবাৰ মধ্যে ওৱ মুখটা ধৰে কেমন গলায় বলল, ‘থাক্কু ইউ মাই সন।’ বলে লাফ দিয়ে ট্ৰাকে উঠে গেল। ওয়াটাৰ বটলটা তখন ট্ৰাকেৰ ভেতত হাতে-হাতে শুৱৰছে।

ট্ৰাকটা চলে যেতে রাস্তাটা ফাঁক হয়ে গেল। বিৱাট আসাম রোড চুপচাপ-শব্দ নেই কোথাও। অনি ওৱ বুকেৰ কাছে ধৰা প্যাকেটগুলোৰ দিকে তাকাল। গৰ্জ এবং ছবিতে বোৱা যাচ্ছে, এগলো বিস্কুট এবং টকিৰ প্যাকেট। ওৱা ওকে এগলো ভালোবেসে দিয়ে গেল। অথচ ও কী ভয় পেয়ে গিয়েছিল! লোকগুলোকে ছেলেধৰা বলে ভেবেছিল। হাঁৎ অনি অনুভব কৰল ওৱ প্যাকেটৰ সামান্যটা কেমন ভেজা-ভেজা। এক হাতে প্যাকেটগুলো সামলে অন্য হাতে জায়গাটা কত ভালো! নিজেৰ বাড়িৰ দিকে তাকিয়ে ও দেখল পিসিমা মাঠৰ মাঝে দাঁড়িয়ে, পাশে ঝাড়িকাকু, অনেক পেছনে মা। হাঁৎ ওৱ পিসিমাৰ ওপৰ রাগ হল, পিসিমাই শুধুমুখ মিলিটাৰিদেৱ ছেলেধৰা বলে ভয় দেখায়। অনি আৱ দাঁড়াল না। একছুটে মাঠটা পেৱিয়ে পিসিমাৰ বাড়ানো হাতেৰ ফাঁক গলে মায়েৰ শৱীৰ জড়িয়ে ধৰল।

মাধুৰী বললেন, ‘কী হয়েছে?’

মাকে জড়িয়ে ধৰতে মুঠো আলগা হওয়ায় অনিৰ হাত থেকে প্যাকেটগুলো টুপ্টুপ কৰে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় মায়েৰ বুকে মুখ গুঁজে অনি বলল, ‘লোকটা খুব ভালো, কিন্তু মা, কিন্তু বোকাৰ মতো হিসি কৰে ফেলেছি।’ ভৱত হাজাম সৱিষণশেখৰেৰ চুল কাটছিল। কাঁঠালতলালৰ রোদুৱে কাঠোৰ পিড়ি পেতে উনি বসেছিলেন। চুল-কাটাৰ সব সৱজাম বাড়িতে রেখেছেন উনি। বাবো ভূতেৰ চুল-কাটা কাটি ক্ষুৰে ঊৰ বড় ফেনা, কাৰ কী রোগ আছে বলা যায় না। ভৱত তাই খালি হাতে এবাড়িতে আসে। এমনকি কাটা চুল থেকে গৌ-বাঁচানোৰ জন্যে ত্ৰিশ বছৰেৰ পুৱনো লং কুখ যেটা এই মুহূৰ্তে সৱিষণশেখৰ জড়িয়ে বসে আছেন সেটাও আনতে হয় না।

কিচকিচ শব্দ কৰে উঠছিল ভৱতেৰ দুই আঙুলৰ চাপে। বেশিকষণ মাথা নিচু কৰতে পাৰেন না বাবু, তাই মাঝে-মাঝে হাত সৱিয়ে নিছিল ভৱত। আজ ত্ৰিশ বছৰে এই বাড়িৰ চুল কাটছে ও, অনেককেই জ্বালাতে দেখেছে, মৰতেও। বিয়ে দিয়ে এনেছে কয়েকজনকে। কিন্তু এখন আৱ তেমন জোৱ নেই ওৱ। কেমন যে ও পুৱনো হয়ে যাচ্ছে বুৱাতে পাৱে না। এই বাড়িৰ সেজোবাৰু ওৱ কাছে চুল কাটে না। একদিন বলতেই হেসে উঠেছিল, কেন বাবা, আমাকে আৱ দয়া নাই-বা কৰলে, তোমাৰ বাটিছাঁট নেবাৰ পাটি এ-বাড়িতে অনেক আছে। বাবা টু অনি। অল ফাউন্ড দুটাকা! মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভৱতেৰ হ্যা, দুটাকায় ও সবাইয়েৰ এমনকি ঝাড়িৰ চুলটাও কেটে দেয়। প্ৰথম ছিল আট আনা, বছৰ পাঁচেক আগে বেড়ে গিয়ে দুটাকা হল।

সৱিষণশেখৰ মাথা তুলতেই হাত সৱিয়ে নিল ভৱত হাজাম, ‘তোৱ কাছে এই শেষ চুল কাটা, না?’

ভরত কোনো উত্তর দিল না। বাবুর চাকরি, শেষ, এই বাগান থেকে শহরে বাঢ়ি করে বাবু চলে যাচ্ছেন। এই মাথার কালো চুলগুলো চোখের সামনে ফুলের মতো সাদা হয়ে গেল-আজ ত্রিশ বছর ধরে এই মাথার চুল কেটেছে ও, আর কোনোদিন কাটতে পারবে না। লোকমুখে শুনেছে ও, বাবু নাকি এই বাগানে আর কোনোদিন পা দেবেন না। কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। পানসে চোখে জল আসতে লাগল।

হঠাতে সরিষ্পেখর বললেন, ‘ভরত, যাবার সময় এই খুরকাঁচিগুলো নিয়ে যাস। খুব চাইতিস তো এককালে!’

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চিকার করে কেঁদে উঠল ভরত। দুহাতে মুখ গুঁজে ফৌপাতে লাগল বাচ্চা ছেলের মতো।

কান্নার শব্দ শুনে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বান্নাঘরে অনিকে থেতে দিছিলেন মাধুরী, শব্দ শুনে এঁটোহাতে একচুটে বেরিয়ে এল অনি, পিছনে পিছনে মাধুরী। ঝাড়িকাঙু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হাসছে। মহীতোষকে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন মাধুরী। খুরমশাই পিছন ফিরে বসে, সামনে ভরত হাজার মাটিতে বসে কাঁদছে। একটু আগে মান হয়ে গেছে মহীতোষের। এই বাড়িতে লুঙ্গি পরা নিষেধ ছিল এককালে। মহীতোষ নিয়ম ভেঙেছেন। শীতকাল নয় তবু ঠাণ্ডা আছে, তাই লুঙ্গির ওপর প্রোহাতের গেঁজি চাপানো। অনি দেখল পিসিমা দাদুর কাছে এগিয়ে গেলেন। মহীতোষ বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হয়েছে?’ সরিষ্পেখর মুখ খুরিয়ে সবাইকে দেখলেন। অনি দেখল দাদুর মুখ কেমন করে কাঁদছে কেন? চুল কাটার সময় ভরত এমন করে ওর ঘাড় ধরে থাকে যেন অনিরই কান্না পেয়ে যায়। একটু নড়াচড়া করলে মাথায় গাঁটা যাবে। আবার মন ভালো থাকলে গানও শোনায় কঁচি চালাতে চালাতে। একটা গান তো অনিরই মৃৎস্থ হয়ে গেছে-‘বুড়া! কাঁদে বুড়ি নাচে, বুড়া বোলে ভাগো’। মা অবশ্য খুব বারণ করে দিয়েছে গানটা গাইতে। কিন্তু বাবা দাদু বাড়িতে না থাকলে ছোটকাকু গলা ছেড়ে ঠাণ্টা করে গানটা মাঝে-মাঝে গায়।

সরিষ্পেখর গঁথির গলায় বললেন, ‘মহী, আমি যখন এখানে থাকব না তখন যেন ভরতের এ-বাড়িতে আসা বক্ষ না হয়।’

মহীতোষ বললেন, ‘কী আশ্র্য, বক্ষ হবে কেন?’

সরিষ্পেখর বললেন, ‘আর ও তো বুড়ো হয়ে গেছে, যখন চুল কাটা ছেড়ে দেবে তখনও যেন প্রতি মাসে টাকটা দেওয়া হয়।’

মহীতোষ হাসলেন, ‘আচ্ছা।’

পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ও বাবা, এইজন্যে ভরত কাঁদছে?’

সরিষ্পেখর মাথা নাড়লেন, না। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হেঁকে উঠলেন, ‘আয় বাবা ভরত, বাকি চুলটা কেটে দে, আমি সারাদিন বসে থাকতে পারব না।’

বাঁধাছাঁদা শেষ। টুকিটাকি যাবতীয় জিনিসপত্র পিসিমা জড়ে করেছেন। চিরকালের জন্য যেন স্বর্ণেভো ছেড়ে চলে যাওয়া-এই যে মাধুরী মহীতোষের এখনে থাকছেন একথাটা আর মনে নেই। শহরে গিয়ে অস্বিধে হতে পারে বলে শুরো সংসারটা তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন পিসিমা। অনির জামাকপড় বাল্লে তোলা হয়ে গিয়েছে। সময়টা যত গড়িয়ে যাচ্ছে অনির বুকের ভেতর তত কী খারাপ লাগছে! অথচ দাদুর মুখ দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না, এখান থেকে যেতে একটুও খারাপ লাগছে। এই চা-বাগান নাকি দাদু নিজের হাতে তৈরি করেছেন। দাদুর তো বেশি মন-কেমন করা উচিত। বরং দাদু চলে যাচ্ছেন শুনে এত যে লোকজন দেখা করতে আসছে, তাদের সঙ্গে বেশ হেসে হেসে দাদু কথা বলছেন। মাঝে আর একটা দিন। পনেরোই আগাম। তার পরদিনই চলে যেতে হবে এখান থেকে। বাগান থেকে দুটো মরি দেবে মালপত্র নিয়ে যেতে-আজ অবধি অনি শহরে যায়নি কখনো।

অঙ্ককারে অনি চারপাশে চোখ বোলাল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন রাত কাটা? ভোর পাঁচটার সময় বিশ আর বাপী ওদের বাড়ির সামনে আসবে। রাতে শোওয়ার সময় মাধুরী অনির জন্য সাদা শার্ট কালো প্যান্ট ইঞ্জি করিয়ে রেখে দিয়েছেন। পাঁচটা বাজতে আর কত দেরি! অনির মোটেই ঘূম আসছিল না। ওর বুকের ওপর মাধুরীর একটা হাত নেতৃত্বে পড়ে আছে। ওপাশে মহীতোষের নাক ডাকছে। কান খাড়া করে অনি কিছুক্ষণ শুনতে চেষ্টা করল বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে কি না। যাক বাবা, বৃষ্টি

হচ্ছে না। কাল সারাটা দিন যদিও রোদের দিন গেছে, তবু সঙ্কেনাগাদ মেঘ-মেঘ করছিল। হঠাৎ মাধুরীর হাতটা একটু নড়ে উঠতে অনি চমকে উঠল। মাধুরীর শরীর থেকে অস্তুত মিঞ্চি গহ্নিটা বেরহচ্ছে। আর একদিন একটা রাত – মাঝের বুকে মুখি গুঁজে দিতে মাধুরীর ঘূম ভেঙে গেল। জড়ানো গলায় বললেন, ‘আঃ, ঠেসছিস কেন?’ আর সঙ্গে সঙ্গে অনি শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে বাইরে ডাকছে। তড়ক করে উঠে পড়ল ও। মাধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হল?’ অনি বলল, ‘ওরা এসে গেছে’। অনি দেখল, ওর গলা শুনে যথৈতোষের নাক ডাকা থেমে গেল। বাবার ঘূমটা অস্তুত, অনি ঠিক বুঝতে পারে না।

পাটভাঙ্গ জামাপ্যাণ্ট, বুকে কাগজের গাঙ্কীর ছবি পিন দিয়ে এঁটে, হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বীরের মতো পা ফেলে অনি বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল। বাইরের ঘরের জানালা খুলে দেওয়া হয়েছে। দরজাও খোলা। বাইরে এখনও আলো ফোটেনি। অঙ্ককারটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। সেই ফ্যাকাশে অঙ্ককারটা ঘরময় জড়ে রয়েছে। ঘরের একপাশে ইঞ্জিচেয়ারে সরিষ্পেখর চূপাপ বসে আছেন। আনির পায়ের শব্দে উনি শুধু ফিরিয়ে ওকে দেখলেন। দানু এভাবে বসে আছেন কেন? দানু কি কাল রাতে ঘুমোননি? দানুর মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন? হাত বাড়িয়ে সরিষ্পেখর অনিকে ডাকলেন, ‘কোথায় চললেন?’

‘স্কুলে। আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।’ অনি বলল।

‘স্বাধীনতা মানে জান?’ সরিষ্পেখর বললেন।

‘হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা এখন।’ অনি শোনা কথাটা বলল।

‘গুড়। শো অ্যাহেড। এগিয়ে যাও।’ পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন সরিষ্পেখর।

ওকে দেখে বিশ বলল, ‘তাড়াতাড়ি চল, আরঞ্জ হয়ে গেল বলে।’

বাপী বলল, ‘কাল রাতে তোদের রেডিওটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নাঃ?’

অনি বলল, ‘জানি না তো।’

বাপী বলল, ‘কাল বারোটাৰ সময় সবাই রেডিও শুনতে গিয়ে দেখে খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাবা বাড়ি ফিরে বলল।’ অনি ব্যাপারটা জানে না, ও শুনেছিল রাতে রেডিওতে নাকি কিসব বলবে, কিন্তু ওদের রেডিওটাই খারাপ হয়ে গেল, যাঃ!

দেরি হয়ে গেছে বলে ওরা দৌড় শুরু করল। আসাম রোডের দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়ানো পাইন-দেওদার গাছের শরীরে অঙ্ককার ঝুপসি হয়ে বসে আছে। রাস্তাটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুব দিকটায় একটি লালচে আভা এসেছে। ওরা তিনজন পাশাপাশি তিনটে পতাকা সামনে ধরে দৌড়ছিল। হাওয়ায় পতাকা তিনটে পত্তপত্ত করে উঠছে; একটু শীতের ভাব থাকলেও বেশ আরাম লাগছে ছুটতে। অনির ভাবি ভালো লাগছিল। আর আমরা নিজের রাজা নিজে। দৌড়তে দৌড়তে বাপী চিক্কার করল, ‘পনেরোই আগস্ট’, ওরা চিক্কার করে জবাব দিল, ‘স্বাধীনতা দিবস।’ এখন এই রাস্তার চারপাশে কেউ জেগে নেই। নির্জন আসাম রোডের ওপর ছুটে-চলা তিনটে বালকের চিৎকার শব্দে একরাশ পাৰি দুনিকের গাছের মাথায় বসে কলৱ করে জানান দিল। ভারতবর্ষের কোন এক কোণে এই নিয়ন্ত্রণ প্রাপ্তিৰে সাতচল্লিশ সালের পনোরাই আগস্টের এই ভোর-হতে-যাওয়া সময়টায় তিনটে বালক কী বিৱাট দায়িত্ব নিয়ে পতাকা উঁৰে দৌড়তে দৌড়তে গান ধৰল, ওদের একটিমাত্র শেখা গান, ‘ধন্যধন্য পুস্তুরা আমাদের এই বসুকুরা’। দোড়বার তালে অনভ্যস্ত গলার সুর ভেঙেচুরে যাচ্ছে, তবু দুপাশের প্রকৃতি যেন তা অঞ্জলিৰ মতো গুণ করছিল।

স্কুলবাড়িৰ কাছাকাছি এসে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখনও আলো ফোটেনি, কিন্তু কষ্ট করে অঙ্ককার খুঁজতে হয়। ওরা দেখল একটি মৃতি খুব সতর্ক পায়ে রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বিশ বলল, ‘রেতিয়া না রে?’

এই তিনজন তিন পাশে গিয়ে দাঁড়াতে রেতিয়া চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল, মুখটা ছুঁচলো করে অঙ্ককার চোখ দুটো বৰু করে কিছু টেৰ পেতে চেষ্টা কৰল। গলা ভারী করে অনি জিজ্ঞাসা কৰল, ‘কাঁহা যাহাতিস রে?’

চট করে উত্তৰ এল, ‘স্কুল।’ ওরা-মুখ চাওয়াচাওয়ি কৰল, তাৰপৰ আবাৰ দৌড় শুরু কৰল। অনি ঠিক বুঝতে পাৰছিল না রেতিয়াৰ কাছে কী কৰে খবৰ গেল যে আজ স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা মানে

আমি নিজেই নিজের রাজা । রাজার ইংরেজি কিং । বাবারা তাস খেলার সময় কিংকে সাহেব বলে । আমরা আজ থেকে সব সাহেব হয়ে গেলাম । রেতিয়া পর্যন্ত ।

সুলের মাঠটা এই সাতসকালে প্রায় ভরে গেছে । ওদের বাগান থেকে মাত্র ওরা তিনজন কিছু ওপাশের বাজার, হিন্দুপাড়া কলিন পার্ক থেকে ছেলেমেয়ের দল এসে মাঠটা ভরিয়ে দিয়েছে । সুলের সামনে একটা লম্বা বাঁশ পেঁতা হয়েছে যার ডগা থেকে একটা দড়ি নিচে নামানো । পাশে টেবিলের ওপর মোহনদাস করমচাঁদ গাঁকীর ছবি । এই নামটা অনি সবে শিরেছে । এত বড় নাম মনে না থাকলে গাঁকীজি বলা যেতে পারে, নতুন দিদিমণি বলেছেন । ভবনী মাস্টারকে দেখে অবাক হয়ে গেল ও । খোপভাঙ্গা ধূতি-পাঞ্জাবি পরলেও অনেককে ভালো দেখায় না, ভবনী মাস্টারকেও কেমন দেখাচ্ছে । তার ওপর মাথায় সাদা নৌকো-টুপি । সুতাষচন্দ্র বসুর ছবিতে দেখেছে ও । নতুন দিদিমণি গঁতির হয়ে দাঢ়িয়ে আছেন পাশে । টেবিলের ওপাশে দুটো চেয়ার, একটাতে ব্যানার্জি স-মিলের বড় কর্তা, অন্যটাতে মোটামতন একটা লোক নৌকো-টুপি পরে বসে ঘড়ি দেখেছেন মাঝে-মাঝে ।

অনিরা ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল । স্বর্ণচেঁড়ার বেশ বড় বড় কয়েকজন ছেলে যারা সুলে পড়ে না তারা ভিড় যানেজ করছিল । পূর্বদিকটা ক্রমশ উজ্জল হয়ে উঠেছে । ব্যানার্জি স-মিলের বড়কর্তা ভবনী মাস্টারকে ডেকে ফিসফিস করে কী বলতে ভবনী মাস্টার হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন । গোলমাল থেমে যেতেই নতুন দিদিমণি চিংকার করে উঠলেন, ‘বন্দে-এ মারতরম’ । সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশো শিশুর গলায় উঠল, বন্দে-এ মারতরম । তিনবার এই ধ্বনিটা উচ্চারণ করে অনির মলে হল ওদের চারপাশে অস্তুত একটা সুলের দেওয়াল তৈরি হয়ে গেছে । ভবনী মাস্টার চিংকার করে উঠলেন, ‘তোমরা জান, আজ ইংরেজদের দাসত্বামোচন করে আমরা স্বাধীন হয়েছি । দুশো বছর পরাধীনতার পরে আমাদের সুন্দরীয়াম, বাধা যতীন, দেশবন্ধু চিংড়জন, গাঁকীজির জন্যে আজ এই দেশে স্বাধীনতা এসেছে ।’ নতুন দিদিমণি ফিসফিস করে কিছু বলতেই ভবনী মাস্টার বললেন, হ্যা, এইসঙ্গে সুভাষ বোসের নাম ভুলে গেলে চলবে না । স্বাধীনতা এই পৃণ্যদিনে আমরা সমবেত হয়েছি । তোমরা যা এখনও নাবালক তারা শোনো, এই দেশটাকে ছিঁড়ে শুধে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে ইংরেজরা । এই দেশটাকে নিজের মায়ের মতো ভেবে নিয়ে তোমাদের নতুন করে গড়তে হবে । বলো সবাই বন্দে মারতরম ।’ অনিরা গলা ফাটিয়ে চিংকার করল, ‘বন্দে মারতরম’ । অনি দেখল ভবনী মাস্টারের চোখ থেকে জল নেমে এসেছে, তিনি মোছার চেষ্টা করছেন না । সেই অবস্থায় ভবনী মাস্টার বললেন, ‘তাকিয়ে দ্যাখো পূর্ব দিগন্তে সূর্যদেব উঠেছেন । এই মহালগ্নে আমাদের স্বর্ণচেঁড়ার আকাশে প্রথম জাতীয় পতাকা উড়বে । শহর থেকে বিশিষ্ট জননেতা শ্রীমুক্ত হরবিলাস রায় মহাশয় আজ আমাদের এখনে এসেছেন । স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা আমরা সবাই জানি । আমি তাঁকে অনুরোধ করছি এই পরিব্রত দায়িত্ব গ্রহণ করতে ।’ সবাই চুপচাপ দাঢ়িয়ে কোথাও কোনো শব্দ নেই । স্বর্ণচেঁড়ার মানুষের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যার গুরুত্ব সম্পর্কে কেউ হয়তো কোনোদিন সচেতন ছিল না । এখন এই মুহূর্তে সবাই উন্নখ হয়ে দাঢ়িয়ে ।

হরবিলাসবাবু দাঁড়ালেন, সামনের জন্তার ওপর ওর বৃক্ষ চোখ দুটো রাখলেন খানিক, তারপর খুব পরিচ্ছন্ন গলায় বললেন, ‘আজ সেই মুহূর্ত এসেছে যার জন্য আমরা সারাজীবন সংগ্রাম করেছি । গাঁকীজির অনুগামী আমি, আমাদের সংগ্রাম শাস্তির জন্য, ভালোবাসার জন্য । কিছু আমার তো বয়স হয়েছে । এই পতাকা আমার ঘোরনের শপ্ত ছিল, একে অনি আমার রক্তের চেয়ে বেশি ভালোবাসি । আজ এই পতাকা আমার ঘোরনের শপ্ত ছিল, একে অনি আমার রক্তের জন্যই আমি বেঁচে আছি । কিছু আমার মনে হচ্ছে, এই পতাকা আকাশে তোলার মোগ্যতা আমার নেই । এই পতাকা তুলবে আগামীকালের ভারতবর্ষের দায়িত্ব যাদের ওপর তারাই যোগ্যতা আমার নেই । এই পতাকা তুলবে আগামীকালের ভারতবর্ষের দায়িত্ব যাদের ওপর তারাই । সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগষ্টের এই সকাল তাদের সারাজীবন দেশগড়ার কাজে শক্তি যোগাবে । তাই আমি আগামীকালের নাগরিকদের মধ্যে একজনকে এই পতাকা তোলার জন্য আহ্বান করিছি ।’ সবাই অবাক হয়ে কথাগুলো শুনল । হরবিলাসবাবু কয়েক পা এগিয়ে এসে সামনের দিকে তাকালেন । তাঁর চোখ ছেট ছেটে ছেলেদের মুখের ওপর, কাকে ডাকবেন তিনি ভাবছেন । হঠাৎ অনি দেখল হরবিলাসবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছেন । খানিকক্ষণ দেখে তিনি আঙুল ভুলে অনিকে কাছে ডাকলেন । অনি প্রথমে বুকতে পারেনি যে তাকেই ডাকা হচ্ছে । বোঝামাত্রই ওর বুকের মধ্যে দুক্কনুক শুরু হয়ে গেল । হাঁটুর তলায় পা দুটোর অতিক্রম যেন হঠাৎই নেই । বাপী ফিসফিস করে বলল, ‘তোকে ডাকছে, যা ।’

হরবিলাসবাবু ডাকলেন, 'তুমি এসো ভাই !'

কী করবে তেবে না পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অনি। স্বর্গছেঁড়ার ছেলেমেয়ের দল অনির দিকে তাকিয়ে আছে। হরবিলাসবাবু এক হাতে অনিকে জড়িয়ে ধরে পতাকার কাছে নিয়ে গেলেন। ভবানী মাট্টার বাঁশের গায়ে জড়ানো দড়িটা খুলে অনিকে ফিসফিস করে বললেন, 'এইদিকের রশিটা টানবা, পুটলিটা একদম ডগায় গেলে রশিটা জোরে নাচাবা।'

অনি সম্মেহিতের মতো মাথা নড়ল। হরবিলাসবাবু জিজেস করলেন, 'তোমার নাম কী ভাই?'
'অনি, অনিমেষে !'

হরবিলাসবাবু সোজা হয়ে সামনের দিকে তাকালেন, 'আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। এখন সেই ব্রাহ্মণমূর্তি, আমাদের জাতীয় পতাকা শাবিন ভারতের আকাশে মাথা উচু করে উঠবে। তাকে তুলে ধরছে আগামীকালে ভারতবর্ষে অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ।' কথাটা শেষ হতেই ভবানী মাট্টার ইঙ্গিত করে অনিমেষকে দড়িটা টানতে বললেন।

দুহাতে হঠাতে যেন শক্তি ফিরে পেল অনি, সমস্ত শরীরে কাঁটা দিছে, মা কোথায়-মা যদি দেখত, অনি দড়িটা ধরে টানতে লাগল। এপাশের দড়ি বেয়ে একটা রঞ্জিন পুটলি উঠে যাচ্ছে, ওদিকে দড়ি নেয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হরবিলাসবাবু চিন্কার করে উঠলেন, 'বন্দে মাতরম্'। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গছেঁড়া কঁপিয়ে চিন্কার উঠল, 'বন্দে মাতরম্'। চিন্কারটা থামছে না, একের পর এক ডাকের নেশায় সবাই পাগল সেইসঙ্গে শব্দে বাজতে লাগল। নতুন দিনিমণি ব্যাগ থেকে শব্দে বের করে গাল ফুলিয়ে সেই ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে সেই শব্দেধনি করতে করতে লাগলেন। অনি তাকিয়ে দেখল পুটলিটা ওপরে উঠে গেছে। দড়িটা ধরে বাঁকুনি দিতেই চুট করে সেটা খুলে গিয়ে ঝুরঝুর করে কিসব আকাশ থেকে অনির মাথার ওপর ঝরে পড়তে লাগল। অনি দেখল একবাশ ঝুলের পাপড়ি ওর সমস্ত শরীর ছয়ে নিচে পড়ছে আর সকালের বাতাস মেঘে প্রথম সূর্যের আলো বুকে নিয়ে তিনরঙা পতাকা কী দরুণ গবে দোল থাচ্ছে। চারধারে হইহই চিন্কার, এ ওকে জড়িয়ে ধরছে আনন্দে, কারও কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। ওপরের ঐ গর্বিত পতাকার দিকে তাকিয়ে অনির মনে হল ও এখনও হেট, পতাকাটা ওর নাগালের অনেক বাইরে।

সরিষ্ঠেখর ফেয়ারওয়েল নিতে রাজি হলেন মা। পনেরোই আগষ্টের দুপুরে হে সাহেব নিজে গাড়ি চালিয়ে সরিষ্ঠেখরের কাছে এলেন। সরিষ্ঠেখর তখন বারান্দায় বেতের চেয়ারে অনিকে নিয়ে বসে ছিলেন। আর স্বর্গছেঁড়ায় অনি একটা খবর হয়ে গিয়েছে। হরবিলাসবাবু অনিকে দিয়ে প্রথম জাতীয় পতাকা তুলিয়েছেন, এই কথাটা সবার মুখে-মুখে ঘূরছে। পতাকা তোলার পর ছবি তোলা হয়েছে অনিকে সামনে রেখে। ভবানী মাট্টার বলেছেন ছবিটা বাঁধিয়ে ঝুলের বারান্দায় টাঙিয়ে রাখবেন। খবরটা শুনে সরিষ্ঠেখর সেই যে অনিকে সঙ্গে রেখেছেন আর ছাড়তেই চাইলেন না।

হে সাহেবের বাড়ি ক্ষট্টলাও। চা-বাগানের ম্যানোজারি করে গায়ের রঙটা সামান্য নষ্ট হলেও আচার-আচরণে পুরো সাহেব। গাড়ি থেকে নামতেই সরিষ্ঠেখর উঠে দাঁড়ালেন। এই দীর্ঘ তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর বিকল্পে অসৌজন্যের অভিযোগ করতে পারেননি। ম্যাকফার্সন সাহেব একসময় অভিযোগ করতেন সরিষ্ঠেখর কংগ্রেসিদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করছেন, হিন্দু-মুসলমান গননার সময় তিনি কংগ্রেসকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু সেটা ছিল তাঁদের অতরঙ্গ ব্যাপার। এ নিয়ে ম্যাকফার্সন সাহেব ওপরতলায় কোনোদিন রিপোর্ট করেননি।

'হ্যালো বড়বাবু!' হে সাহেব হাসলেন, হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সরিষ্ঠেখর করমদন্ত করে সাহেবকে চেয়ারে বসালেন। হঠাতে অনির ভবানী মাট্টারের কথা মনে পড়ে গেল। ইংরেজ সাহেবেরা আমাদের দেশটাকে ছিঁড়ে শৈব্রে নিয়ে চলে গেছে। সবাই তো যায়নি, এই হে সাহেব তো এখনও দান্দুর সামনের চেয়ারে বসে হাসছেন। দান্দু ওর সঙ্গে অমন তালোভাবে কথা বলছে কেন? আজ তো আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা। বড় খারাপ লাগছিল অনির।

হে সাহেব বললেন, 'আমি খবর পেলাম তুমি নাকি ফেয়ারওয়েল নিতে রাজি হচ্ছ না!' বাংলা বরেন সাহেবে, ভাঙা-ভাঙা, তবে বেশ স্পষ্ট বোৰা যায়। কথাটা বলার সময় সাহেবের মুখ-চোখ খুব গঁজার দেখাল।

সরিষ্ঠেখর হাসলেন, 'আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দিতে চাইছ?'

সাহেব বললেন, ‘সে কী, একথা কেন বলছ? এই টি-এক্সেট তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ফেয়ারওয়েল মানে কি তাড়িয়ে দেওয়া?’

সরিষ্ণেখের হাসলেন, ‘দ্যাখো সাহেব, আমি জানি এই বাগানের সবাই আমাকে ভালোবাসে। আজ সবাই আমাকে ভালো কথা বলে উপহার দেবে এবং আমি সেগুলো নিয়ে চুপচাপ চলে যাব, ব্যাপারটা ভাবতে অস্বত্ত্ব লাগছে।’

সাহেব বললেন, ‘কিন্তু এটাই তো প্র্যাকটিস।’

খুব ধীরে ধীরে সরিষ্ণেখের বললেন, ‘আজ আমাদের ইভিপেডেস ডে। দুশো বছর পর তোমাদের হাত থেকে ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি। এমন দিনে আমাকে ফেয়ারওয়েল দিও না, নিজেকে বড় অক্ষম মনে হবে। আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে।’

হে সাহেব সরিষ্ণেখের দিকে কিছুক্ষণ ঝিরচোখে তাকালেন, তারপর মাথা নিচু করলেন, ‘আই আভারট্যাও। তবে আমরা তো কমন পিপল। ওয়েল, তোমার ফেয়ারওয়েলে যদি আমি না থাকি তা হলে তোমার আপত্তি আছে?’

চট করে উঠে দাঁড়ালেন সরিষ্ণেখের, উঠে এসে হে সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরলেন, ‘কী বলছ সাহেব। আমি তোমাকে হেয় করতে চাইনি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে আমি বিশ্বাস করি কোনো তিক্ততা নেই। তোমার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, তার জন্যে তুমি দায়ী হবে কেন? তুমি তো জান আমি অ্যাকিটিভ পলিটিজু কোনোকালে করিনি। আর আমি জানি এখন ভারতবর্ষের যাঁরা নেতা হবেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কোনো যোগাযোগ থাকবে না। তবু আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস—এটা একটা অলাদা ফিলিংস—আমার মনে হচ্ছে আমি যৌবনে ফিরে গিয়েছি—তুমি ফেয়ারওয়েল দিয়ে আমাকে বুঝো করে দিও না।’

হে সাহেব উঠে দাদুর একটা হাত ধরে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন, পেছনে অনি। হে সাহেব বললেন, ‘বাবু, এবার বোধহ্য আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। কোম্পানি ইণ্ডিপেণ্টে ইভিয়ায় হয়তো বিজেনেস করতে চাইবে না। সো, আমাদের হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না। বাট, আমি চিরকাল এই দিনগুলো মনে রাখব, আমি জানি তুমি ভুলবে না।’

দাদু কিছু বললেন না। সাহেব গাড়িতে উঠে অনির দিকে তাকালেন, তারপর হাত নেড়ে বললেন, ‘কন্যাকূলেশন, আওয়ার ইয়ং হিরো।’

গাড়িটা চলে যেতে অনি দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দাদুর পাশে দাঁড়ালে ওর নিজেকে ভীষণ ছেট লাগে। সরিষ্ণেখের নাতির কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে লাগলেন হঠাত। পায়চারি করে বেড়াবার মতো ওরা আসাম রোডে এসে পড়লেন। অনি দেখেছিল, দাদু কোনো কথা বলছেন না, মুখটা গঁথার। বাড়ির সবাই ওকে খুব তয় করে, কিন্তু অনির সঙ্গে উনি এরকম মুখ করে থাকেন না। অনেকক্ষণ থেকে সাহেব সম্পর্কে একগাদা জিজাসা অনির মনে ছটফট করছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, ‘দাদু, সাহেবকে তুমি কিছু বলে না কেন?’

সরিষ্ণেখের আনন্দে বললেন, ‘কেন, কী বলব?’

অনি অবাক হল, ‘কেন? ওরা আমাদের দেশটাকে ছিড়ে শৈমে নষ্ট করে দেয়নি?’

সরিষ্ণেখের চমকে নাতির দিকে তাকালেন, ‘ও বাবা, তুমি এসব কথা কোথেকে শিখলে? নিশ্চয় ভবানী মাটোর বলেছে?’

ঘাড় নাড়ল অনি, ‘হ্যা, বলো না মিথ্যে কথা না সত্যি কথা?’

দুদিকে মাথা দেলালেন সরিষ্ণেখের, ‘মিথ্যে নয় আবার সবটা সত্যি নয়। শোনো ভাই, কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না। সাহেবো যখন এসেছিল আমরা ওদের হাতে দেশটাকে তুলে দিয়েছিলাম; ওরা নিজেদের ব্যার্থে দেশটাকে ব্যবহার করবেই। কিন্তু হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান? কেউ-কেউ তো অত্যাচারী না ও হতে পারে। যেমন ধরো এই হে সাহেব, ওরা যে আমাদের প্রভু, আমরা যে পরাধীন তা কোনোদিন ওর ব্যবহারে টের পাইনি। যেই আমরা স্বাধীন হলাম সব সাহেবে খারাপ হয়ে গেল তা বলি কী করেন?’

দুপাশে বড় বড় দেওদার, শাল তাদের ডালপালা দিয়ে আকাশ ঢেকে, রেখেছে, ছায়া-ছায়া পথটায় ওরা হাঁটছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সরিষ্ণেখের বললেন, ‘আজ যদি তুমি কলকাতায় থাকতে তা

হলে কত কী দেখতে পেতে । কত উৎসব হচ্ছে সেখানে আমরা তো এখানে কিছুই বুঝতে পারি না, আজ অবধি এই স্বর্গছেঁড়ায় একদিনও আন্দোলন হয়নি । এখানকার বাগানের কুলিকামিনীরা স্থানিন্তা মানেই জানে না । বরং আজ যদি সাহেব চলে যায় ওরা কাঁদবে । কিন্তু কলকাতা হল এই দেশের প্রাণকেন্দ্র, আগামীর ফুসফুসের মতো । কত আন্দোলন হয়েছে সেখানে, কত মানুষ মরেছে পুলিশের গুলিতে ।

‘কেন, মরেছে কেন? পুলিশ কেন গুলি করবে?’ অনি বলল ।

হাসলেন সরিষ্পেখর, ‘তুমি যে-জামাটা পরে আছ, কেউ যদি সেটা চায় তুমি দিয়ে দেবে?’

‘কেন দেব? আমার জামা আমি পরুৱা?’

‘কিন্তু ধরো জামাটা একদিন তার ছিল, তুমি পেরে গেছ বলে পরছ, তা হলে? তুমি ভাবছ এখন এটা তোমার সম্পত্তি, কিন্তু সে ফিরিয়ে নেবে বলে বামেলা করছে, ব্যস, লেগে যাবে লড়াই ।’

অনি বলল, ‘জামাটা যদি আমার না হয় তা হলে আমি ফিরিয়ে দেব ।’

মাথা নড়লেন সরিষ্পেখর, ‘সেটাই উচিত, কিন্তু বড়ো এই কথাটা বোবে না ।’

অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যাওয়ার পর অনি বলল, ‘আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে দাদু?’

নাতির দিকে তাকালেন সরিষ্পেখর, ‘কলকাতায় তুমি একদিন যাবেই দাদু । তবে যেদিন যাবে নিজে যাবে, কারোর সঙ্গে যেও না ।’

অনি বলল, ‘কেন?’

সরিষ্পেখর বললেন, ‘এখন তো তুমি ছোট, আরও বড় হও তখন বুঝবে । শুধু মনে রেখো, কলকাতায় যখন তুমি যাবে তখন যোগ্যতা নিয়ে যাবে । তোমাকে তার জন্য সাধনা করতে হবে, মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে । অনেক বড় নেতা হবে তুমি-স্বাধীন দেশের মাথা-উচু-করা নেতা ।’

দাদুর কথাগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না অনি । তবে ভেতরে ভেতরে অস্তুত একটা শিহরন বেৰাখ করছিল ও । আজ ভোরবেলায় ছুটে যেতে যেতে বন্দে মাতরম্ বলে তিঙ্কার করার সময় যে-ধরনের গায়ে-কাঁটা-ওঠা কাঁপুনি এসেছিল ওর হঠাতে সেইরকম হল । এই নির্জন রাস্তায় দাদুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অনি মনেমনে তিঙ্কার করে যেতে লাগল, ‘বন্দে মাতরম্ ।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, ঘুকমকে রোড উঠল, কিন্তু স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের ফ্যাট্টিরিতে আজ ভোঁ বাজল না । কিন্তু একটি পুটি করে মদেসিয়া ওরাও মানুষের দল ঘর ছেড়ে বেরগতে লাগল । সরিষ্পেখরের কোয়াটারের সামনে যে বিরাট মাঠটা চাঁপাগাছ বুকে নিয়ে রয়েছে তার এক কোণে এসে চুপচাপ বসে থাকল ।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, : রিষ্পেখর নিজেই টের পাননি । কদিন থেকেই রাতের বেলা এলে তাঁর ঘূম চলে যায় । একা একা এই ঘরে জানালা দিয়ে বাইরের অঙ্ককারে চোখ রেখে তিনি অস্তুত সব ছবি দেখতে পান । খোলা চোখ কখন দৃষ্টিহন হয়ে মনের মতো করে কিছু চেহারা তৈরি করে দেখতে শুরু করে দেয় । যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে তত এটা বাড়ে, চোখ তত সাদা হয়ে থাকছে । ছাঁড়া হয়ে গেল আজ রাতটায় । কাল যে খাওয়াদোওয়া চুকে গেলে শুয়েছেন বিছানায়, এই রোদ-ওঠা সময় অবধি ঘুমই এল না ।

কান্নাকাটির ধাত সরিষ্পেখরের কোনোকালেই ছিল না । বরং খুব কঠোর বা নিষ্ঠুর বলে একটা কুখ্যাতি ছিল ওর সংস্কৃতে । কিন্তু আজ এই মুহূর্তে স্বর্গছেঁড়া-ছেড়ে চলে যাবার সময় এরকম কে হচ্ছে । সারাটা জীবন এখানে কাটিয়ে নতুন জ্ঞানগায় যাহার অস্তিত্বেও নতুন জ্ঞানগায় যে তিনি নিজেই চেয়েছিলেন, কর্মহীন হয়ে এই স্বর্গছেঁড়ায় থাকতে কিছুতেই চাল না তিনি । তা হলোঁ কাল রাত্রে এটা অস্তুত দৃশ্য দেখলেন উনি । উঠোনের লিচুগাহাটীর মাধ্যায় অঙ্ককার জমে শিয়ে ঠিক বড়বউ-এর পেছন ফিলে চুল খুলে দাঁড়াবার মৃত্তি হয়ে গিয়েছে । চমকে শিয়েছিলেন তিনি । সে কত বছর আগের কথা । বড়বউ-এর মুখটা এখন আর মনে পড়ে না । চোখ ভাবতে শেলে চিবুকের ডোলটা হারিয়ে যায়, নাকটা খুব তিকলো ছিল না মনে আছে, কিন্তু সব মিলিয়ে পুরো মুখটা যে কিছুতেই মনে পড়ে না । অনির মুখের দিকে তাকালে হঠাত-হঠাতে বড়বউ-এর মুখটা চলকে ওঠে । মহীতোষ বড়বউ-এর ছেলে, কিন্তু মামের কোনো ছায়া ওর মধ্যে নেই । আবার মহীতোষের ছেলেকে দেখে সরিষ্পেখরের কেন যে বড়বউ-এর কথা মনে আসে কে জানে! তা সেই অস্পষ্ট হয়ে-যাওয়া বড়বউকে কাল রাত্রে

অন্ধকারমাখা লিচুগাছটা ঠিক আস্তি ফিরিয়ে এনে দিল। রাত্রে শোবার আগে হারিকেনের দিকে তাকিয়ে চুল আঁচড়াত বড়বউ। পিছন থেকে সরিষ্ণেখর তার মুখ দেখতে পেতেন না, চুইয়ে-আসা আলো খোলা চুলের ধারণলোয় গুটিস্টি মেরে থাকত। ঠিক সেইরকম হয়েছিল কাল রাতে লিচুগাছটার।

কিন্তু বড়বউকে নিয়ে কিছু ভাবতে গেলেই যা হয় তা-ই হয়েছিল। হড়মুড় করে ছোটবউ এসে যায়। ছোটবউ একদম স্পষ্ট। কুড়ি বছর আগের সেই ছুটফটো চেহারা বড়বউ-এর ঠাণ্ডা এবং অস্পষ্ট চেহারাকে লহমায় মুছে দেয়। বড় বউ-এর সময় ছবি তোলা সভ্ব হয়নি। স্বর্গছেঁড়ার ফটোর দোকান ছিল না। ছোটবউ-এর সময় সরিষ্ণেখর নিজে বইপত্র পড়ে ছবি তোলা এবং তার ওয়াশপ্রিন্টিং শিখে নিয়েছিলেন। এখন এই কোয়ার্টেরে দেওয়ালে ছোটবউ-এর মুখ ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে অস্ত তিনি জয়গায় রয়েছে। ছোটবউ দণ্ডপিয়ে চলাফেরা করত, তাই যখন সে চলে গেল সরিষ্ণেখর বুকের গভীরে দণ্ডগেঁ ঘা তৈরি হয়ে গেল। বড়বউ কখন এল কখন গেল, কোনো অনুভূতি তৈরি হল না। কিন্তু কাল সারারাত ধরে এই দুটি বিপৰীত চরিত্রের মেয়ে বারবার নিজেদের স্বত্ব নিয়ে সরিষ্ণেখরের কাছে ফিরে ফিরে এসেছে। স্বর্গছেঁড়ার এই বাড়ির চৌহদিতে যাদের অস্তিত্ব সীমায়িত তারা সরিষ্ণেখরকে এই যাবার আগে রাতে শেষবারের জন্য ঘূর্মোতে দিল না।

কখন যেন তোর হয়ে গেল, বাতাবিলেৰ গাছটায় বসে একটা দাঢ়কাক কেমন করুণ গলায় ডাক শুরু করে দিল, জানলার তার গলে বিছানায় সকালে রোদ আলোছায়ায় নকশা কাটা শুরু করে দিল অনি টের পায়নি। কাল রাতে মায়ের কাছে শয়ে অস্তুত একটা শ্বপ্ন দেখেছিল ও। আজ এই সকালে শ্বপ্নটা যেন তাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। শ্বপ্নটার কথা মনে হতেই ও আর-একবার কালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে নিল। কাল রাতে মায়ের পাশে শয়ে শয়ে সেই মিষ্টি গঞ্জটা পেতেই বুকটা কেমন করে উঠেছিল। আজ শেষ রাত, কাল থেকে আর মাকে এমন করে পাব না, এই বোধটা যত বাড়তে লাগল তত চোখ ভারী হয়ে উঠেছিল। শেষে ছেলের কান্না শনে মাধুরী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘কী হল?’ অনি অনেকক্ষণ কোনো জবাব দেয়নি। মাধুরী অনেক বুঝিয়েছিলেন। অনিকে অনেক বড় হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। এখনে স্বর্গছেঁড়ার তো ভালো ক্ষুল নেই। প্রত্যেক ছুটিতে অনি যখন এখানে আসবে তখন নৃতন নৃতন গল্প শুনবেন মাধুরী ওর কাছে। অনি যখন বলল, ‘তোমাকে ছেড়ে আমি কী করে থাকব মা’, তখন মাধুরীর গলাটা একদম পালটে গেল, ‘আমি তো সবসময় তার সঙ্গে আছি রে বোকা!’ অনি হঠাৎ টেরে পেল ওর বুকের কান্নাটা মায়ের বুকের ভেতর চলে গেছে। আর একটু হলেই মা অনির মতো কেঁদে ফেলবে। খুব শক্ত হয়ে গেল অনির শরীর। টানটান করে সিটিয়ে শয়ে রাইল। মাকে কষ্ট দিলে মহাপাপ হয়, পিসিমা বলছ। তারপর সেইভাবে শয়ে থেকে কখন যে ঘুম এসে গেল ও জানে না। কে যেন তার হাত ধরে হাঁটতে লাগল, তার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। ত্রুটি তার শরীর বড় হয়ে যেতে লাগল। সে দেখল অনেকেই তার মতো হাঁটছে, অজন্ম লোক। যে-লোকটার সঙ্গে ও যাচ্ছিল সে বলল আগে যেতে হবে, সবার আগে যেতে হবে। অনির মনে হল সবাই এক কথাই ভাবছে। অনি দৌড়াতে লাগল। অনেকে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে। হঠাৎ অনি দেখল ওর সামনে কেউ নেই, পেছনে হাজার হাজার লোক। কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, ‘গলা খুলে চাঁচাও।’ ও দেখল ভবনী মাস্টার ওর পেছনে। অনি সমস্ত শরীর নেড়ে ডাক দিল, ‘বন্দে মাতরম্।’ কানের পর্দা ছেঁটে যাবার উপক্রম হল সেই ডাকের সাড়ায়। এইভাবে এগোতে এগোতে অনি থমকে দাঁড়াল। সামনেই একটা খাদ, তার তলা দেখা যাচ্ছে না। খাদের কাছে বুকে অনি বলল, ‘বন্দে মাতরম্।’ সঙ্গে সঙ্গে নিচ থেকে একটা গমগমে গলা বলে উঠল, ‘মানে কি?’ অনি মানেটা খুজতে গিয়ে শুল নিচ থেকে যে যেন বলছে, ‘বোকা ছেলে, আমার কাছে আয়।’ অনি আবাক হয়ে দেখল অনেক নিচে মায়ের মুখ, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। অনির ঘুম ডেও গেল।

এখন এই সকালে ওর মনে পড়ে গেল ভবনী মাস্টার বলে দিয়েছিলেন বন্দে মাতরম্ শব্দের মানে কী। এখন এই মহুর্তে দাদুর সঙ্গে শহরে যেতে ওর একদম ইচ্ছে করছে না। স্বর্গছেঁড়ার এই বাড়ি, মায়ের গক্ষ, সামনের মাঠের চাঁপাগাছ আর পেছনে খিরিখিরে নদীটা ছেড়ে না গেলে যদি বড় না হওয়া যায় তাতে ওর বিদ্যুমাত্র এসে যায় না।

তিনটে লরিতে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে। পিসিমা সমস্ত বাড়ি ঘুরে এসে ঠাকুরঘরে তুকেছেন। মহাতোষ দাঁড়িয়ে থেকে দেখছেন কুলিরা লরিতে মালপত্র ঠিকঠাক রাখছে কি না। প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়, তাকে লরির ওপর উঠে তদুরাকি করতে বলে মহাতোষ ঘরে এলেন। সরিষ্ণেখরের

খাওয়াদাওয়া হয়ে গিয়েছিল আগেই, এখন যাবার জন্য জামাকাপড় পরে একদম প্রস্তুত। সকাল থেকে অনেকবার তাগাদা দিয়েছেন সবাইকে, বিকেল হয়ে গেলে তিন্তা পেরুতে জোড়া নেটকো পাওয়া যাবে না। সেই সাতসকালে খেয়েদেয়ে বসে আছেন। ঘরভরতি এখন লোক। শ্রঙ্গছেঁড়া চা-বাগানের শুরু তো আছেনই, আশেপাশের বাস্ক টিবার-মাচেন্টুরাও এসেছেন। ঘরে ঢোকার আগে মহীতোষ দেখে এসেছেন সামনের মাঠটা মানুষের মাথায় ভরে গেছে। চা-বাগানের সমস্ত মদেসিয়া-মুণ্ডা-ওরাও প্রমিকরা একদৃষ্ট এই বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। ফুটবল মাঠেও এত ভিড় হয় না।

সরিষ্ণেখর ছেলেকে দেখে বললেন, ‘হয়ে গেছে সব?’*

মহীতোষ বললেন, ‘একটু বাকি আছে।’

সরিষ্ণেখর বললেন, ‘কী যে কর তোমারা, বামোটা পঞ্চাশের পর যাওয়া যাবে না, বাববেলা পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করতে বলো সবাইকে।’

মহীতোষ ভেতরে এসে দেখলেন মাধুরী একটা ছোট সুটকেসে অনির জামাকাপড় ভরে সেটাকে দরজার পাশে রাখেছেন। মহীতোষ বললেন, ‘অনি কোথায়?’

মাধুরী বললেন, ‘এই তো এখানেই ছিল। মোটেই যেতে চাইছে না।’

‘যাবার জন্য লাফাছিল এতদিন, এখন যেতে চাইছে না বললে হবে!’ মহীতোষ কেমন বিষণ্ণ গলায় বললেন।

‘দ্যাকো, যা তালো বোঝ করো।’ বলে মাধুরী ভেতরে চলে পেলেন।

মহীতোষ বাড়ির ভেতরে ছেলেকে পেলেন না। বাগানের দিকে উঁকি মেরে দেখলেন সেখানে কেউ নেই। যাবার সময় হয়ে গেল অপচ ছেলেটা গেল কোথায়। গোয়ালঘরের পেছনে এসে মহীতোষ থমকে দাঁড়ালেন। অনিকে দেখা যাচ্ছে। মাটিতে উৰু হয়ে বসে আছে। ডাকতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত নাড়েকে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এখান থেকে অনির মূখ দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু ফোঁপানির শব্দটা শোনা যাচ্ছে। এইভাবে নির্জনে বসে ছেলেটাকে কাঁদতে দেখে মহীতোষ কেমন হয়ে গেলেন। সাধারণ ছেলেমেয়ের মতো ও চটপটে নয়, কিন্তু ঐ বয়সের ছেলের চেয়ে ওর বুদ্ধিটা অনেক বড়, মেশিকম বড়। কথা যখন বলে তখন ওর বয়সের ছেলের মতো বলে না। সরিষ্ণেখর ওকে বেশি স্বেচ্ছ করেন, বোধহয় পৃথিবীতে একমাত্র অনিই সরিষ্ণেখরের মন নরম করতে পারে। এখন ছেলেকে কাঁদতে দেখে মহীতোষের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এই একান্নবর্তী পরিবারে ছেলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আলাদা করে নয়। বলতে গেলে বাড়ির সঙ্গে যতটুকু কথা হয় অনির সঙ্গে সেইটুকুই হয়। অনি শহুরে চলে যাবে বাবার সঙ্গে, লেখাপড়া শিখবে-এরকম কথা ছিল। কিন্তু এইমাত্র মহীতোষের মনে হল তাঁর ছেলে এখন থেকে তাঁর সঙ্গে থাকছে না।

দুহাত বাড়িয়ে অনিকে কোলে তুলে নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মহীতোষ। উৰু হয়ে বসে ফোপতে ফোপাতে অনি মুঠায় করে মাটি তুলছে। ওর সামনে একটা ঝুমাল পাতা। ঝুমালটার অনেকটা সেই মাটিতে ভরতি। ব্যাপারটা কী, ও ঝুমালে মাটি রাখছে কেন? শেষ পর্যন্ত অনি যখন ঝুমাল বাঁধতে শুরু করল মহীতোষ নিঃশব্দে পিছু ফিরলেন। ছেলের এই গোপন সংগ্রহ দেখে ফেলেছেন—এটা ওকে বুবাতে দেওয়া কোনোমতই চলবে না। গোয়ালঘর পেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখলেন অনি উঠে দাঁড়িয়েছে। এক হাতে চোখ মুছছে, অন্য হাতে ঝুমালের পুটিলিটা ধৰা। আড়াল থেকে মহীতোষ হাঁক দিলেন, ‘অনি, অনি!’ ছেলের সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন। এবার খুব অন্তে, ক্ষীণ গলায় অনি সাড়া দিতে মহীতোষ উঁচু গলায় বললেন, ‘ওখানে কী করছ! দাদু যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাড়াতাড়ি চলে এসো।’ ক্ষাটা বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না মহীতোষ।

ঘর থেকে সবাই বাবাদায় নেমে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সামনে দাঁড়ানো লরিগুলোর গা-য়েষে মানুষের জটলা। মালপত্র বাঁধা শেষ, প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে সরিষ্ণেখরকে বলল, ‘আর দেরি করবেন না, বেলা হল।’

কথাটা শোনার জন্যই বসে ছিলেন সরিষ্ণেখর, তড়ক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, ‘চলি তা হলে।’

ডাঙুর ঘোষাল বললেন, ‘একদম ভুলে যাবেন না আমাদের।’

সরিষ্ণেখর বললেন, ‘সে কী! তোমাকে ভুলব কী করে হে, তুমি যে আমার-কথাটি বলতে গিয়ে

ଧ୍ୟକେ ଗେଲେନ ଉନି ।

ଏଥିନ ଏହି ପରିବେଶେ ଓଦେର ସେହି ଚିରକୋଳେ ଠାଟିଟା ଏକଦମ ଯାନାଯ ନା । ସରିଅଣ୍ଟର ଥେମେ ଗେଲେଓ ଡାଙ୍କାର ଘୋଷାଳ ବାକିଟୁକୁ ମନେମନେ ଛୁଡ଼େ ନିଲେନ, ‘ବୁଟଟାକେ ମେରାହେ?’

କଥାଟା ତୋ ନେହାତ ଇଯାକି କରେ ବଲା, ସବାଇ ଜାନେ । ଡାଙ୍କାର ଘୋଷାଲେର ହାତ ଚଟ କରେ ସରିଅଣ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିଯେ ଧରଲେନ, ‘କିଛୁ ମନେ କୋରୋ ନା ଡାଙ୍କାର । ଡାଙ୍କାର ମାଥା ନାଡ଼ିଲେନ ।

ଏବାର ମହିତୋଷକେ ସରିଅଣ୍ଟର ବଲଲେନ, ‘ତୋମାର ଦିନି କୋଥାଯା?’

ମହିତୋଷ ବଲଲେନ, ‘ସବାଇ ମେଡ଼ି ।’

ସରିଅଣ୍ଟର ବଲଲେନ, “ନି!

ଗଞ୍ଜିର ଗଲାର ଡାକଟା ଡେତରେ ଯେତେଇ ଅନିର ବୁକଟା କିମ୍ପେ ଉଠିଲ । ଡିତରେର ଘରେ ଖାଟେର ଓପର ମା ଏବଂ ପିସିମାର ମଧ୍ୟେ ଅନି ବସେ ଛିଲ । ବାଗାନେର ଅନ୍ୟ ବାସୁଦେବ ଝାଇ ଓ ମେଯେରା ଭିଡ଼ କରେଛେ ସେଥାନେ । ପିସିମା ଚଲେ ଯାଇଁ ବଲେ ସବାଇ ଦେଖିତେ ଏସେହେ । ଖାଟେର ପାଶେ ଦାଙ୍ଗିଯେ ଆହେ ବିଶ୍ଵ, ବାପୀ । ଓଦେର ଦିକେ ତାକାଙ୍କେ ନା ଅନି । ଓ ଚୋଖ ଜଲେ ଅନ୍ଧ । ଦିତୀୟବାର ଡାକଟା ଆସତେ ମାଧୁରୀ ଆଁଚଲ ଦିଯେ ଛେଲେର ଚୋଖ ମୁହିଁଯେ ଦିଯେ ବଲଲେନ, ‘ଯା ।’

କାପତେ କାପତେ ଅନି ବାଇରେ ଘରେ ଏସେ ଦାଙ୍ଗାତେ ସରିଅଣ୍ଟର ନାତିକେ ଆପାଦମନ୍ତକ ଦେଖଲେନ, ଦେଖେ ହାସଲେନ, ‘କୀ ହେଯେ ତୋମାର?’

ଡାଙ୍କାର ଘୋଷାଳ ବଲଲେନ, ବୋଧ୍ୟ ମନ-ବାରାପ ।

ସରିଅଣ୍ଟର କୀ ଭାବରେନ ଖାନିକ, ‘ତା ହଲେ ଓ ଥାକ ।’

କଥାଟା ଶୁଣେଇ ଅନିର ସମସ୍ତ ଶରୀରେ ହଇଚଇ ପଡ଼େ ପେଲ । ଦାନ୍ତର ଦିକେ ତାକାତେ ଶିଶ୍ରେ ବାବାର ଗଲା ପ୍ରଳ ଓ, ‘ନା, ଏଥିନ ଯାଉନାଇ ଭାଲୋ । ଏଥାନେ ତୋ ପଡ଼ାନ୍ତା ହବେ ନା ।’

ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଳୁଟା ଫୁଟୋ ହୟେ ସବ ହାସ୍ୟା ହୃଦ କରେ ବେରିଯେ ଶେଲ ଯେନ । ସରିଅଣ୍ଟର ଡାକଲେନ, ‘ହେମ!’

ଅନି ଅବାକ ହୟେ ଦେଖିଲ ପିସିମା ଠାକୁରେର ମୃତ୍ତିଟା ପୂଟଲିତେ ନିଯେ ଦରଜାଯ ଏସେ ଦାଙ୍ଗାଲେନ । ପିସିମାକେ ଏଥିନ ଅନ୍ତୁତ ଦେଖାଇଁ । ମାଥାଯ ଘୋମଟା, ଗରଦେର କାପଦ୍ରେର ଓପର ସାଦା ଚାଦର । ମହିତୋଷ ଓ ଦିନିର ଦେଖିଲେନ । ଦିନିର ଭାଲୋ ନାମ ଯେ ହେମଲତା ତା ଯେନ ଖେଯାଲଇ ଛିଲ ନା । ସରିଅଣ୍ଟର ଅନେକଦିନ ପର ଦିନିର ନାମ ଧରେ ଡାକଲେନ । ଏହି ସର୍ଗହେନ୍ଦ୍ରାଯ ସବାର କାହେ ଉନି ଦିନି ବା ବୁଟଦି । ହେମ ବଲେ ଡାକାର ଲୋକ ଖୁବ ବେଶ ନେଇ ।

ସରିଅଣ୍ଟର ବଲଲେନ, ‘ହେମ, ଏହି ଛେଲେଟିକେ ଆମରା ନିଯେ ଯାଛି, ଆଜ ଥେକେ ଏର ସବ ଭାର ତୋମାର ଓପର, ଯଦିନ ଓ କଲେଜେ ନା ଓଠେ । ମନେ ଥାକବେ ତୋ?’

ପିସିମାକେ ଘୋମଟାର ମଧ୍ୟେ ମାଥା ନେଡ଼େ ସମ୍ଭାତ ଜାନାତେ ଦେଖିଲ ଅନି, ‘ଆପନି ଯା ବଲବେନ ।’

ସରିଅଣ୍ଟର ଏବାର ମାଧୁରୀକେ ଡାକଲେନ । ଘରେ ଆର କେଉ କୋନୋ କଥା ବଲଛେ ନା । ମାଧୁରୀ ଏସେ ହେମଲତାର ପାଶେ ଦାଙ୍ଗାତେ ସରିଅଣ୍ଟର ବଲଲେନ ‘ବୁଟମା, ଆମି ଚଲାମ । ଏଥାନେ ଆର ଆମାର ପିଛୁଟାନ ଯେଇ । ତୋମାକେ ଆମି ପଞ୍ଚନ କରେ ଆମାଦେର ସଂସାରେ ଏଣେଛିଲାମ, ଏହି ସଂସାରେର ଭାର ତୋମାର ଓପର ନିଯେ ଯାଛି । ଆର ମା, ତୋମାର ପ୍ରାତିଟିକେ ଆମାର ହାତେ ଦିତେ ତୋମାର ଆପଣି ନେଇ ତୋ?’

ମାଧୁରୀ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଲେନ । ସରିଅଣ୍ଟର ବଲଲେନ, ‘ଠିକ ଆହେ, ତୁମି ଦେଖୋ, ଏହି କାଂଚ ସୋନାକେ କିଭାବେ ପାକା ସୋନା କରେ ଫିରିଯେ ଦିଇ । କଥାଟା ବଲେ ଅନିକେ ଦୁହାତେ ଜାଙ୍ଗିଯେ ଧରଲେନ ସରିଅଣ୍ଟର । ଅନି ଦେଖିଲ ମା ଏକହାତେ ଘୋମଟା ଠିକ କରନ୍ତେ ଶିଶ୍ରେ ଶାଢ଼ିର ପାଢ଼ ଚୋବେର ତଳାଯ ଚେପେ ରାଖିଲ ।

ହେ ସାହେବ ଚେଯେଛିଲେନ ଯେ, ସରିଅଣ୍ଟର ପ୍ରାଇଭେଟ କାରେ ଶହରେ ଯାନ । କିମ୍ବୁ ସରିଅଣ୍ଟର ରାଜି ହନନି । ଲାଲିର ସାମନେ ଡ୍ରାଇଭାରେର ପାଶେ ତୋ ଅନେକ ଜାଗିଗ୍ରାୟ ଆହେ, ଆଲାଦା କରେ ଗାଡ଼ିର ଦରକାର ନେଇ । ମହିତୋଷ ବାରାଦ୍ୟାର ଏସେ ଦେଖିଲେନ କୁଳ-ସର୍ଦାରରା ସବ ସାମନେ ଦାଙ୍ଗିଯେ, ପେଛନେ ଅନେକ ମୁଖେ ।

ମହିତୋଷର ପେଛନେ ଡାଙ୍କାରବାବୁର ସଙ୍ଗେ ସରିଅଣ୍ଟର ଏସେ ଦାଙ୍ଗାତେଇ ଏକଟା ଶୁଙ୍ଗନ ଉଠିଲ । ସରିଅଣ୍ଟର କିନ୍ତୁ ବିବ୍ରତ ହୟେ ସାମନେ ତାକାଲେନ । ଏକଜନ ସର୍ଦାର ଏଗିଯେ ଏଲ, ଏସେ ସରିଅଣ୍ଟରରେର ମୁଖେ ଦିକେ ତାକିଯେ ଥେକେ ଚିରକାର କରେ ଉଠିଲ, ‘କାହା ଯାତିସ ରେ ମୋ ସବ ଛୋଡ଼କେ?’

ସରିଅଣ୍ଟର ବଲଲେନ, ‘କେନ୍?’

লোকটা তেমনি চিন্কার করে বলল, ‘কিনোঁ! এখানে থাক, আমাদের বাব হয়ে থাক, তোকে আমরা যেতে দেব না।’ সঙ্গে সঙ্গে আর-একজন সর্দার চিন্কার করে উঠল, ‘বাবা যাবেক নাই।’ আর সেই একটা গলার সঙ্গে সমস্ত মাঠ গলা মেলাল। সরিষ্পেখের দেখলেন বকু সর্দার ও দের ঘণ্টে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আছে সেরাও। এদের প্রায় ধ্রেতোককে কয়েকটা ছেলেছেকরা বাদে তিনি চেনেন। চিন্কার সমানে বাড়ছিল। মহীতোষ সরিষ্পেখেরকে বললেন, ‘কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না, কী করবেন?’

ডাঙ্কারবাবু বললেন, ‘আমি দেখছি।’ তারপর সামনে এগিয়ে তিনি হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে বললেন, চিন্কারটা কমে এল। ডাঙ্কারবাবু বললেন, ‘তোরা বাবাকে যেতে দিবি না বলছিস কিন্তু বাবার যে চাকরি নেই-তা জানিসঃ?’

একজন সর্দার বলল, ‘এই চা-বাগান বাবা তৈরি করেছে, বাবা যতদিন জীবিত থাকবে তাকে চাকরি করতে দিতে হবে।’ সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থনে আওয়াজ উঠল।

এবার সরিষ্পেখের বারান্দা থেকে নেমে সর্দারদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে ঘিরে ধরল। সরিষ্পেখের সামনের কালো কালো বিচলিত মুখগুলোর দিকে তাকালেন, ‘আমাকে তোরা যেতে দে। সারাজীবন তো চাকরি করলাম, একটু বিশ্রাম চাই রে।’

একজন সর্দার বলল, ‘আমাদের কে দেববে? কার কাছে যাব?’

সরিষ্পেখের বললেন, ‘আরে বোকা, এখন তোরা স্বাধীন, এখন ভয় কী? তোদের চার-পাঁচজন মিলে একটা দল কর। সবাই সেই দলকে সুবিধে-অসুবিধে জানাবে। এ দলই সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দাবি আদায় করবে, ব্যস।’

সর্দাররা সবাই মুখ-চাউয়াচাওয়ি করতে লাগল। হঠাত বকু সর্দার এগিয়ে সরিষ্পেখের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনো কথা নয়, ঝুঁপিয়ে ঝুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ল অন্য মুখগুলোতে। সরিষ্পেখের এইসব সরল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন যে তাঁর নিজের চোখের আগল কথম খুলে গেছে, বয়ঞ্চ শুকনো গালের চামড়ার ওপর ফোটা ফোটা জলবিন্দু পড়ায় অসুস্থ শাপ্তি লাগছে। অথচ কোনো শোক তাকে কাঁদতে পারেনি এতদিন।

হয়তো কান্নার জন্মেই প্রতিরোধ নরম হয়ে সরে গেল। অনি দেখল পিসিমা মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। ঝাঁড়িকাকু এবং প্রিয়তোষ লরির ওপর উঠল। মহীতোষ প্রথমে লরির সামনে ড্রাইভারের পাশে অনিকে তুলে দিলে হেমলতা তার পাশে উঠে বসলেন। সরিষ্পেখের ট্রেসব বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে লরিতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ভড় কাটিয়ে বিলাস ছুটে আসছে। সরিষ্পেখের হাতে একটা বিরাট মিছির হাঁড়ি ধরিয়ে দিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সে। সরিষ্পেখের হাঁড়িটা অনির হাতে দিতেই একটা অসুস্থ ব্যাপার হয়ে গেল। দুজন সর্দার ফিসফিস করে কী বলে মাথার পাগড়ি সরিষ্পেখের পায়ের সামনে টানটান করে ধরে থাকল। আর কয়েকশো মানুষ এগিয়ে এসে একজানা, দুআনা, লাল পয়সা, ঝুটো পয়সা ফেলতে লাগল তাতে। ডাঙ্কার ঘোষাল মালবাবু, মনোজ হালদার সব দাঁড়িয়ে এই অসুস্থ দৃশ্য দেখছে। ক্রমশ কাপড়টার মাঝখানে পয়সা উঁচু হচ্ছিল।

সরিষ্পেখের অসুস্থ গলায় বললেন, ‘ডাঙ্কার, তোমরা ফেয়ারওয়ালের কথা বলেছিলে না, পৃথিবীতে কেউ এর চেয়ে বড় ফেয়ারওয়ালের পেয়েছে?’

মহীতোষ সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাঝুরী এক। পাকবেন বলে সরিষ্পেখের নিষেধ করেছেন। সঙ্গে তো প্রিয়তোষ যাচ্ছেই, কোনো অসুবিধে হবে না। তাছাড়া দুদিন আগে লোক পাঠিয়ে জলপাইগুড়ির বাড়ি ধুয়েছে পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন। ঘড়ি দেখলেন তিনি, আর একদম সহ্য নেই। ড্রাইভার উঠে বসল, তার পাশে হেমলতা, তাঁর গায়ে দরজার ধারে সরিষ্পেখের কোলে খুচু পয়সার পুটিলিটা নিয়ে বসে আছেন। ড্রাইভারকে টার্ট নেবার ইঙ্গিত করতে যেতেই সরিষ্পেখের টের পেলেন গাড়িটা দুলেছে। তারপর গাড়িটা একটু একটু করে চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে চিন্কার উঠল, ‘বাবা যায়-ধেউসি রে, আউড় পোড়া-ধেউসি রে।’ ড্রাইভার অসহায়ের মতো বসে রাইল টিয়ারিং ধরে, গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। দুজন সর্দার পাদানির ওপর লাফিয়ে উঠে অন্যান্যকে নির্দেশ দিতে লাগল ঠেলার জন্য। ক্রমশ মাঠ পেরিয়ে লরি আসাম রোডে পড়ল। পিছনের গাড়িটাকে কেউ ঠেলেছে না, কিন্তু সেটাও স্পীড নিতে পারছে না এই লরির জন্য।

অনি দেখিছি। সামনের কাচের ওপর একটা হনুমানের ছবি, এক হাতে পাহাড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বুকে রাম-সীতার ছবি। কাচের ওপাশে আকাশ। আলো করে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ওর নজরে পড়ল ওদের লরির সঙ্গে বাগানের কুলিরা হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা জুড়ে। সামনের দিক থেকে আসা গাড়িগুলো রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে গেছে পরপর। সবাই হ্রস্ব দিছে কিন্তু কেউ তাতে কান দিছে না। হঠাতে অনির নজরে পড়লে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বিবাট বটগাছের তলায় মুখ উঁচু করে রেতিয়া দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি হতে অনি চিন্কার করে উঠল, ‘রেতিয়া!’ সঙ্গে সঙ্গে সরিৎশেখের আর হেমলতা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। কিন্তু অনির সেদিকে নজর নেই। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রেতিয়ার অন্ধ চোখ দুটোর পাতা কেঁপে উঠল। ঠোট দুটো গোল হয়ে যেন কিছু বলল। কী বলল সেটা সম্মিলিত চিন্কারে শোনা গেল না। ক্রমশ সামনের কাচের মধ্যে থেকে রেতিয়ার মুখ মুছে গেলে অনির বুকের মধ্যে অনেকক্ষণের জমা কান্নাটা ছিটকে বেরিয়ে এল। হেমলতা এক হাতে ঠাকুরের পুরুলি সামলে অন্য হাতে অনিকে বুকে টেনে নিলেন।

সরিৎশেখের ক্রমশ অস্ত্রির হয়ে উঠছিলেন। এভাবে লরি ঠেলে ওরা কদ্দুর যাবে? যেভাবে ওরা যাচ্ছে তাতে উৎসাহে ভাটা পড়ার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পাশে পাদানিতে দাঁড়ানো সর্দারকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কদ্দুর যাবি তোরাঃ’ খুব যেন উৎসাহ হচ্ছে এইরকম মেজাজে সে জবাব দিল, ‘তোর ঘর তক্ত।’

বলে কী। জলপাইগুড়ি অবধি পায়ে হেঁটে ওরা হয়তো যেতে পারে, কিন্তু তাতে তো মাঝরাত হয়ে যাবে! সরিৎশেখের ড্রাইভারকে স্টার্ট নিতে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভটভট করে ইঞ্জিনটা হস্কার ছাড়ল। সরিৎশেখের দেখেরেন শব্দ শুনে সামনের পোকজন লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। সেই সুযোগে ড্রাইভার স্পিড বাড়িয়ে দিল চটপট, মুহূর্তে জনতা চিন্কার করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে ওরা অনেক দূরে চলে এসেছেন। পিছনের গাড়িটাও বোধহয় সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, সরিৎশেখের দেখেলেন সেটাও পিছন পিছন আসছে। ছুতুয়া নদীর পুলের কাছে এসে সরিৎশেখের খেয়াল হল সর্দার দুজন এখনও পাদানিতে দাঁড়িয়ে আছে। আর আশ্র্য এই যে, গাড়ি ছুটে যাচ্ছে ওদের নিয়ে—এতে কোনো অঙ্কেপ নেই যেন, হাসিহাসি মুখ করে ছুটত হাড়িটা হাওয়া মুখচোখে মাখছে দুজন।

গাড়ি থামাতে বলরেন সরিৎশেখের। তারপর নিচে নেমে সর্দার দুটোকে ডাকলেন। ওরা মাথা নিচু করে কাছে আসতে বললেন, ‘এবার তোরা যা, আর এই টাকাগুলো বাখ। লাইনের লোকজনকে আজ রাত্রে আচ্ছাসে তোজ দিবি।’ পকেট থেকে কয়েকটা দশটাকার নোট বের করে ওদের হাতে শুজে দিলেন তিনি। সর্দার দুটো চকচকে নতুন নোট হাতে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছিল না। সরিৎশেখের আর সুযোগ দিলেন না ওদের, গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর সারাজীবনের স্মৃতি বুকে নিয়ে বর্ণহেঁড়া ক্রমশ পেছনে চলে যেতে লাগল।

॥ দুই ॥

অবসর-জীবন কীভাবে কাটাবেন সরিৎশেখের কোনোদিন চিন্তা করেননি। সেই কোন ছেলেবেলায় চা-বাগানে ঢুকে পড়ার পর এতটা কাল হই করে কেটে গেল, নিষ্ঠাস ফেলার সময় পাননি। চাকুরির মেয়াদ ফুরিয়ে আসার মুখে ভেবেছিলেন কমহীন অবস্থায় এই তরাটে আর থাকবেনই না। আজ ডুয়াসের সব লোক তাঁতে একডাকে ঢেনে যেজন্যে সেটা ক্ষয়ে যাবে বেকার ক্ষমতাহীন হয়ে বসে থাকলে। তারচেয়ে কলকাতার কাছে গঙ্গার ধারে বাড়ি নিলে বেশ হয়, এরকমটা ভাবতে শুরু করেছিলেন। হেমলতা বলছিলেন, ‘যদি এদেশ ছেড়ে যেতেই হয় তো দেশে চলুন।’ দেশ বলতে সরিৎশেখের অবাক হয়েছিলেন, আজ প্রায় কুড়ি বছর তিনি নদীয়ার সেই গন্ধার্মে পা বাড়াননি, পিতা ষষ্ঠীচরণ দেহ রাখার পর সে-ভিটেতে খুড়তুতো ভাইলা ধুক্কে। নিজের একটা দেশ আছে এই বেধাটা কবেই চলে গেছে। বোধহয় বড়বড় চলে যাবার পর থেকেই দেশ সম্পর্কে মায়া-ময়তা তাঁর নেই। তা ছাড়া এতটা কাল সাহেবসুবোদের সঙ্গে কাটিয়ে এ গ্রামের জীবন তাঁর পোষাবে না। দেশ শব্দটা তাই তার মনে পড়ে না। অথচ হেমলতা কী সহজে দেশ বলল আবেগ-আবেগ গলায়। বেচারা তো কখনো সে-গ্রাম চোখেই দেখেননি। বাবার ইচ্ছের কথা শুনে মহীতোষ বেঁকে বসল, ‘আমাদের ছেড়ে আপনি অত দূরে চলে যাবেন—এ হয় না। আপনি যখন রিট্যার করে আমার সঙ্গে থাকবেনই না, তা হলে অন্তত কাছাকাছি থাকুন। সাপ্তাহ্যারদের বললে জলপাইগুড়িতে একটা

জমির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিপদে-আপদে আমরা যেতে পারব। কিন্তু কলকাতায় আপনি তিঠোতে পারবেন না, আর কিছু-একটা হয়ে গেলে আমরা আফসোসে মরে যাব।' কথাগুলোকে খুব একটা পাতা দিচ্ছিলেন না সরিষ্টেখর। শেষ পর্যন্ত বউমা বললেন, 'বাবা, আপনি চলে গেলে অনির কী হবে? ও কার কাছে পড়ানো করবে?'

ব্যস হয়ে গেল। সরিষ্টেখর জল পাইগুড়ি শহরে জমি কিনলেন। মাত্র দু-হাজার টাকায় শহরের ওপরে জমিসমেত দুটো কাঁঠালগাছ, একটা আম আর অজস্র সুপুরি। এ ছাড়া একটা টিমের চালওয়ালা দু-ঘরের মাথা গৌজার আঙ্গানা, যেটায় দিবি থাকা যায় কিছুদিন।

জমিটা রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই তিনি বড় ছেলে পরিতোষকে পাঠিয়ে দিলেন। এই ছেলে তাঁর রাতের ঘুম দিনের স্বত্ত্ব কেড়ে নিতে যথেষ্ট। অনেক ঘাট ঘুরে সরিষ্টেখরের অনেক পয়সা আজেবাজে ব্যবসায় নষ্ট করে একজন কাঠের কন্ট্রাক্টরের কাছে পড়ে ছিল। সরিষ্টেখর তাকে কাজে লাগাতে চাইলেন। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্ল্যান মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল বাড়ির। দোতলার ভিত হবে, পাঁচটা শোবার ঘর, একটা হল, বসার ঘর, কিনেন, দুটো বাথকুম, একটু ডাইনিং স্পেস, মেয়েদের গল্প করার জন্য বেশ বড় ঠাকুরঘর। মাকফার্সন সাহেবের সঙ্গে বসে বাড়ির প্ল্যান করা হল। ঘুপটিঘর নয়, দক্ষিণের বাতাস যেন চিরন্মির মতো সমস্ত বাড়িটার মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে পারে এরকমভাবে জানলা-দরজা বানানো হবে। পরিতোষ শহরে এসে বাড়ির তদারকি করবে দাঁড়িয়ে থেকে। কন্ট্রাক্টরকে বিশ্বাস নেই। সরিষ্টেখরের। ওদের কাজকর্ম তো বাগানের বিভিন্ন ব্যাপারে অষ্টপ্রহর দেখছেন। কাজ যদি সঠিক হত তা হলে পুঁজো বা ক্রিসমাসে এত ভেট দিতে হত না। সরিষ্টেখর নিজের বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে কন্ট্রাক্টরের ভেট চান না।

বাড়ি করার আগে সরিষ্টেখর পরিতোষকে নিয়ে এক সকালে শহরে এলেন। পরিতোষের ইচ্ছা সে নিজেই যিন্তি যোগাড় করে প্লানমাফিক বাড়ি বানাবে-সরিষ্টেখরের একেবারে গৃহপ্রবেশ করবেন। কিন্তু ছেলের কথায় তাঁর আজকাল খুব ভরসা নেই। শহরে সরিষ্টেখরের দেশের গৌয়ের একজন আছেন যাকে তিনি বন্ধুর মতো বিশ্বাস করেন-সেই সাধুচরণ হালদারের বাড়িতে পরিতোষ প্রথমটা আসতে চায়নি। কিন্তু সরিষ্টেখর যখন যেখানে যাবেনই পরিতোষকে বাধ্য হয়ে সঙ্গী হতে হল।

রায়কতপাড়ায় চুকতেই সাধুচরণের কাঠ-সিমেন্ট-মেশানো দোতলা বাড়ি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নদীয়া জেলার যেসব মানুষ পাকাপাকি বাস করছেন তাঁদের নাড়িনক্ষতি সাধুচরণের জন্ম। দেশের খবরাখবর এবং ছেলেমেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধের জন্য তাঁরা সাধুচরণের শরণাপন্ন হন। কদমতলায় ঊঁর বিরাট টেশনারি দোকান এককালে রমরম করত। স্যার আগতোষের মতো গোফ তখনও কুকুচে কালো, সরিষ্টেখর শহরে এলেই দোকানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতেন। তা এখন ব্যবস হয়েছে সাধুচরণের, দুই ছেলে দোকানে বসে। বাড়ি বসে বন্ধুকি কারবার করেন তিনি। সরিষ্টেখর জিজাসা করায় বলেছিলেন, কিছু-একটা নিয়ে থাকতে হবে তো!

পরিতোষের এ-বাড়িতে আসতেগ না চাওয়ার পেছনে যে-কারণটা সেটা সরিষ্টেখর জানেন। সাধুচরণের স্ত্রী এবং কন্যা উন্নাদ। স্ত্রী যতটা কন্যা তার ছিঁড়ণ। বিবন্ধ হয়ে যাতে না থাকে সেজন্যে পা অবধি খুল এবং তলায় বোতাম আঁটা একধরনের অর্ডারি সেমিজ মেয়েকে পরিয়ে রাখেন সাধুচরণ। মেয়েটি চিক্কার চ্যাচামেটি করে না, কামড়ায় না। শুধু অঙ্গভঙ্গি করে এবং শব্দ না করে হাসে। পরিতোষ এর আগে দেছেছে সাধুচরণ মেয়েটাকে বারান্দার এক কোণে চেয়ারে বসিয়ে তার খানিক তফাতে নিজে বসে অতিথির সঙ্গে কথা বলেন। সাধুকাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার চোখ মেয়েটার দিকে যেতে সে শিউরে উঠেছিল। অত কুস্থিত করে কোনো মেয়ে নিঃশব্দে হাসতে পারে সে জানত না। আর তার ঐ প্রতিক্রিয়া দেখে সাধুচরণ খুব মজা পাচ্ছেন-সেটা পরিতোষ বেশ টের পাচ্ছিল। বোধহয় মেয়েকে সামনে অতিথিদের নার্তের ওপর একটা প্রেশার সৃষ্টি করে অন্দরোক তাকে নিয়ে খেলা করেন। সেদিন সাধুচরণের স্ত্রী এসে তাকে চা দিয়েছিলেন। নিশ্চিত অন্দরহিলা সেদিন কিছু সুস্থ হিলেন। তবে তাঁর চোখমুখ অসম্ভব লাল দেখে ছিল। পরিতোষ তনেছে অন্দরহিলা মাঝে-মাঝে বক্ষ উন্নাদ হয়ে যান, তখন তাঁকে ঘরবন্দি করে রঁ খা হয়-আবার টপ করে সুস্থও হয়ে যান। পরিতোষ এও গুনেছ এক জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছে বিয়ে দিলে মেয়ের এই পাগলামি সেরে যাবে। কিন্তু সাধুচরণ নদীয়া জেলায় সে ধরনের সংক্ষান পাচ্ছেন না।

তবু সরিষ্পেখেরের সঙ্গে পরিতোষকে আসতেই হল। রিকশায় চড়া সরিষ্পেখের একদম পছন্দ করেন না। লাঠি-হাতে লম্বা শরীরটা নিয়ে যখন হলহন করে হেঁটে যান, তখন তাঁর সঙ্গে পাঁচা দেওয়া মূশকিল। তা ছাড়া বাবার সঙ্গে হাঁটতে পরিতোষের ভীষণ অস্তিত্ব হয়-ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ে এমনভাবে সে হাঁটে যেন সরিষ্পেখের তার কেউ না।

সাধুচরণ হালদার বাড়িতেই ছিলেন। সরিষ্পেখেরের গলা শুনে হাত জোড় করে হাসতে হাসতে অভ্যর্থনা জানালেন। চেয়ারে বসতে বসতে সরিষ্পেখেরের প্রথম কথা হল, ‘বসো হে সাধু, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আর হ্যাঁ, মেয়েটাকে আজ বাইরে আনার দরকার নেই।’

সাধুচরণ ঘাড় নাড়লেন, ‘না না, আপনারা নিষিদ্ধ বসুন, তাকে বাইরে আনার দরকার নেই।’

পরিতোষ বাবাদার একগাণে দাঁড়িয়ে ঝ কুঁচকালো। সরিষ্পেখের খানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন, আনতে হবে না কেন?’

‘আজ্জে, ডাঙ্গার বলেছে ও আর বেশিদিন বাঁচবে না। আজনাম শুনে এলাম পাগলরা দীর্ঘজীবি হয়-কিন্তু এ-মেয়ে নাকি বড়জোর মাসখানেক। কথা তো কোনোকালেই বলে না-এখন মুখে গ্যাজলা উঠছে, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। যাক বাবা, যত শীত্র যায় ততই মঙ্গল। কী বলেন?’

সরিষ্পেখের অন্যমনক গলায় বললেন, ‘তবু তো তোমার মেয়ে হে।’

মাথা নাড়লেন সাধুচরণ, ‘না,’ না। বাপ তো মেয়েকে সৎপাত্তে দান করতে পারলে বেঁচে যায়-তাই না? তা ওর ক্ষেত্রে মৃত্যু হল সৎপাত্তে দান। এ-ব্যাপারে আপনি বিদ্যুমাত্র চিন্তিত হবেন না। এখন বলুন আগমনের উদ্দেশ্যটা কী?’

সরিষ্পেখের বাড়ি বাবাদার কথা বললেন। ঘেরে তিনি শহরে থাকতে পারছেন না তাই সাধুবাবুর সাহায্য নিতে চান। ভালো রাজমিত্রি বোগাড় করে দেওয়া তো সাধুবাবুর কাছে কোনো সমস্যা নয়। ইট-ভাটার খবর দিলে গুরুর গাড়ি করে ইট আসবে-সিমেট্রের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর ঐ এলাহি কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে কি না দেখার জন্য পরিতোষ থাকল। সাধুকাকাকে দেখতে হবে পরিতোষ ঠিকমতো কাজকর্ম দেখাশোনা করছে কি-না। সরিষ্পেখের মাঝে-মাঝে এসে দেখে যাবেন।

সাধুচরণ চুপচাপ শুনলেন, তারপর বললেন, ‘আপনি এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, দুবেলা দেখা পাব-এ তো আমাদের সৌভাগ্য। সব ব্যবস্থা করে দেব। রহমত মিয়া আছে-শুব শুভী মিত্রি-ওর ওপর ভাব দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারেন। সেসব কিছুতেই আটকাবে না। আমি ভাবছি আপনার পুত্র আহারাদি করবে কোথায়?’

পরিতোষ চথকে উঠে কিছু বলতে চাইলে সরিষ্পেখের হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন, ‘কোনো হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিলেই হবে। কিং সাহেবের ঘাটে এখন তো অনেক পাইস-হোটেল হয়েছে।’

সাধুচরণ বললেন, ‘দুদিনেই পেটের বারোটা বেজে যাবে। তারচেয়ে ও আমার এখানেই থাকা-থাওয়া করে কাজকর্ম দেখতে পারে। আমার সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ হবে।’

কিন্তু পরিতোষ বাইরে বেরিয়ে এসে প্রায় বিদ্রোহ করে বসল। সাধুচরণের বাড়িতে সে মরে গেলেও থাকবে না। দু-দুটো পাগলকে দিনবারত দেখার মতো নার্ত তার নাকি নেই। সাধুচরণের বউকে ঘদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু মেয়েকে অসহ্য। তারচেয়ে সে নিজে হাত পুড়িয়ে ভাতে ভাত রেখে থাবে। বাবার দিক থেকে উলটো-মুখো হয়ে সে বলল, ‘আপনি এ-ব্যাপারে একটা চিন্তা করবেন না বাবা।’

সরিষ্পেখেরও সাধুচরণের কথাটা ভালো লাগেনি। হয়তো সে খোলায়নেই বলেছে। তবু একটা সোমথ মেয়ে রয়েছে বাড়িতে, হোক-না পাগল, সোমথ তো, সেখানে পরিতোষের মতো দুর্নামযুক্ত একটা ছেলেকে বাড়িতে রাখার প্রস্তাব-কেন যেন মনে সন্দেহ এনে দেয়। ঠিক হল, পরিতোষ নিজেই খাবার ব্যবস্থা করবে, টিলের ঘরটাকে বসবাসের উপযুক্ত করে দিয়ে শেলেন সরিষ্পেখের। রহমত মিশ্র কাজ করবে লোকজন নিয়ে-সরিষ্পেখের সংগ্রাহে একদিন এসে টাকাপয়সা দিয়ে যাবেন পুরুক্ত। কোনো সমস্যা দেখা দিলে পরিতোষ সাধুচরণের পরামর্শ নেবে। শুব ঠেকায় না পড়লে যেন টাকাপয়সা না নেয়।

তিত খোঢ়া হল। প্ল্যানমাফিক কাজ এগোতে লাগল। তিত-পঞ্জোটুজ্জোর ব্যাপার করবেন না

সরিষ্ণেখৰ। প্ৰথম দিকে তৰতৰ কৰে কাজ চলতে লাগল। সরিষ্ণেখৰ সন্তুষ্টি, ছেলেৰ পৰিবৰ্তন হয়েছে দেখে খুশি হলেন। সাধুচৰণও পৱিত্ৰোভেৰ প্ৰশংসা কৰেন। সারাদিন ঘোৱুৱে দাঁড়িয়ে থেকে মজুদৰেৰ কাজ কৰায়। ক্ৰমশ সরিষ্ণেখৰ ছেলেকে বিশ্বাস কৰতে লাগলেন। লোক মাৰফত টাকা পাঠান, চা-বাগানেৰ কাজ ফাঁকি দিয়ে ঘনঘন শহৰে আসা সম্ভব হয় না এয়তাবে কাজ টলছে পুৱো বাড়ি শেষ হতে মাস দুয়োক লাগাব কথা নয়। এখনও রিটায়াৱ কৰতে দেৱি আছে। তবে সরিষ্ণেখৰ ঠিক কৰলেন ভাড়াটাড়া দেবেন না।

এমন সময় সাধুচৰণেৰ একটা চিঠি পেলেন সরিষ্ণেখৰ। শনিবাৰ সকলোগাদ চলে আসুন, দিনমানে অবশ্যই নয়। আমাৰ গৃহে তো থাকবেন না তাই কুবি^১ৰোড়িং-এ আপনাৰ ব্যবস্থা কৰতে পাৰি। আসাৰ আপনাৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ আপনাৰ পুত্ৰৰ সঙ্গে আপনাৰ ভবিষ্যৎ একেত্ৰে জড়িত হয়ে পড়েছে।

মাথায় রক্ত উঠে গেল সরিষ্ণেখৰেৰ। অতীতৰ অনেক অপৰ্কৰ্মেৰ নায়ক নিজেৰ ছেলেকে তিনি জানেন। শনিবাৰ পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰলেন না। বিবেলেৰ ডাকে চিঠি পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে বলে একটা গাড়ি যোগাড় কৰে শহৰে রওনা হলেন। যাৰাৰ সময় মহীতোষকেও কিছু বললেন না। শহৰে এসে প্ৰথমে ভাৰলেন সাধুচৰণেৰ কাছে যাবেন কি না। তাৰপৰ ঠিক কৰলেন নিজেই ব্যাপারটা দেখবেন আগে। সাধুচৰণেৰ চিঠিৰ ভাষা খুবই সন্দেহজনক-সৱিষ্ণেখৰ একটা বিশ্বী গৰু পাছেন তাতে-আৰ তাই সাক্ষী রাখা বাঞ্ছীয়ি নয়।

সকলে হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। তিঙ্গা নদীৰ গায়ে যে মাটিৰ রাস্তা সেনপাড়াৰ দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে গাড়ি রেখে ছাইভাৰকে চুপচাপ বসে থাকতে বললেন। গাড়ি থেকে নেমে ওৱা বেয়াল হল উত্তেজনায় আসাৰাৰ সময় কাশীৰী লাঠিটা সঙ্গে আনতে ভুলে গেছেন। সামনে অনেকটা খোলা মাঠ অক্ষকাৰে ঢাকা-অনেক দূৰে ঢিলেৰ ঘৰেৰ সামনে হারিকেন জুলছে মিটমিট কৰে। কী মনে কৰে সরিষ্ণেখৰ গাড়িৰ হ্যান্ডেলটা লাঠিৰ মতো বাগিয়ে মাঠ ভাঙতে লাগলেন।

জালতাৰেৰ বেঢ়া দিয়ে সমস্ত জমিটা ঘিৰে রাখা হয়েছিল। এদিকটা দিয়ে বাড়িৰ মালমশলা আনবাৰ জন্য একটা ছোট টিনে গেট কৰা আছে। সরিষ্ণেখৰ গেট খুলে ভেতৱে ঢুকলেন।

ঢুকতেই তিনি বড় ছেলেৰ গলা শুনতে পেলেন। এলোমেলো গলায় সায়গলেৰ গান গাইছে। গানেৰ গলাটা তো বেশ ভালো! ছেলেৰ গান কোনোদিন শোনেননি তিনি। হঠাৎ মনে হল ওকে যদি গান শোখানো যেত, তা হলে নাম কৰতে পাৰত। কিন্তু গলাটা স্থিৰ থাকছে না কেন? কয়েক পা এগোতেই নতুন বাঁধাই কুয়োটাৰ পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি খোঝাৰ পৰ এই কুয়োটা হয়েছে। খাৰাবাৰ জল নয়-বাড়িৰ কাজে জল দৰকাৰ বলে এটা খোঢ়া। অগভীৰ। অস্কাৰ হালকা কৰে অনেক তাৰা উঠে এল আকাশটায়। সরিষ্ণেখৰ কুয়োৰ দিকে তাকাতে আবাক হলেন। বেশ কিছুটা নিচে অস্কাৰেও যেন কিছু চিকচিক কৰছে। জল নয় অবশ্যই। হাতেই লোহার হ্যান্ডেলটা নিচে নামিয়ে দিতেই ঠক্ক কৰে শব্দ হল। জোৱে চাপ দিতে মচ কৰে ভেতে গেল। সরিষ্ণেখৰ বুৰুলেন ওটা কাচ। এত কাচে কুয়ো ভৱিত হবে কেন? নাকি এ-কুয়োৰ জল পায় না বলে ওৱা অন্য কুয়ো খুঁড়েছে বোধহয় এটাতে আৰ্বজনা ফেলে আজকাল। কিন্তু এগুলো কিসেৰ বোতল?

কিছুক্ষণ বাদেই গান শৈষ হল। আৱ সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে সরিষ্ণেখৰ শুনলেন দুটি ঝৌৰি-কষ্টে থবল উল্লাসেৰ বড় উঠল। একটি কষ্ট মাতাল গলায় ‘তুমি মাইৰি ভালোই গাও, এসে তোমাৰ গলায় একটা চুম্ব খাই’ বলে খিলখিল কৰে উঠল।

সরিষ্ণেখৰ আৱ স্থিৰ থাকতে পাৱলেন না। দ্রুতপায়ে নিছু বাৰান্দায় উঠে এসে লোহার হ্যান্ডেল দিয়ে দৰজায় ঠেলা দিলেন। ভেজানো ছিল দৰজাটা, হাট কৰে খুলে শেল। দুটো ঘয়েৰ মধ্যে এটাই একটু বড়। ঘয়েৰ মধ্যিখানে একটা জলচৌকিৰ ওপৰ দুটো বড় মোটা মোমবাতি জুলছে। দৰজাটা খুলু বলে মোমবাতিৰ শিখা দুটো থৰথৰ কৰে কাঁপছে এখন। সরিষ্ণেখৰ দেখলেন পৱিত্ৰোষ একটা বালিশ পেটোৱে নিয়ে একটা কদাকাৰ মেয়েৰ কোলে মুখ রেখে শুয়ে আছে। মেয়েটি হাতেৰ গেলাস থেকে মাঝে-মাঝে নিজে নিছে আৱাৰ পৱিত্ৰোষকে মদ খাওয়াচ্ছে। আৱ-একটা বয়ক্ষা মোটা মেয়েছেলে পৱিত্ৰোষেৰ পায়েৰ কাছে বসে ওৱ গোড়ালি টিপছে।

দৰজাটা খুলে যেতেই বয়ক্ষা মেয়েছেলেটি প্ৰথম ওঁকে দেখতে পেল, তাৱপৰ গলা দুলিয়ে বলল, ‘কে এসে গো, লনুন নাগৱাৰ?’

সরিষ্ণেখৰ প্ৰথমে উত্তেজনায় কথা বলতে পাৱছিলেন না। থৰথৰ কৰে ওৱ দেহ কাঁপছিল। কোনোৱকমে সোজা হয়ে দাঢ়িয়ে গঞ্জে উঠলেন, ‘পৱিত্ৰোষ!’ বাবাৰ গলা শুনে নেশাঘণ্ট হওয়া সত্ৰেও পৱিত্ৰোষ তড়াক কৰে উঠে বসল। অঙ্ককাৰে মোমবাতিৰ আলোয় পুৰোটা দেখা যায় না, তাই দৱজায় দাঢ়ানো সরিষ্ণেকৰকে মোমবাতিৰ মাথা ডিয়ে অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া দেখল সে।

সরিষ্ণেখৰ তখন এক পা এগিয়েছেন, ‘হারামজাদা, বদমাশ, কুলাশাৰ’—কথা বলতে বলতে হাতেৰ হাজেলটা শূন্যে অক্ষয়লন কৰে সজোৱে পুত্ৰেৰ দিকে ঘোৱালেন তিনি। পলকে মোমবাতি দুটো শূন্যে উঠে নিবে গেল। পৱিত্ৰোষ যত্নগায় চিৎকাৰ কৰে উঠে দাঁড়াল। মেয়ে দুটো তাদেৱ বাৰ বিপদে পড়েছে দেখে হাউমাউ কৰে কেন্দ্ৰে প্ৰায় বিবৰণ অবহৃত্য এসে সরিষ্ণেখৰেৰ দুই পা জড়িয়ে ধৰল। সরিষ্ণেখৰ একটাকে লাখি মেৰে সরিয়ে দিলেও মোটা মেয়েছেলেটিকে পাৱলেন না। সে সামনে তাকিয়ে যাচ্ছে, ‘বাসুহেবে আৱ আসব না, মাইৰ বলছি, টাকা দিলেও রাজি হব না ভদ্ৰপৰপাড়ায় আসতে আমাদেৱ বেগুনটুলিই ভালো ছিলো গো-ও-ও।’

আৱ এই সুযোগে এক হাতে মাথাৰ একটা পাশ ধৰে ভীৱেৰ মতো দৱজা দিয়ে পৱিত্ৰোষ ছুটে বেৱিয়ে গেল। পা আটক থাকায় সরিষ্ণেখৰ পুত্ৰকে আৱ-একবাৰ চেষ্টা কৰেও বিফল হলেন।

মেয়েছেলে দুটোকে দূৰ কৰে দেৱাৰ সময় আবাৰ বামেলায় পড়তে হল। টাকা ছাড়া তাৰা থাবে না। জানতে পাৱলেন পৱিত্ৰোষ প্ৰায়ই তাদেৱ নিয়ে আসে, ফুৰ্তি কৰে, যাবাৰ সময় টাকা দেয়। চিৎকাৰ চ্যাচামোচি কৰে ওৱা সরিষ্ণেখৰেৰ কাছ থেকে টাকা আদায় কৰল। ভাগিস এখনও এদিক তেমন লোকবসতি হয়নি এবং সময়টা সক্ষা পেৱিয়ে শেছে তাই কেউ জানল না। সরিষ্ণেখৰ সবকটা দৱজায় তাঁলা লাগিয়ে পেছনে আসতে হৈ হয়ে গেলেন। এতদিনে তাঁৰ বাড়িৰ অৰ্দেকটা কাজ হয়ে যাবাৰ কথা। জানলা-দৱজায় ক্রেম লেগে যাবে উনেছিলেন। কিন্তু এই অস্পষ্ট অঙ্ককাৰে উনি দেখতে পেলেন ভিত-এৰ গাঁথুনিৰ পৰ আৱ এক ইঞ্জি দেওয়ালও ওঠেনি।

নিজেৰ সারাজীবনেৰ সঞ্চয়েৰ একটা অংশেৰ এই পৱিত্ৰণতি দেখতে দেখতে সরিষ্ণেখৰ শক্ত হয়ে দাঢ়ালেন। তাৰপৰ মাথা উঁচু কৰে অঙ্ককাৰে মাঠ ভেঙে গাড়িতে ফিৰে এলেন। একবাৰ ভাবলেন এখনই রায়কতপাড়ায় গিয়ে সাধুচৰণেৰ সঙ্গে দেখা কৰবেন। কেন তাঁকে এতদিন পৱ তিনি জানলেন পুত্ৰেৰ কথা? কেন সময় থাকতে সাবধান কৰে ব্যৱ দেননিং বক্ষ হিসেবে সরিষ্ণেখৰ তো সাধুচৰণেৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰতে চেয়েছিলেন! হঠাৎ তাঁৰ একটা কথা মনে পড়ে গেল। সাধুচৰণ অনেকদিন আগে তাঁকে একবাৰ বলেছিলেন, আপনাৰ এই পুত্ৰটিকে নিয়ে দুঃস্মাৱ দেখছি অবধি নৈই। আমাদেৱ জাতেৰ কেউ জেনেশনে ওকে কল্যা দেবে না। আমাৱও কল্যাটিকে নিয়ে ভাবনাৰ শেষ হয় না। এই দৃঢ়িকে একসঙ্গে জুটিয়ে দিলে কেমন হয়?’

সরিষ্ণেখৰ অবাক হয়ে বলেছিলেন, ‘কী যা-তা বলছ?’

সাধুচৰণ বলেছিলেন, ‘তা অবশ্য। আপনাৰ পুত্ৰ আগে বুৰ আসত, এখন আসতে চায় না।’

গাড়ি আৱ ঘোৱালেন না তিনি। সোজা কিং সাহেবেৰ ঘাটে চলে এলেন। তিন্তাৰ এই ঘাটটা এখন জমজমাট। অজন্ম বড়েৱ চালেৱ দোকান হয়েছে চা-খাবাৱেৰ। সক্ৰেৱ পৰ ঘাট বক্ষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, অনেক কষ্টে বেশি বকশিশেৰ লোভ দেখিয়ে সরিষ্ণেখৰ একটা জোড়া-নৌকো যোগাড় কৰে গাড়ি তুলেন তাতে।

সেদিন গভীৰ রাত্ৰে বাড়ি ফিৰে তিনি কিছুক্ষণ নিজেৰ খাটোৰ ওপৰ গুম হয়ে বসে রইলেন সবাই আন্দাজ কৰছে কিছু-একটা হয়েছে, কিন্তু কেউ আগবাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কৰতে সাহস পাচ্ছে না শেষ পৰ্যন্ত নিজেই ডাকলেন তিনি হেম, মহীতোষ আৱ প্ৰিয়তোষকৰে। ওৱা শুনলেন ওঁদেৱ বাবা ওঁদেৱ বড়দাদাকে আজ থেকে ত্যজ্যপুত্ৰ বলে ঘোষণা কৰলেন। খাটোৱ একপাশে দেওয়ালেৱ দিকে মুঁ ফিৰিয়ে ঘাপটি মেৰে শুয়ে-থাকা অনিমেষ কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল। দাদু আসাৰ পৰই ওৱা বুঁ ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু ও বুৱতে পেৱেছিল সেটা টোৱ পেতে দেওয়াটা বুক্ষিমানেৰ কাজ নয়। কিন্তু ত্যজ্যপুত্ৰ শব্দটাৰ মানে কী?

ৱহমত খিএৱাৰ হাতে বাড়ি হাতেৰ তৱতৱ কৰে উঠতে লাগল। ছাতি-মাথায় সরিষ্ণেখৰ সারাদিন যিন্তিদেৱ পেছনে লেগে রইলেন। ট্ৰাকে কৰে ইট-বালি আসছে। ভাৱা বেঁধে যিন্তিৱা কাঙ কৰছে। বাউভাৱিৰ মধ্যে একচো কৰে মজুৱৰা সেখানে আস্তাৰা কৰে নিয়েছে। সক্ৰেৱ সময় ইটেৰ উনুন জুলিয়ে ঝুঁটি সেঁকতে সেঁকতে রামলীলা গায় ওৱা তাৱনৰে। অনি ঘুৱে ঘুৱে দেখে সারাদিন

সরিষ্ণেখৰ ঠিক কৱেছেন সামনেৰ বছৰ ওকে জিলা স্কুলে ভৱতি কৱে দেবেন। যেহেতু এটা প্ৰায় বছৰেৰ শ্ৰেষ্ঠ, ভৱতি হওয়া চলবে না। ফলে অনিৰ আৰ বই নিয়ে বসতে হয় ছোট ছেলেমেয়েৰা লাইন কৱে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে গান গাইতে যাচ্ছে। জিলা স্কুলে ভৱতি হতে অনিকে যে, আৱৰ কথেক মাস অপেক্ষা কৱতে হবে! সরিষ্ণেখৰ ওকে খৰেৰেৰ কাগজ পড়া শেখাচ্ছেন। ৱোজ বিকেলে যখন কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে যায়, তখন প্ৰথম পাতা জুড়ে মহাআ গাৰ্কাৰি আৱ জওহৰলাল নেহৰুৰ ছবি দেখতে পায় অনি।

এখানে শোওয়াৰ ব্যবস্থা হয়েছে এইৱৰকম—বড় ঘৰটায় সরিষ্ণেখৰেৰ বিৱাট খাটটা পাতা আছে। দামি মেহগণি কাঠেৰ খাট। খাটেৰ গায়ে চৈনে-লণ্ঠন রাখাৰ একটা স্ট্যান্ড। অনি দাদুৰ সঙ্গে ঐ খাটে শোয়। সাৱদিন মিস্ট্ৰিদেৱ পিছনে খেটে সরিষ্ণেখৰ সঙ্গে পেৱলেই খাওয়াদাওয়া সেৱে অনিকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। অক্ষকাৰ ঘৰে দাদুৰ নাকডাকা শনতে শনতে অনিৰ কিছুতেই ঘূম আসে না। রাত হয়ে গেলে মজুৱৱাৰ আৱ গান গায় না, শুধু একলা একটা ঢেলক তালে তালে বেজে যায়। সেই বাজনা শনতে শনতে অনিৰ মায়েৰ কথা মনে পড়ে যায়। আৱ তখনই বুক কেমন কৱে ওৱ কান্না আসে। এখানে ওৱ একটাও বৃক্ষ নেই, সমৰবয়সি কোনো ছেলেৰ সঙ্গে ওৱ আলাপ নেই। পাশৰে ঘৰে শোন হেমলতা। ঘৰেৰ এক কোণে রামাৰ জিনিসপত্ৰ, অন্য কোণে ঠাকুৱেৰ আসন। এইভাৱে থাকা ওৱ কোনোদিন অভ্যোস নেই। প্ৰথম দিন ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন, ‘ওমা, এইৱৰকমভাৱে থাকব কী কৱে?’ সরিষ্ণেখৰ কোনো জ্বাৰ দেননি। তবে বাড়ি তৈৱি না হওয়া অবধি কষ্ট কৱতে হৈবেই-উপায় কী—এইৱৰকম একটা ভদ্ৰ তাৰ আচৰণে ছিল। কিন্তু হেমলতা চমৎকাৰ মানিয়ে লিলেন। এখানকাৰ সংসাৰ, তা যত কষ্টকৰ হোক তাৰ নিজেৰ। চিৱকাল ভাই-ভাই-বউদেৱ সঙ্গে খেকে এৱকম একটা মজা তিনি পাননি কোনোদিন। নিজেৰ সংসাৰ তো কোনোকালে কৰা হৈল না, বাবা আৱ ভাইপোকে নিয়ে নতুন সংসাৰে অভুতভাৱে মজে গেলেন হেমলতা।

খুব ভোৱে সরিষ্ণেখৰ অনিকে ঘূম থেকে তোলেন। এই সময় প্ৰায়ই ভোৱেৰ দিকে বৃষ্টি হয়। সরিষ্ণেখৰ তা গ্ৰাহ্য কৱেন না। বৃষ্টি হলে গামৰুট বা ছাতা নিয়ে দাদুৰ সঙ্গে অনিকে বেৰুতে হয়। দাদুৰও একই পোশাক। ঘূমে চোখেৰ পাতা এটো থাকে, জল ছিটিয়ে চোখ ধুয়ে বেৰুতে হয়। বেৰুবাৰ সময় সরিষ্ণেখৰ হেমলতাৰ ঘূম ভাঙিয়ে যান নইলে দৱজাৰ খোলা থাকবে যে! মাঠ পেৱিয়ে নাতিৰ হাত ধৰে হনহন কৱে তিনি তিণ্টাৰ পাৱে চলে আসেন। এখন তিণ্টা পোয়াতি মেয়েৰ লাবণ্যে টলটলে। বৃষ্টি না হলে অক্ষকাৰ পাতলা সৱেৰ মতো পৃথিবীময় জুড়ে থাকে। টুপটাপ তাৱাগুলো নিভছে। কখনো সাদা হাড়েৰ মতো চাঁদ আকাশেৰ এক কোণে ঝুলে থাকে। সাৱারাত বিশ্রাম পেয়ে পৃথিবীৰ বুকেৰ ভিতৰ থেকে উঠে—আসা নিশ্চাসেৰ মতো একৰাশ ঠাণ্ডা বাতাস নদীৰ জলে খেলা কৱতে কৱতে অনিদেৱ ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় মণ্ডলঘাটেৰ দিকে। নদীৰ বুকে অভুত এক অক্ষকাৰ লুকোচুৱি খেলা কৱে জলেৰ সঙ্গে। হাঁটতে শুৰু কৱেন সরিষ্ণেখৰ কাঁচা রাস্তা ধৰে। এক পাশে নদী, অন্য পাশে ঘূমত শহৰ। দাদুৰ দ্রুত পদক্ষেপেৰ সঙ্গে তাল রাখতে অনিকে হাঁপাতে হয়। চলাৰ সময় কোনো কথা বলেন না সরিষ্ণেখৰ। কিং সাহেবেৰ ঘাট ছাড়াবাৰ পৰ হঠাৎ পুৰেৰ আকাশটা রং বদলায়। অনি দেখেছে যে—মুহূৰ্তে ওৱা কিং সাহেবেৰ ঘাট পেৱিয়ে পিলখানাৰ রাস্তায় পা বাড়ায়, ঠিক তখনই অক্ষকাৰ মাটি থেকে হুশ কৱে উঠে গিয়ে গাছেৰ মাথায়—মাথায় জমে। আৱ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাৱাচৰ ঠাকুৱঘৰেৰ মতো পৰিব্ৰত হয়ে যায়। এমনকি মাটিৰ ওপৰ ধুলোগুলো কেমন শান্ত হয়ে এলিয়ে থাকে শিশিৰ মেৰে। অনি দ্যাখে নদীৰ গায়ে কোখাও অক্ষকাৰ নেই। অভুত সারল্য নিয়ে জলেৱা বয়ে যায়। দু-একটা তাৱা তুবে যাবাৰ আগে, যেন কেউ তাদেৱ কথা দিয়ে নিয়ে যায়নি এইৱৰকম আকসোস-ঘূৰখে চেয়ে থাকে তখনও। পুৰেৰ আকাশটায় হোলি খেলা শুৰু হয়ে যায় হঠাৎ। তখনই দাদু দাঁড়িয়ে পড়েন সৌদিকে হাতজোড় কৱে। সঙ্গে সঙ্গে শুৰু হয়ে যায় খোলা গলায় সূর্যপ্ৰাণম-ওঁ জবাকুসুমসকাশং ক্যাণ্যপ্যেং মহাদ্যুতিম। ধৰাতারিং সৰ্বপাপঃং প্ৰগতোহশি দিবাকৱৰম। কবিতাৰ সুৱে সুৱে অভুত এক মায়াময় জগৎ তৈৱি হয়ে যায় তখন, প্ৰতিটি শব্দ যেন সামনেৰ আকাশে অঞ্জলিৰ মতো রঙ হয়ে জড়িয়ে যায়। একসময় দিগন্তৱেৰাখাৰ যেখানে তিণ্টাৰ বুকে অসম্ভব লালচে রঞ্জেৰ আকাশ মুখ ডুবিয়েছে সেখানটা কাঁপতে থাকে ধৰণৰ কৱে। সেই কাঁপনি গায়ে মেখে টুক কৱে সূৰ্যটা উঠে সুন্দৰ সোনাৰ টিপটা থেকে বলক বলক আগুণ বেৱোতে থাকে তখন সরিষ্ণেখৰ বাড়িৰ পথ ধৰেন। অনিৰ তখন মনটা কেমন কৱে ওঠে। যে-কোনো ভালো জিনিস দেখলেই মায়েৰ কথা মনে পড়ে যায়। এই মুহূৰ্তে ওৱ দাদুকে খুব ভালো লাগে—ঘূম ভাঙিয়ে তোলাৰ জন্য কোনো আকসোস থাকে

বাড়ি ফিরে জল খেয়ে বাড়ির কাজে লেগে যান সরিষ্পেখর। সারাদিনের প্রতিটি মুহূর্তে মিহিদের চিন্তার আর বিভিন্ন রকমের শব্দে বাড়িটা ভরে থাকে। হেমলতা নিজের মনে সংসারের কাজ করে যান। এখানে এসে প্রথমে চাকরবাকর পাওয়া যায়নি। এখন চাকর রাখলেই যেন হেমলতার অসুবিধে হবে বেশি। কোনো কাজ নিজের হাতে না করলে তাঁর ব্যক্তি হয় না। বাবার খাওয়াদাওয়ার দিকে তাঁর কড়া নজর। ঠিক সময়ে শরবত পাঠিয়ে দেন অনির হাত দিয়ে পাথরের গ্লাসে করে। একদিন অন্তর সকালে বাজারে যান সরিষ্পেখর। অনি তখন সঙ্গী হয়। দাদুর সঙে যেতে-যেতে রাস্তা করতরকমের লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের বেশির ভাগই দাদুকে নমস্কার করে কথা বলে, নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। অনি বুবাতে পারে ইংরেজরা চলে যাওয়ায় আমাদের অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেছে। দাদুর বন্ধুদের কেউ বলেন, যারা ইংরেজদের চাকর ছিল সেই অফিসাররা কী করে দেশ শাসন করবে? আবার একজন বুড়ো বললেন, জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, এর চেয়ে ইংরেজ-আমল বরং ভালো ছিল। লোকটা কথা বলার সময় চারপাশে চোরের মতো তাকছিল। অনির ওকে ভালো লাগছিল না। এসব কথাবার্তার সবটা অনি বুবাতে পারছিল না। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল ও বড় হচ্ছে, একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

বাড়ির একদিকে চূড়ো করে বালি রাখা ছিল। খাওয়াদাওয়ার পর অনি একা একা সেখানটায় সুড়ঙ্গ-তৈরির খেলা খেলত। অনেকটা দূর উপরের বালি না ভেঙে গর্ত করে চৃপচাপ ভেতরে চুকে বসে থাকা যায়। এদিকটায় নতুন-তৈরি বাড়ির ছায়া পড়ে থাকায় বেশ ঠাণ্ডা। দরজা-জানালার ফ্রেম বসে গেছে। কয়েকদিন আগেই ঢালাই শেষ হয়ে গিয়েছে। ছাদ-পেটানের কাজ চলছে। বহমত মির্ঝা কম পয়সায় বেশি কাজ পাওয়া যায়। বলে একগাদা কামিন নিয়ে এসেছে। তারা সকালে দল বেঁধে আসে, সক্রে সময় দল বেঁধে চলে যায়। সরিষ্পেখর মজুরদের বাড়ির ভিতরের খোলা জ্বায়গায় অজস্র গাছপালা লাগিয়ে নিয়েছেন। তারা শিকড়ে জোর পেয়ে গেছে। অনি ভালোবাসে বলে তিনটে পেয়ারা এবং বাউগুরির ধার ঘেঁষে সার দিয়ে কলাগাছ লাগানো হয়েছে।

সেদিন দুপুরে অনি বালির পাহাড়ের তলায় সুড়ঙ্গ করে একদম ওপাশে প্রায় চলে এল। সারা গায়ে বালি মেঝে অনি বেরতে যাচ্ছে হঠাৎ চাপা গলা শুনতে পেল। ওর মনে হল কোনো কারণে দাদু আজ এদিকটায় চলে এসেছেন। আজ এই বালিমাখা অবস্থায় তিনি যদি অনিকে দেখেন, তাহলে নির্যাত শান্তি পেতে হবে। এর আগে বালি নষ্ট করার জন্যে ওকে ধর্মক খেতে হয়েছে। চোরের মতো উলটোদিকে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরতে যেতে অনি আবার গলাটা শুনতে পেল। না, এ-গলা তো দাদুর নয়। হিন্দিতে কথা বলছে। ছেলেটা কী যেন বলছে খুব চাপা গলায়, আর মেয়েটা না না বলছে সমানে। অনি ফিরল না আর। ওরা কারো দেখার কোতৃহলে ও এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। একদম শেষপ্রাণে শুহার মুখটা বড় হয়নি, একটা বড় ছিঁড় হয়ে রয়েছে, অনি সেখানে চোখ রাখল। ও দেখতে পেল একটা মাঘবয়সী মজুর, যার দাড়ি আছে অনেকটা আর রাত্রে রামলীলা গায়, নতুন-আসা একটা লম্বা কামিনের হাত ধরে কথা বলছে। কামিনটা বারবার ঘাড় নাড়েছে আর তয়-তয় চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ দেখে ফেল কি না। কিন্তু মজুরটা যেন কোনো কথা শুনতে রাজি নয়। হঠাৎ সে দুহাতে কামিনটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে চাপতে লাগল। কামিনটা প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে দুমায় মজুরটাকে বুকে ঘৃষি মারতে লাগল। মজুরটা তীব্র অন্যায় করছে এটা বুবাতে পারছিল অনি। ওর মনে হল কামিনটাকে বাঁচানো দরকার। চিন্তার করবে কি না অনি যখন ভাবছে, ঠিক তখনই মজুরটা কামিনটাকে টপ করে চুম খেয়ে ফেলল। অনি অবাক হয়ে দেখল চুম খেতেই কামিনটা কেমন হয়ে গেল। হাত-পা ছড়াছে না, প্রতিবাদ করছে না, বরং দুহাতে মজুরটাকে জড়িয়ে ধরেছে ও। আর মজুরটা ওর সমস্ত শরীরে আদর করার মতো করে হাত বেলাতে লাগল। এখন চিন্তার করার কোনো মানে হয় না, কারণ মেয়েটা তো সাহায্য চাইছে না-এটুকু অনি বুবাতে পারল। একসময় লোকটা কামিনের ওপরের কালো জামাটা খুলে ফেলল। অনি কামিনটার পিঠ দেখতে পাচ্ছে। কালো শরীরের ওপর একটা ফ্যাকাশে সাদা দাগ। অনেকদিন চাপা-পড়ে-থাকা ঘাসের রঙ। মজুরটার এখন সব আগ্রহ কামিনের বুকের ওপরে-যেটা অনির দিক থেকে আড়ল করা। হঠাৎ কার গলা ভেসে সাড়া দিতে দৌড়ে চলে গেল কামিনটাকে কী যেন বলে। মাটিতে পড়ে থাকা জামাটা দ্রুত তুলে নিয়ে এপাশে ফিরে হাঁট গেড়ে বসে সে পরতে লাগল। অনি দেখল মেয়েটির তামাটে রঞ্জের বড় বড় বুকের ওপর লালচে লালচে দাতের দাগ। এভাবে কোনেদিন এইরকম বুক দেখেনি অনি। মেয়েটি

জামা পরতে পরতে কী মমতায় একবার দাগগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিল। তারপর অনির পাশে বালির ওপর পিচ করে ধূতু ফেলে হেলতে দুলতে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাবার পর অসাড় হয়ে অনি শয়ে থাকল বালির ভেতর। ওর মাথা ঘুরছিল এবং বুবাতে পারছিল ওয়া খুব খারাপ কিছু করছিল যেটা সবার সামনে করা যায় না। মেয়েটা তা হলে প্রথমে অত ছফ্ট করছিল কেন? কেন লোকটাকে ঘুসি মারছিল? আবার পরে লোকটা যখন ওর বুকে অমন দাঁত বসিয়ে দিল তখন ও কেন যন্ত্রণা পায়নি? কেন তখনও ও মজুরটাকে আদর করছিল? হঠাৎ ওর মালবাবুর ছোট মেয়ে সীতার কথা মনে পড়ে গেল। সীতাও ওর চেয়ে এক বছরের ছোট। বাড়ি থেকে খুব কম বের হয়। কিন্তু ওর হাত একটু শক্ত করে ধরলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। সীতাও কি বুকে ওরকম করে কামড়ে দিলে কাঁদবে না? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল সীতার বুক তো ওদের মতোই একদম সমান। তা হলে বড় হলে সীতার বুক নিচ্ছয়ই এই কামিনিটার মতো হয়ে যাবে। আর বুক বড় হলে মেয়েটার নিচ্ছয়ই যথা লাগে না। সমস্যাটার এইরকম একটা সমাধান করতে পেরে অনির অন্যমনশ্ক হয়ে পড়তেই চাপ লেগে বালির দেওয়াল ধরে পড়ল। অনি দেখল ওপরের বালি হড়ুড়িয়ে তাকে ঢাপা দিতে আসছে। কোলোরকমে টেনে-হিচড়ে ও বাইরের খেলা হাওয়ার বেরিয়ে এল।

বাড়ি শেষ হয়ে গেলে হেমলতার চাপে সরিষ্পেখর ঘটা করে গৃহপ্রবেশের ব্যবহা করলেন। বকবাকে তকতকে বাড়ির দিকে তাকালে তাঁর দেখ জড়িয়ে যায়। নতুন রঙ আর সিমেটের গুৰু নাক ভরে নেন তিনি। সাধুচরণের সঙ্গে এখানকার কালীবাড়ির পুরোহিতদের খুব ভাব আছে। তিনি সরিষ্পেখরকে কলকাতার কাছে হালিশহরে এক তাঙ্গিরের খবর দিলেন, যিনি নাকি সিঙ্গ পুরুষ। অনেক চেষ্টাচরিত করে তাঁকে আনানোর ব্যবহা হল। বর্ণহেঁড়া থেকে সবাই এসে হাজির। এখানে আসার পর অনি একদিনও বর্ণহেঁড়ার যায়নি। সরিষ্পেখর পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মহীতোষ জানিয়েছিলেন এত ঘনঘন এসে শহরে মন বসবে না। মাধুরী আসার পর হেমলতা বললেন, ‘দ্যাখ, তোর ছেলে কত রোগা হয়ে গেছে!’

মাধুরী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, ‘রোগা কোথায়, ও দেখছি বেশ লম্বা হয়েছে!’

হেমলতা বললেন, ‘হবে না কেন? এ-বংশের ধারাই তো লসাটে।’

একসময় একটু একলা পেয়ে মাধুরী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হ্যাঁ সে, আমার জন্যে তোর মন-কেমন করে না?’ আর সঙ্গে সঙ্গে অনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

সেই কান্না শব্দে বাড়ির সবাই ছুটে এসে দেখল অনি-মাধুরীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মাধুরী ছেলেকে যত ধারাতে চান কান্না তত বেড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হেমলতা বললেন, ‘না ভাই, এতদিন পর দেখা হল আর তুমি ওকে বকাবকি করছ-এটা উচিত হয়নি।’

এমনকি সরিষ্পেখর অবদি যেতে-যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, ‘না বৌমা, তুমি বড় ছেলেকে শাসন কর।’ মাধুরী লজ্জায় মরে যান। ছেলে যে এভাবে কেঁদে উঠে বুবাতে পারেননি তিনি।

তোড়জোড় চলতে লাগল গৃহপ্রবেশের। কাল মঙ্গলবার, সব মিলিয়ে দিন ভালো। আজীয়াস্বজন তো আছেনই, সরিষ্পেখর শহরের সমস্ত বস্তুদের নিমজ্জন করেছেন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, টিপ্পটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। কে যেন এসে বলে গেল তিঁরার জল বেড়েছে। তোরে বেড়াতে যাবার সময় সরিষ্পেখর তেমন কিছু লক্ষ করেননি। উঠোনে ভিয়েন বসেছে। কাল দুপুরে খাওয়াদাওয়া হলেও আজ থেকে যেয়েদের রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে না। সঙ্গের টেনে হালিশহরের সিঙ্গ পুরুষ একজন শিশ্যসম্মেত এসে গেলেন। সরিষ্পেখর মহীতোষকে নিয়ে টেশনে গিয়েছিলেন তাঁকে আনতে। কিন্তু তিনি সোজা গিয়ে কালীবাড়িতে উঠলেন। ঠিক হল প্রদিন তোরে পুরোচিত মশাই-এর সঙ্গে উনি চলে আসবেন। খাওয়াদাওয়া সারতে রাত হয়ে গেল। ঠিক হল টিনের চালায় মেঘেরা বাক্সাদের নিয়ে শোবেন। যেহেতু গৃহপ্রবেশ এখনও হয়নি তাই ঘৰে নয়, নতুন বাড়ির ঢাকা পুরের শতরঞ্জি বিছিয়ে ছেলেদের শোওয়ার ব্যবহা হল। শোওয়ার আগে ক্যাল্পখাট গেতে সান্দেশের একবার অনির থোঁজ করতে হেমলতা বললেন, ‘ও মায়ের সঙ্গে শোবে।’

বড় ঘর থেকে খাটটা সরানো গেল না। তাই মেয়েরা মাটিতে ঢালা ও বিছানা পেতে শুলেন। খাটের ওপর মাধুরী আর অনি। মাধুরী নিচেই শুতে চেয়েছিলেন, হেমলতা বকাবকি করাতে রাজ হতে হল।

মায়ের কাছে এতদিন বাদে শুয়ে অনির কিছুতেই ঘৃণ আসছিল না। মায়ের গুরু মায়ের নরম হাত ওকে কেমন আবিষ্ট করে রেখেছিল। মাধুরী একসময় চাপা গলায় বললেন, ‘তুই সকালে অমন বোকার মতো কাঁদলি কেন? সবাই আমাকে বকল!’ ০

অঙ্কার ঘরে মায়ের বুকের কাছে শুধু রেখে অনি বলল, ‘তুমি আমাকে বললে কেন? তুমি জান না বুঝি?’ মাধুরী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের বুকের ওপর গাল রাখতে গিয়ে অনির চট করে সেই কামিন্টার কথা মনে পড়ে গেল। ও বলল, ‘মা, তোমার বুকে যদি আমি কামড়ে দাগ করে দিই তা হলে তোমার লাগবে না।’

চাপা গলায় ছেলের প্রশ্নটা শুনে মাধুরী হকচিকিয়ে গেলেন। অনি যে এ-ধনের প্রশ্ন করবে ভাবতেই পারেননি। কোনোরকমে বললেন, ‘মানে?’

অনি বলল, ‘জান, এখানে না একটা কামিনের বুকে একটা কুলি অনেক দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু কামিনটা একদম কাঁদেনি। বড় বুকে কামডালে লাগে না, না।’

উদ্যেজনায় মাধুরী উঠে বসতে যাচ্ছিলেন, কোনোরকমে কৌতুহল চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুই কী করে জানলি?’

তখন অনি পুঁটেরপুঁটুর করে মাকে সব কথা বলল, এমনকি সীতার কথাটাও। মাধুরী কী করবেন প্রশ্নটা বুঝতে পারছিলেন না। বাপারটা খারাপ বললে ছেলের যদি কৌতুহল বেড়ে যায়! শেষ পর্যন্ত মাধুরী বললেন, ‘ওরা ভীষণ অন্যায় করেছে তাই লুকিয়েছিল। তুমি ওসব আর দেখো না। ওসব দেখলেও পাপ হয়, ভগবান রাগ করেন।’

অনি বলল, ‘আমার তা হলে পাপ হয়েছে?’

মাধুরী ছেলের মাথায় হাত রাখলেন, ‘না না, মায়ের কাছে সব কথা খুলে বললে কোনো পাপ আর থাকে না। তুমি চিরকাল আমাকে সব কথা খুলে বোলো অনি।’

মাধুরীর খেয়াল হল তাঁর পেটে আর-একটি স্তুতি এসে গেছে। এই অবস্থায় টানটান হয়ে শোওয়া উচিত নয়। মাধুরী হাঁটু দুটো পেটের কাছে নিয়ে এসে পাশ ফিরে প্লেন।

সিঙ্গুরুর তাঙ্কিকের নাম শনিবাবা। বিশাল তাঁর চেহারা, যেমন ভুঁড়ি তেমনি লব। লাল কাপড় পরে খড়ম-পায়ে রিকশা থেকে যখন নামলেন তখন অনির ভয়ে চোখ বুঝ হবার যোগাড়। পিসিমা আগে গল্প করেছিলেন, তাঙ্কিকেরা নাকি ইচ্ছে করলে যা-খুশি করতে পারে। শনিবাবাকে দেখলেই বুক হিম হয়ে যায়, সামনে যাবে কী!

পূজোয় বসার আগে শনিবাবা একবার নতুন বাড়ির চারপাশে পাক দিয়ে এলেন। যে-ঘরটা ঠাকুরঘর হবে বলে হেমলতা ঠিক করেছিলেন সেখানেই পূজোর আসন পাতা হয়েছে। আসনে বসে অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থাকলেন শনিবাবা। ওঁর সামনে কোনো মৃত্তি নেই। শুধু চারটে মোটা চন্দনকাটের টুকরো ছড়ানো বালির ওপর সাজানো রয়েছে। শনিবাবার অনেকটা পিছনে ঘরের মধ্যে সরিষ্ঠেখের হাঁটু পেড়ে বসে, তাঁর পেছনে পুরোহিতমশাই, মহীতোষ এবং সাধুচরণ বসে আছেন। প্রিয়তোষ রান্নাবান্নার দিকটা তাদারক করছে। মেঘেরা ভিড় করে দরজায় দাঁড়িয়ে, ভেতরে চুক্তে সাহস পাছে না কেউ। ওঁদের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামান্য ফাঁক দিয়ে অনি শনিবাবার পিট্টা দেখতে পাচ্ছে। হেমলতা মাধুরীকে বলেছেন অনিকে যেন শনিবাবার সামনে খুব একটা যেতে না দেওয়া হয়। কারণ তাঙ্কিক-মানুষকে বিশ্বাস নেই, ছেট ছেলেমেয়ের প্রতি ওঁদের নাকি আগ্রহ থাকে। শোনার পর থেকে মাধুরী ছেলেকে আগলে-আগলে রাখছেন।

হঠাৎ শনিবাবা টানটান হয়ে বসলেন। তারপর চোখ খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই বাজখাই গলায় তিনি ডাকলেন, সরিষ্ঠেখৰুৱা!

সরিষ্ঠেখৰ চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

শনিবাবা বললেন, ‘এত অমঙ্গলের ছায়া কেন? এত শক্ত কেন তোমার?’

উন্নের সরিষ্ঠেখৰ কোনোরকমে বললেন, ‘সে কী?’

শনিবাবা বললেন, ‘এর মধ্যেই ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। এভাবে চললে খুব শীত্র তোমার অসহানি হবে। আমি বাড়িতে চুক্তেই অনুভব করেছিলাম কেউ-একজন খুশি হল না।’

সরিষ্ঠেখৰ হাতজোড় করে বললেন, ‘আমি তো জেনেওনে কোনো অন্যায় করিনি বাবা-আপনি

দেখুন।'

শনিবাবা বললেন, 'এই বাড়ি বাঁধতে হবে। তোমরা একটা কুলোয় চারটে প্রদীপ, চার পাত্র দুধ, গরটে ফল আর চারটে জবাল তুলসীপাতার ব্যবস্থা করো এঙ্কুনি!' কথা শেষ হওয়ামাত্র সরিষ্ঠেখর রাজায় দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ছড়মুড় করে মেয়েরা ছটুল জিনিসগুলোর যবস্থা করতে। মোটামুটি সবই পুজোর ব্যাপারে আনা ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সরিষ্ঠেখর মূলোটাকে শনিবাবার সামনে ধরলেন। সেনিকে একবার চোখ বুলিয়ে শনিবাবা মাটিতে রাখা তাঁর নাল বুলিটা থেকে একটা কাঠোর বাঁক বের করলেন। কাঠোর বাঁকের ডালাটা সন্তর্পণে খুলতে সরিষ্ঠেখর দেখতে পেলেন তাঁর মধ্যে দুইঘিঁটাকে লাঘা চারটে ফণাতোলা গোখরে সাপ রয়েছে। কুকুচে কালো ইস্পাতের তৈরি সাপগুলোর ফণার ডগা খুব ছুঁচলো। চট করে জ্যান্ত বলে ভুল হয়। শনিবাবা সেগুলো বের করে কুলোর উপর রাখলেন। তারপর বললেন, 'এরা তোমার বাড়ি রক্ষা করবে। এই কুলোটাকে মাথার ওপর নিয়ে তুমি বাইরে চলো। এদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

সম্মোহিতের মতো সরিষ্ঠেখর কুলো মাথায় তুলে নিলেন। মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দরজা ছেড়ে দিল। মাধুরী ছেলেকে আড়াল করে সবে দাঁড়ালেন। প্রথমে শনিবাবা, তাঁর পেছনে কুলো-মাথায় সরিষ্ঠেখর, পুরোহিত মশাই, মহীতোষ, সাধুচৱণ লাইন দিয়ে ঘর থেকে বেরকুলেন। যেতে-যেতে শনিবাবা বললেন, 'একটা কোদাল আনতে বলো কাউকে!' কথাটা শুনে দূরে দাঁড়ানো প্রিয়তোষ একচুটে কোদাল নিয়ে এল।

শনিবাবা প্রথমে শেলেন বাড়িটার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। তারপর কী ভেবে বাগান পেরিয়ে একদম বাড়ভারির কোণায় চলে এসে ইঙ্গিতে প্রিয়তোষকে মাটি খুড়তে বললেন। প্রিয়তোষ যখন অনেকটা গর্ত করে ফেলেছে তখন তিনি গজীর গলায় 'মা' বলে ডেকে উঠে সরিষ্ঠেখরের কুলো থেকে প্রথমে একটা সাপকে স্থানে গর্তের গুর্বে ভেতর বসিয়ে দিলেন। তারপর নৈবেদ্যের মতো প্রদীপ, ফল, ঝুল একটা করে তাঁর সামনে সাজিয়ে তিনি নিজের হাতে মাটিচাপা দিতে লাগলেন। মাটি সমান হয়ে গেলে বললেন, 'সাত দিন যেন কেউ এখানে পা না দেয়। যে দেবে তার মৃত্যু অনিবার্য।'

একে একে বাড়ির আর তিনটে কোণে সাপ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেলে হঠাত হাওয়া উঠল বেশ। গাছের ডালপালাগুলো শব্দ করে দূরতে লাগল। শনিবাবা একবার আকাশের দিকে মুখ করে কিছু দেখলেন, তারপর সরিষ্ঠেখরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেঁচে গেলি।'

পুজো শুরু হতে নিমজ্ঞিতদের আসা শুরু হয়ে গেল। সরিষ্ঠেখরের নির্দেশে পুজো শেষ না হলে খাওয়াদাওয়া হবে না। বৃষ্টি আসতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে, তাই ঢাকা লম্বা বারান্দায় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পুজো করতে করতে শনিবাবা অস্তুত রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। মাঝে-মাঝে অদৃশ্য কাউকে ধমক দিছেন, হাসছেন, আর ছেলেমানুষদের মতো অভিমান করছেন। শেষে চন্দনকাঠে আগুন জ্বালালেন তিনি। পুড়েছে কাঠ, অস্তুত সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়া বেরেছে তা থেকে। হঠাত ঝুলি থেকে কিছু-একটা বের করে তাতে ছড়লেন শনিবাবা। সঙ্গে সঙ্গে দাউডাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। শনিবাবা সরিষ্ঠেখরকে বললেন, 'এবার অগ্নি আমায় আকর্ষণ করবে। তোমার আমাকে ধরে রাখবে।' কথাটা বলে শনিবাবা উঠে দাঁড়িয়ে সেই বস্তুটি আরও ঐ আগুনে ছড়িয়ে দিয়ে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে লাগলেন।। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা বাড়তে লাগল। ক্রমশ তা বিশাল আকার ধারণ করে শনিবাবার মাথা ছাঁড়িয়ে উঠে গোল। আর তখনই শনিবাবার সমস্ত শরীর থরথর করে কঁপতে লাগল। খুব আলতো করে সরিষ্ঠেখর শনিবাবাকে শ্রেণি করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাত মনে হল শনিবাবাকে কে যেন সামনের দিকে টানছে প্রচণ্ড জোরে। একসময় তিনি নিজে যেন আর শনিবাবাকে ধরে রাখতে পারবেন না বলে মনে হল। ওর অবস্থা দেখে পুরোহিত মশাই উঠে এসে হাত লাগালেন। শনিবাবা তখন অনর্গল সংস্কৃত শব্দসংযোগে মাকে ডেকে যাচ্ছেন। ওর শরীরের উভাপে যেন সরিষ্ঠেখরের হাত পুড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কেউ যেন পলতে কমানোর মতো আগুনটাকে কমিয়ে দিতে শনিবাবার কাঁপুনিটা থেমে গেল। শনিবাবার কাঁপুনিটা যে ইচ্ছাকৃত নয় এটুকু বুঝতে পারছিলেন সরিষ্ঠেখর। কেবলো মানুষকে ধরে রাখলে সেটা বোকা যায়।

পুজো শেষ হয়ে গেলে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন সরিষ্ঠেখর। অঙ্গহানি কেন হচ্ছিল তাঁর? অঙ্গহানি বলতে উনি কী বোঝালেন? শারীরিক কোনো আঘাত, না কি কোনো প্রিয়জনকে হারানো! আজীবন ঘ-বাগানের চাকরিতে থেকে ধর্মকর্ম কোনোদিন করেননি তিনি-জ্যোতিষচর্চা অথবা

এ-ধরনের ভবিষ্যৎ-বক্তাদের প্রতি তাঁর বিদ্যুমাত্র আঙ্গা নেই। এখন তাঁর যে-বয়েস সেখানে এলে বেশির ভাগ ভাঙ্গালিরা দীক্ষা নেয়। সরিষ্ঠেখরের চিঞ্চা তাঁর ধার দিয়েও যায় না। এমনকি হেমলতা যখন সেই কুড়ি-বাইশ বছরে তাঁর কাছে এসে বলল যে সে দীক্ষা নিতে চায়—জীবন অঙ্গিতে পড়েছিলেন তিনি। বাজিবাদিবা যেয়েকে পুনর্বিবাহ দেবার মতো পরিবেশ চা-বাগানে ছিল না। হেমলতা সেটাকে পাপ বলে মনে করত। ফলে অনুমতি দেওয়া ছাড়া গতাত্ত্বর ছিল না। কিন্তু দীক্ষা নিয়ে হেমলতার কী হয়েছে! মাঝে-মাঝে জয়গুর বলা ছাড়া তিনি আর কোনো পরিবর্তন দেখতে পাননি।

শনিবাবাকে দেখে তাঁর প্রথমে তক্তি জাগেনি। কিন্তু ক্রমশ এই অনুভব তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে যে লোকটি তাঁর চাহিতে আলাদা জাতের। মানুষের শুর বলে যদি কিছু থাকে, শনিবাবা সেদিক দিয়ে তাঁর চেয়ে এগিয়ে আছেন। হোমের সময় তিনি শনিবাবাকে স্পর্শ করে বিদ্যুতের স্বাদ পেয়েছেন। সরিষ্ঠেখরের মনে তাজিকদের সম্পর্কে একটা প্রচল্ল মোহ কোথাও লকিয়ে ছিল, শনিবাবাকে দেখে সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অথচ শনিবাবাকে আলাদা করে প্রশ্ন করে তিনি উভর পেলেন না অঙ্গহনি বলতে কী বোঝাচ্ছেন। এমনকি পূজাজাচ্ছা শেষ হয়ে গেলে শনিবাবা যখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নিচ্ছেন মাটিতে গড়িয়ে তখনও তিনি নিরসন্তর থাকলেন।

শনিবাবা এখানে রাত্রিবাস করবেন না। সঙ্গের ট্রেইনেই ফিরে যাবেন। বাইরে মহীতোষ পরিতোষ খাওয়াদাওয়ার তদারিক করছে। সাধুচরণকে অন্যান্য বয়ক লোকের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শনিবাবা শুধু এক গ্লাস দুধ আর মিষ্টি খেয়ে ঠাকুরঘরের মাটিতে চিত হয়ে দুয়ে আছেন। তাঁর শিষ্যটি পায়ের কাছে বসে পদস্বের করছে। পুরোহিত মশাই একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছেন তাঁকে। পাশে বসে সরিষ্ঠেখর খুব ন্যৰ গলায় আবার প্রশ্নটি তুললেন। শনিবাবা হঠাৎ মুখ পুরিয়ে তাঁর দিকে বিশাল লাল চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। সে-দ্বিতীয় সামনে সরিষ্ঠেখরের খুব অঙ্গিত হতে লাগল। হঠাৎ শনিবাবা বললেন, ‘এই পৃথিবীতে তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন কে সরিষ্ঠেখর?’

খুব ধীরে নিজের অঙ্গাতেই সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘প্রিয়জন!’

‘হ্যা। যাকে তুমি নিজের পরেই ভালোবাস!’

‘আমার—’ সরিষ্ঠেখর কথাটা শেষ করতে পারলে না।

‘তাকে আমার সামনে নিয়ে এসো।’

সরিষ্ঠেখর বাইরে এলেন। ইইহই করে খাওয়াদাওয়া চলছে। প্রিয়তোষ খাবারের ঝুড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল। মহীতোষ পরিবেশন তদারিক করছে। মেয়েদের দিকে হেমলতা আর মাধুরী ঘোরাঘুরি করছে। ছেলে-মেয়ে-বউমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি-এরা সবাই তাঁর প্রিয়জন। এই মুহূর্ত বড় ছেলে পরিতোষের কথা তাঁর মনে পড়ল-অঙ্গহনি তো হয়েই গেছে। হঠাৎ দেখলেন পেয়ারাগাছটার তলায় অনি একা দাঁড়িয়ে, গাছের ডালের দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে। ধীরপায়ে নেমে এলেন তিনি। দানুকে দেখে অনি হাসল। নাতির কাঁধে হাত রাখলেন সরিষ্ঠেখর, ‘কী করছ দানুঁ?’

‘একটা নীলরঙের পাখি এই মাত্রই উড়ে গেল।’ অনির মুখ উজ্জ্বল।

‘খেয়েছ?’

‘ত্য়া।’

‘আমার সঙ্গে এসো। বাবা তোমাকে ডাকছেন।’ সরিষ্ঠেখর নাতিকে নিয়ে ঘরমুখো হলেন। কথাটা শনেই অনি আড়েট হয়ে পেল। হেমলতার কথা সে শনেছে। শনিবাবার কাছে নিয়ে যাছে দানু অংশ পিসিয়া। বারণ করেছেন। শনিবাবাকে দেখলেই তাঁর ভয় লাগে। বুক টিপ্পটিপ করতে লাগল। তাঁর সরিষ্ঠেখর নাতির অবস্থাটা বুঝতে পেরে বললেন, ‘ভয় কী। উনিও তো মানুষ, তোমার কোনো শক্তি করবেন না। আর আমি তো আছি।’

দানুর শরীরের সঙ্গে লেপটে অনি হাঁটতে লাগল। দৃশ্যটা প্রথমে মাধুরীর নজরে পড়ল। তিনি কয়েক পা এগিয়ে হেমলতাকে বললেন। ওরা সবাই অবাক হয়ে দেখলেন অনিকে নিয়ে পুজোর ঘরে ঢুকে সরিষ্ঠেখর দরজার ভেজিয়ে দিলেন ভেতর থেকে।

কাচের জানলা ভেতর থেকে বক্ষ, দরজা ভেজানো, ফলে ঘরটার আলো-কম, কেমন অস্পষ্ট লাগল অনির। কিন্তু শনিবাবাকে ও স্পষ্ট দেখতে পেল। চিত হয়ে দুয়ে আছেন। বিশাল ঝুঁড়ি নিষ্ঠাসেন

তালে তালে দুলছে। গলার কন্দাকের মালা একপাশে নেতিয়ে পড়েছে। ওর সেই শিশ্য পা টিপে যাচ্ছে, পুরোহিত মশাই পাখা-হাতে মাথার কাছে বসে ওদের দিকে তাকালেন। অনি দেখল শনিবার চোখ বোজা। ওরা যে ঘরে চুকল ঘেল টেরই পেলেন না।

সরিষ্ঠের নাতিকে পাশে নিয়ে মাটিতে বসলেন। অনি অবাক হয়ে দেখল দানুর মুখটা কেমন পালটে যাচ্ছে। বাড়িকানু ধ্বনি কোনো অন্যায় করে দানুর সামনে দাঁড়াত তখন এরকম মূখ করত। শনিবাবাৰ শৰীৰ থেকে মাত্ৰ হাত তিনেক দূৰে বসে ওৱ ভয়-ভয় ভাবটা হঠাতে চলে গেল। বৰং শনিবাবাৰ শৰীৰেৰ ঘঠনামা দেখতে দেখতে ওৱ বেশ মজা লাগছিল এখন। সরিষ্ঠের বললেন, ‘ওকে এনেছি! ’

শনিবাবা চোখ ঝুললেন, ‘এনেছ! তোমার প্রিয়জন তা হলে এইকে কে হয় তোমার?’

সরিষ্ঠের বললেন, ‘আমাৰ নাতি।’

শনিবাবা বললেন, ‘আৱ নাতি আছে?’

সরিষ্ঠের উত্তৰ দিলেন, ‘না। এ আমাৰ বিজীয় পুত্ৰেৰ একমাত্ৰ সঙ্গান। প্ৰথম পুত্ৰ বিবাহ কৰেনি এবং আমাৰ সঙ্গে সম্পর্ক নেই।’

ওয়ে ওয়ে শনিবাবা হাত নেড়ে অনিকে ডাকলেন, ‘এদিকে এসো।’

ডাকেৰ মধ্যে এমন একটা সহজ ভাব ছিল যে অনিৰ একটুও ভয় লাগল না। ও বছন্দে উঠে এসে কাছে দাঁড়াতেই পিছন থেকে দানু ওকে প্রণাম কৰতে বললেন। হাত নেড়ে নিষেধ কৰলেন শনিবাবা, ‘না, তুমি আমাৰ সামনে বসো। কেউ ওয়ে থাকলে কঙ্কনো তাকে প্ৰণাম কৰবে না। নাম কী?’

বসতে বসতে অনি উত্তৰ দিল, ‘অনিমেষ।’

একগাল হাসলেন শনিবাবা, ‘বীৱি, মানুষ আমৰা নহি তো মেষ। অনিমেষ মানে জান?’

ঘাড় নাড়ি অনি, ‘ত্বুরি, শাস্তি।’

শনিবাবা বললেন, ‘বার নিমিয়ে নেই, দেবতা। আৱাৰ মাছকেও অনিমেষ বলা হয়, জান? তোমাৰ বয়স কত?’

পেছন থেকে সরিষ্ঠেৰ বললেন, ‘সাত।’

শনিবাবা বললেন, ‘আমাৰ দিকে তাকাও।’

অনি শনিবাবাৰ মুখেৰ দিকে গাকাতেই চোখাচোৰি হয়ে গেল। অনি হঠাতে টেৰ পেল ওৱ শৰীৰ কেমন হয়ে যাচ্ছে, ও যেন নড়তে-ড়তে পারছে না অথচ সবকিছু বুৰতে দেখতে পারছে। শনিবাবাৰ চোখেৰ মধ্যে ওগুলো কী? নিজেৰ চোখ বক্ষ কৰতে পিয়েও পারল না অনি।

শনিবাবা বললেন, ‘সরিষ্ঠেৰ! তোমাৰ এই নাতি বংশছাড়া, ঘোৱন এলে একে আৱ তোমাদেৱ মধ্যে পাৰে না। এৱ জন্মে মায়া আৱ বাঢ়িও না। এই ছেলে যতটা নৱম হৃদয়েৰ ততটাই নিৰ্দয়। তবে হ্যাঁ, এ যদি তোমাৰ সবচেয়ে প্ৰিয়জন হয় তবে তোমাৰ আৱ অঞ্জহানিৰ সঙ্গবনা নেই। জন্ম থেকে এ প্ৰতিবেদনশৰ্তি নিয়ে এসেছে।’

সরিষ্ঠেৰ কিসিকিস কৰে বললেন, ‘ভবিষ্যৎ।’

‘কেউ বলতে পাৰে না সরিষ্ঠেৰ, কাৰণ সেটা প্ৰতিমুহূৰ্তেৰ আৰৰ্তনে পালটে যেতে পাৰে। অতীত ত্বুৰি থাকে চিৰকাল তাই সেটা বলা যাব। তৰে মনে হৱাও বিশান হবে কিন্তু আঠারো বছৰ বয়সে রাজনৈতিক কাৰণে ওকে জেলে যেতে হতে পাৰে। যদি তা-ই যাব তা হলে আমি আৱ কিছু বলতে পাৰে না। কিন্তু একটা জিনিস বলাই, এৱ জীবনে বহু নারী আসৰ্বে, নারীদেৱ কাছে ও চৰম দৃঢ়ি পাৰে, নারীদেৱ জন্ম কৰ্মসূত হৰে, আৱাৰ কোনো কোনো নারীৰ জন্ম ও মাথা তুলে দাঁড়াতে পাৰে। সরিষ্ঠেৰ, একে তুমি কোনো কাজে বাধা দিও না কৰলো।’ কথাগুলো একটানা বলে চোখ বক্ষ কৰলেন শনিবাবা। তাৰপৰ ত্বুৰি হয়ে গেলেন। পুরোহিত মশাই-এৱ ইঙিতে সরিষ্ঠেৰ উঠে এসে অনিকে বাইৱে নিয়ে এলেন। অনিৰ মনে হল, অনেকক্ষণ বাদে একটা অক্ষকাৰ ঘৰ থেকে সে আসোয় এল।

কাঞ্জকৰ্ম সারতে বিকেল হয়ে এল। সকাল থেকে টুপটাপ হালকা চালে যে-বৃষ্টিটা খেলা কৰে

যাছিল, দুপুরের পর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যান্ডেজ জড়ানোর মতো আকাশটা মেঘে ঢাকা রইল। এখনও এখানে শীত পড়েনি। মাত্র ত্রিশ মাইলের ফালাকে স্বর্গছেড়া আর ভলপাইগুড়ির মধ্যে প্রকৃতিদেবী দুরকম বেহারা নিয়ে বিরাজ করেন। ভোরের দিকে একটু হিম হয়। কাল রাত্রে মেঝেতে যারা বিছানা করে শুয়েছিল শেষবারত্তে তারা তাই তড়িঘড়ি উঠে পড়েছে। এবার পূজা কার্তিকের কিছুটা পেরিয়ে। মনে হচ্ছে কালীগুজোর অনেক আগেই শীত পড়ে যাবে। কাল রাত্রে আকাশে মেঘ ছিল, আজ হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। মাধুরী অনিকে সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছেন। আকাশ দেখে কে বলবে এটা শরকাল, কদিন বাদেই পুজো!

শনিবাবা বিকেলের ট্রেনে শিশ্যসমেত ফিরে গেলেন। জোলো হাওয়া লাগলে টনসিল ফুলবে বলে অনিমেষকে টেনে নিয়ে যাননি সরিষ্ঠেখর। ওঁরা ফিরতে ফিরতে মেঘে মেঘে প্রায় সঙ্গে হয়ে গেল। অনি আজ সারাদিন মায়ের কাছাকাছি। শনিবাবা ওর সবক্ষে যা ভবিষ্যত্বাণী করেছেন তা এখন সবাই জেনে ফেলেছে। হেমলতা ঠাণ্ডা করে বলেছেন, ‘বাবার তো দুটো বিয়ে ছিল, এ-ছেঁড়াকে যদি মেয়েমানুষ ধরে কটা বিয়ে করে কে জানে!’ মাধুরী চাপা গলায় বলেছিলেন, ‘ঐকৃকুনি ছেলের সামনে এসব কথা কেন যে ওঁরা বললেন?’

হেমলতা বলেছিলেন, ‘ভিমরতি গো, ভিমরতি। নাতি নাতি করে বাবা হেদিয়ে গেলেন। তুমি জান না এই কটা মাস আমাকে সবসময় শিটপিট করেছেন যেন অনির কোনো কষ্ট না হয়। তুমি হাসছ যে?’

মাধুরী বলেছিলেন, ‘আপনার ভাই বলে, আগনিই নাকি ওকে বেশি প্রশংসন দেন!’

হেমলতা কিছু বললেন না প্রথমটা, তারপর আস্তে-আস্তে বলেছিলেন, ‘কিন্তু জেলে যাবার কথাটা শুনে অবধি ভালো লাগছে না আমার। হ্যাঁগো, লোকটা সত্যিই সিঙ্কপুরুষ নাকি?’

কথাটা একক্ষণেক মহীতোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাধুরী। সিগারেট খেতে ছাদে গিয়েছিলেন মহীতোষ। এখনও ছাদের অনেকে কাজ বাকি। চিলেকোঠার ঘরে প্লাটার হয়নি। ইটগুলো সিমেট্টের ভাঁজ গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। ছাদ থেকে তিঙ্গা নদীর দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলেন মহীতোষ। এত জল বেড়েছে যে ওপার দেখা যাচ্ছে না। জলের রং এই এত দূর থেকে কেমন কালচে-কালচে লাগছে। এমন সময় অনিকে নিয়ে মাধুরী ছাদে এলেন। ন্যাঙ্গা ছাদে ছেলেকে একা ছাড়তে চাননি মাধুরী। এসে স্থায়ির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর তখনই অনির কথাটা, জেলে যাবার কথাটা বললেন তিনি। মহীতোষ কথাটা শুনে হোহো করে হেসে উঠলেন, ‘তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে, এসব কেউ বিশ্বাস করে! শনিবাবা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন যে, দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। এখন আর আঠারো বছর বয়সে কাউকে জেলে যেতে হবে না।’

মাধুরী বললেন, ‘কিন্তু এতবড় সিঙ্কপুরুষ-’

মহীতোষ হাসলেন, ‘কৃত বড়’

মাধুরী জুকুটি করলেন, ‘সবভাবে ঠাণ্ডা ভালো লাগে না। দুম করে উনি ছেলেটার নামে এসব বলবেনই-বা কেন? বস্ত সব।’

মাধুরী বললেন, ‘মন্টা কেমন খারাপ হয়ে গেল।’

মাধুরীর মুখটা খুব বিবর্ধ দেখাচ্ছিল। অনিকে এক হাতে জড়িয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে মহীতোষ বললেন, ‘তা দেশ বখন উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে ও নিচয় চুরি-ডাকুতি করে বা নারীঘটিত ব্যাপারে জেলে যাবে-শনিবাবা মেঘেদের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা কি যেন বললেন?’

মাধুরী জুকুটি করে সরে দাঁড়াতে গেলেন, ‘কী যে সব ছাউপাশ বল! সূরে দাঁড়াবার মুহূর্তে খুব মাথাটা কেমন করে উঠল। জিজে ছাদের ওপর পা যেন স্থিত থাকছে না। সারাদিন খুব পরিশ্রম হয়ে গিয়েছে, হেমলতার নিষেধ শোনেননি। খাওয়াদাওয়ার ঠিক ছিল না আজ অবেলায় খেয়ে অশ্বল হয়ে গিয়েছিল, হঠাতে দেখে অঙ্ককার দেখলেন।

অনি এতক্ষণ হাঁ করে বাবা-মায়ের কথা শুনছিল, এখন ঘাড়ে মায়ের দুই হাতের প্রচণ্ড চাপ পড়তে তিক্কার করে উঠে দেখল মা পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ও মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরতে গেল। পেটে চাপ পড়তে মাধুরী তিক্কার করে ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন। মহীতোষ দৌড়ে এসে ঝীকে আঁকড়ে ধরলেন, ‘কী হল, পড়ে গেলে কেন?’ চোখের সামনে ওকে পড়ে যেতে

দেখে হতভয় হয়ে পড়েছিলেন প্রথমটা। মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে একটা এইরকম বোধ হতে মাধুরীর মৃখটা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কষ্ট হচ্ছে?’

মাধুরী ঘাড় নাড়লেন, ‘না।’ কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মহতোর চমকে উঠলেন। দরদর করে ‘বছেন মাধুরী। স্ত্রীকে ছাদের ওপর উইয়ে দিয়ে ছেলেকে বললেন, ‘যা, শিগগির পিসিমাকে ডেকে আন।’ মাধুরীর চেতনা ছিল, তিনি হাত নেড়ে নিষেধ করতে-না-করতে অনি একলাফে ছাদ থেকে চিলেকোঠার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

পাতলো অঙ্ককার নেমে এসেছে বাড়িটার ওপর, ছাদে এতক্ষণ বোঝা হয়নি। নিচে নামতেই অনি দেখল পিসিমা ছোটবুরের বারান্দায় লঠনগুলো জড়ো করেছেন। ও টিংকার করে উঠল, ‘পিসিমা তাড়াতাড়ি এসো-যা কেমন করছে?’ চিৎকারটা হঠাতে কান্না হয়ে যেতে হেমলতা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। লঠন পড়ে রইল, তিনি দুদাঢ়ো করে অনির দিকে ছুটে এলেন। সরিংশেখর সবে টেশন থেকে এসে পাঞ্জাবি খুলে হাতপাথার বাতাস খাচ্ছিলেন, অনির চিৎকার শুনে তিনিও হস্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

হেমলতা তাঁর ভারী শরীর নিয়ে অনির কাছে এসে দেখলেন ছেলের মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে। ‘তোর মা কোথায়, কি হয়েছে?’

অনি কথা বলতে পারছিল না, আঙুল দিয়ে ছাদটা দেখিয়ে দিল। এক পলক ওপরদিকে তাকিয়ে হেমলতা গঞ্জগঞ্জ করতে করতে ছাদের সিঁড়ির দিকে ছুটলেন, ‘আঃ, এই সংকেবেলায় আবার ছাদে উঠল কেন! এত করে বললাম পেটের বাচ্চা নড়াচড়া করছে যখন, তখন খাটাখাটুনি কোরো না, তা শুনবে আমার কথা!’

সরিংশেখর দ্রুত এসে অনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হয়েছে দাদু?’

অনি কেঁদে ফেলল, মা পড়ে গেছে।

সরিংশেখর আর দাঁড়ালেন না। অনি দাদুর পেছনে পেছনে ছাদে ছুটল।

বৃষ্টিটা এতক্ষণ থমকে ছিল, বেশ আবার ছোট ছোট ফেঁটা পড়া শুরু হল। এ এক অস্তুত ধরনের বৃষ্টি। মেঘ ডাকছে না, সামান্য হাওয়াও নেই, আকাশ চিরে বলকে-ওঠা বিদ্যুতের দেখা নেই। তবু বৃষ্টি পড়ছে, ধূমখেম মেঘগুলো নিঃশব্দে গলে গলে পড়ছে। মহীতোষ বোকার মতো স্তৰীর পাশে বসে ছিলেন, দিদিকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। হেমলতা কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হয়েছে?’

যন্ত্রণার মাধুরীর চোখ বোজা ছিল, হেমলতার গলা শুনে কিছু বলতে গিয়ে না পেরে মাথা নাড়ারেন। মহীতোষ বললেন, ‘হঠাতে মাথা ঘুরে গেছে।’ কথাটা শেষ হতে-না-হতে মাধুরীর শরীরটা কাঁপতে লাগল। তারপর প্রচণ্ড যন্ত্রণা থেকে মৃত্যি পাবার জন্য শরীর মোচড়ানো শুরু হল। সারা শরীর ওঁর ঘায়ে ভিজে যাচ্ছে, তার উপর বৃষ্টির ফেঁটা পড়ছে এখন। বেশিক্ষণ এভাবে থাকলে ভিজে একশা হয়ে যাবে।

হেমলতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাইকে বললেন, ‘ওকে নিচে নিয়ে চল।’ মহীতোষ একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। দিদিকে ডাকতে পাঠিয়ে তিনি মাধুরীকে পাঞ্জাকোলো করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাধুরীর শরীর এমনিতেই ভারী, এখন যেন আরও ওজন বেড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে যাওয়া খুব সহজ নয়, ওর পক্ষে অসম্ভব।

মহীতোষ বললেন, ‘তুমি একটা দিক ধরো, চিলেকোঠার দিকে নিয়ে যাই, বৃষ্টিতে ভিজে না।’ হেমলতা বোধহয় বুবুতে পেরেছিলেন মাধুরীকে একা মহীতোষের পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, তাই দুজনে ধরাধরি করে চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে এলেন। সিঁড়িটা এখানে চাট করে ছাদে উঠে আসেনি। সিঁড়ি শেষ হবার পর খানিকটা সমতল জায়গাকে ঘরের মতো ঢেকে ছাদের শুরু। মাধুরীকে সেখানে রাখা হল। এটুকু আনন্দেই হেমলতা টের পেলেন যে ওকে নিচে নিয়ে যাওয়া বোকায়ি হত, সামান্য নাড়াচড়ায় ওর কষ্ট যে অনেক শুণ বেড়ে যাচ্ছে এটা বুবাতে অসুবিধে হচ্ছে না।

যৌবন আসতে-না-আসতে বিধবা হয়েছিলেন হেমলতা। স্বামী ছিল তাঁর, মুখ-চোখ ভালো করে মনে ধরার আশেই একরাত্রির অসুবিধে মনে শেল লোকটা। তারপর এতগুলো বছর শুধু পার করে দেওয়া, একরাত্রির জন্য নারী হওয়া যাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, মা হবার কোনো প্রশ্নই তো ওঠে না। হ্রস্বচেঁড়ার নির্জন চা-বাগানে বসে সরিংশেখর মেয়ের আবার বিয়ে দেবার কথা ভাবতেন। বিদ্যাসাগর

মশাই অত চেষ্টা করলেন, হয়তো কলকাতা শহরে অহরহ বিধবা-বিবাহ হচ্ছে, কিন্তু স্বর্গহেঁড়ার নির্জন চা-বাগানে সরিষ্পেখের মেয়ের আবার নিয়ে দেবার কথা ভাবতেন। বিদ্যাসাগর মশাই অত চেষ্টা করলেন, হয়তো কলকাতা শহরে অহরহ বিধবা বিবাহ হচ্ছে, কিন্তু স্বর্গহেঁড়ার লোকজন ব্যাপারটা চিন্তা করতে পারে না। এমনকি হেমলতাও। স্বীকে দিয়ে মেয়েকে বলিয়েছিলেন, শুনে মেহলতা বলেছিলেন, ‘ছি! আর কথা বাড়াননি সরিষ্পেখের। বিয়ের সময় ভালো করে কাপড় পরত না যে, জীবনে আর ত্রেস করে শাড়ি পরা হল না তাঁর। একেবারে সরুপাড় সাদা শাড়ি অঙ্গে উঠল। বয়স যত বাড়ছে পাড় তত ছেট হতে-হতে নরুনে ঠেকেছে। ছেটমা যখন স্বর্গহেঁড়ার এল তখন হেমলতার বয়স বড়জোর আট। সেই বয়স থেকে হাত-গোড়ানো শুরু হয়েছে। মহীতোষ বা পরিতোষকে নাইয়ে খাইয়ে দেবার জন্য আর কোনো লোক ছিল না। সে একরকম ছেটমা আসার পর হেমলতা চট করে অনেক বড় হয়ে গেলেন। বছর ঘোরার আগেই ছেটমা সন্তানসংক্রান্ত হলেন। স্বর্গহেঁড়ার চৌহদিতে তখন ভালো ডাঙ্কার নেই। নতুন ডাঙ্কারবাবু তখনও আসেননি। একজন কম্পাউন্ডার কোনোরকমে কাজ চালাচ্ছেন। আর তখন লোকজনই-বা কত ছিল, এক আঙুল যদিবা ফুরোয়! সরিষ্পেখের চেয়েছিলেন বটকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন। কিন্তু সেই নদীয়ায় নিয়ে যাওয়া আর হল না। ছেটবট-এর বাড়ির লোকজন আসব-আসব করে শেষ পর্যন্ত এল না। কুলি-লাইনের এক বৃড়ি যে নাকি মদেসিয়াদের দাই-এর কাজ করে, হেমলতাকে সঙ্গে নিয়ে আতুড়বরে চুকল। সরিষ্পেখের পক্ষে সঞ্চ নয়। ভেতরে যাওয়া, তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেয়েকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। হেমলতা প্রথম সন্তানজন্ম দেখলেন। একটু ভয় ছিল প্রথমটা, কিন্তু বাড়ি তৈরি করার নিষ্ঠা নিয়ে পরপর কাজগুলো করে গেলেন। ছেটমার প্রথম সন্তান আঁতুরঘরেই মারা গিয়েছিল। ছেটমা যতটা-না কেঁদেছেন, হেমলতা বোধহয় অনেক বেশি। তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। বিয়ের পর পরিতোষ জন্মাল। সেদিন আর বৃত্তি ধাই ছিল না। হেমলতা একাই সব দিক সামলাচ্ছেন। রান্না করে সবাইকে খাইয়েছেন, কাপড় ছেড়ে আতুড়বরে গিয়েছেন, সময় এলে নাড়ি কেটেছেন। এমনকি সেদিন অনি যখন হল, তখন তো ডাঙ্কারবাবু ছিলেন, কিন্তু হেমলতাকে ছাড়া চলেনি। অনি হয়েছিল দুপুরে। সরিষ্পেখের ঘরের চেয়ারে বসে ঘড়ির ওপর নজর রেখে মাঝে-মাঝে উচ্চুগায় জিজ্ঞাসা করছেন। বারবার করে বলেছেন ঠিক জন্মায়ুক্ত যেন হেমলতা তাঁকে জানান। শিশুর মতো ছটফট করছেন সরিষ্পেখের। তারপর যখন হেমলতার খুশির চিৎকার তাঁর কানে এল ‘ছেলে হয়েছে’, তখন সরিষ্পেখেরকে দেখে কে। এক হাতে ঘড়ি নিয়ে লাকাচ্ছেন তিনি ‘একটা বেজে পনেরো মিনিট-পাঁজিতে লিখেছে মাহেন্দ্রক্ষণ-শক্ত বাজাও শক্ত বাজাও, দুর্গা দুর্গা।’

এখন চিলেকোঠার ঘরে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে মুখ তুলতেই হেমলতা সরিষ্পেখকে দেখতে পেলেন। উঁঠে মুখে নিয়ে উঠে আসছেন তড়িঘড়ি। চোখাচোখি হতে হেমলতা খুব সাধারণ গলায় বললেন, ‘তাড়াতাড়ি ডাঙ্কার ডাকুন, মাধুর বাচ্চা হবে।’

সরিষ্পেখের থমকে দাঁড়ালেন। বটমার বাচ্চা হবে তিনি জানতেন, কিন্তু তার তো সময় হয়নি। কোনো গোলমাল হল না তো? বোকার মতো বললেন, ‘সে কী! তার তো দেরি আছে।’

কোনোদিকে না তাকিয়ে হেমলতা বাবাকে বললেন, ‘সেসব আগনি বুঝবেন না। তাড়াতাড়ি যান।’

মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে সরিষ্পেখের তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। মহীতোষ ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে ভাবতে পারেলনি। এখনও তো মাস দুয়োক দেরি আছে। হঠাৎ ওঁর খুব ভয় হল। মাধুরীর যদি কিছু হয়ে যায়। কোনো কথা না বলে মহীতোষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, দরকার হলে ওকে হলপিটালে নিয়ে যেতে হবে। হেমলতা দেখলেন মাধুরী ছটফট করছে। কী করবেন বুঝতে না পেরে মুখ তুলতেই দেখলেন অনি সিঁড়ির মুখে গাল চেপে করুণ চোখে মাঝের দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় ওপরে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। হেমলতা হেসে বললেন, ‘যা বাবা, তাড়াতাড়ি নিচ থেকে একটা বালিশ আর চাদর নিয়ে আয়।’ কাজ করতে পেরে অনি যেন বেঁচে গেল।

কোনোমতে বিছানা করে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে হেমলতা বললেন, ‘অনি, তুই মাঝের কাছে বোস, আমি গরম জল করি গে।’ পিসিমা চলে গেলে অনি খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রাইল। বাইরে এখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। ছেট বাড়ি থেকে চাদর-বালিশ আনতে গিয়ে ও একটু ভিজেছে। অন্য সময় মা নিশ্চয় বকত, এখন কিছু বলছে না। মাঝের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কান্না পাচ্ছিল। মা যে খুব

কষ্ট পাছে এটা ও বুঝতে পারছিল।

পিসিমা তখন দাঢ়ুকে বলল মায়ের বাচ্চা হবে। বাচ্চা হলে এত কষ্ট পেতে হয় কেন? মায়ের মুখটা একদম সাধা হয়ে গিয়েছে। ও মায়ের পাশে এসে স্বর্গগে বসে পড়ল। এখন কাছে পিঠে কেউ নেই, কারণ গলা শোনা যাচ্ছে না। চিলেকোঠার দরজাটা আলো আসার জন্যে অথবা ভুলে শোলা রয়েছে। অনি এখন থেকে বৃষ্টি পড়া দেখতে পেল। জলের ছাঁট ঘরের মধ্যে সামান্যই আসছে। অনির খুব ইচ্ছে হল মায়ের মুখে হাত বেলাতে। ঠিক সেই সময় মাধুরী চোখ খুললেন। অনি দেখল মাধুরীর চোখের কোণে দু-ফোটা জল টলমল করছে। মাধুরী একবার দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়ালেন, তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘরটাতে চোখ বেলালেন। মায়ের চোখে জল দেখতে পেয়ে অনি ফুঁপিয়ে উঠল। মাধুরী খুব ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে ছেলের কোলের ওপর রাখতেই অনি মায়ের বুকে ওপর ডেঙে পড়ল। অনেকক্ষণ ছেলেকে মধ্যে রেখে মাধুরী বললেন, ‘হাঁয়ের বোকা, কাঁদছিস কেন?’

ফিসফিসিয়ে অনি বলল, ‘তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?’

‘আমার কষ্ট হলে তোর খারাপ লাগে, না রে!’

অনি ঘাড় নাড়ল। মাধুরী আস্তে-আস্তে বললেন, ‘আমি যদি না থাকি তুই আমাকে ভুলে যাব না তো।’

অনি দৃঃ হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে কেন্দে উঠল শব্দ করে। মাধুরী কেমন ঘোরের মধ্যে বললেন, ‘আমি যদি না থাকি তুই একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস, আমি ঠিক অনতে পাব। অনি, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না রে।’

অনি কোনো কভা বলতে পারছিল না, ওর ঠোট দুটো থরথর করে কাঁপছিল। মাকে এরকম করে কথা বলতে ও কোনোদিন শোনেনি। মা কেন ওকে ছেড়ে চলে যাবে। বাচ্চা হলে কি কাউকে চলে যেতে হয়! ও দেখল মাধুরী একটানা কথা বলে কেমন নিষেজ হয়ে গেছেন, অনেক দূর দৌড়ে এলে যেমন হয় মায়ের বুক তেমনি ঘোনামা করছে। হঠাৎ ও মায়ের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। মাধুরী যেখানে শয়ে আছেন তার নিচদিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এটা কি সম্ভিত রক্ত? কোথেকে এত রক্ত এল? মায়ের তো কোথাও কেটে যায়নি! এর আগে কতবার তরকারি কুঠিতে গিয়ে মায়ের হাত বাঁচিতে কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছে, কিন্তু সে তো কয়েক ফেঁটা যাত্র। অনি আস্তে-আস্তে উঠে মায়ের পাশের কাছে এসে দাঁড়াল। কুঁজে ডেঙে গেলে যেমন জল গড়িয়ে যায় তেমনি একটা মোটা লাল ধারা চলে যাচ্ছে কোণার দিকে। মায়ের পায়ের গোড়ালি সেই শ্রান্তটা থেকে সরিয়ে দিতে গেল অনি আর তখনি ওর আঙুল চট্টটে লাল হয়ে গেল। মাধুরী চোখ খুলে দেখলেন, ছেলে চোখের সামনে আঙুল নিয়ে দেখতে। চিৎকার করে উঠলেন, ‘ওয়া মুছে ফ্যাল, তোর হাত থেকে রক্ত মুছে ফ্যাল।’ কিন্তু ক্রমশ কথা বলার শক্তি চলে যাচ্ছিল ওর। চোখের সামনে সব বাপসা হয়ে আসছে। অনি বাপসা-মহীতোষ বাপসা-দু-চোখে এত জল থাকে কেন?

এই সময় সিডিতে কয়েক জোড়া শব্দ পেল অনি। একটা অঙ্ককার ঘরের মধ্যে যেন দম আটকে যাচ্ছিল ওর, হঠাৎ মনে হল ডাঙ্গারবাবু এসে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হেমলতা একটা বড় লক্ষণ নিয়ে আগে-আগে উঠে এসেন। ছাদের এই ঘরটা এতক্ষণে আবছা হয়ে এসেছে। হেমলতা পিছন পিছনে একজন বৃক্ষ সরিষ্ণেখৰ, মহীতোষকে বাগ্য হাতে নিয়ে উঠে আসতে দেখল অনি। ঘরে চুক্তেই থমকে দাঁড়াল সবাই, হারিকেনের আলোয় রক্ষস্তোত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বৃক্ষ লোকটি বললেন, ‘বিড়িও হচ্ছে বলেননি তো।’

হেমলতা বললেন, ‘আমি একটু আগে নিচে গেলাম, তখনও দেখিনি।’ অনি বুঝতে পারল এই লোকটিই ডাঙ্গাৰ, কাৰণ তৎক্ষণাৎ তিনি মাধুরীৰ পাশে বসে একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগলেন। তারপর খুব গঞ্জিৱনুৰে বললেন, ‘আপনামা নিচে চলে যান।’ সরিষ্ণেখৰ অনিকে এক সস্প্যানটা এনে দে শিগগিৰ।

মহীতোষ নিচ থেকে জল ওপরে দিয়ে এসে দেখলেন সরিষ্ণেখৰ অনিকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ সিডিৰ শেষ ধাপে বসে আছেন। ছেলেকে দেখে সরিষ্ণেখৰ বললেন, ‘হাসপাতালে রিমুভ কৰা যাবো?’

ছোট ঘর থেকে আনা লক্ষণটা নামিয়ে মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন, ‘জানি না কৰতে হলে এখনই কৰা দৰকাৰ। সেনগাড়াৰ দিকটায় তিতার জল চুকে পড়েছে।’

সরিৎশেখর বললেন, ‘দেখলেন না মাইকে অ্যানউস করছে। মনে হচ্ছে এবার খুব ভোগাবে।’

কথাটা শেষ করে মহীতোষ দেখলেন প্রিয়তোষ দরজায় দাঁড়িয়ে। এন্দের দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, ফ্লাই আসছে, সামনের মাঠটা জলে ঝুবে গেছে। চটপট মালপত্র ছাদে তোলো।’

মহীতোষ ডাঙাতড়ি বাইরে বেরিয়ে শুললেন ওদের উঠানে বাগানে জল শব্দ করছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগতে টের পেলেন ওর সমস্ত জামাকাপড় ভিজে চুপসে গেছে, সরিৎশেখরেরও এক অবস্থা অঙ্ককারে এতক্ষণ যেটুকু দেখা যাচ্ছিল আর তাও দেখা যাচ্ছে না। বিমুক্তি বৃষ্টি পড়ছে আর হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী ধাঁধিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই মহীতোষ দেখলেন ঘোলাজলের স্রোত উঠানামা কিলবিল করছে।

‘বৃষ্টিতে ভিজতে মহীতোষ দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, ‘বন্যা এসে গেছে, এখন তো নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।’

প্রিয়তোষ বলল, ‘কী হয়েছে?’

মহীতোষ বললেন, ‘তোর বউদির পড়ে গিয়ে ব্রিডিং হচ্ছে, অবস্থা সিরিয়াস।’

প্রিয়তোষ বলল, ‘সে কী! হয়েছে?’

মহীতোষ বললেন, ‘সে কী! কখন?’

সরিৎশেখর একবার ওপরের দিকে তাকিয়ে জলের মধ্যে গেলেন। অঙ্ককারে চলতে কষ্ট হচ্ছে, প্রিয়তোষ ওর পিছনে। ছাঁট ঘরে তখন পায়ের পাতার ওপর জল। কী নেওয়া যায় কী নেওয়া যায় তাবতে না পেরে আবিষ্কার হল অঙ্ককারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্রুত জল বাঢ়ছে। ইটুর কাছটা যখন ভিজে গেল তখন মহীতোষ টুট্টা খুঁজে পেলেন। খাটোর অনেকটা এখন জলের তলায়। লেপ তোশক নিয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। মেঝেয় রাখা সুটকেস্টা তুলে নিলেন। মহীতোষের টাকা এই সুটকেস্টা আছে। সুটকেস্টা এর মধ্যে ভিজে ঢোল হয়ে গেছে।

নতুন বাড়ির বারান্দায় ইঞ্জি কয়েক নিচে জল। মহীতোষ ছাদের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে দেখলেন সরিৎশেখর ডাঙারবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। হারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ওদের ছায়া কাঁপছে। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর কঁপা-কঁপা গলায় বললেন, ‘আমি কিছু তাবতে পারছি না মহী, ভগবান এ কী করলে!’

মহীতোষ ডাঙারবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, ‘হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে একটা চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যা অবস্থা-জল শুলমাম বাড়ির মধ্যে তুকে পড়েছে!’ মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন।

‘হয়ে গেল তা হলে!’ ডাঙারবাবু ছটফট করে উঠলেন, ‘তোরের আগে কোনোবার জল কমে না। এইজন্যেই আমি আসতে চাইছিলাম না। এখন আমি যাই কী করে! অঙ্ককারে জল তেঙে যেতে কোথায় পড়ব-ইস!’

মহীতোষ বললেন, ‘ডাঙারবাবু, আপনি চলে গেলে ওকে নিয়ে আমরা-না, আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি ওকে দেখুন, আমি আপনার বাড়িতে খবর দিয়ে আসছি।’

কথাটা শেষ হতে প্রিয়তোষ ‘আমি খবর দিয়ে আসি’ বলে অঙ্ককারে ছুটে নেরিয়ে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ডাঙারবাবু বললেন, ‘আমি আর দেখে কী করব! চোখের সামনে মেয়েটা চলে যাচ্ছে আমি ফ্যালফ্যাল করে দেখছি। তগবানকে ডাকুন।’

‘সেটা বেরুলে তো বুবাতে পারা যেত। এতগুলো ইঞ্জেকশন দিলাম, রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছে না।’ বিড়বিড়ি করে বকতে ডাঙারবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

এখন এখানে শুধু বোঢ়ো বাতাস ছাড়া কোনো শব্দ নেই। বাইরে তিস্তার জল নতুন বাড়ির বারান্দার গায়ে ধাক্কা লেগে যে-শব্দ তুলে তাও বাতাসে চাপা পড়ে গেছে। মহীতোষ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। সরিৎশেখর নাতিকে দুহাতে জড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ করে বসে আছেন সিঁড়িতে। লণ্ঠনের আলোয় দেওয়ালে-পড়া তাঁদের ছায়াগুলো নিয়ে বাতাস উঞ্চ ছবি এঁকে এঁকে যাচ্ছে। সময় এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুচ্ছে। যে-কোনো মুহূর্তে ওপর থেকে কোনো শব্দ ভেসে আসবে এইরকম একটা আশঙ্কায় দুটো প্লাস্টিক কাটা হয়ে রয়েছে। দাদুর বুকের ওপর মাথা রেখে অনি অনেকক্ষণ ধরে দুপদুপ বাজনা শুনছিল। এতক্ষণ যেসব কথাবার্তা এখানে হয়ে গেল তার প্রতিটি শব্দ ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। মা আর থাকবে না। ডাঙারবাবু ওদের ভগবানকে ডাকার কথা বললেন, কিন্তু কেউ ডাকছে

না কেন? অনির মনে পড়ল স্বর্গছেঁড়ায় এক বিকেলবেলায় হেমলতা ওকে বলেছিলেন সবচেয়ে বড় ভগবান হল মা। অনি সমস্ত শরীর দিয়ে মনে মনে মাকে ডাকতে লাগল। চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে, ‘মা, মা’ উচ্চারণ করতে করতে অনি দেখতে পেল মাধুরী ওর কাছে এসে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন। মায়ের গায়ের সেই গঁজটা বুক ভরে নিতে নিতে ও শুনতে পেল পিসিমা সিডির মুখে এসে বলছেন, ‘অনিকে একটু ওপরে নিয়ে আসুন।’

কথাটা শনে ডাক করে উঠে দোঢ়াল অনি। অঙ্ককারে সিডিগুলো লাফ দিয়ে পেরিয়ে এসে পিসিমা মুখোমুখি হয়ে গেল ও। অনিকে দেখে হেমলতা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। অনি বুবাতে পারল পিসিমা কাঁদছেন। কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা আবার ধমকে টাঁড়ালেন। অনির মাথাটা ওর প্রায় কাঁধ-বরাবর। অনি শুনতে পেল কেমন কান্না-কান্না গলায় পিসিমা ওকে বলছেন, ‘অনি বাবা, আমার সোনাছেলে, তোমার মা এখন ভগবানের কাছে চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে তোমাকে দেখতে চাইছেন।’ হৃষ করে কেঁদে ফেললেন হেমলতা।

অনি বলল, ‘মা-ই তো ভগবান। তবে মা কার কাছে যাচ্ছে।’

ফিসফিস করে হেমলতা বললেন, ‘আমি জানি না বাবা, তুমি কোনো কথা বলে না, বেশি কেঁদে না, তাহলে মা’র যেতে কষ্ট হবে।’ পিসিমার বারণ তিনি নিজেই মানছিলেন না।

মা শুয়ে আছেন চূপচাপ। ওর শরীর নড়ছে না। ডাক্তারবাবু মাটিতে বাবু হয়ে বসে আছেন। হেমলতা অনিকে এগিয়ে দিলেন সামনে, ‘মাধু, অনি এসেছে দ্যাখ।’

চোখের পাতা নাচল, পুরো খুলুল না। অনি দেখল মায়ের চোখের কোল জলে ভরে গেছে। অনি মাধুরীর মুখের পাশে মুখ নিয়ে ডাকল, ‘মা, মাগো।’

মাধুরী ঘোরের মধ্যে বললেন, ‘অনি, বড় কষ্ট হচ্ছে রে।’

ফুঁপিয়ে উঠল অনি, ‘মা, মাগো।’

মাধুরী ফিসফিস করে বললেন, ‘আমি তোর সঙ্গে থাকব রে, তুই জেলে গেলেও তোর সঙ্গে থাকব।’ অনি পাগলের মতো মায়ের বুকে মুছ চেপে ধরে ফৌপাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বাইরের বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে হেমলতার বুকফটা চিক্কার কানে আসতে অনি মায়ের বুক ধেকে মাথা সরিয়ে অবাক হয়ে দেখল পিসিমা আর বাব পরম্পরকে জড়িয়ে ধরে চিক্কার করে কাঁদছে। ওর পাশ দিয়ে দুটো পা দ্রুত ছাদের দিকে চলে গেল। পেছন থেকে অনি দেখল দানু এই বৃষ্টির মধ্যে এই অঙ্ককারে ছাদে হেঁটে যাচ্ছেন।

মায়ের দিকে তাকাল অনি। স্বর্গছেঁড়ায় অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে ও মাধুরীকে এমনিভাবে শয়ে থাকতে দেখত। ঘুমিয়ে পড়লে মাধুরী সহজে চাইতেন না। ভীষণ বাথরুম পেয়ে গেলে অনি মায়ের গায়ে চিমটি কাটে। তখন মাধুরী ধড়মড় করে উঠে বসতেন। অনি বুবাতে পারছিল আর মা উঠে বসবে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে অনি চিক্কার করে কেঁদে উঠল।

মাঝরাতেই জল নেমে গিয়েছিল। ভোরের আলো ফুটতে চারধাৰ একটা আজুত দৃশ্য নিয়ে জেগে উঠল। সমস্ত শহরটার ওপর কয়েক ইঞ্চি পলি পড়ে গেছে। সূর্যের আলো পড়ায় চকচক করছে সেগুলো। ভেসে-আসা মৃত গুরু-ছাগল আটকে গেছে এখানে-সেখানে। তিজার জল করলার মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় নিচু জ্বালাগুলো এখনও জলের তলায়। শুশানটা শহরে একপ্রাণে, মাষকলাইহাবাড়ির কাছে। উচু জ্বালানী বলে সে অবধি জল পৌছায়নি। লোকজন যোগাড় করে এই পানিকের ওপর দিয়ে হেঁটে শাবানে আসতে দুপুর হয়ে গেল; ছেট ধৰের অনেকে জিনিসপত্র গেলেও খাটো বেঁচেছে। সরিষ্পশ্চর সেখানে সকাল থেকে শয়ে রইলেন; কাল রাতে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্জুর হয়েছে ওর। বারবার বলছেন, ‘আমার অঙ্গহানি ঠিকাতে পারল না কেউ।’

মৃতদেহ নিয়ে যাবার সোকের অভাব হয় না। তারা সবাই হরিক্ষনি দিতে দিতে মাধুরীকে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রিয়তোষ কাঁধ দিয়েছে। হেমলতা কাল রাত থেকেই সেই যে অনিকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন মাধুরীর পাশে, একবারও ওঠেননি। কাঁদতে কাঁদতে অনি বঁা বঁা তাঁর বুকে ঘুমিয়ে পড়ছে; আবার জেগেছে, হেমলতা পাথর। দেহ নিচে নামিয়ে খাটিয়া সঁজ্যে কেউ-একজন ডাকল তাঁকে, ‘ঝোয়াজ্জীকে যাবার সময় সিদুর পরিয়ে দিতে হয়, সিদুর নিয়ে আসুন।’ ঠিক তখনই হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন হেমলতা, ‘আমি চাইনি গো, কাল সকালে জোর করে আমাকে দিয়ে সিদুর পরাল ও,

আমি যে বিধবা, সেই পাপে মেয়েটা চলে গেল গো—।’

মহীতোষ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘থাক, সিদুর পরাতো হবে না।’

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন সরিষ্পেখর, ছেট ঘরের খাটে ওয়ে কান কাড়া করে সব কথা শনছিলেন, ‘খবরদার, আমার বাড়ির বউকে সিদুর না পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।’

এখন সিদুর-মাথায় মাধুরী শুশানে পৌছে গেলেন। ওদের থেকে খানিক দূরত্বে ছেলের হাত ধরে মহীতোষ হেঁটে এলেন। পলি-জয়া রাস্তায় হাঁটতে ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। মহীতোষ কাল থেকে ছেলের সঙ্গে কথা বলেননি। এখন আসার সময় তাম পাছিলেন অনি হয়তো মাধুরীকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঁকে করবে। কিন্তু আশ্র্য, অনি গভীরমুখে হেঁটে এল। মহীতোষের মনে হল এক রাতে ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

শুশানে ওরা যখন চিতা সাজাচিল তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসে ছিলেন মহীতোষ। কাঁদতে ভয় করছিল অনির জন্যে। আজকে এই শুশানে আর কোনো চিতা জ্বলছে না। একমাত্র যেটি সাজানো হচ্ছে সেটি মাধুরীর জন্য।

হাঁটাং অনি কেমন কাঠ-কাঠ গলায় বলল, ‘মাকে ওরা প্রইয়ে রেখেছে কেন?’ মহীতোষ জবাব দিতে গিয়ে দেখলেন তাঁর গলা! আটকে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে বললেন, ‘ভগবান কাউকে নিয়ে গেলে তাঁর শরীরটা পুড়িয়ে ফেলতে হয়।’

হাঁটাং একজন এগিয়ে এল ওদের দিকে, ‘দালা, আর দেরি করা ঠিক হবে না। মুখাপ্তি তো ওই করবে?’ মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন। ছেলেটি অনির হাত ধৰল, ‘এসো তুমি।’ তারপর অনিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘মা তো চিরকাল থাকে না, আমারও মা নেই, বুবালেঁ।’

পরপর সুন্দর করে কাঠ সাজিয়ে মাধুরীকে পোয়ানো হয়েছে। মাধুরীর চূল খুব বড়, চিতার একটা দিক কালো করে ঢেকে রয়েছে। প্রিয়তোষ এসে অনির পাশে দাঢ়াল। অনি দেখল কয়েকজন পাটকাঠিতে আগুন ধরাচ্ছে। মাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে এখন। অনি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। মা, মাগো! অনি ডুকরে কেঁদে উঠতে প্রিয়তোষ বলল, ‘কাঁদিস না, অনি, কাঁদিস না।’

আগের ছেলেটি একগোছা পাটকাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে এনে অনির সামনে ধরল, ‘নাও, মায়ের মুখে আগুনটা একটু ছুঁইয়ে দাও।’

কথাটা শনে আঁতকে উঠল ও। সদ্যজ্বালা আগুনের শিখাটা যদিও ছোট কিন্তু লকলক করছে। সেদিকে তাকিয়ে অনি বলে উঠল, ‘আগুন দিলে মুখ পুড়ে যাবে না।’

কথাটা মহীতোষের কানে যেতে মহীতোষ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি আর দেরি করল না, অনির একটা হাত টেনে নিয়ে পাটকাঠির উপর চেপে ধরে নিজেই জোর করে আগুনের শিখাটা মাধুরীর মুখেছুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা শিখা চিতার আশেপাশে লকলক করে উঠল যেন। প্রিয়তোষ অনিকে সরিয়ে নিয়ে এল চিতার কাছ থেকে। ওকে ধরে উলটোদিকে হাঁটতে লাগল সে। কয়েক পা হেঁটে অনি শনতে পেল পেছন থেকে অনেকগুলো গলায় চিংকার উঠছে, ‘বোল হরি, হরি বোল।’

হাঁটাং কাকার হাতের বাঁধন থেকে ছিটকে সরে গিয়ে অনি মায়ের চিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দাঁড়াউ করে অজস্র শিখা নিয়ে আগুন জ্বলছে। শব্দ হচ্ছে কাঠ পোড়ার। আগুন মশ দলা পাকিয়ে লাল হয়ে নাচতে শুরু করেছে। অনি আগুনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা অবয়ব দেখতে পেল, যাকে মা বলে কিছুতেই চেনা যায় না।

যে-ছেলেটি ওর হাত ধরে মুখাপ্তি করাল সে অনির দিকে এগিয়ে এল, ‘তোমার হাতে কী লেগেছে? শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে।’

নিজের হাতটা চোখের সামনে ধরতেই অনির মনে পড়ে গেল একটা লাল হয়ে নাচতে শুরু করেছে। অনি আগুনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা অবয়ব দেখতে পেল, যাকে মা বলে কিছুতেই চেনা যায় না।

যে-ছেলেটি ওর হাত ধরে মুখাপ্তি করাল সে অনির দিকে এগিয়ে এল, ‘তোমার হাতে কী লেগেছে? শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে।’

নিজের হাতটা চোখের সামনে ধরতেই অনির মনে পড়ে গেল একটা লাল স্বাতের কথা, কাল

রাত্রে মায়ের শরীর থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছিল। কখন সেটা শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে, রক্ত বলে চেনা যায় না। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে, কাঁদতে কাঁদতে বলল, মার রক্ত!

॥ ৩ ॥

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, ‘যিনি তোমাকে গর্ভে ধরেছেন, স্তন্যদান করে জীবন দিয়েছেন, তোমাকে জ্ঞানের আলো দেখিছেন সেই তিনি আর যিনি মাত্রজ্ঞান থেকে নির্গত হওয়ামাত্র তোমার জ্ঞয় জ্ঞায়গা দিয়েছেন, তাঁর সংস্কৃতি তাঁর সংস্কার রক্তে যিশিয়ে দিয়েছেন এই তিনি—কাকে তুমি আপন বলে গ্রহণ করবে?’ তিনি বললেন, ‘দুজনকেই। কারণ একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন ছিন্ন হওয়ামাত্রই আর—একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ছিন্ন না হলে যে যুক্ত হত না। তাই দুজনেই আমার আপন।’

তাঁকে বলা হল, ‘যদি একজনকে ত্যাগ করতে বলা হয় তবে কাকে ত্যাগ করবে?’ তিনি বললেন, ‘এই মাটির তো তাঁরও জননী। তাই এর জন্য জীবন দিয়ে তিনিই ধন্য হবেন। সে ত্যাগ মানে আরও বড় করে পাওয়া, সে-ত্যাগের আগেই আমার আনন্দ।’

সমস্ত ক্লাস চুপচাপ, নতুন স্যার একটু থামলেন, তারপর উদ্ঘীব-হয়ে-থাকা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘সেই মায়ের পায়ে যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজীয়া তখন তাঁর এমন কত দামাল ছেলে বাঁপিয়ে পড়েছিল দুর্ঘটিনি মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে। একবারে না পারলে বলেছিল, একবার বিদায় দে মা সুরে আসি। এই মা দেশমাত্রক। তোমরা নতুন ভারতবর্ষের নাগরিক। আজ আমাদের মায়ের পায়ে বেড়ি নেইকো, অনেক রক্তের বিনিময়ে তিনি আজ মৃত্যু, কিন্তু এতদিনের শোষণে তিনি আজ রিজার্ব, মলিন, শীর্ণ। তোমাদের ওপর দায়িত্ব তাঁর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনবার। নাহলে তোমরা যাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ভাই। ব্যস, আজ এই পর্যন্ত।’ টেবিলের ওপর থেকে ডাঁচার বই তুলে নিয়ে স্যার ক্লাসরূম থেকে সোজা-মাথায় বেরিয়ে গেলেন। তাঁর খন্দেরে পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ বুবাতে পারেনি ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এইসব কথা এই ক্লুলের নতুন স্যার আসার আগে কেউ বলেনি। ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন হয়ে যায় মনটা। নতুন স্যার বলেছেন, ‘শিবাজীও একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের মোকাবা ছিলেন। শিবাজীর কথা শুনলে মনের মধ্যে কিছু হয় না, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু যখন বলেন ‘গীত যি ব্রাউ’ তখন হৃৎপিণ্ড দপদপ করে। এই ব্রাউ শব্দটা উচ্চারণ করার সময় নতুন স্যার এমন জোর দিয়ে বলেন অনিমেষ চট করে সেই ছবিটা দেখতে পায়, নিজের আঙ্গুলগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তীব্র কান্না পেয়ে যায়।

নতুন স্যার থাকেন হোটেলে। ওদের ক্লুলের সামনে বিরাট মাঠ পেরিয়ে হোটেল। কাঁদিনের মধ্যে অনিমেষের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল নতুন স্যারের। ওদের ক্লুলের অন্যান্য চিচার দীর্ঘদিন ধরে পড়াচ্ছেন। ওরা নতুন স্যারের সঙ্গে ছাত্রদের এই মেলামেলা ঠিক পছন্দ করেন না। একমাত্র ড্রিল স্যার বরেনবাবুর সঙ্গে নতুন স্যারের বক্তৃতা আছে। ওরা দুজন এক ঘরে থাকেন।

অনিমেষের পড়ার চাপ পড়েছে বলে সরিষ্পশেখর ভোরে আর ওকে বেড়াতে যেতে বলেন না। কিন্তু এইটুকু ছেলের মধ্যে যে চাঁপল্য ছটফটানি থাকার কথা অনিমেষের মধ্যে তা নেই। সারাদিনই যখনই বাড়িতে থাকে তখনই মুখ গুজে বই পড়ে। বই পড়ার এই নেশাটা ওর মধ্যে ঢুকিয়েছিল প্রিয়তোষ। ঢুকিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গিয়েছে সে। সরিষ্পশেখরের জীবনে আর-একটি আঘাত এই ছেট ছেলে। দিনরাত বাড়ির বাইরে পড়ে থাকত, কখন যেত কখন আসত হেমলতা ছাড়া কেউ টের পেত না। রাগারাগি করতে করতে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন সরিষ্পশেখর। চাকরিবাকরি করে না, তার কোনো সাহায্য হচ্ছে না, এ-ছাড়া এই ছেলের বিরুদ্ধে ওর অভিযোগ করার অন্য কারণ নেই। অনি তখন সবে ক্লুলে ভরতি হয়েছে। বাড়ি এলে অনির সঙ্গে আজড়া হত খুব। স্বর্গছেড়ায় ওর যে-আর্কষণের আভাস তিনি হেমলতার কাছে পেয়েছেন সেটা নিয়ে খুব দৃঢ়স্তা ছিল। কিন্তু ও যে আর স্বর্গছেড়ায় যায় না, জোর করেও তাকে স্বর্গছেড়ায় পাঠাতে পারেননি সেকথাও তো সত্যি।

তারপর সেই দিনটা এল। তিনি দিন বাড়ি আসেনি প্রিয়তোষ। সরিষ্পশেখর এখানে—সেখানে ওকে খুজেছেন। যে-ক’জন ওর সমবয়সি-ছেলেকে ওর সঙ্গে ঘূরতে দেখেছেন তারাও ওর হাদিস দিতে পারেনি। বিরক্ত চিন্তিত সরিষ্পশেখর ঠিক করেছিলেন প্রিয়তোষ এলে পাকাপাকি কথা বলে নেবেন

ভদ্রভাবে সে বাড়িতে থাকতে পারবে কি না।

তখন ওরা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন। ছোট বাড়িটায় পুরনো জিনিসপত্রের শুদ্ধাম করে রাখা হয়েছে। মাঝখানে বড় ঘরটায় সরিৎশেখের একা শোন, লাগোয় ঘরটায় হেমলতা। বাইরের দিকের ঘরটায় প্রিয়তোষ এবং অনিমেষ থাকত। অনিমেষকে সে বছরই প্রথম স্কুলে ভরতি করা হয়েছে, খুব কড়া স্কুল। এ-জেলার মধ্যে এই স্কুলের নামডাক সবচেয়ে বেশি। সরিৎশেখের নিজে গিয়ে ওকে ক্লাসে বসিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলেন ক্লাসে চুকে ছেলেটা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করবে। কিন্তু অনি ওর চলে আসার সময় খুব গঞ্জীরভাবে মাথা নাড়ল। অঙ্গুষ্ঠ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার। সেই জন্ম থেকে তিনি ওকে দেখছেন, ওর নাড়িনক্ষত্র জানা, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর ছেলেটা রাতারাতি পালটে যাচ্ছে। বিকলে স্কুল থেকে ফিরে চুপচাপ ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। প্রিয়তোষ ওর দিনিকে বলেছে রাতদুপুরে অনি নাকি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে কথা বলে না। হেমলতাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন সরিৎশেখের এটাই চাইছিলেন।

মাধুরী বেঁচে থাকতে কাকার সঙ্গে অনির খুব একটা ভাব ছিল না। বরং কারণে - অকারণে প্রিয়তোষ ওর উপর অত্যাচার করত। অনির কান দুটো প্রিয়তোষের আঙুলের বাইরে থাকার জন্য তখন প্রাণপণ চেষ্টা করত। মা মরে যাবার পর প্রিয়তোষের ব্যবহার একদম পালটে গেল।

নতুন স্যার তখন সদ্য স্কুলে এসেছেন। ওর কথাবার্তা, হাসি অনিমেষের খুব ভালো লাগছে। মাৰো-মাৰো যখন খুব শক্ত কথা বলেন তখন অনিমেষৰা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন দেশের গন্ধ করতে করতে নতুন স্যার জানতে পারলেন অনির মা নেই, অনি দেখল, ক্লাসের সমস্ত মুখগুলো ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। যেন মা নেই ব্যাপারটা কেউ ভাবতে পারছে না। নতুন স্যার ওকে দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। যেন মা নেই ব্যাপারটা কেউ ভাবতে পারছে না। নতুন স্যার ওকে কাছে ডেকে আদুর করে বললেন, 'মা নেই বোলো না। আমাদের তো দুটো মা, একজন চলে গেলেন ইংরেজের কাছে, কিন্তু আর-এক মা তো রয়েছেন। তুমি তাঁর কথা ভাববে, দেখবে আর খারাপ লাগবে না। বক্ষিমচন্দ্র বলে একজন বিরাট সাহিত্যিক ছিলেন, তিনি এই দেশকে মা বলেছিলেন, বলেছিলেন বন্দেমাতরম।'

প্রিয়তোষ সেই রাতে বাড়িতে ছিল। অনেক রাত জেগে কাকাকে বইগত পড়তে দেখত অনিমেষ। নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে প্রিয়তোষকে নতুন দিদিমণি যখন বন্দোমাতরম শব্দটা ওদের উচ্চারণ করেছিলেন তখন শব্দটার মানেটা ও ধরতে পারেনি। নতুন স্যার ওকে সে-রহস্য থেকে মুক্ত করেছেন। সব শুনে প্রিয়তোষ বলল, 'শালা কংগ্রেস।'

এই প্রথম অনিমেষ কাকাকে গালাগাল দিতে শুনল। স্বর্গছেঁড়ায় বাজারের বাস্তায় অনেক মদেসিয়া মাতালকে এই শব্দটা ব্যবহার করতে শুনেছে ও। মাধুরীর শ্রাদ্ধের সময় নদীয়া থেকে অনির মামামুরা এসেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন ওরা হলেন মহীতোষের শালা। রেগে গেলে এই সম্মেধনটাকে কেন লোকে গালাগালি হিসেবে ব্যবহার করে খুবতে পারে না অনিমেষ। আবার মদেসিয়াদের মুখে শুনতে যতটা-না খারাপ লাগত এই মুহূর্তে কাকার মুখে খুব বিচ্ছিরি লাগল। কংগ্রেস শব্দটা ও খবরের কাগজ থেকে জেনে গিয়েছিল। যেমন মহাজ্ঞা গাঙ্কী কংগ্রেসি, জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসি। দেশের জন্য যারা কাজ করে তারা কংগ্রেসি, তাদের মাথায় একটা সাদা টুপি থাকে। নতুন স্যারের মাথায় সাদা টুপি নেই, তা হলে তিনি কংগ্রেসি, তাদের মাথায় একটা সাদা টুপি থাকে। নতুন স্যারের মাথায় সাদা টুপি নেই, তা হলে তিনি কংগ্রেসি হবেন কী করেং আর যারা দেশের জন্য কাজ করে, দেশমায়ের জন্য জীবন দান করে তারা শালা হবে কেন! কিন্তু কাকার সঙ্গে তর্ক করা বা কাকার মুখেমুখে কথা বলতে সাহস পেল না অনিমেষ। কথা বলার সময় কাকার মুখ-চোখ দেখছিল ও, ভীষণ রাগী দেখাচ্ছিল তখন। কিন্তু কাকার কথা মেনে নিতে পারেনি, নতুন স্যারকে গালাগালি দিয়েছে বলে কাকার ওপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। সেদিন মাঝখানে অনির ঘুম ভেঙে গেলে দেখল কাকা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা বই ওর মাথায় তলার চাপা পড়ে দুমড়ে যাচ্ছে। হারিকেনের আলোটা কমালো হয়নি। অনেক রাত অবধি আলো জ্বলে রাখলে দাদু রাগ করেন, কেরোসিন তেল নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অনি উঠে আলো নেবাল না, কাকাকে ডাকল না। দাদু যদি এখন এখানে আসে বেশ হয়। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ও। একটা-দুটো করে তারা শুনতে শুনতে আস্তে-আসতে সেগুলো মায়ের মুখ হয়ে গেল। অনি স্থির হয়ে অনেকক্ষণ মাকে দেখল, তারপর নিজের মনে বলল, 'মা, যাঁরা দেশকে ভালোবাসতে বলে তাঁরা কি খারাপ?'

(না সোনা, কক্ষনো না ।)

'তাহলে কাকা কেন নতুন স্যারকে গালাগালি দিল?'

(কাকা রেঞ্জে গেছে তাই ।)

'আমি যদি দেশকে ভালোবাসি তুমি খুশি হবে তো?'

(আমি তো তা-ই চাই সোনা ।)

'মা, তোমার জন্য বড় কষ্ট হয় গো' কথাটা বলতেই অনির চোখ উপচে জল বেরিয়ে এল সেই জলের আড়াল ভেদ করে আনি আর কিছুই দেখতে পেল না। অনি লক্ষ করেছে যখনই সে মায়ের সঙ্গে কথা বলে, কষ্টের কথা বলে, তখনই চোখ জুড়ে নেমে আসে আর সেই সুযোগে মা পালিয়ে যায়। চোখ মুছে আর খুজে পায় না সে।

ক'দিন কাকা বাড়িতে আসেনি। দাদু অনেক খুঁজেও ছোট কাকার খবর পাচ্ছেন না। জলাইগুড়িতে হঠাতে একটা মিছিল বেরিয়েছে। অনি দেখেনি, কিন্তু ক্লাসে বস্তুদের কাছে শুনেছে সেটা নাকি কংগ্রেসিদের মিছিল নয়, তারা কংগ্রেসিদের গালাগালি দিচ্ছিল। পুলিশ নাকি খুব শাঠির বাড়ি মেরেছে। গোলমাল হবার ভয়ে স্কুল ক'দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় খবরের কাগজ পড়ে সরিষ্ঠেশের খুব উভেজিত হয়ে পড়ছিলেন। বাড়িতে খুব শক্ত ইংরেজি কাগজ রাখতে আরুভ করলেন তিনি, ওতে নাকি অনেক বেশি খবর থাকে।

ক'দিন বাদে অনেক রাতে দরজায় টকটক শব্দ হতে অনিমেষের ঘুম ডেক্সে গেল। কাকা না থাকলেও এক তত ও। হেমলতা আপত্তি করতে ও বলেছিল ওর তয় করবে না। পিসিমার বাবা দাদুর ঘর থেকে জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাব না। শব্দ শনে ও দেখল পাশের জানলার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ও চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিল, হঠাতে চাপা গলায় নিজের নাম শুনতে পেয়ে বুকল, কাকা এসেছে। চট করে উঠে গিয়ে দরজা খুলতে কাকা মুখে আতুল দিয়ে ইশারা করে ওকে চুপ করতে বলল, তারপর ঘরে চুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। অনিমেষ দেখল এই কয়দিনে কাকার চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাজামা আর শার্ট খুব য়লু, গালভরতি ছোট ছোট দাঢ়ি গজিয়েছে, ম্নান্টান হয়নি বোা যায়। ঘরে এসে কাকা প্রথমে হারিকেনটা বাড়িয়ে দিল, তারপর ওর খাটের তলা থেকে একটা চিনের সূটকেস টেনে বের করল। তালা খুলে ফেলতে দেখল, সামান্য কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া অনেকগুলো বই আর পত্রিকায় সেটা ভরতি। কাকা ওর সঙ্গে কথা বলছে না, একমনে বইগুলো উলটেপালটে দেখেছে। তারপর অনেকক্ষণ দেখেওনে কতগুলো বই আর পত্রিকা আলাদা করে বেধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চলে যেতে গিয়ে কী ভেবে আবার বাড়িলের ওপরের পত্রিকাটার ওপর বড় বড় করে লেখা আছে-'মার্কিসবাদী'। কাকা খুব ফিসফিস করে বলল, 'অনি, কেউ যদি আমার খোজে এখানে আসে তা হবে তাকে কক্ষনো বলবি না যে আমি এসে বইগুলো নিয়ে গেছি। বুবলি!'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, তারপর বলল, 'তুমি কেন চলে যাচ্ছ?'

কাকা বলল, 'ওদের পুলিশ আমাদের ধরে জেলখানায় নিয়ে যেতে চাইছে। আমাদের পার্টিকে ভ্যান করে দিয়েছে ওরা। মুখে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলবে, অথচ কাউকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে না।'

অবাক হয়ে অনি বলল, 'কারা?'

কাকা থেমে গেল প্রথমটা, তারপর হেসে বলল, 'ঐ বন্দোমাতরম পার্টি, কংগ্রেসিরা। তুই এখন বুবি না, বড় হলে যখন জানবি তখন আমার কথা বুবাতে পারবি।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু নতুন স্যার বলেছেন কংগ্রেসিরা দেশসেবক।'

ঘৃণায় মুখটা বেঁকে গেল যেন, কাকা বলল, 'দেশসেবা! একে দেশসেবা বলে? তিক্ষে করার নাম দেশসেবা! ইংরেজদের পা ধরে ভিক্ষে করে রান্তের অঙ্ককারে চোরের মত হাতে ক্ষমতা নিয়ে দেশসেবা হচ্ছে! আমরা বলেছি এ আজাদি বুটা হ্যায়। আমরা এইরকম স্বাধীনতা চাই না যে-স্বাধীনতা শোষণের হাত শক্ত করে। তাই ওরা আমাদের গলা টিপতে চায়। ওদের হাতে পুলিশ আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু আমাদের শরীরে রক্ত আছে-যাক, এসব কথা এখন তুই বুবি না।'

আমাদের শরীরে রক্ত আছে। কথাটা শুনেই অনি নিজের আঙুলের দিকে তাকাল, তারপর ওর

মনে পড়ল, ‘গিড মি ব্লাড’, আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। সুভাষচন্দ্র বসুর দুইরকম ছবি দেখেছে ও। একটা ছবিতে সাদা টুপি মাথায় আর একটা ছবিতে মিলিটারি জামা টুপিতে একটি হাত সামনের দিকে বাঢ়ানো। সুভাষচন্দ্র বসু কি কংখেসি ছিলেন না? ও কাকার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলল, ‘তোমরা কি সুভাষচন্দ্র বসুর লোক হয়েছ?’

অবাক হয়ে গেল প্রিয়তোষ, তারপর বলল, ‘না, আমরা কথিতিনিষ্ঠ। আমরা চাই দেশে গরিব বড়লোক থাকবে না, সবাই সমান, তা হলেই আমরা স্বাধীন হব। আমি যাচ্ছি অনি, তুই কাউকে বলিস না আমি এসেছিলাম। আর মনে রাখিস এ আজাদি ঝুটা হ্যায়।’

খুব সন্তর্পণে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল প্রিয়তোষ। দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষ। কাকা যেসব কথা বলে গেল তার মানে কী? আমরা কি স্বাধীন হইনি! নতুন স্যারের কথার সঙ্গে কাকার কথার কোনও মিল নেই কেন? নতুন স্যার বলেছেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমরাই আমাদের রাজা। ইংরেজরা যে শোষণ করে দেশকে নিঃশ্ব করে গেছে এখন আমাদের তার শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে। আর কাকা বলে গেল এ-স্বাধীনতা মিথ্যে, তবে কি আমরা এখনও পরাধীন? কিছুই ঠাওর করতে পারল না অনিমেষ। সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ও দেখল, কাকা তাড়াতাড়িতে বইপত্র নিয়ে যাবার সময় ভুল করে সুটকেস বন্ধ করেনি। পায়ে পায়ে অনিমেষ সুটকেসটার কাছে এল। দুটো ধূতি, পাজামা, দুটো শার্ট রয়ে গেছে সুটকেসে। জামাকাপড় তুলতেই তলায় একটা পুরুনো খবরের কাগজ। অনিমেষ দেখল, কাগজ জড়ে একটা মানুষের ছবি, যার মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। কৌতুহলী হয়ে কাগজটা তুলতে ও দেখল কাগজটা কাটা, ছবির মুখ নেই। একটা নীল কাগজ সুটকেসের তলায় সেঁটে থাকতে দেখল সে। কাগজটা বের করে আবার সবকিছু ঠিকঠাক রেখে সুটকেসের খাটের তলায় চুকিয়ে দিল ও।

নীল কাগজটা খুলতেই সুন্দর করে দেখা কর্যকটা মাইন দেখতে পেল অনিমেষ। গোটা-গোটা করে লেখা, কোনো সঙ্গে নেই। লেখার শেষে নামটা পড়ে অবাক হয়ে গেল ও। তপুপিসি লিখেছে, কাকে লিখেছে তা হলে শ্রীচরণেশ্বৰ বা পংজনীয় নেই কেন? তপুপিসি তো কাকার চেয়ে অনেক ছোট। শুদ্ধাম্বাবুর বাড়িটার কথা মনে পড়ল। তপুপিসি কুচবিহারে পড়ত। চিঠিটা পড়া শুরু করল অনিমেষ। ‘পৃথিবীতে তিরকাল মেয়েরাই ঠকবে এটাই নিয়ম, আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন? আমি খুব সাধারণ মেয়ে, আমি সুন্দরী নই। তোমার ওপর জোর করব সে-অধিকার আমার কোথায়? এখানে যখন ছিলে তখন তোমায় কিছুটা বুবাতাম। শহরে যাওয়ার পর তুমি কী দ্রুত পালটে গেলে। তোমার রাজনীতিই এখন সব, আমি কেউ নই। হঠাৎ মনে হল, তুমি তো আমাকে কোনোদিন কথা দাওনি, তোমাকে দোষ দিই কী করে। তুমি তো যোবনের ধর্ম পালন করেছিলে। কী বোকা আমি! তাই তুমি যত ইচ্ছা রাজনীতি করো, আমি দায় তুলে নিলাম।—তপু।’

তপুপিসি কেন এই চিঠি লিখেছে বুবাতে পারছিল না অনিমেষ। কিন্তু তপুপিসি খুব দুঃখ পেয়েছে, কাকা রাজনীতি করে বলে তপুপিসির খুব কষ্ট হয়েছে। রাজনীতি করা মানে কী? এই যে কাকা বাড়িতে থাকে না আজকাল, উশকোখুশকো হয়ে ঘুরে বেড়ায় চোরের মতো একে কি রাজনীতি বলে? এসব করলে কি আর তপুপিসির সঙ্গে ভাব রাখা যায় না? কিন্তু তপুপিসি কেন লিখেছে আমি সুন্দরী নই! সারা বর্গছেড়য়ায় তপুপিসির চেয়ে সুন্দরী মেয়ে তো কেই নেই, এক সীতা ছাড়া। কিন্তু সীতা তো ছোট। বড় হলে নাকি চেহারা পালটে যায়। বড় হ্বার পর সীতাদা তপুপিসির মতো সুন্দরী না-ও হতে পারে। এমন সময় অনিমেষ শুনতে পেল একটি গাড়ি খুব জোরে এসে শব্দ করে বাড়ির সামনে থামল। তিন-চারটে গলায় কথাবার্তা জুতোর শব্দ চারধারে ছড়িয়ে পড়তে ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। প্রথমে বুবাতে-না-বুবাতে দরজার প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ উঠল। আওয়াজটা ওর ঘরের দরজায়, দ্রুতহাতে কে শব্দ করছে, দরজা ভেঙে ফেলা যোগাড়। অনি কী করবে বুবাতে পারছিল না, এমন সময় সরিৎশেখেরের গলা শুনতে পেল ও। শব্দ ওলে ঘূম ভেঙে চিঢ়কার করছেন, ‘কে? কে?’ শব্দটা থেমে গেল আচমকা, একটা বাজবাই গলায় কেউ বলে উঠল, ‘দুরজা! খুলুন, পুলিশ।’

পুলিশ। অনিমেষ বুবাতে পারছিল না সে কী করবে। পুলিশ তাদের বাড়িতে আসবে কেন? ছেলেবেলা থেকে পুলিশ দেখলে ওর কেমন ভয় করে। সরিৎশেখেরের চ্যাচানি বন্ধ হয়ে গেল আচমকা। অনিমেষ শুনল দাদু উঠে তার নাম ধরে ডাকছেন। সে দুর্বল তার গলা ওকিয়ে গেছে, দাদুর ডাকে সাড়া দিতে পারছে না। বিদ্যাসংগ্রহি চিঠিটে শব্দ করতে করতে ডেতেরের দরজা খুলে দাদু এ-ঘরে এলেন। ঘরের মধ্যখানে আলো জ্বালিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাদু খুব অবাক হলেন,

‘কী হল, তুমি ঘুমোওনিঃ’

ঘাড় নেড়ে অনিমেষ বলল, ‘পুলিশ।’

সরিষ্পেখর বললেন, ‘আমি দেখছি, তুমি পিসিমার কাছে যাও।’

কথাটা শব্দে অনিমেষ ভেতরের ঘরে চুক্তে ধমকে দাঁড়াল। ঘরটা অক্কার, একদিকে পিসিমার ঘরে, অন্যদিকে দানুর ঘরে যাবার দরজা। অনিমেষ শুনতে পেল পিসিমা বিড়বিড় করে ‘জয় গুরু জয় গুরু’ বলে যাচ্ছেন। অনিমেষ দরজার পাশে দাঢ়িয়ে উকি মেরে দেখল দানু দরজা খুলে দিতেই হড়মড় করে কয়েকজন পুলিশ ঘরের মধ্যে চুক্তে পড়ল। প্রথমে যে এল তার হাতে রিভলভার দেখল অনিমেষ। পুলিশরা ঘরে চুক্তে পড়তেই সরিষ্পেখর ধমকে উঠলেন, ‘কী ব্যাপার, এত রাত্রে আমার বাড়িতে আপনারা কেন এসেছেন, কী চান?’

রিভলভার-হাতে পুলিশটা বলল, ‘আপনার ছেলে কোথায়?’

সরিষ্পেখর অবাক হলেন, ‘ছেলেঁ ও, আমার বড় ছেলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।’

পুলিশটা বলল, ‘ন্যাকামো করবেন না, আপনার ছোট ছেলে প্রিয়তমের কথা জিজ্ঞাসা করছি।’

সরিষ্পেখর ঘাড় নাড়লেন, ‘জানি না।’

চিবিয়ে চিবিয়ে লোকটা বলল, ‘জানেন না! এই বাড়ি সার্ট করো।’

কথাটা বলতেই অন্য পুলিশগুলো রিভলভার বের করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে জিনিসপত্র উলটোপালটো দেখতে লাগল। সরিষ্পেখর দুহাত তুলে তাদের খামাতে গেলেন, ‘আরে কী করছেন কী আপনারা? আমি কালই ডি.সি.-র সঙ্গে কথা বলব। আমাকে আপনারা অপমান করতে পারেন না। কী করেছে আমার ছেলেঁ?’

প্রথম লোকটি বলল, ‘বাপ হয়ে জানেন না ছেলে কমিউনিস্ট হয়েছেঁ দেশ উদ্ধার করেছেন সব। সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। ওর নামে ওয়ারেন্ট আছে। কাজে বাধা দেবেন না, ওর বইপত্র আমরা দেখব। ও বাড়িতে এসেছে এ-খবর আমরা পেয়েছি।

সরিষ্পেখকর বললেন, ‘আজ ক’দিন সে বাড়িতে নেই। আমি বলছি সে বাড়িতে নেই। কিন্তু সে কমিউনিস্ট হল কবে?’

লোকটি বলল, ‘এই তো, বাপ হয়েছেন অথচ ছেলের খবর রাখেন না।’

সরিষ্পেখর রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ‘মুখ সামলে কথা বলবেন। জানেন সারাজীবন আমি কংগ্রেসকে সাহায্য করছি। দরকার হলে এই জেলার মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি কি ভাবছেন এখনও ত্রিপল আমল রয়েছে যে এইসব কথা বলবেন?’

পুলিশ বলল, ‘মশাই, আমল বদলায় আপনাদের কাছে আমরা হস্তুমের চাকর। আমাদের কাছে ব্রিটিশরা যা এই কংগ্রেসিও তা, হস্তুম তামিল করব। সবাই আমাদের সাহেব। যান, বেশি বকাবেন না, আমাদের সার্ট করতে দিন।’

অসহায়ের মতো সরিষ্পেখর ধপ করে অনিমেষের খাটে বসে পড়লেন। অনিমেষ শুনল, দানু বিড়বিড় করছেন, ‘প্রিয় কমিউনিস্ট হয়েছে, কমিউনিস্ট!’ ততক্ষণে পুলিশগুলো ঘর তচনছ করে ফেলেছে। অনির বইপত্র ছবিকার, কাকার, সুটকেসটা খালি হয়ে ঢঁ করে মাটিতে পড়ল। একটা লোক বলল, ‘এ-ঘরে কিছু নেই স্যার।’

প্রথম পুলিশ বলল, ‘পালাবে কোথায়? বাড়ি দেরাও করা আছে। অন্য ঘর দ্যাখো।’ পুলিশগুলোকে এদিকে আসতে দেখে অনিমেষ দোড়ে পিসিমার ঘরে ঢেলে এল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল হাতের মুঠোয় তপুপিসির চিঠিটা যায়ে গেছে। এই চিঠিটা পেলে পুলিশরা নিচয়ই কাকার সঙ্গে খারাপ খ্যবহার করবে। তপুপিসি তো লিখেছে কাকা রাজনীতি করে। অনিমেষের মনে হল, রাজনীতি করা যাবে কমিউনিস্ট ইওয়া। চিঠিটা লুকিয়ে ফেলা দরকার। কী করবে কোথায় রাখবে বুবাতে না পেরে সে চিঠিটাকে পেটের কাছে প্যাটের ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শেঁজিটা টেমে দিল। দিতেই সে দেখল হেমলতা তার দিকে একদাটে তাকিয়ে আছেন। ঘরের এককোণে ঠাকুরের ছবির তলায় একটা ডিমবাতি জুলছে। হেমলতা নিজের বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন। চোখাচোঁ টর্চ ছেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। একজন ওদের মুখে টর্চ ফেলতে হেমলতা বললেন, ‘চোবে আলো ফেললেন না, কী চাই আপনাদের?’

একটা লোক খ্যাকখ্যাক করে হেসে বলল, ‘রাতদুপুরে জেগে বসে আছন যে, প্রিয়তোষ
কোথায়?’

হেমলতা সঙ্গোরে উত্তর দিলেন, ‘রাতদুপুরে বাড়িতে ডাকাত পড়লে কেউ নাকে তেল দিয়ে
যুমোয় না। আমার ভাই বাড়িতে নেই।’

লোকগুলো তন্মত্ব করে ঘরের জিনিসপত্র ধাঁটছিল। হেমলতা উঠে দাঁড়ালেন, ‘খবরদার, আমার
ঠাকুরের গায়ে কেউ হাত দেবেন না।’

যে-লোকটা সেদিকে এগিয়েছিল সে হেমলতার মূর্তি দেখে থমকে গেল। পেছন থেকে একজন
বলল, ‘ছেড়ে দে, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে কমিউনিট পতিকা থাকে না।’

হঠাতে একটা লোক অনিমেষের দিকে এগিয়ে এল গটগট করে, ‘ওহে শোকাবাবু, তোমার নাম
কী?’

অনিমেষ কোনোরকমে বলল, ‘অনিমেষ।’

লোকটি চিবুক ধরতে অনিমেষের হাত পেটের কাছে চলে গেল সড়াৎ করে, ‘এই যে মিঃ মেষ,
প্রিয়বাবু তোমার কে হয় বলো তো?’

‘কাকা।’ মুখ উচু করে ধরে ধাক্কায় অনিমেষের ঘাড়ে লাগছিল।

‘কাকা! শুভ। একটু আগে সে এখানে এসেছিল আমরা জানি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?’

অনিমেষ কোনোদিন মিথ্যে কথা বলেনি। যা বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। অনি এখন
কী করবে? সত্ত্ব কথা বললে কি কাকার খারাপ হবে? কাকা তো চলে গিয়েছে এখান থেকে এই
বাড়িতে কাকাকে খুঁজে পাবে না ওরা। তা হলেও সত্ত্ব কথাটা বলে দেবে? লোকটা তখনও ওর মুখ
এমন জোরে উচু করে রেখেছে যে ঘাড় টানটান করছে। লোকটা ধরকে উঠল, ‘কী হল?’

অনিমেষ ফিসফিসিয়ে বলল, ‘আঃ!’

লোকটি বলল, ‘কী? না! বলে অনিমেষের মুখটা ছেড়ে দিল, ‘শালা বাড়িসুন্দ লোক ট্রেইভ হয়ে
রয়েছে। বুঝলে মিতির, এই বাচ্চাটা যখন বড় হবে তখন এই প্রিয়তোষদের চেয়ে ধাইজেভ টাইমস
ফেরোসাস হবে। ওইসব থিএরিটিকাল কমিউনিটগুলো তখন পাঠাই পাবে না। শালা এইটকুনি
বাচ্চাও কেমন ট্রেইভ লায়ার! কথাগুলো বলে লোকগুলো অন্য ঘরে চলে গেল।

পাথরের মতো বসে ছিল অনিমেষ। হঠাতে ওর খেয়াল হল পুলিশটা ওকে দায়ার বলল। লায়ার
মানে মিথ্যুক। কখনো না, ও মিথ্যুক নয়। ও কিছুই বলেনি, পুলিশটা নিজে নিজে মনে করে নিয়েছে।
ও দোড়ে পুলিশটাকে কাছে যেতে উঠে পড়তেই হেমলতা ওকে চট করে ধরে ফেলেন, ‘কোথায়
যাচ্ছিস?’

অনিমেষ ছটফট করছিল, ‘ওরা আমাকে দায়ার বলে গালাগালি দিল। আমি কক্ষনো মিথ্যে বলি
না। যা তা হলে রাগ করবে। বলো আমি কি মিথ্যুক?’

দুহাতে ওকে কাছে টেনে নিলেন হেমলতা, ‘কাকু কি এসেছিল?’

ঘাড় নাড়ল অনি, ‘হ্যাঁ, এসে বইগুরু নিয়ে গেছে।’

হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী বইঃ?’

অনি বলল, ‘জানি না। তবে একটা বই-এর নাম মার্কসবাদী। আমাকে ছাড়ো, আমি ওদের সত্ত্ব
কথা বলে দিয়ে আসি, আমি লায়ার নই। যা বলে গেছে সত্ত্ব বলতে।’

হেমলতা কেঁদে ফেলেন, ‘অনি বাবা, যুধিষ্ঠিরও একসময় মিথ্যে বলেছিলেন। কিন্তু তুম তো
বললি, ওরা তোমার কথা ভুল বুঝেছে। আমার কাছে বসে তুমি মনে মনে মাকে ডাকো, দেখবে তিনি
একটুও রাগ করেননি।’

সমস্ত বাড়ি তচনছ করে পুলিশের গাড়ি শব্দ করে ফিরে গেল। ওরা চলে গেলে বাড়িটা আচমকা
নিষ্পত্ত হয়ে গেল যেন। কোথাও কোনো শব্দ নেই, পিসিমার পাশে অনি গা-রেঁমে বসে, সরিয়েল্লেখের
শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তিতার একগাদা শেয়াল নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। এই
রাতে, এখন, জলপাইগুড়ি শহরটা চুপচাপ স্থিয়ে। অনিমেষ প্রিয়তোষের কথা ভাবছিল, কাকা
নিশ্চয়ই স্থিয়ে নেই। কাকাকে খুঁজতে পুলিশটা চারধারে ছুটে বেঢ়াচ্ছে। কাকা তো কাউকে হত্যা

করেনি, কিন্তু পুলিশগুলোর মুখ দেখে মনে হল সেইরকম খারাপ কিছু কাকা করেছে। এখন কাকা কোথায়? কাকা কেন স্বর্গছেড়ায় পালিয়ে যাচ্ছে না? স্বর্গছেড়ায় কোনোদিন পুলিশ যায় ন্য, কাকা সেটা ভুলে গেল কী করে!

এমন সময় শব্দ করে বাইরে দরজাটা বন্ধ হল। বিদ্যাসাগরি চট্টির আওয়াজটা এ-ঘরের দরজায় এসে থামল। অনি তাকিয়ে দেখল দাদুর চোখে চশমা নেই, কেমন রোগা লাগছে মুখটা। অস্তুত শৃণ্য গলায় সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘বুবালে হেম, এই শুরু হল, আমাকে আরও যে কত দেখে যেতে হবে!’

হেমলতা খুব ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হয়েছে?’ *

চিঠ্কার করে উঠলেন সরিষ্ঠেখর, ‘তোমার ভাই কমিউনিটি হয়েছে, আমার গুষ্টির পিতি হয়েছে।’

হেমলতা বললেন ‘কমিউনিটি সে আবার কী?’

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘দেশ উদ্ধার করছেন, আমরা যে এতদিন পর স্বাধীনতা পেলাম তাতে বাবুদের মন উঠেছে না, সারা দেশ তাতিয়ে বেড়াচ্ছেন। মেরে হাড় ভেঙে দেবে জগত্তরলাল। আমি এসব বরদাস্ত করব না, একটা মাতাল লস্পটকে তাড়িয়েছি, এটাও যেন কোনোদিন বাড়িতে না দোকে। এই ছেলের জন্য এত রাত্রে আমাকে হেনস্তা হতে হল।’

হেমলতা বললেন, ‘প্রিয় আবার কবে ওসব দলে ভিড়ল।’

সরিষ্ঠেখর বেঁকিয়ে উঠলেন, ‘তোমারই তো দোষ, নিজের ভাই কী করছে খেয়াল রাখতে পার না।’

হেমলতা উত্তেজিত হরেন, ‘আমার ভাই, কিন্তু আপনার তো ছেলে।’

সরিষ্ঠেখর একটুও অপস্থিত না হয়ে বলে চললেন, ‘তখন যদি শুদ্ধামবাবুর মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতাম তা হলে আর এই দুর্ভোগ হত না। তুমিই তো তখন খ্যাক খ্যাক করেছিল।’

হেমলতা কোনো জবাব দিলেন না। প্রিয়তোষের ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না ঠিক। কিন্তু শুদ্ধামবাবুর মেয়ে তপুকে বাড়ির বউ হিসেবে মাধুরীর পাশে তিনি ভাবতেই পারেন না।

এমন সময় সরিষ্ঠেখর অনিমেষের দিকে তাকালেন, ‘তুমি এত রাত্রে জেগে ছিলে কেন?’

অনিমেষ ভয়ে-ভয়ে দাদুর দিকে তাকাল। রাগলে দাদুকে ভয়ংকর দেখায়। কী বলবে তাবতে—না—ভাবতেই সরিষ্ঠেখর ধমকে উঠলেন, ‘কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দাও না কেন? ভাগিয়ে হেমলতা একটা হাত ওর পিঠের ওপর ছিল নইলে সে কেন্দে ফেলত। সরিষ্ঠেখর এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘প্রিয়তোষ কি এসেছিল?’ চট করে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, ‘হ্যাঁ।’ প্রথম ধেকেই এইরকম একটা সন্দেহ করেছিল সরিষ্ঠেখর, কিন্তু নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে এখন হতবাক হয়ে গেলেন। পুলিশ অফিসারটা যখন ধমকাছিল তখন অনিমেষ একথা শীর্কার করেনি তো! এটুকু শিশু— সরিষ্ঠেখর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমাকে ডাকনি কেন?’

বিড়বিড় করে অনিমেষ বলল, ‘আমাকে শব্দ করতে মানা করেছিল কাকা। আমার মন-খারাপ লাগছিল।’

‘কেন?’

‘কাকার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, জামাকাপড় ময়লা।’

‘হ্যাঁ। কী করল সে?’

‘বইপত্র নিয়ে চলে গেল।’

‘কী বই?’

‘অনেক বই। একটার নাম মার্কসবাদী।’

‘ও! সর্বাশ তা হল অনেক ভেতরে গেছে। কী বলল?’

‘আমি সব কথা বুঝিনি, শুধু একটা কতা মনে আছে—এ আজাদি খুঁটা হ্যায়।’

‘হ্যাঁ হ্যায়।’ চিঠ্কার করে উঠলেন সরিষ্ঠেখর, ‘সব জেনে বসে আছে, আজাদির তোরা কী বুঝিস রে। নেতাজিকে গালাগালি দিস, রুবিন্দ্রনাথকে গালাগালি দিস, সুন্দরীম বাঘা যতীন-এন্দের কথা ভুলে যাস—ননসেস।; হঠাৎ অনির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘এসব একদম বাজে কথা, তুমি

কান দিও না।'

নিজের ঘরের দিকে যেতে-যেতে তাঁর মনে পড়ল এই বালকটি আঠারো বছর বয়সে জেলে যাবে। বুকের ভিতর দুরমুশ শুরু হয়ে গেল ওর-কী জানি-আজ রাত্রে তাঁর বীজবপন হয়ে গেল কি না। ওর দিকে নজর রাকচে হবে, ওকে নিজের মতো করে গড়তে হবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সরিষ্পেখের দেখলেন পায়েপায়ে অনিমেষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ওর হাঁটার ধরন দেখে খুব অবাক হলেন সরিষ্পেখের। খুব শাস্ত গলায় নাতিকে ডাকলেন তিনি, 'কছু বলবে?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। তাঁরপর সরিষ্পেখের একদম কাছে এসে পেটের ওপর প্যাটের ভাঁজ থেকে সেই নীল চিঠিটা বের করে দাদুকে দিল। অবাক হয়ে চিঠিটা নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন সরিষ্পেখের, টেবিলের ওপর রাখা চমশাটা তুলে সেটা পড়লেন। অনেকক্ষণ বাদে ডাক এল অনিমেষে, 'তুমি এটা কোথায় পেলো?'

'কাকার সুটকেসে।'

'পড়েছো?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ'

চোখ বন্ধ করলেন সরিষ্পেখের, 'কিছু বুবোছ?'

ভয়ে-ভয়ে অনি ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'হ্যাঁও। শয়ে পড়ো। প্রিয়তোষ যদি আসে আমাকে না বলে দরজা খুলবে না।'

চলে যেতে-যেতে অনিমেষ দেখল দাদু আলমারির ভেতর চিঠিটা রেখে দিয়ে তালা বন্ধ করছেন।

হঠাতে অনির মন্টা তপুপিসির জন্য কেমন করে উঠল।

ঙুলের প্রথম বছরে অনিমেষের ঝর্গহেঁড়ায় যাওয়া হয়নি। মহীতোষ ওখানে অত বড় কোয়ার্টারে একা আছেন বাড়িকে নিয়ে। সে-ই রান্নাবান্না করে সংসার সামলায়। গরমের ছুটিতে বা পূজার সময় সরিষ্পেখের ভেবেছিলেন নাতিকে পাঠাবেন, কিন্তু মহীতোষই আপত্তি করেছেন। ওখানে গেলে মাধুরীর কথা বারংবার মনে হবে অনিমেষের। হেমলতার হয়েও মুশকিল, হাজার দোষ করলেও ভাইপোকে বকামারা চলবে না, সরিষ্পেখেরে হ্রস্ব। মহীতোষ দুদিন ছুটি থাকলেই শহরে চলে আসেন, কিন্তু ছেলের সঙ্গে ইচ্ছে থাকলেও মিশতে পারেন না ঠিকমতো। কোথায় যেন আটকে যায়। ঐটুকুনি ছেলে একা একা শোয়, একা একা বাগানে ঘোরে, কী গভীর দেৰায়। পড়াশুনায় রেজাল্ট ভালোই হচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই সরিষ্পেখেরকে বলেছেন, হি ইং একসেপনাল, অত্যন্ত লাজুক। জলপাইগুড়ি শহরে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে আর তেমন হইচই হচ্ছে না। কংগ্রেসের মিছিল বেরঞ্জে ঘনঘন। প্রিয়তোষের খবর পাওয়া যায়নি আর। মহীতোষের এক ক্লাসমেট জলপাইগুড়ি থানায় পোষ্টেড হয়ে এল, সেও কোনো খবর দিতে পারল না। পরিষ্টোষ আসামে এক কাঠের ঠিকাদারের কাছে সামান্য মাইনেতে কাজ করছে এ-খবর মহীতোষ পেয়েছেন। যে খবর এনেছে সে প্রিয়তোষের বউকে নাকি দেখেছে। খবরটা বাবাকে জানাতে পারেননি মহীতোষ। বড়দার কথা তুলেই বাবার মেজাজ ঢেড় যায়।

হেমলতা জলপাইগুড়িতে আসার পর হঠাতে যেন বুড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই অস্বল হচ্ছে আজকাল, কিছু খেলে হজম হয় না ঠিক। সব কাজ শেষ করে খেতে-খেতে চারটে বেজে যায়। সেই সময় অনিমেষ আসে। পিসিমার আলোচালের ভাত নিরামিষ তরকারি দিয়ে খেতে ও খুব ভালোবাসে। সরিষ্পেখের সন্দেহ অনিমেষের সঙ্গে থাবার জন্যেই হেমলতার চারটের আগে খেতে বসা হয় না। অনেক বকাখকা করেছেন, কোনো কাজ হয়নি। নিজের হাতে রান্না সেরে সরিষ্পেখেরকে খাইয়ে সমস্ত বাড়ি খেড়েয়ে বাসন মেজে তবে নিজের নিরামিষ রান্না শুরু করবেন হেমলতা। একটু পিটপিটে শৰ্ভাব আগেও ছিল, সরিষ্পেখের লক্ষ করেছেন ইদানীং সেটা আরও বেড়েছে। চবিশ ঘটা জল খেটে ঘেঁটে দুপায়ের আঙুলের ফাঁকে সাদা হাজা বেরিয়ে গেছে, অনিমেষের মুখে সরিষ্পেখের সদ্য সেটা জানতে পারলেন। বিকলে যখন ওরা মুখোমুখি খেতে বসে সে-দৃশ্য বেশ মজার। পিড়িতে বাবু হয়ে বসে অনিমেষ, হেমলতা অত বড় ছেলেটাকে ভাত, তাৰকারি মেখে গোল্লা পাকিয়ে দিয়ে নিজে

মাটিতে উৰু হয়ে বসে খাওয়া শুরু কৱেন। প্রায় একই সংলাপ দিয়ে খাওয়া শুরু হয় রোজ, সরিৎশেখৰ চুৰি কৱে শুণেছেন। অনিমেষ বলে, ‘মাকে তুমি ফ্ৰক পৰা দেখেছ?’

হেমলতা খেতে-খেতে বলেন, ‘পনেৱো বছৱেৱ মেয়ে ফ্ৰক পৰবে কী! তবে বিয়েৰ আগেৰ দিনও নাকি রান্নাঘৰে ঢোকেনি। তোৱ দাদু ঘৰন দেখতে গিয়েছিল তখন ওৱা বৰু ভুজুং দিয়েছিল—এই বাঁধতে পাৱে সেই বাঁধতে পাৱে।’

‘তাৰপৰ?’

‘তাৰপৰ আৱ কী! বিয়েৰ পৰ আমি বেঁধে দিতাম আৱ তোৱ দাদু জানত মাধুৰী বেঁধেছে। তবে খুব চটপট শিখেছিল।’

‘মা দেখতে খুব সুন্দৰী ছিল, না?’

মুখটা খুব মিষ্টি ছিল তবে ভীষণ মোটা। হাতটাতগুলো কী, এক হাতে ধৰা যায় না! মাথায় চুল ছিল বটে, হাঁটুৱ নিচ অবধি নেমে আসত। দুহাতে চুল বাঁধতে হিমশিম খেতে হত। একদিন রাগ কৱে অনেকটা কেটে দিলাম।’

‘মা মোট ছিল?’ অনিমেষেৰ গলায় বিস্ময়।

‘তু। বাবাৱ তো ঐৱকম পছন্দ ছিল। আমাৱ প্ৰথম মা’ৱ নাকি পাহাড়েৰ মতো শয়ীৱ ছিল। বিয়েৰ পৰা আমৱ! তোৱ মাকে নিয়ে খুব ঠাণ্টা কৱতাম। তাৰপৰ ভুই হতে কেমন রোগা-ৱোগা হয়ে গেল।’

তাৰপৰ অনেকক্ষণ চৃচাপ দুজনে কথা না বলে খেয়ে যায়। বিকেলেৰ অনিব এই ভাত খাওয়াটা একদম পছন্দ কৱেন না সরিৎশেখৰ। কিন্তু মেয়েৰ জন্য কিছু বলতেও পাৱেন না। অনেক কিছু এখন মেনে নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। সরিৎশেখৰ বুবাতে পাৱছেন তাৰ পুঁজি দ্রুত ফুৰিয়ে আসছে। এতদিন চা-বাগানেৰ চাকৰিতে মাইনে ছাড়া বাড়িতে কোনো উপাৰ্জন কৱেননি। বিলাসিতা ছিল না তাই জমানো টাকাৱ বেশিৰ ভাগ দিয়ে এই বাড়িটা তৈৰি কৱাৱ পৰ হাতে যা আছে তাতে মাঝ কয়েক বছৱ চলতে পাৱে। এখনও তাৰ স্বাস্থ্য ভালো, ইচ্ছে কৱলে এই শহৱেৰ কোনো দেশি চা-বাগানেৰ হেড অফিসে একটা চাকৰি জুটিয়ে নিতে পাৱেন, কিন্তু আৱ গোলামি কৱতে প্ৰবৃত্তি হয় না। চা-বাগানেৰ ইতিহাসে এতদিন পেনশনেৰ ঘ্যাপারটাই ছিল না। রিটায়াৱ কৱাৱ পৰ অনেক লেখালেখি কৱে কলকাতা থেকে তাৰ জন্য পঁচাত্তৰ টাকাৱ একটা মাসিক পেনশনেৰ অনুমতি আনিয়েছেন। সরিৎশেখৰেৰ ধাৰণা তাৰ চিঠিটো চেয়ে ম্যাকফার্সনেৰ স্পৃহাশ বেমি কাজ কৱেছে। মেমসাহেব এখনও প্ৰতি সন্দেশ তাঁকে চিঠি লেখেন ডিয়াৱৰ বাবু বলে। স্বৰ্গজ্বালোৱ জন্য কষ্ট হয় তাৰ, সরিৎশেখৰকে তিনি ভোলেননি—এইসব। টানা-টানা হাতেৰ লেখা। অনিমেষকে সে-চিঠি পড়ান সরিৎশেখৰ। খামেৰ ওপৱ ভাকঘৰেৰ ছাপ থেকে দেখাটাকে নাতিৰ কাছ উপস্থিত কৱতে চেষ্টা কৱেন। মিসেস ম্যাকফার্সন লিখেছিলেন তোমাৱ গ্ৰাহণ যখন এখনে ব্যাবিষ্টিৱ পড়তে আসবে তখন সব খৰচ আমাৱ। সরিৎশেখৰ অনিমেষকে বিলেতে পাঠাবেন বলে যখন ঘোষণা কৱেন তখন সময়েৰ হিসাব তাৰ হারিয়ে যায়। পেনশন পাৰাৱ পৰ চলে যাচ্ছে একৱকম। তিনটো তো প্ৰাণী, এতবড় বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। মহীতোষ তাঁকে টাকা পাঠাতে চেয়েছিলেন প্ৰতি মাসে, রাজি হননি তিনি। বলেছিলেন তা হলো ছেলেকে হোটেলে রাখো। আৱ কথা বাড়াননি মহীতোষ। টাকাৱ দৱকাৰা হলো বাড়ি ভাড়া দিতে পাৱেন সরিৎশেখৰ। এটা তাৰ একধৰনেৰ আনন্দ। কেউ ভাড়া চাইতে চলে তাকে মুখেৰ ওপৱ না বলে দিয়ে মেয়েৰ কাছে এসে বলেন, ‘বুবালে হৈম, এই যে বাড়িটা দেখছ—এই হল আমাৱ আসল ছেলে, শেষ বয়সে এই আমাকে দেখবে।’

এখন প্ৰতি বছৱ তিস্তাৱ ফ্লাই আসে। যেমনভাৱে নিয়ম মেনে বৰ্ষা আসে শীত আসে তেমনি বন্যাৰ জল শহৱে চুকে পড়ে। নতুন বাড়িতে ঘোঁষৰ পৰ জল আৱ জিনিসপত্ৰ নষ্ট কৱাৱ সম্বোগ পাৱে না। শুধু প্ৰতি বছৱ সরিৎশেখৰেৰ বাগানেৰ ওপৱ পলিমাটিৰ শৰটা বেড়ে যায়। এখন নদী দেখলে সরিৎশেখৰ বুবাতে পাৱেন দুএকদিনেৰ মধ্যে বন্যা হবে কি না। এমনকি তিস্তা যখন খৰখটে শুকনো, সাদা বালিৰ চলে হাজাৱ হাজাৱ কাশগাছ বাতাসে মাথা দোলায়, যখন ওপাৱেৱ বানিশঘাটা অবধি জলেৰ রেখা দেখা যায় না, ভাঙা ট্যাক্সিগুলো সারাদিন বিকট শব্দ কৱে তিস্তাৱ বুকে ছুটে বেড়ায়, সেইৱকম সময়ে একদিন হাঁতিৎ মাঝাৱাতে বোমা ফাটাৱ শব্দ শুষ্ঠে তিস্তাৱ বুকে আৱ সরিৎশেখৰ বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিচিত হয়ে যান কাল ভোৱে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাৱেন তিস্তাৱ শুকনো বালি,

রাতারাতি শয়ে শয়ে নিশ্চিত হয়ে যান কাল ভোরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাবেন তিন্তার শুকনো বালি
রাতারাতি ভিজে গেছে। বিকেল নাগাদ ভুস করে জল উঠে স্নোত বইতে শুরু করবে। চোখের উপর
এই শহরটার চারিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখের উপর অনিকে বড় হয়ে উঠতে দেখেছেন। পড়াশুনায়
ভালো ছেলেটা, পড়ার কথা কখনো বলতে হয় না।

এখন প্রতি বছর তিন্তার ফ্লাই আসে। যেমনভাবে নিয়ম মেনে বর্ষা আসে শীত আসে তেমনি
বন্যা জল শহরে চুকে পড়ে। নতুন বাড়িতে ওঠার পর জল আর জিনিসপত্র নষ্ট করার সুযোগ পায়
না। শুধু প্রতি বছর সরিংশেখরের বাগানের ওপর পলিমাটির স্তরটা বেড়ে যায়। এখন নদী দেখলে
সরিংশেখর বুবাতে পারেন দুর্ধৰণের মধ্যে বন্যা হবে কি না। এমনকি তিন্তা যখন খটখটে শুকনো,
সাদা বালির চৰে হাজার হাজার কাণ্পাছ বাতাসে মাথা দোলায়, যখন ওপারের বার্নিশঘাট অবধি
জলের রেখা দেখা যায় না, ভাঙা ট্যাক্সিগুলো সারাদিন বিকট শব্দ করে তিন্তার বুকে ছুটে বেড়ায়,
সেইরকম সময়ে একদিন হঠাৎ মাঝেরাত্রে বোমা ফাটার শতো শব্দ ওঠে তিন্তার বুকে আর সরিংশেখর
বিছানায় শয়ে শয়ে নিশ্চিত হয়ে যান কাল ভোরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাবেন তিন্তার শুকনো বালি
রাতারাতি ভিজে গেছে। বিকেল নাগাদ ভুস করে জল উঠে স্নোত বইতে শুরু করবে। চোখের উপর
এই শহরটার চারিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখের উপর অনিকে বড় হয়ে উঠতে দেখেছেন। পড়াশুনায়
ভালো ছেলেটা, পড়ার কথা কখনো বলতে হয় না। আজ অবধি কারোর কাছ থেকে কোনোরকম
নালিশ শুনতে হয়নি ওর বিরক্তে। কিন্তু উষধ লাঞ্ছুক অথবা গজীর হয়ে থাকে ছেলেটা। এই বয়সে
ওরকম মানায় না। জোর করে বিকেলে ঝুলের মাঠে পাঠাক্ষেন ওকে, খেলাখুলা না করলে শরীর ঠিক
থাকবে কী করে! তুমশ মাথাচাড়া দিছে ওর শরীর, এই সময় ব্যায়াম দরকার।

অনিমেষ শুনেছিল দাদু সেকালে ফার্ট ক্লাস অবধি পড়েছিলেন। কলেজে যাননি কোনোদিন। কিন্তু
এত ভালো ইংরেজি বুঝিয়ে দিতে পারেন যে ওদের ঝুলের রজনীবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।
একবার প্রতিশব্দ লিখতে বলেছিলেন রজনীবাবু। অনিমেষ বাড়িতে এসে দাদুকে জিজ্ঞাসা করতে
একটা শব্দের পাঁচটা প্রতিশব্দ পেয়ে গেল। রজনীবাবুর মুখ দেকে ক্লাসে বসে পরদিন অনিমেষ বুবাতে
পেরেছিল তিনি নিজেও অতগুলো জানতেন না। ছোট ডিকশনারিতে অতগুলো না পেয়ে রজনীবাবু
ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; কেখেকে ও এসব লিখেছে। অনিমেষের মুখ থেকে ঘুনে রজনীবাবু
বিকেলে এসে দাদুর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিলেন। ম্যাকফার্সন সাহেবে দাদুকে একটা ডিকশনারি
দিয়েছিলেন যার ওজন প্রায় দশ সের হবে, অনিমেষ দুহাতে কোনোক্রমে এখন সেটাকে তুলতে
পারে। রজনীবাবু মাঝে-মাঝে এসে সেটা দেখে যান।

শেষ পর্যন্ত কিছুই চোপে রাখা শেল না। সরিংশেখর যতই আঢ়াল করুন মহীতোষের বিয়ের
আঁচ এ-বাড়িতে লাগতে আরম্ভ করল। মহীতোষ নিজে আসছেন না বটে, কিন্তু তাঁর হুবু শুতবাড়ির
লোকজন নানারকম কথাবার্তা বলতে সরিংশেখরের কাছে না এসে পারছেন না। সরিংশেখর সকালে
বাজারে গিয়ে একগাদা মিছি নিয়ে আসেন, কখন কে আসে বলা যায় না। হেমলতা তা দিয়ে অতিরিক্ত
আপ্যযন করেন। মেয়ের বাড়ি থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা অনিকে দেখে একটু অস্তির মধ্যে থাকেন
সেটা অনি বেশ টের পায়। দাদু পিসিমা ওকে মুখে কিছু না বললেও ও যে ব্যাপারা জেনে গেছে সেটা
বুবাতে পেরে গেছেন। অনিন ধীরণা ছিল বিয়ে হলে খুব ধূমধাম হয়, অনেক আজ্ঞায়বজন আসে, কিন্তু
ওদের বাড়িতে কেউ এস না। শুধু এক বিকেলে সাধুচরণ এক বৃক্ষ জন্মেকে সঙ্গে নিয়ে
সরিংশেখরের কাছে এলেন। ওদের সাজগোজ দেখে কেমন সন্দেহ হল অনিমেষের, পা টিপে ও দাদুর
ঘরের জানলার কাছে এসে কান পাতল। সাধুচরণ বলেছিলেন, ‘সব ঠিকঠাক আছে, এবার আপনাকে
যেতে হয়।’

সরিংশেখর বললেন, ‘সঙ্গে-সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাবে আশা করি, আমি আবার আটটার মধ্যে শয়ে
পড়ি।’

বৃদ্ধ অদ্বলোক বললেন, ‘হ্যাঁ, সঙ্গেবেলাতেই বিয়ে; আপনি খাওয়াদাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি
ফিরতে পারবেন।’

সরিংশেখর বললেন, ‘খাওয়াদাওয়া? না বেয়াই মশাই, আমি তো খেতে পারব না। আমাকে এ-
অনুরোধ করবেন না।’

বৃদ্ধ বললেন, ‘সে কী? তা কখনো হয়?’

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘হয়। আমার বাড়িতে আমার নাতি আছে যাকে আমরা এই বিয়ের কথা জানাইনি। তাকে বাদ দিয়ে কোনো আনন্দ-উৎসবে আহার করতে অক্ষম।’

বৃন্দ বললেন, ‘কিন্তু তাকে তো আপনি নিজেই নিয়ে যেতে চাননি।’

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘ঠিকই। ঐ অবৃষ্টানে ওর উপস্থিতি কি কারো ভালো লাগবে? তা ছাড়া একজনকে যখন এনেছিলাম তখন অনেক আমোদ-আনন্দ করেছি, তবু তাকে কি রাখতে পারলাম! ওসব কথা যাক। পাত্রের পিতা হিসেবে আমার কর্তব্যটুকু করতে দিন, এর বেশি কিছু বলবেন না।’

অনি শুনল দানু গলা ঢিয়ে ডাকছেন, ‘হেম, হেম।’ রান্নাঘর থেকে সাড়া দিতে-দিতে পিসিমা এ ঘরের দরজা অবধি এসে থেমে গেলেন, ‘কী বলছেন?’

‘আমি চললাম, সেই হারটা দাও তো।’

‘ঐ তো, আপনার দ্রুয়ারের মধ্যে আছে। কিন্তু আপনি জামাকাপড় পালটালেন না? এরকম ময়লা পাঞ্জাবি পরে লোকে বাজারে যায়, বরকর্তা হয়ে যায় নাকি?’

অনি দ্রুয়ার খোলার আওয়াজ পেল। তারপর শুনল দানু বলছেন, ‘আমি আটটার মধ্যে ফিরে আসব। অনিকে বোলো ও যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে, একসঙ্গে থাব।’

পায়ের শব্দ পেতেই অনি দ্রুত সরে এল। আড়ালে দাঁড়িয়ে ও দেবল সাধুচরণ আর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দানু বাইরে বেরিয়ে এলেন। পিসিমার গলায় ‘দুর্গা দুর্গা’ শুনতে পেল সে। সাধুচরণ ও সেই ভদ্রলোকের পাশে দানুকে একদম মানাচ্ছে না। লক্ষ্মের ময়লা পাঞ্জাবি, হাঁটুর নিচ অবধি ধূতি, লাঠি-হাতে দানু ওপরে সঙ্গে হেঁটে গলির বাঁক পেরিয়ে গেলেন। দরজা বৰ্জ করে পিসিমা ডাকলেন, ‘অনি, অনিবাবা।’

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াল। দানু কোথায় যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পেরে ওর অসম্ভব কৌতুহল হতে লাগল। চট করে এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে বারান্দায় ছেড়ে-রাখা চাটিজোড়া এক হাতে তুলে ও লাফ দিয়ে ভেতরের বাগানে নেমে পড়ল।

বাড়ির পেছন দিয়ে দোড়ে ও যখন গলির যুথে এসে দাঁড়াল ততক্ষণে সরিষ্ঠেখররা টাউন ক্লাব ছাড়িয়ে গেছেন। দূর তেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে নিচিস্তমনে হাঁটতে লাগল ও। এখন প্রায় শেষ-বিকেল। টাউন ক্লাবের মাঠে ফুটবল খেলা চলছে। রাস্তাটায় লোকজন বেশি, নিরাপদ দূরত্বে অনিমেষ হাঁটছিল। সাধুচরণ একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে কী বলতে সরিষ্ঠেখর ঘাড় নাড়ালেন। অনিমেষ জানে দানু রিকশায় উঠেবেন না। শরীর ঠিক থাকলে দানুকে রিকশায় ওঠানো সহজ নয়। অবশ্য এখন যদি দানু রিকশায় উঠেন তা হবে অনিমেষ কিছুতেই আর নাগল পেত না। রিকশায় না-ওঠার জন্য সময় সময় ওর দানুর ওপর খুব রাগ হত, কিন্তু একন এই মুহূর্তে ওর খুব ভালো লাগল। দানুর সঙ্গে হেঁটে তাল রাখতে পারছেন না সাধুচরণ। সঙ্গের ভদ্রলোকটি প্রায় দোঁভাঙ্গেন। বড় বড় পা ফেলে চলেছেন সরিষ্ঠেখর লাঠি দুলিয়ে। সাধুচরণকে ও কোনোদিন দানু বলতে পারল না। এর জন্য অবশ্য হেমলতা অনেকটা যে কষ্ট দেয়, সে-মেয়ে মরে গেলে তো কষ্ট পাবেই না-এটা তো জানা কথা, কিন্তু তা বলে পাঁচজনকে বলে বেড়াবে, অর্ধমুক্তি হল আমার। বাকি অর্ধেকটা যেন স্তীর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। হেমলতা কোনোদিন ওকে কাকা জ্যাঠা বলতে পারেননি। সেটাই শুধু করেছিল অনি। সামনাসামনি কিছু বলত না, কিন্তু আড়াল হলেও পিসিমার মতো নাম ধরে বলা অভ্যাস করে ফেলল।

বোলনা পুল পার হয়ে করলা নদীর ধার ওপরের থানার দিকে যেতে দেখে অনি দূরত্বটা বাড়িয়ে দিল। ‘খাবনে রাস্তাটা অনেকখানি সোজা, চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে গেছেন তাকালে ও ধরা পড়ে যাবে। নিচে করলা নদীর জল কৃতুরিপানায় একদম ঢাকা পড়ে আছে। এখনও সঙ্গে হয়নি। দানুদের ওপর চোখ রেখে পুঁজোর মাঝামাঝি এসে নতুন স্যারের সঙ্গে চোখাচোবি হয়ে গেল। পুঁজোর তারের জালে হেলান দিয়ে নতুন স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে নতুন স্যার বললেন, ‘কোথায় যাচ্ছ অনিমেষ?’

কী বলবে বুঝতে না পেরে অনি বলল, ‘বেড়াতে।’

‘ও, তোমাদের এই নদীকে আমার খুব ভালো লাগে, জান! কেমন চুপচাপ বয়ে চলে যায়। অথচ এর নাম কেন একটা তেতো ফলের নামে রাখল বলো তো?’ নতুন স্যার বললেন।

অনি দেখছিল দানুরা খুব দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছেন। কিছু বলা দরকার তাই বলল, ‘ক্ষমলা খেলো তো রক্ত পরিষ্কার হয়।’

‘তড়া’ শব্দ শুনি হলেন নতুন স্যার, ‘এই নদী শহরের দুষ্প্রিয় রক্ত পরিষ্কার করছে। এককালে এসব জ্বালাগাছ দেবী চৌধুরানী নোকো নিয়ে বেড়াতেন। ইংরেজদের সঙ্গে ওর শুব শুক্র হয়েছিল। শিশুর পাড়ে এখনও নাকি একটা কালীমন্দির আছে যেটা উনেছি উরই প্রতিষ্ঠিত। তুমি দেবী চৌধুরানীর নাম উনেছ?’

অনি ধাঢ় নাড়ল, ‘না।’

নতুন স্যার বললেন, ‘ঠিক আছে, তোমাকে পরে একদিন খুঁত কথা বলব। আজ বরং তোমাকে একটা বই দিই। এটা চিরকাল তোমার কাছে রেখে দেবে।’ অনি দেখল নতুন স্যার তাঁর কাঁধে বোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিছেন। বইটার মলাটে পাগড়ি পরা একজন মানুষের মুখ যাকে দেখলে মারোয়াড়ি দোকানদার বলে মনে হয়। আর ওপরে লেখা রয়েছে আনন্দমঠ, নিচে বক্ষিমচন্দ চট্টোপাধ্যায়। নতুন স্যার বললেন, ‘ইনি হলেন আমাদের সাহিত্যসন্দার বক্ষিমচন্দ। আর এই বই হল ভারতের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বন্দেমাত্রমের উৎস। এই বই না পড়লে দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাসকে জানা যাবে না।’

বইটা থেকে শুব তুলে অনি দেখল থানার রাস্তায় দাদুদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। করলার ওপর আবছায়া সঙ্ক্ষার অঙ্ককার কোন ফাঁকে চুইয়ে নেমে এসেছে। হঠাৎ কোনো কথা না বলে বই বগলে করে ও দোগতে লাগল। নতুন স্যার অবাক হয়ে ওকে কিছু বললেন, কিন্তু সেটা শোনার জন্য সে দাঁড়াল না।

রাস্তাটা স্বাধানো নয়, একবাশ ধূলো উড়িয়ে ও থানার পাশে এসে দাঁড়াতেই ঢং ঢং করে পেটাঘড়িতে শব্দ হতে লাগল। এখান থেকে রাস্তা দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। কোন রাস্তা দিয়ে দাদু গিয়েছেন কী করে বোঝা যাবে? হঠাৎ বেয়াল হল সেদিন দাদু হোটেলের কথা বলছিলেন। থানার ওপাশে কী-একটা হোটেলের সাইনবোর্ড দেখেছিল ও একদিন। সেদিনই পা চালাল অনি।

এখন সঙ্গে হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় তেমন আলো নেই। দুই-একটা রিকশা ছাড়া লোকজন কম যাওয়া-আসা করছে। থানার সামনে দুটো সিপাই বন্দুক ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। একা সঙ্কেবেলায় এইদিকে কখনো আসেনি ও। আনন্দমঠটা দুহাতে চেপে ধরে সামনে দিয়ে দেঁটে এল অনি। সামনেই একটা বিরাট বটগাছ, তার তলায় ভুজাওয়ালা দোকান। অনি গাছের তলায় চলে এল। এদিকে আলো নেই একদম, শুধু ভুজাওয়ালার দোকানের সামনে একটা গ্যাস পাইপ জলছে। সেই আবছায়া অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে অনি দেখল বেশকিছু লোক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একটা কালো রঙের গাড়ির সামনের সিটে দাদু বসে আছেন। দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর মধ্যে সাধুচরণ ছাড়া স্বর্গছেড়ার মনোজ হালদার, মালবাবুকে দেখতে পেল ও। একটু বাদেই অনি অবাক হয়ে দেখল কয়েকজন লোক মহীতোষকে দুপাশে ধরে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে। বাবাকে শুব সুন্দর দেখাচ্ছে এখন। এক হাতে টোপুর, ধূতি কুঁচিয়ে ফুলের মতো অন্য হাতে ধূরা, কপালে চন্দনের ফেঁটা, পাঞ্জাবিটা কেমন চকচকে করছে আলোয়। বাবা এসে গাড়ির পিছনে উঠে বসলেন। সাধুচরণ আর সেই বৃক্ষ ভদ্রলোক মালবাবুকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটা কিন্তু শুশ করে চলে যেতে পারল না। কারণ গাড়ির সামনে ধূতি পাঞ্জাবি পরা লোকজন হেঁটে যেতে লাগল পথ চিনিয়ে। সিটির দাঁড়িয়ে অনি গাড়িটাকে প্রায় ওর সামনে দিয়ে যেতে দেখল। দাদু গঁউঁগুঁয়ে বসে আছেন। বাবা হেসে মালবাবুকে কী বলছেন। শুব ফেরালেই তুরা ওকে দেখে দেহলতে পারেনন। দেখতে পেলে কি বাবা ওকে বকতেন? হঠাৎ ওর মনে পড়ল বাবার ইইরকম পোশাক-পরা একটা ছবি স্বর্গছেড়ার বাড়িতে মায়ের অ্যালবামে আছে। মা বলতেন, বিষের ছবি। আনন্দমঠ ভড়িয়ে ধরে অনি চৃপচাপ গাড়ির খানিক পেছনে হাঁটতে লাগল।

গলির শুবটায় বেশ ভড়ি, গাড়ি চুকল না। তিন-চারটে গোরামতন মেয়ে শুধু বাজাতে বাজাতে এসে বাবাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল, তারপর ভড়িটা সিনেমা হল তোকার মতো গলির ভেতরে চলে গেল। এখন চারিনিকে বেশ অঙ্ককার। এ-রাস্তায় আলো নেই, তবু বিয়েবাড়ি বলে গলির শুবে একটা হ্যাতাক ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনির শুব কোচুহল হচ্ছিল ভিতরে গিয়ে দেখতে সেখানে কী হচ্ছে। বাবা যখন মাকে বিয়ে করতে গিয়েছিল তখনও কি এইরকম ভড়ি হয়েছিল? এইরকম আলো দিয়ে মায়েদের বাড়ি সাজালো হয়েছিল? মা বেঁচে থাকলে বাবা আর বিয়ে করতে পারত না এটা শুবতে পাবে অনি। কিন্তু এখন, এই একটু আগে বাবাকে যখন মেয়েরা গাড়ি তেকে নামিয়ে নিয়ে গেল তখন-

তো একদম মনে হল না বাবার মনে কষ্ট আছে। বউ মরে গেলে যদি আবার বিয়ে করা যায় তো পিসিমা কেন বিয়ে করেনি? পিসিমা তো আবার শাড়ি পরে মাছ খেতে পারত। আজন্ম-দেখা পিসিমার চেহারাটায় ও মনেমনে শাড়ি সিদুর পরিয়ে হেসে ফেলল, দৃঢ়, পিসিমাকে একদম মানায় না। ঠিক ওই সময় ও শুনতে পেল কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজাসা করছে, ‘কী চাই হোক? এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?’

অনিমেষ কী বলবে মনেমনে তৈরি করতে-না-করতে লোকটা এসে দাঁড়াল সামনে, ‘নেমতন্ত্র খেতে এসেছ তো এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে যাও।’

লোকটা ওর পিঠে হাত রেখে বলছে, ভেতরে যাও। এখন তো বেশ সহজে যেতে পারে। কিন্তু বাবা,-দাদু-অনিমেষ এক পা এগিয়ে আবার ঘরকে দাঁড়াল।

‘কী চল, দাঁড়ালে কেন? যাও।’ লোকটা কথাটা শেষ করতেই ওর মনে হল এবার একছটে পালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ততক্ষণে একটা সন্দেহ এসে গেছে লোকটার মনে, ‘তোমার নাম কী? কোন বাড়িতে থাক?’

‘আমি এখানে থাকি না।’ অনিমেষ বলল।

‘কোন পাড়ায় থাক? কার সঙ্গে এসেছ?’

‘আমি নেমতন্ত্র খেতে আসিনি।’ অনিমেষ প্রায় কেঁদে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চেহারা পালটে শেল, ‘তা হলে এখানে সুরমুর করছিস কেন? চুরিচামুরির ধান্দা, আঁ? যা ভাগ?’ অনিমেষ দেখল লোকটা চড় মরার ভঙ্গিতে একটা হাত উঁপঁড়ে তুলেছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সরে যেতে না-যেতেই লোকটা খপ করে ওর হাত ধরল, ‘তোর হতে এটা কী! বাই! কোথেকে মেরেছে বাবা!’ প্রায় হো মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে লোকটা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে উচারণ করল, ‘আনন্দমঠ, আঁ? ধান্দাটা কী?’

‘আমার বইটি দিন।’ অনিমেষ কোনোরকমে বলল।

‘অ্যাই চোপ। যা পালা এখান থেকে।’ লোকটা তেড়ে উঠতে পেছন থেকে আর-একটা গলা শোনা শেল, ‘কী হয়েছে শ্যামসুন্দর? চোচ্ছে কেন?’

‘আরে এই ছোকরা তখন থেকে সুরমুর করছে, এ-পাড়ায় কোনোদিন দেখিনি।’ লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল।

‘খুব সাবধান। আজকাল চোর-ডাকাতের দল এইসব বাঢ়া ছেলেকে পাঠিয়ে খৰাখৰের নেয়।’ অনিমেষ দেখল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন।

হঠাৎ মাথা-গরম হয়ে গেল ওর। শ্যামসুন্দর নামে লোকটা কিছু বোবার আগেই ও ঝাপিয়ে পড়ে হাত থেকে আনন্দমঠটা ছিনিয়ে নিল। এত জোরে লাফিয়ে উঠেছিল অনিমেষ ও শ্যামসুন্দর ব্যালেস রাখতে না পেরে ঘুরে মাটিতে পড়ে শিয়ে ‘ওরে বাগেরে বাপ’ বলে চিৎকার করে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরতে গেল। বেটোল হয়ে অনিমেষ মাটিতে পড়তে পড়তে কোনোরকমে শ্যামসুন্দরের মুখে একটা পেনালটি শুট কঘিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অনিমেষকে ছেড়ে দিয়ে নিজের মুখ দুহাতে চেপে ডাকাত ডাকাত’ বলে শ্যামসুন্দর চ্যাচাচ্ছে আর সেই বৃক্ষ ভদ্রলোক হস্তাং গলা ফাটিয়ে একটা বিকট শব্দ তুলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলির ভিতরে অনেকগুলো গলায় হইহই আওয়াজ উঠল। অনিমেষ দেখল পিলপিল করে সোকজন বেরিয়ে আসছে গলি দিয়ে। আর দাঁড়াল না অনিমেষ, এক হাতে বইটা সামলে প্রাণপণে ছুটে লাগল সামনের রাস্তা ধরে। কেউ পালিয়ে গেছে এটা বুঝতে না পেরে একটা অজ্ঞান অঙ্ককার গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। এতদূর দৌড়ে এসে ওর হাপ ধরে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে নিখাস নিতে নিতে ও বুঝতে পারছিল আঃ পালাতে পারবে না। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ কিছু-একটায় পা জড়িয়ে ও ছিটকে রাস্তায় পড়ে শেল। ওর মনে হল ডান পায়ের বুঝোঁ আঙুলটা ফেটে চোচির হয়ে গেছে, একটা অসহ্য যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠেছে পা বেয়ে। চুপচাপ শয়ে থাকতে থাকতে ও টের পেল পেছনে কোনো পায়ের শব্দ নেই। কোনো গলা ভেসে আসছে না। তা হলে কি ওরা আর পেছন পেছন আসছিল নাঃ ও কি বোকার মতো ভয়ের চোটে সৌড়ে যাচ্ছিলঃ একটু একটু করে সাহস ফিরে আসতে শরীর ঠাঁঘা হল, বুকের ভিতর ধূকধূকুনিটা কমে এল। অনিমেষ উঠে বসে নিজের বুঝোঁ আঙুলে হাত দিতেই আঙুলগুলো চটচটে হয়ে শেল। গরম ঘন বন্ধুটি যে রঞ্জ তা বুঝতে

কষ্ট হচ্ছিল না। আঙুলের চটচটে অনুভূতিটা হঠাতে ওকে কেমন আচম্ভ করে ফেলল। একা এই অস্কারে মাটিতে বসে মাধুরীর মুখটা দেখতে পেয়ে ঝুপিয়ে ঝুপিয়ে কাঁদতে লাগল অনিমেষ।

পায়ের গোড়াধির উপর ভর করে কয়েক পা হেঁটে আসতে ও একসঙ্গে অনেকগুলো আলো দেখতে পেল। আলোগুলো খুব উজ্জ্বল নয়, পরপর লাইন কিছুটা দূরে চলে গেছে। কাছাকাছি অনেকগুলো গলা শুনতে পেল সে। বেশির ভাগ গলাই মেয়েলি, কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে। এইরকম গলায় কোনো মেয়েকেও হাসতে শোনেনি কোনোদিন। ওকে দেখে মেয়েগুলো মুখের কাছে আলো তুলে ধরল। অবাক চোখে অনিমেষ দেখল পরপর অনেকগুলো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে। কেমন সব সাদা-সাদা মুখ আর তাতে পড়েছে লঞ্চ, কুপির আলো। যেন নিজেদের মুখ অনিকে দেখানোর জন্য ওরা আলোগুলো তুলেছে। একটা মেয়েলি গলায় চিঢ়কার উঠল, ‘এ যে দেখি কেষ্টাকুর, নাড় গোপাল, ননী খাবার ইহু হয়েছে বুঁধি?’

সঙ্গে সঙ্গে আলোগুলো নিচে নেমে এল, ‘ওমা, এ যে দেখছি পুঁচকে ছেলে! আমি ভাবিলাম নাগর এল বুঁধি।’

বিলাখিল করে হেসে উঠল একজন, ‘এগুলো হল ক্ষুদে শয়তান, বুঁধলে দিদি! একটু সুড়সুড়ি উঠেছে কি এসে হাজির।’

‘ঝঁটা মার, ঝঁটা মার।’

‘আঃ থামো তো, রাম না বলতেই রামায়ণ গাইছ।’ অনিমেষ দেখলে একটা লথামতন মেয়ে লঞ্চ-হাতে ওর দিকে এগিয়ে এল, ‘এই ছোঁড়া, এখানে এসেছিস কেন?’

‘আমি আর আসব না।’ অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল ছাড়িয়ে পড়ল, ‘কান ধরে বলতে বল রে।’

মেয়েটি এক হাত কোমরে রেখে অন্য হাতে হারিকেন ধরে আবার বলল, ‘কিন্তু এসেছিস কেন? জানিস না এ-মহল্লার নাম বেগুনটুনি, এখানে আসতে নেই! নাকি জেনেওনে এসেছিস?’

ঘাড় নাড়ুল অনিমেষ, তারপর বলল, ‘আসতে নেই কেন?’

মেয়েটি কী বরতে গিয়ে যেমে গেল, তারপর একটু নরম গলায় জিজেস করল, ‘তুমি কোন ক্ষুলে পড়?’

হঠাতে তুই থেকে তুমিতে উঠে গেলে অনিমেষের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল, ‘জেলা ক্ষুলে।’

বলতে বলতে ও যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেলল। মেয়েটি বলল, ‘কী হয়েছে, আয়সা করছ কেন?’

অনিমেষ পা-টা তুলে ধরতেই মেয়েটি মুখে হাতচাপা দিয়ে প্রায় চিঢ়কার করে উঠল, ‘ওমা, এ যে দেখছি রঞ্জঙ্গা ছুটছে, ক্যায়সা হল?’

অনিমেষ দেখল আরও কয়েকজন এগিয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে ওর পা দেখছে। একজন বলল, ‘ছেড়ে দে, এই সঙ্কেবেলায় আর খামেলা বাড়স না।’

কে-একজন জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে এদিকে আসছে দেখে সবাই হৈ হৈ করে আবার বাতি নিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম মেয়েটি সেদিকে একবার দেখে একটু ইতস্তত করে এক হাত অনিমেষের পিঠের ওপর রেখে বলল, ‘তুমি আস্তে-আস্তে আমার কামরায় উঠে এঙ্গো তো।’

একটু গোলোই সার-দেওয়া মাটির ঘর দেখতে পেল অনিমেষ। তারই একটায় মেয়েটি ওকে নিয়ে চুকল। ঘরের মধ্যে লঞ্চন্টা রেখে মেয়েটি ওকে বসতে বলল। আসবার বলতে একটা তক্ষাপোশ, আর ওপর বিছানা করা। দুটো বালিশ, কোনো পাশবালিশ নেই। দেওয়ালে একটা ভাঙ্গা আয়না খোলানো, একদিকে দড়িতে কিছু জামাকাপড় এলোমেলোভাবে টাঙানো। ওকে বসতে বলে মেয়েটি তক্ষাপোশের তলা থেকে একটা টিনের সুটকেস টেনে বের করে তা থেকে অনেকটা পাড় ছিড়ে নিয়ে এসে বলল, ‘দেখি, গোড় বাড়াও!’ ওর খুব সক্ষেত্রে হচ্ছে মেয়েটি পা ধরায়, কিন্তু হঠাতে ওর মনে হল মেয়েটি খুব ভালো। এত ভালো যে তার কাছে আসতে নেই কেন? তপুপিসির ঢেয়ে বেশি বড় হবে না মেয়েটি, কিন্তু সাজগোজ একদম অন্যরকম। এরা কারা? এই যে এত মেয়ে একসঙ্গে রয়েছে, সঙ্কেবেলায় আলো নিয়ে ঘুরছে কী জন্যে? এটা কি কোনো হোস্টেল? ওদের ক্ষুলে যেমন হেলেদের বোর্ডিং আছে তেমন কিছু? কিন্তু মেয়েরা এত চেঁচিয়ে হাসবে কেন? ওর মনে পড়ে গেল

হেমলতা ওকে যে অঙ্গরাদের গল্প বলেছিলেন তারাও তো এইরকম হাসি গান নিয়ে থাকে, দরকার হলে ভগবানদের সভায় শিয়ে নেচে আসে। এরা কি নাচ জানে? দ্যুৎ, অঙ্গরারা দারুণ সুন্দরী হয়, এরা তো কেমন কালো-কালো। হঠাৎ ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে চাপ লাগাতেই অনিমেষের নজর পায়ের দিকে চলে এল। ও দেখল ওর পায়ের ওপর ইয়া লয় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। ওদের ড্রিল স্যার খুব সুন্দর করে ব্যান্ডেজ বাঁধার যে-কায়দাটা ওদের শিখিয়ে দিয়েছেন এই মেয়েটা নিশ্চয়ই সেটা জানে না।

'কি, আর দরদ লাগছে?' মেয়েটি গিট বেঁধে ওর পা কোল থেকে নামিয়ে দিল। ঘাড় মেড়ে 'না' বলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াতেই ওর মনে হল কী-একটা যেন ওর কাছে নেই। কী নেই বুঝতে না পেরে ও নিজের হাতের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল অনিমেষ। ও যখন দৌড়ে এই গলির মুখে আসে তখনও বইটা তার হাতে ধরা ছিল হাতজোড়া হয়েছিল বলে একটুও মূলকোতে পারেনি। তা হলে নিশ্চয়ই অঙ্ককারে হোচ্ট খেয়ে ও যখন আছড়ে পড়েছিল তখন বইটা ছিটকে গিয়েছে। গোড়ালির ওপর ভর করে ও প্রায় দৌড়ে বাইরে আসছিল কিছু না বলে। মেয়েটি চট করে ওর হাত ধরে বলল, 'চলতে পারবে তো?'

দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। মেয়েটি খুব অবাক হচ্ছিল ওর এইরকম পরিবর্তনে, লষ্টন-হাতে পেছন পেছন খানিকটা এসে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে শোনো, সামালকে যাও।' ততক্ষণে অনিমেষ অনেকটা দূর চলে গেছে। কিন্তু গলিটার মধ্যে এত অঙ্ককার কেন? যে-জ্যাগাটায় ও আছড় খেয়ে পড়েছিল সে-জ্যাগাট যে ছাই বোৰা যাচ্ছে না কোথায়। পা দিয়ে রাস্তাটা হাঁটকে দেখতে লাগল ও অঙ্কের মতন। নতুন স্যার বলেছেন, এই বই না পড়লে দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাস জানা যাবে না। এই অঙ্ককারে অনিমেষ কোথাও বইটার অঙ্গিত খুঁজে পেল না একা একা। ঠিক এই সময় অঙ্ককার ফুঁড়ে একটা চিংকার উড়ে এল, গলাটা ক্যানকেনে, 'কে রে এখনে ঘুরঘূর করে, ট্যাকখালির অমিদারের পো নাকি, বাপের বাসিবিয়ে দেখার বড় সাদ, না রে, যা বোরো এখন হতে।' চারপাশে তাকিয়ে অনিমেষ কাউকে দেখতে পেল না। এই অঙ্ককার গলিতে কাউকে দেখা অসম্ভব। অথচ ওর মনে হচ্ছে এই কথাঙুলো যে বলল সে যেন স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছে। কেমন শিরশিরি করতে লাগল ওর। এখন থেকে একদৌড়ে ও বড় রাস্তায় চলে যেতে পারে। কিন্তু বইটা? ধীরে ধীরে ও পেছনদিকে তাকাল। একটা আলো পেলে হত, কেউ যদি একটা আলো দিত ওকে!

গোড়ালিতে ভর করে ও আবার ফিরে এল। ওকে দেখে একজন শিস দিয়ে উঠল, 'আ গিয়া মেরা জান-খিলা ও দো খিলি পান।' আর-একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ কপাল, এ-ছোড়ার দেখছি জোয়ার এসেছে, তুই যত ওকে ঘরে ফেরত পাঠাবি, কবুতরী, ও তত এখানে ঘুরঘূর করবে দ্যাখ।'

অনিমেষ দেখল সেই মেয়েটি লষ্টন-হাতে দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে এল। তা হলে এর নাম কবুতরী? বেশ সুন্দর নাম তো। ওর কাছে এসে কবুতরী বলল, 'ফিন চলে এল, ঘর যাও।' এখন ওর কথার মধ্যে বেশ একটা ঝাজ টের পেল অনিমেষ। সেই নরম ভাবটা নেই। মুখ ঘুরিয়ে ও আবার গলিটার দিকে তাকাল-একদম ঘৃটঘৃট করছে। ওর কাছে আলো চাইলে কি খুব রেংগে যাবে? কবুতরী সেটা লক্ষ করে বলল, 'ডর লাগচে নাকি? আসতে ডর নেই, যেতে ডর! চল, আমি যাচ্ছি।' ফির কভি এখানে আসবি না।' লষ্টনটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে অনিমেষকে টানতে টানতে কবুতরী হাঁটতে লাগল। কয়েক পা এগোতেই বাঁদিকের রকে চোখ যেতে চমকে উঠল অনিমেষ। একটা বুড়ি শুকনো মুখ ফোকলা দাঁতে হাসছে। তার চোখ দুটো খুব বড়, সমস্ত চামড়া খুলচে। দুটো শুকনো পায়ের ফাঁকে মুশুটা ঝোলানো যেন, উরু হয়ে বসে আছে। বোধহয় কেউ সরিয়ে না দিলে নড়তে পারে না। হারিকেনের আলো ওর মুখ তেকে সরে যাবার আগেই ক্যানকেনে গলায় বেড়িয়ে এল মুখ থেকে, 'ক্যারে, বিয়ে দেখলি? অ্যাঁ?'

বুকের ভিতর হিম হয়ে যায় আচমকা। হাঁটতে হাঁটতে কবুতরী বলল, ডরো মৎ। ও বলৎ তালো বুড়ি আছে, আমাদের দেখ ভাল করে।' হোচ্ট খাওয়ার জা: গাটায় এসে অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ল। লষ্টনের আলো গলির ভিতর নাচতে যাচ্ছে, ব্যাকুল গেঁথে ও চারধারে খুঁজতে লাগল। সব জ্যাগায় আলো যাচ্ছে না, বইটা কত দূরে যেতে পারে? কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল কবুতরী, 'কী হল, খাড়া হয়ে গেলে কেন?' আর ঠিক তখনই ও দেখতে পেল রাস্তার পাশে নর্দমার গায়ে নরম পাকের ভিতর বর্ণার মতো গেঁথে আছে বইটা। একছুটে অনিমেষ বইটাকে তুলে নিল। টপটপ করে

কয়েক ফোটা কাদা-মাখা জল গড়িয়ে পড়ল নিচে, তলার দিকটা কাদায় ভিজে কালো হয়ে গিয়েছে। নতুন স্যার কী বলবেন ওকে? হাত দিয়ে মলাটের কাদা মুছতে গিয়ে কাগজটা আরও কালো-কালো হয়ে গেল। আলোটা বেড়ে গেলে ও দেখল কৃতুরী পাশে এসে দাঢ়িয়েছে, ‘কী টুঁড়ছ? কার কিতাব?’

অনিমেষ বলল, ‘আমার। পড়ে গিয়েছিল এখানে। কাদা লেগে গেছে।

লঞ্ছনটা নামিয়ে রেখে কৃতুরী হঠাৎ বইটা টেনে নিল। উরু হয়ে বসে মলাটের ওপর পাগড়ি মাথায় বাক্সিমচন্দ্রের ছবিটা খানিকক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করল, ‘নাম কী এই কিতাবের?’

অনিমেষ বলল, ‘আনন্দমঠ।’ বইটা খুলে পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে কৃতুরী বলল, ‘জাদা নষ্ট হয়নি।’ শেষ পাতায় কিছুটা কাদা ছিল, আঙুল দিয়ে সেটাকে মুছতে খানিকটা দাগ হয়ে গেল। বইটা ফেরত দিয়ে কৃতুরী জিজ্ঞাসা করল, ‘এখন সাফ করলে আরও খারাপ পড়ে ফেলল—বিসর্জন অসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।’

লাইনটার মানে ও কিছুতেই বুঝতে পারল না।

দানুর সঙ্গে চলে আসার পর আর স্বর্গছেঁড়ায় যায়নি অনিমেষ। মহীতোষ এর মধ্যে অনেকবার এসেছেন জলপাইগুড়িতে। প্রত্যেকবারই স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, রাত্রে থাকেননি কখনো, বেলায়-বেলায় চলে গিয়েছেন।

হেমলতা বলেছিলেন, ‘মা না বলতে পারিস তুই, নতুন মা বলে ডাকিস, অনি। আমিও তা-ই বলতাম। হাজার হোক মা তো!’ ওরা এলো ধারেকে থাকত না অনি। প্রথমদিকে কেমন একটা অস্পতি, পরে লজ্জা-লজ্জা করত। অথচ ওরা আসবেন ছুটির দিন দেখে যখন অনিকে বাড়িতে থাকতেই হয়। মহীতোষ বাড়ি এসে বেশির ভাগ সময় তাঁর বাবার সঙ্গেই গল্প করেন, চা-বাগানের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে হেমলতার পাশে গিয়ে বসে থাকে। মেয়েটির বয়স অল্প এবং হেমলতা প্রথম আলাপেই বুবো গিয়েছিলেন, মেয়েটির স্বভাবের সঙ্গে মাধুরীর যথেষ্ট মিল আছে। চিবুকের আদলটায় তো মাধুরী বসানো, সেইরকমই হাবভাব। তবে মাধুরী একটু ফরসা ছিল এই যা। প্রথম কদিন তো একদম কথাই বলেনি। হেমলতা তিনবার জিজ্ঞাসা করলে একবার উত্তর পান। সে-সময় কী কারণে মহীতোষ এদিকে এসেছিলেন, হেমলতা তাঁকে ডেকে বললেন, ‘ও মহী, তোর বউ-এর বোধহ্য আমাকে পছন্দ হয়নি, আমার সঙ্গে একদম কথা বলে না।’

মহীতোষ উত্তর দেননি কিছু, চুপচাপ চলে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। তাঁর চলে যাওয়া বুঝতে পেরে খুব আস্তে অথচ দ্রুত নতুন বট বলে উঠেছিল, ‘আমার তয় করে।’

‘ভয়! ভয় বেন?’ অবাক হয়েছিলেন হেমলতা।

মাথা নিচু করে নতুন বট বলেছিল, ‘আমি যদি দিদির মতো না হই।’

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেলেন হেমলতা। মহীতোষের বিয়ে করাটা উনি একদম পছন্দ করেননি সেটা সবাই জানে। নতুন বট এলে একটা দূরত্ব রেখে গেছেন এই কয়দিন, কখনো অনিকে বলেননি কাহে আসতে। এক সেই প্রথমদিন ওরা যখন জোড়ে এলেন, বট এসে তাঁকে প্রণাম করল, কানে দুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন যখন তখন সরিষ্ণেশ্বর অনিকে, ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলেটা আগাগোড় মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের প্রণাম করে চলে গেল। শুশ্রে সামনে তখন নতুন বট একমাথা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। এখন এই মেয়েটার কথা তৈন বুকটা কেমন করে উঠল হেমলতা। মাধুরী মুখটা ভাবতে গিয়ে কাঁপুনি এল শরীরে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নলেন, ‘তোমার নামটা আমার একদম ভালো লাগে না বাপু, আমি তোমাকে কিন্তু মাধুরী বলে ডাকব।’

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ওর দিকে তাকিয়েছিল নতুন বট। হেমলতা দেখেছিলেন দুটো বড় বড় চোখ ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হেমলতা দেখলেন একটু একটু করে জল গড়িয়ে এসে চোখের কোনায় জমা হচ্ছে। খুব বড় একটা অন্যায় করে ফেলেছেন বুঝতে পেরে গেছেন ততক্ষণে। সরিষ্ণেশ্বর চিরকাল তাঁকে বকাবাকি করেছেন পেট-আলগা বলে, মনে যা আসে মুখে তা না বললে স্বত্ত্ব পান না হেমলতা। এই মেয়েটাকে মাধুরী বলে ডাকলে মনটা শান্ত হবে ভেবেই কথাটা বলেছিলেন।

খপ করে নতুন বট-এর হাতটা ধরলেন হেমলতা, ‘রাগ করলি ভাই, আমি তোকে সত্যি বলছি, দুঃখ দিতে চাইনি।’

নতুন বউ-এর তখন গলা ধরে গেছে, 'আপনি আমাকে যা-শুশি ডাকুন।'

হেমলতা বললেন, 'দেবি তোর একটা পরীক্ষা নিই। কাল রাত্রে পায়েস করেছিলাম। অনির জন্য একবাটি সরপাতা হয়ে আছে। ওটা নিয়ে ছেলেটাকে খাইয়ে আয় দেখি। বেলা হয়ে গেল।'

কথার মেশায় হেমলতা কখন টপ করে যে তুইতে নেমে এসেছেন নিজেই বুঝতে পারেননি। বয়সে ছোট কাউকে যদি ভালো লেগে যায় তাহলে তাকে তুই না বললে একদম সুখ হয় না তাঁর।

ঘরের কোনায় মিটসেকের ভিতর পায়েসের বাটিগুলো চাপা দেওয়া আছে। আগের সক্ষেবেলায় রাঁধা পায়েস এক-একটা বাটিতে ঢেলে রেখে দেন হেমলতা। নাড়াচাড়া না হওয়ায় বাটিগুলোতে পায়ে জমে গিয়ে পুরু সর পড়ে যায়। সরিৎশেখরের ভালোবাসার জিনিসের মধ্যে এখন এই একটা জিনিস টিম্বটিম করে বেঁচে রয়েছে। ভালো দুধ পাওয়া যায় না এখানে, স্বর্গজ্বালায় যখন পায়েস রান্না হত সাত বাড়ির লোক টের পেত। কালানোনিয়া চালের গঞ্জে চারধার ম-ব করত। সরিৎশেখর নিজেই এক জামবাটি পায়েস দুবেলা খেতেন! দাদুর এই শখটা পেয়েছে নাতি, পায়েস খেতে বড় ভালোবাসে ছেলেটা।

আজ মহীতোষৱা আসবেন বলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাটিতে পায়েস রেখে রেখেছেন হেমলতা। সকালে দেখেছেন সেগুলো জমে গিয়েছে বেশ। বিভিন্ন সাইজের বাটি আছে মিটসেকে। নতুন বউ উঠে দাঁড়ালে তিনি মিটসেকটা ওকে দেখিয়ে দিলেন। বুক-সমান মিটসেকের দরজা খুলে নতুন বউ সেদিকে তাকাতেই হেমলতা আড়তোখে দেখতে লাগলেন। অনির মন অঞ্জে ভরে না, ছোট বাটিতে পায়েস দিলে চ্যাচামেটি করবেই। নতুন বউ কোনো বাটিটা তোলে দেবছিলেন তিনি, মন বোঝা যাবে। দেওয়ার হাতটা টের পাওয়া যাবে। মেয়েটার বুদ্ধি আছে, মনে মনে শুশি হলেন হেমলতা। বড় তিনিটে বাটির একটাকে বের করে আনল নতুন বউ, ছোট দুটোতে হাত ছোয়াল না। যাক, অনিটাৰ কখনো কষ্ট হবে না। চামচটাও মনে করে নিল!

হেমলতা বললেন, 'বড় বাড়িতে রয়েছে ও, তুই গিয়ে ভালো করে আলাপ করে পায়েস খাইয়ে আয়।' এক পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন বউ। কিছু-একটা বলব-বলব করে যেন বলতে পারছিল না। সেটা বুঝতে পেরেই যেন হেমলতা বললেন, কী হল, আরে বাবা নিজের ছেলের কাছে যাচ্ছিস, লজ্জা কিসের! অনি বড় ভালো ছেলে, মনটা খুব নরম। নে যা, আমি আর বকবক করতে পারছি না, উনুন কামাই যাচ্ছে।'

ভেতরের বারান্দায় সরিৎশেখর মহীতোষের সঙ্গে বসেছিলেন। ঘাঢ় স্বারিয়ে নতুন বউকে দেখলেন সরিৎশেখর। একমাথা ঘোমটা, আঁচলের তলায় কিছু-একটা ঢেকে নিয়ে উঠেন পেরিয়ে আসছে। ওকে দেখলেই চট করে মাধুরীর কথা মনে পড়ে যায়। মাধুরীও ঘোমটা দিত তবে এতটা নয়। সে-মেয়েকে পছন্দ করে এনেছিলেন তিনি, তাঁর পছন্দের জিনিস বেশিদিন টেকে না। ছেলের দিকে তাকালেন, মহীতোষও বটকে দেখছে। একটুও গলা বেড়ে নিয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে ওর বাপের কাছে নিয়ে যাও না কেন? প্রত্যেকবারেই দেখতে পাই এখানে এসেই ফিরে যাচ্ছে।'

হঠাত-এ ধরনের কথার জন্য তৈরি ছিলেন না মহীতোষ। কিছু-একটা নিয়ে স্তীকে ওদিকে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন তিনি। এই প্রথম এ-বাড়িতে ওকে দিয়ে কোনো কাজ করাচ্ছে দিনি। কিন্তু কার যাচ্ছে? ওখানে তো অনি থাকে। ছেলের সঙ্গে এখন ভালো করে কথা হয় না তাঁর, কেমন অস্তি হয়। স্তীকে অনির কাছে যোতে দেখে হঠাৎ খুব আরাম বোধ হচ্ছিল। এই সময় বাবার প্রশ্নটা কানে কী বলবেন বুঝতে না পেরে কান চুলকে বললেন, 'যেতে চায় না ও।'

জু কুঁচকালেন সরিৎশেখর, 'সে কী! না না, এ ঠিক কথা নয়। তোমারই উদ্যোগী হওয়া উচিত, এক শহরে বাড়ি, তার মা-বাবা কী ভাবছেন বলো তো।'

সরিৎশেখর নিজে কখনো ছেলের শ্বশুবাড়িতে যান না, অনেক অনুরোধ সন্ত্রেও যেতে পারেন না। মহীর বিয়ের রাত্রে বাড়ি ফিরে তাঁর যে-অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে-কথা কাউকে বলা হয়নি, এমনকি হেমলতাকেও নয়। নাতির মুখের দিকে চেয়ে সেদিন তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

নতুন বউ এদিকটায় কখনো আসেনি। বিরাট বারান্দা পেরিয়ে সার-দেওয়া ঘরগুলোর কোনটায় অনিমেষ আছে বুঝে উঠতে সময় লাগল তার। দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ তার মনের হল শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, হাতে কোনো সাড় নেই। এ-বাড়িতে যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিনও এরকম মনে হয়নি। এতবড় একটা ছেলে যাঁর তাঁকে বিয়ে করতে কখনোই ইচ্ছে হয়নি তাঁর, তবু বিয়েটা হলে

গেল। আর বিয়ের পর ইন্দুক অহরহ যার নাম শুনছে ও, সে হল এই ছেলে। মহীতোষের কথাবার্তায় বুবাতে পেরেছে ছেলের মন জয় করতে মহীতোষ স্তীকে যেন পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা কী করে হয়! আজ অবধি জেনেগুলো কোনো মন জয় করার চেষ্টা ওকে করতে হয়নি। সেটা কী করে করতে হবে মহীতোষ তাকে শিখিয়ে দেননি কিন্তু। ভেজানো দরজাটা ঠেলল নতুন বউ।

বাবা এবং নতুন মা এসেছেন জানতে পেরে অনি চৃপ্তাপ করে বসে ছিল। পিসিমাৰ নির্দেশমতো ও মনে মনে নতুন মা শব্দটাকে অনেকখানি রঙ করে নিয়েছে, কিন্তু ব্যবহার করেন। দূর থেকে কয়েকবার নতুন মাকে ও দেখেছে। এর আগে ওরা যখন এসেছেন তখন দুপুরের খাওয়াৰ সময় বাবা আৰ দাদুৰ পাশে বসে থেতে থেতে মাথা নিচু কৰে আড়চোখে দেখেছে, একটা রঙিন শাড়ি রান্নাঘৰেৱ দৱজাৰ অনেকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাওয়াৰ সময় বসে খাটাটা অত্যন্ত খারাপ লাগে অনিৰ। বাবা যেন না বললে নয় এৱেকম দুএকটা প্ৰশ্ন কৰেন। কত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ কৰতে পাৱে সেই চেষ্টা চালিয়ে যায় অনি। পিসিমা পৰিবেশন কৰে বলে বৰ্ণি পায় ও। এতদিন যা মনে হয়নি আজ ওরা যখন রিকশা থেকে নামলেন তখন অনি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাধৰুমে টিনেৰ বালতিতে ওৱ জামাকাপড় জলে ভজিয়ে দিয়ে নিজেৰ ঘৰে আসছিল পড়তে, এমন সময় রিকশা বাড়িৰ সামনে এসে থামে। মহীতোষ রিকশাগুলোকে পয়সা দিছিলেন যখন তখন নতুন মা রিকশা থেকে নেমে ঘোমটা ঠিক কৰে বাড়িৰ দিকে তাকাল। তাৰ তাকানোৰ ভঙ্গিটা অনিকে কেমন চমকে দিল। ওৱ মনে যেটুকু আছে, মাধুৰী এইৱেকমভাৱে তাকাতেন; একছুটে নিজেৰ ঘৰে চলে গিয়েছিল অনি, কেউ ওকে লক্ষ কৰেনি।

কালকেৰ পড়া হয়ে গিয়েছিল। খুব একটা আটকে না গেলে ও পড়া বুৰাতে সৱিষ্ণেখৰেৱ কাছে যায় না। এমনিতে দাদু খুব ভালো কিন্তু পড়তে গেলেই চট কৰে এমন রেগে যান যে অনিকে অবশ্যই চড়-চাপড় থেতে হয়। সে-সময় ওৱ চেহারাই অন্যৱকম হয়ে যায়। একটা সাধাৱণ-ইংৰেজি শব্দ অনি কেন বুৰাতে পাৱে না এই সমস্যাট এত প্ৰেল হয়ে ওঠে যে সেটা সমাধান কৰতে প্ৰাহাৰ ওযুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সামনেৰ বছৰ থেকে মাটোৰ রাখবেন মহীতোষ, সৱিষ্ণেখৰকে এৱেকম বলতে শুনেছে ও। পিসিমাকে অনি বলেছে যদি মাটোৰ রাখতোই হয় তা হলে নতুন স্বারকে যেন রাখা হয়।

অনি দেখল দৱজাটা খুলে গেল, এক হাতে বাটি নিয়ে নতুন মা দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে মুখ নিচু কৰল অনি। এ— ঘৰে কেন এসেছে নতুন মা? ও তো কাউকে বিৱৰণ কৰতে যায়নি। যেন কিছুই দেখেনি এইৱেকম ভঙ্গি কৰে অনি সামনে খুলে-ৱাখা একটা বই-এৱ দিকে ঢেয়ে থাকল।

‘পায়েস্টা খেয়ে নাও।’ বড়দেৱ মতন নয়, একদম ওদেৱ মতো গলায় কথাটা শুনতে পেল অনি। অবাক হয়ে তাকাল ও। পায়েস থেতে ওৱ খুব ভালো লাগে কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি রান্নাঘৰেৱ বাইৱেৰ ভাতেৰ সকড়ি-এ-বাড়িতে কাউকে আনতে দেখেনি। পিসিমা এ-ব্যাপারে ভীষণ খুঁতসুঁতে। জামাকাপড় না ছেড়ে পায়খানায় গেলে চিন্কাৰ কৰে পাড়া-মাত কৰে দেন। পায়েস শোয়াৰ ঘৰে বসে কেতে দেবেন, এ একেবাৰেই অবিশ্বাস। হ্যাঁ পিসিমা জানেন না, নতুন মা না বলে নিয়ে এসেছে। উলটো ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস কৰতে ইচ্ছে কৰল না অনিমেষেৱ। খুব আস্তে ও বলল, ‘আমি শোবাৰ ঘৰে পায়েস খাই নাই।’

থতমত হয়ে গেল নতুন বউ। কথাটা ওৱ একদম বেয়াল হয়নি, আসাৰ সময় দিদিও বলে দেয়নি। এইটুকুনি ছেলে যে এতটা বিচক্ষণেৰ মতো কথা বলতে পাৱে ভাবতে পাৱেনি সে, তুনে লজ্জা এবং অস্বীকৃতি হল। মাথায় বেশ লম্বা ছেলেটা, গড়ন অবিকল মহীতোষেৰ মত। মুখটা খুব মিঠি, চিবুকেৰ কাছে এমন একটা ভাঙ্গ আছে যে দেখলেই আদুৰ কৰতে ইচ্ছে কৰে। এই ছেলে, এত বড় ছেলেৰ মা হতে হবে, বৰং দিদি হতে পাৱলে ও সবচেয়ে খুশি হত।

চেষ্টা কৰে হাসল নতুন বউ, তাৰপৰ ঘৰটা দেখতে দেখতে অনিৰ পাশে এসে দাঁড়াল, ‘ঠিক বলেছ, আমাৰ ছাই মাথাৰ ঠিক নেই। যেই শুনলাম তুমি পায়েস থেতে ভালোবাস নিয়ে চলে এলাম। একবাৰও মনে হল না যে এটা রান্নাঘৰ না, এখানে সকড়ি চলে না। তা এসেছি যখন তখন এক কাজ কৰা যাক। আমি হাতে ধৰে থাকি তুমি চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাও।’ পায়েসে গাঁথা চামচসুৰ বাটিটা অনিৰ সামনে ধৰল নতুন বউ। সেদিকে তাকিয়ে অনিৰ জিতে জল প্ৰায় এসে গেল, কী গুৰু সৱ পড়েছে। কিন্তু কেউ বাটি ধৰে থাকবে আৱ তা থেকে ও থাবে এৱেকম কোনোদিন হয়নি। ইঠাঁৎ ও নতুন বউ-এৱ দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমৰা বাঙাল, না?’

হকচকিয়ে গেল নতুন বউ, ‘মানে?’

পায়েসের দিকে তাকিয়ে অনি বলল, ‘পিসিমা বলেন, বাঙালরা সকড়ি-টকড়ি মানে না!’

খিলখিল করে হেসে ফেলল নতুন বউ। হসিমা দমকে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার। এই বাড়িতে আসার পর এই প্রথম সে বিয়ের আগের মতো হাসতে পারছে। অনির খুব মজা লাগছিল। নতুন মা একদম তপুপিসির মতো করছে। কোনোরকমে হসিমা দমক সামলে নতুন বউ বলল, ‘ঘটি ঘটি ঘটি, বাঙাল চললে চটি।’ তার পরেই হঠাৎ গলার খুব পালটে পশু করল, ‘তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না?’

মাথা নিচু করল অনি। সেই রাত্রে বাড়িতে ফিরে বারাদ্দায় দাঁড়ানো সরিংশেখরকে সে রেগেমেগে যেসব কথা বলেছিল তা কি বাবা জানেন? বাবা জানলেই নতুন বউ জানবে। পিসিমা তো কোনোদিন অনির সঙ্গে ও-বাপরে কথা বলেননি। কিন্তু অনি জানে পিসিমা সব শুনেছিলেন আবার কেউ-এর দিকে ও পূর্ণচেষ্টে তাকাল। শরীর দেখে খুব বড় বলে একদম মনে হয় না। একটুও ভারিকি দেখাচ্ছে না, কিন্তু এখন যেভাবে ঠোঁট টিপে হাসছে চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। অনি বলল, ‘আমি তোমাকে চিনি না, খামোকা রাগ করতে যাব কেন?’

এক হাতে পায়েসের বাটিটা তখনও ধরা, অন্য হাত অনির চেয়ারের পেছনে রাখল নতুন বউ, ‘আমাকে তুমি কী বলে ডাকবে?’

‘একটু ভেবে অনি বলল, ‘তুমি বলো।’

‘তোমাকে কেউ বলে দেয়নি?’

‘হ্যাঁ, বলেছে। পিসিমা বলেছে “নতুন মা” বলতে।’

খুব ফিসফিস করে শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনল অনি।

‘তোমার নতুন মা বলে ডাকতে ভালো লাগবে তো?’

অনির কেমন অবস্থি হচ্ছিল। কথাবার্তাগুলো এমনভাবে হচ্ছে যে, অন্য একটা অনুভূতির অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল সে।

‘অনি, আমাকে তুমি ছেটমা বলে ডাকবে? আমি তো চিরকাল নতুন থাকতে পারব না!’

ঘাড় নাড়ল অনি। নতুন মার চেয়ে ছেটমা অনেক ভালো। মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যেই যেন ছেটমা বলা।

‘তাহলে এই পায়েসটা খেয়ে ফ্যালো।’ চামচটা এগিয়ে দিল ছেটমা।

হেসে ফেলল অনিমেষ, ‘যদি না খাই?’

কপট নিশাস ফেলল ছেটমা, ‘কী আর করা যাবে। ভাবব আমার কপাল এইরকম। তোমাকে তো আর বকতে পারব না।’

‘কেন? মায়েরা তো বকে।’

ঘাড় নাড়ল অনি, ওর খুব মজা লাগছিল।

‘বস্তু হলে কিন্তু সব কথা শুনতে হয়, বিশ্বাস করতে হয়। আমার আজ অবধি একটাও বস্তু ছিল না। তুমি আমার বস্তু হলে।’

হাত বাড়িয়ে চামচটা ধরল সে, পুরু সরের চাদর কেটে এক চামচ পায়েস তুলে মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি বেয়েছ?’

একগাল হেসে ছেটমা বলল, ‘কেন?’

‘পিসিমা দাক্কণ পায়েস রাঁধে, খেয়ে দেখো।’ নিচিত বিশ্বাসে বলল অনি, ‘মাও এত ভালো পারত না।’

নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাব হয়ে শিয়েছে জানতে পেরে মহীতোষ সবচেয়ে খুশ হলেন। হেমলতার মনটা ব্যবহারে বোঝা যায়, নতুন বউ-এর ওপর তাঁর টেনে বেড়ে গেছে। সরিংশেখরকে চট করে বোঝা মুশকিল। হেমলতা দুপুরে খাওয়ার সময় পাখাৰ হাওয়া করতে করতে অনেকবার নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাবের কথা তুলেছেন। সরিংশেখর হঁচু-না করেননি। চিরকালেই আঘায়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর একটা আড়াল-রাখা সম্পর্ক আছে, মনে কী হচ্ছে বোঝা যায় না।

মহীতোষের বিয়ের রাত থেকে এ-ব্যাপারে একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি।

এবার মহীতোষেরা ফিরে যাবার পর বেশ কিছুদিন আসতে পারলেন না। চা-পাতা তোলা হচ্ছে। এখন ফ্যাট্টিরিতে দিনবারাত মেশিন চলছে। রবিবারেও সময়-অসময়ে ডাক পড়ে। এখন স্বগংড়া ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর অনির ঝুল এখন ছুট। কিন্তু নতুন স্যার ওদের প্রত্যেকদিন ঝুলে যেতে বলেছেন। রোজ দুটো থেকে ঝুলের মাঠে মহড়া হচ্ছে। ছাবিশে জানুয়ারি আসছে। নতুন স্যার বলেছেন, আমরা জন্মেছি পনেরোই আগস্ট আর আমাদের অনুপ্রাশন হবে ছাবিশে জানুয়ারি।

ঠিক এই সময় এক অনি সেজেগুজে বেরহচ্ছে, ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। শীতের এই দুপুরে পচিমে সূর্য চলে গেলে সরিষ্ণেখর পেছন-বারান্দায় ইঞ্জিয়ের পেতে শয়ে থাকেন রোদে গা ডুবিয়ে। ডাকপিয়ন উঁর হাতে ঠিঠিটা দিয়ে গেল। খামের উপর ঠিকানা পড়ে তিনি চিংকার করে ডাকলেন, ‘দাদুভাই তোমার চিঠি।’

ভেতরের কলতলায় বাসন মাজাছিলেন হেমলতা। এখনও স্নান হয়নি তাঁর, জল লেগে পায়ের হাজা জুলছে, বারবার চিংকার শুনে হাত খামিয়ে বললেন, ‘ওমা, অনিকে আবার কে চিঠি দিল।’

ঘর থেকে বেরিয়ে চিংকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অনিমেষ। আজ অবধি তাকে কেউ চিঠি দেয়নি। চিঠি দেবার মতো বঙ্গ তার কেউ নেই।

অবশ্য ওর ঠিকানা ঝুলের অনেকের কাছে আছে। ঝুল বন্ধ হবার সময় যারা বাইরে যায় তারা পচন্দমতো ছেলের ঠিকানা নিয়ে যায়। কিন্তু কোনোবার চিঠি দেয়নি কেউ তাকে। বিশ্ব আর বাপী যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। ওরা কোনোদিন তাকে চিঠি দেয়নি। বেশ একটা উত্তেজনা বুকের ভেতর নিয়ে অনিমেষ বারান্দায় দাদুর কাছে গেল। ইঞ্জিয়ের শয়ে আছেন সরিষ্ণেখর, এক হাত ওপরদিকে তোলা, তাতে একটা মোটা নীল খাম ধরা। খামটা নিয়ে একচুটো ভিতরে চলে এল ও এন্দিক-ওদিক চেয়ে সোজা বাগানে নেমে গেল। সুপ্রারিগাছে বসে একজোড়া ঘৃণ্য সামনে ডেকে যাচ্ছে। গেয়ারাতলায় এসে খামটা ঝুলতেই মিষ্টি একটা গুঁজ বেরুত। মার একটা খুব বড় সেন্টের শিশি ছিল। এই চিঠি যে লিখেছে সেও কি সেই সেন্ট মাথে! খামের ওপর লেখাটা দেখল ও। গোটা-গোটা মুক্তোর মতো অঙ্কের তার নাম লেখা দাদুর কোর অফে। নীল আকাশের চেয়ে নীল খামটা সন্তুর্পণে ঝুলতেই ভাঁজ করা কাগজ হাতে উঠে এল। চিঠি বুক চিরে চারটে ভাজের রেখা চারদিকে চলে গিয়েছে। চিঠির তলায় চোখ রাখল অনি, ‘আমার মেহাশিস জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছেট্টো।’ উত্তেজনাটা হঠাত করে এল অনির। জানা হয়ে গেলে কোনোকিছু আশীর্বাদিকা, তোমার ছেট্টো।’ উত্তেজনাটা হঠাত করে এল অনির। জানা হয়ে গেলে কোনোকিছু নতুন থাকে না। উত্তেজনার জায়গায় কৌতুহল এসে জুড়ে বসল। চিঠিটা পড়ল সে, ‘মেহের অনি। এই পত্র পাইয়া নিশ্চয়ই খুব অবাক হইয়াছ। এখানে অসিয়া শুধু তোমার কথা মনে পড়িতেছে। তুমি নিশ্চয় জান এই সময় তোমার পিতার চাকরিতে ছুটি থাকে না, তাই আমাদের জলপাইগুড়ি যাওয়া হইতেছে না। তাই বলি কি, তোমার যখন পাশের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তখন আমার নিকট চলিয়া আসিও। এখন তো আমরা বন্ধ, বঙ্গের নিকট বঙ্গ আসিবে না!

তোমাকে লইয়া আমি নদীর ধারে বেড়াইব। শুনিয়াছি নদী বন্ধ হইবে, উহা কী জিনিস আমি জানি না। কুলগাছে প্রচুর কুল ধরিয়াছে। তুমি জানিয়া খুশ হইবে কালীগাই-এর একটি নাতনি হইয়াছে। রং সাদা বলিয়া নাম রাখিয়াছি ধৰলি। বাড়িতে এখন এত দুধ হইতেছে যে খাইবার লোক নাই। তুমি আসলে আমি তোমাকে যত ইচ্ছা পায়েস খাওয়াইব। জানি দিদির মতো ভালো হইবে না।

গতকাল এখানকার ঝুলের ভবনী মাটোর আমাদের বাড়িতে আসয়াছিলেন। তোমাদের ঝুল এই বৎসর হইতে নতুন বাড়িতে উঠিয়া যাইতেছে। ভবনী মাটোরের ইচ্ছা তুমি অবশ্যই আগামী ছাবিশে জানুয়ারি এখানে থাক। কারণ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রথম পতাকা তুমি উত্তোলন করিয়াছিলে। ছাবিশে জানুয়ারিতেও সেই কাজটি তোমাকে দিয়া তিনি করাইতে চান। শুনিলাম এই বৎসরই তিনি -অবসর লইয়া দেশে যাইবেন।

তোমার পিতা পরে পত্র দিতেছেন, দিদিকে বলিও। শুরুজনদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিলাম। তুমি আমার মেহাশিস জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছেট্টো।’

‘পুনশ্চ এ-জীবনে আমি কাহাকেও দৃঢ় দিই নাই। অনি, তুমি কি আমাকে দৃঢ় দিবে?’

চিঠিটা পড়ে অনিমেষ কিছুক্ষণ স্তব হয়ে দাঢ়িয়ে থাকল। এখন সেই ঘূর্ষু দুটোই শুধু নয়, একরাশ পারি সমস্ত বাগান জুড়ে তারবরে চ্যাচামেটি শুরু করেছ। চোখের সামনে ঝর্ণেছেড়ার গাছপালা মাঠ নদী যেন একজুটে চলে এল। সেই কঠালগাছের ঝুপড়ি হয়ে দাঢ়িয়ে-থাকা ছেট ছেট পাথরের আড়ালে মুকিয়ে-থাকা লাল চিঙ্গিগুলো কিংবা সুবৃজ গালচের মতো বিছানো চা-গাছের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসা কুয়াশার দস্তল একটা নিশ্বাস হয়ে অনিমেষের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

ভবানী মাটার চলে যাবেন! 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজের কাছে সৎ থাকলে জীবনে কোনো দুঃখই থাকে না।' একটা ঘাম-জড়ানো নিস্যার গুৰু যেন বাতাসে ডেসে এল। ঝর্ণেছেড়ায় যাবার যে - ইছেটা মাধুরী চলে যাওয়ার পর একদম চলে গিয়েছিল সেটা হঠাৎ ঝুপেবুপ করে থাপিয়ে পড়ল। মায়ের কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা শীতল ছোয়া লাগল অনির। ঝর্ণেছেড়ায় গেলে সবাইকে দেখতে পাবে ও, শধু মা নেই। তাঁর জায়গায় ছেটমা সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ের পর হেমলতা রাগ করে বলেছিলেন, 'দুধের স্বাদ কি ঘোলে ঘেটে? মা হল মা, সৎমা সৎমাই।' আচ্ছা, সৎমা বলে কেন? সৎ মানে তো ভালো, ভালো মা-রা আবার খাবাপ হবে কী করে! কিন্তু ছেটমাকে তো মায়ের মতো মনেই হয় না, বরং দিদির মতো নিজের মনে হয়। সৎমারা নাকি বুব অত্যাচার করে। ছেটমাকে দেখে, এই চিঠি পড়ে, কেউ সৈ কথা বললে অনি তাঁকে মিথুক বলবে। এখানে ছেটমাকে তার ভালো লেগেছে, কিন্তু ঝর্ণেছেড়ায় গেলে মাকে মনে পড়বেই, তখন ছেটমাকে-। অনির মনের হল বাবাকে যদি সে জিজ্ঞাসা করতে পার, মাকে ভুলে গেছে কি না! কিন্তু তবু ঝর্ণেছেড়ায় যাবার জন্যে বুকের মধ্যে যে - ছেটফটানি শুরু হয়ে গেছে সেটা যাচ্ছে না। নতুন স্যার বলেছিলেন, 'মা নেই কে বলল? জন্মাতৃমহি তো আমাদের মা। বন্দেমাতৃরঃ।' শব্দটা উচ্চাণ করলেই শরীর গরম হয়ে ওঠে। তখন আর কারও মুখ মনে পড়ে না ওর। পেয়ারাগাছের তলায় পায়চারি করতে করতে ও নিচুগুলায় আবৃত্তি করতে লাগল, 'আমরা অন্য মা জানি না-জননী জন্মাতৃমিত বৰ্ণনাদপি গরীবনী। আয়রা বলি জন্মাতৃমিতি জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, স্তৰী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই-আমাদের আছে কেবল সেই সৃজনা, সুফলা, মূলয়সীমীরণ শীতলা, শস্যশ্যামলা।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। একদণ্ডে ও মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পেয়ারাগাছের তলায় ছেট ছেট ঘাসের ফাঁকে কলো মাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই মাটিটাকে চেনা যাচ্ছে না আর। সেই ঝর্ণেছেড়া থেকে চলে আসার দিন ও রুমালে করে মুকিয়ে একমুঠো মাটি এনে পেয়ারাগাছের তলায় রেখে দিয়েছিল। যখনই মন-খারাপ করত তখনই এসে মাটিটাকে দেখত, মাটিটা দেখা মানে ঝর্ণেছেড়াকে দেখা। তারপর একসময় ভুলে গিয়েছিল সেই মাটির কথা। এতদিন ধরে কত বৃষ্টি গেল, প্রতি বছরের দিন্য গেল। এখন আর কাউকে আলাদা করে চেনা যাবে না। মাটিদের চেহারা কেমন এক হয়ে যায়। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, আমাদের জন্মাতৃমি আছে। চিঠিটা পকেটে রাখতে অনি ঠিক করল এখন ও ঝর্ণেছেড়ায় যাবে না।

এবারও অনি ভালো বেজাল্ট করে নতুন ক্লাসে উঠল। তবে প্রথম তিনজনের মধ্যে ও জাগ্রত্ব পাচ্ছে না, সরিখশেখের ওর প্রথমে রিপোর্ট দেবেছেন, অংশ ও বুব কম নম্বর পাচ্ছে। মহীতোষ চাইছেন, ঝুলের অঙ্কের মাটারমশাইকে বাড়িতে শিক্ষক হিসেবে রাখতে, কিন্তু অনির এক পো-নতুন স্যার ছাড়া ও কারও কাছে পড়বে না। সরিখশেখের নতুন স্যার নিশীথ সেনের সবকে বৌজ নিয়েছেন। অন্দুলক বাল্লাক শিপাক, চিউশনি করেন না, তা ছাড়া ইদানীঃ জলপাইগুড়ির একটি দলের সঙ্গে ওর মেগামেগো কথা সবাই জানে। নিজে সারাজীবন কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন সরিখশেখের, কিন্তু সেটা দূর থেকে। জলপাইগুড়িতে আসার পর সকাল-বিকাল বাইরে বেরিয়ে ঝানীয় নেতৃদের যে-চেহারা দেখেছেন তাতে একান্কার পলিটিক্স ঠিক কী জিনিস তিনি বুবতে পারছেন না। এই সৌদিন দাজানে শাবার সময় দিনবাজার পোষ্টঅফিসের সামনে দুজন দুলোকের সঙ্গে তাঁর মুখেযুখি দেখা, দুজনেই পদ্ধর পরেছেন, একজনের সাথেয় গাফীটুপি। টুপিহীন লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছেন এবং এনে হতে ওরা এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। টুপি-পৱা লোকটি বলেলেন, 'নমহার, এখনোর কাছেই যাচ্ছিলাম।'

সরিখশেখের বলেলেন, 'আমার কাছেই'

'হ্যা। আপনি তো ঝর্ণেছেড়া টি-একটের বড়বাবু!'

'একদিন ছিলাম।'

‘আপনি আমাকে চেনেন না। আমি বনবিহারী সেন, মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের সময় কংগ্রেসের হয়ে আপনার কাছেই দাবি জানাতে যেতাম, হা হা হা।’ প্রাণ খুলে হাসলেন ভদ্রলোক।

‘দাবি কেন বলছেন, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া আমাদের কর্তব্য।’ সরিষ্পেখর খুব সৎ গলায় বললেন।

‘ভালো ভালো। কিন্তু জানেন, এত কষ্টে স্বাধীনতা এনে দিলাম তবু দেশের লোকজন আমাদের প্রাপ্য সর্বান্টা দিতে চায় না। আচ্ছা, আপনার একটি ছেলে শুনেছি কমিউনিস্ট, কী নাম যেন—’

বনবিহারীবাবু পাশের লোকটির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, ‘প্রিয়তোষ।’

বনবিহারীবাবু ঘাড় নাড়লেন, ‘হ্যাঁ, সে ফিরেছে পুলিশ কিন্তু ওয়ারেন্ট উইথ্রড করে নিয়েছে। আসলে আমরা কারও সঙ্গে শক্তভাবে থাকতে চাই না। ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।’

সরিষ্পেখর বললেন, ‘এ-ছেলের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।’

দুহাত দুদিকে বাড়িয়ে উৎকৃষ্ট গলায় বনবিহারীবাবু টিচ্কার করে উঠলেন, ‘এই তো, এই যে আদর্শের কথা বললেন সমস্ত দেশবাসীর তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার মতো লোকই তো এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। হ্যাঁ, আপনার কাছে কেন যাচ্ছিলাম, বলি।’

পাশের লোকটি বললেন, ‘এসব কথা ওর বাড়িতে গিয়ে বললে হত না?’

বনবিহারীবাবু ঘাড় নাড়লেন, ‘আরে না না হল ধর, ইনি হয়েন আমাদের ঘরের লোক, এর সঙ্গে অত দুর্ভাগ্য না করলেও চলবে। হ্যাঁ, সরিষ্পেখু, আপনি তো জানেন ছাবিশে জানুয়ারি আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস। তা এই দিনটিকে সার্থক করে তোলার জন্য আমরা একটা বিরাট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। চাঁদমারির মাঠে ঐতিহাসিক জয়ায়েত হবে, কলকাতগা থেকে নেতারা আসবেন, কিন্তু আমাদের স্থানীয় অফিসে বসে এতবড় ব্যাপারটা অগ্রানাইজ করা যাবে না। আমাদের ইচ্ছা আপনার বিস্টার বাড়িটা তো পড়েই আছে, ওটা আমরা সাময়িকভাবে অফিস হিসেবে ব্যবহার করি। আপনি কী বলেন?’

থ্রুমত হয়ে গেলেন সরিষ্পেখর, ‘কিন্তু আমার বাড়ি তো খুব বড় নয়। তা ছাড়া, বাড়ি ভাড়ার কথা—।’

‘আমি জানি আপনি ভাড়া দেবেন না, আর সেটা দিয়ে আপনাকে অপমান করব না। আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। প্রকৃত দেশসেবী হিসেবে এটা আপনার কাছে নিষ্কয়ই আশা করতে পারি।’ বনবিহারীবাবু রুমালে নাক মুছলেন।

মুহূর্তেই সরিষ্পেখর চিন্তা করে নিলেন। পার্টি অফিস করতে দিলে বাড়িটার হাল কয়েক দিনেই যা হবে অনুমান করা শক্ত নয়। এত সাধের তৈরি বাড়িতে পাঁচ ভূতে আড়তা জয়াবে, প্রাণ ধরে সহ্য করতে পারবেন না তিনি। হোক সেটা কংগ্রেসের অফিস, এ-ব্যাপারে তাঁর কোনো দুর্বলতা নেই। এ-বাড়ি তাঁর ছেলের মতো, অসময়ে দেখবে, তাকে বকে যেতে দিতে পারেন না তিনি। বনবিহারীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি হয়তো জানেন না আমি যাকেটিভ পলিটিক্স কোনোদিন করতাম না। তবে দূর থেকে কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছি। আমার ভূমিকা আজও একই। আপনাদের ইই প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্মসূজে দূর থেকে সমর্থন জানিয়ে যাব। আচ্ছা, নমস্কার—।’

সরিষ্পেখরকে হাঁটতে দেখে বনবিহারীবাবু বিশ্বায়ে হতবাক হয়ে গেলেন প্রথমটা, তারপর কোনোরকমে বললেন, ‘কিন্তু আমি যে নিশ্চীরের কাছে শুনেছিলাম—’

মুরে দাঁড়ালেন সরিষ্পেখর, ‘কে নিশ্চীধ?’

‘জিলা ক্লুলের চিটার নিশ্চীধ সেন।’

‘কী বলেছে সে?’

‘নিশ্চীধ বলল, আপনারা কংগ্রেসের সাপোর্টার। আপনার এক নাতি যে জেলা ক্লুলে পড়ে, সে নিশ্চীধের কংগ্রেসিজমের প্রচণ্ড ভক্ত। নিশ্চীধ তাকে গড়েপিঠে তৈরি করছে, তারও ইচ্ছা আপনার বাড়িতেই কংগ্রেস অফিস হোক। আমি কি তা ভুল রিপোর্টে হলধর? তুমি তো সেই সাপ্তাহিয়ারের কাজ করা থেকে সরিষ্পেখকে চেন? সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বিশ্বিত বনবিহারীবাবু প্রশ্নটা করলেন।

এতক্ষণে টুপিহান লোকটিকে চিনতে, পারলেন সরিষ্পেখর। স্বর্গের ঢাকা চাবাগানের একজন

ফায়ারউট সাপ্তাহারের হয়ে এই লোকটি মাঝে-মাঝে অফিসে যেত। মাল না দিয়েও সাপ্তাহই হয়েছে বলে চেষ্টা করার জন্য সাপ্তাহারে কস্ট্রাইট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। সরিষ্ঠেখর তখন শুনেছিলেন এই লোকটিই নাকি সেজন্য দায়ী। হলধর বলল, ‘নিশীথ তো মিথ্যে কথা বলবে না আপনাকে।’

সরিষ্ঠেখর হাসলেন, ‘আমার নাতিকে আমার চেয়ে সেই ভদ্রলোক দেখছি বেশি চিনে গেছেন। ভালো ভালো। আচ্ছা চলি।’ আর দাঁড়ালেন না তিনি।

বাজার থেকে ফিরে সরিষ্ঠেখর সোজা অনিয় ঘরে এলেন। পরিষ্কার-পরিষ্ক্র হয়ে থাকতে ভালোবাসে অনি, সরিষ্ঠেখর ঘর দেখে খুশ হলেন। নিজের জায়াকাপড় ও নিজেই কাছে, হেমলতা ইত্তি করে দেন। কিন্তু বই-এর টেবিল দেখে বিরক্ত হলেন সরিষ্ঠেখর, সব স্তুপ হয়ে পড়ে আছে। পড়ার টেবিলে বসে অনি তখন ছবি আকছিল, দাদুকে দেখে সেটা চাপা দিল। সচরাচর এই ঘরে সরিষ্ঠেখর আসেন না, দরকারে অনিই তাঁর কাছে যায়।

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘নতুন বইগুলোর এই অবস্থা কেন, সাজিয়ে রাখতে পার না?’ বুকলিস্ট পাবার পর সদ্য কেনা হয়েছে বইগুলো। ওর ওপর একটা পুরনো বই দেখে হাতে তুলে নিলেন সরিষ্ঠেখর, বক্ষিমবুরুর আনন্দমঠ। পাতা উলটে দেখলেন, বেশির ভাগ জায়গায় লাল পেনিসে আভারলাইন করা আছে। নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, ‘এই বই কোথায় পেলে?’

অনি বলল, ‘নতুন স্যারের কাছ থেকে এনেছি।’

‘পড়েছে?’

দাড় নাড়ুল অনি, ‘হ্যা, আমার অনেকটা মুখস্থ হয়ে গেছে। ধরবে?’

‘কেন মুখস্থ করলো?’

প্রশ্নটা যেন আশা করেনি অনি, একটু থেমে বলল, ‘আমার ভালো লাগে।’

নাতির দিকে ভালো করে তাকাবেন সরিষ্ঠেখর। হঠাৎ ওর ঘনে হল অনি আর সেই ছোট্টি নেই। জলপড়া গাছের মতো হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে অনেকখানি উঠে এসেছে। অতিদিন দেখতে দেখতে এই বড়-হয়ে-ওঠা ব্যাপারটা তিনি টের পাননি। এমনকি গলার ঘর পর্যন্ত পালটে যাচ্ছে ওর।

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘নতুন স্যার তোমাকে কী বলেছেন একটু তুনি?’

অনি দাদুর দিকে তাকাল, ‘কী কথা?’

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘এই দেশের কথা, কংগ্রেসের কথা।

অনি হাসল, ‘নতুন স্যার আমাকে খুব ভালোবাসেন দাদু। বলেন, তোমার মতো সিরিয়াস ছেলে এই কুলে আর কেউ নেই।’

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘আচ্ছা! খুব ভালো।’

অনি যেন উজ্জীবিত হল কথাটা শনে, ‘পরিশ্ৰম, আৰুদান আৰ ইতিহাস ছাড়া কোনো জাতি বড় হতে পারে না। আমাদের এই দেশ শাধীন হয়েছে একমাত্র কংগ্রেসের ওইসব গুণ চিল বলে। তা ছাড়া যে-কোনো জাতির যদি উপযুক্ত নেতা না থাকে সে-জাতি দেশ শাসন করতে পারে না। আমাদের পতিত নেহঙ্গ হলেন সেইরকম এক নেতা।’

চোখ বজ্জ করলেন সরিষ্ঠেখর। কী বলবেন ঠিক বুবাতে পারছেন না তিনি। এখন রাস্তাঘাটে যেসব ছেলেকে দেখেন তাদের থেকে অনি আলাদা। কিন্তু ওর নিশীথ সেন এইসব ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকিয়ে ভালো করছে না খারাপ করছে বোৰা যাচ্ছে না।

‘তুমি কি নতুন স্যারকে বলেছ যে, এই বাড়িতে কংগ্রেস অফিস হলে আমার আপত্তি হবে না?’
গঠীর গলায় প্রশ্নটা করলেন তিনি।

দাদুর গলার ঘর শনে অনি চট করে মাথাটা নিচু করে ফেলল। নতুন স্যার যখন বলেছিলেন, ছাবিশে জানুয়ারি প্রিপারেশনের জন্য বড় বাড়ি চাই তখন ও এই কথাটা বলেছিল। তাদের বাড়িতে কংগ্রেস অফিস হবে বড় বড় নেতা এখানে আসবেন, তাঁদের দেখতে পাবে অনি-এটা ভাবতেই কেমন লাগছিল। খুব সন্তুর্পণ মাথা নাড়ল সে, হ্যা।’

সরিষ্ঠেখর এটো আশা করেননি। তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল নিশীথ সেন বানিয়ে বানিয়ে কথাটা বলেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল ওর, গলা চড়িয়ে বললেন, ‘কিসে আমার আপত্তি আছে আৱ কিসে

নেই—একথা তুমি জানলে কী করে?’

দাদুর গলা সমস্ত ঘরে গমগম করছে এখন। খুব অবাক হয়ে অনি দাদুর দিকে তাকাল। এইরকম মুখ নিয়ে দাদু কোনোদিন তার সঙ্গে কথা বলেননি। অসহায় ভঙ্গিতে ও বলল, ‘কিন্তু তুমি তো কংগ্রেসি। দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, মহারাজা গান্ধীর কথা তুমি তো বলতে। তাই আমি ভাবলাম—’

হঠাতে হাত বাড়িয়ে নাতির কান ধরলেন সরিষ্ণেখর। উত্তেজনায় তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছিল, ‘ভীষণ পেকে গেছ তুমি। আমি কংগ্রেসি তোমাকে কখনো বলেছি? মহারাজা গান্ধী একসময় কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন, সুভাষ বোসকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এসব খবর নতুন স্যার বলেছে?’ টকটকে লাল কানটাকে এবার ছেড়ে দিরেন সরিষ্ণেখর, ‘মানুষের ইতিহাস দিয়ে মানুষকে বিচার করি না আমি, একটা মানুষ কীরকর্ম সেটা তার বর্তমান দেখেই বোঝা যায়। স্বাধীনতার আগে আমরা যা ছিলাম, এই তো তিনি বছর চলে গেল প্রায়, কঠুনে এগিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস দেশটাকে?’ শেষের কথাটা নাতিকে ধমকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

কানের ব্যথায় এবং সহসা দাদুর এই নতুন চেহারাটা দেখতে পেয়ে অনি কেঁদে ফেলল এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘নতুন স্যার বলেছেন রাতারাতি দেশ তৈরি যায় না।’

‘পঁচিশ বছরেও পারবে না। সব নিজের পকেট ভরার ধাক্কায় রয়েছে, দেশটা উচ্ছ্বেষণে গেলে পুদের লাভ! সে—কংগ্রেস আর এই কংগ্রেস এক নয়। আটচত্ত্বই সালের তিরিশে জানুয়ারি গান্ধীজির সঙ্গে সে—কংগ্রেস মরে গেছে।’ এককণে সরিষ্ণেখরের খেয়াল হল একটি নাবালকের কাছে এসব কী বলে যাচ্ছেন! বিদ্যাসাগর চাটিতে শব্দ করে বেরিয়ে যেতে—যেতে হঠাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ঘুরে নাতির দিকে তাকালেন। অনি এখন কাঁদছে না, হাঁ করে দাদুর দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল সরিষ্ণেখরের। জীবনে এই প্রথম তিনি অনির গায়ে হাত দিলেন। তাঁর সারাজীবনে অনেক কঠোর কাজ তিনি করেছেন, কিন্তু এই নীতির ব্যাপারে তাঁর মনের ভেতর যে—দুর্বলতা ও জন্মযুক্ত থেকে এসেছিল তাকে সরাতে পারেননি কখনো। কিন্তু আজ যখন শুনলেন কে এক নিশ্চিথ সেন ওকে গড়েপিটে তৈরি করছে তখন থেকে বুকের মধ্যে অস্তুত একটা দীর্ঘ বোধ করতে শুরু করেছেন তিনি। ছেট ছেলেরটা কখন তাঁর আজান্তে রাজনীতির মধ্যে বাঁপিয়ে এখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর ভবিষ্যৎ কী তিনি জানেন না। সে—রাজনীতি ব্যক্তিগতভাবে তিনি অপচন্দ করেন। কিন্তু সেটাও তাঁকে খুব বড় আঘাত দেয়নি। সহ্য হয়ে গেছে একসময়। এখন এই ছেট কাদার তালটাকে খদি কেউ রাজনীতির আওনে সেঁকে, তা হলে সহ্য করতে কষ্ট হবে বইকী।

অনির কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। আন্তে করে দুহাতে মুখটা ধরলেন; ‘দাদু, তুমি তো এখন অনেক চোট, এসব কথা তোমার ভাববার সময় নয়। এখন তোমার কর্তব্য অধ্যয়ন করা। নিজের দেশের ইতিহাস পড়ে দেশকে প্রথমে জান, তারপর বড় হয়ে নিজের চোখে তার সঙ্গে দেশকে যিলিয়ে নিয়ে তবে স্থির করবে এসব করবে কি না।’

অনি দাদুর এই পরিবর্তনে খুব খুশ হতে পারছিল না। সামনের দিকে মুখ তুলে সে বলল, কিন্তু নতুন স্যার বলেন, আমাদের কোনো ইতিহাস নেই। যা আছে তা ইংরেজদের লেখা।’

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সরিষ্ণেখর। তারপর গঞ্জির গলায় বললেন, ‘শোনো, আমি চাই না তুমি এসবের মধ্যে থাক। দাদুভাই, একটা কথা চিরকাল মনে রেখো, নিজে উপযুক্ত না হলে কোনো জিনিস গ্রহণ করা যায় না। আমি চাই তুমি ফার্স্ট ডিভিশন স্কুল থেকে বেরিবে। তার আগে তোমার এসব কথা বলতে যেন না শুনি। আর হ্যাঁ, ওই নতুন স্যারের সঙ্গে বেশি মেলায়েশা না করলেই ভালো। সামনের মাস থেকে তোমাদের অঙ্গের মাস্টার বাড়িতে পড়াতে আসবেন।’

হনহন করে বেরিয়ে যেতে—যেতে সরিষ্ণেখরের নিজেরই মনে হল, তিনি বৃথা এই শব্দগুলো ব্যবহার করলেন। বাঙ্কিমাবাবু ঠিকই বলেছেন, ‘এ যৌবনজলতরঙ বোধিবে কে?’ কিন্তু সেই তরঙ্গটাকে এরা দশ বছর বয়সেই চাপিয়ে দিল যে।

বন্দেমাতরম্ জেলা স্কুলের বিবাট মাঠ জুড়ে চিঁকারটা উঠে সমস্ত আকাশ ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় সাড়ে চারশ ছেলে তিনটে লাইনে ভাগে মাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম। প্রথম দিকে ক্ষাউটরা, পরে সমস্ত স্কুল। একটু আগে হেমাস্টারমশাই ছবিক্ষে জানুয়ারির পতাকাটা ভুললেন। লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে অনির মনে পড়ছিল স্বর্গহেঁড়ার কথা। সাতচত্ত্বই সালের পনেরোই আগষ্ট পতাকা তোলার সময় তার কী অবস্থাটাই না হয়েছিল। প্রত্যেকটা ঝাসের ছেলেদের

সামনে একজন করে লিডার দাঁড়িয়ে। নতুন স্যার অনিকে ওর ক্লাসের লিডার ঠিক করেছেন। এই নিয়ে রিহার্সালের সময় থেকে মন্ট ওর পেছনে লেগে আছে, নেহাত নতুন স্যারের জন্য কিছু বলতে পারছে না। আজকেও একটু আগে লাইনের দাঁড়িয়ে নেতাজির পিয়াজি বলে খেপাছিল। যেহেতু সে লিডার তাই মুখটা সামনে ফেরানো, ফলে মন্টকে কিছু বলতে পারছে না। বদ্দেমাতরম্ভ ধনি উচ্চারণ করার সময় ওর গায়ে সেই কঁটাটা আবার ফিরে এল। এমনকি দানু যে অনেক গভীরযুথে আজকের মিছিলে যেতে পারমিশন দিয়েছেন-সেকথাটা তুলে গিয়েছিল। আজকাল দানু যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।

হেডমাস্টারমশাই-এর বক্তৃতার পর নতুন স্যার মধ্যে উঠলেন, ‘এবার আমরা সবাই সুশ্রেষ্ঠতাবে মার্চ করে চাঁদামারির মাঠে যাব। তোমরা জান নিষ্ঠাই কলকাতা থেকে বিশিষ্ট নেতারা সব সেখানে এসেছেন। তা ছাড়া সরকারের প্রতিনিধিত্ব উপস্থিত আছেন। আমরা ক্লুনের তরফ থেকে সেই ঐতিহাসিক জমায়েতে যোগ দিয়ে পৰিক্রম কর্তব্য পালন করব।’

ক্লুনের সমস্ত মাস্টারমশাই এমনকি ওদের পাগল ড্রাই-স্যার অবধি সামনে হাঁটতে লাগলেন। সাড়ে চারশো ছেলে ভাগে ভাগে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় নামল মার্চ করতে করতে। অনি একবার দেখতে পেল ক্লাস টেনের অরূপদার হাতে বিরাট জাতীয় পতাকাটা উড়েছে। অত বড় পতাকা নিয়ে অনি কখনোই সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না। অরূপদাকে খুব হিসেবে হচ্ছিল ওর।

রাস্তায় পড়তেই গান শুরু হল। ‘চল-চল-চল, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।’ তালে তালে, এতদিনের রিহার্সাল যনে রেখে যখন সবাই গাইতে গাইতে পা ফেলছে তখন মানুষজন অবাক হয়ে ওদের দেখতে লাগল। টাউন ক্লাব মাঠের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ও দেখল রাস্তার দুপাশে ভিড়ের মধ্যে সরিয়েছের দাঁড়িয়ে আছেন লাঠি-হাতে। হঠাৎ দানুকে ভীষণ বুড়ো বলে মনে হল ওর। চোখ-চোখি হতে দানু মাথা নেড়ে হাসলেন। তখন ছিতোর গানের মাঝামাঝি জায়গায় এসে গিয়েছে। অনি দানুর দিকে চেয়ে লাইনটা সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল ‘সঙ্গকোটিকর্ত-কলকল-নিনাদকরালে দিসপ্তকেতিভূজের্ধ-করকরবালে অবলা কেন মা এত বলে।’

করলা নদীর কাঠের পুলটা পেরিয়ে পোষ্টঅফিসের সামনে দিয়ে ওদের মিছিলটা এঁকেবেঁকে গাইতে গাইতে এগোতেই ওরা দেখতে পেল এফ. ডি. আই. থেকে ছেলেরা বেরুছে। এফ. ডি. আই-এর সঙ্গে জেলা ক্লুনের চিরকালের প্রতিষ্ঠিতা, খেলাধূলায় ওদের কাছে হেরে গেলেও পড়াশুনায় জেলা ক্লুন ওদের থেকে এগিয়ে থাকে প্রতিবার। এফ. ডি. আই-এর ছেলেদের দেখে চিঞ্চকরাটা যেন হঠাতই বেড়ে গেল। হঠাৎ মন্ট চেঁচিয়ে বলল, ‘অনিমেষ, ওদের রাস্তা ছাড়িস না, আমরা আড়ে বেরিয়ে যাব।’ ওদের রাস্তা জুড়ে চলতে গেছে অসহায় হয়ে এফ. ডি. আই.-এর ছেলেরা অপেক্ষা করতে লাগল।

চাঁদমারির মাঠে তিলধারণের জায়গা নেই। সামনের দিকে ওরা যেতে পারল না। ক্লাউটোরা ড্রিল-স্যারের সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল। পুলিশ, ক্লাউট, গার্লস গাইডরা পতাকাকে অভিবাদন জানাল। চাঁদমারি গায়ে বিরাট মঞ্চ তৈরি হয়েছে। মন্ট বলল, ‘চল সামনে যাই, এখান থেকে কিছুই দেখতে পাব না।’ ভিড় ঠিসে সামনে যাওয়া সোজা কথা নয়, অনির মাঝে-মাঝে দম বক্ষ হয়ে যাচ্ছিল ভিড়ের চাপে। শেষ পর্যন্ত ওরা একদম মধ্যের সামনে যখন এসে দাঁড়াল তখন সমস্ত শরীর এই শেষ-জানুয়ারির সকালেও আয় ঘেমে উঠেছে। অনি দেখল বিরাট মঞ্চের ওপর নেতারা বসে আছেন। পচিমবঙ্গ সরকারের একজন বিরাট লোক, যাঁর ছবি প্রায়ই কাগজে বের হয়, অনি তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। পাশেই পুলিশ ব্যান্ডে ‘ধনধান্যেপুষ্পেভরা’ বাজছে। মন্ট বলল, ‘আমি এরকম কখনো দেখিনি।’

অনি হাসল, ‘কী করে দেখবি, প্রজাতন্ত্র দিবস তো এর অগে আসেনি।’

একটু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। প্রথমে পায়ে পায়ে বিরাট পুলিশবাহিনী মার্চ করে এসে পতাকাকে স্যালুট করে গেল। পেছনের ব্যান্ডের তালে তালে ওদের পা পড়ছিল। ক্লাউট আর গার্লস গার্ডদের যবার সময় মাঝে-মাঝে হাসি শোনা যাচ্ছে জনতার মধ্যে থেকে। একটি মোটা মেয়ে ঠিক সোজা বিরাট ব্যক্তিটি কপালে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন তখন থেকে। অনি বুবাতে পারছিল ওর হাত ব্যথা করছে। এর পরেই বন্দে-এ-এ মাতরম ধনি দিতে দিতে কংগ্রেসের ক্ল্যান নিয়ে নেতারা এগিয়ে এলেন অভিবাদন জানাতে। সেই চিঞ্চকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জনতার মধ্যে কেউ-কেউ বদ্দেমাতরম্

ধনি দিল। অনির সমস্ত শরীর এখন অস্তুত উত্তেজনা তিরিতির করে ওঠানামা করছে। আর সেই সময় ঘটে গেল ব্যাপারটা।

কংগ্রেসের লোকজন যখন প্রায় মধ্যের সামনে এসে পড়েছেন ঠিক তখনই আট-নাটি যুবক দৌড়ে জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে মধ্যের কাছাকাছি চলে গেল। ওদের ছোটার তঙ্গিতে এমন একটা তৎপরতা ছিল যে জনতা এমনকি মার্চ-করে-আসা কংগ্রেসিরাও থমকে দাঢ়িয়ে পড়ল। অনি শুনল ওরা পাগলের মতো হাত নেড়ে চিংকার করছে, ‘ইনকিলাব-জিন্দাবাদ। ইনকিলাব-জিন্দাবাদ। এ আজাদি-বুটা হ্যায়।’ প্রথম কথাটার মানে অনি বুঝতে পারছিল না। কিন্তু বিশেষণ নয়, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যের ওপর শোরগোল পড়ে গেল। হঠাতে অজস্র পুলিশ এসে ওদের ঘরে ফেলল। ওরা তখনও সামনে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ।’ অনি বিস্ময়ে ওদের দেখছিল। পুলিশ লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু ওরা যাচ্ছে না কিছুতেই। ঠিক সেই সময় কংগ্রেসিরাও ধনি তুলল—‘বন্দেমাতরম্।’ এদেরও গলার জোর যেন হঠাতে বেড়ে গেল, ‘ইনকিলাব-জিন্দাবাদ।’ তার পরই, অনির সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ও দেখল নির্দয়ভাবে পুলিশের লাঠি লোকগোলের ওপর পড়ছে। যত্নাগান চিংকার করতে করতে ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর সেই জটলা থেকে একপাটি জুতো শীঁ করে তাঁরের মতো আকাশে উঠে মধ্যের ওপর দাঁড়ানো পেছনের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। মধ্যের সবাই এসে তাঁকে ঘিলে ধরেছেন। একজন লোক, বোধহয় ডাক্তার, ব্যাগ হাতে ছুটে এলেন।

এতক্ষণে পুলিশ ওদের সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। একটা বড় গাড়িতে ওদের তুলে পুলিশরা শহরে চলে গেল।

এখন একটা থিতনো ভাব চারধারে। কেউ কোনো কথা বলছে না। জনতার কেউ-কেউ উসখুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। অবস্থা স্বাভাবিক করতে থেমে—দাঁড়ানো কংগ্রেসিরা আবার ‘বন্দেমাতরম্’ ধনি দিতে দিতে হাঁটতে চলে গেলেন। মধ্যের ওপর তখনও সবাই ওই নেতাকে নিয়ে ব্যস্ত কংগ্রেসিদের এই যাওয়াটায় কারও মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হল না।

মনু বলল, ‘চল, আমরা পালিয়ে যাই।’

অনিয়েষ বলল, ‘কেন?’

মনু চাপা গলায় বলল, ‘শারামারি হতে পারে।’ বলে ছুঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ক্লাসের কয়েকজন ওর পেছন ধরল। অনি দৌড়তে গিয়ে হঠাতে কী মনে হতে না দৌড়ে হাঁটতে লাগল জনতার মধ্যে দিয়ে। আসবার সময় মানুষ—ঠাসা হয়ে ছিল মাঠটা, এখন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে গেছে, হাঁটতে কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ মানে কী? অনি হাঁটে হাঁটতে ভাবছিল। এই ধনি এর আগে শোনেনি সে। কথাটা কি বাংলা? নতুন স্যার বলেন, ইংরেজ পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেও কংগ্রেসিরা বন্দেমাতরম্ ধনি ছাড়েনি। এরাও তো আজ পুলিশে মার খেয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেছে। কেন? এখন তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। ওরা তবে কী বলতে চায়? কেন ওরা মারকেও ভয় করে না? হঠাতেই ওর ছেটকাকা প্রিয়তোমের কথা মনে পড়ে গেল। এই লোকগুলো কি ছেটকাকার দলের ছেটকাকা বোঝায় চলে গেছে। পিসিমা বলতেন পুলিশের ভয়ে প্রিয় আসে না। কেন পুলিশকে ভয় করবে? এখন তো সবাই বন্দেমাতরমের পুলিশ। অনির বকের মধ্যে আজকের মার-খাওয়া ছেলেগুলোর জন্যে একটু ময়তা জমিল। কেন কংগ্রেসিরা পুলিশদের নিষেধ করল না মারতে? ওরা তো প্রথমে কোনো অন্যায় করেনি, পরে অবশ্য জুতো ছুঁড়েছিল। ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদের’ মানেটা জানবার জন্য অনি নতুন স্যারকে বুঝতে লাগল।

॥ চার ॥

সরিষ্পেখর আজ সকালে শিলিঙ্গড়ি গিয়েছেন। ওর দীর্ঘদিনের পরিচিত পাগলবোঢ়া টি এক্টের রিটার্নার্ড হেডক্লার্ক তেজেন বিশ্বাসের গৃহপ্রবেশ আজ। সরিষ্পেখরের যাবার ইচ্ছে ছিল না বড়-একটা, গেলেই খৰচ। ইদানীং টাকা পয়সার ব্যাপারে আগের মতন দরাজ হতে পারেন না তিনি। পেনশনের টাকা, সামান্য শেয়ার ভিডিভেড আর মহীতোষের পাঠানো অনির নামে কিছু টাকা—এর মধ্যেই তাঁকে ম্যানেজ করতে হয়। সেটা করতে গিয়ে এখন একটা আধুনি তাঁর কাছে একটা টাকার মতোই মূল্যবান। তাই তেজের বিশ্বাস যখন এসে হাতজোড় করে যাবার জন্য অনুরোধ করল তখন

সরিংশেখর বিবৃত হয়ে পড়েছিলেন। এখন প্রতিদিন তাঁকে হিসাব করে চলতে হয়। ব্যাংকে বেশকিছু টাকা তিনি একসময়ে রেখেছিলেন। কিন্তু সে-টাকার কথা চিন্তা করতে গেলে নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়। তা তেজেন বিশ্বাসের বাড়িতে হেমলতা প্রায় জোর করে পাঠালেন বাবাকে। এই একথেয়ে জীবনের বাইরে একটু ঘুরে আসা হবে, মনটা ভালো থাকবে। সেজেন্টে আজ সকাল নটার ট্রেনে শিলিঙ্গড়ি চলে গেলেন সরিংশেখর, সকের ট্রেনে ফিরে আসবেন অবশ্যই।

আজ কুল ছুটি। দাদু চলে যাওয়ার পর অনি পড়েছিল নিজের ঘরে। শীত চলে গেছে, কুলে পড়াশুনা এখন জোর কদমে চলছে। এমন সময় বাইরে দরজায় খুব জোর কড়া নড়ে উঠল। বই রেখে ঘরে বাইরে এসে অনি দেখল পিসিমা রান্নাঘরে রয়েছেন, কড়া নাড়ার শব্দ বোধহ্য কানে যায়নি। ইদানীং হেমলতা কানে একটু কম শুনছেন। কড়াটা আর-একবার শব্দ করে উঠতেই অনি দৌড়ে এসে দরজা খুলল।

মাঝবয়সি একজন মহিলা, মাথায় অনেকখানি ঘোমটা দেওয়া, অথচ ঘোমটা দেওয়ার ধরন থেকে বোঝা যায় অনভ্যস্ত হাতে দেওয়া, একটি বছর দুয়েকের বাচ্চার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। অনিকে দেখামাত্র মহিলা হাসলেন, তারপর বললেন, ‘তুমি নিষ্ঠয়ই অনি, না?’ অনি দেখল হাসবার সময় মহিলার কালো মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। কেমন একটি বিচ্ছিন্ন সেট না পাউডারের গন্ধ ওর শরীর থেকে আসছে। অনি ঘাড় নাড়ল, হঁ।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বাচ্চাটাকে বললেন, ‘প্রণাম করো, প্রণাম করো, তোমার দাদা হয়।’ বলামাত্র দম-দেওয়া পুরুলের মতো বাচ্চাটি হেট হয়ে হাত বাড়িয়ে ওর পায়ের মাটি ছুয়ে মাথায় বোলাল। অনি চমকে উঠে সরে দাঁড়াতে গিয়েও সুন্দোগ পেল না। আজ অবধি কেউ তাকে প্রণাম করেনি, এককাল ওই সবাইকে প্রণাম করে এসেছে। ওর মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল। এই সময় বাচ্চাটা আধো-আধো গলায় বলে উঠল, ‘জল খাব।’

মহিলা বললেন, ‘খাবে বাবা, একটু দাঁড়াও। দাদা তোমাকে জল খাওয়াবে, দুধ খাওয়াবে, সন্দেশ খাওয়াবে, তা-ই না?’

অনি হতভয় হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কে?’

‘আমি?’ মহিলা আবার হাসবার চেষ্টা করলেন, ‘চিনতে পারছ না তো! আচ্ছ আগে বলো, বাড়িতে এখন কে আছেন?’

‘আমি আর পিসিমা।’

‘দাদু কোথায় গেছেন, বাজারে?’

‘না। দাদু আজ শিলিঙ্গড়িতে গিয়েছেন।’

‘ও, তা-ই নাকি!’ বলে মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন গেটের দিকে। সেখানে কেউ নেই, কিন্তু মহিলা গলা তুলে ডাকলেন, ‘চল এসো, তোমার বাবা বাড়িতে নেই।’ অনি অবাক হয়ে দেখল গেটের একপাশে ইলেক্ট্রিক পোস্টের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে এদিকে আসছে। তার মুখচোখ কেমন বসা-বসা, গায়ের শার্ট খুব ময়লা আর পাজামার নিচের দিকটায় অনেকটা ফাটা। কাছাকাছি হতে অনির মনে হল একে সে চেনে, খুতনির কাছে অত্থানি দাঁড়ি বোলা সন্তোষ ভীষণ পরিচিত মনে হচ্ছে। ও চকিতে মহিলার দিকে তাকাল। এতক্ষণ ঘোটা লক্ষ করেনি সেটা দেখতে পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মহিলার শাড়িটা বোধহ্য ঠিক আস্ত নেই আর বাচ্চার জুতোর ডগা ফেটে পায়ের আড়াল বেরিয়ে এসেছে। ঠিক এই সময় লোকটি কাছাকাছি হয়ে মোটা গলায় বলল, ‘আমাদের অনির দেখি স্বাস্থ বেশ ভালো হয়েছে।’ কথাটা শোনামাত্র অনি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। কয়েক লাফে সমস্ত বাড়িটা ডিমিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। হেমলতা তখন মাটিতে বাঁচি নিয়ে বসে তরকারি কুটিলেন। ছেলেটাকে হনুমানের মতো দুপদাপ করে আসতে দেখে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই অনি তাঁর কানের কাছে গরম নিখাস ফেলতে ফেলতে বলল, ‘জ্যাঠামশাই এসেছে।’

অল্পের জন্যে বাঁটিতে আঙুলটা দুটুকরো হল না, হেমলতা জ্ব কুঁচকৈ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে এসেছে?’

‘জ্যাঠামশাই, সঙ্গে একজন বউ তার এইটুকুনি একটা বাচ্চা ছেলে।’

কথাটা বলতে বলতে অনি দেখল পিসিমা সোজা হয়ে বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এমন গলায় হেমলতা বললেন, ‘পরিতোষ এসেছে? তুই চিনতে পারলি? কিন্তু ও তো বিয়ে-থা করেনি-যাঃ, তুই ভুল দেখেছিস!’

হেমলতা উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় হাঁকটা ডেসে এল রান্নাঘরে, ‘ও দিদি, কোথায় গেলে! দ্যাখো কাদের এনেছি!’

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বজ্জ্বাতের মতো বললেন, ‘পরিই তো! কিন্তু এখন আমি কি করব এখন?’

‘আরে তোমাকে ডাকতে ডাকতে গলা ধরে এল, আর তুমি এখানে বসে আছ, বাইরে এসো, প্রণাম করি।’ অনি দেখল জ্যাঠামশাই রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

হেমলতা ভাইয়ের দিকে তাকালেন। এত বিছিরি চেহারা হয়েছে যে চট করে চেনা মুশকিল। এই ভাই তাঁর বড় ভাই, এককালে সেই ছেলেবেলায় ওঁর কত আদরের ছিল-হঠাতে বুকের তিতরটা কেমন নড়েচেড়ে উঠতেই কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলেন হেমলতা। বাবা ওকে ত্যজপূর্ত করেছেন, এ-বাড়িতে ওর প্রবেশাধিকার নেই। এতদিন পর কোথা থেকে উদয় হল?

যেন হেমলতা কী চিন্তা করছেন টের পেয়ে গেল পরিতোষ, ‘কিছু কোরো না, তোমাদের ফাদার ফেরার আগেই কেটে পড়ব?’

এতক্ষণে হেমলতা যেন সাড় পেলেন, শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন এলি?’

‘তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল, তা ছাড়া-’একটু থেমে অনির দিকে তাকাল পরিতোষ, ‘অনেকদিন বউ-বাচ্চার পেট্টারে খায়নি। অবশ্য তোমাদের ফাদার বাড়ি থাকলে আমি চুক্তাম না। বটটা শালা কিছুতেই শুনতে চায় না, একবার খুশুরবাড়ি আসবেই, বাঙাল তো, গো ভীষণ।’

‘বাঙাল? বাঙালের মেয়ে বিয়ে করেছিস তুই?’

‘বিয়ে করিনি। করতে বাধ্য হয়েছি। আমার একটা বাচ্চা ছেলে আছে, তাকে তুমি দেখবে না?’

হেমলতা উঠে দাঁড়ালেন। বাবাকে তিনি চেনেন। আজ অবধি ভুলেও একবার বড় ছেলের নাম করেননি কখনো। বরং প্রিয়তোমের খৌজখবর গোপনে নেবার চেষ্টা করছেন তিনি-হেমলতা সেটা বুঝতে পারেন। পরিতোষ তাঁর কাছে মৃত। এই অবস্থায় হেমলতার কী করা উচিত? ভাইকে থাকতে বলা মানে বাবাকে অসম্মান করা নয়? আর সঙ্গের মধ্যেই তো তিনি ফিরবেন, তখন? অবশ্য সঙ্গে হতে অনেক দেরি আছে। হেমলতা দরজার সামনে এলে পরিতোষ বুঁকে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি চমকে পিছিয়ে দাঁড়ালেন, ‘রাস্তার যয়লা কাপড়ে হুঁয়ে দিয়ো না, আমার স্নান হয়ে গেছে।’

পরিতোষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ‘আমার তো আর জামাকাপড় নেই।’

হেমলতা বললেন, ‘তা হলে সরে দাঁড়াও, প্রণাম করার প্রয়োজন নেই।’

পরিতোষ দিদির কাছ থেকে এই ধরনের কথা আশা করেনি, স্থলিত গলায় সে উচ্চারণ করল, ‘তুমি মাইরি ফাদারের মতোই নিষ্ঠুর।’

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ কষ্টস্বর ডেসে এল, ‘নিজে যেন সাধুগুরুষ। এক ফোটা দয়ামায়া নেই যার সে আবার অন্যকে নিষ্ঠুর বলে।’

কথাটা শনেই পরিতোষ গর্জে উঠল, ‘আই, চুপ।’

‘চুপ করব কেন? অনেক চুপ করোছি, আর নয়।’

কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা উঠেনের দিকে তাকাতেই দেখলেন বারাদার সিডিতে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে একটি রোগাটে বউ বসে আছে। বুঝতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলেন হেমলতা, ‘এরা কারা?’

যেন কিছুই হয়নি এমন গলায় পরিতোষ বলল, ‘ওই তো, তোমার ভাই বউ আর ভাইপো। দিদিরে আবার প্রণাম করতে যেও না, রাস্তার কাপড়ে আছ।’

‘এমন ভাল কর যেন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।’ মুখ নেড়ে পরিতোষকে কথাটা বলল মহিলা, তারপর হঠাতে গলার স্বর বদলে গেল তার। বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে হেমলতার দিকে এগিয়ে এসে প্রায় কেঁদে ফেলল, ‘মুখে বড় বড় কথা বলত লোকটা, তাই শুনে ভুলে গেলাম। বিয়ের পর একদিনও পেট্টারে থেতে পাইনি, বুকের দুধ শুকিয়ে যাবার পর একে আর দুধ দিতে পারিনি। দিদি, আমি ওকে জোর করে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, আপনিও তো মেয়ে, আমাকে ক্ষমা করবেন না?’

হেমলতার পেছনে পেছনে অনি বেরিয়ে এসেছিল। হঠাতে পরিতোষ যেন তাঁকে আবিষ্কার করে

বলে উঠল, 'হৈ ছেলেটা, তুমি এখানে কী করছ? যাও, বড়দের কথার মধ্যে থাকতে নেই।' তারপর চাপা গলায় বলল, 'ফাদারের পেয়ারের নাতি তো, এলেই সব রিপোর্ট করবে।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন হেমলতা, 'পুরি, তুই-তুই একেবারে উচ্ছেন্ন গিয়েছিস। হি হি হি। সারাটা জীবন বাবাকে জ্ঞালিয়ে এলি, নিজের এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই, আবার এই মেয়েটাকে বিয়ে করে কষ্ট দিচ্ছিস, হি!'

হাসল পরিতোষ, 'বিয়ে আমি করিনি, আমাকে করেছে।'

মহিলা এই সময় ঢুকরে কেন্দে উঠতে হেমলতা বিচলিত হয়ে উঠলো নেমে এলেম। জ্যাঠামশাইয়ের ধমক খেয়ে অনি কী করবে বুঝতে পারছিল না। লোকটা খারাপ, খুবই খারাপ, তাদের বাড়িতে কেউ ভাবে কথা বলে না। ও দেখল বাচ্চাটা টেলতে টেলতে হেঠে উঠলো পেরিয়ে বকফুলের গাছের দিকে চলে যাচ্ছে-ঢোদিকে কারও নজর নেই। জ্যাঠামশাইয়ের শরীরের পাশ কাটিয়ে ও নিচে নেমে বাচ্চাটাকে ধরতে গেল। রেচারা এত নিজীব যে সামান্য হেঠে আর দাঁড়াতে পারছিল না, অনিকে পেয়ে ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরল। পরিতোষ সেটা লক্ষ করে বলল, 'বাঃ, দুই তাইয়ে দেখছ বেশ ভাব হয়েছে!'

মহিলা তখনও কাঁদছিল। হেমলতা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বয়েস বেশি নয়, কিন্তু অসুস্থ পোড়-খাওয়া-দেখলেই বোৰা যায়। ভালো খেতে না পেয়ে শরীর ক্ষয়াটে হয়ে গেছে। এ-বাড়ির বট হবার কোনো গুণ চেহারায় নেই। মাধুরী বা-নৃত্ন বউদের চেহারা দেখলে মনটা যে স্বিন্দুতায় ভরে যায় এই মেয়েটির মধ্যে তার বিশ্বাস্তা ছাড়া নেই।

হেমলতা জিজেস করলেন, 'তোমার নাম' কী?'

যেন বেরিয়ে-আসা কার্যাটা শিলছে এমন গলায় উভর এল, 'সাবিত্তী।'

'তোমার বাবা কি বিয়ে দেবার আগে বৌজ্যথর নেননি?' কাটাকাটাভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন হেমলতা। উঠোনের এক কোণে বাচ্চাটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে অনি অন্যদিকে তাকিয়ে পিসিমার কথা শুনছিল। এতদিনের দেখা পিসিমার সঙ্গে এই পিসিমাকে ও কিছুই মেলাতে পারছিল না। হঠাৎ ওর মনে হল, পিসিমার গলা দিয়ে যেন দানু কথা বলছেন।

'আমার বাবা নেই, যশোরে দাঙ্গার সময় মারা যায়। বিয়ের পর আমরা জানতে পারলাম না ত্যজ্যপুত্র।' সাবিত্তী বলল।

'বাঃ, বিয়ের আগে ছেলের বাড়িয়ের আচ্ছায়ৰজনের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন' বোধ করলে না কেটে! চমৎকার।' হেমলতা হিসাব মেলাতে পারছিলেন না।

পরিতোষ হাসল, 'তখন আর উপায় ছিল না যে! আমাকেও কেটে পড়তে দিল না, রাতারাতি জোর করে বিয়ে কিন। নইলে আমদের বংশে—'

'চুপ কর! তোর মুখে বংশ কথাটা একদম মানায় না। যাক, বাচ্চাটাকে নিয়ে যথন এসেছ তখন এমনি চলে যেতে বলছি না। সঙ্গেবেলায় বাবা আসার আগেই বিদ্যায় হয়ো। আর তাঁর অনুমতি না পেলে এই বাড়িতে কথনোই এসো না-মনে থাকে যেন।' হনহন করে আবার রান্নাঘরে ঢুক শেলেন হেমলতা।

পিসিমা চোখের আড়াল হওয়ামাত্র অনি জ্যাঠামশাইকে মাথার উপর দুহাত তলে একটা নাচের ভঙ্গি করতে দেখল। জেঠিমার কান্না চট করে খেমে গিয়ে কালো কালো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। বড় বড় পা ফেলে জ্যাঠামশাই জেঠিমার কাছে নেমে এসে চাপা গলায় বললেন, 'দাঁড়িগ হয়েছে! তুমি মাইরি জবর যায়ত্ব করলে সাবু। বউদি একদম আউট।'

জেঠিমা বললেন, 'বাগড়া না বাধালে তোমার দিদি আমার কথা শুনতোই না।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি তো যাবড়ে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম তুমি অরিজিনাল ছাড়ছ কিনা!'

জেঠিমা বললেন, 'পাগল! একটা কথা তো সত্যি বলেছ।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'কী?'

'এই বাড়িটার কথা। এতবড় বাড়ি যার তাকে কি বকা যায়? এমনভাবে হাসলেন জেঠিমা যে অনির খুব খারাপ লাগল।'

‘এটা আমার বাবার বাড়ি—আমার নয়। তাছাড়া আমাকে ত্যজ্যপুত্র করা হয়েছে—নো রাইট এই বাড়িতে।’ জ্যাঠামশাই উদাস গলায় বললেন। ওর চোখ সমস্ত বাড়িটায় ঘূরছিল।

‘দেখো না, আস্তে-আস্তে সব জল হয়ে যাবে। মানুষের রাগ আমার জানা আছে। কিন্তু শেষবার একটা সভ্য কথা বলো তো, শুধু টাকা চুরি করেছিলে বলে ত্যজ্যপুত্র করেছিল না অন্য কারণ ছিল?’ জেঠিমার চাপা গলার শব্দ কেমন হিসহিসে।

পরিতোষ খুব অস্বিভুল মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘ফাইটিং কোরো না, একটু লটেট করেছিলাম। প্রথম যৌবন তো!’

‘কী বললে? বুড়ো তাম, পাঁচ বছর আগে প্রথম যৌবন ছিল তোমার—’

ফুসে-ওঁ সাবিত্রীকে হাতজোড় করে থামিয়ে দিল পরিতোষ, ‘নিজেদের মধ্য খেয়োথেকে করে শেষ পর্যন্ত লক্ষ থেকে ভট্ট হয়ে যেতে চাও? আরে পুরুষমানুষের ওরকম একটু আধটু হয়ই, তা নিয়ে কেউ যাথা-খারাপ করে না। তাছাড়া দুজনের ধাঙ্কাই তো এক।’

সাবিত্রী নিজেকে অনেকটা সামলে নিলেও বোবাই যায় হজম করতে পারছে না ব্যাপারটা। হঠাৎ ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে ছেলেকে ঝুঁজতে গিয়ে দেখল সে অনির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল সে, ‘খুব তো চেঁচিয়ে তেতরের খবর বলছ, ওদিকে ছোঁঁটাই হাঁ করে সব শিলছে।’ কথাটা শোনামাত্র পরিতোষ ঘাড় স্বীরিয়ে অনিকে দেখতে পেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবিত্রী চাপা গলায় তাকে বাধা দিল, ‘খবরদার, বকাবকি করবে না। মিষ্টি কথায় ওকে হাত করে নিতে হবে।’

অনি দেখল জেঠিমা ওর দিকে আসছে। বাচ্চাটা তখন থেকে ঠায় শুর হাতে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অনি বুঝতে পারছিল ছেড়ে দিলেই ও পড়ে যাবে। জেঠিমা বললে, ‘কী সুন্দর দেখতে তোমাকে অনি! আহা, মার জন্য খুব কষ্ট হয়, না? সত্ত্বে মারেন?’

অনি জেঠিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিল না কী জবাব দেবে। আজ অবধি এ-ধরনের প্রশ্ন তাকে কেউ করেনি। এরা এ-বাড়িতে আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘড়্যন্ত করেছে এটা ও বুঝতে পারছিল। ত্যজ্যপুত্র হলেও জ্যাঠামশাই এ-বাড়ির সব-খবর রাখে।

‘বাচ্চাটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে অনি বলল, ‘একে ধরুন।’

সাবিত্রী অবাক হয়ে বাচ্চাটাকে টেনে নিতে দেখল অনি গঠগঠ করে উঠোন পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। রাগে গা জুলে গেল সাবিত্রী। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে পরিতোষের কাছে এসে বসল, ‘দেখলে, ছেলেটার তেল দেখলে? কথাটার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করলে না।’

পরিতোষ মুখ বেঁকাল, ‘ফাদারের সবকটা ব্যাড ভাইসেস ও পেয়েছে। আচ্ছা করে আড়ং ধোলাই দিতে হয়।’

চেঁবের আড়াল হতেই অনি পা টিপে টিপে বাগানের মধ্যে দিয়ে ফিরে এল। গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ও রান্নাঘরের ওপর নজর রাখতে লাগল।

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে জামা খুলতে খুলতে পরিতোষকে বলতে শুনল অনি, ‘ও বড়দি, আজ তোমার হাতের রান্না খাব।’

হেমলতা কোনো উত্তর দিলেন না। পরিতোষ কান পেতে উঠোনটা শোনার চেষ্টা করে না পেয়ে যেন খুশি হল। অনি দেখল জ্যাঠামশাই জেঠিমার দিকে একটা চোখ কুঁচকে হাসলেন। জামাটা খুলতেই অনির চোখ বড় হয়ে গেল। জ্যাঠামশাইয়ের পেঞ্জিটা ছিঁড়ে ফেটে একাকার। দু এক জায়গায় সেলাই করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। পিসিয়া বলেন পেঞ্জি সেলাই করে পরলে লক্ষ্মী চলে যায়। জ্যাঠামশাই কী করে ওটা পেনেন?

জ্যাঠামশাই পামের ওপর পা দিয়ে বললেন, ‘দিদির রান্না কোনোদিন খাওনি তো, আহা, মাইরি তোমরা রাঁধতে জান না।’

জেঠিমা বিচিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, ‘রান্না করার মতো জিনিস কোনোদিন এনেছ যে রাঁধব? শুনলে গা জুলে যায়।’

হঠাৎ জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, ‘যাও না, দিদিকে একটু সাহায্য করো। একা একা রাঁধছেন, দুই-একটা পদ তৈরি করে নিজের কৃতিত্ব দেখাও।’

জেঠিমা হতচকিত হয়ে বোধহয় রান্নাঘরের দিকে এগোছিলেন, এমন সময় পিসিমার গলা ভেসে এলে, ‘কাউকে আসতে হবে না। রাস্তার কাপড়ে এ-বাড়িতে কেউ রান্নাঘরে ঢোকে না। বাথরুমে জল আছে, বাচ্টাটাকে একবারে শান করিয়ে দিতে বল। অদ্দোকের মতন দেখতে হোক।’

কথাটা শুনে জেঠিমার মুখ বেঁকে যেতে দেখল অনি। জ্যাঠামশাই চট করে উঠে দাঁড়ালেন, ‘সেই ভালো, যাও, মন দিয়ে সাবান মেখে শান করে নাও। আমি বরং হোঁড়াটার কাছ থেকে লেটেট খবর নিই গে।’

জ্যাঠামশাইকে এদিক-ওদিকে তাকাতে দেখে অনি চট করে বাগানের ভিতরে চলে গেল। ইদানীং বোপঝাড় বেশি হয়ে গেছে বলে সরিষ্পেখের লোক লাগিয়ে বাগান সাফ করার কথা বলেন। লোক পাওয়া আজকাল মুশকিল বলেই এখনও পরিষ্কার হয়নি। অনি এই সুযোগটাকে কাজে লাগাল। জ্যাঠামশায়ের মুখোমুখি হতে ওর একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। লোকটাকে অত্যন্ত বদ মনে হচ্ছে ওর।

খেতে বসে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনি। একটা লোক এত তাত খেতে পারে? একসঙ্গে খেতে চায়নি ও, পিসিমা তাগাদা দিয়ে শান করিয়ে বসিয়েছেন। বাচ্টাটার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাকে বড়বাবের মেরোতে বিছানা করে ঘূম পাড়িয়ে আসা হয়েছে। পরিতোষ শান করে সরিষ্পেখের একখানা ধূতি লুকিয়ে মতন জড়িয়েছে। হেমলতা এতক্ষণ সেটা লক্ষ করেননি। অনির বারংবার তাকানো দেখে বুঝতে পারলেন, ‘তুই বাবার ধূতি পরেছিস?’

পরিতোষ খেতে-খেতে বলল, ‘স্মিল রান্না অথচ কী টেট, আহা! হ্যা, কী বললে? ধূতি? আমার পায়জামার চেহারা দেখেছ? তুমি কোনোদিন উরকম পাজামা আমাকে পরতে দেখেছ? দিস ইচ্ছ লাইক। বুবলে!’

‘খেয়ে উঠে ধূতি ছেড়ে রাখবি। একেই তোদের চুক্তে দিয়েছি বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি, তারপর যদি এসব জানতে পারে—’ কথাটা শেষ করলেন না হেমলতা।

পরিতোষ দিদির দিকে তাকাল, ‘মাইরি দিদি, এটা কি মুসলমানদের তালাক যে ত্যজ্যপূর্ণ বললাম আর সমস্ত সম্পর্ক ছুকে গেল? তুমি বুকে হাতে দিয়ে বলো তো, আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়লে কষ্ট হয় না?’

হেমলতা একবার অনির দিকে তাকিয়ে বলব কি বলব না ভাবতে ভাবতে বলে ফেললেন, ‘কিন্তু বাবা বলেন যে দৃষ্ট ক্ষত হাতে হলে সেটা বাড়তে না দিয়ে যদি হাতটা কেটে ফেলতে হয় তা-ই ভালো, শরীর বাঁচে।’

অদ্ভুতভাবে হাসল পরিতোষ। তারপর বলল, ‘আর-একটু ভাত দেবে? কম পড়বে না তো?’

হেমলতা তের থেকে ভাত এনে দিতে পরিতোষ বলল, ‘ব্যাপারটা কী জান, তোমরা চিরকাল হাতটা কেটে ফেলার কথাই ভেবেছ, ওধূধ দিয়ে হাতটা সারিয়ে তোলার কোনো চেষ্টাই করনি। তুমি কি ভেবেছ আমি পায়াণ? আমার মনের মধ্যে তোমাদের কথা আসে না? আমরা সব ভূলে যেতে পারি, কিন্তু ছেলেবেলার কথা কি ভূলে যেতে পারিঃ?’

হেমলতা বললেন, ‘এসব কথা এখন থাক।’

জ্যাঠামশাই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, জেঠিমা বলে উঠলেন, ‘দিদি যখন বলছেন, তখন আর কথা বাড়াচ্ছ কেন?’

জেঠিমা শান করেছেন, কিন্তু সেই আগের কাপড়ই তাঁর পরনে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন মেনে নিলে জ্যাঠামশাই, ‘ঠিক আছে, থাক। আমাকে আর-একটু আমড়ার টক দাও।’

খাওয়াদাওয়ার পর অনি নিজের ঘরে চলে এল। এখন জ্যাঠামশাইকে অনেকটা জান হয়ে গেছে। মুখ-হাত ধোওয়ার সময় জ্যাঠামশাই বলেছিলেন যে ওরা হলদিবাড়িতে আছেন এখন। দানু যে-ট্রেনে শিলিঙ্গড়ি থেকে আসবেন তাতেই ওদের উঠতে হবে যদি যেতে হয়। না হলে কাল সকালে ট্রেন আছে-রাতটা থেকে যেতে হয়। পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, স-চিন্তা যেন দুণাক্ষরে মাথায় না আসে, বিকেলের অনেক আগেই ওদের চলে যেতে হবে।

কথাটা শোনার পর থেকে অনি ভাবছিল টেশনে যদি মুখোমুখি দেখা হয় তা হবে দানু ওদের চিনতে পারবেন কি না। জ্যাঠামশাইয়ের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, দাঢ়ি রেখেছেন, তবু দানু ঠিক চিনে ফেলবেন। কিন্তু তারপর কী হবেং বিছানায় ওয়ে ওয়ে অনি এইসব ভাবছে, তখন দরজা বুলে

পরিতোষ মাথা বাড়াল, 'বাঃ, বেশ ঘরটা তো!' অনি তড়াক করে উঠে দাঁড়াতেই পরিতোষ ঘরে চুকে চেয়ার টেনে বসল, 'পড়াশ্না কেমন হচ্ছে ?'

কোনোরকমে অনি বলল, 'ভালো।'

'খারাপ হবার কথা নয়। সোনার চামচ মুখে লিয়ে জনোছ বাবা—আমার ছেলেটাকে দেখেছ?

পেট পুরে খাবার দিই পারি না তো পড়াশ্না করাব—সত্ত্বা কেমন চিজ? শহরের মেয়ে তো?' অনির একটা পেনসিল টেবিল থেকেই তুলে কানে সূড়সূড় দিতে দিতে জ্যাঠামশাই এমনভাবে কথা বলে যাচ্ছিল যে অনি ঠিক তাল রাখতে পারছিল না।

শেষের কথাটা না ধরে অনি বলল, 'সত্ত্বা?'

জ্যাঠামশাই বলল, 'আরে তোমার বাবা বিয়ে করেনি! আমি শালা চিউই করতে পারি না, এত বড় ছেলে ঘর সে কী করে বিয়ে করে—তা বাবার এই বউ তোমার সত্ত্বা হল না! তুমি কী বলে ডাক?'

'ছেটমা!' কথাগুলো শুনতে অনির ঝুঝ খারাপ লাগছিল।

'ওই হল, বাঞ্ছ কাঁটালের আর—এক নাম এঁচোড়। দেখতে শুনতে কেমন?'

'ভালো।'

'তোমার জেঠিমার চেয়ে ভালো?'

কোনোরকমে অনি বলল, 'জানি না।'

'কী ফরসা ছিল এককালে, দেখলে মনে হত বেনারসি ল্যাংড়া খাচ্ছি। এখন অবশ্য না খেয়ে খেয়ে আমসত্ত হয়ে গিয়েছে—ছেটকা আসে না!'

জ্যাঠামশাই কথা শুন করেন যেভাবে শেষ সেভাবে করেন না। ছেটকা মানে প্রিয়তোষ এটা বুঝতে পারল অনি, 'না!'

'শালা এক নম্বরের বৃক্ষ। বাঞ্ছলি হয়ে পলিটিক্স বোঝে না। আরে আবের গোছাতে হবে বলেই যদি দল করবি তবে কংগ্রেস কর! আমার কাছে গিয়েছিল একদিন। তোমার কাছে টাকাপয়সা আছে?' জ্যাঠামশাই ওর দিকে ফিরে চাইলেন।

অনি প্রথমে কথাটা ধরতে পারেনি, শেষে দ্রুত ঘাড় নাড়ল 'না।'

'ছেটকাকু এখন কোথায়?'

'জানি না। তোমার জেঠিমার হাতে তেল—মুড়ি কেয়ে হাওয়া হয়ে গেল। বেশিক্ষণ রাখা রিস্কি—কে দেখে ফেলবে—ফান্দারের কাছ থেকে টাকা নেয়ে না! এখন তো সব কমিউনিস্টরা দেখি খাণ্ড নিয়ে যিছিল করে, পুলিশ কিছু বলে না, ও—শালা তা হয়ে অন্য কারণে পালিয়েছে, তা—ই না!' কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন জ্যাঠামশাই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুবার আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'জবর খাওয়া হয়ে গেছে আজ। অনেক প্রাইভেট কথা বললাম, কাউকে বলিস না ভাই।'

উনি ঘর থেকে চলে যাবার পর অনির খেয়াল হল জ্যাঠামশাই ওকে ভাই বললেন। ও হেসে ফেলল, লোকটা যেন কীরকম। আচ্ছা, আবের গোছাতে কি লোকের কংগ্রেস করে? আবের গোছানো মানে তো বড়লোক হওয়া। নতুন স্যার মোটেই বড়লোক নয়। তবে?

যাবার সময় হেমলতা প্রায় তাড়িয়ে ছাড়লেন। সাবিত্রীর যেন যেতে কিছুতেই ইচ্ছে করছিল না। বারবার বলছিল, 'দিদি, আমি না হয় খোকাকে নিয়ে থেকে যাই।' উনি দেখবেন, খোকাকে ফেলতে পারবেন না।

হেমলতা কান দেননি সেকথায়। বলেছেন, সরিৎশেখর বাড়িতে থাকাকালীন ওরা আসুক, উনি কিছু বলবেন না, কিন্তু ওর অনুপস্থিতিতে এদের থাকা চলবে না। অনি দেখছিল যাওয়ার সময় অনেকগুলো পেঁটুলা হয়ে গিয়েছে। এগুলো পিসিমা দিয়েছেন, না ওরা জোর করে নিয়েছেন, বুঝতে পারছিল না। প্রায় দরজার কাছে গিয়ে পরিতোষ বলল, যাঃ, এক পেটি চা দাও!

হেমলতা ইতস্তত করে বললেন, 'মহী এখনও চা পাঠায়নি।'

'এমন গুল মার না! আমি দেখলাম খাটের তলায় দুটো পেটি পড়ে আছে। একটা নিছি।' বলে স্টোন ভিতরে গিয়ে একটা পাঁচ—পাঁচড়ের পেটি বের করে আনল।

হেমলতা বললেন, 'সঙ্গে হয়ে আসছে। এবার—'

পোটলাগুলো শুষিয়ে বেঁধে নিয়ে ওরা হেমলতাকে প্রণাম করল। সকালেও দের প্রণাম করা হয়নি, অনি এবার চট করে প্রণাম সেরে নিল। জ্যাঠামশাইকে প্রণাম করার সময় তিনি হঠাৎ এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন, ‘মাইরি দিদি, আমি শালা এক নস্বরের হারামি।’

হেমলতা বললেন, ‘মুখ-খারাপ না করে এবার এসো।’

‘আসতে বলছ?’ অনিকে ছেড়ে দিল পরিতোষ।

‘না। আর হ্যাঁ, এই টাকাটা তোমার ছেলেকে মিষ্টি খেতে দিলাম। জন্মাবার পর ওকে প্রথম দেখলাম তো।’ হঠাৎ হাতে মুঠো থেকে একটা দশ টাকার নেটু বের করে সাবিত্তীর দিকে বাড়িয়ে ধরতেই সে সেটাকে হেমলতার বোবার আগেই নিয়ে রাউজের স্তিতির ঢুকিয়ে ফেলল।

‘মাইরি দিদি, তুমি নমস্য। জন্মাবার পর অনিকে ফান্দার আটা দিয়েছিল, আর তুমি আমার ছেলেকে টাকা দিলে। অবশ্য তা-ই-বা কে দেয়?’

কথাটা শেষ করে পরিতোষ পুঁটলি নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। সাবিত্তী তার পিছনে বাচ্চাকে নিয়ে হাঁটছিল।

অনি পিসিমার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখছিল। প্রায় সঙ্গে হয়ে এসেছে। গেটের বাইরে গিয়ে সাবিত্তী বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল। অনি শুনল এতক্ষণে বাচ্চাটাকে দিয়ে জেঠিমা বলতে পারল, ‘টা-টা।’

হঠাৎ হেমলতা বললেন, ‘অনিবাবা, দাদু এলে এদের আসার কথা তুমি বলে কেলো না, বুবালে?’

অবাক হয়ে অনি বলল, ‘কেন?’

হেমলতা একটু অস্বত্ত্বে বললেন, ‘সারাদিন পরিশ্রমের পর একথা শুনলে ওর শরীর খারাপ হবে। যা বলার আমি বলব।’

‘কিন্তু দাদু যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন?’

হাসলেন হেমলতা, ‘না, করবেন না।’

কিন্তু সেই রাতে, সরিষ্ঠেখর আসার অনেক পরে, অনি যখন বুক-দুর্বুক হয়ে বসে আছে তখন দাদুর চিত্কার শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি পা ঢিপে ঢিপে দাদুর শোওয়ার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। সরিষ্ঠেখর বলছিলেন, ‘তুমি অন্যায় করেছ। কেন তাকে ঢুকতে দিলে? পিসিমা চাপা গলায় কী যেন বলুন।’ তুমি জান সে চারধারে বলে বেড়াচ্ছে ব্যাংকে আমার নামে লাখ টাকা আছে। অমি নাকি চামার।’ সরিষ্ঠেখর আক্ষেপে গলায় বললেন পিসিমা গলা শুনতে পেল অনি, ‘আমি বলে দিয়েছি যেন এ-বাড়িতে সে আর কোনোদিন না আসে। আপনি এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না।’

‘তুমি ভীষণ অন্যায় করেছ এ অপদৰ্থটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়ে। আঃ, আমার রাত্রে ঘুম হবে না।’ কিছুক্ষণ চুপচাপ। অনি চলে আসবে ভাবছে, এমন সময় শুনতে পেল দাদু জিজ্ঞাসা করছেন, ‘বাচ্চাটা কার মতো দেখতে হয়েছে?’

‘মায়ের আদল আসে।’ পিসিমা, ‘মা-মুখো বাচ্চারা সুখী হয়।’

সরিষ্ঠেখের গলার আওয়াজটা অন্যরকম ঠেক অনির কাছে।

আজ ইন্টারকুল ক্রিকেট ফাইনালে জেলা ক্লুব নয় রানে এফ. ডি. আই.-কে হারিয়েছে। ক্লুব উপর-ক্লাসের ছেলেরা বিজয়-উদ্বাস্ত চলার সময় হেডমাস্টারমশাইকে ধরেছিল যাতে আগামীকাল ক্লুব ছাটি থাকে। সেটা পাওয়া গেল কি না এখনও জানা যায়নি। তাই ক্লুবের সামনে বেশকিছু হাতের জটলা হয়েছে। মাঠের একপাশে গোলপোর্টের গা-ঘেঁষে নতুন স্যারের সঙ্গে অনিরা বসে ছিল। এমন সময় এফ. ডি. আই. ক্লুবের নবীনবাবু ওদের কাছে এলেন। নবীনবাবুকে এর আগে দেখেছে অনি। ভীষণ নিস্যি নেন আর কঁচোস করেন। ছবিবিশে জানুয়ারিতে কঁচোসের প্রসেশনে নবীনবাবুর হাতে পতাকা ছিল। এফ. ডি. আই.-এর ছেলেরা পোশাক পালটে চুপচাপই চলে গেল। ইন্টারকুলের যত খেলা হয় প্রতিটিতেই প্রায় ওরা জেলা ক্লুবকে হারায় শুধু এই ক্রিকেটটা বাদে। আজকে জেলা ক্লুবের অরুণ ব্যানার্জী দারুণ খেলেছে, সামনেবার ও থাকছে না, তখন দেখা যাবে-এইসব বলতে বলতে ওরা চুপচাপই চলে গেল।

নবীনবাবু ক্লামালে নাক মুছতে মুছতে নতুন স্যারকে বললেন, ‘নিশীথ, তোমার সঙ্গে একটু

আলোচনা ছিল।' নবীনবাবুকে দেখে অনির খুব হাসি পাচ্ছিল। খেলা চলার সময় কোনো বল বাউভারি পেরিয়ে গেলে নিজের ঝুলের ছেলেদের গালাগালি দিয়ে ভূত তাগাছিলেন। অনিদের ঝুলের বড়রা সেই গালাগালিশুলো আওড়ে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে।

নতুন স্যার বললেন, 'আরে বসুন না এখানে, এখনও তেমন ঠাড়া নেই।'

নবীনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'ওয়েদের চেজ হচ্ছে তো, হিমটির লাগলে-তা ছাড়া-বলে ওদের দিকে তাকালেন নবীনবাবু।

নতুন স্যার বললেন, 'খুব ব্যক্তিগত কথা?'

নবীনবাবু গভীর গলায় বললেন, 'রাজনীতির ব্যাপারে।'

নতুন স্যার হাসলেন, 'ও, তাহলে নির্ধিধায় বলতে পারেন। এরা আমার খুব অনুগত ছাত্র। তেমন গুরুতর ব্যাপার নয় আশা করি!'

নবীনবাবু এবার খুতি সামলে ঘাসের ওপর বসলেন, 'এবারও আমরা তোমাদের কাছে হেবে গোলাম। ফুটবলে দেখে নেব।'

নতুন স্যার হাসলেন। অনির খুব ইচ্ছে করছিল ফুটবল নিয়ে কথা হোক। ওদের ঝুলের দুজন ছেলে আজ আট বছর ধরে নাকি ফুটবল খেলার জন্য পাশ করতে পারছে না। নবীনবাবু বললেন, 'ছাবিশে জানুয়ারির পর একদম হইচই হল না, কেমন আলুনি-আলুনি লাগছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'হইচই করার মতো লোক নেই, আর ষটনাটাও কোনো ভদ্রলোক সমর্থন করেননি।'

নবীনবাবু বললেন, 'কিন্তু ওদের পার্টির সভ্যদের ধরে পুলিশ প্যাদালো, এ তো সবাই চোখের ওপর দেখেছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'ওরা পার্টির সভ্য নয় নিচ্যই। কোনো পার্টি এই ধরনের হঠকারী কাজ করবে না। আমরা তো জানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পর ওরা এখনও আগোছালো।'

নবীনবাবু বললেন, 'তা হলে এ-কাজ করল কে?'

নতুন স্যার বললেন, 'নিচ্যই কিছু মাথাগরম ছেলে। পুলিশ নাকি বলেছে, সবাই শহরের নয়। এসব নিয়ে ভাববেন না।'

নবীনবাবু বললেন, 'আমি ভাবতে পারি না নিশ্চিথ, এত কষ্ট করে এত রক্ত দিয়ে কংগ্রেস স্বাধীনতা আনল, আর সেদিনের কয়েকটা পুঁচকে ছেঁড়া তাকে অপবিত্র করে দিল। এই প্রতিদান!'

হঠাৎ নতুন স্যারের গলার ব্রহ্মপুর পালাটে গেল, 'একথাই তো দেশের মানুষকে বোঝাতে হবে। গাঙ্গীজিকে হত্যা করতে এদেশের মানুষের হাত কাঁপেনি। কিন্তু সেটা কজনের হাত? যিশুক্রিষ্ট নিহত না হলে পথিকীর কয়েক কোটি মানুষের চোখ খুলত না। আমরা সেই কথাই সবাইকে বোঝাব।'

নবীনবাবু সামনে ঝুকে যেন অনিরা শুনতে না পায় এমন গলায় বললেন, 'কাল শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ঐ ষটনাটাকে কাজে লাগিয়ে লাল পার্টির বারোটা বাজাতে প্ল্যান হচ্ছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'সে কী! এটা তো ওদের কাজ নয়, আমরা জানি।'

নবীনবাবু বললেন, 'জানাটা আর জানানোটা এক নয়। শশধরবাবু বললেন, এই সুযোগে ওদের মুখে কালি বোলালে ইলেকশনে ওরা মাথা তুলতে পারবে না। নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন ওয়ার।'

নতুন স্যার বললেন, 'ইলেকশন! কবে?'

নবীনবাবু কোটে খুলে আবার নিস্য তুললেন, 'তা জানি না, তবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নির্বাচন তো অবশ্যজীবী।'

হঠাৎ নতুন স্যার বলরেন, 'যারা সেদিন কাজটা করল তাদের একজনকে আমি চিনি। খুব ভালো কিনিতা লিখত। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, ও যে কোনো রাজনীতিতে বিশ্বাস করে আমি কোনোদিন টের পাইনি।'

নবীনবাবু কুমালে নাক মুছতে মুছতে বললেন, 'শশধরবাবু আজ তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।'

নতুন্য স্যার বললেন, 'বাড়িতে থাকবেন।'

ନବୀନବାବୁ ବଲଲେନ, 'ବାଡ଼ିତେ ଥାକବେନ?'

ନବୀନବାବୁ ବଲଲେନ, 'ନା—ନା । ତୋମାଦେର ପାଡ଼ାୟ ବିରାମ କରେଇ ବାଡ଼ିତେ ଆଜ ସଞ୍ଚେବେଳାଯି ଉଣି ଆସବେନ, ସେଥାନେଇ ଯେତେ ବଲେଛେନ । ବିରାମବାବୁକେ ଚେନ୍?'

'ହ୍ୟା, ଓର ତ୍ରୀର ସଙ୍ଗେ ଆଲାପ ଆହେ ।'

'ଖୁବ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା, ନା—'

ନବୀନବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରତେ ଅନି ଦେଖିଲ ନତୁନ ସ୍ୟାର ଟଟ କରେ ଓଦେର ଦିକେ ଏକବାର ତାକିଯେ ନିଲେନ । ତାରପର ଏକଟୁ ଅସ୍ତି-ମାଧ୍ୟାନୋ ଗଲାଯ ବଲଲେନ, 'ଓଇ ମହିଳାରା ଯେବୁକୁମ ହନ ଆର କି ।'

ନବୀନବାବୁ ହାସଲେନ, 'ଏକଟୁ ହାତେ ରେଖୋ, ମିଉନିସିପ୍‌ପ୍ଲାନ ଇଲେକ୍‌ଷନେ ଆମାଦେର କ୍ୟାନ୍‌ଡିଟେ ହଜେନ । ଇନକିଲାବ ପାର୍ଟିଦେର କେ ହଜେ ଜାନି?'

ନତୁନ ସ୍ୟାର ଅନ୍ୟମନକୁ ହେଁ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଲେନ । କଥାଗଲୋ ଫନତେ ଅନି ଫସ କରେ ବଲଲ, 'ଆଜ୍ଞା, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍‌ଦାବାଦ ମାନେ କୀଃ'

ସବାଇ ଓର ଦିକେ ଅବାକ ହେଁ ତାକାତେ ନତୁନ ସ୍ୟାର ବଲଲେନ, 'ହଠାତ୍ ତୋମାର ମାଥାଯ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଲ କେନ୍?'

ଅନି ଆପ୍ତେ-ଆପ୍ତେ ବଲଲ, 'ବନ୍‌ଦେମାତରମ୍ ଶଦ୍ଦଟାର ମାନେ ତୋ ଆମରା ଜାନି, କିନ୍ତୁ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍‌ଦାବାଦ ମାନେ ତୋ ଜାନି ନା । ଆଜ୍ଞା, ଏଥନ ଥାକ, ଆସି ପରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରବ ।'

କଥା ବଲାର ଧରନ ଦେଖେ ସବାଇ ହୋହେ କରେ ହେଁ ଉଠିତେ ଅନି ମାଥା ନିଚୁ କରଲ । ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ମୁଖ ଥେକେ ନିଜେର ଅଜାପ୍ତେ କଥା ବୈରିଯେ ଥାଏ । ନତୁନ ସ୍ୟାର ବଲଲେନ, 'ପରେ କେନ୍? ଆଜ୍ଞା, ତୋମରା ଯେ ସବ ହାସଛ ତୋମାଦେର କେଟେ ମାନେଟା ବଲେ ଦେଖି ।'

ଅନି ଚୋତ୍ର ତୁଲେ ଦେଖିଲ, ଓରା କେଟେ କଥା ବଲାଇ ନା, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଜନେ ନିଜେଦେର ମୁଖ-ଚାଉୟାଚାଉୟି କରାଇ ହଠାତ୍ ନବୀନବାବୁ ଫିସଫିସ କରେ ବଲେ ଉଠିଲେନ, 'ଆମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କୋରୋ ନା । ଆସି ଚଲି ।' ନତୁନ ସ୍ୟାର କିନ୍ତୁ ବଲାର ଆଗେଇ ଉଠେ ଦୋଢ଼ାଲେନ ତିନି ।

'ଆରେ ଆପନି ଯାହେନ କୋଥାଯା? ଏକସଙ୍ଗେ ଶଶ୍ଵତରବାବୁର କାହେ ଯାବ ଭେବେଛିଲାମ ।' ନତୁନ ସ୍ୟାର ବଲେ ଉଠିଲେନ ।

'ଶଶ୍ଵତରବାବୁ! ବିରାମ କରେଇ ବାଡ଼ିତେ ଯାବେ? ତା ହଲେ ଅବଶ୍ୟ—।' ଏକଟୁ ଯେନ ଖୁବି ହରେନ ନବୀନବାବୁ, 'ଆମାର ସଙ୍ଗେ ଆଲାପ ନେଇ, ଏହି ସୁଯୋଗେ ଆଲାପ ହେଁ ଯାବେ, ଚଲୋ ।'

ନତୁନ ସ୍ୟାର ବଲଲେନ, 'ଆରେ ଏଥନେ ତୋ ସଙ୍ଗେ ହେଯନି!'

ନବୀନବାବୁ ବଲଲେନ, 'ବ୍ୟାସ ଅଳ୍ପ ତୋ, ଠାଓର ପାଓ ନା । ଏହି ସଙ୍ଗେ ହେଯନି ମନେ ହତ୍ୟା ସମୟଟା ଖୁବି ଡେଙ୍ଗାରାସ! ଚୋରା ହିମ କବନ ମାଥାର ଭେତର ଚୁକେ ଗିଯେ ଚେପେ ବସବେ ଟେର ପାବେ ନା । ଆମାର ଆବାର ସାଇନାସେ ଟ୍ରୋବ ଆହେ । ସାଇନାସ କି ବଂଶଗତ ରୋଗ୍?'

ନତୁନ ସ୍ୟାର ଉଠିତେ ଉଠିତେ ବଲଲେନ, 'ଜାନି ନା । ତା ହଲେ ଆପନାର ପଞ୍ଚ ନସି ନେଓଯା ତୋ ଉଚିତ ହଜେ ନା ।'

ଓଂକେ ଉଠିତେ ଦେଖେ ଅନିରାଓ ଉଠେ ପଡ଼ିଲ । ଏଥନ ସନ୍ଦେ ହେଯନି ବଟେ, କିନ୍ତୁ ପଚିମେର ଆକାଶଟାର ଲାଲ ଆଭାଟା କେଟେ ଗେଛେ । କୁଳେର ବିଶାଳ ମାଠଟା ଜୁଡ଼େ ଅଜୁତ ଶାନ୍ତ ଏକ ହାୟା କ୍ରମଶ ଗାଢ଼ ହଜେ ।

ନତୁନ ସ୍ୟାର ବଲଲେନ, 'ଚଲୋ ହାଁଟିତେ ହାଁଟିତେ କଥା ବଲା ଯାକ ।'

ନବୀନବାବୁର କଥାଟା ମନ୍ଦଗୁଡ଼ ହଲ ନା, 'ନା ନା, ଓରା ଆବାର ହାଁଟିବେ କେନ, ଛାନ୍ଦେର ପଡ଼ାର ସମୟ ହେଁ ଗେଛେ । ଏଥନ ତୋମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନ ଦିରେ ପଡ଼ାଗଲା କରା, ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା କରାର ଜଣେ ପରେ ଅନେକ ସମୟ ଆହେ । ସଙ୍ଗେ ହେଁ ଆସଛେ, ଏଥନ ବାବାରା ଦୌଡ଼େ ବାଢ଼ି ଚଲେ ଯାଓ ।'

ନତୁନ ସ୍ୟାର ହେଁ ଅନିର କାଁଧେ ହାତ ରାଖିଲେ, 'ବାଡ଼ି ଯେତେ ହଲେ ଓଦେର ବଡ଼ ରାତ୍ରା ଅବଧି ଏକସଙ୍ଗେ ଯେତେ ହବେ ତୋ । ଚଲୋ ତୋମରା । ହ୍ୟା, ସେ-କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରାଇଲେ, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍‌ଦାବାଦ ମାନେ ହଲ-ବିପ୍ଲବ ଦୀର୍ଘଜୀବି ହେବେ ।'

ନବୀନବାବୁ ବଲଲେନ, 'ତା-ଇ ବଲୋ! ଆମାର ତୋ ଧରିଟା ଉନଲେ କେମନ ଧରିକ-ଧରିକ ମନେ ହୟ । ତା ଭାଇ ବିପ୍ଲବଟା କୋଥାଯ ଯେ ତା ଅନେକ ଦିନ ବୋଚବେ?

ନତୁନ ସ୍ୟାର ହାଁଟିତେ ହାଁଟିତେ ବଲଲେନ, 'ଆସି ଯତନ୍ତ୍ର ଜାନି, ସେ-କୋନେ ଶୋଷଣେ ବିରହି ଯେ-

সংগ্রাম তাকেই কমিউনিস্টরা বিপ্লব বলে থাকে। পথিবীর আর-এক প্রাণে একজন অভ্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষ এক হয়ে যে-সংগ্রাম করেছিল তার ফলে সেই দেশে এক অচূত পরিবর্তন ঘটে যায়। সেই সংগ্রামের সম্মানে পৃথিবীর সর্বত্র শোষিত মানুষের সুকে উৎসাহ আনতে কমিউনিস্টরা বলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'

অনি বলে ফেলল, 'এখন তো আমরা স্বাধীন হয়েছি, ইংরেজরা চলে গেছে, শোষকরা তো আর নেই। তা হলে কেন ওরা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে সেদিন অমন যার খেলে।'

নবীনবাবু চমকিত হয়ে বললেন, 'এ-ছেলে তো খুব তৈরি। গুড, গুড। তবে জেনে রেখো খোকা, নেতৃত্ব যা বলেন তা-ই মেনে নেবে, কোনো প্রশ্ন করতে নেই। প্রশ্ন করলে কোনো শৰ্জনা থাকে না।'

নতুন স্যার বললেন, 'ও তো এখনও বালক, কৌতুহল না থাকলে ওকে মানায় না। ওরা বলে, যে-স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা নাকি ইংরেজরা দয়া করে দিয়ে গেছে। কেউ কি দয়া করে ক্ষমতা দেয় যদি বাধ্য না হয়? ওরা বলে দেশে স্বাধীনতার পর কোনো পরিবর্তন হয়নি। অবস্থা একই আছে। আমরাই যেন এখন শোক। নিশ্চয়ই কেউ একথা ভাবতে পারে, তার স্বাধীনতা আছে ভাবার। আমরা রাশিয়ার মতো কারও ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইনি। কিন্তু আমাদের ভূল দেশের লোকের কাছে ধরিয়ে দিতে ওরা বিদেশ থেকে আদর্শ আমদানি করল কেন? এমন একটা ধীন ওরা বেছে নিল যার অর্থ দেশের সাধারণ মানুষ জানে না। দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পূজো করার কী প্রবণতা! সূতৰাষ বোধ কংপেসের আদর্শ মেনে না নিতে পেরে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেননি, তিনি বলেছিলেন 'জ্যয় হিন্দ'। আসলে নিজেদের মতো করে না বললে, কোনোদিন দেশের মানুষের সমর্পন পাওয়া যাবে না।'

নবীনবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই। এদেশে আগামী একশো বছরেও কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসবে না।'

নতুন স্যার মান হাসলেন, 'দুঃখ হয়, কয়েকটা তাজা তরুণ ছেলে কী ভাঙ্গ হয়ে বিপথে চলে গেল! আচ্ছা, এবার তোমরা যাও।'

ওরা দাঁড়িয়ে দেখল, নতুন স্যার আর নবীনবাবু বিরাম কর মশাইয়ের বাড়ির দিকে চলে গেল। অনির বন্ধুরা ডানদিকে সেনগাড়ার দিকে চলে গেলে ও একা একা হাঁটতে লাগল। নতুন স্যারের সব কথা ও বুবাতে পারেনি। কিন্তু বন্দেমাতরম শুধুটা উচ্চারণ করলে বুকের মধ্যে যেরকম চনমন করে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ বললে তা করে না। সেদিন ঐ ধূমিন্টা শোনার পর বাড়িতে একা একা ও আবাঞ্চি করেছে। খুব জোরালো মিলিটারি-মিলিটারি বলে মনে হয়। হঠাৎ মনে হল, নতুন স্যার হয়তো ঠিক কথা বলেননি। এই ছেলেগুলো কি এতই বোকা যে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলতে বলতে মার খাবে! কোথাও একটা ব্যাপার আছে যা হয়তো নতুন স্যার জানেন না। অনির ছেটকাকার কথা মনে পড়ল। ছেটকাকা কোথায় এখন? ছেটকাকা কোথায় এখন? ছেটকাকা তো বন্দেমাতরম শুনলে শুধুটা কেমন করত। কিসের জন্যে ছেটকাকা এখনও বাড়ি আসে নাঃ ছেটকাকা তো সব বুবাত। এসব কথা ভাবতে শিয়েই অনির মনে পড়ে গেল তপুপিসি এবন জলপাইগুড়িতে। গার্লস স্কুলে দিদিমণি হয়ে গেছে তপুপিসি। পিসিমা সেদিন দায়ুকে বলেছিলেন কথাটা। বাড়ির সঙ্গে ঝাগড়া করে এই চাকরিটা নিয়ে স্কুলের হোষ্টেলে আছে। অনির ভৌষণ মনে হতে লাগল, তপুপিসি নিশ্চয়ই ছেটকাকার খবর জানে। কেন মনে হল অনি জানে না, কিন্তু ও ঠিক করল তপুপিসির সঙ্গে দেখা করবে।

দুদিন বাদে এক বিকেলে অনি তিত্তা গার্লস স্কুলের সামনে এসে দাঁড়াল। আর কদিন বাদেই দোল। জলপাইগুড়িতে দোলটা বেশ বাড়াবাঢ়ি রকম হয়ে থাকে। গার্লস স্কুলের পথে আসতে আসতে অনি বিহারি মন্ত্রণাদের চিন্তার করে ঢোলক বাজিয়ে হোলির গান গাইতে দেখেছে। স্কুলের মেইন গেট বন্ধ, তবে গেটের একপাশে ছোট একটা দরজা কেটে বের করা হয়েছে। অনি দেখল বয়স্ক পুরুষ মহিলারা সেই ছোট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছেন। সাহস করে অনি ওঁদের পিছুপিছু চলে এল। গেটের এপাশে বিরাট মাঠ, অনেক গাছপালা, তারপর ইংরেজি 'ই' অক্ষরের মতো স্কুলবিঞ্চি। কোথায় তপুপিসির হোষ্টেল বুবাতে না পেরে অনি এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ভাবল, এভাবে আসাটা ঠিক হয়নি। তপুপিসির ভালো নাম ও জানা নেই। মাঠের দিকে তাকাল ও, মেয়েরা হাজুড়ু খেলছে। এত বড় মেয়েদের হাজুড়ু খেলতে ও কখনো দেখিনি। কয়েকটা শাড়িগুরা মেয়ে ওর পাশ দিয়ে হেঁটে

যেতে-যেতে ফিক করে হেসে গেল। মুহূর্তে অনির নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে লাগল। ঠিক সেই সময় একটা দারোয়ানগোছের লোক ওকে জিজ্ঞাসা করল সে কাকে চায়।

অনি বলল, ‘নতুন দিদিমণি।’

দারোয়ান বলল, ‘কোনসা দিদিমণি? নাম ক্যা?’

অনি বলল, ‘তপুদিমণি! ব্রহ্মচেড়া থেকে এসেছে।’

‘কা বোলতা? পুরা নাম কহ।’ দারোয়ান খিচিয়ে উঠলে।

‘পুরো নাম জানি না।’ অনি বলল।

‘তব ভাগো। দো মিনিট নেহি থা আর ফটসে ঘুঁস গিয়া। যা ভাগ। মিডিস স্কুলমে ঘুঁসনেমে বহুত মজা-হাঁ।’

লোকটা অনির হাত ধরে টানতে টানতে গেটের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। অনি বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।’ ওর খুব লজ্জা করছিল। মাঠের অন্য মেয়েরা ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

হঠাতে একটি মেয়ে দৌড়ে ওদের দিকে দারোয়ানকে ডাকতে ডাকতে এল। ডাক শুনে দারোয়ান ওকে ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর শক্ত সোহার মতো আঙুলের চাপে অনির হাত ভেঙে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। মেয়েটি হাঁপতে হাঁপাতে কাছে এসে বলল, ‘দারোয়ান, দিদি ওকে ছেড়ে দিতে বলল।’

‘কোন দিদি?’ দারোয়ান বোধহীন এটা আশা করেনি।

‘ডেপুটি দিদি।’ মেয়েটি কথাটা বলতেই দারোয়ান ওর হাত ছেড়ে দিল। অনির মনে হল, ওর হাতটা নিজের কবজির কাছে ভেঙে গেছে। একটুও সাড় পাছে না। অন্য হাতটা দিয়ে ও অবশ্য জায়গাটায় মালিশ করতে গিয়ে তল মেয়েটি তাকে বলছে, ‘তোমাকে দিদিমণি ডাকছেন।’

খুব অবাক হয়ে অনি ওর মুখের দিকে তাকাল। ফ্রক-পুরা এই মেয়েটি মাথায় তারই মতো লম্বা, দৌড়ে এসেছে বলে মুখটা একটু লালচে। ও বলল, ‘আমাকে।’

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল।

‘কে?’ অনি টিক বুঝতে পারছিল না।

‘ডেপুটি দিদি।’

‘আমি তো!-’ অনি ভয় পেল, হয়তো তার এই প্রবেশের জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ ওকে শান্তি দেবেন, শুধু দারোয়ানের আঙুলের চাপই যথেষ্ট নয় অনি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘আচ্ছা, এখনে তপু দিদিমণি কোথায় আছে, ব্রহ্মচেড়ায় থাকতেন?’ মেয়েটিকে তুমি বলতে কেমন বাধল অনির।

‘উনিই তো আমাদের ডেপুটি। উনিই তোমাকে ডাকছেন।’ অনির বোকায় দেখে মেয়েটি ঠোঁট টিপে হাসল।

তপুপিসি কী ধরনের কাজ করে যাতে তাকে ডেপুটি বলা যায় তার কোনো ধারণা ছিল না অনির। ও মেয়েটির পেছনে পেছনে অনেকটা পথ হেঁটে এল। এর আগে কোনো গার্লস স্কুলের ডেতর ও ঢোকেনি, এখন এতগুলো মেয়ের মধ্যে সপ্তম দৃষ্টির সামনে হাঁটতে গিয়ে অনির খুব অস্বত্তি হতে লাগল। অস্তুত এক আড়তো এবং পুরুষালি স্থপতিতা একসঙ্গে ওকে পেয়ে বসল।

মাঠের শেষে চেয়ারে গা এলিয়ে তপুপিসি বসেছিল। অনিরের আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। অনি ধানিকটা দূর থেকে তপুপিসিকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভীষণ রোগা হয়ে গেছে তপুপিসি। মুখচোখ মেন কেমন-কেমন, রাগী-রাগী মনে হয়।

মেয়েটি বলল, ‘দিদি, ওকে এনেছি।’ কথাটা শেষ হতেই তপুপিসি ওকে হাত ধরে কাছে টেনে নেন, ‘ওয়া আমাদের অনি, তুই কত বড় হয়ে গেছিস! দুর তেকে দেখে আমি একদম অবাক। একবার ভাবি অনি কি না, তারপর হাঁটা দেখে বুঝালাম এ নির্বাত তুই। খুব লব্ধ হয়েছিস যাহোক, সোজা হয়ে দাঁড়া দেখি, ওয়া, আমি কোথায় যাব-তুই যে একদম আমার মাথায়-মাথায় হয়ে গেছিস।’ গালে হাত দিতেই তপুপিসির মুখের গাণীর্য কোথায় পালিয়ে গেল। এই ধরনের কথা তনে অনির খুব ভালো লাগছিল। এইভাবে নিজের লোকের মতো কথা কেউ বলে না আজকাল। ও দেখল মেয়েটি বিশয়ে

হঁ হয়ে তপুপিসিকে দেখছে। বোধহয় ওদের কাছে তপুপিসির এই চেহারাটা অজানা। তপুপিসি বলল, ‘এই ছেঁড়া, সেই যে এলি, তারপর আর তপুপিসির বর্ণছেড়ায় গেলি না! খুব নিষ্ঠুর তুই।’ তার পরেই ঘটনাটা মনে পড়ে যাওয়ায় গলাটা অস্তুত নরম হয়ে গেল তার, ‘মায়ের জন্য খুব কষ্ট হয়, না রেঁ?’ তপুপিসির হাতটা ওর কাঁধের ওপর ছিল। অনি মাথা নিচু করল! ও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছে, ইদনীং মায়ের কথাবার্তা কেউ বললেও বেশ সহ্য করতে পারে, আগেকার মতো দমবক্ষ হয়ে কান্না পায় না।

‘তোর নতুন মা কিন্তু খুব ভালো মেয়ে। আচ্ছা, তুই কার কাছে এসেছিস এখানে? কী পরিচিতি আছে এখানে?’ তপুপিসি যেন হঠাতে বাস্তবে ফিরে এলে।

হাসল অনি, ‘তোমার কাছে এসেছিলাম।’

‘আমার কাছেঁ সত্যি? তা হলে ফিরে যাচ্ছিলি কেন?’

‘দারোয়ান তাড়িয়ে দিছিল। তোমার পুরো নাম বলতে পারিনি।’

কথাটা শুনে হঁ হয়ে গেল তপুপিসি, ‘সে কী! তুই আমার নাম জানিস না!’

নিজেকে সামলাতে সামলাতে অনি বলল, ‘কী করে জানব, তুমি ডেপুটি-ফেপুটি হয়েছে।’

‘ওয়া, আরে আমি তো এই হোটেলে থাকি আর মেয়েদের খুব শাসন করি, তাই ওরা ডেপুটি সুপারিস্টেন্টে করে দিয়েছে।’ তপুপিসি বোঝালেন। ‘তা হ্যাঁরে, কার কাছে শুনলি আমি এখানে আছি?’

অনি বলল, ‘শুনলাম শিসিমা বলছিল।’

তপুপিসি বলল, ‘বড়দি, মোসোমশাই ভালো আছেন?’ অনি ঘাড় নাড়ল।

‘কেউ তোকে পাঠিয়েছে আমার কাছেঁ?’ তপুপিসি চোখ বড় বড় করল।

ঘাড় নাড়ল অনির, ‘না।’

এই প্রথম অনির মনে হল, ও যে-জন্য তপুপিসির কাছে এসেছে সেটা বলতে ওর কেমন সঙ্কোচ হচ্ছে। ছেটকাকুর কোনো খবর তপুপিসির কাছে পেতে হলে যে-সম্পর্কটা থাকা দরকার সেটা আছে কিং? অনির মনে পড়ল সেই চিঠিটার কথা, যার অর্থ তখন সে বুঝতে পারেনি কিন্তু তপুপিসির জন্য কষ্ট হয়েছিল। এই তো তপুপিসি বাড়িঘর ছেড়ে একা একা এখানে আছেন, কেন, কী জন্যে?

তপুপিসি জিজ্ঞাসা করল, ‘কেন এসেছিল বল-না রেঁ?’

এবার অনি ঠিক করল, ও বলেই ফেলবে। মাথা নিচু করে ও বলল, ‘আমি একটা কথার মানে বুঝতে পারি না। ছেটকাকু থাকলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম। তুমি জান কোথায় ছেটকাকু আছেঁ?’

‘আমি জানব এই ধরণে তোর কী করে হল?’ যেন একটা গভীর কুয়োর ভেতর থেকে কথা বলছে তপুপিসি।

অনি সত্যি কথা বলে ফেলল, ‘আমি তোমার চিঠিটা পড়েছিলাম, পুলিশ সেটা পায়নি। ছেটকাকু চলে যাবার পর পুলিশ এসে ওটা পেলে তোমাকে ধরত। দাদুর আলয়ারিতে চিঠিটা রয়েছে, তুমি যদি চাও এনে দিতে পারি।’

তপুপিসি বলল, ‘কী কথার মানে তুই বুঝতে পারিস না অনি? –

‘বন্দেমাত্রম আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ছেটকাকু কেন হিতীয়টাকে বেছে নিল? কোনটা বড়?’ অনি বলল।

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তপুপিসি বলল, ‘তুই এত ছেট ছেলে, তোর এসবে কী দরকার! এ বড় শক্ত জিনিস, ভীষণ নেশা। মন্দের চেয়েও খারাপ নেশা। এ-নেশা সব খায়। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের এই নেশা থেকে অনেক দূরে থাক উচিত।’

ঠিক সেই সময় ঢং ঢং করে পেটা-ঘড়িতে ভিজিটরদের যাবার নির্দেশ বাজল অনি দেখল গার্জেন্ট্রা সব গেটের দিকে চলে যাচ্ছেন। তপুপিসি হঠাতে কেমন-কেমন গলায় বলে উঠল, ‘অনি, তার খবর কখনো যদি পাস আমাকে বলে যাবিঃ আমায় ছুঁয়ে বলে যা, বলে যাবি তোঁ?’

কে যেন এসে খবর দিয়ে গেল মহীতোষ খুব অসুস্থ, বিকেলের দিকে রোজই জুর আসছে। জলপাইগুড়ি থেকে স্বর্গছেড়ায় সরিষ্পেখর পোষ্টফিস মারফত চিঠিপত্র খুব-একটা পাঠানেন না। চার ঘটার পথ কোনো-কোনো সময় চারদিন নিয়ে নিত ডাকবিভাগ। খেয়েদেয়ে দুপুরনাগাদ কিং সাহেবের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালৈ হল, প্রচুর লোক স্বর্গছেড়া, বীরপাড়া, বানারহাটে যাচ্ছে। তাদেরই কারও হাতে চিঠি দিয়ে দিতেন তিনি, মহীতোষ সঙ্কেনাগাদ পেয়ে যেতেন। যারা স্বর্গছেড়ার লোক নন অথচ মহীতোষকে চেনেন তাঁরা যাবার সময় স্বর্গছেড়ায় চৌমাথার পেট্রল-পাস্পে চিঠি রেখে যেতেন। চিঠি দেবার না থাকলেও সরিষ্পেখর দুপুরে কিং সাহেবের ঘাটে যেতেন। ওখানে গেলে পুরো ভূয়াপের হালফিল খবর পাওয়া যায়। কোটকাছারি করাঁতে অজস্র মানুষ আসছেন ওদিকে মালবাজার নাগারাকাটা আর এদিকে ফালাকাটা-হাসিমারা থেকে। অনেকেই সরিষ্পেখরকে চেনেন, দেখা হলে নমস্কার করে খবরাখবর নেন। তা ছাড়া চিত্তৰ মাটেন্টৰা তো আছেনই, উঁদের জলপাইগুড়িতে না এসে উপায় নেই। তা আজ বিকেলে ফেরার সময় এই খবরটা পেলেন। মহীতোষ যে অসুস্থ একথা আগে কেউ বলেনি, কেউ চিঠি লেখেনি। বিকেলে দিকে জুর আসছে এটা ভালো কৃত্তি নয়। তিভার পাশ-হেষে যে-কাচা পথটা দিয়ে রোজ হাঁটচলা করতেন সেটার ওপর মাটি পড়ছে। পি. ড্র. ডি. অফিসের সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে হল।

অন্যমনশ্ক হয়ে হাঁটছিলেন সরিষ্পেখর। আজকাল লাঠি আর পা কেমন মিলেমিশে পথ মেপে নেয়। লাস্ট বাস বানিশ থেকে ছাড়ে বিকেল ছাটায়। এখনও ঘণ্টাদেড়েক সময় আছে, অনিকে নিয়ে রওনা হলে রাত নটার মধ্যে স্বর্গছেড়ার পোচে যাওয়া যায়। তেমন বোধ করলে মহীতোষকে এখানে নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতে হবে। হঠাৎ তার মনে হল আজ অবধি তাঁকে শুধুই দায়িত্ব পালন করে যেতে হচ্ছে। চাকরিতে যখন ছিলেন তখন তো বটেই, আজ নিঃসঙ্গ অর্থহীন অবসর-জীবনেও এইসব সাংসারিক চিন্তা তাঁকে ভাবতে বাদ্য করে। সব ছেড়েছে একা একা বেঁচে থাকার সুখ পাওয়া আর হল না। অথচ হেম আজকাল প্রায়ই বলে থাকে যে তিনি নাকি অত্যন্ত নির্দিষ্য, পাষাণ। তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত ট্রেইটকাটা এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া না-ভেবে বলা হেম এসব কথা আগে বলতে সাহস পেত না, ইদনীনীঁ বরে থাকে। সরিষ্পেখরের মাঝে-মাঝে মনে হয়, মেয়ের মাথাটায় কিছু গোলমাল হয়েছে। কারণ রাতারাতি তাঁর সম্পর্কে যে-ভায়টা সকলে ছিল সেটা হেম খেয়াল কী করে! মাঝে-মাঝে এমন উপদেশ দেয় যে বঙ্গুর মতো মনে হয়, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে গোরমাল করলে মায়ের মতো ধূমকে ওঠে, আবার বাবার সংসারে পড়ে থেকে জীবনটা নষ্ট হল বলে যখন আক্ষেপ করে তখন ঢট করে বড়বট-এর কথা মনে পড়ে যায়। এক অন্দুরু খেলা মেয়ের সঙ্গে, হেমলতাও মৌজ হয়ে খেলে যায়। অনির সঙ্গে কথাবার্তা কর হয়। পড়ালুনা খারাপ করছে না, করলে রেজাল্ট ভালো হত না। তাঁর কড়া নির্দেশ আছে যেখানেই থাক সঙ্গের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। সকালে অঙ্গের মাটার পড়িয়ে যায় অনিকে, মহীতোষ তার টাকা দিছে। কিন্তু বাজারদের যেভাবে বাড়ছে সংসারের খরচ সমলানো মুশ্কিল হয়ে পড়ছে তাঁর। ফলে হেমলতার জমা-টাকায় হাত দিতে হয়। মনে মনে ভীষণ কুর্তার মধ্যে আছেন।

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্বর্গছেড়ায় ফিরে যাবেন না আর। জীবনের সব প্রতিজ্ঞাই কি রাখতে পারা যায়? দ্রুত পা চালালেন সরিষ্পেখর। হাসপাতাল-গাড়া থেকে দুটো সাইকেল-রিকশা রেস দিয়ে আসছিল কোর্টের দিকে। মোড় মোরার সময় এ ওকে তিভায়ে মেতে-যেতে পরশ্পরকে ছুঁয়ে মেলতেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। সরিষ্পেখর দেখলেন রিকশাটা দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু বোঝার আগেই হাঁটুর ওপর প্রচণ্ড একটা আঘাত তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। প্রায় মুখ-খুবড়ে পড়ে গেলেন সরিষ্পেখর। হাঁইহাঁই করে লোকজন ছুটে এল চারধার থেকে। রিকশা রাস্তার একপাশে কাত হয়ে উলটে আছে। রিকশাওয়ালা ছোকরা মাটিতে শুয়ে। ওরা যখন সরিষ্পেখরকে তুলে ধরল তখন তাঁর চোখে অঙ্ককার, চশমা নেই, লাঠিটা ছিটকে শেষে হাত থেকে। মাজাভাঙ্গা লাউডগার মতো হিলহিল করছে শরীর, ছেড়ে দিলেই ধূপ করে পড়ে যাবেন, বী পা-টা যেন তাঁর শরীরে নেই। আর তাঁর পরেই বেদনাটা অনুভব করলেন তিনি, যেন একটা ধারালো করাত দিয়ে কেউ তাঁর পা কেটে দিছে। ছেলেরা অনেকেই সরিষ্পেখরকে চিনত, দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য রিকশাটায় ওরা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ধাক্কা লাগার পর সেটার কিছু হয়নি, এমনকি রিকশাওয়ালারাও চুপচাপ ভদ্রলোকের মতো দাঁড়িয়ে ছিল।

অঙ্ককারের সঙ্গে পাট্টা দিয়ে অনি বাড়ি ফিরে আসত। সৃষ্টি ভুবে গেলে যে-ছায়াটা চারধার জুড়ে

থাকে সেটা মন-কেমন করার। কারণ একটু বাদেই দৌড়তে হবে, পিসিমা ঠাকুরবর থেকে সঙ্গে দিয়ে বেরিয়ে আসার আগেই কলতলায় পৌছে যেতে হবে। এই একটি ব্যাপারে সরিষ্পেখর দারুণ কড়া। রাত হয়ে গেলে কী হবে অনি অনুমান করতে পারে।

আজ অবশ্য সেরকম কোনো সমস্যা তার নেই। ছুটির পর বাড়ি এসে বেরুতে থারে এমন সময় শচীন আর তপন এসে হাজি হল। শচীন ওদের ক্লাসের গোলগাল-মার্কা ভালো ছেলে, ওর বাবার দুটো চা-বাগানে শোয়ার আছে। শচীন তপনকে নিয়ে এসেছে অনিকে নেমন্তন্ত্র করতে। ক্লে বললে হবে না বলে বাড়ি বয়ে এসেছে, তার দিদির বিয়ে।

ভেতরের বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল, সেখানে ওদের বসিয়ে অনি পিসিমাকে ডেকে আনল। দাদু বাড়তে নেই, নিচ্ছয়ই কিং সাহেবের ঘাটে পিয়েছেন। অনির বক্সুরা খুব কমই বাড়তে আসে, পিসিমা তড়িয়ত দেখতে এলেন। আজকাল পিসিমা বাড়তে শেমিজ পরেন না, কেমন যেন হয়ে গেছেন। কিছুই খেয়াল থাকে না।

হেমলতা দেখে অনির বক্সুরা উঠে দাঁড়াল। ফুটফুটে দুটো ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, ‘বসো বসো, দাঁড়াতে হবে না, তোমরা তো সব অনির বক্সু! তা আমাদের বাড়তে আস না কেন? কী নাম তোমাদের?’

অনির খুব মজা লাগছিল, পিসিমা যখন কথা বলেন তখন যেন থামতে চান না। ওর বক্সুরা বেশ হকচকিয়ে গেছে, কোন উত্তরটা দেবে বুঝতে পারছে না। অনি বলল, ‘পিসিমা, এ হচ্ছে তপন, খুব ভালো গান গায়, আর ও—’

অনিকে থামিয়ে হেমলতা বললেন, ‘তপন কী?’

তপন এবার চটপট বলল, ‘মিত্র।’ বলে এগিয়ে এসে হেমলতাকে প্রণাম করল।

হেমলতা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ‘বেঁচে থাকো বাবা। মিত্রি হল কুলীন কায়েত।’

অনি বলল, ‘আর এ হচ্ছে আমাদের ক্লাসের শুড় বয়। ওর দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ত্র করতে এসেছে।’

হেমলতা বললেন, ‘কী নাম তোমার বাবা?’

‘আমার নাম শচীন রায়।’

শচীন এগিয়ে গেল প্রণাম করতে। কিন্তু বেচারা নিচু হতে-না-হতেই হেমলতা ধড়মড় করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেনত ‘না না, থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না।’ শচীন তো বটেই, অনিও খুব অবাক হয়ে গেল পিসিমার একক ব্যবহারে। একটু সামলে নিয়ে বললেন, ‘বায়নের ছেলে তুমি—।’

কথা শেষ করার আগেই অবাক-গলায় শচীন বলল, ‘না না, আমরা বৈদ্য।’

হেমলতা তা-ই শুনে দোনোমনা হয়ে বললেন, ‘একই হল। বদ্বিরাণি তো একধরনের বায়ন তোমরা সব বসে গল্ল করো।’ হেমলতা আর দাঁড়ালেন না। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে-যেতে আর-একবার ওদের দেখে গেলেন।

শচীন বলল, ‘তোর পিসিমা খুব সেকেলে, না রোঁ?’

‘নি বলল, ‘কই, না তো।’

তপন বলল, ‘ঘাঃ, আমি প্রণাম করলাম কিছু হল না! ও প্রণাম করতেই বায়ন-টায়ন বের করে ফেললেন।’

শচীন বলল, ‘মিত্রা তো কায়েত সবাই জানে। আগেকার লোকেরা বায়নদের শুধু স্থান দিত। তোর পিসিমার কথা বাড়তে গিয়ে বলতে হবে।’

তপন গভীর গলায় বলল, ‘স্বাধীনতা এলেও আমরা যে কত পরাধীন তা তোর পিসিমাকে দেখলে বোঝা যায় অনি।’

এসব কথা শুনতে অনির একদম ভালো লাগছিল না। পিসিমা এমন কাও করবেন ও ভাবতে পারেন। বদ্য না বায়ন না-জেনেই প্রণাম নিলেন না, বক্সুদের কাছে ওই খবরটা ওরা নিচয়ই ছড়িয়ে দেবে। খুব খারাপ লাগছিল ওর। এমন সময় রান্নাঘর থেকে হেমলতা চাপা গলায় তাকে ডাকলেন। হেমলতা এইভাবে তাকে ডাকেন না, অন সময় তার চিক্কার শুনে সরিষ্পেখর অবধি বিরক্ত হয়ে

ধমক দেন, 'কী কাকের মতো ট্যাচছ?'

চটপট হেমলতা জবাব দিতেন, 'কী করব, জন্মাবার সময় তো কেউ মধু দেননি।' তা এখনও এই ওকে ডাকছেন, ওকে মোটেই কর্কশ মনে হচ্ছে না। অনি উঠে রান্নাঘরে এল।

হেমলতা প্রেট সাজিয়ে বসে ছিলেন। তিলের নাড়ু, নারকেসের নাড়ু আর মোটা পাকা কলা। হেমলতা বললেন, 'হ্যাঁরে, ও আবার এসব খাবে-টাবে তো! নাহলে বল দুটো লুটি ভেজে দিই!

অনি বলল, 'কে খাবে না, কার কথা বলছ?'

হেমলতা বললেন, 'ঐ যে, ফরসামতন-'

অনি বলল, 'দুজনেই তো ফরসা! তপন!'

হেমলতা দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, 'না না, যে প্রণাম করতে আসছিল-।'

'ও, শচীনের কথা বলছ? তুমি কিন্তু ওকে প্রণাম না করতে দিয়ে খুব অন্যায় করেছ। আমার বন্ধুরা শুনলে খ্যাপাবে!' অনি সোজাসুজি বলে ফেলল।

হেমলতা বলে উঠলেন, 'না বাবা, ধণ্যাম করতে হবে না। তা ও কি খাবে এসব?'

'খাবে না কেন?' অনি দুটো প্রেট হাতে নিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'একটাতে বেশি দিয়েছ কেন অত?'

হেমলতা হাসলেন, 'বেশি কোথায়? ওটা ওকে দিবি।'

অনি বলল, 'কেন? দুজনকেই সমান দাও! তপন কী দোষ করল? একেই প্রণাম নেবার সময় অমন করবলো, আবার সময় যদি তপনকে কম দাও তো ও ছেড়ে কথা বলবে?'

হেমলতা যেন অনিষ্টায় দুটো প্রেটের খাবার সমান করতে চেষ্টা করলেন, 'হ্যাঁরে ছেলেটা খুব শাক্ত, না রে?'

'কোন ছেলেটা?' অনির হঠাত মনে হল পিসিমাকে অন্যরকম লাগছে। এমন ভঙ্গিতে পিসিমাকে কথা বলতে ও কোনোদিন দেখেনি।

'ওই যে, বদিব্রাক্ষণ-'

'ওঁ', অনি আঘ খিচিয়ে উঠল, 'তুমি বাববাব ওই যে ওই যে করছ কেন? শচীন নামটা বলতে পারছ না!'

হেমলতা কিছু বললেন না। অনি খাবার নিয়ে চলে গেলে একা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে হঠাত ঝরবার করে কেন্দে ফেললেন। তার কোঁচে ছবি নেই, মুখ মনে নেই, এই শরীরে কোনো চিহ্ন সে এঁকে যেতে পারেনি, কারণ শরীরটা তখন তৈরি হ্যানি। সে শুধু বেঁচে আছে হেমলতার কাছে একটা নাম হয়ে, বুকের মধ্যে একটা নামজপের মন্ত্রের মতো অবিভূত সুরেফিরে আস্তে। সে-মানুষতে তিনি মনে করতে পারেন ন্যূন শুনেছেন বড় সুন্দর ছিল লোকটা, খুব ফরসা। তারপর এতদিন ধরে নামটাকে সম্পর্ক করে কল্পনায় চেহারাটাকে তৈরি করে নিজের সঙ্গে খেলে-খেলে যাওয়া। আজ এতদিন বাদে সেই নামের একটি মানুষকে তিনি প্রথম দেখলেন। ফরসা সুন্দর চেহারার একটি কিশোর। হোক কিশোর, নামটা শুনে বুকের মধ্যে সোহার মুঠোয় কে দম টিপে ধরেছিল। এ-নামের মানুষের কাছে কী করে তিনি প্রণাম নেবেন?

হেমলতা চুপচাপ একা একা কাঁদতে লাগলেন। যৌবনের শুরুতে যে-শানুষটা তাকে কুমারী রেখে চলে গিয়েছিল স্বার্থপরের মতো, আজ এতদিন পরে তার নামটার সঙ্গে মিলিয়ে একটি ছবি পেয়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সরিষ্ণেখরের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তপন আর শচীন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল অনি যেন অবশ্যই যায়, ওর দাদুকে যেন অনি বলে যে ওরা এতক্ষণ বসে ছিল। জলপাইগুড়িতে তখন একটা অন্তু নিয়ম চালু ছিল। কোনো বিবাহ-অনুষ্ঠানে 'পত্র দিয়ে অথবা মুখে নিমজ্ঞন করলেই চলবে না, অনুষ্ঠানের দিন ঘনিষ্ঠভাবে বাঢ়ি-বাঢ়ি গিয়ে বলে আসতে হবে। এরকম অনেকবার হয়েছে, এই সাধারণ ক্রিটির জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠান ফাঁকা হয়ে গেছে, বাঢ়িতে বলা হয়নি বলে অনোকেই আসেননি।

শচীনরা চলে গেলে অনি চুপচাপ গেটের আছে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন খেলার মাঠে গিয়ে কোনো

লাভ নেই। পিসিমা আজ ওরকম করছিলেন কেন? শচীনকে নাম ধরে ডাকছিলেন না পর্যন্ত হঠাত ওর বেয়াল হল পিসিমার ববের নাম ছিল শচীন। দাদু একদিন সেসব গল্প বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনি ঘুরে দাঁড়াল। এখন ও বুবাতে পেরে গেছে কেন শচীনকে উনি প্রশাম করতে দেননি। ইদানীং ও পিসিমার সঙ্গে ঠাণ্টাতামাশ করে, বয়স হয়ে যাবার জন্যে বোধহয় পিসিমা ওকে প্রশংস দেন। এরকম একটা ব্যাপার তাকে ডেকে উঠল। অনি ফিরে দেখল, ওদের পাড়ার একটি বড় ছেলে ওকে ডাকছে, ‘এই খোকা, তোমার নাম অনি তো’।

অনি ঘাড় নাড়ল।

‘তাড়াতাড়ি বাড়িতে খবর দাও, তোমার দাদুর অ্যাঞ্জিলেট হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’ ছেলেটি গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

দাদুর অ্যাঞ্জিলেট হয়েছে? অনি হতভেবের মতো তাকাল। কী করতে হবে কী বলতে হবে বুবাতে পারছিল না। ছেলেটি আবার বলল, দাঁড়িয়ে থেকে না, যাও। বুব আরাপ কিছু না, পায়ে চোট লেগেছে বোধহ, ভয়ের কিছু নেই।’

দুর্ঘটনা ঘটে গেছে অর্থ ভয়ের কিছু নেই—একথা লোকে চট করে বিশ্বাস করতে চায় না। তা ছাড়া প্রিয়জনের দুর্ঘটনা মানেই একটা মারাস্থল ব্যাপার হয়ে যায়। অনি যখন ছুটে গিয়ে হেমলতাকে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। বাবার দুর্ঘটনা ঘটেছে, যে-লোকটা একটু আগে সুস্থ শরীরে বেড়াতে গেল সে-লোকটা এখন হাসপাতালে—একথা তাবেলেই বুকটা কেমন করে শুটে। এই নীরু জীবনটা তাঁর বাবার সঙ্গে কেটেছে, বাবা ছাড়া তিনি কিছু ভাবতেই পারেন না। ফলে এই খবরটা ওর শরীর নিংড়ে একটা ভয়ের কান্না বের করে আনল। স্বামীর কথা ভাবতে গিয়ে যে—কান্নাটা বুকে ঘোরাফেরা করছিল এতক্ষণ, আর্চর্ভভাবে সেটা চেহারা পালটে ফেলল এখন। সেই কান্নাটা এখন হেমলতাকে যেন সাহায্য করল।

হাসপাতালে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ির ঘরদোর বক্ষ করে তালা দিতে গিয়ে হেমলতা আবিক্ষার করলেন বাড়িটা একদম খোলা পড়ে থাকবে। এত বড় বাড়িতে তালা দিয়ে এর আগে সাবই মিলে কোথাও যাওয়া হয়নি। হেমলতা দেখলেন বাগানের ভেতর দিয়ে কেউ এসে তালা ভেঙে যদি সব বের করে নিয়ে যায় তবে পাড়ার লোকে কেউ টের পাবে না। কিন্তু একটা বড় আতঙ্ক ছেট ভয়ের সংজ্ঞানকে চাপা দিতে পারে, হেমলতা ইষ্টনাম করতে করতে অট্টক নিয়ে বের হলেন।

অনি দেখল, পিসিমা থান-শোমিজের ওপর একটা সৃতির চাদর জড়িয়েছেন। এর আগে কখনো সে পিসিমার সঙ্গে রাস্তায় বের হয়নি। এখানে আসার পর পিসিমা কখনো বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কি না মনে পড়ে না। সঙ্গে হয়ে এসেচে। টাউন ক্লাব মার্টের পাশ দিয়ে যেতেই ওরা রিকশা গেয়ে গেল। হেমলতা তখন থেকে শুধু নাম জপ করে যাচ্ছেন। দাদুর পায়ে চোট লেগেছে, ভয়ের কিছু নেই, শোনার পরও কিন্তু অনি সহজ হতে পারছিল না। খারাপ খবর নাকি লোকে টপ করে দেয় না, সহয়ে সইয়ে দেয়। দাদু যদি মরে গিয়ে থাকে এতক্ষণে তা হলে ও কী করবে?

হাসপাতালে প্রথম ঢুকল অনি। পিসিমা পেছন পেছন। রিকশা থেকে নেমেই অনি দেখল পিসিমা মাথায় ঘোমটা দিয়েছেন। এরকম বেশে ওঁকে দেখে অনির বুব হাসি পেলেও কিছু বলল না। তাড়াছড়োয় পয়সাকড়ি আনা হয়নি বলে রিকশাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ফিরে গিয়ে একেবারে ডবল পাবে। করা শুধুরে গঞ্জ নাকে ধক করে আসতেই অনির মনে হল, হাসপাতালে থাকতে খুব কষ্ট হয়। অনুসূক্ষান লেখা কাউন্টারটায় কেউ নেই। একটা পাঁটকোমতো বেয়ারাগোহের লোক যেৰেতে বসে ছিল, অনিদের বোকার মতো চাইতে দেখে বলল, ‘কী খুঁজছ বাবা?’

অনি বলল কি বলবে না ভেবে বলে ফেলল, ‘আমার দাদু কোথায় তা-ই জানতে এসেছি।’

লোকটা কেমন অথর্বের মতো তাকাল, ‘জানতে চাইলেই জানতে পারবে না। ছটার পর বাবুদের ডিউটি খতম।’ হাত দিয়ে পাঁকা চেয়ার দেখাল সে, ‘কী কেস?’

অনি ঠিক বুবাতে পারল না প্রথমটা, ‘মানে?’

‘বাঁচবে না কষ্ট পাবে’ লোকটা উদাস গলায় জিজ্ঞাসা করল। অনিকে ঘুরে পিসিমার দিকে চাইতে দেখে লোকটা বুঝিয়ে দিল, ‘চুকে গেলেই বেঁচে যাওয়া যায়, এখানে থাকলেই তো তোগান্তি, কষ্ট। কিন্তু চাইলেই কি যাওয়া যায়? এই যে দ্যাখো, আমি একেবারে খোদ যাবার দরজা—এই

হাসপাতালে কাজ করছি আর প্রতিদিন চলে যাবার জন্য চেষ্টা করছি, তবু সে-মালা কি আমাকে টিকিট দেবে? তা কখন ভৱিতি হয়েছে?

‘বিকেলে। অ্যারিস্টেট হয়েছে পায়ে।’ অনি বলল।

‘ও, সেই রিকশা-কেস? বাঁচার কোনো আশা নেই, সে-শালা দয়া করবে না, অনেক ভোগান্তি আছে। তা তিনি আছেন ওই সামনে হলুদ বাড়িতে। এসে অবধি ডাক্তার নার্সদের ধমকে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। যাও, রিকশা-কেস বললেই যে-কেউ এখন বলে দিতে পারবে।’ লোকটা একফোটা নড়ল না।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে অনি বলল, ‘বাঁচার আশা নেই বলল, না?’

হেমলতা বললেন, ‘তার মানে ভগবান নিয়ে যাবে না, ওর কাছে যাবে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া। যত বদ লোক!’

হেমলতা হাঁটছিলেন টিপটিপে পায়ে। হাসপাতালের বারান্দায় রুগিরা সার দিয়ে শয়ে রয়েছে। রাজ্যের মানুষের হোঁয়া লেগে যাওয়ায় তাঁর হাঁটটা শুধু হচ্ছিল। দুর্বার তাগাদা দিয়ে অনি এগিয়ে গিয়েছিল হলুদ বাড়ির দরজায়। এখন তিঙ্গিটিৎ আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। দলেদলে মানুষজন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজায় একজন দারোয়ানগোছের লোক ওদের আটকাল। অনি ব্যাপারটা তাকে বললেও সে যেতে দিতে নারাজ, সময় চলে গেছে।

ততক্ষণে হেমলতা এসে পড়েছেন, ঝুনে বেঁকিয়ে উঠলেন, ‘আমরা কি জেনে বসে আছি যে কখন ওর অ্যারিস্টেট হবে আর আমাদের সে-ব্ববর পেয়ে আসতে তোমাদের সময় চলে যাবে?’

দারোয়ান বলল, ‘কখন অ্যারিমিট হয়েছে আপনার স্বামী?’

হেমলতা সব ভুলে চিকিরা করে উঠলেন, ‘মুখপোড়া বলে কী! ওরে উনি আমার বাবা, স্বামীকে অনেক দিন আগে খেয়েছি।’ অনির চট করে মনে পড়ে গেল, দাদু বরেন পিসিমা নাকি রাক্ষসগণ।

দারোয়ানটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ‘কী হয়েছিল?’

এবার অনি চটপট বলল, ‘রিকশায় লেগেছে।’

সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ানের চেহারা বদলে গেল, ‘আরে বাপ, যান যান, বাঁদিকে ঘুরে তিন নম্বর বেড়ে।’

লোকটা একক ভয় পেল কেন বুঝতে পারল না অনি। পিসিমা তখনও গজগজ করেছেন, ‘এদের এখানে ঢাকরি দেয় কেন? মেয়ে বাট বুঝতে পারে ন! যত বদ লোক!’

সরিষ্ণেখর বিছানার ওপর হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর একটা পা মোটা ব্যান্ডেজ জড়ানো, টানটান করে রাখা। ওদের দেখে তিনিই কাছে ডাকলেন, ‘এই যে, এদিকে এসো। দ্যাখো কীভাবে এঁরা সব আছেন। এটা কি হাসপাতাল না শয়োরের খাচ! ঘরময় নোংরা ছিল, আমি বলেকয়ে সরিয়েছি, নইলে আমরা চুক্তে পারতে না।’

হেমলতা বাবার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী হয়েছে?’

সঙ্গে সঙ্গে গলা তুললেন সরিষ্ণেখর, ‘স্বাধীন হয়ে সব উচ্ছেন্নে গেছেন। আমি এখানে এন্টে এক মটা পড়ে আছি, একটা ডাক্তার নেই যে এসে দেখবে। নাকি তার ডিউটি ওভার, নতুন শোক আসেনি। ভাবতে পার? ইরেজ আমলে এসব জিনিস হলে হাঙ আনটিল ডেথ হয়ে যেত। আমি কালই জওহরলাল নেহকুকে লিখব।’

সরিষ্ণেখরের পাশের বেতে শয়ে-থাকা একজন ঝুঁগি চিনচিনে গলায় বলে উঠলেন, ‘আমাদের খাবার থেকে চুরি করে ওরা, কী জঘন্য খাবার!’

সরিষ্ণেখর হেমলতাকে বললেন, ‘ভুলে? চুরি করা আমি বের করছি! আমি এখনকার দেখনবাহার নাইটস্পেলদের বলেছি খাবারের চার্ট দেখাতে, একটা-কিছু বিহিত করতে হবে। ওই যে আট নম্বরের বাচ্চাটা-চাপ্পিশ মিনিট চেঁচিয়েও বেডপ্যান পায়নি, আমি এলে তবে দিল। হ্যাঁ মশাই, সিভিল সার্জন কখন আসেন হাসপাতালে?’

হেমলতা এবার প্রায় অসহিষ্ণু গলায় বললেন, ‘আপনার পায়ের অবস্থা কীরকম?’

‘যত্রণা হচ্ছে খুব।’ ততক্ষণে মুখ-বিকৃতি করলেন সরিষ্ণেখর, ‘কাল সকালে বোধহয় প্রাটার

করবে। দুপুরনাগাদ বাড়ি শিয়ে তাত খাব।'

'পারবেন?' হেমলতা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'পারব না কেন? আমার একটা পা তো ঠিক আছে।' হঠাৎ যেন তাঁর কথাটা মনে পড়ে যেতেই তিনি অনিকে কাছে ডাকলেন, 'শোনো, তুমি কাল সকালের ফার্স্ট বাসে স্বর্গছেড়ায় চলে যাবে।'

অনি অবাক হয়ে বলল, 'কেন? আমার ক্ষুল যে খোলা!'

সরিশেষের বললেন, 'সারাজীবনে অনেক ক্ষুল খোলা পাবে। আমি যেতে পারছি না, তুমি অবশ্যই যাবে। তোমার বাবার খুব অসুবি।'

কিং সাহেবের ঘাটের চায়ের দোকানগুলো বোধহ্য দিনরাত খোলা থাকে। এই কাক-ভোরেও তাদের সামনে লোকের অভাব নেই। ভাতের হোটেল এখনও খোলেনি। সেগুলো ছাড়িয়ে সামান্য এগোতেই অনিকে নিয়ে কাঢ়াকড়ি পড়ে গেল। একই সঙ্গে চার-পাঁচজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সাক্ষাত এসে ওকে যেন কোলে করেই নিজের গাড়িতে তুলতে চাইছে। অনি অসহায়ে মতো এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। সামনে সার দিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। মন্তু এগুলোকে বলে মুড়ির টিন। থার্টি টু পার্টস অল আউট। পুরো গাড়িটাই নাকি ভাঙচোরা-সবকটা অংশ কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে রাখা হয়েছে। হৰ্ন নেই, দরকারও হয় না। চলার সময় এক মাইল দূর থেকে সবাই এদের গর্জন শুনতে পায়। অনি কোনোদিন এই ট্যাক্সিতে চড়েনি। স্বর্গছেড়া থেকে আসবার সময় লরিতে চেপে জোড়া-নৌকায় পার হয়ে এসেছিল। অনেকদিন ওরা কিং সাহেবের ঘাটে এসে দেখেছে সমস্ত শরীর ধর্মধর করে কঁপিয়ে আগাপাশতলা যাত্রী বোঝাই করে ট্যাক্সিগুলো তিতার কাশবন চিরে চুটে যায় বার্নিশের দিকে। বছরের যে-কটা মাস চর শুকনো থাকে ট্যাক্সিগুলো প্রতিপ দেখিয়ে বেড়ায়। তাও পুরো চর নয়, বার্নিশের কাছে সিকি মাইল গভীর জলের ধারা আছে। সে-অবধি শিয়ে আবার যাত্রী নিয়ে ফিরে আসে ট্যাক্সিগুলো। তারপর যখন বর্ষা বেশ জমে উঠে, মনীর এপার-ওপার দেখা যাব না, ডেউগুলো খ্যাপা গোখরোর মতো ছোবল মারতে থাকে অবিরত, তখন ট্যাক্সিগুলো কোথায় যে হাওয়া হয়ে যায়! অনি দেখল সামনের একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে গেল হঠাৎ। তারপর একজন বয়স্ক মানুষ চাপা গলায় ধর্মে উঠলেন, 'কী হচ্ছে!'

সঙ্গে সঙ্গে অনি দেখল লোকগুলো বেশ ধূমত হয়ে গেল। একজন চট করে বলে উঠল, 'কেন বামেলা করস, বাবু তখন থিকা বইস্যা আছেন, ইনারে পাইলেই গাড়ি খুলুম-আসেন কসা, আমাগো পিক্ষিরাজে বসেন, আমি ডেরাইভার সাহেবেকে ডাইক্যা আনি।'

লোকটা ওকে যেন পথ দেখিয়ে খনিকটা দূর এগিয়ে এসে গাড়িটা চিনিয়ে দিল। অনি দেখল অন্যান্য গাড়ির তুলনায় এটা তবু ভুত চেহারার, মাথার ওপরের ত্রিপলটা আন্ত আছে। বয়স্ক ভদ্রলোক তখনও বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অনি দেখেই বুঝল অনি নিয়চয়ই, খুব বড়লোক, কারণ এর ফিনফিলে ধূতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি আর ফরসা গোলগাল চেহারা থেকে একটা আভা বের হচ্ছিল।

ভদ্রলোক গঁষ্ঠীর গলায় বললেন, 'গাড়িতে উঠিয়ে ছাড়ার নাম নেই! তোমাদের প্যাসেঞ্জার না হওয়া অবধি বসে থাকতে হবে?'

কথাটার কোনো জবাব দিল না কেউ। ভদ্রলোক এপাশ-ওপাশ তাকালেন। অনি দেখল যে-লোকটা ওকে গাড়ি চিনিয়েছে সে একটা পাটকার্টির মতো ফিলফিলে লোককে সঙ্গে নিয়ে এলিকে আসছে। অনি শুনতে পেল ভদ্রলোক তাকে ডাকছেন, 'এই খোকা, ওপারে যাবে তো? গাড়িতে উঠে বসো। এবার না ছাড়লে দেখছি!' অনি গাড়িতে উঠার আগেই ফিলফিলে লোকটি দরজা খুলে ওকে সামনে বসতে বলল। ড্রাইভারের সিটে কোনো গদি কোনো গদি নেই। গোল গোল শিপ্প-এর ওপর মেটা বস্তা পাতা রয়েছে। খুব চওড়া ফুটবোর্ডের ওপর পা রেখে নিয়ু হয়ে বসতেই মনে হল ওর পাছায় অজস্র পিপড়ে কামড়াচ্ছে। ড্রাইভারের সঙ্গীটি তখন চাঁচাচ্ছে-'ফাটো টিপ- বার্নিশ, ফাটো টি-বার্নিশ!'

গাড়িতে উঠার সময় অনি লক্ষ করেছিল ভদ্রলোক একা নেই। একজন মহিলা এবং একটি ছেলেকে এক পলকে নজর করেছিল সে। এখন গাড়িতে উঠে ও দেখল ওর সামনে আয়নাটা আন্ত আছে এবং ভদ্রলোকের পাশে ভীষণ ফরসা একজন মহিলা বসে আছেন লাল কাপড় পরে। মহিলার চোখে নতুন ধরনের চশমা যা অনি কোনোদিন দেখেনি, জামাটার হাতা নেই। এলক্ষ জামা ছোট ঠাকুমা পরত। দাদুর তোলা ছোট ঠাকুমাৰ একটা ছবি দেখেছিল সে, ঠিক এইরকম, 'ঃ'। একটু ঢেলা।

অনি উঠতেই তিনি চোখ কুঁচকে তাকে একবার দেখলেন, 'রাবিশ! এত করে বললাম গাড়ি বের করো, শুনলে না, এখন বোবো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিস্তাৰ চৰে প্রাইভেট গাড়ি চালালে বারোটা বেজে যাবে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেলে শুনছে।'

'শুনুক! এখন তো শোনাব বয়স হচ্ছে।'

ভদ্রমহিলার কথা শেষ হওয়ামাত্র হড়মুড় করে চার-পাঁচজন কাবুলিওয়ালার একটা দল এসে পড়ৱ। ওদের দেখে অন্যান্য ট্যাক্সি-ড্রাইভার কিন্তু একদম চিঢ়কার কৰল না। ওৱা বোধহয় এই ট্যাক্সিতে প্যাসেজার দেখে সোজা এখানেই চলে এল। ড্রাইভারের সঙ্গী চেঁচিয়ে বলল, 'এক কুপিয়া খান সাব এক আদমি কো।'

একটা মোটা কাবুলিওয়ালা, যার ঘাড় মাথার অর্ধেক অবধি কামালো, ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, 'পাঁচ আদমি-চার রূপযাঁ।'

এই নিয়ে যখন ওদের মধ্যে কথা চলছে অনি শুনল ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই গাড়িতে ওৱা যাবে নাকি?' ভদ্রলোক জবাৰ না দিলেও অনি বুঝতে পারল, তিনিও ওদের যাওয়াটা পছন্দ কৰছেন না। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি ড্রাইভারকে বলো ওদের না নিতো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও শুনবে কেন? আমৰা তো পুৱো ট্যাক্সি রিজার্ভ কৰিনি।'

এবাৰ যেন মহিলা দৈৰ্ঘ্য বাবতে পারলেন না, 'তা-ই কৰো। আঃ! তুমি জান না ওৱা কীৱকম। আজ অবধি কেউ কাবুলিওয়ালার বউ দেখেনি, জান?'

হঠাৎ ভদ্রলোকের গলার বৰ পালটে গেল, 'তাতে তোমার কী এসে গেল, তুমি তো আমাৰ স্তৰী।'

অনি দেখল ভদ্রমহিলার মুখ অসম্ভব লাল হয়ে গেছে। তাঁৰ একপাশে ওৱা বয়াসি মে-ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে তার মুখটা অসম্ভব রকমের গোবেচারা। এৱকম লালুটু গোলাটু-মাৰ্কা ছেলে ওদের দলে একটাও নেই। হঠাৎ ছেলেটা বলে উঠল, 'কাবুলিওয়ালাৰা খুব ভালো, না মা? আখৰোট দেবে আমাদেৱ?'

ভদ্রমহিলা বিচিয়ে উঠলেন, 'আঃ, তুমি চুপ কৰো। যেমন বাপ তেমনি ছেলে।'

ছেলেটি হতকিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ মা, মিনিকে দিত, আমি পড়েছি।'

অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না ছেলেটি কোন পড়াৰ কথা বলছে। তবে আদাজ কৰল ও কাবুলিদেৱ নিয়ে কোনো গল্প পড়েছে।

দৰ ঠিকঠাক হয়ে গেলে লোকগুলো যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখন অনি পিঠে একটা হাতেৱ স্পৰ্শ পেল। ঘাড় ঘূৱিয়ে সে দেখল, ভদ্রমহিলা অনেকটা ঝুঁকে প্ৰায় তাৰ কানেৰ কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছেন, 'তুমি আমাদেৱ এখানে এসে বসো তো ভাই, সামনেৰ সিটটা ওদেৱ ছেড়ে দাও।'

অনি কী কৰবে বুঝে না উঠতেই ভদ্রলোক গষ্ঠীৰ গলায় বললেন, 'চলে এসো পেছনে, কুইক।'

অনি কী কৰবে বুঝে উঠতেই ভদ্রলোক গষ্ঠীৰ গলায় বললেন, 'চলে এসো পেছনে, কুইক।' ভদ্রলোক জানা ছাড়বেন না, তাঁৰ কীসৰ দেখাৰ আছে। গোলালু ছেলেটা প্ৰায় নাকে কেঁদে উঠল, সে ওগাশেৱ জানালা থেকে সৱাৰে না। অনি নেমে দাঁড়িয়েছিল। একটা ছোকু-কাবুলি ওৱা মাথায় আলতো কৰে টোকা মাৰল। তাৰপৰ ওৱা চাৰজন ড্রাইভারেৰ পাশে গিয়ে অস্তুত ভাষায় উঃ আঃ কৰতে কৰতে বসে পড়ল। শেষ পৰ্যন্ত ভদ্রলোক নেমে দাঁড়াতে অনি পেছনেৰ সিটে বসতে পেল। ছোট কাপড়েৰ ঝোলাটা কোলেৰ ওপৰ রেখে মহিলাৰ পাশে বসতেই অনিৰ মনে হল অস্তুত এক ফুলেৰ বাগানে সে চুকে পড়েছে। এতৰকম ফুলেৰ গৰ্জ একসঙ্গে নাকে আসছে যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। মায়েৰ গা থেকে যেৱকম গৰ্জ বেৰ হত এটা সেৱকম নয়, মহিলাৰ শয়িৰ থেকে যে-সৌৱভ বেৰ হচ্ছে তা মানুষকে যেন অবশ কৰে দেয়। সামনেৰ সিটে বসে যে কেন গৰ্জটা পায়নি বুঝতে পাৰছিল না অনি। কাবুলিলা উঠে বসেই প্ৰায় একই সঙ্গে ঘাড় ঘূৱিয়ে ওদেৱ দেখল। একজন কী-একটা মন্তব্য কৰতেই সবাই ঠাঠা কৰে হেসে উঠল। অনি দেখল ভদ্রমহিলা এক হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধৰেছেন, অন্য হাত তাৰ পিঠেৰ উপৰ রাখা।

ড্রাইভারেৰ সঙ্গী এবং অবশিষ্ট কাবুলিটা ফুটোৰ্ডে উঠল। সঙ্গীটি গোৱা আগে হ্যাজেল নিয়ে

কয়েক মিনিট প্রাপ্তে ঘুরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করতে সেটা সফল হয়ে এল। ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই গাড়িটা ধর্মথর করে কাঁপতে লাগল। অনিমনে হতে লাগল মণ্ডুর কথা সত্তি, যে-কোনো সময় গাড়ির সবকটা অংশ খুলে পড়ে যেতে পারে। বিকট চিন্তকার করে গাড়িটা চলতে শুরু করল এবার। ভেতরে বসে কানে তালা লাগার যোগাড়। অনি দেখল পেছনের সিটের গদি এখনও সবটা উঠে যায়নি।

দুপাশে বালি আর বারি, ইত্তত কিছু কাশগাছ, গাড়িটা যত জোরে ছুটছে তার বহুগুণ বেশি শব্দ করছে। মাঝে-মাঝে মরা নদীর পৌঁজে কিছু জল জমে রয়েছে। অবশীলায় ট্যাঙ্গি সেটা পেরিয়ে এল। কাবুলিশুলো খুব মজা পেয়েছে, অনি শুনল, ওরা চিন্তকার করে গান ধরেছে। অনির বস্তে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মহিলা তাকে প্রায় চেপে ফেলেছেন। ওঁর পেটের গমের মতো রঙের চর্বি যত নরম হোক ওজনে দমবক্স করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। দ্বৰমহিলা বোধহয় অনির পেছনদিক দিয়ে থামীকে চিমটি কেটেছিলেন, কারণ তিনি হঠাৎ উঁ করে ঝীর দিকে তাকালেন। মহিলা কেমন হাসিহাসি গলায় বললেন, ‘কাবুলিশুলারাও গান গায়, শুনেছ আগে?’

ভদ্রলোক বললেন, ‘হুঁ। সেক্স এলে ওরা গান গায়।’

প্রায় আঁতকে উঠলেন মহিলা, ‘সে কীী।’

সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ‘তোমার অবশ্য তয়ে দিন অনেক আগে চলে গেছে। আয়নায় মুখ দ্যাখো না তো।’

অনি দেখল মহিলা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ওঁর হাতটা নির্ভার হয়ে ওর পিঠের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখ ঘুরিয়ে অনি দেখল একটা ঠোঁট চেপে ধরে তিনি ছেলের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। কেন হঠাৎ এমন হল সে বুবাতে পারছিল না। সেক্স মানে কী? এই শব্দটাই সব গোলমালের কারণ। মানে জিজ্ঞাসা করলে যদি ভদ্রলোক চট্টে থান? ও মনে ঘনে কয়েকবার আওড়ে শব্দটা মুখস্থ করে ফেলল। গাড়িতে ফিরে গিয়ে ডিকশনারিতে এর মানেটা দেখতে হবে। আর এই সময় আর্টসাদ করে গাড়িটা থেমে গেল। অনি দেখল চারধারে এখন মাথা অবদি কাশগাছের বন। একটা ডাহক পাখি ডাকছে কোথাও। ড্রাইভারের সাকাত লাফিয়ে নামল, ‘হালায়ে টাইট দেবার লাগব।’ বলে পাশ খেকে একটা কাশগাছের ডাঁটা ছিঁড়ে নিয়ে ইঞ্জিনের তাকনা খুলে ভেতরে কোথাও গুঁজে দিতেই আবার শব্দ করে গাড়িটা ডেকে উঠল। ব্যাপারটা এতটা আকশ্মিক যে কাবুলিশুলো পর্যন্ত হা হয়ে গেল। ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, ‘আমার গাড়ি হলে মেকানিক ডাকতে হত।’

নদীর ধারে এসে ট্যাঙ্গিটা দাঁড়াতেই কাবুলিশুলো আগে লাফিয়ে নামল। এপারে কোনো দোকানপাট নেই। প্রায় রোজই ঘাট জায়গা বদলাচ্ছে, তা ছাড়া পাহাড়ের বৃষ্টি হলেই শুকনো চরে আট-দশটা মেটো ধারা গজিয়ে এক হয়ে যাবে। ওপারে বার্নিশ বার্নেশও বলে অনেক। লোকজন দোকানপাটে জমজমাট। এই সাতসকালে সেখানে গঞ্জের ভিড়। সমস্ত ড্যুয়ার্স এবং সুন্দর কুচবিহার থেকে বাসগুলো এসে ওই বার্নিশে বসে থাকে। তিঙ্গা প্রেরিয়ে জলপাইগুড়িতে আসার উপায় নেই। তাই বার্নিশের রবরবা এত। বার্নিশের নিচে মঙ্গলঘাট, জলপাইগুড়িতে আসার সময় রা মঙ্গলঘাট দিয়ে এসেছিল।

গাড়ি তেকে নেমে অনি দেখল জোড়া-নোকো একটাও নেই, ছোট ছোট নোকো দুটো দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ে ভিড় নেই একদম, একটা নোকোয় গোটা-আটেক লোক বসে আছে। তবে এই সিকি মাইল চওড়া তিস্তায় এখন প্রচও ঢেউ, জলের রঙ লালচে : হঠাৎ দেখলে কেমন তয়-তয় করে। ড্রাইভারের সঙ্গী এসে তার কাছে টাকা চাইল। ও দেখল ভদ্রলোক মহিলা এবং গোলাকুকে নিয়ে নোকোর দিকে এগোচ্ছেন। টাকাটা দিয়ে ও চটপট এগোল। আসবার সময় পিসিমা তিনটে এক-টাকার নোট তাকে দিয়েছেন, একটাকা ট্যাঙ্গির ভাড়া, চার আনা নোকোর ভাড়া, পৌচসিকা বাসভাড়া আর আটআনায় দুটো রাজভোগ। একদম হিসেব করে দেওয়া টাকা। সকালবেলায় সাততাড়াতাড়ি না খেয়ে বেরনো-তাই রাজভোগ বরাদ্দ।

ভদ্রলোক উঠে ছেছেন নোকোয়, উঠে ছেলেকে প্রায় কোলে করে টেনে তুলেছেন। অনিকে আসতে দেখে মহিলা বললেন, তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ভাই। একসঙ্গে এলাম তো, যাই কী করে।

অতবড় মহিলা তাকে ভাই বলছেন, অনির কেমন অবস্থি হল। ও কি মাসিমা না বলে দিনি বলবে? ওরা নিচয়ই খুব আধুনিক। বড়লোক হলেই বোধহয় আধুনিক হয়। মণ্ডু বলে বিলেতে আয়েরিকায় ছেলেমেয়েরা বাগ-মায়ের বক্স। ওদের চেয়ে আধুনিক কে আছে? মহিলা তো তাকে শুধু

ভাই বললেন।

‘আনি দেখল চেউ-এর দোলায় নৌকোটা পাড়ের বালিতে ঘষা খেয়ে আবার হাতখানেক সরে যাচ্ছে। সে-সময় তার ফাঁক দিয়ে লালচে জলের স্রোত দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা বোধহয় সেই দিকে চোখ পড়ার আর এগোতে পারছেন না। এদিকে ভদ্রলোক কিন্তু উদাস-চোখে বার্নিশের দিকে চেয়ে আছেন। নৌকোটা ছেট। দুধারে সুরু তত্ত্ব পাতা, যাত্রীরা সেখানে বসে আছে। মাঝখানে কাঠের বিষগুলো এখন ফাঁকা। গোলালু জ্বলজ্বল করে বাবার পাশে বসে যাকে দেখছিল। অনির একটু ভয়-ভয় করছিল। সে সাবধানে নৌকোতে উঠতেই সেটা সামান্য দূলে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি এবার ব্যালাস থাকবে না, কিন্তু সেটা চট করে ফিরে এল। সোজা হয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। ও ঘুরে দেখল ভদ্রমহিলা ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, ‘বেশি দুলছে না তো?’ অনি ঘাড় নেড়ে হাত ধরতেই ভদ্রমহিলা শরীরের সব ওজন নৌকোর ওপর অনিকে ভর করে ছেড়ে দিলেন। অনির মনের হল ওর দমবক্ষ হয়ে যাবে, ও উলটে জলে পড়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না, সামনে নিয়ে ভদ্রমহিলা সেখানেই কাঠের ওপর বসে পড়ে অনিকে বললেন, ‘বসো।’ অনি বসতে বসতে তনতে পেল মহিলা বলছেন, ‘বার্থপর, জেলাস!’ ঠিক বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকাতেই তিনি হেসে ফেললেন, ‘না না, তোমাকে নয় ভাই। এস্থা, তোমাকে কেন বলব! তুমি আমার কত উপকার করলে! কোথায় যাচ্ছ?’

‘স্বর্গহেঢ়ায়।’ অনি বলল।

‘দারুণ রোমাটিক নাম, না? আমরা যাচ্ছি ময়নাগুড়ি। আজই ফিরে আসব। জলপাইগুড়িতে থাক?’ কাঁধে হাত রেখে পা নাচালেন মহিলা।

‘হ্যাঁ।’

‘এলে দেখা কোরো। আমরা থাকি বাবুপাড়ায়। বাড়ির নাম জ্বিমল্যান্ড। মনে থাকবে তো?’

অনি ঘাড় নাড়ল। ‘ও কোন ক্লুলে পড়ে?’

‘কে? ও, পিস? কার্শিয়া-এ পড়ে। ছুটিতে এসেছে। আমার একটা মেয়ে আছে, দারুণ সুন্দরী, আমার চেয়েও। ওর সঙ্গেই আমার মেলে বেশি। পিস ওর বাবার মতন, স্বার্থপর। ওহো, তোমার নাম কী? কোন ক্লুলে পড়ে?’ এত কথার পর মহিলার এবার যেন প্রশ্নটা মনে পড়ল। ঠিক সে-সময় মাঝিরা এসে নৌকোয় উঠতে সেটা বুব জোরে দূলে উঠল। মহিলা ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন। সেইরকম ফুলের বাগানে ঢুকে পড়ে অনি বলল, ‘আমার নাম অনিমেষ, জেলা ক্লুলে পড়ি।’

নৌকোটা ছেড়ে দিল। নৌকোর মূখে একটা মোটা লোড দড়ি বেঁধে কয়েকজন সেটাকে টানতে লাগল পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে। সেই টানে নৌকো এগিয়ে যেতে লাগল ওপরের দিকে। অনি তনতে পেল ভদ্রলোক গোলালুকে বলছেন, ‘একে বলে শুণ টানা।’ গোলালু বুঝল কি না বোঝা গেল না। ও কেন জেলা ক্লুলে না পড়ে কার্শিয়া-এ পড়ে? সেখানে নিচ্যাই একা থাকতে হয়। ওর হাঁটাং গোলালুর জন্য কষ্ট হল। মা থেকেও ও মার কাছে থাকতে পারছে না। চেউ বাঁচিয়ে নৌকোটাকে অনেক দূরে নিয়ে এসে মাঝিরা লাকিয়ে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ছপছপ করে বৈঠা পড়তে পাগল জলে। বাঁধন খুলে যেতেই স্রোতের টানে শ্রেণী করে নৌকো নদীর ভিতর ঢুকে পড়ল।

বড় বড় চেউ দেখা যাচ্ছে মাঝবন্দীতে। এক-একটা বড় যে তার আঢ়ালে বার্নিশটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পলকের জন্য। হাঁটাং নৌকোর একধারে বসে-থাকা রাজবংশীরা চিংকার করে উঠল, ‘তিতা বুড়িকি জ্যা!’ সঙ্গে সঙ্গে সেটা গর্জন করে ফিরে এল। মাঝিলা আপগণে নৌকো ঠিক বাঁধার চেষ্টা করছে। চিংকার করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে ওরা। অনি দেখল বড় চেউয়ের কাছাকাছি নৌকো এসে যেতেই একটা দিক কেমন উচু হয়ে যাচ্ছে নৌকোর।

গোলালু ওর বাবাকে জড়িয়ে ঢোক বক্ষ করে বসে আছে। ভদ্রলোক অন্য হাতে নৌকোর তত্ত্ব শক্ত করে ধরে আছেন। ভদ্রমহিলা এই সকালে কুলকুল করে ঘামছেন। তাঁর মুখের রং কাদা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে একধারে। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন অনিকে জটিয়ে ধরেছেন। ছিটকে ছিটকে জল আসছে নৌকোয়। কাবুলিশুলো পর্যন্ত নদীর চেহারা দেখে ভয়ে পচাপ হয়ে বসে গেছে।

এবার চেউটা পার হবে নৌকো। অনি দেখল স্রোতটা এখানে গর্তের শতো নিচে নেমে গিয়ে হাঁটাং তুবড়ির মতো ওপরে ফুসে উঠছে। নৌকো সেই টানে নিচে নেমে যেতেই অজুন একটা ঝাকুনি

ଲାଗଲ । ସେଟା ସାମଲେ ଜଳେର ଟାନେ ଓପରେ ଉଠିତେଇ ଏକୁଟି ବେଟୋଲ ହୟେ ଗେଲେ ହଡ଼ମୁଡ଼ କରେ ଏକରାଶ ଜଳ ନୌକୋଯ ଉଠେ ଏଲ । ଆର ତଥନଇ ଅନି ଦେଖିଲ ବେଟୋଲ ନୌକୋର ଏକପାଶେ ବସେ ଥାକା ଏକଟା ଲୋକ ଟୁପ କରେ ଜଳେ ପଡ଼େ ଗେଲ ଚୁପଚାପ । ଯେଣ ଡେତରେ ଡେତରେ କେଉ କାଜ କରେ ଯାଇ, ନଇଲେ ସେଇ ମୁହଁର୍ତ୍ତ ମହିଳାର ବାଂଧନ ଖୁଲେ ଅନି ଘୁରେ ବସନ୍ତ ନା । ଆର ବସନ୍ତେଇ ଓ ଦେଖିଲ ସେଇ ଶ୍ରୀରାଟ୍ଟା ଛୁଟ୍ଟ ଜଳେର ସଙ୍ଗେ ପାକ ଖେଯେ ତାର ନିଚ ଦିଯେ ନୌକୋର ତଳାଯ ଢୁକେ ଯାଛେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝୁକେ ପଡ଼େ ଅନିମେସ ତାର ପିଠିର ଜାମା ଚେପେ ଧରିଲ ମୁଠୋସ । ଜଳେର ହ୍ରାତେ ଶ୍ରୀରାଟ୍ଟାର ଓଜନ କରେ ଗିଯେଛେ, ତବୁ ତାକେ ଧରେ ରାଖା ଅନିର ପକ୍ଷେ ଅସତ୍ବ । ପିଠିର ଦିକେ ଟାନ ଲାଗାଯ ଶ୍ରୀରାଟ୍ଟାର ନିଚ ଦିକ ନୌକୋର ତଳାଯ ଢୁକେ ଗେଲ ଆର ଲୋକଟା ଚଟ କରେ ଆଧା ଉଲଟେ ଗେଲ । ଅନି ଦେଖିଲ ଲୋକଟାର ସାରା ଶ୍ରୀର କାପଢେ ମୋଡ଼ା, ବୀଚର ବ୍ୟାନ ପେଯେ ଏକଟା ହାତ ଓପରେ ବାଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛେ । ଏଭାବେ କତକ୍ଷଣ ମେ ଧରେ ଥାକତେ ପାରେଁ ମହିଳା ନା ଥାକଲେ ମେ ନିଜେ ପଡ଼େ ଯେତ । ମହିଳା ତାର କୋମର ଦୁହାତେ ଧରେ ରାଖାଯ ମେ ବ୍ୟାଲେପ ରାଖିତେ ପାରାଛେ । ଏତକ୍ଷଣେ ନୌକୋଟା ସେଇ ବଡ ଟେଉ-ଏର ଜାୟଗାଟା ପେରିଯେ ଏସେଛେ । ଦୁଜନ ମାରି ଦୌଡ଼େ ଛୁଟେ ଏଲ ଅନିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ । ତାରା ଏସେ ଝୁକେ ପଡ଼େ ଲୋକଟାକେ ଧରିତେଇ ମେ ହାତ ବାଡ଼ିଯେ ନୌକୋର କାଠ ଧରତେ ଗେଲ । ନାଗାଳ ପାଛେ ନା ଦେଖେ ଅନି ହାତଟା ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ଯେତେଇ ଦେଖିଲ ମେ କୋନୋରକମେଇ ମୁଠୀ କରତେ ପାରାଛେ ନା । କାରଣ ମୁଠୀ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଶ୍ରମଗୁଲୋଇ ତାର ନେଇ । ଏହି ଜଳ-ଭୋଜା ହାତେର ଯେବାନେ ମେ ଚେପେ ଧରେଛିଲ ସେ-ଜାୟଗାଟା ଯେନ କେମନ-କେମନ ଲାଗଛେ । ଆର ଏହି ସମୟ ଚିକାରାଟା ଓଜନେ ପେଲ ଅନି । କାନେର କାହେ ମହିଳା ପ୍ରଚନ୍ଦ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ତାର କୋମର ଛେଡ଼େ ଦିଲେନ । ଦିଯେ ଆଲଥାଲୁ ହୟେ ଦୌଡ଼େ ଶାମୀର ପାଶେ ଗିଯେ ବସଲେନ ।

ଯେହେତୁ ଏଥନ ନୌକୋ ଦୁଲାହେ ନା, ଅନି ସୋଜା ହୟେ ଏକା ଦାଁଡାତେ ପାରିଲ । ତତକ୍ଷଣେ ନୌକୋଟା ପାଡ଼ରେ କାହେ ଏସେ ଗେଛେ ଏବଂ ଏହି ମାରି ଦୂଟୋ ଲୋକଟାକେ ଟେନେ ଅନିରା ଯେବାନେ ବସେଛିଲ ମେଖାନେ ତୁଲେଛେ । ଅନି ଦେଖିଲ ମୃତ୍ୟୁଯ ଏକଟା ମାନୁଷ ନୌକୋର କାଠରେ ଓପର ଏଲିଯେ ପଡ଼େ ଆଛେ । ମୁର୍ବଭରତି ଦାଢ଼ି ଦାଁତ ନେଇ, ହା କରେ ବୁକ କାପିଯେ ନିଶ୍ଚାସ ନିଛେ । ଅନି ଦେଖିଲ ଲୋକଟାର ନାକ ନେଇ, କାନେର ଅର୍ଦ୍ଦକଟା ଖସା, ତୁଲେର ଜାୟଗାଯ ଛୋପ ଛୋପ ଦାଗ । ପୁରୋ ମୁଖ୍ୟଟା ଢେକେ ବସେଛିଲ ମେ ନୌକୋଯ । ଆର ଏତକ୍ଷଣ ମେ ଅନି ଟେର ପେଲ ଓର ଶ୍ରୀର ଥେକେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ତ ଏକଟା ପଚା ଗଞ୍ଜ ବେର ହେବେ । କେମନ ଏକଟା ଗା-ଘିନଧିନେ ଭାବ ସମ୍ମତ ଶ୍ରୀରେ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲ ଏବାର । ଅନି ନିଜେର ହାତେର ଦିକେ ତାକାଳ । ତାରପର ଝୁକେ ତିତ୍ତାର ଜଳେ ହାତ ଧୁଯେ ନିଲ । ଆର ଏହି ସମୟ ଏକଟା ମାରି ଓକେ ବଲେ ଉଠିଲ, ‘ପୁଣ୍ୟ କରଲେନ ନା ଭାଇ, ଆପନାର ପାପଇ ହଇଲ ।’ କଥାଟାର ମାନେ ବୁଝାତେ ନା ପେରେ ଅବାକ ହୟେ ତାର ଦିକେ ତାକାତେଇ ମେ ବଲଲ, ‘ଏ ତୋ ମାନୁଷ ନା, ଜ୍ଞାନର ଅଧିମ । ମଇରା ଗେଲେଇ ଏ ଶାନ୍ତି ପାଇତ, ତିତ୍ତାବୁଦ୍ଧିର କୋଳ ଥିକା ହିନ୍ହାଇୟା ଆଇନ୍ୟା କୀ ଲାଭ ହଇଲ ।’

ଅନି ଏତ ଅବାକ ହୟେ ଗିଯେଛିଲ ଯେ ଓର ଜାମାକାପଡ଼େର ଅନେକଟା ଯେ ଜଳେ ଭିଜେ ଗେଛେ ଟେର ପେଲ ନା, ‘କିନ୍ତୁ ଓ ମରେ ଯେତ ଯେ ।’

ମାରିରା ହାସଲ, ‘ହୁକ କଥା । କିନ୍ତୁ ବାଇଚା ଯାଇତ ।’

ଠିକ ତଥନ କାଳ ମୁକ୍କେବୋଲାଯ ହାସପାତାଲେ ସେଇ ଲୋକଟାର ମୁଖ ମନେ ପଡ଼ିଲ । ଏହି ପୃଥିବୀ ଥେକେ ଚଲେ ଯାଓୟା ମାନେ ବେଂଚେ ଯାଓୟା-ଲୋକଟା ବଲେଛିଲେନ । ଏଥନ ଏହି ମାରିଓ ପ୍ରାୟ ସେଇ କଥାଇ ବଲାହେ ନିଜେର ମାଯେର କଥା ଭାବିଲ ଅନି, ମା କି ବେଂଚେ ଗେହେ ତାକେ ଫେଲେ ରେଖେ ମା କି ଶାନ୍ତିତେ ଆଛେ ମାନୁଷର କେନ ପୃଥିବୀତେ ବେଂଚେ ଥାକତେ ଇଛେ କରେ ନା ବୁଝାତେ ପାରାଛିଲ ନା ଅନି । ହଠାତ୍ ଓର ମନେ ହର ହାସପାତାଲେ ସେଇ ଲୋକଟା ଅଥବା ଖସ-ଯାଓୟା-ଶ୍ରୀରେ ଲୋକଟା ବୋଧ୍ୟ ଏକଇ ବରମରେ ।

ପାଡେ ନୌକୋ ଏସେ ଭିଡ଼ିତେଇ ଛଢିଯେ ପଡ଼ିଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକଟା ଭିଡ଼ ଜମେ ଗେଲ ନୌକୋଟାର ସାମନେ । ସବାଇ ଏକେ ଏକେ ପୟସା ଦିଯେ ନେମେ ଗେଲେ ଅନି ମାରିଟାକେ ପୟସା ଦିତେ ଗେଲ । ସେ ଘାଡ଼ ନେଡ଼ ବଲଲ, ‘ନା, ଆପନେର ଭାଡା ଲାଗବେ ନା ।’

ପାଡେ ଦାଢ଼ିଯେ ଦୁଲାହ ଦାଁଡାନୋ ମାରିକେ ମେ ବଲଲ, ‘କେନ !’

ମାରି ହାସଲ, ‘ଆପନି ଯା କରଛେ ତା କ’ଜନା କରେ !’

କିଛିତେଇ ପୟସା ନିଲ ନା ସେ ! ଅନେକଗୁଲୋ ବିଶ୍ଵିତ ମୁଖେ ସାମନେ ଦିଯେ ଅନି ଓପରେ ଉଠେ ଏଲ । ସାରା ସାର ବାସ ଦାଢ଼ିଯେ । ଜାୟଗାଗୁଲୋର ନାମ ମାଥାର ଓପର ଲେଖା-ଲେଖାପାଦା-ଆଲିପୁରଦ୍ୟ-କୁଚବିହାର-ନାଧୁର୍ଯ୍ୟ-ଫାଲାକଟା । ଏହିସବ ଚେନା ବାସଗୁଲୋକେ ଦେଖତେ ପେଯେ ଓର ଖୁବ ଥିଦେ ପେଯେ ଗେଲ । ଖାବାରେ ଦୋକାନ ବୁଝାତେ ଗିଯେବାନେ ମହିଳା ଆର

গোলালু একটা মিষ্টির দোকানে বসে আছেন। হাসিমুখে ওঁদের কাছে যেতেই অনি দেখল মহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। একটা চেয়ার খালি ছিল, অনি সেটা ধরতেই তিনি চিন্তকার করে উঠলেন, ‘বসো, না, বসো না, খবরদার, ছোঁয়া লেগে যাবে!’ হ্যাঁ হয়ে গেল অনি। মহিলা স্বামীকে বললেন, ‘ওকে এখান তেকে যেতে বলে দাও। সংক্রামক রোগ, অলরেডি ওর ভেতরে এসে গিয়েছে কি না কে জানে?’

অদ্যমহিলার দিকে আড়তোখে দেখে নিয়ে ওর স্বামী অনিকে বললেন, তুমি বরং কার্বলিক সোপ দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিও। হিরোর সব মানুষের কাছে সমান নয় ভাই। উইশ ইউ শুড লাক।’

ভীষণ কাল্পা পেয়ে গেল অনির। কোনোরকমে ফ্রান্ট দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। খাবার ইচ্ছেটা এখন একদম চলে গেছে। এসব রোগ কি সংক্রামক? তার ভেতরে কি চলে আসতে পারে? এখানে কার্বলিক সোপ সে কোথায় পাবে। চারিদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাকের কাছে সে দেখল তার ওপর আলিপুরদুয়ার লেখা, বাসটা এখনই ছাড়বে। স্বর্গহেড়ার ওপর দিয়ে একে যেতে হবে।

প্রায় অক্ষের মতন সে বাসে উঠে বসল। এখান থেকে মিষ্টির দোকানটা দেখা যাচ্ছে। জানলার পাশের সিটে বসে অনি দেখল ওদের টেবিলে বড় বড় রাজভোগ এসে গিয়েছে। আজ অবধি কেউ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি। সে কি জানত লোকটার খারাপ অসুখ আছে? একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে দেখে তার বুকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার হল যে সে ঠিক থাকতে পারেনি। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, মারিউলো তো নির্বিধায় লোকটাকে টেনে তুলেছিল। ওরা কি কার্বলিক সোপে হাত ধোবে? ওদের মনে যদি কোনো চিন্তা না এসে থাকে সে এত ভাবছে কেন? মহিলা নিচয় ভুল বুঝেছেন অথবা তিনি মোটেই আধুনিক নন। সংক্ষার না থাকার নামই নাকি আধুনিক হওয়া, আমেরিকানদে মতো—মাটু প্রাপ্তই বলে। ওর মনে পড়ল মাঝি ৬কে বলেছে আপনি যা করেছেন তা কঁজনে পারে? অস্তু একটা শাপ্তি একটু একটু করে ফিরে আসছিল অনির।

এই সময় ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল দুবার হৰ্ণ বাজিয়ে। সামান্য লোক হয়েছে গাড়িতে। কন্ট্রাটর দরজা বন্ধ করে চ্যালান, ‘ময়নাটডি, ধৃপণ্ডি, স্বর্গহেড়া, সীরপাড়া—আলিপুরদুয়ার’ আর বাসটা এবার নড়তেই হঠাৎ অনি লক্ষ করল কী—একটা ছুটে আসছে তার দিকে। কিছু বুঝে গঠার আগেই সেই কালোমতন জিসিস্টা চটাং করে এসে লাগল জানলার ওপরে। একটা কানার তাল খুলে থাকল জানলায়। একটু নিচু হলেই সেটা গলে অনির মুখে এসে লাগলত। বিশ্বিত, হতভাঙ্গ অনি সমস্ত শরীরে বাঁপুনি নিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটা লোক ওকে দেখে চ্যাচচে, কেন বাঁচালি, মরতে চেয়েছিলাম তো তোর বাপের কী, শালা! কেন বাঁচালি? সেই আধ্যাত্মা শরীরটা নৌকোর ওপর থেকে এসে ভেজা কাপড়ে হিস্ত হয়ে লাকাচ্ছে আর নাকিস্বরে অনির দিকে তাকিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে। ও কী করে টের পেল যে অনি দাঁচিয়েছে: নিচয়ই কেউ বলে দিয়েছে। অনির বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল, চোখের সামনে জলের আড়াল। ও তাড়াতাড়ি কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিল। বাপসা হয়ে গেলে সব মানুষকে সমান দেখায়।

বাবার অসুখের খবর পেয়ে ঝোর করে দানু তাকে পাঠালেন কিন্তু ধূপগড়ি না পেরনো পর্যন্ত সেকথা খুব-একটা মনে পড়েনি অনির। ডুড়য়া নদী ছাড়িয়ে রাস্তাটা বাক নিতে যেই স্বর্গহেড়া চা-বাগানের গাছগুলো চোখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একা উভেজন হড়যুড় করে ঢুকে পড়ল। কদিন বাদে সে আবার এইসব গাছগাছালি, ডানদিকের মদসিয়া কুলিদের ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে একটাও পরিচিত মুখ দেখল না ও। যদিও স্বর্গহেড়ার বাজার এখান থেকে মাইল দূরেক, তবু কেউ-কেউ তো এদিকে আসতেও পাবে। তারপর সেই বিরাট শালের মাঝখানে কাজ-করা ফুলের মতো চা-বাগানের মধ্যখানে মাথা—তোলা ফ্যাট্রি—বাড়িটা চোখে পড়ল তক্ষুনি ওর বুকটা কেঁপে উঠল। বাবার খুব অসুব, ওই ফ্যাট্রির বাবা নিচয়ই কাজ করতে যেতে পারছেন না। চা-বাগানের শেষে বাঁদিকে বাবুদের কোয়ার্টার, দু-দুটো চাঁপাগাছ বুকে নিয়ে নিয়ে বিরাট খেলার মাঠ চুপচাপ পড়ে আছে। অনি চিন্তকার করে বাস থামাল।

মাটিতে নামতেই ইউক্যালিপটাস গাছের শরীর-ছোঁয়া বাতাসটাকে নাক ভরে টেনে নিয়ে ও চারপাশে তাকাল। কোয়ার্টারগুলোর দরজা বন্ধ। রাস্তার এপাশে মাড়োয়ারিদের দোকানের সামনে একজন পশ্চিমগোছের লোক উন্ম হয়ে বসে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হতে দাত বের করে হাসল, অনি তাকে চিনতে পারল না। ক্লাবঘর তালাবন্ধ, অনি বাবান্দায় উঠে এসে দরজার কঢ়া নাড়ল।

ডানদিকের খিড়কিদরজা খুলে বাগান দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ এই সদরের

বৰ্ক দৱজাৰ সামনে দাঁড়িয়ে ওৱ মনটা কেমন হয়ে গেল। এখন এ – বাড়িতে মা নেই। এই বারান্দা, এ-বাড়িৰ ঘৰ উঠোন যে-কোনো জায়গায় ও মাকে কল্পনা কৰতে পাৰে। মা মাৰা গেছেন জেনেও মাজে মাৰে নিজেৰ সঙ্গে খেলা কৰে ভাৰত মা স্বৰ্গছেড়ায় আছে, গেলৈ দেখা হবে। এখন এই সত্যটাৰ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অন্তুল কষ্ট হচ্ছিল ওৱ। মায়েৰ কথা ভাৰতে বাৰাকে মনে পড়ে যেতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল অনি। বাৰার কী হয়েছে? দাদু কেন জোৱ কৰে ওকে স্বৰ্গছেড়ায় পাঠালেন? হঠাৎ অনি কুইকুই শব্দ গেয়ে পেছন ফিৰে তাকাতেই দেখতে পেল একটা কালো রঞ্জেৰ ঘৰয়ো নেভিকুৰুৰ চাই পা মুড়ে মাটিতে বসে ওৱ দিকে কেমন আদুৰে চোখে তাকিয়ে শব্দ কৰছে। কুকুরটাকে চিনতে পাৱল ও, মা এঁটো ভাত দিতেন, কালু বলে ডাকতেন, আৱ একদম পছন্দ কৰতেন না পিসিমা কুকুরটাকে। আচৰ্য, ও কী কৰে অনিকে চিনতে পাৱল। আৱ-একবাৰ কড়া নাড়তেই ভেতৱে খিল খোলাৰ শব্দ হল। দৱজাৰ কপাট খুলে যেতে অনি দেখল ছোটমা দাঁড়িয়ে আছে।

‘ওমা, তুমি। কী চমকে দিয়েছ, আমি ভাবলাম কে না কে।’ সত্যিই বাৰাক হয়ে গেছে ছোটমা, হাত বাড়িয়ে অনিৰ ব্যাগটা নিয়ে কাছাকাছি হতেই আৰাব বলল, ‘আৱে, তুমি যে দেখছি আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছ মাথায়।’

অনি এখন চট কৰে কথা বলতে পাৱছিল না। অনেক ছোটমা জলপাইগুড়ি যায়নি। মহীতোষ একা গেছেন মাসখানেক আগে। কিন্তু একটা মানুষৰে চেহাৰা যে এই সামান্য কয়েক মাসেৰ ব্যবধানে এত খাৰাপ হতে পাৱে ছোটমাকে না দেখলে বোৰা যাবে না। কী রোগা হয়ে গেছে শৰীৰটা! দেখে মনে হয় ছোটমাৰই খুব কঠিন অসুখ হয়েছে। কিন্তু গলাৰ ওপৰ অতৰানি কাটা দাগ কেন? অনি সেদিকে তাকিয়ে বল, ‘তুমি পড়ে গিয়েছিলে?’

‘না তো!’ বলেই ছোটমা প্ৰশ্নটা বুৰাতে পাৱল, ‘ও হাঁ, খোঁচা লেগেছিল একবাৰ। তা তুমি হঠাৎ কৰে এলে যে, ঝুল কি ছুটি?’

‘না, ছুটি না। দাদু জোৱ কৰে পাঠালেন, বাৰার নাকি খুব অসুখ, কী হয়েছে?’ অনি ছোটমাৰ পেছনে পেছনে ভেতৱে চুকে দৱজা বৰ্ক কৰে দিল।

ওদেৱ বাইৱেৰ ঘৰটা সেইৱকমই রায়ে গেছে। এমনকি দু-দুটো সোফাৰ ওপৱে যে কভাৱ ছিল সেগুলো অৰবি একইৱকম আছে, ছিড়ে যায়নি। ছোটমা বলল, ‘অসুখ মানে? বাৰাকে কে খৰ দিল?’ ছোটমা ঘুৱে ওৱ দিকে তাকাল।

‘জানি না। কাল বোধহয় কেউ দাদুকে বলেছে। কিন্তু বাড়ি আসাৰ সময় একটা রিকশাৰ সঙ্গে অ্যারিঙ্গডেটে দাদুৰ পা ভেড়ে গেছে, আজ প্লাষ্টিৰ কৰে হাসপাতাল থেকে আসবে।’ অনি খৰৱটা দিল।

‘ও মা! কী কৰে হল? এখন কেমন আছেন?’

‘ভালো।’

‘কিন্তু ওঁ এই অবস্থায় তুমি চলে এলে কেন?’

‘কী কৰব! দাদু যে জোৱ কৰে আমাকে পাঠালেন, কোনো কথা শুনতে চাইলেন না। বাৰা কোন ঘৱে? এখন কেমন আছেন?’

‘খুব আস্তে ছোটমা বলবেন, ‘এখন ভালো আছেন, ফ্যাট্টিৱিতে গিয়েছেন।’

অবাক হয়ে গেল অনি, ‘সে কী! তা হলে কাল যে দাদু খৰ পেলেন বাৰা খুব অসুখ! দাদু লোকেৰ কথায় চট কৰে বিশ্বাস কৰেন।’ অনিৰ মনে হল ছোটমা খুব কষ্ট কৰে হাসতে চেষ্টা কৱল।

মাৰোৰ ঘৱে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। কোনো জানলা খোলা নেই, যাপো-আসাৰ দৱজাৰ ভাৱী পৰ্ণা বোলানো। প্ৰায়স্কৰাৰ ঘৱে এক কোনয়া টেবিলৰ ওপৰ প্ৰদীপ জৰুৰ। সেই প্ৰদীপৰে আলোয় অনি দেখতে পেল মাধুৰী খুব গভীৰমুখে তাকিয়ে আছেন। বেশ বড় ফ্ৰেমেৰ চৌহণ্ডিতে মাধুৰীৰ একটা অচেনা ছবি এনলার্জড কৰে ধৰে রাখা হয়েছে। যেহেতু ঘৱেৰ ভেতৱে আলো আসাৰ রাস্তা নেই তাই ছবিৰ ওপৰ পড়া প্ৰদীপৰে আলোটা অন্তুভাৱে চোখ কেড়ে নেয়। অনিৰ মনে হল মাকে যেন দেবদৰীৰ মতো লাগছে, এ-বাড়িৰ সবাই এখনে এসে পূজা কৰে যায়। কিন্তু এই বৰ্ক ঘৱে কিছুক্ষণ থাকলে দয় বৰ্ক হয়ে যাবে। একটা চাপা অৰস্তি সমষ্ট শৰীৰে ছাড়িয়ে পড়ল। খুখ ঘুৱিয়ে ছোটমাৰ দিকে তাকাতেই দেখল ছোটমা একদৃষ্টি ওৱ দিকে তাকিয়ে আছে। খুব দ্রুত অনি বলল, ‘জানলা বৰ্ক কৰে মেখেছ কেন, খুলে দাও?’

সঙ্গে সঙ্গে ছোটমা চমকে উঠল, ‘না না, এ-ঘরের জানলা কোলা বারণ। চলো, ভেতরে যাই।’ ছোটমা আমার দাঁড়িল না। অনি দেখল ঘরের ভেতর ঠিক ছবির সামনে একটা খাট পাতা। ঘরটা থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে ছবিটার দিকে আর-একবার তাকিয়ে ওর মনে হল মা যখন খুব গঞ্জির হয়ে যেতেন অথবা কোনো কারণে যখন মায়ের মন-খারাপ হয়ে যেত তখন এইরকম দেখত।

ভেতরের ঘরে যেখানে অনিরা শুত সেখানে একটা ছোট ছোট খাট আর তার চারাপাশের কাপড়চোপড় দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে এটা ছোটমার ঘর, ছোটমা একই শোয় এখানে।

ছোটমা বলল, ‘আগে একটু জিরিয়ে নাও, আমি তোমার জন্য খবর করি।’

অনি বলল, ‘বাড়িকাকু কোথায়?’

ছোটমা মেন সামান্য ঝর্ণুটি করল, ‘তুমি জান না?’

অনি ঘাড় নাড়ল। ছোটমা মুখ নিচু করে বলল, ‘তোমার বাবার সঙ্গে তর্ক করেছিল বলে উনি তাড়িয়ে দিয়েছেন। তা আমার অসুবিধে হচ্ছে না কিছু, একা মানুষ সারাদিন বসে থাকতাম, এখন কাজ করতে করতে বেশ দিনটা কেটে যায়।’ ছোটমা উঠোনে পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে অনির মনে হল ও যেন একদম অচেনা কোনো পরিবেশে চলে এসেছে।

জুতো খুলে খালিপায়ে অনি উঠোনে এসে দাঁড়াল। বাড়িকাকুকে বাবা ছাড়িয়ে দিয়েছেন? পিসিমা বলতেন, বাড়িকাকু এ-বাড়িতে এসে বাবাকে কোলে পিঠে করেছেন, কাকুকে তো মানুষ করেছেন বলা যায়। ইদোবৰি অনির মনে হত ও সবকিছু বুঝতে পারে, ও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন এই কাঠালগাছ আর তালগাছের দিকে তাকিয়ে ও কিছুতেই বুঝতে পারল না যে বাবা কী করে বাড়িকাকুকে ছাড়িয়ে দেন!

বাড়ির ভেতর যে-বাগানটা ছিল সেটা অপরিক্ষার হয়ে গেছে। অনি তারের দরজা ঠেলে পেছনে এল। গোলাঘরের আশেপাশে বেশ জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। সেদিকে এগোতেই খুব দ্রুত হাথা হাথা ডাক শুনতে পেল অনি। গলাটা ধরা-ধরা, কিন্তু অনি চিনতে পারল। কাছাকাছি হতে ও একটা অস্তুত দৃশ্য দেখতে পেল। গোলাঘরের কাছে বিচুলির স্তুপের পাশে কালীগাইকে বেংধে রাখা হয়েছিল। অনিকে দেখে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এখন ওর অনেক বয়স, শরীর হাঙ্গিজরিজিয়ে হয়ে গেছে, ফলে বেচারার গলায় দড়ির চাপ লাগায় চোখ বড়-বড় হয়ে যাচ্ছে। অনি দৌড়ে ওর পাশে যেতে গরুটা একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর খুব অভিমানী মেয়ের মতো যাথা নিচু করে কোঁসফোস শব্দ করতে লাগল। অনি ঘাড়ে হাত রাখতেই কালী ওর লম্বা গলাটা চট করে তুলে যেন অনিকে জড়িয়ে ধরতে কোমরের কাছে ধ্যতে লাগল। সেই কোঁসফোস শব্দটা সমানে চলছে। অনি শব্দটার মানে বুঝতে পারছিল। বেচারার প্রচুর বয়স হয়েছে। এখন নিশ্চয়ই আর দুধ দেয় না। মা ওকে এইটুকুনি কিনে এনেছিল। তারপর ওর নাতিপুতি বিরাট বংশে গোয়ালঘর ভরতি হয়ে গেল। হঠাৎ অনির খেয়াল হল, আর-কোনো গোরুকে দেখতে পাচ্ছে না তো! কালীর আদরের চোটে যখন অঙ্গুর তখন অনি ছোটমার গলা শুনতে পেল, ‘তোমাকে দেখে ওর খুব আনন্দ হয়েছে, না?’

অনি দেখল ছোটমা তাদের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কালী ওকে সরতে দিচ্ছে না, ওর গলায় হাত বেলাতে বেলাতে অনি বলল, ‘আর গোরুকে কোথায়?’

ছোটমা বলল, ‘বাড়ি চলে যাওয়ার পর তোমার বাবা রাগ করে সবকটাকে বিক্রি করে দিলেন।’

অনি অবাক হয়ে বলল, ‘বিক্রি করে দিলেন?’

ছোটবা হাসল, ‘দিদি খুব যত্ন করত, আমি পারি না, তাই। বাড়ি ধাক্কে ও-ই করত সব। তা যেদিন সবগুলোকে নিয়ে হাতে চলে যাবে সেদিন এই গরুটার কী কান্না! ঠিক বুঝতে পেরেছিল এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এখন তো আর দুধ দেয় না বেচারা, গায়ে জোরও নেই যে চায করবে, বোধহয় কেটেই ফেলত ওকে। এমনভাবে কাঁদতে আমার দিকে তাকাল যে আমি পারলাম না। তোমার বাবাকে অনেক বলেকয়ে ওকে রেখে দিলাম। বেশিদিন আর বাঁচবে না।’

হঠাৎ অনি আবিষ্কার করল কালীগাই-এর গলায় আদর করতে করতে কখন ওর দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। ছোটমা সেই সময় ডাকল, ‘এসো, হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নাও। সেই কোন সাতসকালে বেরিয়েছে।’

ছোটমার হাতের রান্না ভালো, তরকারিটা খেতে-খেতে অনির মনে হল। একটু ঝাল-ঝাল, কিন্তু বেশ সুস্থাদু। লুটি ওর খুব খিয় জিনিস, ফুলকো হলে কথাই নেই। ঠিক এই সময় অনি শুনতে পেল বাইরের ঘরের দরজায় কে যেন খুব জোরে জোরে শব্দ করছে খেতে-খেতে ও উঠতে যাবে, ছোটমা রান্নাঘর থেকে ছুটে এল, ‘তৃষ্ণি খাও, আমি দেখছি।’

ভেতরের বারান্দায় জলখাবার খাবার চল এ-বাড়িতে এখনও আছে। টুলমোড়াগুলো পালটায়নি। খেতে-খেতে অনি পিসিমার পেয়ারাগাছটা তার সব ডালপালা যেন নামিয়ে দিয়েছে, বেশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা পেয়ারা হয়েছে গাছটায়। এই সময় বইরের ঘরে বেশ জোরে একটা ধমক শুনতে পেল অনি, ‘কোথায় আড়া মারা হচ্ছিল, য়াঁ? আধঘষটা ধরে ডাকছি, দরজা খোলা নাম নেই।’ ছোটমা বোধহয় কিছু বলতেই চিক্কারটা জোরদার হল, ‘কেন, আস্তে বলব কেন? বিয়ের সৱৰ তোমার বাপ তো বলে দেয়নি তোমার কান খারাপ।’

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, অনি উঠে দাঁড়াল। গলাট নিচে নেমে আসতে ও স্পষ্ট চিনতে পারল। আর চিনতে পেরেই হতভুর হয়ে গেল। মহীতোষকে এ-গলায় কোনদিন কথা বলতে শোনেনি অনি। আজ অবধি বাবাকে কারও সঙ্গে বাগড়া করতে দেখেনি পর্যন্ত। মাঝের সঙ্গে যখন ঠাট্টা করতেন তখন বাবার গজদাঁত দেখা যেত। ও কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। এমনকি বাবা যখন জলপাইগুড়ি যান তখনও তো এ-ধরনের কথা বলেন না। যেয়েদের এ-বাড়িতে কেউ বকেছে এমন গলাস, মনে করতে পারছিল না অনি। তা ছাড়া, ওর যেজন্য আসা, বাবার এই গলা শনে কিছুতেই মনে হচ্ছে না যে তাঁর কোনো অসুব করেছে।

‘ধূপ জ্বলছে না কেন, ধূপ?’ আবার চিক্কার ভেসে এল, এবার কাছে। বোধহয় বাবা এখন মাঝের ঘরে চলে এসেছেন। তবে স্বরটা কেমন কাঁপা-কাঁপা, সুস্থ নয়।

ছোটমার গলা শুনতে পেল ও, ‘নিবে শেছে।’

‘য়াই!’ গর্জনটা অস্তুতভাবে গোড়াল যেন, ‘সারাদিন খ্যাটন মারছ, একটা কাজ বললে পাওয়া যাবে না, নাঁ?’

‘আঁ! আস্তে কথা বলো।’ ছোটমা যেন ধমকে উঠলেন।

‘ও বাবা, আবার গলায় তেজ হয়েছে দেখছি। ঝোড়ে বিষ নামিয়ে দেব?’

জবাবে ছোটমা বলল, ‘অনিমেষ এসেছে।’

প্রথমে বোধহয় বুরতে পারেননি বাবা, ‘কে এসেছে? আবার কে জ্বল?’

ছোটমা বলল, ‘অনিমেষ-অনি।’

এবার চটপট বাবার কেমন-হয়ে-যাওয়া গলাটা কানে এল, ‘অনি! অনি এসেছে! কোথায়?’

‘ভেতরে, খাজে।’ খুব লিলিঙ্গ ছোটমার গলা।

‘তৃষ্ণি আনালো?’

‘না, বাবা পাঠিয়েছেন তোমাকে দেখতে। অসুখের ব্বর পেয়েছেন কার মুখে। কাল বাবারও পা ভেঙেছে।’

‘সে কী! কী করে?’

‘রিকশার ধাক্কা লেগে। আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। তবু ছেলেকে পাঠিয়েছেন তোমায় দেখতে, আর তৃষ্ণি-।’ কেমন ধরা-ধরা লাগল ছোটমাৰ গলা।

‘য়াই, আগে বলিনি কেন যে ও এসেছে? ছেলেকে দেখাতে চাও, নাঁ? প্রতিশোধ নিতে চাও, নাঁ?’

‘তৃষ্ণি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দাওনি। রোজ রোজ তৃষ্ণি যা কর, আমি আব পারি না-।’ এবার যেন কেঁদে ফেলল ছোটমা।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলে উঠলেন, ‘য়াই চুপ! খবরদার এ-ঘরে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণি কাঁদবে না। ছেলেকে শোনাছ বুরতে পারছি। খবরদার, কোনো নালিশ করবে না।’

ছোটমা বলল, ‘চমৎকার! তোমার নামে আমি ঐটুকু ছেলের কাছে নালিশ করব? গলায় দড়ি ঝোটে না তার চেয়ে।’

বাবা বললেন, ‘গুড়। তা সে কোথায়? অনেকদিন পরে এল, না?’

অনির খুব লজ্জা করছিল। বাবার গলা তার আসার খবর পেয়ে অভূতভাবে যে পালটে গেল এটা টের পেয়ে লজ্জাটা যেন আর বেড়ে গেল। মা বেঁচে থাকলে বাবা কি করবো এরকমভাবে কথা বলতে পারত? বাবার গলা ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসছে। ওর ইহু করছিল দৌড়ে এখান তেকে চলে যায়, বাবার সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা না হলেই যেন ভালো হয়।

মহীতোষ এলেন। খুব শব্দ করে। খুতো মশমশিয়ে। বারান্দায় পা দিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। এই কয় মাসে লাউডগার মতো ঢড়চড় করে বেড়ে গেছে শরীরটা, মাথায় মহীতোষকে ধরতে আর দেরি নাই। নিজের ছেলেকে এখন হঠাতে লোক-লোক বলে মনে হল মহীতোষের। চোখাচোর হতেই গলা ঝাড়লেন ষষ্ঠীতোষ, ‘কখন এলে?’

বাবার চেহারাটা এরকম হয়ে গেল কী করে? কেমন রোগা-রোগা, চোখের তলায় কারি, গাল ভাঙা, মাথার চুল লালচে-লালচে-মাখে-মাখে চিকচিক করছে। অসুবিটা কী! মহীতোষ বললেন, ‘কুল বদ্ধ?’

‘না। অসুবির খবর শনে দাদু জোর করে পাঠালেন।’

‘অসুবি? কার অসুবি? আরে না না, কে এসব বাজে কথা বলায়! আমি ভালো আছি। কুল যখন খেলা তখন তোমার আসা উচিত হয়নি। তোমার মা থাকলে রাগ করতেন। তোমার এখন ফার্ট ডিউটি অধ্যয়ন! তোমার মায়ের ঘরে গিয়েছে’ মহীতোষ চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

অনির হঠাতে মনে হল বাবা ঠিক স্বাভাবিকভাবে কথা বলছেন না। কথাগুলো যেন অসংলগ্ন এবং সেটা তিনি নিজেও টের পাচ্ছেন। মাঝের ঘর মাঝে? ঘে-ঘরে মাঝের ছবি আছে সেই ঘর? ও না-বুঝে ঘাড় নাড়ল।

মহীতোষ বললেন, ‘গুড়। ঘ-ঘরে শিয়ে চুপচাপ করে বসে থাকলে দেখবে, ইউ ক্যান ফিল হার।’ অনি লক্ষ করল কথাটা বলার সময় বাবার চোখ কেমন জুলজুল করে উঠল। ওর মনে পড়ল ছেটমা খবর দেওয়া সন্তোষে বাবা দাদুর অ্যাঞ্জিলেটের কথা বলেছেন না কিছু। ও ঠিক করল, না বললে সেও কিছু জানাবে না। কারণ ওর মনে হল বাবার মাথায় এখন অন্য কোনো চিন্তা রয়েছে, দাদুর কথাটা একদম ভুলে গিয়েছেন।

ছেটমাকে রান্নাঘর থেকে জলখাবার নিয়ে বের হতে দেখে বাবা হঠাতে সুরে দাঁড়ারেন, ‘আচ্ছা, তুমি তা হলে আজকের দিনটা থাক অনি। কুল কামাই করা ঠিক নয়। দাদুর ওখানে তোমাকে রেখেছি-হ্যাঁ, দাদুর নাকি পা ডেঙে গেছে, রিকশার সঙ্গে থাকা লেগো?’

অনি ঘাড় নাড়ল, ‘কাল বিকেলে হয়েছে, হাসপাতালে ছিলেন। আজ প্লাষ্টার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।’

এবার যেন মহীতোষের কানে-শোনা চেহারাটাকেই সামনাসামনি দেখতে পেল অনি, ‘অ্যা�়! দাদুকে হাসপাতালে রেখে তুমি চলে এসেছ? আশ্চর্য অকৃতজ্ঞ ছেলে। মেখাপড়া শিখে তুমি বাঁদর তৈরি হচ্ছ? যে তোমাকে বুকে আগালে রেখেছে তার প্রতি কর্তব্য বলে কিছু নেই? ছি ছি ছি!’

জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে এসব শব্দ দিয়ে তৈরি কড়া বাক্য শোনাল। অনি বাবার দিকে তাকিয়ে হঠাতে সমস্ত শরীরে একটা আলোড়ন অসুবিত করল। তারপর কোনোরকমে বলল, ‘আমি আসতে চাইনি, দাদু জোর করে পাঠালেন।’ এখন অনির আর কান্না পাছিল না, এত শক্ত কথা শনেও ওর ভেতরে কোনো অভিযান হচ্ছিল না। বরং ও খুব শক্ত হয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়াল।

‘তুমি আসতে চাওনি, গুড় গুড়। তা এই প্রথম বাপ-মায়ের কথা মনে পড়ল? গিয়েছ তো অনেকদিন, আমরা এখানে আছি মৌজ রেখেছ! “আমি আসতে চাইনি”-তা তো বরবেই! মহীতোষ কেমন ঠাণ্টা অর্থচ রাগরাগ গলায় বললেন। এর জবাব কী দেবে অনি? মা থাকতে বাবা তাকে আনতে চাননি। এখন এলেও দোষ, না-এলেও দোষ। অনি কোনো কথা বলছে না দেখে মহীতোষ ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর দুপা এগিয়ে অনির কাঁধে হাত রাখলেন, ‘রাগ কোরো না, একটু বুবাতে শেখো। তোমার মা তো তোমার জন্যই মারা গেলেন।’

চমকে উঠল অনি, ‘আমার জন্যা?’

ঘাড় নাড়লেন মহীতোষ, হ্যাঁ। তোমার জেলে যাবার ভবিষ্যদ্বাণীটা শোনার পর থেকেই ছেটফট

করছিল। না হলে বৃষ্টির মধ্যে কেউ এই অবস্থায় ছাদে আসে! আমিও দোষী, বুবলি অনি, আমি যদি তখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতাম—। ওর চলে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই দায়ী।’

ঠাণ্ড ছোটমার গলা মহীতোমের যেন বাধা দিল, ‘অনেক হয়েছে, ছেলেটা এল আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে পড়লে। ওকে ছেড়ে দাও।’ বৃষ্টির থালাটা টেবিলের ওপর রাখল ছোটমা।

মহীতোম ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার মা আমার সঙ্গে এভাবে কোনোদিন কথা বলেনি।’

অনি কোনোদিন উত্তর দিল না। বাবার দিকে না তাকিয়ে আস্তে-আস্তে উঠেনে নিয়ে এল। এই মুহর্তে ও বাবাকে যেন সহ্য করতে পারছিল না।

বাইরের খোলা মাঠে একবাশ ছাগল গলায় ঘটিত বেঁধে টুঁটে শব্দ করে ঘূরে বেড়াচ্ছে। অনি আজন্মের মতো সেখানে এসে দোড়াল। এখন মনে হচ্ছে এই বাড়িতে ওর কোনো জোর নেই। নিজের বাড়ি বলে ও আর ভাবতে পারছে না। এখন যদি জলপাইগুড়িতে চলে যেতে পারত! ও ঠিক করল বিকেলের বাসে ফিরে পাবে। বাবা কী করে বদলে গেলেন! বাবার এই চেহারাটা জলপাইগুড়িতে ওরা কেউ টের পায়নি।

সামনের আসাম রোড দিয়ে হশহশ করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। একবাশ মদেসিয়া যেয়ে পিঠে টুকরি বেঁধে চা-পাতি নিয়ে ফ্যাট্টির দিকে ফিরে যাচ্ছে। অনি কোয়ার্টারগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মাথার ওপর ঠা-ঠা রোদ এখন। বিশ বা বাঁপীরা এখন নিশ্চয়ই স্কুলে। সীতাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে অনি উন্নতে পেল কেউ তার নাম ধরে ভাকছে। ও দেখল বাড়ির জানালায় সীতার ঠাকুমা বসে আছেন। ওকে তাকাতে দেখে ঠাকুমা রোজ বিকেলে ওদের বাড়িতে পিসিমার কাছে বেড়াতে লাগল। অনি যখন এখনে থাকত তখন ঠাকুমা রোজ বিকেলে ওদের বাড়িতে পিসিমার কাছে বেড়াতে আসতেন। ঠাকুমার কাছে ওরা কত মজার গঢ় শুনেছে।

গেট খুলে বাগান পেরিয়ে বাঁচান্দায় উঠল অনি সীতাদের কোয়ার্টারটা একই রকম আছে, চোখ বন্ধ করে ও যোরাফেরা করতে পাবে। বাঁদিকের ঘরে ঠাকুমা বসে আছেন। ওকে দেখেই ফোকলা দাঁতে বলে উঠলেন, ‘আয় দাদু, কাছে এসে বোস, কখন এলি?’

ঠাকুমার চেহারা একই রকম আছে। বিছানার ওপর ছড়ানো পা দুটো দেখল অনি, বেশ ফোলা-ফোলা। ‘চোখে বড় কম দেখি আজকাল, তাই তাবলাম সত্যি দেখছি তো! কী লো হয়ে গেছিস দাদু, আয় কাছে এসে বোস।’

হাত বাড়িয়ে বিছানার একটা ধার দেখিয়ে দিতে অনি সেখানে বসল, ‘কেমন আছ ঠাকুমা?’

‘ওমা, গল্পর দ্বর দ্বার, একদম ব্যাটাছেলে-ব্যাটাছেলে লাগছে। তা হ্যাঁ দাদু, এখান থেকে চলে গিয়ে আমাদের এমন করে ভুলে যেতে হয়?’ ঠাকুমা তাঁর শির-বার-করা হাত অনির গায়ে বোলাতে লাগলেন।

মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছিল অনির, আস্তে-আস্তে বলল, ‘তুমি একইরকম আছ।’

‘সে কী! দুরকম হতে যাব কেন? কিন্তু আজকাল একদম হাঁটতে পারি না রে, বাতে পেড়ে ফেলেছে, পা দুটো দ্বার, কলাগাছ। কবে মে ছাই যেমের ঝুঁটি হবে! সে-বেটি তো স্বার্থপরের মতো কলা দেখিয়ে চলে গেছে।’ ঠাকুমার শেষ কথাটা শুনে অনি ওর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি কেদে ফেললেন, ‘গৃহপ্রবেশে যাবার আগে আমায় বলে গেল তোমার ওপর সব দায়িত্ব, এবার দিদি নেই। তা আমি বসে আটখানা কাঁথা সেলাই করে রেখেছিলাম, মাধুর বড় ইচ্ছে ছিল যেয়ে হোক এবার।’ ডুকবে-ওঁ কানাটাকে কোনোরকমে সামলে আবার বললেন, ‘তা সেসব কাঁথা আমার কাছে পড়েই রাইল। মহীকে এত করে জিজ্ঞাসা করলাম, বাঁচাতে পারলি না কেন? জবাব দেয় না।’

মায়ের কথা ঠাকুমা এভাবে বলবেন অদ্ভুত করতে পারেনি অনি। এসব কথা শুনেও ওর কান্না পাছে না কেন আজ? ঠাণ্ড ঠাকুমা গলা নামিয়ে যেন কোনো গোপন কথা বলছেন এই ভঙ্গিতে বললেন, ‘তোর সংযোগ বড় ভালো যেয়ে রে! এত লোককে দেখলাম, যেয়ে দেখলে আমি চিনতে পারব না? বেশ যেয়ে, কিন্তু বড় দুঃখি। তুই ওকে কষ্ট দিস না ভাই।’

হাসতে চেষ্টা করল অনি, ‘কী যা-তা বলছ! আমি কষ্ট দিতে যাব কেন?’

ঠাকুমা যেন কী বলতে গিয়ে বললেন না। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, ‘তোর দাদু

কেমন আছে রেঁ?’

‘আমি দানুর ঝবরটা দিতেই মাথা নাড়তে লাগলেন, বুড়ি, ‘এই বয়সে পা ভাঙ্গলে কি আর জোড়া লাগে। দেখেনে তো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়। তা হ্যাঁ দানু, তেনার পা সেরে গেলে শিগুগির একবার নিয়ে আসতে পারবি?’

‘কেন?’

‘দৱকার আছে ভাই। নইলে যে সব ভেসে যাবে। আমি তো বিছানা থেকে উঠতে পারি না, আমার কথা কে শোনে। কিন্তু আমার কানে তো সবই আসে। দানুভাই, আমাদের সবাইকে ভগবান নিজের নিজের জয়গায় থাকতে দিয়েছেন, আমরা যদি বাঢ়াবাড়িক রিত তবে তিনি সইবেন কেন? তা তুই কিন্তু মনে করে তেনাকে বলিস।’

ব্যাপারটা কেমন অশ্পষ্ট অথচ কিছু-একটার ইঙ্গিত পাছে অনি। ও জানে ঠাকুমাকে, এ-বিষয়ে বেশি প্রশ্ন করে লাভ হবে না।’

ঠাকুমা হঠাৎ চিন্তকার তরু করবেন, ‘ও বউমা, দ্যাখো কে এসেছে! তোমার বন্ধুর ছেলে গো।’

সাধারণত চা-বাগানের এইসব কোয়ার্টারের রান্নাঘর একটু দূরে, উঠোন পেরিয়েই বেশি ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখান থেকে মহিলাকষ্টে সাড়া এল।

অনি বলল, ‘সীতা কোথায়? খুলো?’

‘সে—মুখপত্তি গলা খুলিয়ে বিছানায় কাত হয়ে আছে। যা না, পাশের ঘরে গিয়ে দ্যাখ-না, দুদিনের জুলে কী চেহারা হয়েছে।

অনি উঠে পাশের ঘরের দরজায় শিরে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়িয়েই ও সীতাকে দেখতে পেল। একটা বড় খাটের ঠিক মধ্যখানে চাদরযুক্তি দিয়ে শয়ে আছে। মুখটা ঘামে ভরতি। চোখ দুটো বোজা-আঘোরে ঘূমুজে। শব্দ না করে পাশে এসে দাঁড়াল নি। বোধহয় জুব ছাড়ছে ওর, বালিশ অবধি ঘামে ভিজে গেছে। ঘুমোলে মানুষের মুখ কেমন আদুরে-আদুরে হয়ে যায়।

ডাকতে যায় হল অনির, ফিরে যাবে বলে ঘুরতেই ও সীতার মাকে দেখতে পেল। রান্না করতে করতে বোধহয় ছুটে এসেছেন, ‘ও মা, অনি কখন এলি? দেখেছেন মা, কী লস্থা হয়ে গেছে।’

ঠাকুমা বললেন, ‘ওদের শুষ্ঠির ধাত লস্থা হওয়া।’

‘এই তো আজ সকালে।’ অনি হাসল।

‘তোর নাকি এত পড়ার চাপ যে আসবার সময় পাস না?’ সীতার মা বললেন।

অনি বলল, ‘কে বলল?’

‘তোর নতুন মা।’ কথাটা বলেই ভদ্র মহিলা চট করে শাশ্বতির দিকে তাকালেন। তারপর বলে উঠলেন, ‘দেড়িয়ে কেন, বোস। আজকে নাড় বানিয়েছি, খেয়ে যা। ছেলেবেলায় ও নাড় খেতে ভালোবাসত, না মা?’

ঠাকুমা হাসলেন, ‘একবার হেমের ঠাকুরঘরের নাড় চুরি করে খেয়েছিল বলে দশবার ওঠ-বোস করেছিল।’

অনি বলল, ‘আজ থাক ঠাকুমা। আমি এইমাত্র খেয়ে আসছি।’

ঠাকুমা বললেন, ‘থাক মানে? এ-বাড়ি থেকে না খেয়ে যাবি? বড় হয়ে গেছিস বুঝি! আর ও-মেয়েটা যদি ঘুম থেকে উঠে শোনে যে তুই এসে না কথা বলে চলে শোছিস তা হলে আমাকে আন্ত রাখবে?’

সীতার মা বললেন, ‘তুমি ওকে ডেকে তোলো, অবেলায় ঘুমোজে। আমি তোমার নাড় নিয়ে আসছি।’ রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন তিনি।

অনি আবার সীতার দিকে ফিরে তাকাল। ঠোটটা দীর্ঘ ফাঁক হয়ে থাকায় সাদা দাঁত চিকচিক করছে। মুঝের মতো ঘামের ক্ষেত্রে কপালময়, গলায় ছড়ানো। কুকু একরাশ চূপ কেঁপে ফুলে বালিশটাকে অঞ্চকার করে রেখেছে। হঠাৎ অনির খুব অস্বিত্ব হতে আরম্ভ করল। ও ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঠাকুমা পাশের ঘরের খাটে বসে খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখেছেন। চোখাচোখি হতে হেসে বললেন, ‘কী, কী হল, চেঁচির ডাক। মেয়েটা একটু কালা আছে।’

হঠাতে অনির মনে পড়ল ছেলেবেলায় সীতা কানে একটু কম শুনত। ও এবার বুঁকে পড়ে চেঁচিলে ডাকল, ‘সীতা সীতা!’

আচমকা ঘূম ভেঙে গেলে যে-অবস্থাতা থাকে সেটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল সীতার। মুখের সামনে একটি অনভ্যন্ত মুখ দেখতে পেয়ে ধড়মাড়িয়ে উঠে বসল।

একটু সময় উঠতে দিয়ে অনি বলল, ‘বুব তয় পেয়ে গেছিস, না।’

বুব দ্রুত খাটের উপর বাবু হয়ে বসে গায়ের চাদরটা শরীরে জড়িয়ে নিতে নিতে সীতা হাসতে চেষ্টা করল, দুর্বলতার হাসিটা সজ্জল হল না, ‘শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে পড়ল?’

জবাব দিতে গিয়ে কথা আটকে গেল অনির। সীতা কেমন বড়দের মতো কথা বলছে। এখন ও বসে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে, কিন্তু তবু কেমন বড় বড় দেখাচ্ছে। মুতসই উত্তর বুঁজে না পেয়ে সামান্য হাসল অনি, ‘জুর বাধিয়ে বসে আছিস?’

‘এই একটু। কখন আসা হল?’ সীতার বোধহয় অবস্থি হচ্ছিল, খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

অনি বলল, ‘সকালে। তুই শো, উঠলি কেন?’

‘সারাঙ্গ তো শয়ে আছি। তা নিজের থেকে আমাদের বাড়িতে আসা হয়েছে, না ঠাকুমা ডাকল?’ সীতা চোখ বড় বড় করল।

এখন এই মুহূর্তে সত্যি কথাটা বলতে অনির ইচ্ছে করছিল না। ওকে ইত্যত করতে দেবে সীতা ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠাকুমা, তুমি ওকে ডেকেছ, না?’

বুড়ি প্রথমে ঠাওর না করতে পারলেও শেষে বললেন, ‘ও আসব-আসব করছিল আর আমিও ডেকে ফেললাম, কেন, কী হয়েছে?’

সীতা বলল, ‘জলপাইগুড়ির ঝেলা স্কুলে পড়ে তো, আমাদের এবাবে আসা মানায় না।’

ঠাকুমা হেসে বললেন, ‘পাগলি।’

অনি ঘাড় নাড়ল, ‘ঠিক ঠিক। এখনও বাচ্চা আছিস তুই।’

চোখের কোণে তাকাল সীতা, ‘ত-ই নাকি! এখনও হাফপ্যান্ট পরা হয় কিন্তু।’

অনি চট করে জিভটা সামলে নিল। ও সীতাকে বলতে পারত যে, সে-ও ক্রুক পরে, কিন্তু ক্রমশ টের পাছিল সীতা যেন ওর চেয়ে অনেক বেশি বুঝে কথা বলে। সেই ছেলেবেলার সীতা যে কিনা শক হাতে হাত ধরলে কেঁদে ফেলত, সে কেমন করে কথা বলছে দ্যাবো।

প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল অনি, ‘বিষ বাপীদের খবর কী রে?’

পিঠের ফুলে-থাকা ডানগোছের চুলটাকে সামনে এনে সীতা আঙুলে তার ডগা জড়াতে জড়াতে বলল, ‘বিষ তো কুচবিহারে জেকিংস স্কুলে পড়ছে। চিঠি লেখালেখি পর্যন্ত হয় না।’

ঘাড় নাড় অনি, ‘না।’

‘চমৎকার! আমি ভাবলাম শুধু আমিই বঞ্চিত। আর বাপীর কথা না-বলাই ভালো। অন্যের কাছে বললেই হয়।’ সীতা গভীরমুখে বলে আবার খাটে পা বুলিয়ে বসে পড়ল। বোধহয় দাঁড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

কেন, কী হয়েছে ওর?’

‘বুব খারাপ হয়ে গিয়েছে বাপী। মেয়েদের টিটকিরি দেয়, সাইকেল নিয়ে পেছন পেছন ঘোরে। রাজারহাট স্কুলে ভৱতি হয়েছিল, যায়ই না।’ মুখ বাঁকাল সীতা।

‘তোকে কিছু বলেছে?’ বাপীর চেহারাটা ও এই বর্ণনার সঙ্গে মেলাতে পারছিল না।

‘ইস, অত সাহস আছে? একদিন রাত্তায় হঠাতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিস-এই সীতা, রাবণ এলে খবর দিস, কী অসভ্য ছেলে।’

‘আমি বুব চ্যাচেমি করে উঠতে ও পালিয়ে গেল। যাবার আগে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলে শেল, তুই আমাদের সেই সীতা-তো রে, বড় হয়ে গেলে তোরা সব কেমন হয়ে যাস। ও চলে গেলে দম ফেলে বাঁচি বাবা।’ সীতা বুকে হাত রাখল, ‘জানি না, আমার সামনে যিনি আছেন তিনি শহরে এসব করেন কি না! দেখে তো মনে হয় বুব শাস্ত্রশিষ্ট।’

হঠাতে অনি আবিকার করল যে, সীতা ওকে এতক্ষণ ধরে তুই বা তুমি কোনেটাই বলছে না। এভাবে সমোধন না করে কথা বলা খুব সহজ নয়, কিন্তু সীতা বেশ অবস্থায় তা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সময় সীতার মা এক ডিশ খাবার-হাতে ধরে এলেন। অনি দেখল, তিনি আর নারকেলের নাড় তে ডিশটা সাজানো, সদেশও আছে।

সীতার মা বললেন, ‘নাও, খেয়ে নাও। তুমি যা ভালোবাস তা-ই দিলাম।’

খাবার দেখে আঁতকে উঠল অনি, ‘এখনও পেট ভরাট, এত খেতে পারব না।’

সীতা হঠাতে হেসে উঠল শব্দ করে, ‘ও ঠাকুমা, শুনছ, তোমার নাড় গোপাল বলছে খেতে পারবে না, শহরের জল পেটে পড়লে সব পালটে যায়।’

অনি একটু ধর্মকের গলায় বলল, ‘খুব পাকা-পাকা কথা বলছিস তুই।’

সীতার মা বললেন, ‘ঠিক বলেছ তুমি। ভীষণ অসভ্য মেয়ে। ভাবছি এবার ওকে এখানকার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে জলপাইগুড়িতে তপুদের স্কুলে পাঠিয়ে দেব। হোটেল আছে, বেশ হবে তখন।’

পাশের ঘরে খাটের ওপর বসে ঠাকুমা বললেন, ‘মেয়ে হয়েছে যখন, তখন পরের ঘরের তো যাবেই একদিন, এখন থেকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর কী দরকার?’

সীতার মা বললেন, ‘না, এখানে শুর পড়ানো হচ্ছে না।’

ঠাকুমা বললেন, ‘জনোছে তো হাঁড়িবুন্তি ঠেলতে-বিদ্যে নিয়েও তো সেই একই গতি। মেয়েকে পড়ানো করে ভাঙ্গার ইঞ্জিনিয়ার হতে দেবে?’

চট করে কথাটার জবাব দিলেন না সীতার মা, ‘যা-ই বলন, শহরের ভালো স্কুলে পড়লে চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। এই দেশুন আমাদের অনিকে, এখানকার ছেলেদের চেয়ে কত আলাদা, দেখলেই বোঝা যায়।’

সীতা ফুট কাটল, ‘নাড় গোপাল-নাড় গোপাল।’

সীতার মা মেয়েকে ধর্ম দিলেন।

অনি যতটা পারে খেল, তারপর খানিকক্ষণ গল্প করে চলে আসার জন্য উঠল। ঠাকুমা আবার দানুকে বলার জন্য অনিকে মনে করিয়ে দিলেন। বাইরে এখন রোদ নেই বলা যায়। একটা বিরাট মেঘ ভূটানের পাহাড় তেকে ভেসে এসে এই স্বর্গছেঁড়ার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তাই চারধার কেমন ছায়া-ছায়া।

সীতা বাইরের দরজা অবধি হেঁটে এসে জিজাসা করল, ‘কবে যাওয়া হবে?’

অনি বলল, ‘বোধহয় কাল।’

কেমন উদাস গলায় সীতা বলল, ‘আজ বিকেলে কি বাপীর সঙ্গে আড়া মারা হচ্ছে?’

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল অনি, ‘কেন?’

‘এখানে এলেই হয়।’ সীতা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর গায়ে এখন চাদর নেই। জ্বর না ধাকলেও তার ছাপটা মুখে স্পষ্ট। ওর শরীর এবং পায়ের দিকে তাকাতেই অনির মনে হল—সীতা খুব বড় হয়ে গেছে। সেই কামিনিটার মতো সীতার শরীর এখন। চাহনিটা দেখে বোধহয় সীতা সোজা হয়ে দাঁড়াল, ‘বিকেলে না এলে আর কথা বলব না। অসভ্য।’ বলে সীতা দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেল।

হঠাতে অনির বুকের ভিতর কী যেন কেমন করে উঠল। সীতাকে আর-একবার দেখার জন্য মুখ ফিরিয়ে ও দেখল জানলায় বসে ঠাকুমা ওর দিকে চেয়ে আছেন।

বাগানের এলাকা আসাম রোড ধরে বাজারের দিকে হাঁটতে বেশ অবাক হয়ে গেল অনি। দুপাশে এত দোকানপাট হয়ে গেছে যে, জায়গাটাতে চেনাই যায় না। আগে যেসব জায়গায় শুধু হাটবারে ত্রিপল টাঙ্গিয়ে দোকান বসত সেখানে বেশ মজবুত কাঠের দোকানঘর দেখতে পেল সে। দোকানদারের অধিকাশ্চই জচেনা, বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে প্রচুর লোক স্বর্গছেঁড়ায় এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসেছে। শুয়োরকাটার মাঠটা ছাড়িয়ে আগে নদী, ওপারের ধানক্ষেত স্পষ্ট দেখা যেত, এখন সব আড়ালে পড়ে গিয়েছে।

বিলাসের মিষ্টির দোকানটা বেশ বড় হয়েছে যেন, নতুন শো-কেসের মধ্যে মিষ্টির ‘লালগুলো দূর

থেকে দেখা যায়। বিলাসকে কাছেপিঠে দেখল না সে। আঙরোভাসা নদীর পুলটার ওপরে এসে দাঁড়াল অনি। নিচে সকগেটের তলা দিয়ে সেইরকম জল প্রচণ্ড স্নোতে ফেনা ছড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে ওদের কোয়ার্টারের পিছনদিক দিয়ে ফ্যান্টুরির হাইল ঘোরাতে। অনির মনে পড়ল বাপী একবার বলেছিল, এখন থেকে সাঁতরে বাড়িল পেছন অবধি যাবে, আর যাওয়া হয়নি। বাপীটা এরকম হয়ে গেল কী করে? মেয়েদের টিটকিরি দিলে কী লাভ হয়? বরং সীতার মতো মেয়েরা তো চ্যাচামেটি করবে। তা ছাড়া খামোকা টিটকিরি দেবেই-বা কেন?

ভরত হাজামের দোকানটা নেই। সেখানে এখন বেশ বড়সড় সেলুন হয়েছে, ওপরে সাইনবোর্ডে নাম পড়ল অনি, ‘কেশচর্চ’। রাস্তা থেকেই ভেতরের বড় বড় আয়না, চেয়ার দেখা যায়। বুকে সাদাকাপড় বেঁধে তিনজন লোক চুল কাটছে খেদেরে। সেই ল্যাঙ্ডা কুকুর বা বরত হাজাম, কাউকে কাছেপিঠে চোখে পড়ল না। নাচ বুড়িয়া নাচ, কাঙ্কে পর নাচ—অনি হেসে ফেলল।

‘চৌমাথায়’ এসে অনির চমক আরও বেড়ে গেল। ব্রগ্রেঞ্জ যেন রাতারাতি শহর হয়ে গেছে। পুরো চৌমাথা ঘিরে পান-সিগারেট, রেট্রোৱেন্ট আর টেশনারি দোকানে ছেয়ে গেছে। ওপাশের প্রেট্রলপাস্পের গায়ে অনেক নতুন নতুন সাইনবোর্ড ঝুলছে। সকাল-পেরিয়ে-যাওয়া এই সময়টায় আগে ব্রগ্রেঞ্জের রাণায় লোকজন থাকত না বললেই চলে, এখন জলপাইগুড়ির মতো জমজমাট হয়ে আছে। এমন সময় কুচবিহার-জলপাইগুড়ি রুটের একটা বাস এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়াতে অনি সেদিকে তাকাল। দুতিনজন কুলি মাল বইবার জন্য ছুটে গেল সেদিকে। তাদের একজনের দিকে নজর পড়তে অনি সোজা হয়ে দাঁড়াল, বাড়িকাকু। হাফপ্যান্ট আর ময়লা একটা কৃতুয়ামাতন পরে বাসের মাথার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, ব্রগ্রেঞ্জের এখন কেউ মানপত্র নিয়ে নামল না। অনির মনে হচ্ছিল, ও ভুল দেখেছে। সেই বাড়িকাকু এখন কুলিগিরি করছে! ভিড়টা একটু হালকা হতে বাড়িকাকু ঘুরে দাঁড়াতে রাস্তার এপাশে দাঁড়ানো অনির সঙ্গে চোখাচোখি হল। অনি দেখল, পথমে যেন চিনতে পারেন চট করে। তারপর হঠাৎ বাড়িকাকুর চেহারাটা একদম অন্যরকম গেল। যেন অনিকে দেখেনি এমন ভান করে দ্রুত পা চালিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে চাইল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনি আর দেরি করল না। পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে চিকিরা করতে লাগল, ‘ও বাড়িকাকু, বাড়িকাকু।’

কয়েক পা হেটে বোধহয় আর এড়াতে পারল না, বাড়িকাকু দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনি, ‘আরে, তুমি আমাকে দেখেও চলে আছিলে কেন?’ বাড়িকাকুর একটা হাত ধরল সে। খুব বুড়িয়ে গেছে বাড়িকাকু। মুখে কাঁচাপাকা খোঁচা-খোঁচা দাঢ়ি। গাল থরথর করে কাঁপছে। তার পরই মুখ বিকৃত করে অতবড় মানুষটা একটা কান্না চাপবার চেষ্টা করে যেতে লাগল প্রাপণগে। কারও চোখে জল দেখলেই অনির চোখ কেমন করে উঠে, ‘এই, তুমি কাঁদছ কেন?’

এবার হাউমাউ করে উঠল বাড়িকাকু, ‘তোর বাবা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে রে, এই একটুখানি দেখেছি যে—মহীকে সে আমাকে দূর করে দিল।’

এরকম একটা দশ্য প্রকাশ্য চৌমাথায় ঘটতে দেখে মুহূর্তেই বেশ ভিড় জমে গেল। দুতিনজন কুলিগোছের লোক বাড়িকাকুকে বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কী হয়েছে কোন শালা মেরেছে? বাড়িকাকু কারও কথার জবাব দিচ্ছিল না বটে, কিন্তু অনির খুব অস্তিষ্ঠি হচ্ছিল। সবাই তার দিকে সন্দেহের চোখে ও তাকাচ্ছে এটা বুঝতে পারছিল সে। যারা অনিকে চিনতে পারছে তারা কেউ-কেউ বলতে লাগল, ‘নিজের হাতে মানুষ করেছে—এ বাবা নাড়ির বাঁধনের চেয়ে বেশি।’ ভিড়টা যখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে, এমন সময় দু-তিনটে সাইকেল খুব জোরে ঘটি বাঁজাতে বাঁজাতে ওদের পাশে এসে ব্রেক করে দাঁড়াল। ‘কী খেলা হচ্ছে, পকেটমার নাকি?’ গলাটা খুব চেনা-চেনা মনে হল অনির, সামনে মানুষের আড়াল থাকায় দেখতে পাচ্ছিল না। আর দুজন কী-একটা বলে এগিয়ে আসতেই ভিড়টা চট করে হালকা হয়ে গেল। অনি দেখল, একটা লস্বাটে ছেলে এসে ওদের দেখে জু কুঁচকে বলে উঠল, ‘ক্রাইং কেস!’

‘সে আবার কী!’ ওপাশে সাইকেলে ভর দিয়ে কথাটা যে বলল তাকে এবার দেখতে পেল অনি। চোখাচোখি হলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর অনি কিছু বোবার আগেই বাপী তাঁরের মতো ছুটো এসে জড়িয়ে ধরল। ঝনঝন করে একটা সাইকেলকে মাটিতে পড়ে যেতে শুল সে। সেদিকে কান না দিয়ে বাপী ততক্ষণ একনাগাড়ে কীসব বলে গিয়ে শেষ করল, ‘গুড বয় হয়ে শেষ করল, ‘গুড বয় হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুলে গেল, অনি?’

‘তীব্রণ বিশ্বল হয়ে পড়েছিল অনি, ‘না, তুলব কেন? তুইও তো আমাকে চিঠি দিস না?’
বাপী বলল, ‘ভেবেছিলাম দেব, কিন্তু এত বানান তুল হয়ে যায় না যে লজ্জা করে। আমি-না খুব
খারাপ হয়ে গেছি, সবাই বলে।’

‘কেন? খারাপ হতে যাবি কেন?’ অনির কেমন কষ্ট হচ্ছিল।

‘দূর শালা, তা আমি জানি নাকি! এই শোন, আমি এখন বীরপাড়ায় যাচ্ছি, একটা ঝামেলা
হয়েছে, সামলাতে হবে। বিকেলবেলায় দেখা হবে, হ্যাঃ’ অনি ঘাড় নাড়তেই বাপী দৌড়ে
সাইকেলটাকে মাটি থেকে তুলে লাফিয়ে সিটে উঠল। অনি দেখল ওর দুই সঙ্গীকে নিয়ে তিনটে
সাইকেল দ্রুত বীরপাড়ার দিকে চলে গেল।

বৈধহয় অন্য একটা ঘটনা সামনে ঘটে যাওয়ায় ঝাড়িকাকু সামলে নিয়েছিল এরই মধ্যে।
বাপীর চলে গেলে কয়েকজন দূর থেকে ওদের দেখতে লাগল, কিন্তু আগের মতো কাছে এসে ভিড়
করল না। অনি দেখল লক্ষ্মপাড়া থেকে একটা প্রাইভেট বাস এসে ট্যাঙ্কে দাঁড়াতেই কুলিরা সেদিকে
ছুটে গেল। ঝাড়িকাকু একবারও বাসটার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কখন এলি? কর্তব্য
কেমন আছে?’

‘সকালে। দাদুর পা ভেঙে গেছে কাল, এমনিতে ভালো আছে।’

‘সে কী! পা ভঙ্গল কেন? এই বুড়ো বয়সে-পড়ে শিয়েছিল?’

‘না, রিকশায় ধাক্কা দেশেছিল।’

গুনে ঝাড়িকাকু জিভ দিয়ে কেমন একটা চুক চুক শব্দ করল।

‘দিদি কেমন আছে?’

‘ভালো। কিন্তু তুমি কেমন আছ?’

‘আমি ভালো নেই রে!’ ঝাড়িকাকু ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগল কুলের রাস্তায়।

যদিও শরীর দেখেই বোঝা যায় তবু অনি জিজ্ঞাসা করল, ‘কেন?’

‘আমার যে কেউ নেই রে! ঝাড়িকাকু শকে নিয়ে হাঁটতে লাগল কুলের রাস্তায়।

যদিও শরীর দেখেই বোঝা যায় তবু অনি জিজ্ঞাসা করল, ‘কেন?’

‘আমার যে কেউ নেই রে, একা কি ভালো থাকা যায়!’ অনি কথাটা শুনে ঝাড়িকাকুর হাতটা চট
করে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। ঝাড়িকাকু বলল, ‘তুই আমার সঙ্গে হাঁটছিস দেখলে মহী রাগ
করবে।’

‘কেন, রাগ করবে কেন? তুমি কি আমার পর?’

‘তুই যে কবে বড় হবি!’

‘আমি তো বড় হয়েছি, তোমার চেয়ে লম্বা।’

‘এই বড় নয়-যে-বড় হলে মহীর মতো আমাকে চড় মারা যায়।’

‘কেন আমাকে মেরেছিল বাবা? কী করেছিলে তুমি?’

‘কী হবে সেকথা শুনে! হাজার হোক মহী তোর বাবা, বাবার নিন্দে কোনো ছেলের শুনতে নেই।’

মুখ ঘুরিয়ে নিল ঝাড়িকাকু।

তবু অনি জেদ ধরল, ‘মা বলত সত্যি কথা বললে শুনলে কোনো পাপ হয় না।’

হঠাতে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝাড়িকাকু, ‘মা! তোর মায়ের কথা মনে আছে?’

অবাক হয়ে গেল অনি, ‘কেন থাকবে না! সব মনে আছে।’

‘আমি খবরটা শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি। এই সেদিন কর্তব্য মহীকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন
তোর মাকে। তারপর তুই হলি-কী যে হয়ে যায় সব! তোর মা চলে গেলে মহীটা একদম ভেঙে
পড়েছিল। তখন রোজ রাত্রে ওর ঘরে শুতাম আমি। এক শুলেই কাল্লাকাটি করত। ওর খাটের পাশে
মাটিতে শয়ে আমি শুধু তোর মায়ের কথা ছাড়া সব গল্প করতাম।’ ঝাড়িকাকু কথা থামিয়ে একটা
নিশ্চাস ফেলল।

এসব খবর অনির জানা নেই। ঝাড়িকাকু কোনোরকমে তখন বাবাকে রান্না করে খাওয়াচ্ছে—এই

বৰৱটাই শুনেছিল তখ্ন। তাই বাকিটা শোনার জন্য বলল, ‘তারপর?’

‘বাঁ হাতের ডানায় চট করে মুখটা ঘষে নিয়ে ঝাড়িকাকু বলল, ‘তারপর যখন মহীর আবার বিয়ের কথা উঠল তখন ও কিছুই রাজি হচ্ছিল না। আমারও পছন্দ ছিল না। কিন্তু অন্য বাবুরা বুঝিয়ে-সুবিয়ে ওর মত করিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল।’ হঠাতে ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাড়িকাকু বলল, ‘তোর মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?’

হেসে ফেলল অনি, ‘বা রে! কেন হবে না?’

ঝাড়িকাকু বলল, ‘বড় ভালো মেয়ে রে। বিয়ের পর বছর তিনিক তো বেশ ভালো সবই। আমি ভাবতাম, যাক, এই ভালো হল। তোর মায়ের অভাব টের পেতে দিত না মেয়েটা। এমনকি আমার সঙ্গে থেকে শোকৰ কাজও শিখে নিয়েছিল। যে গোছে তার জন্যে মানুষ কতদিন দুঃখ করতে পারে! কিন্তু এই মেয়েটা রাতারাতি যেন এই বাড়ির লোক হয়ে গেল।’

‘আরে! তুমি আমাদের বড়বাবুর নাতি না।’

অনি মুখ ঘুরিয়ে দেখল, একজন বৃক্ষমতন লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। মাথা নাড়ল অনি, ‘হ্যাঁ।’

‘বড়বাবু কেমন আছেন?’ বৃক্ষ যেখানে দাঁড়িয়ে তার পিছনে বিরাট স-মিল। অনি এতক্ষণ চিনতে পারল। ওর নাম হারাণচন্দ পাল। কুবু বড়লোক। দু-তিনিটে স-মিল আছে, বাস-ফাস, জমি-টমি আছে। দানুর কাছে শুনেছে অনি, একদম হোটেলোয় ইনি স্বর্গছেঁড়ায় এসে মুঢ়ি বিক্ৰি কৰতেন। পা ভাঙার কথাটা বলতে শিখেও ঘাড় নাড়ল অনি। ক্লেন সংস্কৃতের স্যার পড়া জিজ্ঞাসা কৰলে মন্ট এইরকমভাবে ঘাড় নাড়ে। হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হয়।

‘ভালো, ভালো। তুমি তো বড় হয়ে গেছ হে। কিন্তু এত রোগা কেন? তালপাতার সেপাই! আরে দেশ গড়তে গেলে স্বাস্থ্য ভালো চাই। সেই পনেরোই আগট সকালে ফ্লাগ তুলেছিলে তুমি যতই বড় হও, দেখেই চিনেছি। হেঁ হেঁ। বেশ বেশ।’ বৃক্ষ হাসিহাসি মুখ করে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ওৱা আবার হাঁটতে লাগল। সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগটের কথাটা বৃক্ষ বলতেই ওর বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল। স্বর্গছেঁড়ায় অনেকেই নিচয়ই মনে করে রেখেছে তার কথা। বৃক্ষ বলতেই ওর বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল। স্বর্গছেঁড়ায় অনেকেই নিচয়ই মনে করে রেখেছে তার কথা। উঃ, ফ্লাগটা কী দাক্ষণ উঠেছিল।

ত্বরানীমাস্টারের মখুটা মনে পড়তেই ও দেখা করার জন্য চতুর্ভুল হয়ে উঠল। ঝাড়িকাকু চুপচাপ কিছু ভাবছিল। ও বলল ‘চলো, ক্লুলে যেতে-যেতে সব শুনব।’

‘কেন, ক্লুলে কী হবে?’ ঝাড়িকাকু ব্যাপারটা পছন্দ কৰল না।

‘ত্বরানীমাস্টারকে দেখে আসি।’

‘কাকে?’

ত্বরানীমাস্টার। আমাদের পড়াত না? ত্বরানীমাস্টার, নতুন দিদিমণি!

‘ও। সে-ক্লুলে তো উঠে শিয়েছে মৰাঘাটে। আৱ ত্বরানীমাস্টারের কুবু অসুখ, বাঁচবে না।’

‘কী হয়েছে?’ অনি সেই মুখ মনে কৰতে চেয়ে স্পষ্ট দেখে ফেলল।

‘শৰীৰ নাকি অবশ হয়ে গেছে। কলোনিতে আছে, আমি দেখিনি।’

একটা অভুত নিস্তঙ্গতা-বোধ অনিমেষকে দিয়ে ধৰল আচমকা। এইসব মানুষ এবং এই পরিচিত জায়গাটা যদি এমনি কৰে তার চেহারা পালটে একদম অচেনা হয়ে যায় তা হলে কী কৰবে!

অনি জিজ্ঞাসা কৰল, ‘কলোনিতে কোথায় অনি আছেন তুমি জান?’

ঝাড়িকাকু ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, ‘কেন?’

‘আমি যাৰ। তুমিচলো আমাৰ সঙ্গে, ‘শুজে নেব।’ অনি জোৱা কৰে ঝাড়িকাকুৰ হাত ধৰে কলোনিৰ দিকে হাঁটতে লাগল। দুপাশে কাঁচা কাঠের গুঁক বেৱুচ্ছে। স-মিলগুলো থেকে একটানা কৰাত চালাবাৰ শব্দ হচ্ছে; একটা ট্রাক্টোৰ চজা-পাতা-বোৱাই ক্যারিয়াৰকে টেনে নিয়ে ফ্যাট্টিৰ দিকে চলে গেল।

অনি পুৱনো কথার বেই ধৰে জিজ্ঞাসা কৰল, ‘তারপৰ কী হল? বাবা তোমাকে মাঝে কোনো

ঝাড়িকাকু বলল, ‘এসব কথা ধাক !’

‘তুমি বারবার ধাক দেলো না তো !’ অনি প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল।

ঝাড়িকাকু বিব্রত হয়ে ওর দিকে তাকাল। এই ছেটা মানুষটা খুব খিদায় পড়েছে বৌদ্ধা যাচ্ছিল। তারপর যেন বাধ্য হয়ে বলল, ‘তোর নতুন মাকে নিয়ে তোর বাবা মাঝে-মাঝে কুচবিহার যেত ডাঙ্কারের কাছে। শেষে একদিন দুজনের মাঝে কী বাগড়া। মেয়েটাকে সেইদিন প্রথম কথা ঘলতে দেখলাম। লোকে বলে, মহী নাকি বাজ্ঞা-বাজ্ঞা করে খেপে গিয়েছিল। ধাক, তুই এসব কথা তুনস না—’

‘আঃ! বলো মদ খেতে লাগল। প্রথমে ঝুকিয়ে লুকিয়ে খেতে। কোথা থেকে ও একজন লোককে ধরে এনেছিল যে নাকি সামনে বসে ভূত নামাতে পারে। রোজ রাত্রে দরজা বন্ধ করে ওরা নাকিতোর মাঝে নামাত। একদিন তোর মায়ের একটা ছবি বিবাট করে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে খুব ধূপঘূনা দিতে লাগল-দরজা বন্ধ করে দিল। নাকি ও তোর মায়ের সঙ্গে খাবানে কেমন চুপচাপ হয়ে যেতে লাগল। একদিন ঘরে বাঁট দিতে গিয়ে আমি জানলাটা খুলেছিলাম, সে সময় ও মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল। জানলা খোলা দেখে কী হবিতোবি, আমি আর পারলাম না, বললাম, এরকম করলে আমি কর্তৃবাবুকে সব বলে দেব। এই ঘনে ও আমাকে মারতে লাগল। বলল, চাকর চাকরের মতো ধাকবি। একে মাতাল, তারপর ইদানীং ওর মাথার ঠিক নেই, আমি চুপচাপ মাব খেতে লাগলাম। তাই দেখে নতুন বউ ছুটে এসে ওকে ধরতে মহী বলল, ‘ও, খুব দরদ! এই মহুর্তে তুই বেরিয়ে যা। আমি চলে এলাম।’

‘আসার সময় কিছু বলল না?’

‘তোর নতুন যা আমাকে অনেক করে বলেছিল, ক্ষমা চেয়েছিল মহীর হয়ে। কিন্তু যে-বাড়িতে সারাজীবন কাটিয়ে এলাম নিজের দিকে না তাকিয়ে, সেই বাড়ির ছেলে চা মারলে আর ধাকা যাবে। কর্তৃবাবু যাওয়ার সময় আমার সব মাইনের টাকা মহীর কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা আর ফেরত নিইনি। চলে আসার সময় ও মনে দেয়নি। যদি কোনোদিন ইচ্ছে হয় তো দেবে, আমি চাইব না।’

‘কেন চাইবে না, তোমার নিজের টাকা না?’ শক হয়ে গিয়েছিল অনি এসব কথা ঘনে। ছেটমায়ের মুখের কাটা দাগটা যে কোথেকে এল এতক্ষণে বুবুতে অর অসুবিধে হচ্ছে না। অনি দেখল ও বাবার ওপর রাগতে পারছে না। অচুত নিরাসক হয়ে বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। বাবা যেন ওর কষ্ট হতে লাগল। বাবা যথন বিয়ে করেছিল তখনও ওর কিছু মনে হয়নি, এখনও হল না। শুধু ওর মনে হল, ও-বাড়িতে দুজন খুব কষ্ট পাচ্ছে, একজন ছেটমা আর একজন যাঁকে ছবিতে পুরে দরজা-জানলা বন্ধ করে বাখা হয়েছে।

অনি আবার প্রশ্নটা করতে ঝাড়িকাকু বলল, ‘গবসময় কি চাওয়া যায়! টাকা চাইলেই তো ও চাকর বরে দিয়ে দিত। ও নিজে ধেকেই দেবে।’

‘দাদুকে বললে না কেন? তুমি তো জলপাইগুড়িতে যেতে পারতে!’

‘লজ্জা করছিল। তা ছাড়া এসব ঘনলে কর্তৃবাবু কষ্ট পাবে। তাই একজনকে দিয়ে কাল খবর পাঠিয়েছিলাম যে দেখা হলে বলতে মহীর খুব অসুবিৎ। এ-বাড়ির ছেলে হয়ে মদ খায় কী করেও বড়দা যে ত্যজ্যপুত্র হয়েছে ভুলে গেল! আর মহীর মতো শাস্ত ছেলে, আ! নিশ্চয় ভুতে পেয়েছে ওকে। এরকম হলে বাগানের কাজ ধাকবে না ওর! লোকে বলছে ওর নাকি মাধার ঠিক নেই। আমি তো আর যাই না যে দেখব।’

অনি ঝাড়িকাকুর দিকে তাকাল। দাদুকে গিয়ে সব কথা বলতে হবে। ঘনলে নিশ্চয়ই দাদু বাবাকে ত্যজ্যপুত্র করে দেবেন। কিন্তু তা হলে ছেটমায়ের কী হবে? কী করা যায় বুবুতে পারছিল না অনি। বাবাকে কি ভূতে পেয়েছে? বুক জানলা-দরজার অঙ্ককার ঘরে বসে যদি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে, তবে তো সে মায়ের ভূত। কথাটা মনে হতেই ও হেসে ফেলল। মা কখনো ভূত হতে পারে না। ওসব বুজুকি। ও ঠিক করল ব্যাগারটা কী আজ রাত্রে দেখবে।

কলেনির মুখটাতে এসে ঝাড়িকাকু কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল ড্রবানীমাটার কোথায় থাকেন। আগে স্বর্গছেড়ার এই অঞ্চলটায় লোকবসতি ছিল না। ওগাণে হিন্দুপাড়ায় কুলিলাইনটা অবশ্য ছিল, কিন্তু সে বানারহাটের রাস্তায়। এদিকটায় খুটিমারি ফরেটের গা-ধৰ্মে স্বর্গছেড়া টি এক্টেটের অন্য প্রান্ত। খাসমহলের জায়গাখলো তখন আগাছা জঙ্গলে ভরতি ছিল। সাতচল্লিশ সালের

পর ওপারের মানুষেরা এপারে আসতে শুরু করলে এইসব জায়গা রচেহারা পালটে গেল রাতারাতি। অনি এই প্রথম এমন একটা জায়গায় এল যাকে কালোনি বলে। কলোনি শব্দটা এর আগে ও শোনেনি। ভেতরে চুকে ও দেখল সরু রাস্তার দুপাশে কাঠ আর টিনের ছেট ছেট বাড়ি, এর উঠোনের গায়ে ওর শোওয়ার ঘর। সদর অন্দর কিছু নেই। বোঝাই যায় যাঁরা এসেছেন তাঁরা বাধ্য হয়ে এখানে আছেন।

ছেট একটা কাঠের গায়ে আলকাতোরা বোলানো, দরজা বন্ধ, ওরা জানল এখানেই ভবানীমাস্টার থাকেন। একটা ভাঙা কাঠের সিডি বেয়ে ওরা দরজার গায়ে এসে দেখল একটা মানুষুর তার তিন-চারটে বাচ্চাকে চোখ বুঝে শয়ে বুকের দুধ খায়াছে। বৈধহয় এ-সময় কারও আসার কথা নয় বলে সে খুব বিরক্ত হয়ে দুবার ডাকল। বন্ধ দরজায় শব্দ করতেই ভেতরে কেউ খুব আস্তে কিছু বলল। কয়েকটা বাচ্চা ওদের দেখছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তাদের একজন বলল, দরজার খোলাই আছে, জোরে ঠেলেই খুলে যাবে। সত্যি দরজাটা খোলাই ছিল। অনি ভেতরে চুকেই ভবানীমাস্টারকে দেখতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে অতিকঠে দরজার দিকে ঠিকরে-বেরনো দুটো চোখে যিনি তাকিয়ে আছে তাকে দেখে পাথর হয়ে গেল অনি। সমস্ত শরীর বিছানার সঙ্গে ল্যাপটানো, বিছানাটা অপরিষ্কার। মাথার পেছেনে জানলাটা খোলা।

‘কে? সামনে এসো—’ অস্তুত একটা শব্দ গলা থেকে। বুঝতে কষ্ট হয়।

অনি পায়ে পায়ে ভবানীমাস্টারের সামনে এল। বাড়িকাকু ঢুকল না ঘরে। অনি দেখল দুটো চোখ ক্রমশ তার মুখের ওপর স্থির হল এবং সেই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

মাস্টারমশাইয়ের শরীর শুকিয়ে চিমেস হয়ে গেছে, কিন্তু মৃবধূনা প্রায় একই রকম আছে। যদিও কাঁচাপাকা দাঁড়িতে সমস্ত মুখ ঢাকা, তবু চিনতে ক্ষেনো অসুবিধে হবার কথা নয়। একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরল গলা থেকে, ‘অ-নি-মে-ষ’।

তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল অনি, ‘হ্যাঁ।’ ঘরঘড় শব্দটা উচ্চারণের অনেকটা ঢেকে দিচ্ছিল। কথা বললে হয়তো কষ্ট বেড়ে যাবে, অনি বলল, ‘কথা বলবেন না।’

ভবানীমাস্টার হাসলেন, ‘প্যা-রা-লা-ইসিস।’

এমন সময় বাইরের থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, ‘কে আইছে শুনলাম, দুদিন পরেই তো মরব, এখন আইয়া কামটা কী? আ, আপনারা আইছেন, উনার কেউ হন নাকি?’

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িকাকুর গলা শুনল অনি, ‘না না। মাস্টারের ছাত্র এসেছে।’

উভয়ে সেই মহিলাকষ্ট বিরক্ত হল, ‘এখন আর পড়াতেই পারব নাকি উনি। উনি যাইলে আমার পরান জুড়ায়, আর পারি না।’

ভবানীমাস্টার বললেন, তো-তো-মার মানে আ-ছে পতাকা তু-লে-ছিলে?’

অনি বলল, ‘হ্যাঁ। আপনার সব কথা মনে আছে আমার।’

‘বড় হও বাবা, বড় হও! ’ কথাটা বলতে বলতে চোখের কোল বেয়ে একটা সরু জলের ধারা বেরিয়ে এসে কানের দিকে চলে গেল। অনি আর দাঁড়াতে পারছিল না। শায়িত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। ও চট করে এগিয়ে গিয়ে হাতের চেটো দিয়ে ভবানীমাস্টারের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সৌড়ে বাইরে চলে এল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর কাঁঠালগাছতলায় এসে দাঁড়াল অনি। বাড়ি ফেরার পর থেকে ছেটমার সঙ্গে কথাই হচ্ছে না প্রায়। এমনকি অনিকে খাবার দেবার সময় মনে হচ্ছিল রান্নাঘরে ওর খুব কাজ, সামনে দাঁড়িয়ে গল্ল করার সময় পাঞ্চেল না। উঠোনে উঁই-করা বাসন অথচ বাড়িতে কাজের লোক নেই-বাবার ওপর ক্রমশ চটে যাচ্ছিল। ছেটমাকে এখন সব কাজ করতে হয়। বিয়ের পর পায়েসের বাটি হাতে নিয়ে ওর ঘরে-আসা ছেটমার সঙ্গে এখন কেমন ঝোঁগা জিরঞ্জের হয়ে যাওয়া ছেটমার কোনো মিল নেই। সত্যি বলতে কী ছেটমার জন্য ওর কষ্ট হচ্ছিল।

অনির খাওয়া হয়ে যাবার পর মহীতোষ এলেন। ভাগিস একসঙ্গে থেতে বসা হয়নি। তখন বাবার পাশে চুপচাপ শব্দ না করে চিবিয়ে যাওয়া, একটা দয়বক্ষ-করা পরিবেশে কথা না বলে খাবার গেলা-অনির মনে হল ও খুব বেঁচে গেছে। কাঁঠালগাছতলায় দাঁড়িয়ে বাবার গলা শুনতে পেল সে, ‘অনি কোথায়?’ ছেটমার জবাবটা স্পষ্ট হল না। মহীতোষ গলা চড়িয়ে বললেন, ‘এই রোক্তুরে টোটো

করে না ঘুরে মায়ের কাছে গিয়ে বসতে তো পারে। ভঙ্গি নেই, বুঝলে, আজকালকার ছেলেদের মাত্তভঙ্গি নেই।' ছেটমার গলা শোনা গেল না।

অনি ঘরে দাঁড়াল। ও ভাবল চেঁচিয়ে বাবাকে বলে যে মাকে ও যেরকম ভাল্লোবাসে তা বাবা কঢ়না করতে পারবে না। কিন্তু বলার মুহূর্তে যেন অনির মনে হল কেউ যেন তাকে বলল, কী দরকার, কী দরকার। কিছুদিন হল অনি এইরকম একটা গলা মনেমনে শুনতে পায়। যখনই কোনো সমস্যা বড় হয়ে উঠে, তার খুব অভিযান-বা রাগ হয়, তখনই কেউ-একজন মনেজনে কদিন আগে একটা ব্যাপার হয়েছিল। ওদের ক্ষেত্রে একজন নতুন টিচার এসেছেন দক্ষিণশ্রেণির খেকে, খুব ভক্ত লোক। আর বেশ ভালো লেশেছিল দেখতে। একদিন হলখরের প্রেয়ারের পর উনি রঞ্জকবোড়ে লিখে দিলেন 'ও ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণয় নমঃ'। ওরা ভেবেছিল এটা মাস্টারমশাই-এর নিছক খেয়াল। দিন-সাতেক পরে হঠাতে ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন লাইনটা কার স্পষ্ট মনে আছে, কে লিখতে পারবে? কেউ খেয়াল করেনি, ফলে এখন ঠিকঠাক সাহস পাছিল না। অনি সঠিক জবাব দিতে তিনি ওকে কাছে ডেকে বললেন, 'চিরকাল লাইনটা মনে রাখবে। সুধে কিংবা দুর্ঘটে, বিপদে-আপদে মনেমনে লাইনটা বলে নিজের কপালে মা শব্দটা লিখবে। দেখবে তোমার অঙ্গসূল হবে না।' কথাটা বলে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'রামকৃষ্ণ কে ছিলেন জান তো?' ঘাড় নেড়েছিল অনি।

'গুড়! অনি ছিলেন পরম সত্য, পরম আনন্দ। তাঁর আলোর কাছে কোনো আলো রঁইতে পারে না।'

কথাগুলো তখন ভালো করে বুঝতে না পারলেও মনেমনে তাঁকে শুন্ধার সঙ্গে নিয়েছিল অনি। তার পর থেকে এই প্রক্রিয়াকে অনেকবার কাজে লাগিয়েছে ও। যেমন, বিকেল মুহূর্যে সঙ্গে হয়ে গেলে দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্য বুক্টা ধৰ্বন চুক্তুক করে উঠে তখন চট করে ওই চারটে শব্দ আওড়ে কপালে মা লিখলে অনি লক্ষ করছে কোনো গোলমালে পড়তে হয় না। এই আজকে যখন বাড়িকাকুকে চৌমাথা ছেড়ে ও বাড়ি ফিরল তখন মনে হচ্ছিল এখন বাবার মূরুমুরি হতে হবে, একসঙ্গে খেতে হবে। বাড়িতে তোকার আগে প্রক্রিয়াটা করতে ফাঁড়া কেটে গেল।

রামকৃষ্ণকে ভগবান মনে করে প্রণাম করার একটা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু এটা অনিমেষের কাছে স্পষ্ট নয় মাস্টারমশাই কেন 'মা' শব্দটা কপালে লিখতে বলেছিলেন। আর্চর্য, শব্দটা লেখার পর সারা শরীরে মনে কেমন একটা নিষিদ্ধি সৃষ্টি হয়।

সারা দুপুর ওর প্রায় টেটো করেই কেটে গেল। ওদের বড়ির পেছনের বাগানের সেই চেনা-চেনা গাছগুলো অত্তু বডসডু আৰ অগেছালো হয়ে গিয়েছে। সেই বুনো গাছগুলো যাদের বুকে জোনাকির মতো হলুদ ফুল ফুটত তেমনি ঠিকঠাক আছে। এই দুপুরে সুঁড়গুলো একা একা হয়ে যায় কেন? এমন গলায় কী কঠোর ডাক যে ডাকে! অনি ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দেখল জলেরা এখনও তেমনি চুপচাপ বয়ে যায়।

একসময় সুর্যটা খুঁটিমারির জঙ্গলের ওপাশে মুখ ডোবালে হর্গছেড়া ছায়া-ছায়া হয়ে গেল। এখন একবার পাখির চিৎকার আৰ মদেসিয়া কুলিকমিনদের ভাঙা-ভাঙা গান জানান দিছিল রাত আসছে। নদীৰ ধারে-ধারে অনি চা-বাগানের মধ্যে চলে গিয়েছিল। ছেট ছেট পায়েচলা পথ দুপাশে ঠাসবুনোট কোমৰ-সমান চায়ের গাছে ফুল ফুটেছে, শেডট্রিগুলাতে বাঁকে-বাঁকে টিয়াপাখি বসে সুরজ করে দিয়েছে। এখন চা-বাগানের মধ্যে কেউ নেই। লাইনে ফেরার জন্য পথসংক্ষেপ করে কোনো-কোনো কামিন মাথায় বোঝা নিয়ে দূর দূর দিয়ে যাচ্ছে। হঠাতে এই নির্জন পরিবেশে বিশাল সুবুজের অঙ্গীভূত ঢেউ-এ দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে-দেখতে অনির মনে হতে লাগল ও খুব একা, ভীষণ একা। ওৱা মা নেই, বাবা নেই, কোনো আঞ্চলিক-বন্ধু নেই। ঠিক এই মুহূর্তে ও দানু বা পিসিমার কথা ভাবতে চাইছিল না। ওদের বিরুদ্ধে অনির কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু বয়সবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা যেন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর কিছুই যেন তাদের স্পৰ্শ করে না তেমন করে। তোমাদের দুটো জননী, একজন গর্ভধারিণী অন্যজন ধরিয়া-যিনি তোমাকে বুকে ধারণ করেছেন। নতুন স্বারের সেই কথাগুলো মনে হতেই এই নির্জন সুর্য্য-নামা সমটায় চা-বাগানের ভিতর দিয়ে দাঁড়িতে দোড়তে গলা কাঁপিয়ে গাইতে লাগল, 'ধন-ধান্য-পুস্প-ভৱা আয়াদের এই বসুকুরা।'

না, বাড়িতে ইলেক্ট্রিক আসেনি। অনিনা প্রথম যখন জলপাইখড়িতে গেল তখনই মহীতোষ সব বন্দোবস্ত করে কলকাতা থেকে ডায়নামো আনবাব চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আসেনি।

ফলে এখন রাত্রে এ বাড়িতে হারিকেন জ্বলে। দুটো নতুন জিনিস দেখল অনি, সঙ্গে চলে গেলেও ক্লাবঘরে হ্যাজাক জুলল না, কেউ এল না তাস খেলতে। আর সব বাবু সাইকেলে চেপে টর্চ জ্বালতে জ্বালতে যে যার কোয়ার্টারে ফিরে গেলেও মহীতোষ ফিরলেন না। অথচ রাত হয়ে গেছে বেশি, চা-বাগানে-যে রাতটায় কুলিলাইনে মাদল বাজা শুরু হয়ে যায়। অনি ঠিক বুবাতে পারছিল না ও কোন ঘরে থাকবে। যদি বাইরের ঘরে থাকতে হয় তা হলে মহীতোষ ফেরার আগেই খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়লেই ভালো। সঙ্গের পর বাড়ি ফিরলে ছোটমা একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘বাবে নাও?’ সত্যি সারাদিন এত ঘুরেও একটুও খিদে পায়নি অনির। ও ‘না’ বলেছিল, ছোটমা আর কথা বাড়ায়নি। সামনের মাঠে গাঢ় অঙ্ককার নেমেছে। আসাম রোড দিয়ে মাঝে-মাঝে হশ্যশ করে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। অনি ঠিক করল কাল সকালের ফাঁট বাসে ও জলপাইগুড়ি ফিরে যাবে।

একটু বাদে ও খিড়কিদরজা খুলে উঠোন পেরিয়ে ভেতরে এল। ঘরের মধ্যে দিয়ে এলে মাঝের ছবিটা ঘৰটা পার হতে হবে যেটা অনি কিছুতেই চাইছিল না। রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে ও দেখল দরজাটা খোলা। ভিতরে কাঠের উনুনে কিছু-একটা ফুটছে আর উনুনের পাশে উরু হয়ে গালে হাত দিয়ে ছোটমা বসে আছে। জুলন্ত কাঠের লম্ব আগন্তের আভা এসে পড়েছে গালে, স্থির হয়ে কোনো ভাববায় ছুবে থাক। চোখের পাতায়, চলে, কাপড়ে। চারপাশের অঙ্ককারে ছোটমাকে কাঠের উনুনের আঁচ মেখে এখন একদম অন্যরকম দেখছিল। অনি এসে দরজায় দাঁড়াতেও ছোটমার হংশ হল না। আগিস এখানে চুরিচামারি বড়-একটা হয় না।

অনি রান্নাঘরে চুকতে ছোটমা চমকে সোজা হয়ে বসল, তারপর অনিকে দেখে আঁচলটা ঠিক করে নিল, ‘ওমা তুমি! সারাদিন কোথায় ছিলে?’

‘ঘুরছিলাম।’ অনি খুব আস্তে উত্তরটা দিল। ও রান্নাঘরটা দেখছিল। আ যখন ছিল তখন এরকম ব্যবহা ছিল না। বোধহয় কাজ করার সুবিধে অনুযায়ী চোখাচোখি হতে বলল, ‘খিদে পেয়েছে?’

অনি ঘাড় নাড়ল, ‘না। আচ্ছা, একটা লম্ব কাঠের সিঁড়ি ছিল, ওপরে গোলাপের ফুল আঁকা, সেটা কোথায়?’

অবাক হল ছোটমা, ‘কেন?’

অনি বলল, ‘ঐ পিড়িটায় আমি বসতাম। রাতিরবেলায় খুব যুম পেয়ে গেলে এই ঘরে পিড়িটায় বসে খেয়ে নিতাম।’

কথা শুনে ছোটমা হাসল, তারপর উঠে পাশের ঘরে গিয়ে সেই পিড়িটাকে এনে মাটিতে পেতে নিল, ‘বসো, গল্প করি।’

অনি পিড়িটায় বসে বেশ আরাম পেল, ‘আজকাল ক্লাবে তাসখেলা হয় না!’

প্রশ্নটা করতেই ছোটমা ঘাড় নাড়ল, ‘না।’

‘কেন?’

তরকারিতে হয়তো খন্তি চালাবার কোনো দরকার ছিল না, তবু ছোটমা সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তারপর বলল, ‘জানি না।’

‘বাবা কখন আসবে?’

অনির দিকে পেছন ফিরে তরকারি নামাতে নামাতে ছোটমা বলল, ‘ওর ফিরত দেরি হবে, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো। কালকে আবার যেতে হবে তো।’

এখানে থাকতে যদিও তার একটুও ইচ্ছা করছিল না, তবুও এখন অনির কেমন রাগ হয়ে গেল, ‘বাবা, তুম তো আমাকে একসময় আসাবার জন্য চিঠি লিখেছিলে, এখন চলে যেতে বলছ কেন?’

মুখটা পলকে কালো হয়ে গেল ছোটমার। অনি দেখল, নিজেকে খুব কষ্টে সামলে নিছে ছোটমা। তারপর বলল, ‘তখন তো তোমার এত পড়াশুনা ছিল না।’

হাঁটাং সোজা হয়ে বসল, অনি, ‘ঝাড়িকাকুকে বাবা তাড়িয়ে দিয়েছে কেন?’

ছোটমা দুচোখ তুলে ওকে দেখল, ‘তাড়িয়ে দিয়েছে কে বলল?’

‘আমার সঙ্গে ঝাড়িকাকুর দেখা হয়েছিল।’ অনির অমল জেদ ধরে যাচ্ছিল। ছোটমা কি ওকে খুব বাঢ়া ভেবেছে? এভাবে কথা লুকিয়ে যাচ্ছে কেন?

‘এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, আমি বলতে পারব না।’

‘তুমি আমাকে বন্ধু বলেছিলে না?’

ছোটমা কোনো উপর দিল না। উচু করে রাখা দুটো হাঁটুর ওপর গাল রেখে চপ করে রইল।
অনি বলল, ‘বাবা আগে এমন ছিল না, মা থাকতে বাবা একদম অন্যরকম ছিল।’

খুব গাঢ় গলায় ছোটমা বলল, ‘কী জানি! বোধহয় আমি খারাপ, তাই।’

উডেজনায় সোজা হয়ে বসল অনি, ‘তুমি মিথ্যা কথা বলছ।’

হঠাতে ঘট করে উঠে বসল ছোটমা, ‘বেশ, আমি মিথ্যে কথা বলছি। আমার খুশি তাই বলছি।’

‘কেন? মিত্তে কথা বললে—?’ অনি কী বলবে তবে পাছিল না। কেউ অন্যায় করছে এবং
এরকম জেন্ডের সঙ্গে স্বীকার করছে—কখনো দেখেনি সে।

খুব কাটা-কাটা গলায় ছোটমা বলল, ‘উনি যা করছেন করুন তবু আমাকে এখানে থাকতে হবে।
আমার পেটে বিদ্যে নেই যে রোজগার করব। ভাইদের কাছে গলগৃহ হয়ে থাকার চেয়ে এখানে
অপমান সহ্য করা অনেক সুবের। নিজের জন্যে মিথ্যে বলতে হবে, আমাকে আর প্রশ়্ন করবে না
তুমি।’

অনি চুপ বরে গেল। ছোটমার কথাগুলো বুঝে উঠতে সময় লাগল। শুর হঠাতে মনে হল এতক্ষণ
ও যেভাবে কথা বলেছে সেটা ঠিক হয়নি। জলপাইগড়িতে প্রথম পরিচয়ের দিন যাকে বন্ধু এবং
নিজের চৌহদিক মধ্যে বলে মনে হয়েছিল, এখন এই রাতে তাকে ভীষণ অচেনা বলে মনে হতে
লাগল। কিন্তু ছোটমা তাকে একটা মৃত্যুত সত্ত্বের মুখোযুবি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাবার এইসব
কাজ, কাজ না বলে অত্যাচার বলা ভালো, ছোটমাকে মুখ বুঝে সহ্য করতে হচ্ছে তার ভাইদের কাছে
গিয়ে থাকা সম্ভব নয় বলে। ছোটমা যদি দেখাগড়া শিখত তা হবে চাকরি করতে পারত সেটাও সম্ভব
নয়। আচ্ছা, আজ যদি বাবা তাকে—। সঙ্গে সঙ্গে অনি যেন চোখের সামনে সরিষ্পেখরকে দেখতে
পেল, পেয়ে বুকে বল এল। দাদু জীবিত থাকতে তার কোনো ভয় নেই। কিন্তু দাদুকে আজকাল কেমন
অসহায় লাগে মাঝে-মাঝে, পিসিমার সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে আয়ই চা কথা-কাটাকাটি হয়। হোক,
তবু তার দাদু আছে, কিন্তু ছোটমার কেউ নেই। ও গাঁথীর গলায় বলল, ‘তুমি চিত্তগা কোঠা না আমি
পাশ করে চাকরি করলে তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে। বাবা কিছু করতে পারবে না।’

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ছোটমা বলল, ‘ছি! বাবাকে কখনো অসম্মানের চোখে দেখতে নেই, ভুল
বুবাতে পারলে তিনি ঠিক হয়ে যাবেন।’

অনি কিছুতেই বুবাতে পারছিল না, বাবার বিকুঠে কিছু বললেই ছোটমা একদম সমর্থন করে না
কেন? ছোটমা উঠে মিটসেফ থেকে একটা বিরাট জামবাটি বের করে ওর সামনে এনে রাখল, ‘তোমার
জন্যে করেছি। বাড়িতে তো আর দুধ হয় না, অনেক কষ্টে এটুকু যোগাড় করতে পেরেছি।’ অনি
দেখল জামবাটির বুক-টাইটুর পায়েসের ওপর কিনিমসগুলো ফুলেক্ষেপে তেল হয়ে আছে, একটা
জেজপাতা তিনভাগ শরীর ছবিয়ে কালো মুখ বের করে আছে। চোখাচোখি হতে ছোটমা বলল,
‘ভালো না হলেও খেতে হবে অনি, দিদির মতো হয়নি আমি জানি।’

অনি হাসল, ছোটমা সেই প্রথম দিনের কথাটা এখনও মনে রেখেছে।

‘এ-বেলা একদম নিরায়িত, তোমার খেতে অসুবিধে হবে খুব।’

ছোটমার কথা ওলে হাসল অনি, ‘এতবালি পায়েস পেলে আমার কোনো খাবারের আর দরকার
নেই।’ একটা চা-চামচ দিয়ে ধারের দিকের একটু পায়েস নিয়ে মুখে দিয়ে বলল, ‘ফাইন! তারপর
চোখ বুজে সেটাকে ভালোভাবে গলাধরকর করে বলল, ‘পিসিমার চেয়ে একটু কম ভালো হয়েছে,
তবে মায়ের চেয়ে অনেক ভালো। পিসিমা ফার্ট, তুমি সেকেন্ড, মা থার্ড।’

অনির কথা ওলে বেশ মজা পাচ্ছিল ছোটমা। সারাদিন এবং এই একটু আগেও যে-অস্তিত্বকর
পরিবেশ স্থি হয়েছিল, ছেলেটা খেতে আরম্ভ করার পর থেকে সেটা টুপ করে চলে গেল। যে যা
ভালাবাস তাকে সেটা তৈরি করে খাওয়াতে যে এত ভালো লাগে এবং আগে এমন করে জানা ছিল
না। কী ত্বক্তির সঙ্গে থাক্কে ছেলেটা। আর এই সময় প্রাণ জোরে একটা শব্দ উঠল, কেউ যেন মনের
সুর দরজায় লাধি মারছে। খেতে-খেতে চমকে উঠে অনি বলল, ‘কিসের শব্দ?’

ছোটমার খুশির মুখটা মুহূর্তেই কালো হয়ে গেল যেন, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে

কোনোরকমে বলে গেল, ‘তুমি খাও, আমি আসছি।’

শব্দটা থামছে না, ঘড়ির আওয়াজের মতো বেজে যাচ্ছে। তারপর দরজা খোলার শব্দ হতে একটা হঙ্কার এদিকে ভেসে এল। খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে অনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর একচুটে বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভিতর চুকে পড়ল। ছেটমার ঘরে একটা ছেট ডিমবাতি জুলছে, এত অল্প আলো যে চলতে অসুবিধে হয়। মাঝের ছবির ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল ও। বাবা কথা বলছেন, জড়িয়ে জড়িয়ে, কোনো কথার শেষটা ঠিক থাকছে না, ‘কোথায় আড়ো মারছিলে, আমি দুষ্টো ধরে নক করছি খেয়াল নেই, অ্যায়?’

ছেটমা বলল, ‘অনিকে খেতে দিচ্ছিলাম।’

‘অনি? হই ইজ অনি? মাই সন? সন বড় না ফাদার বড়, অ্যায় আমার আসবাব সময় কেন দরজায় বসে থাকনি, অ্যায়?’

ছেটমা খুব আগে বলল, ‘কাল ছেলেটা চলে যাবে, আজকের রাতটায় এসব না করলেই নয়?’

‘জ্ঞান দিছু সেন্দিনকার ছুঁড়ি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে, অ্যায়! বিনে পয়সায় মা হয়েছে, মাগিরি দেখাচ্ছে তালো, ভালো। মাধু গিয়ে আচ্ছা প্রতিশোধ নিয়েছে। নইলে একটা বাজা মেয়েছেলে কপালে জুটল! গলাটা টলতে টলতে মাঝের ঘরে চলে এল, ‘অ্যাই, ধূপ জুলছে না কেন?’

ছেটমা সৌভে মহীতোষের পাশ দিয়ে এসে বোধহয় ধূপ জুলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার গলা থেকে একটা আর্তনাদ উঠল, ‘উঃ!’

কৌতুহলে অনিমেষ এক পা বাড়াতেই ঘরের মধ্যে চুকে পড়ল। ছেটমার ডান হাতের কবজিটা বাবার মুঠোয় ধরা, বাবা সেটাকে মোচড়াচ্ছেন। সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারছে না ছেটমা। বাবা সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘শাস্তি দিছি, অন্যায় করলেই শাস্তি পেতে হবে, ইই বাবা!’

বাবার দৃষ্টি অনুসরণ করে অনি মাধুরীর ছবিটা দেখতে গেল। অত বড় ছবিটার ওপর দুটো চাইনিজ লল্লনের আলো পড়ায় মুখটা একদম জীবন্ত। সকালে ছবিটায় অঙ্গুত একটা বিমর্শভাব দেখতে পেয়েছিল অনি, এখন সেটা নেই যেন। বরং উল্লাসময় একধরনের উপভোগ করার অভিযোগ মাঝের মুখে। চোখ দুটো কি খুব চকচক করছে! না, আলো পড়ায় ওরকম হয়েছে। ছবির মাকে ওর একদম পছন্দ হচ্ছিল না! ও মহীতোষের দিকে তাকাল। এখনও উনি ছেটমাকে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছেন, ছেটমা ইচ্ছে করলে ঠেলে ফেলে দিতে পারেন বাবাকে, কিন্তু দিচ্ছেন না। অনি যেন শুনতে পেল কে যেন তার কানের কাছে বলে গেল, বল বল, ভয় কিসের? অনি সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষকে বলল, ‘ছেটমাকে মারছেন কেন?’

মহীতোষ পাথরের মতো শক্ত হয় দাঁড়িয়ে পড়লেন, দুচোখ ঝুঁকে লক্ষ করার চেষ্টা করলেন কে বলছে। এই সময় তাঁর শরীরের নিম্নভাগ স্থির ছিল না। অনিকে চিনতে পেরে বললেন, ‘আমি যে মারছি তোমাকে কে বলল? তোমার এই মা বলছে তুমি একে মা বল তো, অ্যায়?’

অনি দেখল ছেটমা সামান্য জোর দিয়ে নিজের হাতটা বাবার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল। মহীতোষ বললেন, ‘গতরে জোর হয়েছে দেখছি!'

‘মেরে ছেটমার গালে দাগ কে করে দিয়েছে?’ অনি প্রশ্নটা এমন গলায় করল যে মহীতোষ প্রাণপণে সোজা হবার চেষ্টা করলেন। ছেটমা মুখে আঁচল দিয়ে বিক্ষারিত-চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। দুই পা এগিয়ে এক হাত বাড়িয়ে মহীতোষ বললেন, ‘অনি, পুত্ৰ, পুত্ৰ আমার! এখানে এলো, এই বুকে মাথা রেখে শুনে যাও।’

অনি কিছু বোবার আগেই মহীতোষ কয়েক পা টলতে টলতে হেঁটে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনির স্পর্শ শরীরে পেতেই ঝরবার করে কেঁদে ফেললেন তিনি, ‘মাধু দ্যাখো, কে আমার বুকে এসেছে, অ্যায়?’

এই প্রথম অনিমেষ জ্ঞানত পিতার আলিঙ্গন পেল এবং সেই আলিঙ্গনে ওর সমস্ত শরীর শুলিয়ে উঠল যেন। বাবার মুখ দিয়ে যে-বিশ্বি ক্রেতাঙ্ক গুৰু বের হচ্ছে তা সহ্য করতে পারছিল না অনি। তীক্ষ্ণ গলায় ও চিঢ়কার করে উঠল, ‘আপনি মদ খেয়েছেন?’

প্রশ্নটা শুনেই ছেটমা দাঁড়িয়ে ডুকবে কেঁদে উঠল। মহীতোষ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড় সুরিয়ে

তাকে চমকে দিলেন, 'আঃ, ফ্যাচফ্যাচ কোরো না তো, পিতাপুত্রের কথাবার্তার মধ্যে ফ্যাচফ্যাচনি! হ্যাঁ বাবা, ইয়েস আমি ড্রিক করেছি। ইউ মে আঙ্ক মি, হোয়াই! লুক অ্যাট হার!' এক হাতের আঙ্গুল তীব্রের মতো মাধুরীর ছবিটার দিকে বাড়িয়ে মহীতোষ বললেন, 'দ্যাখো ও কেমন খুশি হয়েছে। ইউর মাদার! তোমাকে ও পেটে ধরেছিল, হোলি মাদার! ওর খুশির জন্য থেঁয়েছি।'

'আপনি কি উঁর খুশির ছোটমাকে মারেন?' গলাটা এত জোরে যে মহীতোষ দুহাতের মধ্যে দাঁড়ালেন প্রায় অর চিরুক অবধি লম্বা ছেলের মুখ দেখবার চেষ্টা করে বললেন, ইউ আনফের্থফুল সন, কোনোদিন নিজের মাকে ছোট করে দেখবে না। আমি প্রত্যেক রাতে মাধুরীর সঙ্গে কথা বলি। এখানে, এই ঘরে দাঁড়িয়ে, ডু ইউ নো?'

অনির আর সহ্য হচ্ছিল না। আপনি মিথ্যে বলছেন!'

'কী? আমি মিথ্যে বলছি? আমি মিথ্যে বলছি!' হাত বাড়িয়ে থিমচে ধরলেন মহীতোষ ছেলেকে। মাতাল হলোও বাবার গায়ের জোরের সঙ্গে পেরে উঠেছিল না অনি, 'মাকে যদি আপনি এত ভালোবাসেন, মা যদি-না, তা হলে আপনি মদ খেতেন না, ছোটমার উপর অত্যাচার করতেন না। শুনেছি ভুতে ধরলে মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়, আপনার সেরকম হয়েছে!'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে মহীতোষ ছোটমার দিকে ছুটে গেলেন, 'ভূমি ওকে এসব শিখিয়েছ, আমার ছেলেকে আমার বিকুলে লেলিয়ে দিয়েছে!'

দুহাতের আড়ালে মুখ বেরে ছোটমা সেই চাপাকান্নার মধ্যে গলা ডুবিয়ে বলে উঠল, 'আমি বলিনি, বিশ্বাস করো, আমি কিছু বলিনি।'

কিন্তু কথাটা একদম বিশ্বাস করলেন না মহীতোষ, রাগে উশাদ হয়ে বলে চললেন, 'কাল সকা঳ে বেরিয়ে যাবে, তোমাকে আমার দরকার নেই, একটি বাঁজা মেয়েছেলের মুখ দেখা পাপ। তোমার জন্য সে এই কয় বছর আমার কাছে আসছিল না, ভূমি আমার ছেলেকে—'

প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে হাতাং উচ্চকচ্ছে কেন্দে উঠল ছোটমা, 'আমি কাউকে কিছু বলিনি।'

বোধহয় সমস্ত শরীরের ওজন দিয়ে মহীতোষ ডান হাতখানা শুন্যে তুলেছিলেন, যেটার লক্ষ্য ছিল ছোটমার গাল। ঠিক সেই পলকে অনিমেষ যেন তন্তে পেল, যাও, ছুট যাও। কিছু বোবার আগেই সে তীব্রের মতো এগিয়ে গিয়ে মহীতোষের ডান হাত চেপে ধরে ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যালেস সামলাতে না পেরে মহীতোষ ছেলের ওপর হমড়ি থেঁয়ে পড়লেন, অনি নিজেকে বাঁচাতে সরে দাঁড়াতেই নেশাপ্রাণ শরীরটা দূম করে মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়াটা এত দ্রুত ঘটে গেল এবং একটা মানুষ যে পতুলের মতো সোজা চিত হয়ে পড়তে পারে তানি বুবাতে পারেনি: মেঝের ওপর পড়ে-থাকা নির্থর শরীরটার দিকে ওরা বিঞ্চারিত চোখে তাকিয়ে ছিল যেন বিশ্বাস করাই যায় না যে এই লোকটাই এতক্ষণ এখানে ছিল। অনির আগে ছোটমা চিন্তকার করে ছুটে গেলেন মহীতোষের কাছে। অনি দেখল ছোটমা বাবার মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে প্রাণপণে ডাকছেন। বাবার মাথাটা একটা পাশে বারবার ঘূরে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছে। হাত-পা টানটান, শরীরে কোনো আলোড়ন নেই। প্রথমে সন্দেহের চোরে তাকাঞ্চিল অনিমেষ, বাবার ওপর আর কোনোরকম শুন্দা ছিল না তার, এই মুহূর্তে। বাবা মদ বায়, ছোটমাকে মারে, তার মৃত্যু মায়ের নাম করে যা হচ্ছে বলে—। এখন যে এভাবে পড়ে আছে তা ব্যাতাবিক নয়। বাবার জোরের সঙ্গে সে পারেন না কিছুতেই, তাই ওর সামান্য ঠেলায় এভাবে পড়ে মাথা থেকে বেরিয়ে-আসা রক্তে ছোটমার শাড়ি ভিজে যাচ্ছে।

'আমি!' কোনোরকমে বলল সে।

'কেন মাতাল মানুষটাকে ঠেলে দিলে! আমাকে মারলে তোমার কী এসে যেত, যদি আমাকে মেরে সুখ পায়, পাক-না! নিজের আঁচলটা বাবার মাথায় চেপে ধরে ছোটমা ডুকবে ডুকবে কথাগুলো বলল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনি চারপাশে অনেকগুলো মুখ দেখল, নড়ে নড়ে ভেঙেছে যাচ্ছে। মুখগুলো কার? নাকি একনজরের মুখ হাজার হয়ে যাচ্ছে! শিরশিলে একটা শীতল বোধ ওর শিরদাঢ়ায় উঠে এল। মুহূর্তে কপাল ভিজে যাচ্ছে ঘামে। ও দেখল মায়ের ছবিটা বড় বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আহুত একটা ভয় ডানা বাপটাতে ঝাপটাতে বেড়াচ্ছে। ও কি বাবাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল?

না, কখনো নয়। গলা প্রায় বুজে যাচ্ছিল অনির, ও কথা বলল, ‘বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছে করে করিনি। আমি ভাবিনি, বাবা পড়ে যাবেন।’

হঠাতে যেন ছোটমার গলার স্বর বদলে গেল। খুব ধীরে ছোটমা বলল, ‘ওকে একটু ধরবে অনি! থাট্টের ওপর শুইয়ে দিই।’

মহীতোষকে শুইয়ে দিতে ওদের একটু কষ্ট হল, দেহটা বেশ ভারী। ছোটমার হাত মাথার ফেটে-যাওয়া জায়গায় আঁচল ঢেপে রেখেছে। অনি বলল, ‘আমি একচুটে ডাঙ্কারবাবুকে ডেকে আনছি।’

ও যেই বেরুতে যাবে এমন সময় ছোটমার ডাক শুন। দরজা অবধি পৌছে ঘুরে দাঢ়িয়ে পেছনে তাকাল সে। ছোটমার মুখটা অস্পষ্ট। পাশে বাবার শরীরটা আবছা দেখা যাচ্ছে। ওদের পেছনে দেওয়ালে মায়ের ছবিটা ঝকঝক করায় সামনেটা কেমন হয়ে গিয়েছে। ছোটমা যেন অনেক দূর থেকে তাকে বলল, ‘অনি, আমার একটা কথা বাখবে?’

গলার স্বরে এমন একটা মহতা ছিল যে অনি স্পষ্ট শুনতে পেল কে যেন তাকে বলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও বলল, ‘হ্যাঁ।

‘মানে?’

‘ও নিজেই ভার সামলাতে পারেনি, একথা সবাই জানবে!’

‘কিন্তু বাবা-?’

‘মাতাল মানুষের কোনো খেয়াল থাকে না। জেগে উঠলে যা বলব বিশ্বাস করবে।’

অনি বুবাতে পারছিল না কেন ছোটমা একথা বলছে। সবাই যদি শোনে অনি বাবাকে ফেলে দিয়েছে, তা হলে—। ওর বুকে, ডেতের থেকে অনেক অঙ্কন অনেকদিন পরে একটা কানুর দমক উঠে এল গলায় কেন?

ছোটমা বলল, ‘আমার জন্য। আর জানতে চেয়ে না। কেউ যেন জানতে না পারে, মনে থাকে যেন। যাও, দেরি কোনো না। ডাঙ্কারবাবুকে ডেকে আনো।’

কখনো কখনো অঙ্ককর, বুকুর মতো কাজ করে। এখন শৰ্গছেঁড়ায় গভীর রাত। ঘুটঘুটে অঙ্ককারে জেনাকিরা ঘুরে দেড়ায়; লাইনে মানুল বাজে। সার-দেওয়া কোয়ার্টারের দরজাগুলো বক। মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে ডাঙ্কারবাবুর কোয়ার্টারের দিকে যেতে-যেতে এই অঙ্ককারটা যদি শেষ না হত তা হলে যেন ও বেঁচে যেত। বাবার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে কী করবে সে?

ডাঙ্কারবাবুর দরজার সামনে দাঢ়িয়ে ও বুক ডরে নিশ্বাস নিল। তারপর অঙ্ককারে উচ্চারণ করল, ‘ও ভাগবতে শ্রীরামকৃষ্ণয় নমঃ! একটা ঘোরের মধ্যেও মা শুধ আঙুলের ডগা দিয়ে কপালে লিখতেই অসুস্থ শান্ত হয়ে গেল শরীরটা মাধুরী ওকে জড়িয়ে ধরবে যেমন হত।

নিশ্চিন্তে ডাঙ্কারবাবুর দরজার কড়া নাড়তে লাগল অনিমেষ।

॥ ছফ ॥

বালির চরের ওপর দিয়ে ওরা তিনজন হেঁটে যাচ্ছিল। এখন তিন্তার একটা খাতেই বয়ে যাচ্ছে, সেটা বানিশের দিকে। ফলে এদিকের বিরাট চারটা শক্তিয়ে খেটখেট করছে। চরে নেমে কিছুটা গেলেই কাশগাছের জঙ্গল চাপ বেঁধে ওপরে উঠে গেছে। জেলা ক্ষুলের মুখোযুথি নদীর বুকের জঙ্গলটা বেশ ঘন, দিবিয় লুকিয়ে থাকা যায়। মাঝে-মাঝে পারে-চলার পথ আছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। সেনপাড়ার পুদিক থেকে গরিব মেয়েরা তিন্তায় কাঠ কুড়োতে যায়। পাহাড় থেকে ভেঙে-পড়া গাছের শরীর তিন্তায় ভাসতে ভাসতে আসে। মেয়েরা সাঁতরে সাঁতরে সারাদিন ধরে সেগুলো জড়ো করে নদীর ধারে। বিকেলে সেগুলো জড়ো করে নদীর ধারে। বিকেলে সেগুলো মাধায়-মাধায় চলে যায় পাড়ায়। তারপর টুকরো হয়ে রোদে শক্তিয়ে বাবুদের বানার জালানির জন্য বিক্রি হয়ে যায়। জঙ্গলের যেখানে শুরু সেখানে কিছু সোক তরয়েজের ক্ষেত করে দিনরাত পাহাড়া দেয়। এখন তরয়জ পাকার সময় আর কদিন বাদেই জঙ্গলটা একদম সাদা হয়ে যাবে। দারুণ কাশফুল ফুটবে তখন।

অনি এর আগে দুই-তিনবার বালির চরে এসেছে, জঙ্গলে ঢোকেনি। মণ্টুর এসব জায়গা খুব চেনা। আয়ই টিফিনের সময় স্কুল পালিয়ে ও একা একা এখানে যোৱে। এই জঙ্গলে কোনো হিংস্র

জানোয়ার সচরাচর থাকে না, কিন্তু শিয়াল তো আছে। মাঝে একবার তিক্তার জলে ভেসে একটা বাচ্চা বাধ এখানে পুরুয়ে ছিল। অতএব ডয় যে একদম নেই তা বলা চলে না। জঙ্গলে ঘূরে ও কী দ্যাখো কিছুতেই বলতে চায় না, জিঞ্জাসা করলে বিজের মতো হাসে। তপন থাকে আশ্রমপাড়ায়, সবকটা দেশোভূবেধ গান ওর মুখস্থ। অথচ এ নতুন স্যারকে নিয়ে খারাপ খারাপ রসিকতা করে।

জঙ্গলে ঢোকার আগে তরমুজক্ষেত। পাকাগাকি কোনো ব্যাপার নয়, জল এলেই পালিয়ে যেতে হবে তবু ক্ষেতের বাউভারি দেওয়া হয়েছে। মাঝে-মাঝে খুঁটি পুঁতে সেগুলোর মধ্যে দড়ি বেঁধে দেওয়ায় আলাদা হয়েছে ক্ষেতগুলো। ওদের তিনজনকে বালিবু চর পেরিয়ে সেদিকে যেতে দেখে একজন হেঁকে উঠল, ‘কে যায়? কারা যায়?’

মণ্টু বলল, ‘আমি গো বুড়োকর্তা। সঙ্গে আমার বন্ধুরা।’

অনি দেখল ক্ষেতের মধ্যে অনেক জায়গায় লাঠির ডগলায় কাকাতাড় যারা ছেঁড়া আমা পরে হাওয়ায় দুলছে। তেমনি একজন শুধু মাথায়, চোখমুখ আঁকা কালো ইঁড়িটাই যা নেই, বালির ওপর উরু হয়ে বসে এক হাতের আড়ালে চোখের রোম্ফুরে ঢেকে ওদের দেখেছে। মণ্টুর কথা শুনে একগাল হাসল বুড়ো, ‘আ খোকাবাবু, তা-ই কও! এত চোরের আওন-যাওন বাড়ছে আজকাল যে চিনতে পারি না। কালকের ফলটা মিষ্টি ছিল?’

‘হ্যাঁ, খুব মিষ্টি ছিল।’ মণ্টু বলল।

‘যাও কই?’

‘এক অনি পরসা আছে, একটা তরমুজ দেবে?’

বুড়ো হাসল, ‘বোকলাম।’

‘তা হলে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব, কেমন?’ কথাটা বলে ও চাপা গলায় অনিদের বুঝিয়ে দিল, ‘যাওয়ার সময় প্রত্যেক একটা করে নিয়ে যাব, বুবলি!’

তপন বলল, ‘পয়সা?’

মণ্টু খিচিয়ে উঠল, ‘আমাকে পয়সা দেখাচ্ছিস? আমি তোমাদের মতো বাচ্চা নাকি?’

জঙ্গলের তিতর তুকে পড়লে আর হাকিমপাড়া দেখা যায় না। শুধু দূরে জেলা স্কুলের মতো লাল ছাদটা চোখে পড়ে। জঙ্গল সরিয়ে সামান্য এগিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। চারধারে জঙ্গল, মাঝাখানে টাকের মতো পরিষ্কার বালি। হঠাতে মণ্টু বলল, ‘এই অনি, আজকে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো।’

অনি মণ্টুকে ভালো করে দেখল। ওর মাথার চুল বেশ কোঁকড়া, গায়ের রঙ খুব ফরসা। কিন্তু ওকে তো অন্যরকম কিছু দেখাচ্ছে না। রোজকার মতো ইউনিফর্ম পরাই আছে। ওর মুখ দেখে মণ্টু সেই বিজের হাসিটা হাসল। এই হাসিটা দেখলে অনির নিজেকে খুব ছেট বলে মনে হয়। মণ্টু ওদের বন্ধু, এক ক্লাসে পড়ে, কিন্তু ও অনির চেয়ে অনেক বেশিক্ষিত জানে। মণ্টু হাসিটা শেষ করে জিঞ্জাসা করল, ‘আজকে আসবার সময় কর-বাড়ির দিকে তাকাসনি?’

অনি ধাঢ় নেড়ে না বলল।

তপন বলল, ‘মুভিং ক্যাম্পেল পায়চারি করছিল বাবান্দায়।’

মণ্টু বলল, ‘জানলার ফাঁক দিয়ে বঁঞ্চির চোখ দুটো তো দেখিসনি তোরা; আহা! তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আমাকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে।’

ওদের স্কুলের উলটোদিকে যে বিরাট বাড়িটা অনেকখানি বাঁধান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা এখনকার মিডিনিসিপ্যালিটি অন্যতম কর্তা শ্রীবিবাহ কর মহাশয়ের। মণ্টু একদিন ওকে দেখিয়েছিল বাড়ির পেটের গায়ে ওর নামের আগে কে বেল ‘অ’ অক্ষরটা লিখে শেষে। মানেটা ঠাওর করতে পারেনি প্রথমটায়। মণ্টু বলেছিল, ‘তুই একটা গাড়ল।’ নতুন স্যারের চ্যালা হয়ে বুরু রয়ে পেলি। তারপর মুখ-খারাপ করে কথাটার মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল। কান্টনেন লাল হয়ে শিয়েছিল অনিষ্টেরে। অগচ মণ্টু খারাপ ছেলে তাবতে পারে না। ক্লাসে যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দেয়। অ্যানুয়েল পরীক্ষার সময় ইচ্ছে করে দুটো উত্তর না-লিখে ছেড়ে দেয় যাতে ফার্স্ট না হতে পারে। নতুন স্যার কারণটা জিজ্ঞেস করাতে ও বলেছিল, ‘ফার্স্ট হলে বামেলা। ক্লাসের ক্যাপ্টেন হতে হয়, সবাই শুভ বয় ভাবে।’ সবই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। নতুন স্যারও।

মন্তু যেসব খারাপ কথা জানে, অনিমেষ তা জানে না। সেইজন্যে মন্তু ওর চেয়ে যেন এক হাত এগিয়ে আছে। তপনটা মুখে কিছু বলে না। কিন্তু মন্তুর সব ইঙ্গিত ও চটপট বুঝতে পারে। আলাউদ্দিন খিলজির চিতোর আক্রমণটা ক্লাসে পড়ানো হয়ে গেলে তপন আর মন্তু দুজনে মিলে দেবলাদেবীর নাচ ওদের দেখাল। নাচটা দেখতে খুব বিশ্বি, তপন মেয়েদের ঢং করে দেবলাদেবী সাজছিল আর মন্তু আলাউদ্দিন খিলজি। নাচ শেষ হলে মন্তু বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘পৃথিবীতে সবচেয়ে আরাম কিসে পাওয়া যায়?’

কে যেন বলেছিল, ‘যুমুতে সবচেয়ে আরাম।’

পেটুক অজিত বলেছিল, ‘খুব পেটভরে রসগোল্লা খেতে দারুণ আরাম।’

তপন মাথা নেড়ে বলেছিল, ‘ধূস! একবার খেলার মাঠে আমার পেট কামড়েছিল। উঃ, কী যন্ত্রণা! দৌড়ে বাড়ি ফিরছি, কপালে ঘাম জমে যাচ্ছে। তারপর একসময় আর পা যেন চলতে চায় না। যখন ল্যাটিন থেকে বেরিয়ে এলাম, ওঃ, তখন এত আরাম এত হারকা লাগল-এরকম আরাম হয় না।’

তপনের বলার ভঙিতে ব্যাপারটা এত জীবন্ত ছিল সবাই যেন বুঝতে পেরে একমত হয়ে গেল। কিন্তু মন্তু বলল, ‘তপন অনেকটা ঠিক কথা বলেছিস কিন্তু পুরো নয়। আচ্ছা অনিমেষ, ট্রেয়ের যুদ্ধটা কার জন্য হয়েছিল?’

‘হেলেনের জন্য।’ তপন উত্তরটা দিয়ে দিল।

‘লঙ্কাকাণ্ড?’

‘সীতার জন্য।’ উত্তরটা অনেকগুলো মুখ থেকে বুলেটের মতো ছুটে এল।।।

‘আলাউদ্দিন খিলজি কেন চিতোর আক্রমণ করেছিল?’

‘পদ্মনীর জন্য।’

সবাই হেসে উঠতেই মন্তু সেই বিজ্ঞের হাসিটা হেসে হাত তুলে ওদের থামাল, ‘আমরা কেন মুভিং ক্যাসেলকে মাসিমা বলে ডাকি?’

এবার কিন্তু কোনো শব্দ হল না, চট করে উত্তরটা খুঁজে না পেয়ে এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। ওধু তপন খিকাবিক করে হেসে উঠল। অনি বুঝতে পারছিল না এর সঙ্গে আরামের কী সম্পর্ক। মুভিং ক্যাসেল হল বিরাম কর মশাই-এর স্তু। গোলগাল লাশা এবং প্রচণ্ড ফরসা মহিলা। বাংলায় বলা হয় চলত দর্গ, পেছন থেকে দেখলে মনে হয় ওর শরীরের মধ্যে অনেকে লুকিয়ে থাকতে পারে। দারুণ সাজেন মহিলা, ওর মেয়েরাও টিক পাতা পায় না। জলপাইগুড়ি শহরের মেয়েরা খুব একটা উগ্র নয়, বরং স্কুলগুলোর সুবাদে একটা গোড়া রঞ্জশীল ভাব বজায় আছে। অবশ্য ইদানীং বাইরের কিছু মেয়ে আসার পর হাওয়া বদলাতে শুরু করলেও দেখলেই বোঝার যায় কে বাইরের! সেক্ষেত্রে মিসেস বিরাম কর যাকে সবাই মুভিং ক্যাসেল বলে সত্যিই ব্যতিক্রম। গায়ের রঙ ফরসা বলেই হাতকাটা লাল সরু প্লাউজ যে তুকে মানাবে একথা ওর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। অনি পেছনে থেকে ওর বিকশায় চলে-যাওয়া শরীর দেখে একদিন ভেবেছিল বোধহয় চাপ-চাপ মাখন দিয়ে ওঁকে তৈরি করা হয়েছে। বিরাম কর মহাশ্যের নাম ছেলেরা রেখেছে ফড়িংদা। মন্তু বলে ওর দাদা নাকি বারো বছর আগে জেলা স্কুলে পড়ত, তারাও নাকি এই একই নামে ওঁদের ডেকে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনের সময় ফড়িংদার চেয়ে মুভিং ক্যাসেলকে বেশি ব্যস্ত দেখায়। মুভিং ক্যাসেলের তিন মেয়েরই নাম, ওধু ওদেরই, জলপাইগুড়ি শহরে আর কারও নেই। তিনজনেই মায়ের কাছ থেকে গমের মতো রং পেয়েছে, জেলা স্কুলের ছেলেরা কাকে ফেলে দেখবে বুরো উঠতে পারে না। মেয়েগুলো এমন নিলিঙ্গের মতো তাকায় যে কাউকে দেখেছে কি না বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। মন্তুর অবশ্য নিশ্চিত ধারণা যে রঞ্জার ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। রঞ্জ সবচেয়ে ছোট। মেনটা উবশী রঞ্জ। মেনকাই ওধু শাড়ি পরে। নতুন স্যারে সঙ্গে কর-বাড়ির খুব হয়েছে। হোস্টেলের ছেলেরা বলে প্রায়ই, নতুন স্যার রাত্রের মিল অফ করে মুভিং ক্যাসেলের নেমতন্ত্র খান। এখন তাই জলপাইগুড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে লিপীখ-মেনকা লেখাটা দেখা যাচ্ছে। নতুন স্যারকে নিয়ে এসব ব্যাপার অনির খুব খারাপ লাগে।

মন্তু বলল, কেউ পারলি না তো! পারবি কী করে, তোরা তো আর নডেল পড়িস না!

অনি বলল, ‘এর সঙ্গে আরামের কী সম্বন্ধ?’

মষ্টু হাসল, 'চিরকাল মেয়েদের জন্য যুক্ত হয়েছে, কত রাজ্য ছারখার হয়ে গিয়েছে, তাই তা থেকে যে-আরাম হয় সেটার কোনো তুলনা হয় না। মানুষ তো কষ্ট পাবার জন্য এসব করে না। সে তোরা ঠিক বুঝবি না।' সত্যি ব্যাপারটা ওরা ঠিক বুঝল না এবং অনি মনেমনে একমর্ত হল না।

এখন তরমুজের ক্ষেত্রে পেরিয়ে কাশবনের ভেতর সরু পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তপন বলল, 'গুল মারিস না। রঞ্জ দেখেছে, বলে তুই অন্যরকম হয়ে গেছিস, না? রঞ্জ আজকাল আমার দিকেও তাকায়। আমি গান গাই জানে বোধহয়।'

চট করে ঘুরে দাঁড়াল মষ্টু, 'খুব খারাপ হয়ে যাবে তপন।' মুখ সামলে কথা বলবি। রঞ্জ ইজ মাই লাভার, আই লভ রঞ্জ।'

ভেট্চি কাটল তপন, 'ইস! তুই তুই জেনে বসে আছিস না যে রঞ্জ তোকে ভালোবাসে?'

একটু ধর্মত হয়ে মষ্টু বলল, 'আমি বললেই বাসবে।'

তপন চিৎকার করে উঠল, 'ঃঃঃ তোর কেনা চাকর নায় যখনই হকুম করবি তখনই ভালোবাসবে! আবার ডাঁট মারা হচ্ছে!'

'আলবত মারব। তুই কি পুরুষমানুষ যে রঞ্জ তোকে চাইবে? পরিস তো একটা ঢলতলে প্যান্ট, আবার কথা!' মষ্টুর কথাটা শনে তপন হাঁ হয়ে গেল। অনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কথা শনছিল। ওর মনে হচ্ছিল যে-কোনো মুহূর্তে ওরা মারামারি কর করে দেবে। কার কথাটা যে সত্যি বুঝতে পারছিল না ও। এতদিন ধরে মিশে অনি শনের এই ব্যাপারটার কথা একটুও টের পায়নি বলে নিজেই অবাক হচ্ছিল।

তপন বলল, 'তুই পুরুষ নাকি? পুরুষ হলে দাড়ি কামায়, বুঝালি! তুই দাড়ি কামাস?'

মষ্টু হাঁটাঁ খেপে সিয়ে দুই হাত আকাশে নেড়ে চ্যালেঞ্জ করে বসল 'ঠিক আছে তপন, তুই যখন প্রমাণ চাস তো প্রমাণ দেব। অনি, তুই শনলি সব, আমি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেন্ট করছি। বেশ তোর প্যান্ট খোল, অমরা দেখব।'

কেমন আমশি হয়ে গেল তপনের মুখ। বোধহয় এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কোনো কথা বলতে পারল না। অনিও চমকে গিয়ে মষ্টুর দিকে তাকাল।

সেইরকম বিজের হাসি হাসল মষ্টু, 'কাওয়ার্ড! শুধু মুখেই জগৎ জয় করিস। বেশ দ্যাখ আমার দিকে।' এই বলে ঘটপট করে ওর চাপা প্যান্ট খুলে ফেলল। প্যান্ট খোলার সময় অনি চট করে মুখ ঘূরিয়ে নিয়েছিল। ও দেখল মষ্টু বালির ওপর ওর শার্ট প্যান্ট ছাড়ে দিল। তারপর শনল মষ্টু বলছে, 'এবার দ্যাখ।' খুব সঙ্কেচে মুখ ফেরাল অনি। কোমরে হাত রেখে গোড়ালি উঁচু করে ব্যায়ামীরের মতো মষ্টু ঘুরে ঘুরে নিজেকে দেখাচ্ছে। ওর পরনে একটা সাদা ল্যাঙ্ট, ব্যায়াম করার সময় অনেকে পরে। আর সঙ্গে সঙ্গে অনির খুব খারাপ লাগতে আরঞ্জ করল। ওর নিজের একটা জাঙ্গিয়া দরকার তা কারও বেয়াল হয় না। এখন এই মুহূর্তে ও অনুভব করল জাঙ্গিয়া ল্যাঙ্ট না পরলে পুরুষমানুষ হওয়া যায় না। মষ্টু বলল, 'দ্যাখ, পুরুষমানুষ কাকে বলে। তুই লাইফে পরেছিস?'

তপন খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। কী বলবে বুঝাতে না পেরে অনির দিকে তাকাল। তারপর মুখ নিচু করে ও বলল, 'বুদ্ধদেব বলেছেন মনটাই সব, শরীর কিছু নয়।'

'সেব বাক্যি বইতে থাকে।' ফের জামাপ্যান্ট পরতে পরতে মষ্টু বলল, 'রঞ্জ যদি আমাকে এই ত্রেস দেখত তা হবে একদম ম্যাড হয়ে যেত।'

কথাটা শনে অনি হেসে ফেলল, 'ম্যাড হলে তো কামড়াবে!'

'দুস! সে-ম্যাড নাকি? তোদের সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই।' তারপর গলার স্বর তারী করে বলল, 'তপন, ফ্রেন্টশিপ রাখতে চাস তো ল্যাঙ্ট মারতে যাস না। আমি তোর চেয়ে আগে পুরুষ হয়েছে, আমার চাপ আগে। একেই শালা আমি জলেপুড়ে মরছি। কদমতলার একটা ছেলে রোজ বিকেলে ওদের বাড়ির সামনে নাকি তিনবার সাইকেলের বেল বাজিয়ে যায়। বল তোরা, এসব কি ভালো কথা?'

তপন যেন গ্রেক্ষণ এইসব কথা কিছুই শনতে পায়নি এমন ভান করে সামনের জঙ্গল দুহাতে সরাতে সরাতে বলল, 'আর ফ্যাক্ষাঁচ করিস না। যা দেখাবি বলেছিল তা কোথায়, নাকি সব শুল?'

শ্বার্টের বোতাম আটকে মন্তু বলল, ‘এ-শর্মা বলল, ‘এ-শর্মা তুম মারে না। চলে দেখাও, এই যে অনিমেষচন্দ্র, চলো, দেখব তোমার শরীর কেমন ঠাভা থাকে।’ কৃষ্ণটা ঘনে অনিমেষের কান গরম হয়ে গেল আচমকা।

জঙ্গলটা ধরে খানিক এগোতেই কয়েকটা মিহি গলা উন্নতে পেল অনিমেষ। আওয়াজটা কানে যেতে মন্তু হাত নেড়ে ওদের খামতে লাগল। ও মুখে কোনো কথা বলছে না, কিন্তু ইশ্বারা ইঙ্গিতে এমন একটা পরিবেশ চটপট তৈরি করে ফেল যে অনিমেষের মনে হল ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না। মন্তু এখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, ওরা পেছন পেছন মাথার ওপর কাশগাছ ছাদের মতো হচ্যে রয়েছে, দূর থেকে ওদের বুরতে পারবে না। ইঁটু দুটো ক্রমশ জালা করতে লাগল বালিতে ঘষা লেগে। কী-একটা সরসর করে ওদের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যেতে অনি ফিসফিস করে বলল, ‘এই, আজ বাড়ি চল।’

তপন বলল, ‘দূর বোকা, পটা তো শিয়াল।’

মন্তু হাসল, ‘ফৱ দেখে তয় পাছিস, টাইঞ্চেস দেখে কী করব?’ আর ঠিক সেই সময় একগাদা হাসি ছিটকে এল ওদের দিকে। মেয়েলি গলায় কে যেন কী-একটা কথা বলে উঠল চেঁচিয়ে। আর একটু এগোতেই জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এল। জলের শব্দ হচ্ছে ছলাং-ছলাং করে। অনিমেষ দেখল মন্তু কাশগাছ সরিয়ে ছোট একটা ফাঁক তৈরি করেছে। অনিমেষ আর তপন ওর পাশে মাথা রাখতেই পুরো নদীটা সিনেমার মতো ওদের সামনে উঠে এল তিস্তাৰ জল এখন অত ঘোলা নয়, করলা নদীৰ চেয়ে একটু অপরিক্ষার। নদীটা এখানে বাক নিয়েছে সামান্য। প্রথমে কাউকে নজরে এল না অনিমেষের, শুধু একটা মেঘে গান গাইছে এটা বুরতে পারছিল। গানের সুরটা অদ্ভুত মিষ্টি, অথচ কেন কান্না-কান্না গলায় মেঘেটি গাইছে। ওকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে, কিন্তু বুরতে অসুবিধে হয় না যে গাইছে তার বুর দুঃখ। আর এই সময় অন্য কেউ হাসাহাসি করছে না আগের মতো। শুধু ছলাং-ছলাং শব্দ যেন সেই গানের সঙ্গে আবহসকীভোর মতো বেজে যাচ্ছিল। ভালো করে কান পাতলা অনি, মেঘেটি গাইছে—

‘এবে আজ্জে এবে সঙ্গে

ওহে পরতু মুই

নাই বহিম মুই ঘরেরে পরভু,

হামু না যামু অরণ্যে জঙ্গলেরে।’

মন্তু ফিসফিসিয়ে বলল, ‘মেঘেটা ঘরে থাকবে না বলছে, জঙ্গলে চলে যাবে রে।’

হঠাত তপন বাঁদিকে সরে শিয়ে জঙ্গলটা ফাঁক করল। করেই বুব উভেজিত হয়ে ওদের ডাকল। অনিমেষ নড়বার আঁশেই মন্তু ঝাপিয়ে পড়ে জায়গা করে নিয়েছে। ঝুটোতে চোখ রেখে অনিমেষ দেখতে পেল প্রায় আট-দশজন মেঘে ছোট ছোট কাঠ জল থেকে পাঢ়ে টেনে তুলছে। দুজন সাতোরে নদীৰ মধ্যে চলে গেল। আর একটু দূরে বালিশ ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে একটি প্রোঢ়া চোখ বদ্ধ করে গান গাইছে যা ওরা এতক্ষণ উন্নতে পাচ্ছিল।

মন্তু বলল, ‘কী রে, কেমন দেবছিস?’

আর তখনই ওর নজরে পড়ল, মেঘেগুলোর কেউ শাড়ি জামা পরে নেই। কোমর থেকে একটা কাপড় গোল করে জড়িয়ে রেখেছে সবাই। ওপরে কাশগাছের গায়ে অনেকগুলো জামাকাপড় স্তুপ করে রাখা আছে, বোধহ্য জলে ভিজে যাবে বলে এই পোশাকে সবাই জলে নেমেছে। ওদের নিচ্ছয়ই বেশি জামাকাপড় নেই; কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে অনির কেমন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল। এখন এই নির্জন নদীৰ তীরে এতগুলো নারীৰ বিস্তু অকারোৰ বুক দেখতে দেখতে ওৱ শৰীৱে অদ্ভুত একটা শিরশিরানি জন্ম নিল। তাকিয়ে থাক্কুত ওৱ ক্রমশ কষ্ট হতে লাগল, আৱ তখনই ওৱ কানে এল মন্তু বলছে, ‘কীৱে অনি, তোৱ মুখ এত লাল হয়ে গেল কী কৱে?’

তপন বলল, ‘বেদিং বিউটি একেই বলে, আহা! থ্যাঙ্ক ইউ মন্তু।’

দূরে তিস্তার মধ্যখানে সেই মেঘে দুটো কিছু বলে চেঁচিয়ে উঠতে উপটপ এৱা কয়েকজন জলে ঝাপ দিল। অনি দেখল তিস্তার ঠিক মাঝেবৰাৰ একটা বিৱাট গাছের গুড়ি ভেসে যাচ্ছে। গুড়িটাৰে অনেকখানি জলেৰ নিচে ডোবা, কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা থেকে এৱ আকৃতিটা বোকা যায়, এটাকে

দেখতে পেয়েই মেয়েগুলোর মধ্যে দারুণ উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে। এতক্ষণ যে গান গাইছিল সে এখন উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত মখের দুপাশে আড়াল করে সাঁতরে-যাওয়া মেয়েগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছিল। আগে মেয়ে দুটো যে লৰা দড়ি কোমরে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে অনি তা দেখেনি। এখন সেগুলোর ডগা চটপট ভেসে-যাওয়া গুঁড়িটার গায়ে গিটি দিয়ে বেঁধে ফেলে ওরা নিচিত হল। গুঁড়িটা কিন্তু ভেসেই যাচ্ছে। ততক্ষণে অন্য মেয়েরা গিয়ে সেই দড়িগুলোর অন্ত ধরে ফেলেছে। হঠাত একটা অদ্ভুত সুরেলা চিঢ়কার থেমে-থেমে ভেসে আসতে লাগল। গুঁড়িটা এত বড় যে মেয়েদের সরাসরি টেনে আনার সাধ্য নেই। তাই ওরা ওটাকে স্নোতের টানে চলে যেতে দিয়ে মাঝে-মাঝে হ্যাঁচাকা টানে একটু করে তাঁরের দিকে সরিয়ে আনছে। আর টানবার সময় সেই সুরেলা চিঢ়কার বোধহয় ওদের শক্তি যোগাচ্ছে বেশি করে। মগ্ন হয়ে ওদের পরিশ্রম দেখছিল অনি। মেয়েগুলোর শক্তি ওদের শরীর দেখে আঁচ করা যায় না।

নতুন স্যার কয়েক দিন আগে ওদের কয়েকজনকে নিয়ে শিকারপুর চা-বাগানের কাছে একটা জঙ্গলে শিয়েছিলেন। সেখানে একটা পোড়ো মন্দির আছে। জলপাইগুড়ি থেকে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। মন্দিরটা তিস্তা থেকে খুব দূরে নয়। স্লোকে বলে ওটা নাকি দেবীচৌধুরাণীর প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির। ডাকাতি করার আগে এ-অঞ্চলে এলে পুজো দিয়ে যেতেন। এই তিস্তার ওপর দিয়ে দেবীচৌধুরাণীর বজরা ভেসে যেতে কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ হয়। এখন ওর মনে হল এইসব মেয়ে পরিশ্রমের দিক দিয়ে দেবীচৌধুরাণীর চেয়ে একটুও কম ন্য। গাছের গুঁড়িটা স্নোতের টানে দ্রুশ চোখের আড়ালে চলে গেলেও অনি বুঝতে পারল সেটা তাঁরের দিকে চলে এসেছে এবার মেয়েগুলো যদি তাঁরের ওপর ওঠে শৃণ-টানার মতো করে গুঁড়িটাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে তা হলে ওদের নির্ধারিত দেখতে পাবে। বার্নিশ কিং সাহেবের ঘাটের শৃণ-টানা দেখেছে ও। এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার। অনি পাশ ফিরে তাকিয়ে বস্তুদের দেখতে পেল না। একটু আগেও ওরা এখানে ছিল, এত সন্ত্বনে এখান তেকে সরে শিয়েছে যে সে টের পায়নি। এনিকে মেয়েগুলোর চিঢ়কার বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে, বোৰা যাচ্ছে পাড়ে উঠে পড়েছে ওরা, এবার শৃণ-টানা শুরু হবে।

মাথা নিচু করে ভেঙে-যাওয়া কাশবনের চিহ্ন দেখে ও জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। খানিক দূর আসার পর ও বস্তুদের দেখতে পেল। অনি যে পা টিপে টিপে ওদের পেছনে এসেছে তা যেন ওরা টের পেল না। দুজনেই ইঁটু গেড়ে বসে সরবিকু দেখেছে। অনি তপনের পিঠের ওপর হাত রাখতেই ভীষণ চমকে উঠে ওকে দেখতে পেয়ে নিশাস ফ্যালে সে, ‘ঃঃ, চমকে দিয়েছিলি!’ কথাটা একটু জোর হয়ে যেতেই পাশ থেকে মন্তু ওর পেটে জোরে চিমিটি কাটল। তপনের মুখ দেখে বোৰা যাচ্ছে ব্যাথা লেগেছে খুব কিন্তু সেটা ও হজম করে নিল। কী দেখছে ওরা বোৰার জন্য অনি কাশবনের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিল। প্রথমে বুঝতে পারেনি, পরে স্পষ্ট হল, সামনে এক চিলতে খোলা বালির ওপরে দুটো শরীর প্রচও আক্রমণে কৃতি লড়ছে। অনেকক্ষণ ধরে লড়াইটা হচ্ছিল। অনি দেখতে আসার সময়মতায় একজনকে প্রায় কবজা করে ফেলেছে প্রতিদ্বন্দ্বী। এরকম এক নিঝন জঙ্গলের মধ্যে ওরা কৃতি করছে কেন বুঝতে না পেরে অনি হাঁ করে দেখল বিজীর উঠে দাঁড়াল, বিজিত শুয়ে আছে চিত হয়ে বালিতে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল অনি। এরা দুজনেই মেয়েমানুষ। যে শয়ে আছে অসহায়ের ভঙ্গিতে, একটা হাত চোখের ওপর আড়াল কলে, তার বয়স হয়েছে; শরীরটা কেমন চলচলে। যে জিতল, তার উঠে দাঁড়ানাতে একটা গর্ব ফেটে পড়ছিল যা তার অল্প বয়সের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যাচ্ছিল। তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। খুব গর্বিত ভঙ্গিমায় সে ছেড়ে-রাখা জামাকাপড় পরতে লাগল। হঠাত ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনির মনে হল শরীরে যেন অনেক জুর এসে গেছে। গলা জিভ দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনির মনে হল শরীরে যেন অনেক জুর এসে গেছে। গলা, জিভ শুকনো। একটু একটু করে কপালে ঘাম জমছে। পায়ে কোনো সাড়া নেই। যুবতী যাবার সময় থুক করে শয়ে-থাকা প্রোঢ়ার দিকে একদলা থুতু ফেলে চলে গেল, প্রোঢ়া সেই ভঙ্গিতেই পড়ে থাকল কিন্তুক্ষণ, তারপর হঠাত উপড় হয়ে চাপা গলায় ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগল, মন্তু ফিসফিস করে বলল, বেচারা বরটাকে হারাল।’ এর আগে কী কথা হয়েছে যেরে দুটোর মধ্যে অনি শোনেনি তাই মন্তু-কথাটা বলতে ও ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু ওর শরীর এরকম করছে কেন?

মানুষের শরীরের মধ্যে যে আর-একটা শরীর আছে এই প্রথম অনিমেষ অনুভব করল। ওর সর্বাঙ্গে কাটা দিয়ে উঠল। হঠাত কী-একটা বোধ ওর মেরুদণ্ডে টোকা মারতেই ও তাঁরের মতো জঙ্গল তেদ করে দোভাতে লাগল। পেছনে মন্তুর চাপা গলায় ডাক পড়ে থাকল। ওর হাত-পা ছড়ে যাচ্ছিল

কাশগাছে, কিন্তু তরমুজের ক্ষেত্রে পেরিয়ে বালিতে না আসা অবধি ও থামল না।

এই শরীরটা ওর চেনা ছিল না আচর্ষ, এই সময় আর কানের কাছে সেই গলাটা শুনতে পাচ্ছিল না যে তাকে মাঝে মাঝে সঠিক পথ বলে দেয়।

পেছন ফিরে তাকিয়ে ও কাউকে দেখতে পেল না। এই বিরাট ফাঁকা বালির চরে দাঁড়িয়ে ওর মনে হল আজ সে যে-কাজটা করে ফেলেছে তা কাউকে বলা যাবে না। দাদু-পিসিমাকে একথা বলাই যাব না। তাছাড়া দাদু পিসিমার সঙ্গে ক্রমশ যে ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে সেটা প্রতিদিন ও টের পাছে। বাবার সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নই উঠে না। সেই ঘটনার পর বাবা নাকি খুব চৃপচাপ হয়ে গেছেন। জলপাইগুড়িতে যখন আসেন তখন গঞ্জির হয়ে থাকেন। এমনকি ছেট্যাও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। সেই ঘটনার কথা ভুলেও তোলে না, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না।

না, কেউ নেই। মা বলতেন কোনো কথা লুকোবি না অনি, আমার কাছে সব কথা খুলে বললে কোনো পাপ হবে না। অনেক দিন পর অনির বুকটা টনটন করতে লাগল মায়ের জন্য। যত দিন যাচ্ছে রাত্রিবেলায় আকাশের দিকে তাকালে তারাগুলো তারাই থেকে যাচ্ছে, সূর্যের মতো সেগুলো এক-একটা নক্ষত্র জ্যানার পর এখন আর মা ওর সঙ্গে মনেমনে কথা বলেন না।

অল্পবয়সি মেয়েটার শরীরটা, যেন চেতের সামনে থেকে সরানো যাচ্ছে না। সেই অনেক দিন আগে দেখা কামিনিটার কথা চট করে মনে পড়ে গেল আজ। তখন তো এমন হয়নি। তখন তো মাকে স্বচ্ছদে সব কথা খুলে বলতে পেরেছিল। চিকিত্বে ও কপালে শর্কটা লিখে কয়েক বছর আগে শেখা রামকৃষ্ণের প্রণাম-মঞ্চটা উচ্চারণ করল। এবং এবার আচর্যভাবে কোনো কাজ হল না। কী-একটা আক্রমণে ও লাধি মেরে একগাদা বালি ছড়িয়ে নিজের অজাতে জেলা স্কুলের দিকে দৌড়াতে লাগল।

॥ সাত ॥

জেলা স্কুলের পাশে তিস্তার কিনারে একটা নৌকো বালিতে আটক হয়ে আছে জল শুকিয়ে যাওয়া থেকে। অনেকটা পথ মৌড়ে অনিমেষ সেখানে থামল। এখন সমস্ত শরীরে কুলকুল করে ঘাম নামছে, জোর ওঠানামা করছে বুকটা। ও নৌকোর গায়ে ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ চৃপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। মণ্ডু বা তপনকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। মণ্ডুরা এখানে প্রায়ই আসে। কেন আসে তা এতদিন জানত না সে, আজ জানতে পেরে নিজেকে আরও ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছিল। ইদানীং স্বাস্থ্য তালো হচ্ছে বুবতে পারছে ও। রোজ সকাল-বিকেল ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ করে বেশ খিদে পায়। হাত ভাঁজ করলে বাইসেপ্শনে চমৎকার ফুলে উঠে। নতুন স্যার বলেছেন চে জাতির স্বাস্থ্য নেই তাদের কিছুই নেই। তাই প্রতিটি কিশোর নাগরিকের উচিত নিজের শরীরের প্রতি যত্ন তিন ইঞ্চি ছাঁয়ে ফেলেছে। পড়ার ঘরে ক্ষেল দিয়ে দেওয়ালে ছেট ছেট করে মাপ দিয়ে মাঝে-মাঝেই উচ্চতা জরিপ করে নেয় অনিমেষ। বঙ্গদের মধ্যে অনেকেই গোফের রেখা দেখা গেছে, কিন্তু ওর মুখ একদম পরিষ্কার। পিসিমা বলেন মাকুলদের নাকি গোফদাঢ়ি হয় না, তাই তোরবেলায় তাদের মুখদর্শন করলে অ্যাত্তা হয়। কী করে হয় ওর মাথায় ঢোকে না। বাচ্চা ছেলের মুখ দেখলে যদি অ্যাত্তা না হবে তো বয়স্ক মানুষের গোফছাড়া মুখ দেখলে তা হবে কেন? তা হলে যাদের মাথাজুড়ে টাক, একটাও চূল নেই, তাদের দেখলেও অ্যাত্তা হবেও পিসিমার সঙ্গে ও প্রাণপন্থে এসব তর্ক চালিয়েও জিততে পারে না শেষ পর্যন্ত। পিসিমার শেষ অংশ, তাই এখনও ছেট-এসব বুরাবি না। হঠাৎ হেসে ফেলল অনিমেষ, তারপর মনেমনে বলল, আজ থেকে আমি আর ছেট নই, আমি এখন বড় হয়ে গেছি। একদিন মণ্ডু বলেছিল পেসিলের মুখাদ্বা রেডের গোল গর্তে টাইট করে চমৎকার গোক কামানো যায়। অনিমেষ ঠিক করল এবার মাঝে-মাঝে ও এই কায়দাটা করবে, তা হলে গোক বেঙ্গলে দেরি হবে না মোটেই। আর হাঁ, ওর জমানো চার টাকা ছয় আনা দিয়ে একটা জাঙিয়া কিনতে হবে। একা যেতে পারবে না সে, মণ্ডুকে নিয়ে যেতে হবে দিনবাজারে। জাঙিয়া না পরলে পুরুষমানুষ হওয়া যাব না।

চৃপচাপ ও জেলা স্কুলের পাশের রাস্তাটায় উঠে এল। এখন প্রায় বিকেল। আকাশ সামান্য মেঘলা বেল রোদটা মোটেই গায়ে লাগেনি এতক্ষণ। মাঠের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে অনিমেষ দেখতে পেল নতুন স্যার ওকে হাত নেড়ে ডাকছেন। এই সময় নতুন স্যারকে এখানে দেখতে পাবে ভাবেনি অনিমেষ। এতদিন হয়ে গেলি নিশ্চিথবাবু এখানে আছেন, তবু নতুন স্যার নামটা আংটির মতো ওর অঙ্গে ঝটে আছে। আর-একটা মজার ব্যাপার এই যে, অনিমেষ এতটা বড় হল তবু নতুন স্যার একই

রকম আছেন। চেহারায় একটুও বুড়ো হননি। অনিমেষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে মেপে দেখেছে যে তার আর নতুন স্যারের উর্কতায় পার্থক্য খুব বেশি নয়।

কাছাকাছি হতে নতুন স্যার বললেন, ‘কোথায় গিয়েছিলে অনিমেষ?’

অনিমেষ বলল, ‘তিস্তার চরে বেড়াতে।’

নতুন স্যার যেন অবাক হলেন প্রথমটায়, তারপর হাসলেন, ‘ও, তরমুজ খেয়ে এলে বুঝি, ওরা প্রায়ই কমপ্লেন করে স্কুলের ছেলেরা নাকি তুরি করে তরমুজ লিয়ে আসে।’

অনিমেষ বলল, ‘না, আমি তরমুজ খাইনি।’

নতুন স্যার কথাটা শনে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় এ-ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে চাইলেন না, ‘ও গুড, হ্যাঁ শোনো, তোমাকে একটা কথা বলার আছে। তুমি তো এখন বড় হয়েছ, তোমার সঙ্গে আমি ফ্র্যাক্ষলি সব কথা বলে আসছি এতকাল তাই এই ব্যাপারটা বলতে কোনো সংক্ষেপ অবশ্য আমি বোধ করছি না। কিন্তু তোমাকে আশাস দিতে হবে, এটা কাউকে বলবে না।’

নতুন স্যার ওর মুখের দিকে চেয়ে কথা মেষ করতে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। সেই ক্লাস প্রি থেকে আজ অবধি কোনোদিন নতুন স্যার ওর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেননি। অনিমেষ খুব বিচলিত গলায় বলল, ‘না না স্যার, আমি কাউকে বলব না, আপনি যা বলেন তা আমি কখনো অমান্য করি না।’

শেষ কথাটা বলতে শিরে অনিমেষ হঠাৎ আবিকার করল ওর গলাটা কেমন অসুস্থ শোনাল নিজের কাছেই। খুব খুশি হয়ে নতুন স্যার ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, ‘আমি জানি। এই স্কুলে তুমই একমাত্র তৈরি। আমি বিরামদাকে বলেছি তোমার কথা।’ ওর সঙ্গে কয়েক পা হেঁটে হঠাৎ গলার স্বর পালটে নতুন স্যার বললেন, ‘আচ্ছা, মণ্টু ছেলেটা কেমন?’

আচছিতে প্রশ্নটা আসায় থত্তমত হয়ে গেল। কেন? কোনোরকমে বলল সে।

নতুন স্যার বললেন, ‘ওর সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে। এই এত অল্প বয়সে ও দেশের কথা না ভেবে নোংরা আলোচনা করে শুনতে পাই। তুমি তো ওর সঙ্গে মেশ, তাই জিজ্ঞাসা করছি।’

কোনোরকমেই অনিমেষ মিথ্যে কথা বলতে পারছিল না। আবার আচর্য, সত্যি কথাটা বলতে ওর একটুও ইচ্ছে করছে না। আসলে মণ্টু যা বলে এবং আজ একটু আগেও যা দেখিয়েছে তার মধ্যে এমন একটা সরলতা থাকে যে ব্যাপারটা খারাপ হলেও অনিমেষের মনে হয় না যে খারাপ। এখন মট্টুর বিকলে কিছু বললে নতুন স্যার নিশ্চয়ই তা হেডস্যারকে বলবেন এবং তা হলে মট্টুর কাছে ও মুখ দেখাবে কী করে? এই সময় নতুন স্যার আবার বললেন, ‘আমার সন্দেহ হচ্ছে বিরামদার বাড়ির সামনে অশীল অক্ষরটা মণ্টুই লেখে।’

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, ‘না না, এ একদম মিথ্যে কথা, মণ্টু কখনো লিখতে পারে না।’

ওকে আপাদমস্তক দেখে নতুন স্যার বললেন, ‘তুমি বলছ?’

বেশ আঘ্যপ্তায় নিয়ে অনিমেষ জবাব দিল, ‘হ্যাঁ।’

এই কথাটা ওকে মিথ্যে বলতে হচ্ছে না। কথা বলতে বলতে ওরা বিরামবাবুর গেটের সামনে এসে গিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে বিরামিতে মুখটা বেঁকলেন নতুন স্যার। অনিমেষ দেখল এখন বিরামবাবুর নামের আঘে কাঠকঙ্কলা দিয়ে অক্ষরটি লেখা আছে। বেশ উভেজিত গলায় নতুন স্যার বললেন, ‘দেখছ, কী রুচি স্থানীন ভারতের ছেলেদের! ছি ছি ছি! বিরামদার মতো একজন রেসপেক্টবল কংগ্রেসি কি এখানকার ছেলেদের কাছে একটু সৌজন্য আশা করতে পারেন না? আচ্ছা, লেখাটা কি তোমার পরিচিত মনে হচ্ছে অনিমেষ?’

অনিমেষ কিছুক্ষণ দেখে ঠাওর করতে পারল না। অক্ষরটা তো এইরকমই হয়। তাকে লিখতে বললেও সে এইরকম লিখত। সরলভাবে ঘাড় নাড়ল সে। নতুন স্যার কয়েক পা হেঁটে হাত দিয়ে অকে মুছতে চেষ্টা করতে সেটা কেমন ঝাপসা হয়ে ধেবড়ে গেল। তারপর কুমালে হাত মুছতে মুছতে বললেন, ‘এই ব্যাপারটা আর বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। যে করছে তাকে ধরতে হবে। এ-ব্যাপারে তোমাদের সহায় চাই অনিমেষ।’

কী সাহায্য করবে বুবতে না পেরেও ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। আর এই সময় ও দেখল গেটের

ভেতরে বাগানে একটা ছোট কুকুরকে চেনে বেঁধে মুভিং ক্যাসেল হেঁটে আসছেন। মুভিং ক্যাসেলের তুলনায়, কুকুরটা এত ছোট যে ব্যাপারটা মানচিল না। টকটকে লাল শাড়ি পরেছেন মুভিং ক্যাসেল, ঢোক টেনে নেয়। হঠাৎ গেটের কাছে ওদের দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে এলেন তিনি, ‘ওমা, নিশ্চিথ! কথন এলো? সারাদিন তোমার কথা ভাবছিলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, ভেতরে এসো।’

গলার শব্দটা এত যিহি এবং মোলায়েম এবং কাঁপা-কাঁপা যে অনিমেষ আজ অবধি কাউকে এভাবে কথা বলতে শোনেনি। ও অবাক হয়ে শুনল নতুন স্যার এতক্ষণ যে-গন্যায় কথা বলেছিলেন তা যেন মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। কেমন বিগলিত ভঙ্গিতে নতুন স্যার বললেন, ‘একটু দেরি হয়ে গেল, বিরামদা আছেন?’

অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘আঃ বিরামদা আর বিরামদা, আমার কাছে বুঝি আসতে নেই? আমি না ধাকলে তোমাদের বিরামদা হত? আরে, ভেতরে এসো-না।’

চট করে পেট খুলে ভেতরে গিয়ে অনিমেষের কথা মনে পড়তে নতুন স্যার ঘুরে দাঁড়ালেন। মুভিং ক্যাসেল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ছেলেয়িট কে?’

নতুন স্যার বললেন, ‘আমার ছাত্র অনিমেষ।’

‘অ। তুমি একদিন এর কথা বলেছিলে, নাঃ বেশ বেশ। খুব যিষ্টি দেখতে তো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো-না আমাদের বাড়িতে।’ মুভিং ক্যাসেল মাথা নেড়ে অনিমেষকে ডাকলেন।

কী করবে বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। ওর মনে হল এখন চলে যাওয়াই উচিত, নাহলে নতুন স্যার হয়তো বিরক্ত হবেন। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই নতুন স্যার ওকে ডাকলেন, ‘এসো অনিমেষ।’

অনিমেষ ভেতরে এসে গেটটা বৰ্ক করতেই মুভিং ক্যাসেলের বুকুরটা ওর পায়ের কাছে শরীর ঘমতে লাগল। একরাতি কুকুরটার কাও দেখে ও অবাক। মুভিং ক্যাসেল শরীর দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ‘আমার জিমির দেখছি পছন্দ খুব। তোমাকে ওর খুব ভালো লেগেছে।’ বলে চেনটা অনিমেষের হাতে দিয়ে দিলেন।

নতুন স্যার মুভিং ক্যাসেলের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন বারান্দার দিকে, পেছন পেছন কুকুর নিয়ে অনিমেষ। কয়েক পা হেঁটে প্রকৃতির ডাক শুনতে পেল জিমি। পেছনে দুই পা তেঙে বসে জলবিয়োগ করতে লাগল সে। চেন-হাতে দাঁড়িয়ে খুব অস্থিতিতে পড়ল অনিমেষ। এখানেই মানুষের সঙ্গে পতুর তফাত, মনেমনে ভাবল সে, যতই আদর করল মুভিং ক্যাসেল একে, সময়-অসময় জ্ঞানটা শেখাতে পারবেন না। কুকুরটা আনন্দে গুটগুট করে চলতে শুরু করলে অনিমেষ বারান্দার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। লম্বা বারান্দার তিনদিক মানিপ্ল্যাটে ঢাকা তবে ভেতরে দাঁড়ালে সামনের রাস্তা এমনকি ওদের স্কুলের অনিমেষের হাত থেকে চেনটা নিয়ে জিমির গলা থেকে খুল সেটাকে চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। জিমি এখন তাঁর বুকের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে। ঘরে চুক্তে চুক্তে মুভিং ক্যাসেল অনিমেষের হাত থেকে চেনটা নিয়ে জিমির গলা থেকে খুল সেটাকে চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। জিমি এখন তাঁর বুকের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে। ঘরে চুক্তে চুক্তে মুভিং ক্যাসেল ঘাড় নেড়ে ডাকলেন, ‘এসো।’

দেওয়ালজুড়ে গাঁকীজির ছবি। বাবু হয়ে বসে চৰকা কাটছেন। মুখে এমন একটা প্রশান্তি আছে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বিরাট ফ্রেমে হাতে-আঁকা এৱকম জীবন্ত ছবি এর আগে দেখেনি অনিমেষ। এদিকের দেওয়াল আলমারি আর তাতে মোটা-মোটা বই ঠাস। আলমারির সামনে সাদা রঙের বেতের সোফাসেট। তার একচিত্তে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। মাথাৰ চূলে সামান্য পাক ধরেছে, খুব রোগা এবং বেঁটে মানুষ। গায়ে ফিলফিনে আদিৰ গিলে-কৱা পাঞ্চাবি। ওদের দেখে সোজা হয়ে বসলেন, ‘আরে নিশ্চিথ যে, এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।’

গলার শব্দ এত সুর যে চোখ বন্ধ করে শুনলে বোৰা যাবে না যে কোনো পুরুষমানুষ কথা বলছে! কিন্তু সুর হলেও এঁর বলার ধরনে এমন একটা সুর আছে যে সহজেই আকৃষ্ট করে। নতুন স্যার সোফাটাই বসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘শরীর কেমন আছে বিরামদা?’

বিরামবাৰ বললেন, ‘আমার তো তো চিৰকেলে হাঁপানি রোগ, বাতাস চললেই বাড়ে। ভালো আছি, বেশ আছি-য়তটা থাকা যায়। কিন্তু কিছু ব্যবস্থা হল?’

নতুন স্যার বললেন, ‘এখনও হ্যানি, তথে অ্যাদিন তো তেমন চেষ্টাও হ্যানি। আঃ যি কিছু দিস্তা

করবেন না, কয়েকদিনের মধ্যে এটা যাতে বক্ষ হয় তার ব্যবস্থা করব। আমার সঙ্গে বনবিহারীবাবুর কথা হয়ে গেচে, তা ছাড়া হোটেলের ছেলেদের ফ়েপ করে শুয়াচ রাখতে বলেছি।'

বিরামবাবু সরু করে বললেন, 'ঞ্চেজ! কাদের জন কাজ করব বলো। এই ডো সব চেহারা। অবশ্য যারা প্রিটকে হত্যা করেছিল, গালীকে শুলি করেছে, তারা যে আমার বাড়ির সামনে অগ্নীপাত্র অক্ষর লিখবে এটাই তো স্বাভাবিক, না?'

এই সময় মুভিং ক্যাসেল অনিমেষের পাশে দাঁড়িয়ে কেমন গলায় বলে উঠলেন, 'তোমার ঠাকুর্দার আর খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না যে এরকম হতজাড়া নাম রাখল। বিরাম যে কারও নাম হয় জীবনে শুনিনি।'

বিরামবাবু হাসলেন, 'আসলে আমাদের সংসারে অনেক ছেলেমেয়ে আসছিল বলেই বোধহয় ঠাকুর্দা আমার নামকরণের মাধ্যমে স্বাইকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। তা এই ছেলেটি কে?'

নতুন স্যার কিছু বলার আগেই মুভিং ক্যাসেল বলে উঠলেন, 'নিশ্চিতের ছাত্র। তারি সুন্দর দেখতে, চিবুকটা দেখেছে।'

কথাগুলো তার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গিমায় বললেন উনি যে মৃহুর্তে লাল হয়ে গেল অনিমেষ। কিন্তু ততক্ষণে নতুন স্যার বলতে শুরু করেছেন, 'ভীষণ সিরিয়স ছেলে এ, প্র্যাকটিক্যালি এই স্কুলে অনিমেষই আমার নিজের হাতের তৈরি। ও দেশের কথা তাবে, কংগ্রেসকে ভালোবাসে। ওকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে, কারণ এই ইলেকশনে আমি চাই ও কাজ করুক। একটু প্র্যাকটিক্যালি অঙ্গজ্ঞতা হোক।'

মুভিং ক্যাসেল বলে উঠলেন, 'কিন্তু এ যে একদম বাঢ়া ছেলে!'

বিরামবাবু হাসলেন, 'তুমি অবশ্য রান্নাঘরে ঢোক না, তাই বলে যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না? আমরা কবে পলিটিক্স শুরু করিঃ আরে এসব কি তোমার এম এ পাশ করে চাকরি নেবার মতো ব্যাপার?'

নতুন স্যার হাসলেন, তারপর অনিমেষের দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যস, তোমার সঙ্গে বিরামদার আলাপ হয়ে গেল।'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল প্রণাম করলেই তালো হয় কিন্তু সেটা করতে ওর একদম ইচ্ছে করছিল না। হাতজোড় করে নমস্কার করতেই বিরামবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'খুশি হলাম, বড় খুশি হলাম। আমাদের পার্টি অফিসে যাওয়া-আসা আরও করো।'

মুভিং ক্যাসেল জিগিকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিমেষের হাত ধরলেন, 'ব্যস দীক্ষা হয়ে গেল তো, এবার তুমি আমার হেফাজতে। থ্রেথ দিন এলে, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও, এসো।' মুভিং ক্যাসেল ওর হাত ধরে অন্দরমহলে নিয়ে এলেন।

তেতরে একটা প্যাসেজ, প্যাসেজের পাশ দিয়ে ঘৰগুলো। অনিমেষের মনে হল ওর তেতরে আসার আগে কেটে-কেউ এখানে ছিল, ওদের আসতে দেখে দ্রুত সরে গেল। জিগি এখন যেন ঘুমিয়ে আছে এমন ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেলের বুকে পড়ে আছে। ডানপাশের প্রথম ঘরটায় ওকে বসতে বলে মুভিং ক্যাসেল তেতরে চলে গেলেন। অনিমেষ দেখল একটা সুন্দর খাট আর তাতে বিরাট বেডকভার জড়ে নীল রঙের ময়ুর কাজ করা আছে। ঠিক সামনেই একটা হাতলহীন সোফা, ইচ্ছে করলে শোওয়াও যায়, অনিমেষ সেটায় বসল। সামনেই একটি অঙ্গুরবাসি মেয়ের ছবি, ভীষণ সুন্দর দেখতে, তাকানোর ভঙ্গিটায় এমন অস্তুত আদুরোপনা আছে যে তালো না লেগে যায় না। খুব চেনা-চেনা মনে হতে ও বুঝে ফেলল ইনিই মুভিং ক্যাসেল, নিচয় অনেককালের ছবি, এখনকার চেহারার সঙ্গে মিল বলতে শুধু চোখে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুভিং ক্যাসেল তেতরে এলেন, 'কী দেখছ?'

অনিমেষ মুখ নামিয়ে বলল, 'আপনার ছবি।'

বুব অবাক এবং খুশি হলেন মহিলা, 'ওমা, ছেলের দেখছি একদম জহুরির চোখ। অনেকেই চিনতে পারে না। আমরা মেজা মেয়ে বলে, মা কী ছিলেন আর কী হয়েছেন।' কথাটা শেষ করতে করতে বাঢ়া মেয়ের মতো বিলখিল করে হেসে উঠলেন উনি। আর বোধহয় চমকে গিয়ে জিগি চোখ মেলে ওর বুকের মধ্যবানের খোলা উচু সাদা চামড়ায় টট করে জিভটা বুলিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে খেপে

গেলেন মুভিং ক্যাসেল, ‘আঃ, কী অসভ্য কুকুর রে বাবা, যা পছন্দ করি না তা-ই করবে! নাম তুই কোল থেকে নাম!’ ধমকে ওকে বিছানায় নামিয়ে দিতে কুকুরটা সুড়সুড় করে ময়ুরের পেটের ওপর গিয়ে কুঙ্গলী পাকিয়ে শুধে পড়ল। যেন খুব পরিশ্রম হয়েছে এমন ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেল বিছানায় ধপ করে বসে পড়লেন, তারপর আঁচল দিয়ে জিমির লালা বুক থেকে মুছে বললেন, ‘তোমরা কোথায় থাক?’

‘টাউন ক্লাবের কাছে।’ অনিমেষ বলল।

‘ওমা তাই নাকি! একই পাড়ায় আছি অথচ এতদিন তোমাকে দেখিনি! তোমরা কয় ভাইবোন?’

‘আমার ভাইবোন নেই, দানু-পিসিমার কাছে থাকি।’

‘কেন, তোমার বাবা-মা?’

‘বাবা স্বর্গহেঁড়া চা-বাগানে আছেন।’ অনিমেষ মায়ের কথাটা বলতে শিয়েও বলল না। ও দেখল পাশের দরজা দিয়ে একটি মেয়ে হাতে ছোট ডিশ নিয়ে ঘরে এল। মেয়েটি বেশ বড়, শাড়ি পরা, গায়ের রং ফরসা তবে খুব সুন্দরী নয়। একে অনিমেষ দেখেছে রিকশা করে বই নিয়ে আনন্দচন্দ্র কলেজে যেতে। মেয়েটির নাম নিচ্যহই মেনকা। কারণ বিবাহ করের তিন মেয়ের মধ্যে একজনই শাড়ি পরে এবং তার নাম তো এই। মেনকার হাতের ডিশে চারটে সন্দেশ।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘মানু, এই ছেলেটির নাম অনিমেষ, আমাদের নিশ্চীথের প্রিয় ছাত্র। বেশ মিষ্টি চেহারা, না?’

মেনকা হাসল, তারপর অনিমেষকে বলল, ‘এটা খেয়ে নাও তো লজ্জী ছেলের মতো।’

কপট রাগে ভঙ্গি করল মেনকা, ইস একটুখানি ছেলে, আবার না না বলা হচ্ছে! দেখি হাঁ করো তো, আমি খাইয়ে দিছি।’ একটা সন্দেশ হাতে তুলে অনিমেষের মুখের কাছে নিয়ে এল মেনকা। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে অগত্যা অনিমেষ মুখ করে দেখছিলেন, এবার বললেন, ‘তা তুমি আমাকে কী বলে ডাকবে বলো তো?’

সন্দেশটা গিলতে গিলতে অনিমেষ বলতে গেল মাসিমা, কিন্তু তার আগেই মেনকা বলে উঠল, ‘দাঁড়াও, তোমাকে আমি হেঁল করছি। আচ্ছা বাপীকে তোমার নিশ্চীথদা কী বলে, দাদা তো? বেশ, তা হলে যা হল তার বউদি। তুমি যদি বাপীকে বিবাহমদা বল, তা হলে তোমার বউদি হয়ে গেল।’ হাসিহাসি মুখটির দিকে তাকিয়ে অনিমেষ কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এত বড় মহিলাকে বউদি কী করে বলা যায়। তা ছাড়া নতুন স্যারকে তো ও দাদা বলে ডাকে না। মেনকা বোধহয় ওর সমস্যাটা বুঝেই বলল, ‘এদিকে নিশ্চীথটা আমাদেরও দাদা, কিন্তু তুমি আমাকে মেনকাদি বলবে। আসলে আমারা সবাই দাদা বৌদি দিনি। মাসিমা মোসেমশাই বলা এ-বাড়িতে অচল।’

এই সময় অনিমেষ অনুভব করল দরজায় আরও কেউ দাঁড়িয়ে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে ওর লজ্জা করছিল। মুভিং ক্যাসেল সেদিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আয়, জলটা দিয়ে যা, ছেলেটির গলা শুকিয়ে গেল বোধহয়।’ তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘অনিমেষ এই দ্যাখো, আমার আর দুই মেয়ে, উর্বরী আর রঞ্জ।’

খুব অবাক হয়ে গেল অনিমেষ। কাচের প্লাসে যে জল নিয়ে এসেছে তাকে দেখে ওর মনে ল দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিটা থেকে যেন সে স্টান নেমে এসেছে। হ্রস্ব এরকম দেখতে। ছিপছিপে, পানপাতার মতো মুখ, গায়ের রঙ কঢ়ি কলাপাতার মতো, আর টানা-টানা কী আনুরূপে চোখ দুটো। শুধু চুলগুলো ঘাড় অবধি ছাঁটা। চাহনিটা বড়দের মতো আর তার মাথার চুল ছাঁট অবধি স্টান নেমে এসেছে। বোঝাই যায় এটাই ওর গর্ব।

মেনকো ওর মুখ দেখে খিলখিল করে হেসে উঠতে ছোটটিও গলা মেলাল। শুধু ছবির মতো মেয়েটি শব্দ না করে হাসল। অনিমেষ দেখল হাসলে ওর গজাঁত দেখা যায়। সেটা যেন আরও সুন্দর। গজাঁত তো বাবারও আছে, কিন্তু বাবাকে তো এমন দেখায়। মেনকা বলল, ‘কী, খুব ঘাবড়ে গেলে বুঝি! একদম অস্পসারদের মধ্যে এসে পড়েছ! আমি মেনকা, ও উর্বরী আর এ রঞ্জ।’

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুভিং ক্যাসেল বলল, ‘বুঝতে পেরেছি। আমার ছবির সঙ্গে খুব মিল, না? উর্বরী আমার অতীত, কী বল?’

লজ্জাল লাল হয়ে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, ‘হ্যাঁ।’

উর্বশী বলল, ‘জল।’

এত যিষ্ঠি গলার আওয়াজ যে অনিমেষ চট করে হাত বাড়িয়ে প্লাস্টা ধরল। কাছে গায়ে উর্বশীর লাল-আভা-ছড়ানো আঙুলগুলো আন্তে-আন্তে আলগা হতে অনিমেষ চকচক করে জলটা খেয়ে নিল। ঠিক এমন সময় দরজায় কেউ এসে দাঁড়াতে যেনকদি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল দরজায় এখন কেউ নেই এবং সেদিকে তাকিয়ে রঞ্জব ঠোঁটের কোণটা কৌতুক নেচে উঠল।

মুভিং ক্যাসেল এবার বললেন, ‘অনিমেষ, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে গেলে, তোমার ওপর আমি দায়িত্ব ছিলাম, কুলের কোন ছেলে শেটে লিখে যায় তা তোমাকে বের করতে হবে। কী লজ্জা বলো তো! আবার ইদানীং নিশীথের সঙ্গে মানুর নাম এক করে দেওয়ালে-দেওয়ালে লেখা হচ্ছে! সত্যি, এই শহরটার যা অবস্থা হচ্ছে ক্রমশ, আর থাকা যাবে না।’

অনিমেষের মনে পড়ে গেল শহরের দেওয়ালে-দেওয়ালে এখন ‘নিশীথ+যেনকা’ লেখা আছে।

মুভিং ক্যাসেল উঠলেন, ‘তোমরা গল্প করো, আমি একটু কাজ সেরে নিই।’ যাবার সময় বিছানা থেকে জিমিকে কোলে তুলে নিয়ে অনিমেষের চিকুক ডান হাতে নেড়ে নিয়ে গেলেন। হাতটা শব্দন নাকে কাছে এসেছিল অনিমেষ চাঁপামূলের গুঁক পেল। উনি চলে গেলে রঞ্জ বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল। সেদিকে তাকিয়ে অনিমেষ চোখ সরিয়ে নিল। এই মেয়েটা তার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু পা দুটো কী মোটা-মোটা, তাকালে কেমন লাগে। ওর চট করে মনে পড়ে গেল-একটু আগে রঞ্জকে নিয়ে মন্তব্য আর তপনের ঝঁঝড়ার কথা! ইস, ওরা যদি জানত এইন অনিমেষ কোথায় আছে! রঞ্জের দিকে তাকালেই শরীরটা কেমন করে গঠে।

উর্বশী ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘প্লাস্টা!’

এতক্ষণ যে এটা হাতেই ধরা ছিল খেয়াল করেনি অনিমেষ, উর্বশীর বাড়ানো-হাতে সেটা দিয়ে বলল, ‘আমি যাই!

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জ বলে উঠল, সে কী, যাই মানে? নিশীথদ তো এখন দিদির ঘরে গল্প করছে। একসঙ্গে এসেছ একসঙ্গে যাবে।

অনিমেষের ভালো লাগছিল, কিন্তু এই মেয়েটার বলার ধরনটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না। ও দেখল উর্বশী ওর দিকে একদৃষ্ট তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে বলল, ‘কাজ আছে।’

মাথা নাড়ল অনিমেষ, না।

রঞ্জ বলল, ‘তুমি কোন ক্লাসে পড়।’

অনিমেষ বলল, ‘নাইন।’

রঞ্জ ছাড়া কাটল, ‘নাইন ফাইন। আমি হেসেন, আর ও টাইট।’ বলে ও পা দোলাতে লাগল।

উর্বশী বলে উঠল, ‘এই, পা দোলায় না, মা বারণ করেছে না।’

রঞ্জ পা নাচানো বন্ধ করে বলল, ‘দেখছ তো, তোমরা পা নাচালে দোষ নেই, যত দোষ মেয়েদের বেলায়।’

অনিমেষ বুরুল ওরা সেভেন আর এইটে পড়ে। কিন্তু ও যেন উঁচু ও যেন উঁচু ক্লাসে পড়েও ঠিক পাতা পাছে না।

রঞ্জ বলল, ‘এই, কথা বলছ না কেন?’

অনিমেষ বলল, ‘তোমরা কোন কুলে পড়?’

‘তিতা গার্লস কুলে।’

‘ওখানে তপুদি পড়ায়?’

‘তপুদি? ওরে বাবা, খুব স্ট্রিট। চেন নাকি?’

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, ‘চিনি।’

রঞ্জ বলল, ‘তোমার সঙ্গে একটা ছেলে দুপুরবেলায় তিতার নিকে গেল, তার নাম কী?’

অনিমেষ অবাক হল, ‘তুমি দেখেছ?’

‘হ্যাঁ। লাখামতো, কোঁকড়া তুল, খুব উঁট মেরে আমাকে দ্যাখে।’ রঞ্জ হাসল।

‘ও, মন্তুর কথা বলছ?’ অনিমেষ বুঝল মন্তু ঠিকই বলে যে রঞ্জা ওকে দেখেছে।

‘মন্তু ফন্টু জানি না, ছেলেটা কেমন?’ অবহেলাভরে কথাটা বলল রঞ্জা।

‘ভালো।’ ধাড় নাড়ুল অনিমেষ।

‘তোমার চেয়েও?’ বলে খিলখিল করে হেসে উঠল রঞ্জা।

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মনটা বিশ্বী হয়ে গেল। এই মেয়েটার কথাবার্তা খুব আরাপ, গায়ে কেমন জালা ধরিয়ে দেয়।

‘আমি ভালো না।’ বেশ রেগে গিয়ে অনিমেষ জবাব দিল।

‘কে বলল?’ এবার প্রশ্নটা উর্বশীর।

হাসিটা যেন থামছিল না রঞ্জা, দিদির গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, ‘বোৰো।’

আর ঠিক তখনি বাইরে সাইকেলের বেল খুব দ্রুত বাজতে বাজতে চলে গেল। অনিমেষ দেখল রঞ্জা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সাইকেলটা আবার বেল বাজিয়ে ঘূরে আসতে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর যেন কোনো কাজ মনে পড়ে গেছে এরকম ভক্ষিয়ায় বলল, ‘আমি আসছি।’

এই বলে আস্তে আস্তে যেন কিছুই জানে না এইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল উর্বশীর মুখ থমথমে। রঞ্জা চলে যেতে ওখাটের ওপর আলতো করে বসে বলল, ‘তুমি কিছু মনে কোরো না, রঞ্জো এইরকম। মায়ের কাছে এত বকুনি খায় তবু ঠিক হয় না আমার এসব একদম পছন্দ হয় না।’

অনিমেষ কী বলবে বুঝতে পারছিল না। ও মনে মনে উর্বশীর কথার সঙ্গে যে একমত এটা জানাবার জন্যই যেন চূপ করে থাকল। দুজনে ঘরে বসে আছে অর্থচ কেউ কথা বলছে না এখন। অডুত নিঃশব্দ এই পরিবেশটা ওর খুব তালো লাগছিল। বাইরের রাস্তায় যে একক্ষণ সাইকেলের বেল বাজাছিল সে বোধহয় চূপ করে গেছে, কারণ এখন কোথাও কোনো শব্দ নেই।

হঠাৎ উর্বশীর দিকে মুখ তুলে তাকাতে ও দেকতে পেল যে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, যেন বেশ মজা পেয়ে গেছে, কী ভাবছিল এতক্ষণ?’

‘আমি? কই, কিছু না তো।’ অনিমেষ অবাক হল।

‘আমি দেখলাম তোমার মন অন্য কোথাও চলে গেছে। আচ্ছা, তুমি সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাস? দেখি আমার সঙ্গে মেলে কি না।’ উর্বশী বলল।

অনিমেষ এখন এই উত্তরটা দেবার জন্য আর তাবে না। কিন্তু এই কয় বছর আগে অবধি ও চেঁচিয়ে বলতে পারত দেশকে ভালোবাসি। কিন্তু এখন বুঝে নিয়েছে সত্যি সত্যি যে দেশকে ভালোবাসে সে চেঁচিয়ে কথাটা সবাইকে জানায় না। এগুলো নিজের কাছে রেখে দিলে সুখ হয়। বিলিয়ে দিলে বড় খেলো হয়ে যাবে।

অনিমেষ চূপ করে আছে দেখে উর্বশী বলল, ‘বলতে লজ্জা করছে বুঝি? সব ছেলেমেয়েই মাকে ভালোবাসে, তাই মাকে বাদ দিয়ে—’

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অনিমেষ বলল, ‘না, আমার তো মা নেই।’

‘আমাকে খুব ছোট রেখে মা চলে গিয়েছেন।’ অনিমেষ বলল।

‘মা নেই?’ খুব অবাক হল উর্বশী, ওর গলাটা যেন কেমন হয়ে গেল।

‘তোমার খুব কষ্ট, না?’

উর্বশীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের মনে হল, সত্যি সত্যি বেচারার মন-আরাপ হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা সহজ করতে ও বলল, ‘প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হত, এখন ঠিক হয়ে গেছে। তা ছাড়া নতুন স্যার বলেছেন, গৰ্ভধারিণী মা না থাকলে কী হয়, জন্মভূমি-মা আছেন, তাঁকে ভালোবাসলেই সব পাওয়া হয়ে যাবে।’

ক্রু কুচকে উর্বশী বলল, ‘কে বলেছেন একথা?’

অনিমেষ বলল, ‘নতুন স্যার, মানে নিশীথন্দা।’

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল উর্বশী, ‘তুমি এসব বিশ্বাস কর’ নিশীথন্দা এসব বলে বাবার

মন ভেজায়, নইলে দিদির সঙ্গে লড় করতে পারবে না। এখন আমাদের পাশের ঘরে যাওয়া বারণ, জান?’

‘উৰ্বশি অৱস্থিতে পড়ল অনিমেষ উৰ্বশী খারাপ শব্দ কিছু বলেনি, কিন্তু নতুন স্যার সংস্কে শোনা কথাটা ও এমনভাবে সত্যি করে বলি! তবু অনিমেষ বলল, ‘কেন?’

‘আহা! বোৰা না যেন কিছু! ক্লাস নইলে পড় না তুমি?’ তারপর গঞ্জির গলায় বলল, ‘নিশ্চিথদা এখন দিকিকে বাংলা পড়াচ্ছে?’

‘ও!’ খুব স্বাবড়ে গেল সে।

‘ওসব চিতা ছাড়ো, বুবলে! দেশ-ফেশ কিছু নয়। নিজের মায়ের চেয়ে বড় কেউ নেই। সেসব ইংরেজ আমলে ছিল, তখন সবাই দেশকে স্বাধীন করতে চেষ্টা করত, এখন এসব চলে না।’ উৰ্বশী বলল।

‘যাঃ!’ হাসল অনিমেষ, ‘স্বাধীন হয়েছে বলে দেশ আৰ মা থাকবে না?’

উৰ্বশী মাথা নাড়ল, ‘তুমি যদি একথা পাঁচজনকে বল তাৰা তোমাকে বোকা ভাববে। এই দাখো, আমাৰ বাব নাকি বিবাহিতেৰ আন্দোলন না কী কৰেছিল। এখন এই শহৱেৰ নেতা, গাঞ্জিজিৰ শিষ্য, সবাই স্বাধাৰ কৰে অনেক লোক বলে’ তারপৰ হঠাৎ হলা পালটে বলল, ‘অৰ্থ আমাৰ মায়েৰ গায়ে দেৰেছ কী বিলিতি সেকেৱ গৰু, আমাৰ জ্বাকাপড় কী দেৰছ, দিদিৰ যা আছে না তোমাৰ চোখ-খারাপ হৰে বাবে। বাবাৰ অমত থাকলে এসব হত?’

হঁ কৰে কথাগুলো তনহিল অনিমেষ। উৰ্বশী ওৱা মূৰেৰ দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আজ থেকে একশো বছৰ আগে আমাৰ মতো যেসবেৰ বিয়ে কৰে কৰ কী হয়ে যেত। এখন কেউ সেটা ভাবতে পাৱে? তেমনি দেশকে যা বলে পুঁজো কৰাটা তখনকাৰ আমলে ছিল, বুবলে?’

এত তাড়াতাড়ি অনিমেষ কথাট হজম কৰতে পাৱছিল না, ‘কিন্তু নতুন স্যার-’

ঠোঁট বেঁকাল উৰ্বশী, ‘তোমাৰ নতুন স্যারে কথা বোলো না। যা ইয়াৰ্কি কৰে না, কান লাল হয়ে যায়। তুমি খুব বোকা ছেলে।’

এবাৰ অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

এতদিন ধৰে মণ্ডুৱা যেসব কথা ওকে বলে বোঝাতে পাৱেনি, আজ এই যেয়েটা সেকথাই বলে তাকে কেমন কৰে দিছে।

ওকে দাঁড়াতে দেখে খাট থেকে নেমে এল উৰ্বশী, ‘কী হল, যাচ্ছ?’

‘হ্যা যাই, সংকে হয়ে আসছে।’ অনিমেষ বলল।

‘কিন্তু তোমাৰ নতুন স্যার-’

‘থাক, আমি একাই যাই।’

হঠাৎ চট কৰে উৰ্বশী ওৱা হাত ধৰল, ‘এই আমাকে ছুঁয়ে বলো, আজ আমি যেসব কথা বললাম, তা তুমি কাউকে বলবে না।’

তুলোৱ মতলন নৱম শৰ্পৰ্হ হাতেৰ ওপৰ পেয়ে অনিমেষ চমকে ওৱা দিকে তাকাল। উৰ্বশীৰ চোখ দুটো কী আদুৱে ভঙ্গিতে ওৱা দিকে চেয়ে আছে। অনিমেষ আন্তে-আন্তে বলল, ‘কেন?’

‘এসব কথা কাউকে বলতে নেই। বাবা তনলে আমাকে যেৱে ফেলবে।’ খুব চাপা গলায় উৰ্বশী বলল।

‘তা হৱে তুমি বললে কেন?’ অনিমেষ ওৱা চোখ থেকে চোখ সৱাছিল না।

‘জানি না।’ তারপৰ হেসে বলল, ‘তুমি খুব বোকা বলে তোমাকে বক্ষু বলে ভাবতে ইচ্ছে কৰছে, তাই। কথা দাও।’

অনিমেষেৰ বুকেৱ ভেতৱটা কেমন কৰতে রাগল, ‘কিন্তু আমি যে-’

ওকে থামিয়ে দেয় উৰ্বশী, ‘তুমি কি খুব দুঃখ পেয়েছো?’

নিজেৰ মনেৰ কথাটা উৰ্বশীৰ মুখে শুনে মুখ তুলে তাকাতে দেখল পাশেৰ দৱজায় রঞ্চ দাঁড়িয়ে অদেৱ দেখছে। চোখচোৰি হতে নিজেৰ ঠোঁট কামড়ে সে দ্রুত সৱে গেল।

গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই তিন্তাৰ দিকে নজৰ গেল অনিমেষেৰ। ছেট জটলা হচ্ছে একটা সাইকেলকে ঘিৰে। উৰ্বশীৰ ঘৰ থেকে বেৱিয়ে বিৱামবাৰুকে নমকাৰ কৰে অনিমেষ একটা ঘোৱেৱ মধ্যে হেঁটে আসছিল। আসাৰ সময় মুভিং ক্যাসেলকে দেখতে পায়নি ও। উৰ্বশীৰ কথাগুলো মানেৱ মদ্যে যে অডুত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰেছে সেটা ও ঠিক সামলাতে পাৰছিল না। নতুন স্যার মেনকাদিকে ভালোবাসেন, তাকে বাংলা পড়ন, আবাৰ দেশকেও ভালোবাসেন, অনিমেষকে জননীৰ মতো তাঁকে গ্ৰহণ কৰতে বলেন। অনিমেষেৰ মনে হয় এৱে মধ্যে দোমেৰ কিছু ধৰকতে পাৰে না। এটা ও মনে নিতে পাৰছিল। কিন্তু বিৱামবাৰু, যিনি এখানকাৰ কঢ়েসেৰ নেত, মিউনিপ্যালিটিৰ কৰ্তা, তিনি মুভিং ক্যাসেলৰ বিলিতি সেন্ট, শাড়িৰ টাকা যোগান কী কৰে—। নতুন স্যার এসব কথা জেনে, জানাটাই স্বাভাৱিক, এই বাড়িৰ সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন—এই ব্যাপারটি ও সহ্য কৰতে পাৰছিল না। ও বেশ বৰতে পাৰছিল সমষ্টি ব্যাপারটাৰ মধ্যে একটা বিৱাট ফাঁকি আছে। উৰ্বশী বলল, বিৱামবাৰুৰ মন ডিজিয়ে নতুন স্যার এ-বাড়িতে আসাৰ সুযোগ পান। অনিমেষেৰ ভেতৰটা টলমল কৰছিল।

আবাৰ উৰ্বশী যৈ এত কথা বলল তাৰ জন্য ওকে ওৱ একটুও খাৱাপ দাগছিল না। কী সহজে উৰ্বশী বাবা-মায়েৰ কথা ওকে বলে দিল। কেন? রণা, এমনকি মেনকাদিকেও ওৱ ঠিক পছন্দ হয়নি। উৰ্বশীৰ চোখ, লালচে আঙুল, গজদাঁত-অনিমেষ চোখেৰ সামনে দেখতে পাচ্ছিল। বুকেৰ মধ্যে একটা গভীৰ আৱাম ক্ৰমশ জায়গা জুড়ে নিছিল।

এইসব ভাবতে ভাবতে অনিমেষ গেট খুলে বাইলে এল এবং তখনই জটলাটা ওৱ নজৰে পড়ল। কয়েক পা এগোতেই মন্তুৰ গলা ওনতে পেল, মন্তু খুব টাঁচাছে। একদৌড়ে ও কাছে গিয়ে দেখল, মন্তু একটা সুন্দৰমতো ছেলেৰ জামার কলার মুঠোয় নিয়ে বাঁকাছে আৱ তপন একটা সাইকেল ধৰে দাঁড়িয়ে ক্ৰমাগত শাসিয়ে যাছে। ওদেৱ বিষে পৌচ-ছয়জন পথচলতি লোকেৰ ভিড়, তবে সবাৰ মুখ হাসিহাসি। বোৰা যায় ওৱা একটা মজাৰ ব্যাপার দেখেছে। যে-ছেলেটিকে মন্তুৱা ধৰেছে তাৰ বয়স ওদেৱ মতো বা সামান্য বেশি হতে পাৰে। ফুৰসা, ফুলগ্যাণ্ট পৰা, কোমৰে বেল্ট আছে আৱ মাথাজুড়ে একটা বিৱাট শিঙড়া মন্তুৰ কথাৰ জবাবে একটা-কিছু আবাৰ বেয়াদবি শাৰা হচ্ছে! মেৰে বাপেৰ বাসিবিয়ে দেখিয়ে দেৰ, বুৰালি!

ছেলেটাৰ জামপ্যাণ্ট বেশ দামি, বোৰা যায় বড়লোকেৰ ছেলে এবং এ-ধৰনেৰ আক্ৰমণে অভ্যন্ত নয়। সে বলল, ‘মিছিমিছি মাৰছ, আমি এদিকে বেঢ়াতে এসেছিলাম।’

তপন দুহাতে-ধৰা সাইকেলটা বাঁকিয়ে বলল, ‘আবাৰ মিথ্যে কথা! আমৰা শ্পষ্ট দেখলাম তিন-চারবাৰ বেল বাজিয়ে বাড়িৰ সামনে ঘূৰিয়ুৰ কৰা হাইছিল! জানলায় ও আসতেই বেল খেমে গেল। কোন পাড়ায় থাকিস, বল।’

কোনোৱৰকমে ছেলেটা বলল, ‘বাবুপুড়ায়।’

মন্তু বলল, ‘কেন এসেছিল এখানে?’

অনিমেষ একটা ব্যাপারে অবাক হাইছিল। এই ছেলেটিৰ শৰীৰ দেখে বোৰা যায় যে গায়েৰ জোৱ কম নয় মন্তুৰ থেকে। অথচ ও কেমন অসহায় হয়ে মন্তুৰ হাতেৰ মুঠোয় নিজেৰ জামার কলার ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এৱে আগেও বোধহয় চড় সুসি পড়েছে, কাৰণ ওৱ গালে লাল দাগ ফুটে উঠেছে। ইচ্ছে কৰলে ও লড়ে পালিয়ে যেতে পাৰে, কিন্তু যাছে না কেন? ছেলেটাকে চুপ কৰে থাকতে দেখে মন্তু বাঁ হাত দিয়ে ওৱ চুলেৰ শিঙড়া খৎ কৰে ধৰে হাঁচকা টান নিল। যত্নগায় মাথা নোয়াতে নোয়াতে ছেলেটা বলে উঠল, ‘আমাকে আসতে বলেছিল।’

মন্তু চট কৰে বাঁ হাতটা ছেড়ে দিয়ে বোকাৰ মতো উচ্চারণ কৰল, ‘আসতে বলেছিল।’

‘হ্যা আমার বোন ওৱ সঙ্গে পড়ে। বোনকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল।’ ছেলেটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কথাগুলো বলল।

ফ্যাসক্যাসে গলায় মন্তু বলল, ‘মিথ্যে কথা, একদম বিশ্বাস কৰি না। কোনো প্ৰমাণ আছে?’

ততক্ষণে যেন একটু জোৱ পেয়েছে ছেলেটি পায়েৰ তলায়, দুহাত দিয়ে মন্তুৰ মুঠো থেকে নিজেৰ জামাটা ছাড়িয়ে বলল, ‘এসব ব্যাপারে কি কোনো দ্রুশান থাকে? তবে যদি বিশ্বাস না কৰ ওকে তেকে আনো, আমি তোয়াদেৱ সামনে জিজ্ঞাসা কৰিব।’

সঙ্গে সঙ্গে মন্তু একটা সুসি মারল ছেলেটিৰ মুখে, কিন্তু দ্রুত মুখটা সৱিষে নেওয়ায় সুসিটা কাঁধে

গিয়ে লাগল। যন্ত্রণায় ছেলেটা দুহাতে কাঁধ চেপে ধরল। মন্টু বলছিল, ‘শালা, অনুসন্ধানের মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভজাতে চাও? কোনো প্রমাণ-ফ্রমাণ নেই। আমি একদম বিশ্বাস করি না।’

হঠাৎ ছেলেটা রংখে দাঁড়াল, ‘আমি এখানে আসি না-আসি তার তোমাদের কী? তোমরা ওর কেউ ওর?’

মন্টু বলল, ‘আবার কথা হচ্ছে! আমি কেউ হই না-হই সে-জবাব তোকে দেব? আজ প্রথম দিন বলে ছেড়ে দিলাম, আবার যদি কোনোদিন দেখি এইখানে টাঙ্কি মারতে তা হলে ছাল ছাড়িয়ে নেব। যাঃ।’

ছেলেটা ঘুরে সাইকেলটা ধরতে যেতে তপন বলল, ‘লেগেছে তোর?’

একটু অবাক হয়ে কী বলবে বুবতে না পেরে ছেলেটা বলল, ‘না।’ বোধহয় নিজের কষ্টের কথা খীকার করতে চাইছিল না।

তপন হাসল, ‘গুড়। তা হবে ক্ষমা চা, বল, আর কোনোদিন এসব করব না।’

ছেলেটা বলল, ‘তোমরা আজ সুযোগ পেয়ে যা ইচ্ছে করে নিছু। বেশ, আমি ক্ষমা চাইছি।’ তপন ওকে সাইকেলটা দিয়ে দিতে সে দৌড়ে লাফিয়ে তাতে উঠে পড়ে একটু নাগালের বাইরে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, ‘এই শালারা, শোন, এর বদলা আমি নেব। পাওপাড়ার সাধন মৃধার পার্টিকে আজই বলছি।’ কথা শেষ করেই জোরে প্যাডেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা ছুটে ঝমকে দাঁড়াল মন্টু, ‘যা যা, বল শালা সাধনকে। আমি যদি রায়কতপাড়ার আশেকদাকে বলি তোর সাধন লেজ শুটিয়ে নেবে।’

কিন্তু কথাগুলো ছেলেটার কোন অবধি পোছাল না। আর কোনো মজার দৃশ্য দেখা যাবে না বুঝে ভিড়টা পলকে হালকা হয়ে গেল। অনিমেষ ওদের কাছে এগিয়ে গেল। তপন প্রথমে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ‘অতক্ষণ কোথায় ছিলি?’

অনিমেষ বলল, ‘এখানে কী হয়েছে রে?’

মন্টু বলল, ‘আরে তোকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে দেখি এই মালটা সাইকেলে পাক খাচ্ছে আর বেল বাজাচ্ছে। টাঙ্কি মারার আর জায়গা পায়নি। আবার সাধন মৃধার ভয় দেখাচ্ছে।’ মন্টু যেন তখনও ফুসফুল।

অনিমেষ বলল, ‘মারতে গেলি কেন মিছিমিছি?’

মন্টু বলল, ‘বেশ করেছি মেরেছি। প্রেমের জন্য জীবন দেয় সবাই, তা জানিস?’

তারপর টেনে টেনে বলল, ‘আই লাভ রঞ্জা।’

হঠাৎ মুখ ফসকে অনিমেষ বলে ফেলল, ‘রঞ্জা তোর কথা জিজ্ঞাসা করছিল।’

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হয়ে গেল মন্টু। ও যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না কথাটা। তারপর কোনোরকমে বলল, ‘তোকে জিজ্ঞাসা করেছে?’

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল।

‘তোর সঙ্গে আলাপ আছে বলিসনি তো! গুল মারবি না একদম।’ মন্টু ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

অনিমেষ বলল, ‘আগে আলাপ ছিল না, একটু আগে হল। এখানে আসতে নতুন স্যার আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।’

কথাটা শেষ করতেই তপন দৌড়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল, ‘তোর কী লাক মাইরি, একই দিনে বেদিং বিউটি থেকে লাভিং বিউটি সব দেখলি। তোকে একটু ছেঁদে দে।’

তিক্তার পাড়ে হাঁটাট হাঁটতে ওদের সব ব্যাপারটা বলতে হল। শুধু উর্বরী যে কথাটা ওকে সবশেষে বলেছে সেটা বস্তুদের ভাঙল না। শোনা হয়ে গেলে মন্টু বলল, ‘না রে অনি, অ অক্ষরটা যে-ই লিখুক এবার আমি ধৰবই। রঞ্জা যখন আমাকে লাইক করে তখন এটা আমার প্রেটিজ ইয়ু। তুই মুভিং ক্যাসেলকে নিচিত্ত ধাকতে বলিস। আসামি ধৱা পড়লে আমাকে ভাই ও বাড়িতে নিয়ে যাস।’

তপন বলল, ‘আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?’ অনিমেষ ঘাড় নেড়ে ‘না’ বলল। হতাশ গলায় তপন নিজের মনে বলল, ‘আমাকে শালা মেয়েরা পছন্দ করে না। এই ব্রনশুলো যতদিন না যাবে—’ নিজের গাল থেকে হাত সরিয়ে ও মন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মাইরি, নিশীথবাবুটা হেভি হারামি।’

গাছেরও খাচ্ছে তলারও কুড়োছে!

গালাগালি শনে প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল অনিমেষের। ও চিংকার করে উঠল, ‘খুব খারাপ হচ্ছে তপন। না জেনেতেনে একটা অনেক লোককে গালাগালি দিবি না!’ কিন্তু অনেক শব্দটা বলার সময় ওর কেন জানি না বিরামবাবুর মুখটা মনে পড়ে গেল।

মন্টু হাসল, ‘তুই কিছুই জানিস না অনি, আগে মুভিং ক্যাসেলের সঙ্গে নিশীথবাবুকে সব জায়গায় দেখা যেত। কলকাতায় করতাম নাকি ওরা দুজনে গিয়েছে। তখন মেয়েরা ছোট ছিল। মেনকার সঙ্গে লাইন হয়েছে, তা সবাই অনুমান করতাম, কিন্তু শিওর ছিলাম না। তুই আজ ঠিক খবরটা দিলি।’

একই দিনে একটা মানুষের এতরকম ছবি দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল অনিমেষ। নতুন স্যার দেশকে ভালোবাসেন, মেনকাদিকেও ভালোবাসতে পারেন, মেনকাদির বাবা অসৎ হলেও মেনকাদি তো সৎ হতে পারে। কিন্তু তার মেনকাদির মাকে—এই ব্যাপারটা সব গোলমাল করে দিচ্ছিল।

হঠাতে তপন মন্টুকে বলল, ‘তুই শালা এবার থেকে বাংলা হেভি নষ্টর পাবি।’

মন্টু অবাক হয়ে বলল, ‘কেন?’

‘কেন আবার। ভায়ারাভাইকে কেউ কম নষ্টর দেয়?’ কথাটা বলে ও চঁচো করে দৌড় মারল।

মানে বুবাতে পেরে মন্টু ওকে দৌড়ে ধরতে যেতে যখন বুবাতে পারল ও নাগালের বাইরে চলে গেছে, তখন দাঙিয়ে পড়ে অনিমেষকে বলল, ‘বশ্ব হোক আর যা-ই হোক, মেয়েদের ব্যাপারে সবাই খুব জেলাস, না রে।’

অনিমেষের কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ও চৃপচাপ মাটির দিকে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। যত বড় হচ্ছে তত যেন সবকিছু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। একটা মানুষের করতরকম চেহারা থাকে!

॥ আট ॥

ইদানীং সরিষ্পেখের কোরা ধূতি পরেন। একজোড়া মিলের কাপড় সন্তায় কিনে দুটো টুকরো করে নেওয়া যায়। সব দিক থেকে খরচ কমিয়েও যেন আর তাল ঠিক রাখতে পারছেন না। হেমলতার সঙ্গে এখন প্রায়ই তাঁর ঝগড়া হয় জিরে মরিচ কয়লা লিয়ে। বিশ সের কয়লায় এক সংগৃহ যাওয়ার কথা, সেখনে একদিন আগে হেমলতা কেন আক্তেলে ফুরিয়ে ফেলেন! এসব কথাবার্তা চলার সময় যদি অনি এসে পড়ত তা হলে আগে ওঁরা চুপ করে করে যেতেন। কিন্তু ইদানীং আর যেন তার প্রয়োজন হয় না। খালিবাড়িতে দুজন চিংকার করলে বাইরের লোকের কানে যাবে না। পরম সুখে ওদের ঝগড়া করতে দ্যাখে অনিমেষ। পিসিমার মেজাজ আরও খারাপ, কারণ কদিন আগে ব্যাংক থেকে পিসিমার টাকা তুলে দান্দ বাড়ির কাজে লাগিয়েছেন।

বাড়িতে এখন মাছ আসে না। হেমলতার যত বয়স হচ্ছে তত মাছের গুরু সহ্য করতে পারছেন না। শষ্ঠ বলে দিয়েছেন, মাছ খাবার ইচ্ছে হলে লোক রাখুন বা হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসুন। সরিষ্পেখের মাছ খাওয়া বন্দ হয়েছিল আশেই, তখন অনিমেষের জন্য মাছ আসত বাড়িতে। হেমলতার ঢ্যাচামেচিতে তিনি সেটা বন্ধ করে দিলেন এবং হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। জলপাইগুড়িতে মাছের দাম এখন আকাশহৌয়া। কই মাওর চল্লিশ টাকা সের বিক্রি হচ্ছে। পোনামাছ চালান আসে বাইরে থেকে, সেখনে ঢোকে কার সাধ্য! বাজারের বরাজ টাকার প্রায় আড়াই ভাগ অনির মাছের পেছনে চলে যেত। সেটা বেঁচে যেতে ঘনটা একটু খারাপ হলেও স্বত্ত্ব পেলেন। সম্পুর্ণ ইঁরেজি কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে আমিষ-নিরামিষ নিয়ে। ভেজিটেবল প্রোটিন অ্যানিমেল প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। ভারতবর্ষের প্রচুর মানুষ যে নিরামিষ আহার করে তাতে তাদের কার্যদক্ষতা বিন্দুমাত্র কমে না, বরং অনুসন্ধানে জানা গেছে যে নিরামিষাহারী মানুষ দীর্ঘজীবি হয়। কাগজটা তিনি অনিকে পড়তে দিয়েছিলেন। যদিও মাঝে-মাঝে তাঁর এই নাতির মুখে এক টুকরো মাছ দিতে পারছেন না বলে মনেমনে আঙ্কেপ হয়, কাউকে বলেন না।

বাজারদর হত্ত করে বেড়ে যাচ্ছে। গ্রাম-অঞ্চল থেকে মানুষের মিছিল কাজের আশায় শহরে ভিড় করছে। এমনিতেই তাঁদের শহর পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি খরচের জায়গা, কারণ এখানে ধনীদের

প্রাধান্য বেশি। সরিষ্পেখরের মাথার ঠিক থাকছে না, হেমলতার সঙ্গে ঝগড়া বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছে সবাই ঠকাছেঘাকে। যে-গয়লাটা দুধ দিয়ে যায় তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল অতিরিক্ত জল মেশাচ্ছে বলে। কয়লাওয়ালা কাঁচা কয়লা দিয়ে টাকা শূটছে। পরপর কয়েক বছর বন্যা এসে পলিমাটি ফেলে বাগনটার যে-চেহারা হয়েছে তাতে লোক দিয়ে শাকসবজি লাগালে কোনো কাজ হবে না। মহীতোষ যে-টাকা পাঠায় তা বাঢ়ে না। এদিকে বাজারদের যে খেমে থাকছে না! হেলের কাছে টাকা চাইতে এখন আর কুঠা নেই, কিন্তু মহীতোষের সাধের সীমাটা তিনি জানেন। যে-টাকাটা সে পাঠাচ্ছে তাতে অনিমেষ হোস্টেলে আরামে থাকতে পারত।

মাস শেষ হতে আর দুদিন আছে। সরিষ্পেখর কিং সাহেবের ঘাট থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলেন। আজ ছুটির দিন, কোর্টকাছার বক্ষ স্বর্গের্হে থেকে কোনো লোক তাই শহরে আসেনি। অন্যমনক্ষ হয়ে হাটছিলেন তিনি। আজ সকালে বাজার করার পর ওর কাছে তিনটে আধুলি পড়ে আছে। সামনে আর দুটো দিন, তারপর স্বর্গের্হে থেকে টাকা আসবে। কী করে এই দুদিন চলবে? চাকরি করার সময় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তাঁকে কোনোদিন এই অবস্থায় পড়তে হবে হ্যাঁ ওর মনে হল রিটায়ার করার পর বেশিদিন বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। দীর্ঘজীবি অকর্মণ্য হয়ে থাকলে এইসব সমস্যার সামনে দাঁড়াতেই হবে।

আজকাল জোরে হাটে ভাঙা পা-টা টনটন করে। বুর আন্তে-আন্তে তিনি পি ভুরু ডি অফিসের সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। ওদিকে তিন্তা পাশের রাস্তা দিয়ে হাটা যায় না। এতদিন পর তিন্তা বাঁধ প্রকল্প হয়েছে। প্রতি বছরের বন্যা থেকে বাঁচবার জন্য জলপাইভডি শহরের গা-মেঘে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। জোর তোড়জোড় চলছে ওরানে। পি ভুরু ডির অফিসটা পেরোতেই একটা জিপগাড়ি সজোরে ওর পাশে ব্রেক করে দোঁড়াল। এখন বুর সতর্ক হয়ে রাস্তার বাঁপাশ দৈঘ্যে হাঁটেন সরিষ্পেখর। চোখ তুলে দেখলেন দুই-তিনজন লোক জিপ থেকে নেমে তাঁর সিকে আসছেন।

ধূতিপরা এক ভদ্রলোক বললেন, ‘হ্যাঁ স্যার, আমার ভুল হয়নি, ইনিই সরিষ্পেখরবাবু।’ মাথা নেড়ে একজন লশ্বচওড়া টাই-প্রা ভদ্রলোক সরিষ্পেখরের সামনে এসে হাতজোড় করে নমকার করলেন, ‘আপনি সরিষ্পেখর?’

একটু অবাক হয়ে ঘাড় নাড়লেন সরিষ্পেখর।

‘ভালোই হল পথে আপনার সাথে দেখা হয়ে। আমরা আপনার বাড়িতে যাচ্ছিলাম। আমি তিন্তা বাঁধ প্রকল্পের অ্যাসিস্টেন্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।’

সরিষ্পেখর নমকার করে উদ্দেশ্যটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সঙ্গের ভদ্রলোক বললেন, ‘স্যার, বাড়িতে গিয়ে কথা বললে ভালো হয় না?’

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, সে-ই ভালো। আপনি বোধহয় বাড়িতেই যাচ্ছিলেন, তা আসুন আমার গাড়িতেই যাওয়া যাক।’

তাঁর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে ভদ্রলোক জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন। এক-একজন মানুষ আছেন যাঁরা কথা বললেই একটা কঢ়েত্বের আবহাওয়া তৈরি হয়ে থায়, যেন তিনি যা বলছেন তার পর আর কোনো কথা থাকতে পারে না। সরিষ্পেখর বুঝতে পারছিলেন না যে তাঁর সঙ্গে তিন্তা বাঁধ প্রকল্পের কী সম্পর্ক থাকতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার জিপে বসে আবার ডাকলেন, ‘কই, আসুন!’

অগত্যা সরিষ্পেখরকে জিপে উঠতে হল। ধারের দিকে জ্বায়গা করে দিলেও সরিষ্পেখরের বসতে অসুবিধে হাস্তি। শক্ত-হাতে সামনের রড আকড়ে বসেছিলেন তিনি জিপটা হৃত করে টাউন ক্লাবের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। ইঞ্জিনিয়ার বললেন, ‘আপনার ফ্যামিলি-মেঘার কত, মানে এই বাড়িতে?’

সরিষ্পেখর বললেন, ‘তিনজন। কেন?’

ইঞ্জিনিয়ার অবাক হলেন, ‘সেকী! আপনার বাড়ি তো শুনেছি বিবাট বড়। তা এত বড় বাড়িতে তিনজন মানুষ কী করেন?’

সরিষ্পেখর এবার ইঙ্গিটা বুঝতে পারলেন, ‘ব্যবহার হয় না ঠিক নয়, আঞ্চীয়াব্দজনরা এলে থাকবে তাই করা।’

ততক্ষণে জিপটা বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে। রাস্তাটা আগ বড় ছিল। কিন্তু যেহেতু জিপটা

পি ডব্লু ডিউ, সরিষ্ঠেখর অনেক চেষ্টা করেও তাদের স্টাফদের কোয়ার্টার বানাবার ব্যাপারে বাধা দিতে পারেননি। এখন জমি ঘিরে রাস্তাটা এত সরু হয়ে গেছে যে রিকশা অথবা একটা জিপ কোনোক্ষে চুক্ত পারে। এই নিয়ে বহু চিঠি লিখেছেন তিনি, কোনো কাজ হয়নি।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, ‘বাবঃ, এত সরু রাস্তা! মিউনিসিপ্যালিটি অ্যালাউ করল?’

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘আপনাদের সরকার বাহাদুরের ব্যাপার, আমরা বললে তো হবে না।’

ভদ্রলোক যেন বিরক্ত হয়েছেন খুব, ‘না না, এ খুব অন্যায়। বাড়ি করতে দিলে তাকে যাতায়াতের রাইট দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি ব্যাপারটা দেখছি।’

গেট খুলে বাড়িতে চুক্ত সরিষ্ঠেখর জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী ব্যাপার বলুন তো, আপনাদের আসবাব উদ্দেশ্যটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।’

ইঞ্জিনিয়ার তখন কোমরে হাত দিয়ে বাড়িটা দেখছিলেন। এখন ভর-বিকেল রোদ গাছের ধারাথার। নতুন বাড়িটা খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সরিষ্ঠেখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ‘আমরা শহরে ভালো বাড়ি খালি পাছি না। আজ আপনার বাড়ির খবরটা গেয়ে চলে এলাম। তিনা বাধ প্রকল্পের ব্যাপারে এ-বাড়িটা আমরা চাই।’

‘চাই মানে?’ হতভস্ত হয়ে গেলেন সরিষ্ঠেখর।

‘অবশ্যই ভাড়া চাই। তবে তেতরটা দেখে নিতে হবে আগে।’

‘আপনি বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছেন?’

‘আমি নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।’

সরিষ্ঠেখর কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। বাড়িটা ভাড়া দেবার কথা হেমলতা প্রায়ই বলে থাকেন তাঁকে। যেভাবে রাজাদের বাড়িতে তাতে সামলে পঠা যাছে না। এই তো আজই তাঁর পক্ষে কয়েকটা আধুনিক পড়ে আছে। আগে গলছলে বলতেন এই বাড়ি তাঁর ছেলের মতন, অসময়ে দেখবে। কিন্তু যাকে-তাকে ভাড়া দিতে একদম নারাজ তিনি, বিশেষ করে ফ্যামিলিম্যানকে। এর আগে অনেকেই এসেছে তাঁর কাছে। কিন্তু হেণ্টে-মূতে একাকার হয়ে যাবে বলে মুখের ওপর ‘না’ বলে দিয়েছেন সবাইকে। এখন সরকার যদি তাঁর বাড়ি ভাড়া নেয় তা হলে তো বামেলার কিছু থাকে না। যাস গেলে ভাড়াটা নিশ্চিত। তা ছাড়া জলপাইগুড়িতে এখন বাড়িভাড়া হলু করে বেড়ে যাচ্ছে। খালি পড়ে থাকলে বাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। ভাড়া দিলে প্রতি মাসের টাকাটায় কী উপকার হবে ভাবলে পায়ে জোর এসে যায়। কিন্তু, তবু একটা কিন্তু এসে যাচ্ছে যে মনে। যারা এসে থাকবে তারা লোক কেমন হবে। সরকারি অফিস তো, পাঁচ ভূত্রের ব্যাপার, বাড়ির ওপর কারও দয়াময় থাকবে না।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছেন। সরিষ্ঠেখর ওঁর পেছন পেছন উঠতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী ভাবছেন আপনি?’

সরিষ্ঠেখর সত্যি কথাটা একটু অন্যভাবে বললেন, ‘এ-বাড়ি ভাড়া দেব কি না আমি তো এখনও ঠিক ফরিনি। তা ছাড়া ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।’

ভদ্রলোক এবার গঁথির হয়ে বললেন, ‘কিছু মনে করবেন না। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে যে-কোনো খালি বাড়ি আমরা প্রয়োজন বোধ করলে বিকুলইঞ্জিন করে নিতে পারি। যে-ক্যে বছর ইচ্ছে আমরা থাকব-আপনার কিছু বলার থাকবে না। তাই আপনি আমার সাজেশনটা নিন, ভাড়া দিতে রাজি হয়ে যান, নইলে পরে আফসোস করবেন।’

এদিকটা জানতেন না সরিষ্ঠেখর। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মাথা গরম-হয়ে গেল। এরা কি তয় দেখিয়ে তাঁর বাড়ি দখল করতে চায়? সরকারের কি এ-ক্ষমতা আছে? ওঁর মনে পড়ল সেই পঞ্চাশ সালে কংগ্রেস থেকে তাঁর বাড়িতে অফিস করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তখন কেউ তত্ত্ব দেখায়নি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন তিনি। তারপর হেমলতাকে ডেকে দরজা খুলতে বললেন। অনিমেষ বাড়িতে নেই। খুব বিরক্ত হলেন কথাটা শুনে। আজকাল যেস কোথায়-কোথায় ঘোরে টেরে পান না তিনি। মাথায় লব্ব হয়েছে, গালে দুএকটা ব্রন বের হয়েছে। এই সময় মন চথল হয়।

সরিষ্ঠেখর ইঞ্জিনিয়ারকে বাড়িটা দেখালেন। দুটো ঘর তাঁর চাই। বাকি ঘরগুলো ওঁরা নিতে পারেন। বাড়ি দেখে খুব খুশি ইঞ্জিনিয়ার। সরিষ্ঠেখের থাকার ঘর দুটো আলাদা করে দিলে সামনের দিকে সমস্ত বাড়িটাই ওঁদের হাতে আসবে। একদম সাহেবি বন্দোবস্ত, অফিস কাম রেসিডেন্স করতে

কোনো অসুবিধা নেই। ঘুরে ঘুরে খুব প্রশংসন করলেন সরিষ্ঠেখরের বাড়ি বানাবার দক্ষতার। দেখলেই বোৰা যায় নিজে দাঙিয়ে থেকে করানো, কোনো কন্ট্রুলের ওপর ছেড়ে দেওয়া নয়।

শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার বললেন, ‘কাল আমার অফিসে আসুন, ভাড়াটা ঠিক করে নেওয়া যাবে।’
সরিষ্ঠেখর এতক্ষণ মনেমনে আঁচ করছিলেন কীরকম ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।

এখন বললেন, ‘সরকার কত ভাড়া দেবেন মনে হয়?’

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, ‘আমি এখনই বলতে পারছি না। ওপরওলার সঙ্গে কথা বলতে হবে। সাধারণত সরকার বাড়িভাড়া ঠিক করেন ভালুয়ার দিয়ে, ক্ষোয়াফিট মেপে। কিন্তু এখন তার সময় নেই। আমাদের ইমিডিয়েটলি বাড়ি দরকার। তাই এমাজেন্সি ব্যাপার বলে আমরা নিজেরাই ঠিক করে আঝতু করে নেব।’

সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘তবু যদি আভাস দেন।’

ভদ্রলোক হাসলেন ‘দেশুন, এসব কথাবার্তা তো এভাবে হয় না। আপনি চাইবেন ভাড়াটা বেশি হোক, আমরা চাইব কম হোক। ভালুয়ার অবশ্যই বেসরকারি ভাড়া থেকে অনেক কম রেট দেবে। তাই মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করতে হবে।’

সরিষ্ঠেখর নিজের অজ্ঞানে কেমন বিগলিত গলায় বললেন, ‘আপনাকে আর কী বলব, এই বাড়িটাই আমার ভৱসা। এখন শহরে বাড়িভাড়া হৃৎ করে বাড়ে, কিন্তু কোনো ফ্যামিলিকে ভাড়া দিতে চাই না। আপনি একটু দেখবেন।’

ভদ্রলোক হেসে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালেন। সরিষ্ঠেখর উঁর পিছুপিছু আসছিলেন। এখন একটু রাতির করা উচিত। মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোকের হাতেই সব নির্ভর করছে। সরিষ্ঠেখর বললেন, ‘একটু চা খেয়ে যদি যান।’

দ্রুত মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, ‘না না। সঙ্গে হয়ে গেলে আমার চা চলে না তাছাড়া পাবলিক অন্যভাবে নেবে। তা হলে কাল ঠিক দশটায় আমার অফিসে আসুন। আমি কাগজপত্র রেডি করে রাখব। পয়লা তারিখ থেকেই আমরা ভাড়া নেব। আমার অফিসটা চেনেন তো?’

সরিষ্ঠেখর ঘাড় নাড়লেন। এই শহরে কোনোকিছুই অচেনা থাকে না। হাঁটাঁ ইঞ্জিনিয়ার উঁর দিকে এগিয়ে এলেন, ‘সরিষ্ঠেখরবাবু, আপনার ভাড়াটা যাতে রিজিনেবল হয় আমি নিয়ন্ত্রণ দেখব, কিন্তু দেখাটা যেন পারস্পারিক হয়। বুবাতে পারছেন আশা করি। কাল একটু সকাল সকাল আসুন অ্যান্ড কিপ ইট এ সিক্রেট।’ হনহন করে হেঁটে গিয়ে ভদ্রলোক জিপে উঠলেন।

জিপটি চলে গেলেও সরিষ্ঠেখর পাথের যতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময় হেমলতার ডাকে তাঁর চেতনা এল। বাবা যে এন্দের বাড়িটা দেখাচ্ছেন কী জন্যে তা তিনি অনুমান করতে পারছিলেন। এতদিনে বাবার যে ঝুঁশ হয়েছে তাতে তিনি খুশি। এইভাবে বুড়ো মানুষটার অর্থকষ্ট তিনি দেখতে পারছিলেন না। তবু খানিকটা দূরত্ব রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বাবা, বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন নাকি?’

সরিষ্ঠেখর ঘুরে যেয়েকে দেখলেন, তারপর হাঁটাঁ তিক্কার করে উঠলেন, ‘সেদিনের একটা পুঁকে ছেলে আমার কাছে ঘুষ চাইল, বুবালে, ঘুষ।’

ভাড়ার সঙ্গে ঘুষের কী সম্পর্ক আছে বুবাতে পারলেন না হেমলতা। সরিষ্ঠেখর তখন বলছিলেন, ‘ভাড়া না দিলে সরকার জোর করে বাড়ি নিয়ে নেবে। আমি ন্যায় ভাড়া চাইলাম তো বলল ওকে দেখতে হবে আমাকে। চা খেতে চায় না, ঘুষ খেতে চায়। তগবান! হাঁয় আমরা কোথায় এলাম! নেহরুর পোষ্যপুত্রদের চেহারা দেখলে।’

হেমলতা বললেন, ‘যে-যুগ সেরকম তো চলতে হবে! তা যদি বেশি ভাড়া দেয় তা হলে আর আপনি করবেন না।’

‘আপনি!’ সরিষ্ঠেখর হাঁটা করে উঠলেন, ‘আমার পকেটে মাত্র দেড় টাকা পড়ে আছে, আমি আপনি করব কেন? কোনো মানে হয় না। আপনি করা তো বোকামি। চাকরি করার সময় যে ঘুস নিইনি সে-বোকামিটা হাড়ে-হাড়ে টের পাছি! এখন কাল সকালে দুর-কমাকষিটা কীভাবে করব তা চিন্তা করতে হবে।’

হেমলতা একটু ভেবে বললেন, ‘সাধুবাবুর কাছে একবার যান-না, উঁর তো এসব রাস্তা ভাল জানা আছে।’

সরিষ্ণেখৰ মেয়েৱ ওপৰ খুলি হলেন। সত্তি, সাধুচৰণই ভালো পথ বাতলাতে পাৰে। খুব ধূর্ত লো। আৱ দাঁড়ালেন না তিনি, 'দৰজাটা বক্ষ কৰে দাও, আমি এখনই ঘুৱে আসি!' গেট খুলে বাইৱে আসতেই নজৱে পড়ল অনিমেষ বাড়িৰ দিকে দৌড়ে আসছে।

কাছাকাছি হতেই সরিষ্ণেখৰ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা কৰলেন, 'কোথায় গিয়েছিলো? তোমাৰ এখন সিৱিয়াস হওয়া উচিত, সেকেও ক্লাসে পড়ছ, এভাবে চললে রেজাল্ট ভালো হবে না।'

দাদুৰ মুখে হঠাতে এই ধৰনৰ কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল অনিমেষ। ইদানীং ওৱা ব্যাপারটাকে চাপা দেবাৰ জন্য তাড়াতাড়ি ডাল হাতে ধৰা খামটাকে এগিয়ে দিল। 'কী ওটা?' সরিষ্ণেখৰ খামটাৰ দিকে সন্দিপ্ত চোখে তাকালেন।

'টেলিগ্ৰাম। টাউন স্কুলেৰ সামনে পোস্টঅফিসেৰ লোকটাৰ সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে ও দিয়ে দিলে।' আজ অবধি অনিমেষ কখনো এ-বাড়িতে টেলিগ্ৰাম আসতে দেখেনি। পিয়ানোৰ কাছ থেকে প্ৰায় আবদার কৰেই ও খামটা এনেছে।

হঠাতে কেমন নাৰ্ভাস হয়ে গেলেন সরিষ্ণেখৰ। খামটা হাতে নিয়ে ছিড়তে ছিড়তে বললেন, 'আবাৰ কাৰ কী হল!'

তাৰপৰ একনিষ্ঠাসে টেলিগ্ৰামটা পড়ে ফেলে চিন্কাৰ কৰে হেমলতাকে ডাকলেন, 'হেম, প্ৰিয় টেলিগ্ৰাম কৰেছে, আগামীকাল প্ৰেনে কৰে আসছে।'

হেমলতা হকচকিয়ে শিয়ে বললেন, 'কে আসছে বললেন? প্ৰিয়-মানে আমাদে প্ৰিয়তোষ?'

জলপাইগুড়ি শহৱেৰ কাছাকাছি বড় এয়াৱপোট বাগড়োগৱা-শিলিঙ্গি ছাড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু চা-বাগান এবং ব্যবসায়ীদেৰ সুবিধেৰ জন্য কলকাতা থেকে বেসৱকাৰি কোম্পানি জলপাইগুড়ি শহৱেৰ কাছাকাছি একটা প্ৰেন নামৰ জায়গা কৰে নিয়েছিল। জায়গাটাকে কখনোই এয়াৱপোট বলা যায় না তবু যেহেতু অন্য নাম মাথায় চট কৰে আসে-না তাই প্ৰেনে কৰে কলকাতায় যেতে হলৈ লোকে বলে এয়াৱপোটে যাচ্ছি। ঠিক এ-ধৰনৰ বেসৱকাৰি প্ৰেন নামৰ জায়গা ছিল বৰ্গছেড়াৰ হাছাকাছি তেলিপাড়ায় এবং কুচবিহাৰে। মালবাহী প্ৰেনগুলো যাত্ৰী নিত খুব কম ভাড়ায়। তবু সাধাৰণ মানুষ কেউ প্ৰেনে আসছে শুনলে লোকে বুৰুত তাৰ পথসা আছে বেশ। প্ৰিয়তোষৰ প্ৰেনে কৰে জলপাইগুড়ি আসাৰ টেলিগ্ৰাম পেয়ে খুব নাৰ্ভাস হয়ে গেলেন সরিষ্ণেখৰ।

যে-ছেলেটা কমিউনিস্ট হওয়ায় পুলিশৰ ভয়ে এক রাতেৰ অঙ্ককাৰে পালিয়ে গেল আচমকা এবং এতগুলো বছৱে যাব কোনো খোঁজখৰ পাওয়া গেল না, সে হঠাতে প্ৰেনে কৰে ফিৱে আসে কীভাৱে? প্ৰিয়তোষ যদি হঠাতে বড়লোক হয়ে গিয়ে থাকে (কমিউনিস্টদেৱ সঙ্গে বড়লোক কথাটা কিছুতই জুড়তে পাৱেন না সরিষ্ণেখৰ) আলাদা কথা, তা হলে এৱ মধ্যে তো সে তাঁকে চিঠি দিতে পাৱত! এতদিন তুৰ দিয়ে হঠাতে এত জানান দিয়ে আসছে সে-সরিষ্ণেখৰ খুব অবশ্যিতে পড়লেন। ওকে আনতে যাওয়াৰ কথা লেখেনি প্ৰিয়তোষ, কিন্তু সরিষ্ণেখৰেৰ অভিজ্ঞতায় প্ৰেনে কৰে কেউ আসছে জানলৈ রিসিভ কৰতে যেতে হয়।

গাড়িভাড়া এবং প্ৰিয়তোষ এই দুটো চিন্তা কাল রাত্ৰে তাঁকে ঘুমোতে দেয়নি। আজ ভোৱে উঠেই মনে পড়ল সকাল-সকাল বৌধ প্ৰকল্প অফিসে তাঁকে যেতে হবে। শেষ পৰ্যন্ত তিনি ঠিক কৰলেন প্ৰিয়তোষকে আনতে অনিমেষকে পাঠাবেন। একবাৰ ভেবেছিলেন, যে-ছেলে রাতেৰ অঙ্ককাৰে পালিয়ে গেছে তাকে বৰণ কৰে আনাৰ দৱকাৰ নেই। কিন্তু হেমলতা তাঁকে মনে কৰিয়ে দিলেন, এই বংশে কেউ কখনো প্ৰেনে, চাপেনি, প্ৰিয়তোষ যখন সেই দুৰ্লভ সম্মান অৰ্জন কৰছে তখন সেই পালিয়ে যাওয়া প্ৰিয়তোষেৰ সঙ্গে এই প্ৰিয়তোষেৰ নিশ্চয়ই অনেক পাৰ্থক্য। কথাটা চট কৰে মনে ধৰেছিল সরিষ্ণেখৰেৱ। এই বংশে কেউ যদি সম্ভানজনক বিৱল দৃষ্টান্ত দেখায় তাকে তিনি ক্ষমা কৰে দিতে পাৱেন, তাৰ জন্য গৰ্ব হয় তাৰ। এইৱেকম একটা গৰ্ব নিয়ে তিনি সয়ত্ৰে লালন কৰছেন যে অনিমেষ একদিন এম এ পাশ কৰবে-এই বংশে যা কোনোদিন হয়নি।

অতএব শিৱ হল অনিমেষ তাৰ ছেটকাকাকে আনতে এয়াৱপোটে যাবে।

আজ অবধি শিলিঙ্গড়িতে কখনো যায়নি অনিমেষ। শিলিঙ্গড়িৰ বাসে চেপে ওৱা খুব রোমাঞ্চ হচ্ছিল। তা ছাড়া এয়াৱপোটে প্ৰেন ঠাণ্ডানা দেখাৰ কোতুহলটা ক্ৰমশ ওকে অস্থিৰ কৰছিল আজ স্কুল খোলা অথচ ও শাঙ্কা না-এৱকম ঘটনাও কখনো ঘটেনি। আসবাৰ সময় দাদু ওকে একটা টাকা

দিয়েছেন, দুটো আধুলি! বাস-বদল করে যেতে আটআনা লাগে। ও যখন এয়ারপোর্টে পৌছাল তখন বেলা দশটা, শুল কলকাতার প্লেন আসতে দেরি আছে। জায়গাটা দেখে খুব হতাশ হল অনিমেষ। মাঠের একপাশে কিছু ঘরবাড়ি, মাঝে-মাঝে বিভিন্ন রঙের কাপড় উড়ছে মাঠের এখানে-সেখানে। একটা ও প্লেন নেই ধারেকাছে। যে-জায়গাটায় প্লেন নামে সেটা ও খোলামেল। একটি টিটল দেখতে পেল সে। বয়ামে কেক রাখা আছে। ওর খুব লোভ হচ্ছিল কেক থেতে, কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না। যদি ছোটকাকা না আসে তা হবে ফেলার বাসভাড়া থাকবে না। দাদু এত টায়-টায় পয়সা দেয়। অনির মনে পড়ল আজ সকালে পিসিমা বাজারে যাওয়ার কথা বলতে দাদু রেগে গিয়েছিলেন। বাড়িতে যা আছে তা-ই থেতে হবে ওকে বলে ধমক দিয়েছিলেন। পিসিমা অনিমেষকে আসবার সময় বলে দিয়েছিলেন, ফরেষ্ট বাংলা চৌকিদারকে ডেকে দিতে। ও জানে চৌকিদার বাড়িতে মুরগি পুরে ডিম বিক্রি করে। ডেকে দিয়েছিল অনিমেষ। আজ দুপুরে নিষ্ঠয়ই ডিমের ডালনা হবে-ছোটকাকা আসছে বলে অনেকদিন বাদে ডিম খাওয়া যাবে।

প্লেন আসছেন। অনেকেই গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে এসেছে। তিন-চারটে ট্যাক্সি সামনে দাঁড়িয়ে। কলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে বলে প্লেন ছাড়তে দেরি হচ্ছে। অনিমেষ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিছু সুরেশা মহিলা ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। ওর মনে হল এবার জোর করে ফুলপ্যাট বানাতে মরে। মেয়েদের সামনে হাফপ্যাট পরে হাঁটতে আজকাল বিশ্বি লাগে। দাদু যে কেন ছাই বোঝে না।

ছোটকাকাকে সে চিনতে পারবে তো? পিসিমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সকালে। যদি জ্যাঠামশাইকে অ্যান্ডিন পর চিনতে পারে, তাহলে ছোটকাকাকে পারবে না? আপনমনে হাসল অনিমেষ। ইয়ে আজাদি বুট হ্যায়-মনে রাখিস অনি! হঠাৎ ওর মনে হল, এই ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। সেই পাঞ্জাব থেকে কন্যাকুমারিকা - ম্যাপে যে-ভারতবর্ষ খুব বুজে পড়ে থাকে, ছোটকাকা বোধহয় সেই ভারতবর্ষের মানুষকে এই কথাটা শনিয়ে এল-ইয়ে আজাদি বুট হ্যায়। কিন্তু ছোটকাকাকে সে এবার জিজ্ঞাসা করবে, এই কথাটা সত্যি কি না। আজাদি যদি যিখ্যে হত, তা হলে ছোটকাকারা সব কথা এত খোলাখুলি বলছে, কিন্তু কই পুলিশ তো তাদের অ্যারেষ্ট করছে না। ইংরেজ আমলে সেরকম ব্যাপার কি হত? নিশীথাবাৰ বলেন (অনিমেষ ওকে আজকাল আর নতুন স্যার বলে ডাকে না), ভারতবর্ষ স্বাধীন, সাৰ্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক মানুষ তাঁৰ ইচ্ছেমতন কথা বলতে পারেন, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন শুধু তাঁৰ আচরণের ঘৰা অন্যের অথবা দেশের যেন ক্ষতি না হয়। কংগ্রেস সরকার এই মহৎ অধিকার দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছে। দীর্ঘ সংগোষ্ঠের পর কংগ্রেস যে-অধিকার অর্জন করেছে তা সে নিজের শুঁটোয়ে লুকিয়ে রাখেনি। সেক্ষতে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস কী বলে? দেশবিভাগে, আগে এরা নেতৃত্বে নামে মোংকা ছিটোয়ালিং যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের সঙ্গে হাত মেলায়নি; স্বাধীনতার পর তারা এমন বাড়াবাড়ি করেছিল যে দেশের স্বার্থে তাদের দলকে ব্যান করে না দিবে চলত না। কিন্তু সে কটা কমিউনিস্টদের ছুড়ে ফেলে দিল। কথাটা ভীষণ সত্য-অধিকার কেউ হাতে তুলে দেয় না, তাকে অর্জন করতে হয়। কমিউনিস্টরা তা পারেনি, এটা তাদের কৃটি। আর এই যে ওর, 'কংগ্রেস সরকারকে যা-তা বলতে পারছে, তা আমাদের এই স্বাধীনতা সত্যি বলেই পারছে।

নিশীথাবাৰ এই কথাগুলো আজ ছোটকাকাকে জিজ্ঞাসা করবে অনিমেষ। মন্টুর কথাটা চট করে মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মন্টু বলে, 'কংগ্রেস হল চোৱের সরকার। যে যেখান থেকে পারে তুমি করে যাচ্ছে। অবশ্য এসব কথা আমি বিৱাম কৰাকে উদ্দেশ করে বলছি না। উনি যে রঞ্জন বাবা!'

কংগ্রেসের সব ভালো, ইতিহাস ভালো, নেতৃত্বও ভালো। কিন্তু কেন যে সবাই ওদের চোৱে বলে কে জানে! আছা, চোৱ যদি তবে ভোট দিয়েছে কেন?

হঠাৎ মাইকে কে যেন কী বলে উঠতে অনিমেষ দেখল সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিল। খুব জড়ানো ইংরেজি বলে ও ঠিক খুবে উঠতে পারে না। কিন্তু এখন তো সবাই বুঝতে পারছে যে কলকাতার প্লেন এখনই নামবে।

আৱ কয়েক মিনিট বাদে ডানায় কুপোলি রোদ মেঘে একটা মাঝারি চকচকে পাখি এয়ারপোর্টের ওপৰ দুবাৰ পাক খেয়ে অনেক দূৰ থেকে নিচে নেমে আসতে লাগল। একসময় তার বুক থেকে চাকা বেঁধিয়ে মাটিৰ ওপৰ গড়িয়ে যেত লাগল যতক্ষণ-না সেটা নিৰাহ খুব করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

তারপর ওর বুকের র খুলে গিয়ে সিঁড়ি জুড়ে গেল। আর লোকগুলো কেম গভীরপায়ে নেমে আসতে লাগল মাটিতে। অনিমেষ দেখল রেলস্টেশনে অথবা বাসে প্যাসেজাররা যেরকম জামাকাপড় পরে যায় এবং তার চেয়ে দামি-দামি জামাকাপড় পরেছেন। একজন খুব মোটা ভীষণ কালো ফৌফওয়ালা মানুষ-ধূতি, ভূড়ি-সামলানো পাঞ্জাবি আর মাথায় ইয়া বড় গাঙ্কীটুপি, নামতে অনেকে মালা নিয়ে ছুটে গেল তাঁর দিকে। চার-পাঁচজন পুলিশ অফিসার তাঁকে স্যালুট করে ঘিরে দাঁড়াল। ওপাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, ‘মিনিস্টার আয়া, মিনিস্টার।’

এই প্রথম মন্ত্রী দেখল সে। বাজা ভারতবর্ষের মানুষরা, আর মন্ত্রী মাঝ কয়েকজন। তাঁদের একজনকে দেখতে পেয়ে অনিমেষের খুব গর্ব হচ্ছিল। কেমন বিনয়ী হয়ে হাতজোড় করে এগিয়ে আসছেন। ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর পাশ দিয়ে ওঁকে যেতে হবে, অনিমেষ যন্ত্রচালিতের মতো দুটো হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। আর সেই সময় ওর নজরে পড়ল মন্ত্রীর পেছন পেছন যে হৈটে আসছে তাঁর দিকে। ছেটকাকা। একদম চেনা যাচ্ছে না, আঘাত কালারের সুট, লম্বা সরু মীল টাই, চোখে চশমা, হাতে বড় অ্যাটিচিব্যাগ। এই পোশাকে অনিমেষ ছেটকাকাকে কখনো দেখেনি। চট করে চেনা অসম্ভব। কিন্তু ছেটকাকার মৃখচোখ এবং হাঁটার ভঙ্গি একই রকম আছে। ও দেখল মন্ত্রী ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেটকাকাকে কিছু বলতেই ছেটকাকা হেসে জবাব দিয়ে নমস্কার করে এবার একা এগিয়ে আসতে লাগল লম্বা-লম্বা পা ফেলে। তাঁর মানে মন্ত্রীর সঙ্গে ছেটকাকার ভাব আছে। অনিমেষ কেমন হতঙ্গ হয়ে পড়ল। কংক্রেসি মন্ত্রীর সঙ্গে ছেটকাকার ভাব হল কী করে? আর সেই ছেটকাকার সঙ্গে এই ছেটকাকার পোশাকে একদম মিস দেই কেন?

ভীষণ নার্তস হয়ে ছেটকাকার দিকে এগিয়ে গেল সে।

চোখাচোখি হলেও প্রিয়তোষ অন্যমনশ্ব হয়ে কয়েক পা এগিয়ে হঠাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘুরে অনিমেষের দিকে ভালো করে তাকিয়ে চিন্কিৎ করে উঠল, ‘আরে অনি না?’

অনিমেষের ভালো লাগল বলার ধরনটা। ও হেসে সামনে এগিয়ে এসে নিজু হল প্রণাম করতে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে এক হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরল প্রিয়তোষ, ‘আরে কী আশ্র্য, তুই যে দেখছি ভেরি শুড় বয়, প্রণাম-ট্রনাম করিস! আমি তো তোকে প্রথমে চিনতেই পারিনি-কী লম্বা হয়ে গেছিস! তা তুই কি আমাকে রিসিড করতে এসেছিস?’

ঘাড় নাড়ল সে, ‘দাদু আসতে বললেন।’

‘আমি ভাবছিলাম টেলিফোনটা আমার আগে আসবে কি না। যাক, বাবা এখন কেমন আছেন?’ প্রশ্ন করল প্রিয়তোষ। অনিমেষ দেখল ছেটকাকার মাথা ওর চেয়ে সামান্য ওপরে।

অনিমেষ বলল, ‘দাদু ভালো আছেন।’ এই সময় ও দেখল পাঁচ-ছয়জনের একটা দল এগিয়ে আসছে। দলের সামান্য বিরাট মোটা একটা ফুলের মালা-হাতে বিরাম কর মহাশয়। বিরামবাবুর ছেট শরীররটার পেছনে মুভিং ক্যাসেল। বিরামবাবু এগিয়ে গিয়ে মন্ত্রীমশাই-এর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। একটা হাততালির বাড় উঠল। বিরাম কর কিছু বলতেই মন্ত্রীমশাই মুভিং ক্যাসেলকে নমস্কার করলেন। অনিমেষের মনে হল এই মুহূর্তে মুভিং ক্যাসেলকে একদম বাক্ষা মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। এই দলের মধ্যে নিশ্চিখাবুকে দেখতে পেল না সে।

‘কোন পাড়ায় থাকে?’

‘আমাদের পাড়ায়। আমার সঙ্গে আলাপ আছে।’ অনিমেষ বেশ গর্বের সঙ্গে কথাটা বলল। বাইরে তখন গাড়িগুলো নড়চড়া করছিল।

প্রিয়তোষ বলল, ‘একটা ট্যাক্সি দ্যাখ, সোজা বাড়ি যাব।’

ছেটকাকা যে বাস যাবে না এটা ও অন্যমন করতে পারছিল। এখান থেকে পুরো ট্যাক্সি রিজার্ভ করে যাওয়া যায়। অনিমেষের মেয়াল হল ওর আট আনা পয়সা বেঁচে যাচ্ছে। দাদু যদি ফেরত না চান তা হলে কী ভালোই-না হয়!

মন্ত্রীর জন্য সরকারি গাড়ি এসেছিল। তিনি তাতে চলে গেলেন। অনিমেষ ট্যাক্সি ওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে হতাশ হচ্ছিল। সবাই আজ রিজার্ভড হয়ে আছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ ব্যাপারটা দেখছিল। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসে অনিমেষকে বলল, ‘তুই এখনও নাবালক আছিস। দাঁড়া আমি দেখছি।’

প্রিয়তোষ গিয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখন অনিমেষ দেখল বিরামবাবুরা সদলে ফিরে যাচ্ছেন। মুভিং ক্যাসেল ওকে দেখতে পেয়ে অস্তুত ভঙ্গিতে শরীরে ঝাড়ুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে এলেন কাছে, ‘ওমা তুমি! একদম দেখতে পাইনি গো! কখন এলে?’

অনিমেষ বলল, ‘অনেকক্ষণ ইঠে’

মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘কালই নিশীথকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম, ছেলের দেখা নেই কেন? তা মিনিটারকে দেখতে এসেছে বুঝি?’

ঘাড় নাড়ুল অনিমেষ, ‘না। আমার ছেটকাকা এসেছেন ওই প্লেনে।’ ও ইশারা করে প্রিয়তোষকে দেখাল।

ট্যাক্সি-ওয়ালার সঙ্গে কথা শেষ করে প্রিয়তোষ তখন এদিকে আসছিল। তাকে এক পলক দেখে নিয়ে একটু উন্মেজিত গলায় মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘ওমা, ইনি বুঝি তোমার কাকা। মিনিটারের সঙ্গে কথা বলছিলেন না প্লেন থেকে নেমে?’ অনিমেষ ঘাড় নাড়তেই ফিসফিস করে বললেন, ‘খুব ইন্ত্রুয়েশনিয়াল লোক মনে হচ্ছে। কলকাতায় থাকেন?’

প্রিয়তোষ কোথায় থাকে জানে না অনিমেষ। কিন্তু জলপাইগুড়ির বাইরে সভা জায়গা বলতে চটক করে কলকাতার নামই মনে আসে। ও ধিখা না করে মাথা নেড়ে হাঁ বলল। প্রিয়তোষ তখন প্রায় কাছে এসে পড়েছে, মুভিং ক্যাসেল ফিসফিসিয়ে বললেন, ‘আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।’

প্রিয়তোষ বলল, ‘চল, ট্যাক্সিটা পাওয়া গেছে! এই কয় বরে জলপাইগুড়ির হাল কী হয়েছে রে, ট্যাক্সির রেট দিল্লির থেকেও বেশি?’

মুভিং ক্যাসেলকে প্রিয়তোষ যেন দেখেও দেখল না, অনিমেষের হাতে-ধরানো অ্যাটচিটা নিয়ে ট্যাক্সির দিকে ফিরল। মহা ফাঁপরে পড়ে গেল অনিমেষ। মুভিং ক্যাসেলের ভালো নাম তো জানা নেই, কী বলে পরিচয় করিয়ে দেখে ও। প্রিয়তোষকে ফিরতে দেখে মুভিং ক্যাসেল জরুরি করে আলতো চিমটি কাটলেন অনিমেষের হাতে। তৎক্ষণাত অনিমেষ বলল, ‘ছেটকাকা, ইনি-মানে ইনি না আমাদের মাস্টারমশাই-মানে এখানকার কংগ্রেসের...’, কীভাবে কথাটা শেষ করবে বুঝতে না পেরে চট করে শেষ করে দিল, ‘শ্রীবিবাম করের স্তী।’

খুব অবাক হয়ে প্রিয়তোষ তাইপোকে একবার দেখল, তারপর হাতজোড় করে মুভিং ক্যাসেলকে নমস্কার করল। অনিমেষ শুরু করা থেকেই মুভিং ক্যাসেল যুক্তহস্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখন হাত নামিয়ে সলজ মিটি হাসলেন, ‘আমি সামান্য কংগ্রেস করি, কোনো ইতিহাস নেই, আর ভূগোল তো দেখছেন।’

এইভাবে নিজের পরিচয় দিতে বোধ করি প্রিয়তোষ কাউকে শোনেনি। খুব অবাক হয়েও সেটকে দ্রুত কাটিয়ে নিয়ে বলল, ‘আমি তো অনেকদিন জলপাইগুড়ি ছাড়া, তুই আপনার সঙ্গে আলাপ হ্যানি। আমি প্রিয়তোষ।’

মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘আপনারা তো বাড়ি ফিরবেন, তা আমাদের গাড়িতে আসুন পারেন, কোনো অসুবিধে হবে না।’

প্রিয়তোষ বলল, ‘না না, অনেক ধন্যবাদ। ট্যাক্সি-ওয়ালাটাকে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি।’

মুভিং ক্যাসেল খুব ছেট একটা ভাঁজ দুই ভুরুর মাঝখানে এনে বললেন, ‘আপনি বুঝি কথগা দিবে কখনো খেলাপ করেন না?’

প্রিয়তোষ হাসল, ‘ঠিক উলটো। এত বেশি খেলাপ করি যে মাঝে-মাঝে রাখবার জন্য বদখেয়াল হয়। শহরে আশা করি আপনার দেখা পাব।’

মুভিং ক্যাসেল হঠাতে কেমন নিষেজে গলায় বললেন, ‘বাঃ, নিষয়ই।’ তারপর এক হাতে অনিমেষের চিরুক নেড়ে দিয়ে বললেন, ‘এই ছেলে, কাকাকে নিয়ে আমার বাড়ি আসবে।’

প্রিয়তোষের সঙ্গে ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের মনে হল একক্ষণ সেয়ানে-সেয়ানে কক-ঠোকারুকি হচ্ছি। কাটিকদা যখন অন্য কারওর সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেন তখন ককটা বেশিক্ষণ শুন্যে থাকে না, কিন্তু প্রতুলদার সঙ্গে যাচ হলে শুধু ছেটকিয়ে এপার-ওপার করতে থাকে, মাটিতে পড়তে ঢায় না। নিশীথবাবু বা তার কাছে মুভিং ক্যাসেল যত সহজভাবে বলতে পেরেছেন, আজ ছেটকাকার সঙ্গে যেন তা একদমই পারেননি। খুব মজা লাগছিল ওর।

ট্যাক্সির পেছন-সিটে ওরা দুজন, ছেটকাকা পকেট থেকে একটা চকচকে সিগারেটের টিন বের করে সিগারেট ধরাল, ‘তারপর খবরাখবর বল।’

অনেকক্ষণ থেকে যে-প্রশ্নটা অনিমেষের মুখে আসছিল সেটা ফস করে বলে ফেলল এবার, ‘ছেটকাকা, তুমি একদম বদলে গিয়েছ।’

‘আঁ?’ বলে চমকে ওর দিকে তাকিয়ে হোহো করে হেসে উঠল প্রিয়তোষ, তারপর বলল, ‘আমার কথা পরে হচ্ছে। আমি চলে যাবার পর কী হয়েছিল বল।’

চট করে অনিমেষ সেসব দিনের কথা মনে করতে পারল না। একটু ভেবে নিয়ে বলল, ‘পুলিশ এসে খোঁজ করেছিল, দাদু রেগে গিয়েছিলেন তোমার ওপর।’

সিগারেট খেতে-খেতে প্রিয়তোষ বলল, ‘তারপর?’

অনিমেষ বলল, ‘দাদু অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়েছিলেন কিন্তু কোনো খবর পাননি। তারপর এতদিন আর কোনো কথা হত না তোমাকে নিয়ে।’

‘দিদি কেমন আছেন?’

‘পিসিমার শরীর খারাপ।’ অনিমেষ একটু ভেবে নিয়ে বলল, ‘আজ দাদু বাড়িভাড়া দেবার জন্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন।’

‘বাড়িভাড়া? কেন?’

অনিমেষ ছেটকাকার দিক তাকিয়ে বলল, ‘তুমি কাউকে বোলো না। দাদুর হাতে একদম পয়সা নেই। আমরা অনেকদিন মাছ খাই না।’

‘মে কী?’ চমকে সোজা হয়ে বসল প্রিয়তোষ, ‘তোর বাব টাকা পাঠায় না? আমি জানি তোর বাবা আবার বিয়ে করেছে। আমি এখানকার সব খবর জানি। কিন্তু বাবা যে অর্ধকটে আছে তা তো কেউ বলেনি।’

অবাক হয়ে ছেটকাকাকে দেখল অনিমেষ। এখানকার সব খবর রাখে ছেটকাকা! কী আশ্চর্য! ও বলল, ‘বাবা টাকা পাঠান, কিন্তু তাতে চলে না। জলপাইগুড়িতে জিনিসপত্রের দাম নাকি খুব বৃদ্ধি।’

ছেটকাকা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অনিমেষ দেখল জলপাইগুড়ি এসে যাচ্ছে।

ও হঠাৎ সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, ‘ছেটকাকা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করল, ‘কার কাছে ওনলি?’

দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, ‘কারও কাছে না।’

খুব সঁওগা গলায় প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, ‘হঠাৎ তোর একথা মনে হল কেন?’

প্রিয়তোষের বলার ধরনের এমন একটা অস্বাভাবিক সুর ছিল যে, অনিমেষ বুঝতে পারছিল প্রশ্নটা করা ভীমণ ভুল হয়ে গেছে। ও তাকিয়ে দেখল ছেটকাকা ওর দিক থেকে দৃষ্টি সরায়নি। খুব অস্বস্তি নিয়ে অনিমেষ বলল, ‘এখানে যাঁরা কমিউনিটি তাঁদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।’

প্রিয়তোষ যেন এ-উত্তরটা আশা করেনি, ‘মানে?’

‘এখানকার কমিউনিটিদের চূল্টুল উশকোঝুকো হয়, বেশিরভাগ গেৱয়া পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে আর কাঁধে একটা কাপড়ের বোলা থাকে। দেখলেই বোঝা যায় খুব গরিব-গরিব।’ তারপর যেন মনে করতে পেরে বলল, ‘আগে তুমি এইরকম পোশাক পরতে।’

হোহো করে হেসে উঠল প্রিয়তোষ। হাসি যেন আর থামতেই চায় না। তা দেখে অনিমেষ হাঁপ ছেড়ে বাচল। শেষ পর্যন্ত প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, ‘আর কংগ্রেসিরা, তাঁদের কী দেখে বোঝা যায়? ফিল্মফেনে ধৃতি, খন্দরের ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি আর মাথায় সাদা ধৰ্মধৰে গাঙ্কীটুপ-তাই তো।’

ঝটা অবশ্যই কংগ্রেসিদের পোশাক। এই তো মন্ত্রীকে সে এইরকমই দেখল, তবু সবাই তো এরকম নয়। নিশীথবাবু, নবীনবাবু শশধরবাবু, তো একদম অন্যরকম। আবার মুভিং ক্যাসেল-তিনিও তো কংগ্রেস করেন।

ওর দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ বলল, ‘তা আমার পোশাক দেখে নিশ্চয়ই কংগ্রেস মনে হচ্ছে।’

না, কিন্তু কংগ্রেসও মনে হচ্ছে না তো? তা হলে আমি কী?' হঠাতে মুখ ঘুরিয়ে প্রিয়তোষ ড্রাইভারকে বলল, 'একটু বাজারের দক্ষিণ যাব ভাই, দিনবাজারের পুলটা দিয়ে না হয় ঘুরে যাবেন।'

তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর কোনো পার্টি করি না।'

একথাটাই এতক্ষণ মনে হচ্ছিল অনিমেষের, সে অবাক-গলায় জিজ্ঞাস করল, 'তুমি বুবি অফিসার?'

মাথা নাড়ল প্রিয়তোষ, 'না রে! আমি চাকরি করি, কিন্তু ঠিক সেরকম চাকরি নয়। তওঁই এখন এসের কথা বুবাবি না। বাঃ, শহরটার তো অনেক উন্নতি হয়েছে। ওটা কী সিনেমা হল, আলোছায়া? দীনিতি টিকিজ আছে না?'

প্রসঙ্গটা এমন সহজে ঘুরে গেল যে অনিমেষ ধরতে পারল না, হ্যাঁ। আর-একটা সিনেমা হল হয়েছে।' ও মুখ বের করে দেখল আলোছায়াতে দস্যু মোহন হচ্ছে। এই সিনেমাটার কথা মন্তু খুব বলছিল। ও চট করে পকেটে পড়ে-থাকা আধুলিকে শ্পর্শ করে নিল।

'তুই সিগারেট খাস?'

প্রশ্নটা শুনে চমকে ছেটকাকার দিকে তাকিয়ে দ্রুত মাথা নাড়ল অনিমেষ। এরকম প্রশ্ন বড়রা কেউ করবে ও ভাবেন। ছেটকাকা নির্বিকার-ওদের ক্লাসের অনেকেই এখন সিগারেট খায়। মন্তু ওকে একবার জোর করে সিগারেট টানিয়েছিল, কী বিশ্বিতি তেতো-তোতো! কি আরাম যে লোকে পায়!

'তুই পার্টি করিস?'

এই প্রশ্নটার অর্থ এখন অনিমেষের জানা হচ্ছে গেছে। পার্টি করা বলতে এখন সবাই কমিউনিস্ট পার্টি করার কথাই বোঝায়। যেন কংগ্রেসিরা পার্টি করে না। নিশ্চিধাবু ওকে নিয়ে কংগ্রেস অফিসে কথেকবার গিয়েছিলেন। সামনের নির্বাচনে ওকে কংগ্রেসের হয়ে যে কাজ করতে হবে সেটা নিশ্চিত। সেদিন একটা মজার বক্তৃতা ঘুরেছিল ও। জেলা থেকে নির্বাচিত একজন কংগ্রেস বলছিলেন, 'ওরা বলে আমরা চোর, ভালো কথা। কিন্তু গদিতে যে-ই যাবে সে সাধু থাকতে পারে না। এখন কথা হল আমরা খেয়ে-খেয়ে এমন অবস্থায় এসেছি যে আর খাওয়ার ক্ষমতা নেই। এখন হচ্ছে না থাকলেও আমরা সাধারণ মানুষের জন্য দুঃখকটা কাজ করব।' কিন্তু ওরা তো উপোসী ছারপোকা হয়ে আছে, গদিতে গেলে তো দশ বছর লুটেপুটে খাবে! তার বেলা? কথাটা অনিমেষের ঠিক মনঃপূত না হলেও বিকল্প কোনো চিন্তা মাথায় আসেনি। তাই ঘাড় নেড়ে এখন সে বলল, 'আমি কংগ্রেসকে সার্পোট করি।'

একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ মনে করতে পারল, 'ও, তুই সেই বন্দোমাতরম্য বলতিস, না? স্বাধীনতা দিবসে ঝুঝাগ তুলেছিল, না?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। এটা ওর গর্ব!

হঠাতে অনিমেষের জ্যাঠামশাই-এর কথা মনে পড়ে গেল, 'জান, জ্যাঠামশাই একদিন জেটিমা আর ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। দাদু ছিল না তখন।'

'তা-ই নাকি? তারপর?'

'খাওয়াদাওয়া করে দাদু আসার আগেই চলে গেল। এ-খবর তুমি জান?'

অনিমেষ সন্দেহের চোখে ছেটকাকার দিকে তাকাল। প্রিয়তোষ হেসে ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'জ্যাঠামশাই তোমাকে কমিউনিস্ট পার্টি কর বলে বোকা বলছিল। আবের গোচাতে হলে নাকি কংগ্রেস হতে হয়। আমার খুব রাগ হয়েছিল। বলো কথাটা কি ঠিক? হাতের সব আঙুল কি সমান? অনিমেষ বেশ উত্তেজিত গলায় বলল।

প্রিয়তোষ দিনবাজারের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাতে বলে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল, 'কেন, তুই একটু আগে বললি না চেহারা দেখে বোৰা যায় কে কমিউনিস্ট আৱ কে কংগ্রেসি। তা স্বে থাকতে গেলে তো কংগ্রেস হতে হবে। ভালো কৰেছিস।'

ব্যাগ থেকে একটা একশে টাকার নোট বের করে অনিমেষের সামনে ধরল প্রিয়তোষ, 'যা, চট করে এক সের ভালো কাটা পোনা এক সের রাবাড়ি আৱ কিছু মিষ্টি কিনে আন। আমি আবার মাছ ছাড়া খেতে পাৰি না। তা ছাড়া বাবার এসব অনেকদিন পৰ খেতে ভালো লাগবে।'

অনিমেষ দেখল ছোটকাকাৰ ব্যাগটা একশো টাকা নোটে ফুলে ঢাউস হয়ে আছে। কত টাকা! বাড়ানো হাতে নিয়ে ওৱ খেয়াল হল পিসিমা আজকাল একদম মাছ হোন না, ও একটু ইত্তত করে বলল, ‘কিন্তু পিসিমা যে মাছ রাখা কৰেন না!’

‘সে কী! প্ৰিয়তোষ যেন কথাটা বিশ্বাস কৰল না, ‘ঠিক আছে, সে আমি দেখব। হ্যাঁ, এক কাজ কৰ, আসাৰ সময় এক পোয়া ছানাৰ জিলিপি আনবি। দিদি ছানাৰ জিলিপি পেলে কোনোকিছুতেই না বলবৈ না।’

প্ৰিয়তোষ যেন বাড়িতে একটা উৎসবেৰ মেজাজ নিয়ে এল। এতদিন ধৰে সৱিষ্ণেখৰেৱ এই সংসাৰ যে-জলাৰ মধ্যে পাক খাচিল তাৰ যেন অনেক মুৰু খুলে গেল আচৰিতে। হেমলতা প্ৰিয়তোষকে জড়িয়ে ধৰে খানিকক্ষণ মন খুলে কেঁদে নিয়ে মাছ কুটতে বসে গেলেন। কানাৰ সময় অনিমেষ দূৰে দাঁড়িয়ে অনেকগুলো নাম শৰণতে পেল যাদোৰ মধ্যে সেই অদেখা শটীন পিসেমশাইও ছিলেন। হেমলতা কানায় আপেক্ষটাই বড় হয়ে উঠেছিল, প্ৰিয়তোষ আদিন কোধাৰ ছিল- এদিকে যে সংসাৰ ভেসে যায়-আৱ কতদিন এই পোড়া বোৰা বইতে হবে ইত্যাদি। কানাৰ মাৰখানে একবাৰ সৱিষ্ণেখৰেৱ বিৰুক্ষেও কিছু বলা হল। তাৰপৰ কানাৰ ধৰণে প্ৰিয়তোষেৰ অনি মিষ্টি তাকে বেতে দিয়ে গল্প কৰতে কৰতে মাছ কুটতে বসে গেলেন। যেন যত্ত্বেৰ মতো ব্যাপার হচ্ছে, অনিমেষ অবাক হয়ে দেখছিল। খুব শোক বা খুব আনন্দ মানুষকে তাৰ সংক্ষাৰ ভুলিয়ে দিতে পাৰে সহজেই।

একটু বেলা বাড়লে একমাথা রোদ ভেঙে সৱিষ্ণেখৰ বাড়ি ফিৰলেন। এই দৃশ্যটা দেখাৰ জন্য আড়লে চূপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল অনিমেষ। সৱিষ্ণেখৰ আসছেন, এক হাতে বিবৰ্ণ ছাতি অন্য হাতে লাঠি। কোৱা ধৃতি হাঁটুৰ নিচ অবধি, পাঞ্জাৰি লালচে। বেশ দ্রুত হাঁটছিলেন প্ৰথমটাই, গেটেৰ কাছাকাছি এসে মুৰু তুলে ঠাঠওৱ কৰতে চাইলেন বাড়িতে নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি না। অনিমেষ দেখছিল দাদু ঠিক বুৰাতে পারছেন না, তাই গেটটা বৰু কৰাৰ সময় শৰ্ক কৰলেন খুব জোৱে। তাৰপৰ যেন হাঁটতে পারছেন না আৱ, এইৱেকম ভঙ্গিতে লাঠিতে শৰীৱৰ ভৱ দিয়ে এগোতে লাগলেন। কয়েক পা ছেঁটে থককে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কোনো আওয়াজ পান কি না। দাদুৰ এইৱেকম ব্যাপারস্যাপার কোনোদিন দেখেনি অনিমেষ। গেটেৰ আওয়াজ ভেতৱে হেমলতাৰ কানে গিয়েছিল। পিসিমাকে হত্তয়ড় কৰে বাইৱে বেৰিয়ে আসতে দেখল ও। দাদুকে দেখে পিসিমা চিৎকাৰ কৰে উঠলেন, ‘ও বাবা, দেখুন কে এসেছে-প্ৰিয়-প্ৰিয়তোষ, একদম সাহেব হয়ে এসেছে-আপনাৰ জন্য মাছ মিষ্টি এনেছে।’ অনি দেখল দাদু যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব কৰে হাঁটছেন। তাঁৰ শৰীৱৰে কষ্ট যেন ছোটকাকাৰ ফিৰে আসাৰ চেয়ে অনেক জুৱাৰি।

বাবান্দায় উঠে চেয়াৰে গা এলিয়ে দিতে দিতে পিসিমা সৱিষ্ণেখৰ বললেন, ‘এক গোলাস জল দাও।’

হেমলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘এই রোদে পুড়ে এলেন, এখনই জল খাবেন কী!'

অনিমেষ দেখল ছোটকাকা ভেতৱে থেকে বেৰিয়ে এসে গৰীবমুখে দাদুকে প্ৰণাম কৰল। ছোটকাকাৰ পৱনে এখন ধোপভাঙা পায়জামা আৱ পোঁজি। দাদু একটা হাত উঁচু কৰে কী যেন বললেন, তাৰপৰ ছোটকাকা উঠে দাঁড়ালে জিজ্ঞাসা কৰলেন, ‘কৰন এলো?’

একদম হাঁ হয়ে গেল অনিমেষ। এত বছৰ পৱ এভাৱে বাড়ি ফিৰল যে, তাকে দাদু এমনভাৱে প্ৰশ্ন কৰলেন যেন কদিন বেৰিয়ে কেউ বাড়ি ছিলেছে! ছোটকাকাৰ বলল, ‘এই তো খানিক আগে আপনি কেমন আছেন?’

ততক্ষণে পিসিমা ভেতৱে থেকে একটা তালপাতার পাৰ্খা এনে জোৱে জোৱে দাদুকে বাতাস কৰতে আৱস্থ কৰে দিয়েছিলেন। সে-বাতাস খানিকক্ষণ নিয়ে দাদু বললেন, ‘বড় অৰ্থকষ্ট, এ ছাড়া ভালোই আছি। আজ বাড়িটা ভাড়া দিয়ে এলাম।’

পিসিমা জিজ্ঞাসা কৰলেন, ‘কত টাকায় ঠিক হস?’

‘আড়াইশো। তাতে আমাৰ চলে যাবে।’ কথাটা বলে দাদু ছোটকাকাকে আৱ-একবাৰ দেখলেন, ‘তোমাৰ শৰীৱ আগেৰ থেকে ভালো হয়েছে। বিয়ে-থা কৰেছ?’

‘না না, কী আচৰ্য, আপনাকে না বলে বিয়ে কৰব কেন?’ কেমন বোকাৰ মতো মুৰু কৰল ছোটকাকা।

পিসিমা বললেন, ‘মহী আৰু বিয়ে কৰেছে, জানিস? আৱ পৰি একটা কোথেকে মেয়ে ধৰে

বিয়ে করেছে, একটা বাচ্চাও হয়েছে।'

হঠাতে খুব জোরে ধমকে উঠলেন দানু, 'থামো তো, তখন থেকে ভড়ভড় করছ!'

পিসিমা চূপ করতেই খুব আস্তে বলে ফেললেন, 'তুমি আজদিন কোথায় ছিলে জানতে চাই না, মনে হচ্ছে সুরেই আছ। চাকরিবাকরি করা?'

'হ্যাঁ' খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ছোটকাকা।

পিসিমা আবার বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ বাবা, প্রিয় যখন এল আমি তো অবাক! কী দামি কোটপ্যান্ট, আবার সাহেবদের মতো টাই! খুব বড় অফিসার আমাদের প্রিয়। আগন্তর আর কোনো কষ্ট হবে না।'

হঠাতে দানু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আজকাল কমিউনিস্ট পার্টি কর না?'

মাথা নাড়ল ছোটকাকা, 'না, আমি কোনো দলে নেই।'

'সে কী! যে-পার্টির জন্য বাড়ি ছাড়লে সেই পার্টি ছেড়ে বড়লোক হয়ে গেলে! আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয় তোমার বঙ্গুরা ঠিক কথাই বলে। আমি অবশ্য তোমার বঙ্গুরের বেশি চিনি না।' সরিষ্ঠেখর মেয়ের দিকে তাকালেন, 'হেম, প্রিয়তোম মিষ্টি এনেছে বলছিলে না, দাও খাই, অনেকদিন মিষ্টি খাই না!'

সরিষ্ঠেখরের এই মিষ্টি থেতে চাওয়াটা থেকেই বাড়িতে বেশ উৎসব-উৎসব আয়োজ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু অনিমেষ দেখছিল দানু যখন ছোটকাকাকে বঙ্গুরের নাম করে কীসব শোনার কথাটা বললেন এবং বলে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন তখন ছোটকাকা এক কুঁচকে দানুকে এমন তঙ্গিতে দেখল যেটা মোটেই তালো নয়। তার পর থেকে এ-বাড়িটা একদম পালাটে গেল। এত বয়স হয়ে গেলেও এখনও কী শক্ত উনি, একই দিনবাজার থেকে বাজারের বোৰা এক হাতে বয়ে আনেন। সেই দানু একন যেন হঠাতেই অথর্ব হয়ে যাচ্ছেন। কথা বলছেন আস্তে-আস্তে। থেরেদেয়ে দুপুরে ছোটকাকা ঘুমুলে পিসিমা শব্দ করে বাসন মাঝিলেন বলে চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, 'যেমন তোমার গলার শব্দ তেমনি হাতের আওয়াজ! ছেলেটাকে ঘুমাতে দেবে না!'

বিকেলে চা খেয়ে বেঙ্গুরার সময় ছোটকাকা দানুকে দশটা একশো টাকার নেট দিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অনিমেষ দেখল টাকাটা নেবার সময় দানু একটুও উত্সেজিত হলেন না। যেন গচ্ছিত টাকা ফেরত নিচ্ছেন এমন ভাব। বাড়ি থেকে বের হবার আগে ছোটকাকা অনিমেষকে ডাকল, 'কী করছিস তুই?'

এখন ভর -বিকেল। তিস্তার পাড়ে মন্তুরা এসে গেছে। অনিমেষ ওদের কাছে আজকের এয়ারপোর্টের অভিভ্রতাটা বলবার জন্য ছাটফট করছিল। মুখে বলল, 'কিছু না।'

'তা হলে চল, আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি।' তারপর পিসিমাকে ডেকে বলল, 'তোমরা কখন শুয়ে পড়?'

পিসিমার সময়ের হিসেব ঠিক থাকে না, 'নটা-দশটা হবে, বাংলা খবর শেষ হলেই বাবা শুয়ে পড়েন।'

ছোটকাকা বললেন, 'আমাদের ফিরতে দেরি হবে।'

ছোটকাকার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে টাউন ক্লাবের রাস্তায় আসতে-আসতে অনিমেষের মনে হল আজ অবধি ও কাউকে এভাবে হ্রস্ব করে বাড়ি থেকে বের হতে দেখেনি। তুমশ ও বুরাতে পারছিল ছোটকাকা ওদের থেকে একদম আলাদা। এই ষে সিকের শার্টপ্যান্ট পরা শরীরটা ওর পাশে-পাশে হেঁটে যাচ্ছে তাকে ও ঠিক চেনে না। এই শরীরটা থেকে যে বুক-ভরে-যাওয়া সুগন্ধ বেঙ্গুরে সেটাই যেন একটা আড়াল তৈরি করে ফেলেছে। এত সুন্দর গন্ধ মুভিং ক্যাসেলের শরীর থেকেও বের হয় না। বিলিতি সেট বোধহয়।

মোড়ের মাথায় এসে একটা রিকশা নিল ছোটকাকা। কোনো দর-কষাকষি করল না, বলল, 'ঘণ্টা চারেক থাকতে হবে, দশ টাকা পাবে।'

রিকশাওয়ালাটা বোধহয় এরকম খন্দের আগে পায়নি, অব ক হয়ে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল। ছোটকাকার পাশে রিকশায় বসতে অনিমেষের মনে হল ওর জামাকাপড়ও গঙ্গে ভুরভুর করছে এখন। হাওয়া কেটে ছুটছে রিকশাটা টাউন ক্লাবের পাশ দিয়ে। ছোটকাকা বলল, 'আগে পোষ্টঅফিসের দিকে চলো।' ঘাড় নেড়ে রিকশাওয়ালা পি ডুরু ডি অফিস ছাড়িয়ে করলা নদীর পুলের

ওপৰ উঠল। কৱলা নদীৰ একদিকটায় কচুৱিপানা কম। আৱও একটু বাঁদিকে তাকালে তিস্তা দেখা যায়—কৱলা-তিস্তাৰ সঙ্গমটায় কিং সাহেবেৰ ঘাট।

করলা নদীর দিকে তাকাতেই চট করে অনিব সেই ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ও সোজা হয়ে বসল। অলসভাবে শরীরটা রেখে খিয়তোষ শহর দেখছিল। এই কয় বছরে একচুটুও বদলায়িনি জলপাইগুড়ি, শুধু নতুন নতুন কিছু বাড়ি তৈরি হয়েছে এদিকটায়। করলার পারে বিরাট জায়গা জড়ে হলঘরমত্ন কিছু হচ্ছে। হঠাৎ ও লক্ষ করল অনিমেষ কেমন সিঁটিয়ে বসে আছে।

‘কী হল তোর?’ প্রিয়তোষ পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে জিজ্ঞাসা করল। মনে পড়ে যাওয়া থেকে অনিমেষ চূপচাপ ভাবছিল কথাটা বলবে কি না। ও ঠিক বুঝে উঠছিল না যে ছোটকাকা ব্যাপারটা কীভাবে নেবে। ও নিজে অবশ্য আর গার্লস ক্লু যায়নি, কিন্তু তপুপিসি যে এখনও এখানে আছে এ-খবর সে জানে। আর আশ্চর্য, এতদিন জলপাইগুড়ি শহরে থেকে তপুপিসি একদিনের জন্যও ওদে বাড়িতে আসেনি! তপুপিসির কথা ছোটকাকুকে কীভাবে বলবে মনেমনে গোছছিল সে। প্রিয়তোষ অবাক হচ্ছিল ওর মুখ দেখে। নরম গলায় বলল, ‘কিছু বলবি?’

ଘାଡୁ ନାଡ଼ୁ ଅନିମୟେ । ତାରପର ଉଲଟୋଦିକେ କାରଖାନାର ଦିକେ ତାକିଯେ ବଲଲ, ‘ତୋମାର ଏକଟା ଚିଠି ଆମି ପଲିଶକେ ନିତେ ଦିଇନି । ଚିଠିଟା ଦାଦାର ବ୍ୟ ଆଲମାରିରେ ଆଛେ ।’

প্রিয়তোষ ব্যাপারটা ধরতে পারল না একবিদ্বু, ‘আমার চিঠি? কী বলছিস, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’

ইঠাঁ খুব রাগ হয়ে গেল অনিমেষের। এত বড় শুরুত্পূর্ণ একটা চিঠি সুটকেসে রেখে গেল ছেটকাকু, অথচ এখন কিছুই মনে পড়ছে না! চিঠির সমস্ত লাইনগুলো অবশ্য অনিমেষের নিজের মনে নেই, কিন্তু সব মিলিয়ে এই বোধটা ওর মনে আছে যে তপগুপ্তি খুব দুর্ঘ পেয়েছিল আর চিঠিটা পেলে পলিশ নিচ্যাই তপগুপ্তির ওপর অভ্যাচার করত। অথচ ছেটকাকু কিছি বুঝতে পারছে না!

‘তপ্পিসিৰ লেখা একটা চিঠি তোমার সুটকেসে পেয়েছিলাম আমি। তোমাকে খুজতে আসার আগেই লকিয়ে ফেলেছিলাম। চিঠিটা দাদৰ কাছে আছে।’ অনিয়ে আন্তে আন্তে কথাগুলো বলল।

ব্যাপারটা বুঝতে যেন একটু সময় লাগল ছোটকাকার। তারপর নিজের মনেই যেন বলল, ‘ও, আচ্ছা! আমার একদম খেয়াল ছিল না চিঠিটার কথা। তারপর অনিমেষের দিকে ফিরে বলল, ‘তুই পাইছিস’

ମାଥା ନାଡ଼ିଲ ଅନିମେସ, 'ଆମି ଜାନତାମ ନା ଓଟା କାର ଚିଠି ।' କଥା ବଲେଇ ଓ ବୁଝାତେ ପାରିଲ ଯେ ଠିକ ବଲା ହଲ ନା । କାରଣ ଛୋଟକାକୁ ସୁଟିକେସେ ଅନ୍ୟ କାର ଚିଠି ଥାକେଥାବେ । ଆର ଚିଠିଟା ଖୁଲେଇ ଓ ତପପିସିବ ନାହିଁ ଦେଖାଏ ପେଣ୍ଟିଲ । କିମ୍ବା ଚିଠିଟା ଡକ୍ଟର ନା-ପାଦ୍ମ ଉପାୟ ଛିଲ ନା-ଏଟା ମନେ ପଡ଼ିଛେ ।

ରିକଶ୍‌ଓସାଲା ପୋଷ୍ଟଅଫିସରେ ସାମନେ ଏସେ ଦାଢ଼ିଯେ ପଡ଼େଛିଲା । ଛେଟକାଳା ଏଫ ଡି ଆଇ କୁଲେର ଦିଲେ ତାକିଯେ ବଲଳ କନ୍ଦମ୍ବତା ଦିଯେ ମାସକଲାଇବାଡ଼ି ଚାଲା । ବାବା କୀ ବଲଳ'

শেষ প্রশ্নটা ওকে করছে বুঝতে পেরে অনিমেষ বলল, ‘দাদু কিছু বলেননি, শুধু আলমারিতে তুলে
বেংকে দিলাম।’

ରାତ୍ରିବାଡ଼ିର ତଳାଟା ଜମଜମାଟ । ଏବନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ହୟନି, ଆଶେପାଶେ ପ୍ରାଚୁର ସାଇକେଲରିକଣ ଛୁଟେ ଯାଛେ । ପ୍ରିୟତୋଷ ଚପଚାପ ସିଗାରେଟ ବେଯେ ଯାଛେ । ଅନିମେସ ବୁବେତେ ପାରଛିଲ ନା ଛୋଟକାକା ତାକେ ଛୋଟକାକା ଏକବାରଓ କିନ୍ତୁ ତପୁପିସିର କଥା ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ ନା । ନାକି ଏଥାନଙ୍କର ସବ ସବର ସେମନ ଛୋଟକାକା ଜାନେ ତପୁପିସିର କଥା ଓ ଅଜାନା ନନ୍ଦ ! ତପୁପିସି ଓକେ ଖବରଟା ଦିଯେ ନିଜେ ଥେକେଇ ବଲେଛିଲ, ତାଟ ଛୋଟକାକାକେ ବଲା ଓର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

‘ঙ্গোটকাকা তপপিসি ভোঘাকে দেখা কৰতে বলেছে ।’

‘তপ তোকে বলেছে?’

३५

‘তোর সঙ্গে কেথায় দেখা হল? স্বর্গছেঁড়ায়?’

‘না । তপুগিসি ব্রহ্মেন্দুয় নেই এখন । এখানে গার্লস স্কুলে কাজ করে তপুগিসি । তোমার খবর নিতে আমি একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম ।’

‘আমার খবর নিতে? আমার খবর ওর কাছে পাবি কী করে মনে হল?’

অনেক কষ্টে অনিমেষ বলতে পারল, ‘তোমার চিঠিটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল।’

প্রিয়তোষ কোনো কথা বলল না। থানার পাশ দিয়ে ঝুঁবি বোতিং ছাড়িয়ে কদম্বতলার রাস্তায় যাচ্ছিল রিকশাটা। অনিমেষ দেখল রূপসী সিনেমার সামনেটা একদম ফাঁকা, সামান্য কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে। আর ওপরে বিরাট সাইনবোর্ডে একটা ছোট চেলে তার চেয়ে বড় একটা মেয়ের সঙ্গে দৌড়ে যাচ্ছে। সামনে একটা গাড়ি রাস্তা ভুঁড়ে থাকায় ওদের রিকশাটা দাঁড়িয়ে গেল। অনিমেষ সিনেমার হেডিং-এ ছবির নামটা পড়ল, ‘পথের পাঁচালী।’ কীরকম ছবি এটা একদম ভিড় নেই কেন? ওর মনে পড়ল আলোচায়াতে ‘দস্যু মোহন’ হচ্ছে, মণ্টু বলছিল ভীষণ ভিড় হচ্ছে। আর তখনই অনিমেষ সিনেমা হলের পেটের দিকে তাকিয়ে প্রায় উঠে দাঁড়াল। প্রিয়তোষ চমকে গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কী হল?’

চেঁচিয়ে উঠল অনিমেষ, ‘তপুপিসি!’

প্রিয়তোষের কপালে সঙ্গে সঙ্গে তিনি-চারটে ভাঁজ আঁকা হয়ে গেল! মুখ ঘুরিয়ে অনিমেষের দৃষ্টি অনুসরণ করে ও সিনেমা হলের সামনেটা ভালো করে দেখল। আট-দশজন ঝুলের মেয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সামনে নীলপাড় সাদা শাড়ি পরে তপু টিকিট শুনছে। কিছু বলার আগেই অনিমেষ লাফ দিয়ে নেমে দ্রুত হেঁটে তপুপিসির কাছে গিয়ে হাজির হল।

ওকে দেখতে পায়িন তপুপিসি, অনিমেষ কাছে গিয়ে ডাকল। ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিমেষকে দেখতে পেয়ে তপুপিসি ভীষণ অবাক হল, ‘ওমা অনি, তুই কোথা থেকে এলি? সিনেমা দেখছিস?’

চটপট ধাঢ় নাড়ল অনিমেষ, ‘না। তুমি দেখছ?’

খুলি-খুশি মুখে তপুপিসি বলল, ‘হ্যা। হোটেলের ওপর-ক্লাসের মেয়েদের নিয়ে এসেছি। এত ভালো ছবি বাংলাদায় এর আগে হয়নি। তুই অবশ্যই দেখবি কিন্তু।’

এসব কথা এখন কানে যাচ্ছিল না অনিমেষের। ও একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল, ‘জান তপুপিসি, ছোটকাকা এসেছে।’

‘ছোটকাকা’ তপুপিসি যেন কথাটা মনের মধ্যে দুএকবার আওড়ে নিলেন, ‘কবে এসেছে?’

‘এই তো, আজ সকালে।’ অনিমেষ রিকশার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ওই তো রিকশায় বসে আছে। একটু আগে আমরা তোমার কথা বলছিলাম, তুমি অনেকদিন বাঁচবে, দেশো।’

রিকশায় বসে প্রিয়তোষ দেখল তপু মুখ তুলে ওকে দেখছে। ও ধীরেসহে রিকশা থেকে নেমে দুরুত্বটা হেঁটে এর। ডুগ চশমা নিয়েছে মোটা কালো ফ্রেমের। খুব ভারিকি দেখাচ্ছে। ঝুলের মেয়েগুলো বড় বড় চোখ করে ব্যাপারটা দেখছিল। অনিমেষের দিকে কেউ-কেউ চোরা-চাহনি দিচ্ছে, কেউ মুখ তিপে হাসছে। বোৰা যায় তপুপিসিকে এরা ভয় করে, কারণ কেউ কোনো শব্দ করছে না। অনিমেষ ছোটকাকাকে বলতে শুনল, ‘কেমন আছ তপু?’

তপুপিসি বারবার ছোটকাকাকে দেখছিল। যেন সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, প্রশ্নটা উন্তেই একটু নড়ে উঠল শরীরটা, তারপর বলল, ‘ভালো। তুমি কেমন আছ?’

হাসল ছোটকাকা, ‘কেমন দেখছ?’

‘বেশ আছ মনে হচ্ছে। কবে এলে?’

‘আজ সকালে।’

কদিন থাকবে?’

‘কালই চলে যাব।

উত্তরটা শুনে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। ছোটকাকা যে কালই চলে যাবে একথা তো আগে একবারও বলেনি! এমনকি দাদু-পিসিমাও জানেন না।

‘কেন এলে?’

‘এলাম। অনেকদিন এদিকে আসিনি, ভাবলাম দেখে যাই। তাছাড়া এখানে একটা শুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে সেটা সারতে হবে। এখন সেখানেই যাচ্ছি।’

‘ও। ঠিক আছে, তোমাকে আর আটকাব না, কাজ সারো গিয়ে। আমাদেরও সিনেমা উক্ত হল

বলে! তপুপিসি আন্তে-আন্তে মুখ ফিরিয়ে নিছিল।

অনিমেষ ফ্যালফ্যাল করে এদের দেখছিল। এতদিন পরে দেখা হল অর্থ ওরা কীভাবে কথা বলছে! তপুপিসির সঙ্গে ওর মেদিন শেষ কথা হয়েছিল সেদিন তপুপিসি কত ব্যাকুলভাবে ছোটকাকার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। অর্থ আজ সেই মানুষটাকে সামনে পেয়ে কেমন দায়সারা কথা বলছে। আবার ছোটকাকা যেভাবে কথা বলছে তার উভর আর কীভাবেই-বা দেওয়া যায়। না, তপুপিসিকে সে কোনো দোষ দিতে পারছে না।

হঠাৎ যেন প্রিয়তোষের গলাটা অন্যরকম শোনাল, ‘ঠিক আছে, তোমরা সিনেমা দ্যাখো, আমরা চলি।’

‘আছা! শোনো, এই সিনেমা দেখাটা আমার যতটা আনন্দ করার জন্য, তার চেয়ে কর্তব্য করা কিন্তু একবিন্দু কর নয়।’ তপুপিসি মেয়েদের এগোতে নির্দেশ দিল হাত নেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা সাপের মতো নড়ে এগোতে লাগল।

আরও খানিক বাদে যখন রিকশাটা কদমতলার মোড় ঘুরে শিল্প-সমিতিপাড়া হয়ে মাষকলাইবাড়ির দিকে যাচ্ছিল, যখন শহরটার বুকজুড়ে ছুড়ে-দেওয়া হাতজালের মতো অঙ্ককার আকাশ থেকে নেমে আসছিল তখন অনিমেষের মনে হচ্ছিল ও একদম বড় হতে পারেনি। এখনও অনেক অজানা ইংরেজি শব্দের মতো এই পৃথিবীর চেনা চোহাদিতে অনেক কিছু অজানা হয়ে আছে। তপুপিসি আর ছোটকাকু যে-কথা সহজ গলায় বলে গেল ও কিছুই তা পারত না। কিন্তু ওর কাছে এই ব্যাপারটা শ্পষ্ট হয়ে আসছে যে তপুপিসি আজ খুব দুর্ঘট পেল, সেই কতদিন আগে-লেখা চিঠিতে যে-দুর্ঘটা ছিল আজ একদম কিছু না বলে তার চেয়ে অনেক বড় দুর্ঘট নিয়ে তপুপিসি সিনেমা হলের ভেতর চলে গেল। ওর মনে একটু সংশয় নেই, এখন এই মুহূর্তে তপুপিসি একটুও সিনেমা দেখছে না। অনিমেষের ইচ্ছে হচ্ছিল এখন চূপচাপ হেঁটে বাড়ি ফিরে যেতে। ছোটকাকার বিলিতি সেন্টের গুরু নাকে নিয়ে রিকশায় যেতে একদম ভালো লাগছে না।

মাষকলাইবাড়িতে পৌছতে সক্কেটা গাঢ় হয়ে গেল। বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের মাটির পথটায় রিকশাওয়ালাকে যেতে বলল ছোটকাকা। অনিমেষ এর আগে এইসব জায়গায় কখনো আসেনি। বাড়িয়রদোর দেখলেই বোঝা যায় সদা-গজিয়ে-ওঠা একটা কলোনি এটা। প্রিয়তোষ একটু অসুবিধেতে পড়েছিল প্রথমটা। খুব তড়িঘড়ি জায়গাটার চেহারা বদলেছে। কিন্তু একটা টিনের চালওয়ালা একতলা বাড়িটাকে খুঁজে বের করল শেষ অবধি। কাঁচা রাস্তাটায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো আসেনি। কেমন অঙ্ককার হয়ে আছে চারধার। দুপাশের বাড়িগুলো থেকে চুইয়ে-আসা হারিকেনের আলোটুকুই এতক্ষণ রিকশাওয়ালার সঙ্গে ছিল। বাড়িটার সামনে এসে রিকশা থেকে নেমে পড়ল প্রিয়তোষ, তারপর অনিমেষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কী ভেবে নিয়ে বলল, ‘নেমে আয়। আমি ইশারা করলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবি।’

ব্যাপারটা খুব রহস্যময় লাগছিল অনিমেষের কাছে। এই অঙ্ককারে এমন অপরিচিত পরিবেশ আসা, বোধহয় সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা যার জন্য ছোটকাকা এসেছে তা এখানেই এবং ইশারা করলেই বেরিয়ে আসতে হবে—ও কী করবে ঠাঁওর করতে পারছিল না। ও বলতে গেল যে সে রিকশাতেই বসে আছে, ছোটকাকা কাজ শেষ করে আসুক। কিন্তু ততক্ষণে ছোটকাকা রাস্তা ছেড়ে সেই বাড়িটার বারান্দায় উঠে পড়েছে। অগত্যা অনিমেষ রিকশা থেকে নেমে অঙ্ককারে কোনোরকমে বারান্দায় চলে এলে। প্রথমবার কড়া নাড়ার সময় ভেতর থেকে কোনো শব্দ হয়নি, এবার কেউ খুব গম্ভীর গলায় কে বলে উঠল। অনিমেষ অস্পষ্ট দেখল প্রিয়তোষ গলাটা তনেই পকেট থেকে ঝুমাল বের করে চট করে মুখ মুছে নিয়ে জবাব দিল, ‘আমি প্রিয়তোষ।’

দরজা খুলতে একটুও দেরি হল না এবার। প্রিয়তোষ এগিয়ে যেতে অনিমেষ পিছু নিল। খোলা দরজার ওপাশে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর মাথায় ঘোমটা, বাঁ হাতে শৌখি-নোয়া নেই। দেখলেই বোঝা যায় এবং কাঙড় পরার ধরনে এমন একটা ব্যাপার আছে যে তাঁকে পরিচিত বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায়। ঘরে আসবাব বলতে একটা তজ্জপোশ আর দুটো কাঠের চেয়ার। তজ্জপোশের ওপর বাবু হয়ে একজন মাৰবোয়েসি মানুষ বসে আছেন। বোঝাই যায় এককালে স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। মাথায় চুল আছে যথেষ্ট, কিন্তু সেগুলো অগোছালো আর ঘরের ভেতর যেটুকু হারিকেন দিছিল তাতেই চুলগুলোর অর্দেক যে পাকা বুৰাতে

অসুবিধে হচ্ছিল না । একটা ফতুয়া আর লুঙ্গি পরেছেন ভদ্রলোক, নাকটা ভীষণ টিকলো । অনিমেষ দেখল ভদ্রলোকের ডান হাতটা ফুতয়ার হাতা থেকে বেরোয়ানি । নতপত করছে সেটা । এই প্রথম ও অবিক্ষার করল মানুষটার একটা হাত নেই ।

প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছিল । অনিমেষ দেখল ওঁরা দুজন একদলে ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে আছেন । ভদ্রমহিলার চোখের বিশ্বায় মুখেও ছাড়িয়ে পড়েছে ।

ছোটকাকা বলল, ‘তেজেনদা, আমার চিঠি পেয়েছেন?’

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা কাঠ-কাঠ গলায় বলে উঠলেন, ‘ঠিকানা যখন ঠিক লেখা হয়েছে তখন না পাওয়ার কোনো কারণ নেই’ ।

ছোটকাকা বলল, ‘এভাবে কথা বলছ কেন রঞ্জলাদি?’

ভদ্রমহিলা বললেন, ‘তোমার সঙ্গে আর কীভাবে কথা বলা যায়?’

ছোটকাকা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ভদ্রলোক কথা বললেন । অনিমেষ শুনল ওঁর গলার ঘর বেশ গঁথীর, ‘এই ছেলেটি কে?’

ছোটকাকা বলল, ‘আমার ভাইপো’ ।

‘একে সঙ্গে এনেছ কেন?’

ছোটকাকা একটু সময় নিল উত্তরটা দিতে, ‘ওকে নিয়ে শহুরটা দেখতে বেরিয়েছিলাম, সেই থেকে সঙ্গে আছে’ ।

‘তুমি কি পলিটিক্যাল আলোচনা অ্যাভরেড করতে চাও?’

এবার ছোটকাকা ঘুরে দাঁড়াল, ‘অনি, তুই বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর।’

দরজা ভেজানো ছিল । অনিমেষ আস্তে-আস্তে সেটা খুলে বাইরে এল । ওর মনে হচ্ছিল এই ঘরে একটা দাঙ়গ কোনো ব্যাপার হবে-চলে গেলে সেটা দেখতে পাবে না ও । অথচ এর পর চলে না যাওয়া অসম্ভব । দরজাটা ভেজিয়ে ও বারান্দায় দাঁড়াল । বাইরে ঘুটেঘুটে অঙ্ককার । রিকশাওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে না । শুধু রাস্তার একপাশে রিকশার তলায় ছোট একটা লাল আলো একচক্র রাঙ্কসের মতো ঘাপটি মেরে বসে আছে । বারান্দা দিয়ে কয়েক পা হেঁটে অনিমেষ একটা বক্স জানলার পাশে এসে দাঁড়াল । আচর্ষ, ঘর থেকে কোনো শব্দ বাইরে আসছে না । ওরা কি খুব চাপাগলায় কথা বলছে? কী কথা? হঠাত অনিমেষের মনে হল ছোটকাকার হঠাত করে চলে যাওয়া, এতদিন উধাও হয়ে থেকে এভাবে বড়লোক হয়ে কিন্তে আসা-এতসব রহস্যের কথা এই বক্স ঘরের আলোচনা থেকে জানা যাবে । ওই হাতকাটা ভদ্রলোক তো বললেন পলিটিক্যাল আলোচনা হবে । অনিমেষ শুনবার কৌতুহল ওকে এমন পেয়ে বসল যে ও নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির এপাশটায় চলে এল । এধারের মাটি কোপানো, বোধহয় শাকসবজির গাছ লাগানো হয়েছে । অঙ্ককারে পায়ে হাতড়ে ও ঘরটার একপাশে চলে এল । এদিকের জানলাটা আধা-ভেজানো, একটা পর্দা বুলছে । ও চূপ্তি করে জানলার নিচে সিয়ে দাঁড়াল । পাশেই একটা ঝাপড় গাছে বসে একটা পাখি ডানা ঝাপটে উঠল । অনিমেষ শুনল ছোটকাকা বলছে, ‘এভাবে কথাবার্তা বলার জন্য আমি নিশ্চয়ই এতদিন পর আপনাকে চিঠি দিইনি তেজেনদা।’

সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলা, যাকে ছোটকাকা রঞ্জলাদি বলেছেন, হিসহিস করে বলে উঠলেন, ‘একজন বিশ্বাসযাতক দালালের সঙ্গে এর চেয়ে ভদ্রভাবে কথা বলা যায় না।’

ছোটকাকা উত্তেজিত গলায় বলল, ‘তেজেনদা, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, এই ভদ্রমহিলাকে আপনি চূপ করতে বলুন।’

তেজেনদার গলা পেল অনিমেষ, ‘প্রিয়তোষ, তুমি হঠাত এলে কেন? আমি তো তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করিনি।’

‘আপনি কি জানতেন আমি কোথায় আছি?’

‘গত তিন বছর ধরে তোমার সব খবর আমি পেয়েছি । দিল্লিতে—’

গলাটা হঠাত থেমে গেল । তার পরেই ছোটকাকার গলা ভেসে এল, ‘বুঝতে পারছি । ঠিক আছে, আমি যা বলব আপনাকেই বলব, এই মহিলাকে এই ঘর থেকে যেতে বলুন।’

‘কেন আমাকে কেন প্রিয়তোষ?’

‘আচর্ষ, আপনি আমাকে এই প্রশ্নটা করলেন!’

‘হ্যা।’

‘আপনি আমাকে কমিউনিটিজমে দীক্ষা দিয়েছিলেন, আপনাকে আমি গুরু বলে মেনেছি।’

‘সে তো এতকালে। সেই কোন কালে! এখন তো তুমি কমিউনিট নও। আমার সঙ্গে তোমার তো কোনো সম্পর্ক নেই, তুমই রাখিনি। তা হলে এসব কথা কেন?’

ছোটকাকার গলাটা কেমন শোনাল, ‘মাৰো-মাৰো তেজেনদা আমি ভাবি। ইদানীং প্রায়ই মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করবে মনটা পরিষ্কার হবে। কোনো মানে নেই জানি, কিন্তু এককালে আমি আৱ আপনি দিনবাত একসঙ্গে কীভাবে কাটিয়েছি—সেগুলো আমাকে হচ্ছে করে। এ-ফিলিংস শুধু আপনার আমার ব্যক্তিগত রিলেশন নিয়ে, তেজেনদা। তাই কথাগুলো শুধু আপনাকে চলতে চাই।’

‘হ্যা। কিন্তু প্রিয়তোষ, তোমার চিঠি পাওয়ার পর আমরা পার্টি থেকে ডিভিশন নিয়েছি যে, কোনো ব্যক্তিগত আলোচনা তোমার সঙ্গে অসম্ভব। ইন ফ্যাট্ট, তোমাকে অভিযুক্ত করাৰ জন্য রমলাদে পার্টি থেকে এখানে থাকতে বলেছে। তুমি কাল মিনিটারের সঙ্গে প্রেন থেকে নামাৰ পৰই আমৰা মিটিং কৰিব।’

কয়েক সেকেন্ড সব চৃপচাপ, তাৱপৰ ছোটকাকা বলে উঠল, ‘আমি কোনো পার্টিৰ কাছে জৰাবদাই কৰতে বাধ্য নই। তেজেনদা, ব্যক্তিগত ব্যাপার পার্টিৰ লেভেলে নিয়ে যাওয়াৰ যে প্ৰবণতা আপনার কাছে সেটাকে আমি ঘৃণা কৰি। বেশ, আমি উঠাই।’

সঙ্গে সঙ্গে রমলাদি বললেন, ‘না। উঠি বসলেই এখন ওঠা সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তেজেনদার একটা অস্বস্তি থাকায় আমৰা কিন্তু কৰিনি এতদিন। কিন্তু তোমার সাহস যখন এতটা বেড়ে গৈছে তখন আৱ স্পোয়াৰ কৰা যায় না। তুমি জলপাইগুড়ি ঢোকাৰ পৰ থেকে আমাদেৱ ছেলেৱা তোমাকে ওয়াচ কৰছে এবং এই মুহূৰ্তেও।’

প্রিয়তোষেৰ কী প্ৰতিক্ৰিয়া হল অনিমেষ দেখতে পেল না, কিন্তু ওৱ নিজেৰ শৰীৰে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল এবাব। ও চকিতে মুখ ঘুৰিয়ে চারপাশে তাকাল। আশেপাশেৰ বাড়িগুলো থেকে যে-আলো আসছে তাতে কোনোকিছুই ভালো কৰে দেখা যায় না। এই বাড়িতে কেউ কি আছে যে ওদেৱ ওয়াচ কৰছে? ছোটকাকা যদি এই শহৰে আসা অবধি কেউ বা কাৰা ফলো কৰে থাকে, তবে তাৰা এখানেও আছে। অনিমেষেৰ খুব অৰ্থস্তি হচ্ছিল, ও অঙ্ককাৰে ঠাইছ তখন দেখতে পেল না। এই যে ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাও নিশ্চয়ই ওদেৱ নজৰে পড়েছে। নাকি পড়েনি?

হঠাৎ রমলাদিৰ গলা শুনতে পেল অনিমেষ, ‘প্রিয়তোষ, তোমার বিৰুদ্ধে প্ৰথম অভিযোগ, পার্টিৰ বিপৰ্যয়েৰ সময় তুমি যখন অন্যাদেৱ যতো গা-ঢাকা দিয়েছিলে তখন তোমার হানিস কোনো কৰয়েড় জানত না।’

ছোটকাকার গলা পাওয়া গেল না। রমলা বললেন, ‘চুপ কৰে থেকে সময় নষ্ট কৰছ। আমৰা এখানে আড়ডা মারতে আসিনি।’ তবু কোনো উত্তৰ এল না ছোটকাকার কাছ থেকে। রমলাদি আবাৰ বললেন, ‘ঘাৰৰ আগে তুমি পার্টি ফাফ ডিল কৰতে, আমৰা পৱে হিসাব মেলাতে পাৰিনি। কেন?’

এবাৰে ছোটকাকা বলে উঠল, ‘চমৎকাৰ! যেহেতু আমি আৱ পার্টিৰ সদস্য নই, তাই এইসব আজেবাজে প্ৰশ্ৰে জৰাব দিতে বাধ্য নই। তবু যখন শুনতে চাইছ তখন বলছি, আমি যা-কিছু কৰেছি সবই তেজেনদার আদেশে কৰেছি। সোকাল কমিটিৰ ফাফতে লাখ লাখ টকা থাকে না। যা গৱাঞ্চি হচ্ছে তা তেজেনদার আদেশেই হয়েছে। ব্যস।’

সঙ্গে সঙ্গে তেজেনদার তিৎকাৰ কানে এল ওৱ, ‘কী, কী বললি প্ৰিয়! আমি তোকে বলেছি তুমি কৰতে? তুই পাৰলি বলতে এসব কথা? তোকে আমি হাতে কৰে গড়েছিলাম এইজন্যে?’

রমলাদি বললেন, ‘তুমি যে-কথা বলছ তা কি দায়িত্ব নিয়ে বলছ?’

হঠাৎ প্ৰিয়তোষ চেঁচিয়ে উঠল, ‘আমার কী দৰকাৰ দায়িত্ব নেবাৰ! তোমৰা যা অভিযোগ কৰছ তা কি প্ৰমাণ কৰতে পাৰবে? কখনোই না। অতএব আমি যদি বলি তেজেনদাই সবকিছু কৰেছেন তোমাদেৱ সেটা শুনতে হবে। কী কৰেছ তোমৰা? ফিফটি টুৱ ইলেকশনেৰ পৰ কোথায় দাঁড়িয়েছে

এসে! সাধারণ মানুষকে তোমরা কখনোই কাছে আনতে পারনি, তাদের আস্থা পাওয়া তো দূরের কথা। কংগ্রেস সহিপ করে বেরিয়ে গেছে এটা তাদের ক্ষেত্রিক, তোমাদের লজ্জা। পার্টির যথন এই হাল করেছ তখন তোমাদের কোনো কথা বলার অধিকার নেই। আমি চললাম।’

তেজেনদা বললেন, ‘তোর মতো কিছু বিশ্বাসযাতকের জন্য আজ্ঞ আমাদের এই অবস্থা। আমরা যতদিন তোদের খেড়ে না ফেলতে পারি ততদিন এক পা-ও এগোতে পারব না। কিন্তু মনে রাখিস, কমিউনিস্ট পার্টি চিরকাল ইইভাবে পড়ে-পড়ে মার খাবে না। তাই বলতিস এককালে, তেজেনদা, আপনার একটা হাত ইংরেজদের দিয়েও আপনি এত অ্যাকচিভ? হ্যাঁ, এই পার্টি যখন মিলিট্যান্ট হবে, যখন কোনো আপস করবে না, তখন এই দেশের মানুষ আমাদের পাশে আসবেই। হয়তো আমি তখন থাকব না, কিন্তু পার্টি ক্ষমতায় আসবেই।’

রমলাদির তীক্ষ্ণ গলা ডেস এল, ‘তেজেনদা, আপনি সোন্টিমেটাল হয়ে যাচ্ছেন!’

এবার ছোটকাকার গলার স্বর পালটে গেল আচমকো, ‘তেজেনদা, ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। আমি কাদের হয়ে কাজ করছি সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু যেজন্য আমি আপনার কাছে এলাম তা আলোচনা করার সুযোগ দিলে ভালো করতেন।’

রমলাদি বললেন, ‘কী জন্যে তুমি এসেছ?’

আস্তে-আস্তে ছোটকাকা বলল, ‘আমরা চাই উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে অ্যাক্টিকংগ্রেস মূড়মেট শুরু হোক, টাকার জন্য তোমরা চিন্তা করো না। তেজেনদা, আন্দোলন না করলে কোনো পার্টি জনতার আস্থা অর্জন করতে পারে না।’

‘আমাদের টাকা দেবে কে? তোরা মানে কারা? কী লাভ তোদের?’ তেজেনদার গলাটা কাঁপছিল।

ছোটকাকা বলল, ‘মাপ করো, এর উত্তর আমি দিতে অক্ষম। তবে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব আমার ওপর দেওয়া হয়েছে।’

সঙ্গে সঙ্গে রমলাদি শক্ত গলায় বলে উঠলেন, ‘তুমি কাদের হয়ে টোপ ফেলছ প্রিয়তোষ! আমাদের পার্টি ঘূষ খেয়ে কাজ করে না। তোমার সম্পর্কে যা শুনেছিলাম সেটা সত্যি তা হলে। ছি ছি ছি!

দরজা খোলা শব্দ পেল অনিমেষ, ‘রমলাদি, তোমাদের পার্টির নিয়ম হল কোনো প্রশ্ন না করা। ওপরতলা থেকে যখন আদেশ আসবে তখন দেখব তুমি কী করে অঙ্গীকার কর।’

হঠাতে রমলা বললেন, ‘তুমি এখন তেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না, প্রিয়তোষ।’

হাসল ছোটকাকা, ‘ভুলে যাচ্ছ কেন, এটা রাশিয়া নয়। আর এটা দেখছ, তোমার সঙ্গীদের কেউ সাহস দেখাতে এলে আমাকে এটা ব্যবহার করতে হবে।’

খুব ফ্যাসফেস গলায় তেজেনদা বললেন, ‘প্রিয়তোষ।’

ছোটকাকা বলল, ‘আমি কাল সকাল অবধি আছি। আমার প্রস্তাব যদি ভালো লাগে খবর দিও। এবং খবরটা, রমলাদি, তুমি নিজে শিখে দিও। আনঅফিসিয়ালি একটা কথা বলি ফালতু গোড়ামি বাদ দিলে যদি আবেরে কাজ হয় তা-ই করাটাই বৃক্ষিমানের লক্ষণ।’

দরজা খুলে গেল। তেজেনদা বললেন, ‘ওর হাতে রিভলভার আছে, বোকায়ি কোরো না রমলা। ছেলেদের নির্দেশ দেবার দরকার নেই। ও যেমন এসেছিল তেমনি যাক।’

ঠিক এই সময় অনিমেষ ছোটকাকাকে ওর নাম ধরে ডাকতে শুনল। দুবার ডাকবার পর ছোটকাকা রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল ওর কথা। অনিমেষের এখন একটুও ইচ্ছে করছিল না? ছোটকাকার সঙ্গে যেতে। ছোটকাকা কী? কংগ্রেসের মিনিটারের সঙ্গে ভাব আছে, কিন্তু কংগ্রেস নয়। আবার কমিউনিস্ট না হয়েও কমিউনিস্টদের বলে গেল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়। আবার কমিউনিস্ট না হয়েও কমিউনিস্টদের বলে গেল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে। ছোটকাকার সঙ্গে রিভলভার আছে ও জানতই না!

বন্দেমাতরম বা ইনকিলাব জিনাবাদের বাইরে কি কোনো দল আছে? তারা কারা? তাদের কি অনেক টাকা আছে? অনিমেষের মনে হল তারা যে-ই হোক এই দেশকে একফেঁটাও ভালোবাসে না। তারা ওধু দপক্ষের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিতে চায়। দাদুকে দেওয়া ছোটকাকার টাকাগুলো মনে করে ও যেন কিছু হনিস খুজে পাচ্ছিল না। ছোটকাকা আবার ওর নাম ধরে ডেকে উঠতে অনিমেষ নিজের

অজান্তেই একটা ঘৃণা মনে লালন করতে করতে রিকশার দিকে এগিয়ে গেল।

আজ দুপুরে প্রেনে প্রিয়তোষ চলে যাবে। অনিমেষ ভেবেছিল এতদিন পর বাড়ি এসেইভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ায় দাদু নিচ্ছাই অসম্ভুষ্ট হবেন। কিন্তু কার্য্যত দেখা গেল হেমলতাই একটু চ্যাচামেটি করলেন, ভাইকে অভিযানে দুক্কা শুনিয়ে দিলেন এবং খবরটা সরিষ্পেখরের কাছে পৌছে দিয়ে অনুমোগ করতে লাগলেন। সরিষ্পেখরের তখন সবে বাজার থেকে ফিরে হাতপাখা নিয়ে বসেছেন, শুনে বললেন, ‘ও, তা-ই নাকি নাকি!’ কোনো তাপ-উত্তাপ নেই, আবহনও নেই, বিসর্জন নেই বড় হ্বার পর দাদুকে যত দেখছে অনিমেষ তত অবাক হচ্ছে। কোনো শোক-দুঃখই যেন দাদুকে তেমনভাবে শ্র্পণ করে না। ছোটকাকাকে প্রথম দেখে দাদু কী নির্লিঙ্গের মতো প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কখন এল?’ এখন খবরটা পর মুখোমুখি হতে সেইরকম গলায় শুধোলেন, ‘প্রেন কটায়?’

প্রিয়তোষ বোধহয় এরকম আশা করেন। ভেবেছিল দিদির মতো বাবা ও রাগারাগি করবেন।

‘একটা পঁয়তালিশ।’ প্রিয়তোষ নিজের ঘড়ি দেখল, আটটা বাজে।

‘একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেও। তোমার দিদিকে বলে দিছি তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করতে।’

‘ব্যস্ত হ্বার কিছু নেই। অনেক দেরি আছে।’ প্রিয়তোষ অবাক হয়ে বাবাকে দেখছিল।

হঠাৎ সরিষ্পেখর বললেন, তুমি ওই চেয়ারটায় বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।’ বেতের চেয়ারের ওপর পাতা গদিগুলো দীর্ঘকাল না পালটানোয় কালো হয়ে গিয়েছে ময়লা জমে, প্রিয়তোষ সাবধানে বসল।

সরিষ্পেখর উঠেনের পাশে বাতাসে দেল-বাওয়া বকফুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমি জানি না তুমি এখন কী কর। আজ বাজারে তনলাম তুমি নাকি খুবই ইন্দুরেনশিয়াল লোক। আমার বাড়িতে এসে উঠেছ অনেকে বিশ্বাস করে না।’

খুব সজ্জিত হয়ে পড়ল প্রিয়তোষ, ‘কে বলেছে এসব কথা?’

ঝাড় নাড়লেন সরিষ্পেখর, যেন ছেলের প্রশ্নটাকে বেড়ে ফেললেন, ‘তুমি আমার একটা উপকার করবে?’

‘বলুন।’

‘আমার বাড়ির চারপাশে কী দ্রুত বাড়িয়া গজিয়ে উঠেছে। একটা বড় গাড়ি ঢোকার পথ নেই। অথচ মিউনিসিপ্যালিটির প্ল্যানে আমার জন্যে রাস্তা দেখানো আছে। আমি ডি.সি. মিউনিসিপ্যালিটি-সবাইকে চিঠি দিয়েছি, কোনো কাজ হয়নি। এরকম চললে ক্রমশ আমার বাড়িটা বন্দি হয়ে যাবে।’

প্রিয়তোষের দিকে মুখ ফেরালেন সরিষ্পেখর। প্রিয়তোষ সমস্যাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছিল, ‘কিন্তু আপনার রাস্তা অন্য লোক দখল করবে কী করে?’

অসহায় ভঙ্গিতে সরিষ্পেখর বললেন, ‘সবই তো হয় এ-যুগে। স্বাধীতার পর আমরা যে-জিনিসটা খুব দ্রুত শিখেছি সেটা হল টাকা দিয়ে আইন কেনা যায়। এখন এ-যুগে উচিত বলে কোনো শব্দ সরকারি কর্মচারীদের কাছে আশা করা বোকায়ি। আমাকে ওরা বলে এই বাড়ি নিয়ে যথম এতন সমস্যা তখন ওটাকে বিক্রি করে দিন, নিষ্ঠার পাবেন। যেন আমি নিষ্ঠার পাবার জন্য এই বাড়ি বানিয়েছি।

প্রিয়তোষ বলল, ‘আপনার বাড়ি তো এবার গভর্নেন্ট ভাড়া নিছে, ওদের প্রয়োজনেই রাস্তা বৈরিয়ে যাবে। সরকারি গাড়ি আমার জন্য রাস্তা দরকার হবেই।’

সরিষ্পেখর খানিকক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তা হলে তোমাকে বলছি কেন?’

প্রিয়তোষ বোঝাতে চাইল, ‘না, এ তো গভর্নেন্ট নিজের গরজেই করবে, মাঝখান থেকে আপনার বাড়ির জন্য একটা রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে।’

সরিষ্পেখর আন্তে-আন্তে বললেন, ‘কাল হয়ে যাওয়ার পর আমি জানতে পারলাম এই বাড়িতে ওরা অফিস করছে না, রেসিডেন্সিয়াল পারপাসে নিছে। আগে জানলে আমি ভাড়া দিতাম না।’

‘কিন্তু বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা তো আপনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।’ প্রিয়তোষ বলল।

‘হ্যাঁ ছিল, কারণ মানুষ শেষ বয়সে এসে কাওয়ে ওপর বাঁচার জন্য নির্ভর করে। আমার পুত্রদের কাছে থেকে সেটা আশা করা বোকায়ি। আমার বাড়ির কাছ থেকে আমি তা পাব, এ এখন আমাকে

দেখবে। তুমি প্রায়ই বলছ, “আপনার বাড়ি।” যেন এই বাড়িটা শুধু একা আমারই, তোমাদের কিছু যাঘ-আসে না।’

প্রিয়তোষ বলল, ‘কিন্তু আমার পক্ষে তো জলপাইওড়িতে এসে সেটলড করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। দাদারা আছেন—।’

‘দাদারা বোলো না, দাদ-তোমার বড়দার অস্তিত্ব আমার কাছে নেই।’ চট করে ছেলেকে থামিয়ে দিলেন সরিংশেখর, ‘ক, আজেবাজে কথা বলে লাভ নেই। দেশের কত বড় বড় কাজে তোমাদের সময় ব্যয় হচ্ছে, আমার এই সামান্য উপকার যদি তোমার দ্বারা সম্ভব হয় তা হলে খুশি হব।’

প্রিয়তোষ উঠল, দেখি কী করা যায়।

সরিংশেখর বললেন, ‘শুনলাম সেট্টালের মিনিটারের সঙ্গে তোমার খাতির আছে। তাঁকে বললে তো এই মুহূর্তেই কাজ হয়ে যায়।’

প্রিয়তোষ বলল, ‘এত সাধারণ ব্যাপার তাঁকে বলা ঠিক মানায় না।’

সরিংশেখর মনেমনে বিড়বিড় করলেন, ‘আমার কাছে তো মোটেই সাধারণ নয়।’ তারপর হঠাতে মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ‘তুমি কি এখন বাইরে যাচ্ছো?’

‘হ্যাঁ।’ প্রিয়তোষ ঘাড় নাড়ল।

‘দাঁড়াও।’ সরিংশেখর দ্রুত ঘরের ভেতর চলে গেলেন। অনিমেষ ওর পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দাটা স্পট দেখতে পাচ্ছিল। প্রিয়তোষ কাল রাত্রের পোশাকটাই পরেছে এখন। দাদু ভেতরে গলে একা দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। এই লোকটাকে ওর একবিন্দু পছন্দ হচ্ছে না এখন। কাল রাত্রে বাড়িতে ফেরার পর অনিমেষ ভেবেছিল কেউ হয়তো এসে ছেটকাকার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এমনকি আজ সকালে দুবার ছেটকাকা অনিকে বলেছে কেউ এলে যেন ডেকে দেয়। কিন্তু কেউ আসেনি। অনিমেষের মনে হল তেজেনদাদের কেউ নিচ্যাই আসবে না। আজ একটু আগে ছেটকাকা অনিমেষকে একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কাল রাত্রের কোনেকিছু সে শুনেছে কি না। এখন চট করে সত্যি কথা না বলতে কোনো অসুবিধে হয় না। বিশেষ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপেদশটা পড়ার পর থেকে। ছেটকাকা আশ্চর্ষ হয়ে ওকে হঠাতে বিরাম করেন বাড়ির পজিশনটা জানাতে বলল। অনিমেষ ভাবছিল ছেটকাকা নিচ্যাই তাকে সঙ্গে যেতে বলবে। কিন্তু প্রিয়তোষ ঠিকানা জেনে নিয়ে এ-বিষয়ে কোনো কথা বলল না। অবশ্য কাল স্কুল-কামাই হয়েছে, আজ না গেলে দাদু খুশি হবে না। কিন্তু মুভিং ক্যাসেলের বাড়িতে ছেটকাকা কী জন্য যাচ্ছে জনবার জন্য ওর ভীষণ কৌতুহল হচ্ছিল। অথচ কোনো উপায় নেই। ওর মনে হল একটু পরেই উর্বশীরা রিকশা করে স্কুলে চলে যাবে। ছেটকাকার সঙ্গে কি ওদের দেখা হবে?

সরিংশেখর বাইরে এলেন হাতে একটা কাগজ নিয়ে, ‘এটা তোমার জিনিস, নিয়ে যাও।’

অনিমেষ দেখল ছেটকাকা খুব অবাক হয়ে দাদুর হাত থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কী এটা?’

দাদু কোনো উত্তর দিলেন না, একটা হাত শূন্যে কীভাবে নেড়ে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। ছেটকাকা কাগজটা টান্টান করে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুঠোয় পুর মুচড়ে ফেলল। তারপর তাকে কয়েক টুকরো করে ছিঁড়ে টান দিয়ে উঠোনের একপাশে ফেলে দিল।

ছেটকাকা বেরিয়ে গেলে অনিমেষ উঠোনে নেমে এল। দাদু ঘরের মধ্যে বসে হাতপাখা চালাচ্ছেন, পিসিমা রান্নাঘরে। ও প্রায় পা টিপে টিপে ছেটকাকার ছুড়ে-ফেলা কাগজের মোড়কটা তুলে নিল। টুকরোগুলো দেখেই ওর পা-দুটো কেমন ভারী হয়ে গেল। এক টুকরোয় অনিমেষ পড়ল, ‘কী বোকা আমি।’ দায় তুলে নিলাম। তপু।’ আর-একটা টুকরোর প্রথমেই, ‘পৃথিবীতে চিরকাল মেয়েরাই ঠকবে, এটাই নিয়ম।’

তপুপিসির সেই চিঠিটা যেটাকে সে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, যেটাকে দাদু এতদিন যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন সেটার এই অবস্থা হওয়ায় অনিমেষের বুকটা কেমন করে উঠল। গতকাল সন্ধিয়া-দেখা পাথরের মতো মূর্খটা মনে পড়তেই অনিমেষ বুকাতে পারল, তপুপিসি অনেক বুদ্ধিমতী। ও হঠাতে দ্রুতহাতে কাগজগুলো কুটিকুটি করে ছিঁড়ে লাগল। এর একটা শব্দও যেন কেউ পড়তে না পরতে। তপুপিসির এই চিঠির প্রতিটি অক্ষরে যে-দুখখটা ছিল সেটা যেন এখন ওর লজ্জা হয়ে

পড়েছে। অনিমেষ তপুপিসিকে সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আক্ষরণলো নষ্ট করে ফেলেছিল।

সেদিন স্কুলে নিশ্চিথবাবু এলেন না। প্রথম পিরিয়েডেই ওঁর ক্লাস ছিল। প্রেয়ারের পর ক্লাসরুমে গিয়ে ওরা গল্পগুজব করছিল। গতকাল এয়ারপোর্টে যা যা ঘটেছিল অনিমেষ যখন সবিস্তারে ঘটনা ঘটে না। হোটেলের ছাত্রদের কারও গার্জেন এলে হেডস্যার দারোয়ান দিয়ে ডাকান, অনিমেষের বেলায় আজ আবধি এরকম হয়নি।

দারোয়ানের পিছুপিছু হেডস্যারের ঘরে গেল অনিমেষ। হেডস্যারের ঘরের সামনেই অফিস-ক্লার্ক বসেন। তিনি অনিমেষকে দেখে বললেন, ‘তোমার বাড়ি থেকে দিয়েছে, এখনই বাড়ি চলে যাও।’

‘অবাক হয়ে অনিমেষ বলল, ‘কেন?’

‘নিশ্চয়ই কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে।’

‘আমি কি বই-এর ব্যাগ নিয়ে যাব?’

ভদ্রলোক একটু ধিখ করে বললেন, ‘না, তুমি যাও। আমি দারোয়ানকে দিয়ে ক্লাস থেকে ব্যাগ আনিয়ে রাখছি, কাজ শেষ হলেই চলে এসো।’

কোনোদিন এত সকাল-সকাল ওস্কুল থেকে বের হয়নি। স্কুলের বাগানটা এখন হরেকরকম ফুলে উপচে পড়েছে। এত প্রজাপতি আর মৌমাছি উড়ে বেড়ায় যে সাবধানে শান-বাঁধানে প্যাসেজটা দিয়ে ইঁটতে হয়। বাড়িতে কার কী হল? আসবাব সময় তো তেমন-কিছু দেখে আসেনি! দাদুর কি শরীর খারাপ হয়েছে? কে এসে খবর দিল? ও হঠাতে দৌড়ে শুরু করল। স্কুলের গেট খুলে রাস্তায় পা দিতেই দেখল মেনকাদি ওদের বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাত নেড়ে কাছে ডাকল।

‘এই, তোমার জন্য ঠায় আধাখণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি এসো।’

মেনকাদি একগাল হাসল। অনিমেষ বুঝতে পারল না মেনকাদি কেন তার জন্য অপেক্ষা করবে। ও বলল, ‘আমাকে বাড়িতে যেতে হবে, খুব বিপদ। কিছু-একটা হয়েছে, খবর এসেছে।’

ঠোট ওলটাল মেনকাদি, ‘তুমি একদম বস্তু, আমরাই খব দিয়েছি। প্রিয়দই দিতে বললেন।’ নিজের হাতে গেট খুলে দিলেন মেনকাদি।

এক-এক সময় অনিমেষের নিজের ওপর খুব রাগ হয়। সবকথা অনেক সময় ও চট করে ধরতে পারে না। যেমন এই মুহূর্তে ও মেনকাদির কথার মানে বুঝতে পারছে না। ওর বাড়িতে বিপদ হলে মেনকাদিরা কী করে জানবেন! নাকি বিপদটিপদ কিছু নয়, শুধুশুধু মেনাদিরা ওকে ডেকে আনল! কিন্তু কেন?

মেনকাদি গেট বন্ধ করতে করতে অনিমেষ দেখে নিল গেটের বাইরে বিরাম-কম শব্দটার আগে আজ ‘আ’ আক্ষরটা লেখা নেই! মেনকাদি ওর চোখ দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, হেসে বলল, ‘আজ বাবার নামটা ঠিক আছে, না! আচ্ছা, যারা দেওয়ালে এসব লেখে তারা কী আনন্দ পায় বলো তো?’

অনিমেষ বলল, ‘জানি না, আমি কখনো লিখিনি।’

মেনকাদি বলল, ‘জানি না, আমি কি তা-ই বলছি?’ তারপর অনিমেষকে নিয়ে বারান্দার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘আচ্ছা, আমাদের বাড়িতে তো তুমি সেদিন এলে, কাকে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগল? বাবা, মা, আমি, উর্বর্ষী আর রঞ্জি-চটপট ভেবে নাও, কাকে খুব ভালো লেগেছে তোমার?’

এরকম বোকা-বোকা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল। অনিমেষ হাসল, ‘সবাইকে।’

‘মিথ্যে কথা! একদম মিথ্যে কথা! রঞ্জি আমাকে বলেছে।’ হাসতে হাসতে মেনকাদি বারান্দায় উঠে পড়লেন। রঞ্জি আবার কী বলল মেনকাদিকে? রঞ্জির সঙ্গে তো ওর তেমন কোনো কথা হয়নি। কিছু এ-ব্যাপারে মেনকাদি ইতি টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, ‘এই নিন, আপনার ভাইগোকে এনে দিলাম।’

অনিমেষ দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল ঘরে বেশ একটা মিটিংতো ব্যাপার চলেছে। বিরাম কর তেমনি গিলে – করা দুধ-রঞ্জি পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন, তাঁর একপাশে নিশ্চিথবাবু একটা লম্বা কাগজে কীসব

লিখছেন! উলটোদিকে ছেটকাকা গভীরমুখে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ছেটকাকার পাশে মুভিং ক্যাসেল বসে। মুভিং ক্যাসেলের দিকে নজর যেতেই অনিমেষ ঢোখ সরিয়ে নিল। অসাধারণে আঁচল সরে যাওয়ায় মুভিং ক্যাসেলের বড়-গলার জামার উন্তুত হয়ে পড়েছে। বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না, কেমন অস্বিত্ত হয়।

প্রিয়তোষ বলল, ‘আয়! আজ আর স্কুল করতে হবে না। তোর মাট্টারমশাই অনুমতি দিয়েছেন।’

অনিমেষ নিশীথবাবুকে আর-একবার দেখল। এর আগে অসুখবিসুখ ছাড়া নিশীথবাবু কোনোদিন স্কুল-কামাই করেননি। নিশীথবাবু বললেন, ‘ফার্স্ট পিরিয়ড কেট নিল?’ ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

প্রিয়তোষ বলল, ‘মোটামুটি একইভাবে কাজ হলে কিছু আটকাবে না। নিশীথবাবু, আপনি তা হলে জ্বেল সবকটা স্কুলের প্রথম চারজন ছেলের একটা লিঙ্ক করে ফেলুন। ক্লাস এইট আর নাইন। টেন দরকার নেই, ওদের ইনফ্লুয়েন্স করার সময় পাবেন না। এইট নাইনের মেরিটোরিয়াস ছাত্রদের জন্য ক্লারিশপ দিলে কাজ হবে। কটা বাজল?’

বিরাম কর সরু গলায় বললেন, দেরি আছে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করেছি।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘তা হোক, গরিবের বাড়িতে একটু খেয়ে যেতে হবে তাই।’

প্রিয়তোষ বলল, ‘কী দরকার। দুপুরের মধ্যে কলকাতায় পৌছে যাব।’

মুভিং ক্যাসেল ছেলেমানুষের মতো মূখভঙ্গি করলেন, ‘আহা! না খেয়ে গেলে আমার মেয়েদের বিয়ে হবে না, সেটা খেয়াল আছে।’

যেন বাদ্য হয়েই মেনে নিল ছেটকাকা, মাথা নাড়ানো দেকে অনিমেষের তা-ই মনে হল। নিশীথবাবু বললেন, ‘আমরা কি সবাই এয়ারপোর্ট যাব?’

মাথা নাড়ল ছেটকাকা, ‘না না, আপনারা পরিচিত লোক, ওদের দৃষ্টি এড়াতে পারবেন না। বেশি লোক যাবার দরকার নেই।’ তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আনি, তুই এক কাজ কর, বাড়িতে গিয়ে আমার ব্যাগটা চূ করে নিয়ে আয়। দিনিকে বলবি না এখানে আমি আছি, বলবি জরুরি দরকারে এখনই চলে যেতে হল। পরে চিঠি দেব। আর কেউ যদি তোকে কিছু জিজাসা করে আমি কোথায় আছি না-আছি তুই কোনো উত্তর দিবি না। যা।’

অনিমেষকে অবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিল। ছেটকাকা এখন বাড়ি ফিরবে না। তার মানে যাবার আগে দাদু-পিসিমার সঙ্গে দেখা করবে না। এখানে এইভাবে ছেটকাকা বসে আছে কেন? বললেন, ‘এখানে খেয়েদের বাড়ি গেলে ওর প্লেন ধরতে দেরি হয়ে যাবে বলে তোমাকে ব্যাগটা এনে দিতে বলেছেন।’

মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনিমেষ। বারান্দা থেকে নামতেই পেছনে ছেটকাকার গলা গেল, ‘আনি!’

অনিমেষ ঘুরে তাকাল। ছেটকাকা কাছে এসে বলল, ‘রাজসীভিতে অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয়, তুই আর-একটু বড় হলে ব্যাপারটাটা বুবাতে পারবি। যদি দেখিস বাড়ির সামনে লোকজন আছে, পেছন-দরজা দিয়ে লুকিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসবি। তুই তো কংগ্রেসকে ভালবাসিস। আজ তুই যা করছিস তা কংগ্রেসের জন্যে। কেউ যেন না জানতে পারে আমি এখানে আছি। যা।’

আচ্ছেনের মতো সমস্তা পথ অনিমেষ হেঁটে এল। ছেটকাকা কি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস হয়ে গেল? দ্যুৎ তা কী করে হবে? কাল রাত্রেই তো তেজেনদাকে বলল অ্যাটিকংগ্রেস মুভেমেন্ট করতে, টাকার চিতা নেই। অথচ আজ যেভাবে বিরামবাবুদের সঙ্গে বসে মিটিং করছে তাতে তো কালকের রাত্রের ঘটনাটা বিশ্বাস করাই যায় না বাড়ির সামনে এসে ও দেখল পাঁচ-ছয়জন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগই পাজামা-পাজাবি পরা, একজনের দাঢ়ি আছে। সরু গলি দিয়ে যেতে গেলে ওদের পাশ কাটাতে হবেই। একজনরেই অনিমেষ বুবাতে পারল এরা এপাড়ার ছেলে নয়। চুপচাপ গলি জুড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কাছাকাছি হতেই ওরা অনিমেষকে থিরে ধরল, ‘কোথায় যাচ্ছ?’

অনিমেষ দেখল দাঢ়িওয়ালা লোকটা ওর সঙ্গে কথা বলছে। প্রথমে একটু নার্ভাস-নার্ভাস লাগছিল ওর, কিন্তু চূ করে ভেবে নিল নিজের দুর্বলতার প্রকাশ করলে বোকামি হবে। আর দেশের কাজ করতে গেলে এর চেয়ে বড় বিপদে পড়তে হয়। ও গভীরমুখে বলল, ‘কেন? বাড়িতে যাচ্ছি?’

ওদের মধ্যে কে যেন বলল, ‘হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকে?’

‘প্রিয়তোষবাবু তোর কে হন?’ দাঢ়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করল।

‘কাকা।’

‘এখন বাড়ি যাচ্ছ যে, কুল নেই?’

এই প্রশ্নটার সামনে পড়তেই একটু হকচকিয়ে গেল অনিমেষ। সত্যি তো, এখন ওর কুলে ধাকার কথা। কী উত্তর দেওয়া যায় বুঝতে না পেরে ও পিচিয়ে উঠল, ‘তাতে আপনার কী দরকার?’ আর বলামাত্র ওর নাভির কাছটা চিন্চিন করে গেল।

‘দরকার আছে বলেই বলেছি।’

দাঢ়িওয়ালার গলার হৰে এমন একটা গঁজীর ব্যাপার ছিল যে অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে এবার সত্যি সত্যি একটা কারণ খুঁজতে গিয়ে ব্যথাটাকে সম্বল করল, ‘আমি লাগিনে যাচ্ছি।’

দাঢ়িওয়ালা যেন এরকম উত্তর আশা করেনি, চোখ কুঁচকে বলল, ‘সত্য়?’

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

‘তোমার কাকা কোথায় গেছে জান?’

‘কেন?’

‘বড় প্রশ্ন করে তো! শোনো, তোমার কাকাকে আমাদের দরকার। প্রিয়তোষবাবুর বাবা বললেন যে বাড়িতে নেই, কোথায় গেছে জানেন না। তুমি জান?’

এমন সরাসরি মিথ্যে কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। যতই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের গল্প পড়া থাক এই মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল এয়া একদম খারাপ লোক নয়। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে দাঢ়িওয়ালা আরও কাছে এগিয়ে এল, ‘শোনো তাই, তুমি জলপাইগুড়ির ছেলে, আমাদেরই মতন, তুমি নিশ্চয়ই জান না তোমার ছোটকাকা এতদিন পর এখানে এসে কী বিষ ছড়াচ্ছে। তাকে আমরা মারব না, কিন্তু বলব না, শুধু চাইব এই মুহূর্তে সে যেনে জলপাইগুড়ি ছেড়ে চলে যায়। দালালরা এসের আমাদের সরবনাশ করুন তা আমরা চাই না। তুমি চাও?’

আন্তে-আন্তে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, না। কিন্তু ওর মনে হল পেটের চিন্চিনে ব্যথাটা ক্রমশ পাক খেতে শুরু করেছে। ছোটকাকা বলল, দেশের কাজ করতে। এরা নিশ্চয়ই কংগ্রেসি নয়। যা-ই হোক, এয়া যদি ছোটকাকার চলে-যাওয়া যায় তো ছোটকাকা তো একটু বাদেই চলে যাচ্ছে। ছোটকাকার যাওয়াটা যদি কাম্য হয় তা হলে তার ঠিকানা না বললেও তো এদের কাজ হচ্ছে।

অনিমেষ বলল, ‘আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।’

‘খুব হতাশ হল দাঢ়িওয়ালা। একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, বাড়িতে গিয়ে যদি জানতে পার কিন্তু আমাদের বলবে, বলবে তো?’

অনিমেষ সত্যি আর দাঁড়াতে পারছিল না। ওর কপালে ঘায়, আর দুটো হাঁটু হঠাৎ দুর্বল হয়ে শিরশিরি করছিল। পেটের মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে ও আড়ষ্ট পা জোরে জোরে ফেলে বাড়িতে চলে এল। বাইরের দরজা বন্ধ। কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে এখন। সমস্ত শরীর দিয়ে প্রচণ্ড জোরে অনিমেষ দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল। ভেতর থেকে সরিৎশেখর’কে কে’ বলে চিন্কার করতে করতে এসে দরজা খুলতেই অনিমেষ তীরের মতো তাঁর পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। আচমকা ছেলেটাকে ছুটে যেতে দেখে হকচকিয়ে গেলেন সরিৎশেখর, মেয়ে নাম ধরে চিন্কার করতে লাগলেন, ‘হেম, ও হেম, দ্যাখো অনিকে বোধহ্য ওরা মেরেছে। ছেলেটা ছুটে গেল কেন, ও হেম।’

মহীতোষ অনেকদিন আগে স্বর্গহেঁড়া থেকে ভালো কালামোনিয়া চাল এনে দিয়েছিলেন। হেমলতা রান্নাঘরে বসে কুলোয় করে সেই চাল বাঁচিলেন। প্রিয়তোষের জন্য’ আজ স্পেশাল ভাত। বাবার ডাকে তিনি হড়মুড় করে উঠে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিন্কার শুরু করে দিলেন, ‘কে মেরেছে, কে ছুটে গেল, ও বাবা, কার কথা বলছেন, ও বাবা।’

সরিৎশেখর ভেতরে এসে তেমনি গলায় বললেন, ‘অনি ছুটে গেল, কোথায় গেল দ্যাখো, আঃ, অনি আর পারি না।’

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা রান্নাঘরের বাইরে এসে চিন্কার করে অনিকে ডাকতে লাগলেন, ‘ও অনি,

অনিবাবা, তোকে মারল কে?' এ-ঘর সে-ঘর উঠোন বাথরুম কোথাও না পেয়ে হেমলতা থমকে দাঁড়ালেন, 'ও বাবা, আপনি ঠিক দেখেছেন তো, অনি না অন্য কেউ!'

সরিষ্ণেখর বিরক্ত হয়ে খিটিয়ে উঠলেন, 'আঃ, আমি অনিকে চিনি না!'

'কী জানি, ও হলে তো বড়তই থাকত। মা-মরা ছেলেটাকে মারবেই-বা কেন? না, আপনাকে ঠিক বাহাতুরে ধরেছে, কী দেখতে কী দেখেছেন!'

পেছনে দাঁড়ানো বাবার দিকে চেয়ে হেমলতা এই প্রথম দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তটা যা তিনি কিছুদিন হল মনেমনে বিশ্বাস করছিলেন অকপটে ঘোষণা করলেন। সরিষ্ণেখর নিজের কানকে হেমলতার অভিযোগটা সত্য হয়ে যাবে তিনি ভেবে রাখলেন যে মেয়েকে এই ব্যাপারে পরে আচ্ছ করে কথা শোনাবেন, কিন্তু এই ঝুঁকুরে ছেলেটাকে খুজে বের করা প্রয়োজন।

পৃথিবীতে এর চেয়ে মূল্যবান আনন্দ আর কী থাকতে পারে? সমস্ত শরীরে অঙ্গু তৃষ্ণি, জমে-থাকা ঘামশুলোয় বাতাস লেগে একটা শীতল আমেজ-অনিমেষ উঠোনের আর-এক প্রান্তের পুরনো পায়খানার দরজা খুলে বাইরে এল। প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে ওর নজরে পড়ল, দুটো মুখ অপার বিশ্বয় মুখচোখে ঝঁটে তার দিকে চেয়ে আছে। ওর চট করে মনে পড়ল যে, পায়খানায় ডেকার সময় আজ একদম সময় ছিল না সুলের জামাকাপড় ছেড়ে যাবার। আক্রমণটা বোধহয় এন্দিক দিয়েই আসবে। অবশ্য নির্ভয় হতে-হতে ও দাদু পিসিমার উভেজিত কঠ শনতে পাঞ্চিল, কিন্তু সুত্রটা ধরতে পারছিল না।

হেমলতা প্রথম কথা বললেন, 'তুই! পাত্রবানায় শিয়েছিলি!'

খুব দ্রুত ঘাড় নাড়ির অনিমেষ 'হ্যাঁ'।

পেছন থেকে সরিষ্ণেখর হাঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'হবে না! দিনরাত গাণেপিণ্ডে খাওয়াচ্ছ, পেটের আর দোষ কী? হ্যাঁ, আমায় বাহাতুরে ধরেছে, আঃ চোখে কম দেকি! দ্যাখো হেম, তোমার দিনদিন জিভ বেড়ে যাচ্ছে, যা নয় তা-ই বলছ। হবে না কেন, যেমন ভাই তেমনই তো বোন হবে!'

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন হেমলতা, সত্যি সত্যি অনি এসেছে, বাবা ভুল দেখেননি। কিন্তু শেষ কথাটায় ওর গায়ে জালা ধরিয়ে দিল, 'কী বললেন, যেমন ভাই চেমন বোন, না? তা আমরা কার ছেলেমেয়ে? আমি যদি না থাকতাম তবে এই শেষ বয়সে আপনাকে আর ভাত মুখে দিতে হত না!'

'কী বললে! তুমি খাওয়া নিয়ে খৌটা দিলে?' সরিষ্ণেখর চিংকার করে উঠলেন।

'আপনি কি কম দিচ্ছেন! আপনার কফ ফেলা থেকে শুরু করে কী না আমি করেছি! বিনা পয়সার ঢাকরানি। আর-কেউ এক বেলার বেশি আপনার সেবা করতে যেঁত না।' থাকত যদি সে-'চট করে পালটে গেল হেমলতার গলার ব্বর, 'আমার পোড়া কপাল যে!'

এবার সরিষ্ণেখর চাপা গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

অনিমেষ দাদু-পিসিমার এই রাগারাগি মুঝে হয়ে দেখছিল। হঠাৎ দেখল পিসিমা তার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছেন, 'কপালের আর দোষ কী! বাড়িসুন্দ সবাই উচ্ছেন্নে গেলেও এই ছেলেটা আমার কথা শনত। মাধুরী চলে যাবার পর বুকের আড়াল দিয়ে রাখলাম, সে এমন হেমস্তা করল আমাকে!'

সরিষ্ণেখর অবাক হয়ে বললেন, 'কী করল ও!'

অনিমেষ এতক্ষণ আক্রমণটাকে এভাবে আসতে দেকে দোড়ে বাথরুমে যেতে-যেতে শুনল পিসিমা বলছেন, 'বাইরের জামাকাপড় পরে পায়খানায় চুকছে, সাহস দেখেছেন!'

জামাকাপড় পালটে অনিমেষ বাইরে এসে দেখল সরিষ্ণেখক চেয়ারে চুপচাপ বস্তে আছেন। ওকে দেখে আঙুল তুলে কাছে ডাকলেন। দাদুর এরকম ভঙ্গি এর আগে দেখেনি ও। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সরিষ্ণেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি চলে গেছেন?'

কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন বুরাতে অস্বিধে হল না অনিমেষের, সে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

'কোথায় আছে জান?' সরিষ্ণেখর চাপা গলায় প্রশ্ন করছিলেন।

'হ্যাঁ!' দাদুর সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলা যায় না।

'কোথায়?' *

‘বিরাম করে বাড়িতে।’ অনিমেষ এমন গলায় কথা বলল যেন তৃতীয় বাজি শুনতে না পায়।

‘বিরাম কর! কংগ্রেসের বিরাম কর? তোমাদের ঝুলের সামনে যার বাড়ি?’

‘হ্যা।’

‘ওখানে সে কী করছে? সেই মুটকি মেয়েছেলেটার খপ্পরে পড়েছে নিচয়ই। যাক, আমার কী! কিছু ওর সঙ্গে আলাপ হল কবে?’ নিজের মনেই সরিষ্পেখের কথাগুলো বলছিলেন।

মুটকি মেয়েছেলেটা! সামলাতে সময় লাগল অনিমেষের। দানুর মুখে এ-ধরনের কথা এর আগে শোনেনি ও। আর খপ্পরে বললেন কেন, উনি কি রাঙ্গুলী না ছেলেধরা যে তাঁর খপ্পরে পড়েছে বলতে হবে! অনিমেষ নির্ণিত হয়ে বলতে চেষ্টা করল, ‘কাল এয়ারপোর্টে আলাপ হয়েছিল। ওরা কংগ্রেসের নেতা।’

‘কংগ্রেস! ওদের তুমি কংগ্রেসি বলছ? চোরের আবার ভালো নাম! কংগ্রেসের নাম করে এখানে বসে রক্তা ছষে থাছে! কংগ্রেস যাঁরা করতেন তাঁরা স্বাধীনতার আগেই মারা গিয়েছেন। শেষ মানুষ ওই গাঙ্কীবুড়ো। এসব চোখে দেখতে হবে বলে ইঞ্জি সাততাড়াতড়ি সরিয়ে নিলেন। তোমার কাকা কার দালাল?’ সরিষ্পেখের ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন।

‘দালাল।’

‘হ্যা, বাইরে দাঁড়ানো ছেলেগুলোকে দেখিয়ে ওরা বলল তোমার কাকার ঠিকানা চায়। সে নাকি দালাল। টাকা দিয়ে সব কিনতে চায়। আমাকে তো মাঝ হাজার টাকা দিল, দিয়ে কিনে নিল। কার দালাল ও?’

‘জানি না।’

‘করত কমিউনিজম, এখন দেখছি কংগ্রেসিদের বাড়িতে আড়া মারছে। আর বেছে বেছে তাঁর বাড়িতে যাঁর বট-মেয়ের নাম শহরের দেওয়ালে-দেওয়ালে লেখা আছে। শাবাশ।’

হঠাৎ হেমলতার গলা পাওয়া গেল। তিনি যে কখন রান্নাঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি অৰ্নি। হেমলতা বললেন, ‘প্রিয়তোষ যা-ই করুক সে বুবুবে, এই বাপে-তাড়ানো মায়ে-বেদানো ছেলেগুলোর তাতে মাথা ধামানোর কী দরকার?’

সরিষ্পেখের সোজা হয়ে বসলেন, ‘আছ তো রাতদিন রান্নাঘরে বসে, কিছু টের পাও না। পিলপিল করে পাকিস্তানের লোক এসে জুটছে এদেশে, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে কোথায় গিয়েছে খবর রাখ? কিছু কংগ্রেস সরকারের সেদিকে খেয়াল আছে? মানুষ কী খাবে তাদের সেসব ভাবাবার সময় কোথায়? এই ছেলেগুলো অস্ত দিনরাত চাঁচাচ্ছে দ্ব্যুম্য কমাও, এটা চাই সেটা চাই বলে। পরজন্মে বিশ্বাস কর? আমার মনে হয় এইসব কমিউনিস্ট হয়ে গেছে।’

হেমলতা বললেন, ‘কী যে আবোলতাবোল কথা বলেন! জিজ্ঞাসা করলাম প্রিয়তোষের কথা, আপনি সাতকাহন শুনিয়ে দিলেন।’

সরিষ্পেখের আরও উভেজিত হয়ে বললেন, ‘তোমার ভাই হল দুর্মুখো সাপ। এর কথা তাকে বলে, ওর কথা একে। জনসাধারণের উপকার হোক এ-ইচ্ছেনৈ। কী চাকরি করে সে যে অত টাকা পায়? বিদ্যে তো জানা আছে। নিচয়ই কেউ দিচ্ছে কোনো অপকর্ম করার জন্য। তা এই ছেলেগুলো ওকে দালাল বলে ছিড়ে খাবে না?’

এতক্ষণে একটু ফুরসত পেল অনিমেষ, ছোটকাকা আমাকে ব্যাগটা নিয়ে যেতে বলেছে, আজকের প্রেনেই চলে যাবে।’

ফ্যাসফ্যাসে গলায় হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এখানে খাবে না?’

‘না। মিসেস কর খেতে বলেছেন।’ অনিমেষ টের পেল কাকাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ওর বেশ আনন্দ হচ্ছে।

‘সে কী। আমি যে এত রান্না করলাম!’ পিসিমার আর্টনাদ অনিমেষকে নাড়া দিল।

সরিষ্পেখের গঢ়ির গলায় বললেন, ‘হেম, পাখি যখন ডানায় জোর পায় তখন তার মা-বাপ আর একফোটা চিতা করে না। বিরাম করে বাড়িতে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে, তোমার ভাই সেসব ছেলেমেয়েকে ডেকে দিয়ে দাও, ওরা খেয়ে সুখ

পাবে।'

হেমলতা কেঁদে ফেললেন। অনিমেষ আর দাঁড়াল না। একদৌড়ে ঘরে গিয়ে ছেটকাকার ব্যাগটা আলমারির ওপর থেকে নামিয়ে আনল। টেবিলে টুকিটাকি জিনিস ছড়ানো ছিল, সেগুলো ঝাড়ে করে ব্যাগে রাখতে ওটকে খুলতে হল। একটা সুন্দর গৰ্জ ভক করে নাকে লাগল। ব্যাগটার মুখে চাবি নেই। ওর হাতাং মনে হল একবার দেখে সেই রিভলভারটা ব্যাগের মধ্যে আছে কি না। না নেই। অনিমেষ পেল না সেটা। তার মানে ছেটকাকা রিভলভার পকেটে নিয়ে বসে অছে বিরাম করের বাড়িতে। গাটা শিরশিরি করে উঠল অনিমেষের।

ব্যাগ নিয়ে বাইরে এল সে। ঢচ্চড়ে রোদ উঠেছে। ও দেখল, দাদু-পিসিমা উঠোনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। ও একবার সদরদরজার দিকে তাকাল। এখান দিয়ে গেলে ছেলেগুলো নিচ্ছাই তাকে ধরবে। এপাশের মাঠ পেরিয়ে গেলে নিচ্ছাই কোনো বাধা পাবে না। ও চলতে শুরু করতেই সরিষ্ণেখর বললেন, ‘শোনো, প্রিয়তোষকে বলে দিও, আমার কোনো উপকার করতে হবে না, আর এ-বাড়িতে যেন সে কখনো না আসে, বুবালে?’

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বলে উঠলেন, ‘আপনি ওর টাকা ফেরত দিয়ে দিন বাবা। ও টাকা ছোঁড়েন না। কাল থেকে ভড়াটে এসে যাচ্ছে, এ-মাসটা আমার বালা বিক্রি করে চালান।’

প্রথমে যেন একটু ধ্বিধায় পড়েছিলেন সরিষ্ণেখর, তার মাথা নেড়ে বললেন, ‘কেন নেব না টাকা আমার এক-একটা ছেলের পেছনে আমি কত খরচ করেছি সে-বেবাল আছে আমি সব হিসেব করে রেখেছি। সেগুলো আগে শোধ করুক তারপর অন্য কথা।’

হেমলতা বললেন, ‘আপনাকে আমি বুবাতে পারি না না বাবা। ওর টাকা ছুঁতে আমার ঘেরা হচ্ছে।’

হাসলেন সরিষ্ণেখর, ‘তা হলে বোৰো, ওই ছেলেগুলো কেন এত রেগে গেছে?’

হাতাং কী হল অনিমেষের, ও পেছনের মাঠের দিকে না গিয়ে সদরদরজার দিকে হাটতে লাগল। সরিষ্ণেখর সেটা লক্ষ করে কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। অনিমেষ যখন দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন চেঁচিয়ে বললেন, ‘অনিমেষ, বিনা কারণে এইভাবে তোমার স্কুল-কামাই করা-আমি একদম পছন্দ করছি না।’

মাথা নিচু করে ব্যাগটা নিয়ে হাঁটছিল অনিমেষ। ও নিজে থেকে স্কুল-কামাই করেনি, দাদু কি জানেন নাঃ দাদু যেন কেমন হয়ে গেছেন! বিরামবাবুর মেয়েদের নিয়ে ছেটকাকার সঙ্গে ইঙ্গিত করে কীসব বললেন। যাঃ, হতেই পারে না! হাতাং ওর উর্বশীর কথা মনে পড়ল। উর্বশী আজ খুলে গেছে। মেনকাদির সঙ্গে তো নিশীথবাবুর হাতে, দাদু এসব কথা জানে না। না জেনে কথা বলা ওদের বাড়ির স্বত্ব।

কিন্তু দাদু ছেটকাকুকে এ-বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছেন। জ্যাঠামশাহ-এর নং৩০, ত্যজ্যপুত্র করলেন না অবশ্য, কিন্তু আসতে না-বলা মানে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ওর মনে হল, একটু একটু করে দাদু কেমন নিশঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন ইচ্ছে করে। কেন?

ছেটকাকার ওপর ওর কাল সঙ্গে থেকে জমা রাগটা তাৎ-আস্তে বেঁচে যাচ্ছিল। তপ্পুপিসি, তেজেনদা-সবকিছু মিলিয়ে মিলিয়ে ওর মনের মদ্যে একটি আকেশ তৈরি হয়ে গেল। ও টিক করল দাঁড়িওয়ালা ছেলেটাকে গিয়ে সব কথা বলে দেবে, ব্যাগটা দেখাবে। ও থেক ছেটকাকার, ওর কিছু এসে যায় না। দোষী মানুষের শাস্তি হওয়া দরকার। ছেটকাকা তো কংগ্রেসি নয়। কাল রাত্রে অ্যাস্টিকংগ্রেস মুভমেন্টের কথা বলেছে, অতএব ছেটকাকাকে ধরিয়ে দিলে কোনো অন্যায় হবে না।

বড় বড় পা ফেলে ও সরু গলিটাম চলে এলে। ত্রুমশ র গতি করে গেল এবং অবাক হয়ে চারধারে ঢেয়ে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। গলিটা একদম হাস্ত। যেখানে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে একটা গোরু নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। খুব হতাশ হয়ে পড়ল অনিমেষ। ওরা গেল কোথায়? একটু একটু করে গলিটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাটতে ও ভীষণভাবে আশা করছিল ছেলেগুলোর দেখা পাবে। অথচ এই দুপুরবেলায় গলি এবং বড় রাস্তা ঠাসা রোদুরে মেঝে চুপচাপ পড়ে আছে। ওরা কি খোঁজ পাবে না বলে চলে গেল?

ব্যাগটা ওজন যেন ত্রুমশ বেড়ে যাচ্ছিল। কোনো উপায় নেই, অনিমেষ সেটাকে টেনে টেনে

বিরাম করের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল ।

॥ নয় ॥

হোটকাকা চলে যাবার পর বিরাম করের বাড়িতে অনিমেষের খাতির যেন বেড়ে গেল । মুভিং ক্যাসেল পরদিন স্কুল ছুটি হতেই ধরলেন । গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রমহিলা, জেলা স্কুলের ছেলেরা ছুটির পর পিলপিল করে বেরিয়ে ওঁকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল । স্কুলের গেট পার হবার আগেই তপন ওকে দেখতে পেয়েছিল । সঙ্গে সঙ্গে কোমরে একটা খোচা খেল অনিমেষ, ‘ওই দ্যাখ, হোলি মাদার দাঁড়িয়ে আছেন । উইন্ডাউট ডগ !’

অনিমেষ বলল, ‘কী হচ্ছে কী ?’

তপন থামল না, ‘মাইরি, জলপাইগুড়িতে কোনো মেয়ের এরকম ব্লাউজ পরার হিমত নেই । শালা নিশীথবাবুটা বহুৎ চালু মাল !’

অনিমেষ এবার রেঁগে গেল, ‘তপন, তুই যদি ভদ্রভাবে কথা না বলতে পারিস তা হলে আমার সঙ্গে আসিস না ।’

মটু এতক্ষণ শনছিল চৃপচাপ, এবার অনিমেষের পক্ষ নিল, ‘সত্যি কথা । সব ব্যাপারে ইয়ার্কি করা ঠিক নয় ।’ তারপর ফিসফিস করে বলল, ‘মাসিমাৰ সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দে না ভাই ।’

ততক্ষণে ওরা রাস্তায় এসে পড়েছে । চোখাচোখি হতে মুভিং ক্যাসেল ঠোঁট টিপে মাথা সামান্য কাত করে হাসলেন অনিমেষ বলল, ‘তোরা দাঁড়া, আমি আসছি ।’ কাছাকাছি হতেই মুভিং ক্যাসেল অত্তু মিষ্টি গলায় বললেন, ‘বাবাঃ, ছুটি আৱ যেন হয় না, সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি! আমাদের বাড়তে একটু আসবে না/’

অনিমেষ দেখল স্কুলের অন্যান্য ছেলে যেতে-যেতে ওদের দেখছে । মটু আৱ তপন চৃপচাপ রাস্তায় দাঁড়িয়ে । অনিমেষ বলল, ‘আমার সঙ্গে যে বস্তুয়া আছে?’

‘ও ।’ চোখ বড় বড় করলেন মুভিং ক্যাসেল, ‘ওৱাও কংগ্রেসকে সার্পোট করো?’

অনিমেষ চটপট ঘাড় নাড়ল, ‘না ।’

মুভিং ক্যাসেল তাতে একটুও দুঃখিত হলেন না, ‘আছা! তোমার বস্তু যখন তখন ওরা নিশ্চয়ই ভালো ছেলে, কী বল? তা ওদের ডাকো না, ওরাও আসুক, বেশ আড়া দেওয়া থাবে থন । তোমার দাদা আবার আজকে প্লেনে কলকাতায় গেলেন । ছেটকুটোৱ শৰীৰ খারাপ বলে আমি থেকে গেলাম ।’

অনিমেষ হাতে নেড়ে বস্তুদের ডাকল । মটু বোধহয় এতটা আশা করতে পারেনি, ও তপনকে ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু বলল, তারপর দুজনে আড়ত-পায়ে এদিকে আসতে লাগল । মুভিং ক্যাসেল গেটটা খেলে ওদের ভেতরে চুক্তে দিলেন, ‘এসো এসো, তোমোৱা তো অনিমেষের বস্তু, এক ক্লাসেই পড় বুঝি?’

মটু ঘাড় নাড়ল, ‘হ্যা ।’ তারপর ঝুকে পড়ে ওঁকে প্রণাম করতে গেল । প্রথম বুঝতে পারেনি মুভিং ক্যাসেল, তারপর সাপ দেখাৰ মতো যতদূৰ সভ্ব শৰীৰটাকে সরিয়ে নিলেন, ‘ওমা, এৱ যে দেখছি দারুণ ভক্তি! দিদি বউদিকে কি কেউ প্ৰণাম কৰে, বোকা ছেলে! এসো ।’

মুভিং ক্যাসেলের পেছন পেছন যেতে-যেতে অনিমেষ মটুৰ মুখেৰ দিকে তাকিয়ে ফিক কৰে হেসে ফেলল । আজকাল কথায়-কথায় মুভিং ক্যাসেলেৰ প্ৰসঙ্গ উঠলে মটু মাসিমা বলে, বেচাৱাৰ প্ৰথম চালটাই নষ্ট হয়ে গেল ।

বাৰান্দার বেতৰে চেয়াৱে ওৱা বসল । মুভিং ক্যাসেলেৰ বসবাৰ সময় চেয়াৱটায় মচমচ শব্দ হতেই তিনি বললেন, ‘বুব মোটা হয়ে গেছি, নাঃ’

অনিমেষ কোনো কথা বলল না । উত্তৱটা দিলে কাৰও স্বষ্টি হবে না । মুভিং ক্যাসেলও বোধহয় চাননি জৰাব, ‘কী গৱম পড়েছে, বাবা! পুজো এসে গেল কিন্তু ঠাণ্ডাৰ নাম নেই ।’ কথা বলতে বলতে বুকেৰ আঁচল দিয়ে একটু হাওয়া নিলেন উনি, ‘এবাব তোমাদেৱ দুজনেৰ নাম জানা যাক ।’

অনিমেষ বস্তুদেৱ দিকে তাকিয়ে দেখল দুজনেই মুখ নিচু কৰে নাম বলল । কাৰণটা বুঝতে পেৱে চট কৰে অনিমেষেৰ কান লাল হয়ে গেল । আঁচলে হাওয়া খাওয়াৰ পৰ ওটা এমনভাৱে কঁধেৰ ওপৰ রয়েছে যে মুভিং ক্যাসেলেৰ বুকেৰ গভীৰ ভাঁজটা একদম ঊৰ মুখেৰ মতো উন্মুক্ত । মুভিং ক্যাসেলেৰ

কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, নাম শুনে বললেন, ‘বাঃ! সামনের বছর তো তোমরা সব কলেজ টুডেট। এখন বলো তো, তোমরা কংগ্রেসকে কেন সাপোর্ট কর না?’

মণ্ডু সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের দিকে তাকাল। তখন বলল, ‘আমি এসব ভাবি না।’

মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘তুমি?’

মণ্ডু আন্তে-আন্তে বলল, ‘আমি কংগ্রেসকে পছন্দ করি না।’

‘গুড়।’ হাতাতলি দিয়ে উঠলেন মুভিং ক্যাসেল, ‘আজ বেশ জমবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে একটু চা হলে তালো হয়, না? চা খাও তো সবাই।’

অনিমেষ বাড়িতে চা খায় না। কখনো-কখনো সর্দিকাশি হলে পিসিমা আদা দিয়ে চা তৈরি করে দেন। কিন্তু আজ বস্তুরা কেউ আপত্তি না করাতে ও চুপ করে থামল। মুভিং ক্যাসেল চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করে আবার বসে পড়লেন, ‘আর পারি না। অনিমেষ ভাই, তুমি একটু যাও-না, ভেতরের রাম্যাঘরে দেখবে আমাদের মেইড-সার্টেট আছে, ওকে বলবে চার কাপ চা আর খাবার দিবে। তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে।’ আদুরে মুখতঙ্গি করলেন উনি।

বই-এর ব্যাগটা রেখে অনিমেষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মণ্ডু আর মুভিং ক্যাসেলের আলোচনাটা শোনে। মণ্ডু ইদানীং খুব কংগ্রেসকে গালাগালি দেয়। অনিমেষকে ঠাট্টা করে বলে, ‘কবে যি খেয়েছিস এখন হাত চেটে গঞ্জ নে।’ ও চটপট ফিরে আসবাব জন্য ভেতরে পা বাড়ল। ড্রাইবিংস্টায় কেউ নেই। বিবাম কর মেখানটায় বিসেন সে-জায়গাটা চেৰে ফাঁকা ঠেকল। সেদিন যে-ঘরটায় ওরা বসেছিল তার দরজায় এল ও, কেউ নেই এখানে। উর্বরীদের ঝুল এত দেরিতে ছুটি হয় কেন? মেনকাদিও বাড়িতে নেই। ও গভীরমুখে একদম শেষপ্রাপ্তে এসে একটা বড় উঠোন দেখতে পেল। উঠোনের এক কোনায় কুরোর ধারে বসে একজন মাঝবয়সি বউ কী সব ধূঁচে। অনুমান করে অনিমেষ তাকেই মুভিং ক্যাসেলে হক্কুমট শোনাল। ও দেখল মুখ ঘৰিয়ে বউটা তাকে দেকে নিঃশব্দে ডাঢ় নাড়ল। ভেতরটা বেশ ছিমছাম, সুন্দর। অনিমেষ দেখল উঠোনের এপাশে আর একটা ঘর, তাতে পর্দা ঝুলছে। ওটা কার ঘর? এই সময় ওর মনে পড়ল বাড়িতে ঢোকার সময় মুভিং ক্যাসেল বলেছিলেন, ওর বিবাম করের সঙ্গে কলকাতায় যাওয়া হল না ছেটকুটার অসুবিধে জন্য। ছেটকু কে? বাড়ির সবচেয়ে ছেট তো রঞ্জা, নাকি আর কেউ আছে? ওর মন বলল, যে-ই হোক সে অসুস্থ হয়ে ওই ঘরে শয়ে আছে। মুভিং ক্যাসেল বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর কেউ-একজন অসুস্থ হয়ে ঘরে শয়ে আছে তাবতে খারাপ লাগল অনিমেষের। ওর ইচ্ছে হল একবার ঘরটা দেখে যাবার। কুয়োর ধারে বসে কাজ করে-যাওয়া বউটার দিকে তাকিয়ে ওর একটু সংকোচ হচ্ছিল, ফট করে একটা পর্দা-ফেলা-ঘরে উকি দি঱ে কিছু ভাববে না তো? তারপর সেটা বেড়ে ফেলে পায়েপায়ে উঠোনটা পেরিয়ে পর্দাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। আশ্চর্য, বউটা একবারও ঘুরে ওকে দেখল না, কিন্তু দাঁড়ানোমাত্র ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কেউ বলে উঠল, ‘কে?’ অনিমেষের আর সন্দেহ রইল না ছেটকু মানে রঞ্জাই। ও-ই অসুস্থ! কী হয়েছে রঞ্জার? এখন এই মুহূর্তে আর এখান থেকে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। ও মন্তুর কথা ভাবল। মণ্ডু এখন বাইরে মুভিং ক্যাসেলের সঙ্গে পলিটিকস্ নিয়ে আলোচনা করার সময় স্মাক্ষরে ভাবতে পারছে না রঞ্জা এখানে অসুস্থ হয়ে রয়েছে! এক হাতে পর্দাটা সরাল অনিমেষ।

ভেতরটা আবেছায়া, খাটের ওপর রঞ্জাকে দেখতে পেল ও। পর্দা তোলামাত্র রঞ্জা চট করে কী যেন সরিয়ে ফেলতে গিয়ে ওকে দেখে সেটা নিয়েই অবাক হয়ে উঠে বসল, ‘আরে! কী আশ্চর্য ব্যাপার!’

অনিমেষ সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল, ‘কী হয়েছে তোমার?’

হঠাৎ মুখটা গভীর করে রঞ্জা শয়ে পড়ল, ‘বলব না।’

এরকম ব্যাপার কখনো দেখেনি অনিমেষ, ‘কেন?’

‘মায়ের কাছে জেনে নাও। দরজায় দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে থা বলা ভদ্রতা নয়।’ রঞ্জা বলল।

অনিমেষ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, ‘এবার বলো, কী হ গচ্ছে?’

‘সার্দি জুর। কাছে এসেছ তোমারও হয়ে যাবে। রঞ্জা চাদরটা গলা অবধি টেনে নিল। অনিমেষ হাসল। মেয়েটা সত্যি ভাড়ুত। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রঞ্জা বলল, ‘দিদির কাছে এসেছে?’

চমকে উঠল অনিমেষ, ‘না না। আমাদের মাসিমা ডেকে এনেছেন।’ দিদি বলতে উর্বশীর মুখ

মনে পড়ে গেল ওর। এবং এখন ওর ইচ্ছে হচ্ছিল উর্বশী তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক।

‘আমাদের মানে?’ রঞ্জি কথা ধৰল।

এবার অনিমেষ একটু মজা করল, ‘আমি আর আমার দুই বক্স। যার একজনের কথা তুমি সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে, তোমার কথাও ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে।’

মুখ বেঁকাল রঞ্জি, ‘ও, সেই শুভাটা! ও আবার এল কেন?’

‘গুণা?’ হঁ হয়ে গেল অনিমেষ।

‘একটা ছেলে সাইকেলে চেপে এসেছিল, তাকে ও মারেনি? বদমাশ ইতর।’ রঞ্জির গলায় তীব্র বাঁচা, ‘কীসব বক্স তোমার! আবার তাদের নিয়ে এসেছে।’

অনিমেষ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, ‘আমি যাই।’

সঙ্গে সঙ্গে খিচিয়ে উঠল রঞ্জি, ‘যাই মানে? ইয়ার্কি, না! আমার ঘুম ভাঙিয়ে এখন চলে যাওয়া হচ্ছে। বসো এখানে পাঁচ মিনিট।’

‘তুমি ঘুমিছিলে কোথায়? বই পড়ছিলে তো!’ অনিমেষ বালিশের পাশে উপুড় করে রাখা বইটা দেখাল।

রঞ্জি বলল, ‘আচ্ছা আচ্ছা। একটু বসে যাও প্রিজ।’

‘মাসিমা খোঁজ করবেন, আমি চা বলতে এসেছিলাম।’ অনিমেষ ইতস্তত করছিল।

‘মা এখন তোমার বস্তুদের সঙ্গে বকবক করবে, খেঁয়াল করবে না। তা ছাড়া তোমার বাকা হল মায়ের ফ্রেন্ট।’ কথাটা বলার ভঙ্গি অনিমেষের ভালো লাগল না। ঘরের এক কোণে টেবিলের গায়ে একটা চেয়ার সাঁটা আছে। ওখানে বসলে এদিকে মুখ ফেরানো যাবে না। এরকম চেয়ার-টেবিল স্থলে থাকে। নিচ্ছয়ই পড়ার টেবিল। ও কোথায় বসবে বুরাতে পারছে না দেখে রঞ্জি হাত বাড়িয়ে বিছানার একটা পাশ দেখিয়ে বলল, ‘এখানে বসো, কথা বলতে সুবিধে হবে। অবশ্য তোমার যদি ছোঁয়া লেগে যাবার ভয় থাকে তো অন্য কথা।’ এরপর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, অনিমেষ সন্তুপণে বিছানার একপাশে বসল। বসেই ও বইটার মলাট স্পষ্ট দেখতে পেল।

রঞ্জি সেদিকে তাকিয়ে বইটা সরাতে গিয়ে থেমে গেল, ‘এই বইটা তুমি পড়েছো?’

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, না। মাথার ওপর চাঁদ, বকুলগাছের তলায় আলুখালু হয়ে দুটো ছেলেমেয়ে জড়াজড়ি করছে, নিচে লেখা ‘হনিমুন’। এ-ধরনের বই এর আগে কখনো দেখেনি ও। একদিন ওদের ক্লাসের ফটিক কেমন বিশ্রি ছাপা মলাটা-ছাড়া একটা বই নিয়ে এসেছিল। ফটিকদের একটা দল আছে যাদের সঙ্গে ওরা প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। প্রত্যেক বছর একবার করে ফেল করে ফটিক ওদের ক্লাসে উঠেছে। বইটার নাম বাকি ‘লাল গামছা’। এরকম নামের কোনো বই হয় বিশ্বাস হয়নি থথমে। তপন বলেছিল, উটা নাকি খুব জ্যন্য বই। এখন এই হনিমুনটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের মনে হল এটাও সেরকম নাকি।

‘তুমি এখন কচি, নাক টিপলে দুখ বের হবে। রঞ্জি বইটাকে বালিশের তলায় চালান করে দিয়ে বলল, ‘আমি যে বইটা পড়ছি দিদিকে বলবে না।’

হঠাতে রাগ হয়ে গেল অনিমেষের, ‘তখন থেকে দিদি-দিদি করছ কেন?’

ঠোট টিপে হাসল রঞ্জি, ‘কেন বলব না, তুমি তো উর্বশীহরণ করেছ।’

ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনিমেষ বলল, ‘কী যা-তা বলছ?’

চোখ বড় বড় করল রঞ্জি, ‘ওমা তাই নাকি! বেশ, তা হলে আমার মাথাটা একটু টিপে দাও তো, খুব যন্ত্রণা করছে।’ বলেই চোখ বুজে ফেলল ও।

খুব রাগ হয়ে গেল অনিমেষের। এই যেয়েটা-ওর থেকে অনেক ছোট, অথচ এমন ভঙ্গিতে কথা বলে যে নিজেকে কেমন বোকা-বোকা লাগে। ও বলল, ‘ঘুমোলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি মাথা টিপতে জানি না। আমি উঠি, মাসিমা বসে আছেন।’

রঞ্জি হাসল, ‘তুমি ভীষণ দুষ্ট। মা ঠিকই বুঝবেন যে তুমি আমার সঙ্গে গল্প করছ, ঝগির সঙ্গে থাকলে কেউ অশুশি হয় না।’ তারপর একটু চেয়ে থেকে বলল, ‘তুমি কী জান?’

‘মানে?’

ରଙ୍ଗ ଏବାର କାତ ହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ବୀ ହାତଟା ଧପ କରେ ଅନିମେଷେର ପାଯେର ଓପର ରାଖିଲ, ‘ମାନେ ତୁମି ମାଥା ଟିପେତେ ଜାନ ନା, ଗଲ୍ଲ କରତେ ପାର ନା, ଏକଦମ ତୋଦାଇ !’

ଅନିମେଷ ଟେର ପେଲ ଓ ପା ନାଡ଼ିତେ ପାରଛେ ନା, କେମନ ଅବଶ ହେଁ ଯାଚେ । ଏମନକି ରଙ୍ଗ ଓକେ ଶୈସ ଯେ-କଥାଟା ବଲଲ, ସେଟା ଶୁନେଓ ରାଗ କରତେ ପାରଛେ ନା । ଆଶ୍ଚର୍ମ ଦିଯେ ଓର ଥାଇ-ଏର ଓପର ଟୋକା ମାରତେ ମାରତେ ରଙ୍ଗ ବଲଲ, ‘ତୁମି ତୋ ବଲଲେ ଦିଦିର ସଙ୍ଗେ କିଛୁ ହୟନି । ତା ତୋମାର ଆର ଲାଭାର ଆଛେ ?’

‘ଲାଭାର ?’ ଅନିମେଷ ଚୋଥ ଖୁଲେଇ ଉର୍ବଣୀର ମୁଖ ଦେଖତେ ପେଲ । ଉର୍ବଣୀ କି ଓର ଲାଭାର ? କି ଜାନି ? ଆର କୋନୋ ମେଯେ-ଯେନ ଗତିର କୋନୋ କୁରୋ ଥେକେ ଦ୍ରୁତ ଟେନ୍-ତୋଳା-ବାଲତିର ମତୋ ଓର ସୀତାକେ ମନେ ପଡ଼ିଲ । ସୀତା କି ଓର ଲାଭାର ? ସୀତାକେ କତଦିନ ଦେଖେନି ଓ ! କତଦିନ ସ୍ଵର୍ଗଛେଡ଼ାଯ ଯାଉୟା ହୟନି । ସୀତାର ତୋ ଏଥାନେ ତପୁପିସିର ଝୁଲେ ପଡ଼ତେ ଆସାର କଥା ଛିଲ, ଇସ, ଏକବାର ଗିଯେ ଖୋଜ ନିଯେ ଏଲେ ହତ ।

ଓକେ ଚପ କରେ ଥାକତେ ଦେଖେ ରଙ୍ଗ ବଲଲ, ‘ଆଛେ, ନା ?’

ଆନ୍ତେ-ଆନ୍ତେ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ି ଅନିମେଷ, ‘ନା !’

‘ଯାଃ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ନା ! ଆଜକାଳକାର ଛେଲେଦେର ଆବାର ଲାଭାର ନେଇ ! ଦିଦିଭାଇ-ଏର ତିନଙ୍ଗନ ଆଛେ, ଏକଜନ କଲେଜେ, ଏକଜନ କଲକାତାଯ ଆର ଏକଜନ ତୋମାର ମାଟାର ନିଶ୍ଚିଥଦା । ଦିଦିଭାଇ ଅବଶ୍ୟ କଲକାତାର ଛେଲେଟାକେ ବିଯେ କରବେ ।’ ରଙ୍ଗ ଖବରଟା ଦିଲ ।

‘ମେ କୀ ! ନିଶ୍ଚିଥାବୁର ସଙ୍ଗେ ବିଯେ କରତେ ?’ ରଙ୍ଗ ବଲିଲ ।

ହଠାତ ଅନିମେଷ ସୋଜା ହେଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲ, ‘ତୋମାର ଦିଦିର ଲାଭାର ଆଛେ ?’

ଚୋଥ ବକ୍ଷ କରେ ଏକଟୁ ତାବଳ ରଙ୍ଗ, ନାଃ । ଏକଜନ ଛିଲ କିନ୍ତୁ ବାବାର ଜନ୍ୟ କେଟେ ଗେଛେ । ଆସଲେ ଦିଦି ଖୁବ କାଗ୍ରାର୍ଡ !’

ଏବାର ମୋକ୍ଷମ ପ୍ରଶ୍ନଟା କରଲ ଅନିମେଷ, ‘ତୋମାର ?’

ଖିଲଖିଲ କରେ ହେଁସ ଉଠିଲ ରଙ୍ଗ, ‘କୀ ଚାଲୁ, ଏହି କଥାଟା ଜିଞ୍ଜାସା କରାର ଜନ୍ୟ କତ ଭାନ ! ତୁଁ, ଆମାର ପାଂଚଜନ ଲାଭାର ଆଛେ । କିନ୍ତୁ କାରେ ସଙ୍ଗେ ସାମନାସାମନି କଥା ବଲିନି । ଓଦେର ସବାଇ ଆମାକେ ଲାଭଲେଟାର ଦିତ, ଏକଜନ ଯା ଫାର୍ଟ କ୍ଲାସ ଲିଖିତ ନା !’

‘ତାରା କୋଥାଯ ଗେଲ ?’ ଅନିମେଷର ମଜା ଲାଗଛିଲ ।

‘ଦିଦିଭାଇ ଟେର ପେଯେ ଗିଯେ ମାକେ ବଲେ ଦିଲ । ମା ବଲଲ, କଲେଜେ ଓଠାର ଆଗେ ଏସବ କରଲେ ବାଡ଼ି ଥେକେ ବାର ହେଁସା ବନ୍ଦ । ଆମି ଯେ କୀ କରି !’ ରଙ୍ଗ ହତାଶ ଗଲାଯ ବଲଲ ।

ଅନିମେଷ ଏବାର ଉଠି ଦାଁଡ଼ାଲ, ତାରପର ରଙ୍ଗର ହାତଟା ସର୍ପଣେ ବିଛନାଯ ରେଖେ ଦିଲ, ‘ଏବାର ତୁମି ଯୁମୋଡ, ଆମି ଚଲି ।’

ରଙ୍ଗ ବଲଲ, ‘ଆମାର ବୋଧହୟ ଆବାର ଜୁର ଆସାଛେ ।’

ଅନିମେଷ ଦେଖିଲ, ଓର ମୁଖୀଟା ସତି ଲାଲଚେ ଦେଖାଛେ । ଓ ଏକଟୁ ଝୁକେ ରଙ୍ଗର କପାଳେ ହାତ ରାଖିତେଇ ଆଜ୍ଞାଲେ ଉତ୍ତାପ ଲାଗଲ । ଓ ବଲଲ, ‘ଇସ, ତୋମାର ଦେଖାଇ ବେଶ ଜୁର !’

ରଙ୍ଗ ତତକ୍ଷଣେ ଓର ହାତ ଦୁହାତେ ଧରେ ଗଲାଯ ଘୟତେ ଆରାଷ କରରେ । ଅନିମେଷ ବୁଝାତେ ପାରଛିଲ ନା କୀ କରବେ । ଏକବାର ଚଢ଼ା କରେଓ ରଙ୍ଗର ଶକ୍ତ ମୁଠୀ ଥେକେ ହାତଟାକେ ମେ ଛାଡ଼ାତେ ପାରିଲ ନା । ଶୈସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଲ ସାମଲାତେ ପାରିଲ ନା ଅନିମେଷ, ଧପ କରେ ରଙ୍ଗର ବାଲିଶେର ପାଶେ ବସେ ପଡ଼ିଲ । ଆର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ ଓର ହାତ ଛେଡେ ଦିଯେ ଦୁହାତେ କୋମର ଜାଡ଼ିଯେ ଧରେ କୋଲେ ମୁଖ ରେଖେ ଝୁପିଯେ କେଂଦ୍ର ଉଠିଲ । ଅନିମେଷ ଦେଖିଲ ଓର କୋଲେ ଏକରାଶ ଲକ୍ଷ ଚଲ ଝୁଲେଫେପେ ଭାରାଟ ହେଁ ଓଠାନାମା କରରେ । କିଛୁତେଇ ଯେନ କାନ୍ଦା ଥାମିଛିଲ ନା ରଙ୍ଗର, ଅନିମେଷ ଟେର ପେଲ ଓର ଗା ଯେନ ରଙ୍ଗର ଶରୀରେର ଜୁର-ଉତ୍ତାପେ ପୁଣ୍ଡ ଯାଚେ । କେମନ ମାଯା ହଲ ଓର, ଆଲାତୋ କରେ ରଙ୍ଗର ଚାଲର ଓପର ଆଜ୍ଞାଲେ ରେଖେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲ, ‘ଏହି, କଂପାଇ କେନ ?’

ମେଇରକମ କୋଲେ ମୁଖ ଭୁବିଯେ ଶୁଯେ ଥେକେ କାନ୍ଦାଜଡ଼ାନେ ଗଲାଯ ରଙ୍ଗ ବଲଲ, ‘ଆମାକେ କେଉ ଭାଲୋବାସାତେ ଇହେ କରେ, ଆମି କୀ କରବ ?’

ଅନିମେଷ କୀ ବଲବେ ପ୍ରଥମ ବୁଝାତେ ପାରିଲ ନା । କିଛୁକ୍ଷଣ ପର ଓ ବଲଲ, ‘ଠିକ ଆଛେ ।’

ଓକେ ଶକ୍ତ କରେ ଧରେ ରେଖେ କେମନ କରିଲ ଗଲାଯ ରଙ୍ଗ ଜିଞ୍ଜାସା କରିଲ, ‘ତୁମି ଆମାକେ

ভালোবাসবে?

রঞ্জন শরীর থেকে উঠে-আসা উত্তাপ হঠাৎই অনিমেষের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। এর জন্য সে একটুও প্রস্তুত ছিল না, যেন অঙ্ককার ঘরে চুকে কেউ টপ করে সুইচ অন করে দিয়েছে। সেই তিঙ্গার চর থেকে পালিয়ে-আসা অনিমেষের মুখেমুখি হয়ে গেল সে। সমস্ত শরীর বিমর্শিম হাত-পা অবশ। রঞ্জন আবার বলল, ‘এই বলো-না, আমাকে ভালোবাসবে তো?’

সিকি চুলের ওপর আলতো করে রাখা আঙুলগুলো হঠাৎ গোড়ায় গোড়ায় অঞ্চলিপাসের মতো চুকে পড়ল। আর সেই মুহূর্তেই ঘরের আলোটা একটু নড়ে উঠতেই অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে দেখল এক হাতে পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে উর্বশী ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে টুপ করে আলোটা নিভে গেল, উর্বশীর চোখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ আবিষ্কার করল ওর শরীরটা আস্তে-আস্তে শীতল হয়ে যাচ্ছে। উর্বশীর এই উপস্থিতি ওর কোলে মুখ ডুবিয়ে ওয়ে থাকা রঞ্জন টের পায়নি। কান্নার রেশটা গলায় নিয়ে নিজের মনে এই সময় ও বলল, ‘আমি খারাপ, খুব খারাপ, না?’

এভাবে বসে থাকা যায় না, অনিমেষ সমস্ত শক্তি দিয়ে রঞ্জন দুটো হাত কোমর থেকে ছাড়িয়ে নিল। ওর চোখ উর্বশীর দিকে দরজা থেকে একটুও নড়ছে না সে; পরনে স্কুল-ইউনিফর্ম, কপালে ঘাম রুক্ষ চুল আর চোখে পাথর-হয়ে-যাওয়া বিশায়। অনিমেষ জোর করে রঞ্জন মাথাটা বিছানায় নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রঞ্জন মুখ তখনও উলটোদিকে পাশ-ফেরানো। একটা ঘোরের মধ্যে সে বলে যেতে লাগল, ‘তুমিও আমাকে সরিয়ে দিলে!’

অনিমেষ উর্বশীকে কিছু বলতে যেতেই ও দেবল পর্দাটা পড়ে গেল, উর্বশী যেমন এসেছিল তেমন নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর এই আসা এবং চলে যাওয়াটা রঞ্জন টের পেল না। অনিমেষের ইচ্ছে হল ও এখনও ছুটে গিয়ে উর্বশীকে সব কথা বলে। ও রঞ্জন সঙ্গে ইচ্ছে করে এরকম করেনি, রঞ্জন সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু উর্বশী কি একথা বিশ্বাস করবে? অনিমেষ নিজের মনে সমর্থন পেল না। হঠাৎ ওর বুকের ডেতর অনেকদিন বাদে সেই কান্নাটা হড়মুড় করে চুকে পড়ে গলার কাছে ঝড়ে হয়ে থাকল।

আস্তে-আস্তে বিছানায় উঠে বসে রঞ্জন ওর দিকে তাকাল, ‘কী হয়েছে?’

নির্জীব গলায় অনিমেষ বলল, ‘তোমার দিদি এসেছিল।’

‘কখন?’ অনিমেষ অবাক হয়ে শুনল রঞ্জন গলা একটু কাঁপল না।

‘একটু আগে।’ তারপর বলল, ‘যদি এখন মাসিমাকে বল দেয়?’

‘না, বলবে না। আমি তা হবে অনেক কথা বলে দেব। একদিন বাবার এক বুড়ো বস্তু ওকে বিছিরিভাবে আদুর করেছিল, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। ও তো সেকথা মাকে বলেনি?’ রঞ্জন মাথা নাড়ল।

অনিমেষ বলল, ‘কী জানি।’

হঠাৎ মেন কারণটা ধরতে পেরে রঞ্জন বলে উঠল, ‘ও, দিদি এসেছিল বলে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তরে কথা বলছিলে না, তা-ই বলো! তুমি একদম তোদাই।’

অনিমেষ এগোল, ‘আমি যাচ্ছি।’

খুব ক্লান্ত হয়ে গেল রঞ্জন গলা, ‘আবার কবে আসবে?’

অনিমেষ বলল, ‘দেবি।’

রঞ্জন বলল, ‘দাঁড়াও, তোমাকে একটা কথা বলবে, আর বিরক্ত করব না।’

বলার ধরনটা এমন ছিল অনিমেষ ঘুরে দাঁড়াল, ‘কী কথা?’

‘তোমার খুব অহঙ্কার, না?’

‘না তো।’

‘ইঁ, ভালো ছেলে বলে ভীষণ গর্ব তোমার।’

হেসে ফেলল অনিমেষ, ‘তুমি বাজে কথা বলছ।’

ওর চোখে চোখ রেখে রঞ্জন বলল, ‘তোমাকে একটা কথা বলব, শুনবে?’

‘বলো।’

‘উহ, এতদুর থেকে চেঁচিয়ে বললে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ শনে ফেলবে। প্রিজ, একটু কাছে এসো—না!’ একদম মুভিং ক্যাসেলের মতো ঘাড় কাত করে রঞ্জ বলল :

খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে অনিমেষ বলল, ‘বলো।’

ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রঞ্জ আস্তে-আস্তে খাট থেকে নেমে মেঝেতে দাঁড়াল। অনিমেষ ওর ভাবভঙ্গ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কথাট বলার জন্য ডেকে যেন তুলে গেছে রঞ্জ। ওর সামনে দাঁড়িয়ে দুহাতে কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরাল, তারপর কী অবলীলায় দীর্ঘ ক্ষীত চুলের গোছাকে দুহাতে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে ধরে আঁট ব্যাপার মতো জড়িয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জের চেহারাটাই পালটে গেল। সেদিকে চেয়ে থাকতে রঞ্জ দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই দুহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওর সমস্ত শরীর দিয়ে ওকে চুম খেল।

অদ্ভুত একটা স্বাদ-ঠোঁট, ঠোঁট থেকে জিভে এবং সমস্ত শরীরে ছাড়িয়ে পড়তে অনিমেষ দুহাতে ঠেলে রঞ্জকে সরিয়ে দিল। শরীরটা হাঁতাঁ গুলিয়ে উঠল যেন ওর, বিছিরি লাগছে রঞ্জের ঠোঁটের গুরু। বোধহয় এরকমটা হবে রঞ্জের অনুমানে ছিল তাই খানিকটা দূরে ছিটকে সরে দাঁড়িয়ে ও মুখটা বিকৃত করল, ‘ভীতু, বুহু, ভোদাই! ছি!

কথাগুলো বলে ও আর দাঁড়াল না, দ্রুত গিয়ে বিছানায় উঠে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল। বিহুল অনিমেষ দেখল শোয়ার আগে রঞ্জ ‘হিনিয়ন্টাকে বিছানার তোশকের তলায় চালান করে দিতে তুলাল না।

অদ্ভুত একটা অবসাদ, গা-রি-রি-করা অবস্থি এবং অপরাধের দিকে নিয়ে অনিমেষ চুপচাপ পর্দা সরিয়ে বাইরে এল। উঠোন এবং কুয়োর পাড়ে কেউ নেই। এখন ওর সমস্ত শরীরে কোনো উজ্জেবনা নেই, কোনো মেয়ে তাকে এই প্রথম চুম করল অথচ ওর মনে হচ্ছে মুখটা ভালো করে ধূয়ে ফেলতে পারলে বোধহয় স্বত্ত্ব হত। ও দেখল সেই বউটা একটা ট্রিতে চায়ের কাপ আর খাবার নিয়ে বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে যাচ্ছে। উঠোনে নামল অনিমেষ। কুয়োর ধারে গিয়ে ও অনেক কষ্ট টেক্সেটাকে সংবরণ করে পায়েপায়ে বারান্দায় উঠে এল। একটা দুটো ঘর পেরোতোই ও প্রথম দিনের বসার ঘরটার সামনে এল। বাড়ির জামা পরে উর্বশী চুল বাঁধছে। ও যে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে উর্বশী যেন দেখেও দেখেছেন না। আয়নার ওপর একটু বেশি বুঁকে পড়েছে যেন সে। ক্ষেত্রে বুবাতে পারল উর্বশী ওর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। সঙ্গে সঙ্গে ও ঠিক করল উর্বশীকে সব কথা খুলে বলে যাবে। রঞ্জকে ও ভালোবাসে না, কোনো অন্যায় কিছু করতেও চায়নি, যা হয়েছে সবই ত্রুটির ইচ্ছা, হৃঝেছে এবং এই মুহূর্তেও শরীরে কোন স্বত্ত্ব পাচ্ছে না—এসিসব খুলে বলবে। উর্বশীকে ডাকতে গিয়ে ও আবিক্ষার করল গলা দিয়ে প্রথমে কোনো স্বর বের হল না; জোরে কেশে গলা পার্শ্বফার করে ও ডাকল।

মুখ ফেরাল না উর্বশী, সেই ভঙ্গিতে চুল বাঁধতে বাঁধতে বলল, ‘কোমাদের চা দেওয়া হয়েছে, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।’

অনিমেষের মনে হল সেদিন যে-মেয়েটা বন্ধুর মতো কথা বলেছিল এ সে নয়। ওর বুকের তেরোটা কেমন করছিল, অকারণে কেউ তুল বুবাবে অনিমেষ ভাবতে পারছিল না। নিজেকে শক্ত করে অনিমেষ বলেই ফেলল, ‘তুমি যা দেখেছ সেটাই সত্যি না।’

একটুও অবাক হল না উর্বশী, আয়নার ওপর বুঁকে পড়ে কপালে টিপ আর্কতে আঁকড়ে দলল, ‘এ-বাড়িতে এই ব্যাপার নতুন নয়, জ্ঞান হওয়া থেকেই তো দেখছি। যাও, মা হয়তো ভাবছেন।’ একবারও তাকাল না সে, অনিমেষ মুখ দেখার কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রচণ্ড অভিমানে অনিমেষের চোখে জল এসে গেল। ও চুপচাপ আচ্ছন্নের মতো পা ফেলে বিরাম করের ঘুরে এল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না কেন? রঞ্জের ওপর যে-বিতর্ক্ষণ ওর মনে জমেছিল সেটা এখন প্রচণ্ড ক্রোধ হয়ে উর্বশীকে লক্ষ করল। রঞ্জ ওকে অহঙ্কারী বলেছিল, ওর মনে হল উর্বশী ওর চেয়ে হাজার-শুণ অহঙ্কারী। মেয়েরা সুন্দর হলে এরকম হয় বোধহয় রঞ্জকে ওর একদম তালে লাগে না, এখন ও আবিক্ষার করল উর্বশীকে ও বন্ধু বলে ভাবতে পারছে না আর।

বাইরে বোরতে গিয়ে অনিমেষ থমকে দাঁড়াল। ও বুবাতে পারছিল শরীর এবং মনের ওপর যে-বাড় একক্ষণ বয়ে গেছে, ওর মুখ দেখলে যে-কেউ টিপ করে বুঁকে ফেলবে। অন্তত মুভিং ক্যাসেলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ও জলদি পকেটে থেকে রুমাল বের করে মুখটা রংগড়ে নিল। তারপর অনেকটা নিখাস নিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে বারান্দায় এল। ওকে দেখতে পেয়েই

তিনজনে একসঙ্গে ওর দিকে তাকাল। মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘তোমার চা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আমরা কিন্তু শেষ করে ফেলেছি।’

জড়সড় হয়ে অনিমেষ চেয়ারে বসে দেখল প্রেটে একটা কেক ওর জন্যে পড়ে আছে। কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল না, ও চায়ের কাপটা তুলে নিল। সত্যি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘ওমা, কেকটা খেলে না?’

‘কামুমাচু করে অনিমেষ বলল, ‘খিদে নেই।’

‘সে কী! এইটকুনি ছেলের খিদে নেই কী গো! তোমাদের বয়সে আমি কত খেতাম!’ বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলেন। চা খেতে-খেতে অনিমেষ বস্তুদের দিকে তাকিয়ে নিল। মন্টুর মুখটা বেশ গঁষ্ঠীর। ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, বইপত্র নিয়ে উঠবার জন্যে তৈরি।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘ছোটকুটার শরীর নিয়ে চিন্তায় পড়েছি। কথা বলল তোমার সঙ্গে?’

চমকে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল অনিমেষ। ও দেখল, মন্টু সোজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুভিং ক্যাসেল কি কিছু বুবাতে পারছেন?

ও ঘাড় নাড়ল, ‘ইঁ। খুব জ্বর আছে এখন।’ যেন জ্বর হরে কেউ কোনো বাজে কিছু করতে পারে না।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘একটু আগে আমি দেখলাম নাইটি নাইন। তুমি ভুল করেছ। আর ও-মেয়ে সবসময় বাড়িয়ে বলে।’

অনিমেষ বই-এর ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, ‘আমরা যাই।’

ওকে উঠতে দেখে মন্টুরা উঠে দাঁড়াল। মুভিং ক্যাসেল চোখ বড় বড় করে বললেন, ‘ওমা, তোমাদের অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, না? কথা বলার লোক গেলে একদম খেয়াল থাকে না আমার। কথা বলতে এত ভালোবাসি আমি।’ কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে উনি অনিমেষের কাঁধে হাত রেখে ইঁটিতে লাগলেন গেটের দিকে। মন্টুরা আগে-আগে যাচ্ছিল। না, অনিমেষ ফিরে আসার পর থেকে মন্টু একটাও কথা বলেনি। মুভিং ক্যাসেলের ধীরে চলার জন্য মন্টুরের সঙ্গে দূরত্বটা বেড়ে যাচ্ছিল। ইঠাঁ-উনি ফিসফিস করে বললেন, ‘তোমার ওই বস্তুটা কিন্তু মোটেই ভালো নয়। ওর দাদা পি এস পি করে?’

অনিমেষ বলল, ‘জানি না।’ মুভিং ক্যাসেলের নরম হাতের চাপ ক্রমশ ওর কাঁধের কাছে অসহ্য হয়ে আসছিল। সেই মিষ্টি গন্ধটা ওকে এখন ধীরে ধরেছে।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, ‘তোমার মতো ওর মন পরিষ্কার নয়। একটু সতর্ক হয়ে মিশো ওর সঙ্গে। আর হ্যাঁ, আমাদের সে স্টুডেন্টস সংগঠন আছেন তাতে তোমার জয়েন করার দরকার নেই। তুমি,-তোমাকে দিয়ে অন্য কাজ করাবার প্ল্যান আছে।’

অনিমেষ কিছু বলল না। ওরা গেটের কাছে এসে পড়তেই উনি দাঁড়িয়ে পড়ে অনিমেষের কাঁধ থেকে হাতটা নামাতে নামাতে ওর চিরুক ধরে নেড়ে দিলেন, ‘ছেলের চিবুকটা এত সুন্দর যে কী বলব?’ তারপর গেটটা বন্ধ করে বললেন, ‘কালকে এসো।’

ওরা দেখল মুভিং ক্যাসেলের ফিরে যাওয়ার সময় সমস্ত শরীর নাচছে, শুধু কুকুরটা সঙ্গে নেই বলে যা মানাচ্ছে না। আচ্ছা, কুকুরটাকে সে সারা বাড়িতে দেখল না তো! মন্টু মুভিং ক্যাসেলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বহুত খচ মেয়েছেলে।’

তপন সঙ্গে তাল দিল, ‘হেলি মাদার গোমিং ব্যাক।’

অনিমেষ এখন আর কিছু বলতে পারল না। ওদের। মন্টু যদি জানতে পারে রক্ত ওকে চুম্ব দিয়েছে তা হলে কী করবে? এই পৃথিবীর কাউকে কখনো একথা বলা যাবে না।

তপন বলল, ‘এতবড় মেয়েছেলে, এখনও কঢ় চুকি হয়ে আছে। মাসিমা বোলো না-বউদি বলো! পেঁয়াজি!'

অনিমেষ ওদের এমন রাগের কারণ ঠিক বুবাতে পারছিল না।

মন্টু বলল, ‘আমাকে বলে কিনা তুমি ভুল পথে চলছ; তোমার দাদার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কংক্রিসে এলে তুমি কত সুযোগ-সুবিধে পাবে-অনির মাথা চিবিয়েছে, এবার আমারটার দিকে লোড।’

হঠাতে তপন বলল, ‘গুরু, এতক্ষণ কী খেলে এলে ভেতরে? বুকে হাত দিয়ে জ্বল দেখলে?’
অনিমেষ রাগতে গিয়েও পারল না, কোনোরকমে বলল, ‘কী হচ্ছে কী?’
তপন বলল, ‘হোলি মাদারের একজিবিশন দেখলাম অমরা, এতক্ষণ হোলি ডটার কি তোমাকে
গ্রামার পড়াল?’

অনিমেষ কোনো উত্তর না দিয়ে হাঁটতে শুরু করতেই দেখল বাগান পেরিয়ে উর্বশীর ঘরের
এদিকের জানালাটা দড়াম করে বক্ষ হয়ে গেল। তপন আর মচু সেদিকে চেয়ে চাপা গলায় কী-একটা
কথা বলে এসেগোত্তে গিয়ে আবার ধমকে দাঁড়াল। অনিমেষ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখল, মচু পকেট
থেকে কালোমাতান কী একটা বের করে চটপট গেটের গায়ে বিরাম করের নামটার আগে বিরাট ‘অ’
লিখে গভীরমুখে হাঁটতে লাগল।

আচমকা ঘটনাটা ঘটে খাওয়ায় অনিমেষ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। ও এগিয়ে-আসা মচুর
মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটু আগের সেই বিরক্তিটা আর একদম সেখানে নেই। অনিমেষ
নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ভাড়াটে আসার পর তেরাসিও কাটেনি সরিষ্পেখের অস্থির হয়ে উঠলেন। তিন্তা বাঁধ প্রকল্প
অফিস বাড়ি ভাড়া নিছে, সইসাবুদ ছুঁচি হয়েছে, উনি ভেবেছিলেন আর-পাঁচটা সরকারি অফিস যেমন
হয় তেমনি দশটা-পাঁচটাৰ ব্যাপার,, সকাল সঙ্গে রাত নিচিঞ্চ থাকা যাবে। অফিস হলেই গাড়ি
আসবে ফলে সরিষ্পেখের নিজে বা অনেক চেষ্টা করেও পরেননি সরকার নিজের প্রয়োজনেই বাড়িৰ
দৱজা অবধি রাস্তা বের করে নেবে। কিন্তু সেসব কিছুই হল না। প্রকল্পের দৃঢ়ন ইঞ্জিনিয়ার তাদেৱ
ফ্যামিলি নিয়ে এসে উঠলেন এ-বাড়িতে। রেলেমেগে সরিষ্পেখের চুক্তিপত্রটা খুলে দেখলেন তাঁৰ
হাত-পা বাঁধা। তিনি শুধু সরকারকে বাড়িভাড়াই দিয়েছেন, কিন্তু কোথাও বলেননি যে পরিবার নিয়ে
কেউ বসবাস করতে ফ্যামিলি নিয়ে ধাকবার জন্ম ভাড়াৰ প্রস্তাৱ তিনি নাকচ করেছে। দিনে-দিনেই
বাড়িৰ মদ্যে কাঠেৱ একটা পার্টিশন হয়ে গেল, দেওয়ালে পেরেকেৱ শব্দ হতেই সরিষ্পেখেৱেৱ মনে
হল ওঁৰ বুক ভেতে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি ছুটে গেলেন ঘটনাহুলে, চিতকাৰে চ্যাচামেচিতে কোনো কাজ হল
না, যিঞ্চিতুলো বধিৰেৱ মতো কাজ শেষ কৰে গেল। সেই বিকলেই সাধুচৱণেৱ কাছে ছুটলেন
সরিষ্পেখ। সাধুচৱণ এখন আৱ তেমন শক্ত নন। মেয়ে মারা যাবার পৰ স্তৰী একদম উদ্যোগ পাগল
হয়ে গিয়েছিলেন, সম্পত্তি তিনিও গত হয়েছেন। দুই ছেলে বিয়ে কৰে আলাদা হয়ে গিয়েছে, পাগলেৱ
সৎসারে তাঁৰা ধাকতে চাননি। ফলে সাধুচৱণেৱ কী অবস্থা তা জানতে বাকি ছিল না সরিষ্পেখেৱেৱ।
ত্বৰ ওঁৰই কাছে ছুটলেন তিনি, বিয়হ-সম্পত্তিৰ ব্যাপারে লোকটাৰ বুদ্ধি খেলে থুব। সাধুচৱণ সব ঘনে
খানিকক্ষণ তিন্তা কৰে বললেন, ‘আপনি এত উপেজিত হচ্ছেন কেন?’

‘উপেজিত হব না! কী বলছ তুমি! আমাৰ বুকে বসে ওৱা পেৱেক ঠুকবে, সহ্য কৰব? ও- বাড়ি
আমাৰ ছেলেৰ চেয়েও আপন, বাবো ভূতে লুটেপুটে থাবে, আমি দেখব?’

‘আহা, আপনি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, কে ধাকল বা না-ধাকল তাতে আপনাৰ কী দৱকাৱ! শুধু
যদি ওৱা কিছু ভ্যামেজ কৰে তা হনেই লিঙ্গ্যাল অ্যাকশন নেওয়া যেতে পাৱে।’

‘তুমি বলছ আইন আমাৰকে সাহায্য কৰবে না?’

‘ঠিক এই মুহূৰ্তে নয়। যাবা আসছে তাদেৱ সঙ্গে মানিয়ে শুছিয়ে যদি ধাকা যায় তা হলে খারাপ
কী। আপনাৰা একা একা থাকেন, বিপদে-আপদে কাজ দেবে। তা ছাড়া, আপনাৰ মেয়ে তো একদম
নিঃসংস্কৃত, ভাড়াটে যেয়েদেৱ সঙ্গে তাৰ হয়ে গেলে দেখবেন ও খুশি হবে।’

সরিষ্পেখেৱ তুব মেনে নিতে পারছিলেন না, ‘দিনৰাত চ্যাঁ-ভাঁ এই বয়সে সহ্য হবে না।
দেওয়ালে ধূতু ফেলবে, পেসিল দিয়ে লিখবে, আমাৰ বিলিতি বেসিনগুলো ভাঙবে, ওঁ, কী দুর্মতি
হয়েছিল তখন বাজি হয়ে গেলাম।’

‘বালেন-সাধুচৱণ, উঁহু, ব্রাজি না হলে বাড়ি ওৱা জোৱ কৰে নিয়ে নিত। সরকার তা পাবে।
তবে আঙুল কামড়াতে হত।’

কথাটা খেয়াল ছিল না সরিষ্পেখেৱেৱ। সাধুচৱণেৱ দিকে ফ্যালফ্যাল কৰে তাকালেন তিনি।
হঠাতে ওঁৰ মনে হল, ছেলেদেৱ মতো এই বাড়িটাও বোধহয় তাঁকে শেষ বয়সে জুলাবে। সাধুচৱণ
হঠাতে ওঁৰ দিকে মুখ তুলে যিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

জ্ঞ কুঁচকালেন সরিষ্ঠেখর, ‘হাসছ কেন?’

তেমনিভাবে সাধুচরণ বললেন, ‘কথায় আছে রাজাৰ মাও ভিৰ মাণে।’

বুৰাতে পারলেন না সরিষ্ঠেখর, ‘মানে?’

‘বাঃ, আপনাৰ ছেট হেলে থাকতে কোনো চিন্তাৰ মানে হয় না।’

‘ছেট হেলে! প্ৰিয়তোষ?’

‘হ্যাঁ শুনেছি তাৰ কথায় নাকি কংগ্রেসিৱা উঠে বসে। মন্ত্ৰীৰ সঙ্গে খুব ভাব। ও আপনাৰ বাড়িতে এসে থাকেনি?’

সরিষ্ঠেখৰ ঘাড় নাড়লেন, ‘কমিউনিষ্ট ছোড়াৱা ওৱ খৌজে এসেছিল।’

‘তা-ই নাকি! আমি তো শুনে অবাক। কমিউনিষ্ট ছিল বলে ঘৰ ছেড়ে পালাল যে-হেলে তাৰ এখন এত থাতিৰ! জলঞ্চৰেৱ পোজিৱ বিজ্ঞপনেৰ মতো ব্যাপার, যাক, তাকে আপনি বনুন এইসব কথা, সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে যাবে।’

ঘাড় নাড়লেন সরিষ্ঠেখৰ, ‘সে চলে গিয়েছে।’

‘তাকে আসতে লিখুন।’

এতক্ষণ পৰ সরিষ্ঠেখৰেৰ খেয়াল হল প্ৰিয়তোষকে ওৱ ঠিকানার কথা জিজ্ঞাসা কৰা হয়নি। এমনকি সে কোথায় গেল তাৰ বলে যায়নি। হয়তো ভাড়াছড়োয় সময় পায়নি, হয়তো পৰে চিঠি দেবে, কিন্তু সেকথা সাধুচৰণকে বললে কাল সমস্ত শহুৰ জেনে যাবে। হেমলতা হয়তো প্ৰায়ই বলে যে, বাবা, কিন্তু সেকথা সাধুচৰণকে বললে কাল সমস্ত শহুৰ জেনে যাবে। হেমলতা প্ৰায়ই বলে যে, বাবা, আপনাৰ পেট আলগা তাঁকে ফিরিয়ে দেয় সরিষ্ঠেখৰ এখন তাই থীৱে থীৱে ঘাড় নাড়লেন, যেন সাধুচৰণেৰ এই প্ৰস্তাৱটা তাঁৰ খুব মনঃপৃত হয়েছে। কিন্তু রায়কতপাড়াৰ রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেৰার পথে কিছুতেই তিনি ব্যক্তি পাছিলেন না।

আনিমেশ দাদীৰ ব্যাপারটা ঠিক বুৰাতে পারছিল না। সৱকাৰ বাড়িৰ ভাড়া দেবে, কে থাকল বা না-থাকল তাতে কী এসে যাব! ওৱ নিজেৰ খুব মজা লাগছিল। ওদেৱ বাড়িতে নতুন কিছু মানুষ এসে গাকছে, রেডিওতে হিন্দি গান বাজছে, এটা কল্পনায় ছিল না। সরিষ্ঠেখৰ বাইৱেৰ বাৰান্দায় দোড়ানো একজন মহিলাকে ভদ্ৰভাবে বলতে গেলেন যে জোৱ হিন্দি গান বাজলে হেমলতাৰ পুজোআচাৰৰ অসুবিধে হবে, বৱং শ্যামসঙ্গীত কীৰ্তন আৱ খবৰ শুনলে মন ভালো থাকে। কথাটা শুনে মহিলা হেসেই বাঁচেন না, বললেন, ‘দাদু, আপনি কী কী পছন্দ কৰেন না তাৰ একটা লিষ্ট দিয়ে দেবেন। হিন্দি গান ভালো না, বুঝলাম। বৰীন্দ্ৰসংগীত?’

সরিষ্ঠেখৰ সুৱাটা ধৰতে পাৱেননি, ‘বৰি ঠাকুৱেৱ গান?’ না মা, ও বড় প্যানপেনে। ওই এখন যা হয়েছে আধুনিক না ফাধুনিক-ওসব একই ব্যাপার!

মহিলা এত জোৱে হেসে উঠলেন যে, সরিষ্ঠেখৰ আৱ দোড়ালেন না। কথাটা শুনে হেমলতা রাগ কৰতে সাগলেন, ‘কী দৱকাৰ ছিল আপনাৰ গায়ে পড়ে ওসব কথা বলাৰ! নিজেৰ সম্মান রাখতে পাৱেন না।’

সরিষ্ঠেখৰ বললেন, ‘তোমাৰ পূজোৰ অসুবিধে হবে বলেই—’

বাঁবিয়ে উঠলে হেমলতা, ‘আমাৰ জন্মে চিন্তা কৰে যেন আপনাৰ ঘূম হচ্ছে না! আমি কি কিছু বুৰাতে পাৱি না! হিন্দি গানস, বৰীন্দ্ৰসংগীত, এসব তো আপনাৰ চিৰকালেৰ কৰ্ণশূল। নি পৰ্যন্ত রেডিওতে হাত দেয় না তাই।

সরিষ্ঠেখৰ শেষবাৰ ছাড়াৰ চেষ্টা কৰলেন, ‘আমাৰ বাড়িতে মাইক বাজাবে আমি সেটা সহজ কৰবঁ।’

আকাশ থেকে পড়লেন হেমলতা ‘মাইক? বুড়ো বয়সে আপনাৰ কথাৰ্বার্তাৰ যা ছিৱি হয়েছে না! মেঝেটা কী ভালো! বেচাৱাকে মাঝাৰ বুড়ো ভৱেৰ কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে, সাধ-আহাদ কৰাৰ সুযোগ পেল না।’

কথাটা শুনে তাজব হয়ে গেলেন সরিষ্ঠেখৰ, ‘তুমি জানলে কী কৰেঁ?’

‘বাঃ, আপনি যখন বাড়ি ছিলেন না তখন ও তো আলাপ কৰতে এসেছিল, আমাৰ আমেৰ আচাৰ

থেয়ে কী প্রশংসাটাই-না করল!

সরিষ্ণেখৰ মনেমনে বেশ দমে গেলেন। ওঁর আড়ালে বেশ একটা ঘড়্যজ্ঞ চলছে এই বাড়িতে। অনেকদিন থেকেই তিনি হেমলতাকে সদেহ করেন। পরিতোষ বউকে নিয়ে এল এমন সময় যখন তিনি বাড়ি নেই। পরেও এসেছে কি না কে জানে! তিনি তো আৱ সবসময় বাড়িতে থাকেন না! মহীতোষ যখনই আসে তাঁৰ সঙ্গে দুএকটা কথা বলার পৰ রান্নাঘৰে গিয়ে দিদিৰ কাছে চুপচাপ বসে থাকে। কী কথা বলে কে জানে! ইদানীং নাভিটাও তাঁৰ কাছাকাছি দেঁয়ে না, নেহাত প্ৰয়োজনে দুএকটা কথা হয় অৰ্থ দিনৰাত পিসিৰ সঙ্গে ফুসফুস গুজুজ চলছে। প্ৰিয়তোষ আদিন পৰ বাড়ি ফিরল, তাঁৰ সঙ্গে আৱ কটা কথাই-বা হল! হেমলতা অনেক রাঁত অবধি ছোট ভাই-এৱ সঙ্গে গল্প কৰছে এটা টেৰ পেয়েছেন তিনি। সাধুচৰণেৰ কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় বেশ শক্ত গলায় এখন সরিষ্ণেখৰ জিজ্ঞাসা কৱলেন, ‘প্ৰিয়তোষ ওৱ ঠিকানা তোমাকে দিয়ে গেছে, না?’

চট কৰে প্ৰসঙ্গ পালটে বাবা একথা জিজ্ঞাসা কৱায় প্ৰথমে একটু অবাক হয়েছিলেন হেমলতা, তাৱপৰ বললেন, ‘আমাকে দিয়েছে কে বলল?’

সরিষ্ণেখৰ জেৱা কৱাৰ ভঙ্গিতে বললেন, ‘দেয়নি’

আৱ সামলাতে পারলেন না হেমলতা বাবাৰ কৃটচালটা ধৰে ফেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনি আপনাৰ ছেলেদেৰ চেনেন না? এ-বংশৰ ব্যাটাছেলোৱা কোনোদিন মেয়েদেৰ সঙ্গে খোলামনে কথা বলেছে? আমৰা তো যিগিৰি কৱতে এসেছি আপনাদেৱ বাড়িতে।’ কথাটা বলে আৱ দাঁড়ালেন না হেমলতা, হনহন কৰে রান্নাঘৰেৰ দিকে চলে গেলেন। সরিষ্ণেখৰ আৱ কিছু বললেন না। এই মেয়েকে তিনি চটাতে সাহস পান না। আজ সাধুচৰণেৰ যে-দশা সেটা তাঁৰ হলে তেৱািতেও কাটবে না। তাঁৰ জন্য শ্বেশাল ভাত তৱকাৰি থেকে শুক কৰে কফ ফেলাৰ বাবাৰ পৰ্যন্ত ঠিক কৰে দেওয়া হেমলতা ছাড়া আৱ কেউ পাৱবে না। নিজেৰ জনেই চুপচাপ সব হজম কৰে যেতে হবে। নিঃশব্দে লাঠি আৱ টৰ্চ নিয়ে বাড়ি থেকে বেিয়ে গেলেন সরিষ্ণেখৰ। সঙ্গেবেলায় কালীবাড়িৰ বাঁধানো চাতালে বসে আৱতি দেখলে ঘনটা খানিকক্ষণ চিন্তাযুক্ত থাকে, ইদানীং এই সত্যটা আবিষ্কাৰ কৰেছেন তিনি। রাত হলেই বাড়িটা নিয়ম হয়ে যেত। এদিকটায় তিঙ্গৰ চৰ বেশি দূৰে নয় বলেই সঙ্গেৰ পৰ শ্বেয়ালগুলো তাৱবৰে ডাকাড়ি কৰে। নদী যখন টাইট্ৰুৰ হয়ে যায়, এপাৰ ওপৰ হাত মেলায়, তখন শ্বেয়ালগুলো এসে এপাৱেৰ কিছু বোপজঙলে দিব্যি গৰ্ত খুড়ে লকিয়ে থাকে। অনিমেষ দিনদুপুৰে কয়েকটাকে বাগান থেকে তাড়িয়েছে, নেহাতই নেড়িকুভা-মাৰ্ক নিৰীহ চেহাৱা। পিসিমা তো সেই ভুলটাই কৰে ফেললেন। একদিন রাত্তিৰে খাওয়াদাওয়াৱ পৰ বাসন ধূতে গিয়ে দেখলেন, একটা কুকুৰ ধূকতে ধূকতে ওৱ দিকে তাকিয়ে উঠোনে বসে আছে। কী মনে হল, এটোকাটা ছুড়ে দিতে সেটা ভয়ে-ভয়ে শুড়ি মেৰে এগিয়ে এসে খেয়ে গেল। পৰদিনও একই ব্যাপার। আস্তে-আস্তে জীবটাৰ ভয় কমে গেল। উঠোনে আলো কম, ভোল্টেজ এত অল্প যে একশো পাওয়া টিমটিম কৰে, তাৱ ওপৰ হেমলতা চোখে খুবই কম দেখছেন, ঠাওৰ কৱতে পাৱেনি। একদিন সরিষ্ণেখৰকে বললেন কুকুৰটাৰ কথা, বাড়িতে রাত্বে আসে, যখন-তখন চোৱটোৱ আসতে পাৱবে না। অনিমেষও শুনেছিল, সেদিন দেখল। খাওয়াদাওয়াৱ পৰ পিসিমা এঁটোৱ সঙ্গে একটা আন্ত রুটি নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকাৰ কৰে ডাকতে লাগলেন, ‘সিধু, ও সিধু, আয় বাবা, সিধু।’ পিসিমা কুকুৰটাৰ নাম রেখেছেন সিধু। নিজেৰ মৰণেৰ কাচেৰ জানালায় মুখ রেখে কৌতুহলী হয়ে অনিমেষ দেখল কয়েকবাৰ ডাকাৰ পৰ বাগানেৰ জঙ্গলটায় ঝটপট শব্দ হল। তাৱপৰ একটা শ্বেয়াল প্ৰায় দোড়ে পিসিমাৰ সামনে এসে দাঁড়াল। পিসিমা খাবাৰগুলো মাটিতে রেখে দিতেই সে চেটেপুটে যেতে লাগল। বিশয়ে থ হয়ে গেল অনিমেষ। সত্যিই শ্বেয়ালটাৰ চেহাৱাৰ সঙ্গে কুকুৰেৰ যেষেষ মিল আছে, তাই বলে অত কাছে দাঁড়িয়ে পিসিমা ভুল কৰবেন? অনিমেষ ভাৱতে পাৱেনি শ্বেয়ালেৰ এত সাহস হবে। তবে কুকুৰটাৰ রাত্তিৰবেলায় শুধু চুপচাপ আসাটা কেমন ঠেকছিল। পৰদিন যখন ও পিসিমাকে বলল পিসিমা তো বুৰাতে পাৱছি না। তুই আৱাৰ বাবাকে বলিস না। হাজাৰ হোক কৃক্ষেৰ জীব তো, আৱ ডাকলেই কেমন আদুৱে-আদুৱে মুখ কৰে চলে আসে।’ পিসিমা নিজেই যেন স্বত্ব পঞ্জিলেন না ওটা শ্বেয়াল শোনাৰ পৰ থেকে।

এইৱেকম একটা পৰিবেশে নতুন মানুষজন এসে যাওয়ায় সঙ্গেৰ পৰ আৱ নিৰ্জন থাকল না। তবে যা-কিছু আওয়াজ শোবগোল হচ্ছে তা বাড়িৰ ওদিকটায়। নতুন বাড়িৰ দুখানা ঘৰ সরিষ্ণেখৰ নিজেদেৱ জন্য রেখে দিয়েছেন। তাৱ আসা-যাওয়াৰ পথ আলাদা। ভাড়াটোৱা দুটো ফ্ল্যাট কৰে

নিয়েছেন। একটাতে মহিলা আর তাঁর স্বামী, অন্যটায় যিনি থাকেন তাঁর বোধহয় বেশিদিন চাকরি নেই, দেখতে বৃদ্ধ মনে হয়। তাঁর ছেলে আর চাকর আছে। ছেলেটি অনিমেষদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়, সবসময় পাজামা তার শেঁকয়া পাজাবি পরে। আনন্দচন্দ্র কলেজে পড়ে ও, মহিলা এসে পিসিমাকে বলে শিখেছেন। পিসিমার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে গেছে ওঁর। আজ বিকেলে অনিমেষের সঙ্গে আলাপ হতে উনি জোর করে ওকে ওদের ঘরে নিয়ে গেলেন।

মহিলার নাম জয়া, ঘরে চূকেই তিনি বললেন, ‘আমাকে তুমি জয়াদি বলে ডাকবে ভাই। আমার কর্তৃর দিকে তাকালে অবশ্য আমাকে মসিমা বলতে হয়, তোমার কী ইচ্ছে করছে?’

অনিমেষ হেসে বলল, ‘আমার কোনো দিনি নেই, আমি দিনি বলব।’

বসবার ঘরে পা দিয়ে সত্যি মজা লাগছিল ওর। এই ঘরগুলো কদিনে জববর তোল পালটেছে। সুন্দর বেতের চেয়ার, দেওয়ালে একটা বিরাট ঝরনার ক্যালেভার আর মন্ত বড় একটা বুককেস-তাতে ঠাসা বই।

জয়াদি বললেন, ‘তুমি কোন ক্লাসে পড়?’

অনিমেষ গবেষ সঙ্গে উত্তরটা দিল।

‘ও বাবা, তা হলে তো তোমাকে খুব পড়তে হচ্ছে, আমি ডেকে আনলাম বলে পড়ার ক্ষতি হল না?’

‘না না। আমি বিকেলবেলায় পড়তে পারি না তো।’

‘তুমি কারও কাছে প্রাইভেট পড়?’

‘আগে পড়তাম। টেক্টের পর কোচিং ক্লাসে ভরিত হব।’

‘তোমার বই পড়তে তালো দাগে?’

‘বই,-পড়ার বই?’

‘তুঁ পড়ার বই, গঞ্জের বই, কবিতার বই।’

‘পড়ার বই-এর মধ্যে অফটা আমার একদম তালো লাগে না। আমি চার রাকমের অক্ষ খুব তালোভাবে শিখেছি, যে-কোনো প্রশ্নই আসুক শুধু তা দিয়েই চল্লিশ নম্বর পেয়ে যাই।’

‘তা-ই নাকি! যা!’

‘সত্যি! সরল, চলিত নিয়ম, ল. সা. ও., গ. সা. ও. আর সুন্দের অক্ষ।’

জয়াদি শুনে শুন করে হেসে উঠেছেন। তারপর বললেন, ‘আমি তোমার সব খবর জেনে নিছি বলে কিছু মনে করছ না তো?’

‘না।’

‘আচ্ছা, এবার বলো গঞ্জের বই কী কী পড়েছে?’

অনিমেষ একপলক চিন্ত করে নিল, ‘বঙ্গিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, বিষ্঵ক্ষ, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম। নীহারঞ্জন শুণের কালো ভ্রমর—’

সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি জয়াদির। হাসতে হাসতে বললেন, ‘তুমি কালো ভ্রমর পড়েছে? ওঃ, দারুণ না? দস্যু মোহনঃ ও বাবা, তাও পড়েছ। কিন্তু শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি, আয় একশো বছর বাগে বঙ্গিমচন্দ্র যেসব বই লিখেছেন সেগুলোকে আমরা বলি অমর সাহিত্য। অমর মানে যা কোনোদিন পুরনো হয় না। আর কালো ভ্রমর হচ্ছে আইসক্রীম খাওয়ার মতো, ফুরিয়ে গেলেই শেষ। তাই কখনো আনন্দমঠের সঙ্গে কালো ভ্রমরের নাম একসঙ্গে কোরো না। তা হলে বঙ্গিমচন্দ্রকে অশ্রদ্ধা করা হয়।’

এভাবে কেউ তাকে লেখকদের চিনিয়ে দেয়ানি, অনিমেষ জয়াদিকে আরও পছন্দ করে ফেলল, ‘আমাকে এখান থেকে বই পড়তে দেবেন?’ আঙুল দিয়ে ও বুককেসটাকে দেখাল।

‘নিয়ন্ত্রিই, কিন্তু আর-কাউকে দেবে না। বই অন্যের হাতে গেলে তার পা গঁজিয়ে যায়। ঠিক আছে, আমি তোমাকে বই বেছে দেব। প্রথমে বঙ্গিমচন্দ্রের সব বই তুমি পড়বে, তারপর শরৎচন্দ্র—।’

‘আমি শরৎচন্দ্রের রাখের সুমতি পড়েছি।’ অনিমেষ মনে করে বলল।

‘আছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ পড়া হয়ে গেলে তোমার সব পড়া হয়ে যাবে।’

‘রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা আমার মুখস্থ। ভীষণ ভালো, না?’

‘যত বড় হবে তত ভালো লাগবে। কিন্তু তুমি পড়বে কখন, তোমার তো স্কুলে পড়ার চাপ এখন?’

একটুও দেরি করল না অনিমেষ, ‘বিকেলবেলায় পড়ব। এখন থেকে আর বিকেলে খেলতে যাব না, খেললে রাত্রে পড়ার সময় ঘৃণ আসে।’

বেশ তা হলে বিকেলে এখানে বসে আরাম করে পড়বে, রোজ বাড়িতে নিয়ে গেলে পড়ার বই—এর তলায় গল্পের বই লুকিয়ে রাখবে, পড়া হবে না।’

অনিমেষ হেসে ফেলল, ‘আমি কাল একটা বই কিছুতেই ছাঢ়তে পারছিলাম না বলে ওরকম করে পড়েছি। দাদু অঞ্জের জন্য ধরতে পারেননি।’

‘কী বই সেটা?’

‘পথের পাঁচালী। এখন যে-সিনেমাটা হচ্ছে রূপগ্রীতে, সেই বইটা। ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে এনেছি। তুমি পড়েছ?’

হঠাতে যে ও তুমি বলে ফেলেছে অনিমেষ নিজেই খেয়াল করেনি। জয়াদি আন্তে-আন্তে বলল, দুর্গাকে তোমার কেমন লাগে?’

মুহূর্তে বুক তার হয়ে গেল অনিমেষের, ‘দুর্গার জন্য আমি কেঁদে ফেলছিলাম, ওঃ, কী ভালো। আর জান, পড়তে-পড়তে নিজেকে অপু বলে মনে হয়।’

জয়াদির সঙ্গে রিকশায় যেতে-যেতে অনিমেষ বইটা যে পথের পাঁচালী তা জানতে পারল। আজ শেষ পো, কাল রবিবার থেকে অন্য বই। উচ্চবারি থেকে এখানে নতুন ছবি দেখানো হয়, কিন্তু এবার কিছু গোলমাল হয়ে যাওয়ায় পুরনো ছবিটা থেকে গেছে। হলের সাথে এসে দাঁড়াতেই তপুপিসি আর ছেটকাকার কথা মনে পড়ে গেল ওর। তপুপিসির সঙ্গে জয়াদির অনেক মিল আছে। জয়াদিও যেটুকু নইলে নয় তার বেশি সাজে না। অনিমেষ দেখে যাকে ভালো লেগে যায় তার সঙ্গে সবসময় ভালোলাগা মানুষগুলোর অঙ্গুত্ব একটা মিল পাওয়া যায়।

জয়াদি এবং অনিমেষ পাশাপাশি বসে ছবিটা দেখল। হবে আজকে একদম দর্শক নেই। অনেকদিন বাদে সিনেমা দেখতে এল অনিমেষ। মূল ছবির আগে গর্ভর্মেন্টের বাবি দেখাল, তাতে জওহরলাল নেহরু, বিধানচন্দ্র রায়কে দেখতে পেল ও। একবার গাঙ্গীজিকে এক হয়ে গেল তার অজান্তে। তারপর দুর্গা মারা যেতে সেই বৃষ্টির রাত্রে ছাদের ঘরে শয়ে-থাকা মাধুবীর মৃত্যুটাকে দেখতে পেল ও। সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁটে উঠল অনিমেষ। ওর সারা শরীর থরথর করে কাপতে লাগল। জয়াদির একটা হাত ওর পিঠে এগে নামল, ‘এই, কেঁদো না, এটা তো সিনেমা, সত্যি নয়।’

অনিমেষ বুঝতে পারল কথা বলার সময় জয়াদির গলার দ্বর জড়িয়ে যাচ্ছে, জয়াদি কোনোরকমে কানাটাকে চেপে যাচ্ছে।

ছবি শেষ হবার পর গঞ্জির হয়ে গেল অনিমেষ। ওর মনে হল ও যেন নিজের কখন অপু হয়ে গিয়েছে। জয়াদিও আর কোনো কথা বলছেন না। সঙ্গে হবার অনেক আগেই ওরা রিকশায় চেপে বাড়িতে পৌছে গেল। পথের পাঁচালী সদ্য—সদ্য পড়া ছিল অনিমেষের, তার ওপর এই ছবি দেখা, দুই-এ মিলে অঙ্গুত্ব একটা প্রতিক্রিয়া ওঁ হয়ে গেল ওর মন্দে। যা বক্ষিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র এমনকি রবীন্দ্রনাথ পারেননি, বিভূতিভূষণ সেটা সহজে যেন পেরে গেলেন। অনিমেষের বুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ও যদি কখনো কলকাতায় যেতে পারে তা হবে বিভূতিভূষণের কাছে গিয়ে চৃপ্তাপ বসে থাকবে।

দিতীয় ভাড়াটের ছেলেটিকে অনিমেষ কয়েকবার দেখেছে, বুব ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে অথবা চুকচে, কিন্তু আলাপ হয়নি। জয়াদির সঙ্গে ওদের আলাপ নেই এটা বুঝতে পেরেছে অনিমেষ, ওদের বাড়িতে মহিলা নেই বলেই বোধহয়। জয়াদির স্বামী খুব গঞ্জির। ওকে দেখলে ‘কেমন আছ’, ‘বসো’, এর বেশি কোনো কথা বলেন না। না বলে দিলে উনি যে জয়াদির স্বামী বোবা মৃশকিল। মাথার চুল সব পাকা, চোখে খুব পাওয়ারওয়ালা কালো ফ্রেমের চশমা। বরং অন্য ভাড়াটে, যিনি ওই ছেলেটির বাবা, তাঁকে খুব ভালোমানুষ মনে হয়। দাদু যখন ঐতার অভিযোগ করে যান তখন চৃপ্তাপ মাথা নেড়ে শোনেন। রিটায়ার করার সময় হয়ে গেছে ওঁর, মাথায় একটাও চুল নেই।

তা ছেলেটার সঙ্গে অঙ্গুত্বাবে আলাপ হয়ে গেল ওর। একদিন বিকেলে ও স্কুল থেকে ফিরেছ

এমন সময় দেখল গেটে পিয়ন দাঁড়িয়ে, হাতে একটা পার্সেল। ওকে দেখতে পেয়ে পিয়ন জিঞ্চাসা করল, ‘আজ্ঞা, সুনীল রায় বলে কেউ থাকে এখানে?’

‘সুনীল আচর্য?’ অনিমেষ এরকম নামের কাউকে চিনতে পারল না, ‘না তো!’

‘কী আচর্য! দুদিন ধরে ঘুরছি, হামিপাড়া নিয়ার টাউন ফ্লাব। একটু আগে একটা ছেলে বলল, এই বাড়িতে হবে। অচেনা লোকের নামের আগের কেয়ার অফ দেয় না কেন? যেন সবাই বিধান রায় হয়ে গেছে!’ বিরক্ত হয়ে পিয়ন চলে যাচ্ছিল।

খুব হতাশ হল সুনীল, ‘কী আচর্য! আজ্ঞা, তুমি এখানে বসো।’ হাত দিয়ে বিছানার একটা দিক দেখিয়ে দিল ও। অনিমেষ বসতে এই তিনটে ওর সামনে রেখে বলল, ‘সুকান্ত হল কবি, নবজাগরণের কবি। ওর কবিতা পড়লে রক্ত টগবগ করে ওঠে। আমাদের এই ভাঙচোরা সমাজ, বুর্জোয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কবিতা লিখেছে।’ সুনীল বলল, ‘ওনবে শেষ চারটে লাইন?’

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, ওর খুব কৌতুহল হচ্ছিল। সুনীল কেমন অন্যরকম গলায় কবিতা পড়ল,

‘এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রঙে রঙিন ধান,
দেখবে সকালে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ করে বাংলা দেশের প্রাণ।’

তারপর চোখ বন্ধ করে বলল,

‘কবিতা তোমায় দিলাম ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদাময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো ঝুটি।’

‘এরকম কবিতা এর আগে শুনছে? কবিতা বলতে তো বোঝ প্যানপেনে টাঁদফুল আর প্রেমের ন্যাকামি। প্রেম সম্পর্কে সুকান্ত কী লিখেছে শুনবে?’

‘হে রাজকন্যে
তোমার জন্যে
এ জনারণ্যে
নেইকো হাঁই-
জানাই তাই।’

অনিমেষ ক্রমশ চমৎকৃত হচ্ছিল। এ-ধরনের কবিতা ও আগে শোনেনি। খুব সাহস করে সে বলল, ‘উনি কি কমিউনিস্ট?’

হঠাৎ মুখের চেহারা পালটে গেল সুনীলের। খুব শক্ত গলায় সে বলল, ‘শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে যদি কমিউনিস্ট হতে হয় তিনি কমিউনিস্ট। একদল মানুষ ফুলেকেঁপে ঢোল হবে আর কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে শুকিয়ে মরবে—এরকম সমাজ্যবস্থা তিরিদিন চলতে পারে না। সুকান্ত তাই বলেছে, জন্মেই দেখি, ক্ষুঁক বন্দেশভূমি। কথাটা এই স্বাধীনতার পওে সত্যি।’

অনিমেষের একথাগুলো শুনে চট করে সদ্যাপড়া রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা যানে পড়ে গেল, রাজার হস্ত করে সমস্ত সোৎসাহে যে-বইটা ওকে দিল তার নাম ‘ছাড়পত্র’।

সুনীলের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল অনিমেষের। বয়সে বড় বলে সে ওকে সুনীলদা বলে ডাকে। জয়াদি ব্যাপারটা তালো করে শুনে বলল, ‘বাঃ, বেশ ছেলে তো! আমাদের সঙ্গে কথা বলে না তো, তাই জানতাম না।’ কিন্তু এর চেয়ে বেশি কৌতুহল প্রকাশ করল না।

জয়াদির কথা সুনীলদাকে বলতেই সুনীলদা বলল, ‘হ্যা, ওকে দেখেছি। মহিলাকে সঙ্গে মপ্যোজনে কথা বলি না।’

অনিমেষ সুকান্তের পর গোর্কির মা পড়ে ফেলল। সুনীলদা ওকে বুঝিয়েছে, ‘পৃথিবীতে মানুষের যাত্র দুটো শ্রেণী আছে। একদল শোষক অন্যদল শোষিত। শোষকের হাতে আছে সরকার, মিলিটারি, পুলিশ। শোষিতের সম্বল ক্ষুধা, বঞ্চনা, তাঙ্গি আজকের স্লোগান দুনিয়ার শ্রমিক এক হও। ভিয়েতনাম,

କିଟ୍ଟବା, ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶଗୁଲୋ ଆଜ ମାନୁଷେର ଅଧିକାର ଆଦାୟ କରତେ ଲଡ଼େ ଯାଛେ । ଭାରତବର୍ଷକେ ଓଦେର ସଂଘାମେର ଶାମିଲ ହତେ ହବେ । ଇଂରେଜ ଚଲେ ଯାବାର ପର ତାଦେର ସ୍ନେହେ ପୁଷ୍ଟ କିଛୁ କଂଠେସି ସରକା' ହାତେ ପେଯେଛେ । ସାଧାରଣ ମାନୁସ ଏଥନ୍ତି ଏଦେଶେ ଝିତୁପୁଜୋ କରେ, ତାରା ଜୁହୁରଲାଲେର ଡଖାମିତେ ଭୁଲବେଇ । କଂଠେସର ଏକଟା ନକଳ ଇତିହାସ ଆଛେ ଯାର ଫୁଲେ ଜେଲାସ୍ୟ ସାଧାରଣ ମାନୁସ ଏମନ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଏତଦିନ କଂଠେସ ଯା ଇଛେ ତା-ଇ କରତେ ପେରେଛେ! କିନ୍ତୁ କଂଠେସ ତୋ ଦାଲାଲମାତ୍ର । ଆସିଲେ ଏହି ଦେଶ ଶାସନ କରେ କ୍ୟେକଟା ଫ୍ୟାମିଲି । ତାରାଇ ଦେଶର ଟେଟାଲ ଇକନମିତେ କବଜା କରେ ବସେ କଂଠେସକେ ଶିଖଷ୍ଟା କରେ ଯା ଇଛେ କରଛେ ।

ଅନିମେସ ଲକ୍ଷ କରେଛେ ସୁନୀଲଦା ଯେ-କଥା ବଲେ ଛୋଟକାକା ଠିକ ସେ-ଧରନେର କଥା ବଲତ ନା । ଛୋଟକାକା ସେଇ ସମୟ ଯେରକମ ଛୁଟାଡ଼ା ଛିଲ ସୁନୀଲଦା ତା ନାୟ । ଛୋଟକାକାର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ବିକ୍ଷୋଭ ଛିଲ ଠିକଇ, କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲଦାର ଯତେ' ଏତ ପରିଷାରର ଧାରନା ଛିଲ ନା । ସୁନୀଲଦାକେ ଓର ଅନେକ ସମସ୍ତଦାର ମନେ ହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ସେ-ସମୟକାର ଛୋଟକାକାକେ ଓ ଶ୍ପଷ୍ଟ ମନେ କରତେ ପାରେ ନା, ସ୍ଥା ଇମ୍ବେ ଆଜାଦି ଝୁଟୀ ହ୍ୟାୟ ଛାଡ଼ା । ମୁଖ୍ୟ ଯେବେ କଥା ବଲେଛେ ନିଶ୍ଚିଥବାବୁ, କାଜେର ସମୟ ତାର କୋନୋଟାର କଥା ମନେ ରାଖେନି । ସୁନୀଲଦା ଓକେ ସବଚେଯେ ବଡ଼ ଧାଙ୍କ ଦିଯେଛେ, ସେଟା ଜନ୍ମଭୂମି ନିଯେ । ନିଶ୍ଚିଥବାବୁ ବଲେଛେନ, ଜନ୍ମଭୂମିଇ ହଲ ଯାଯେର ବିକଳ । ଜନ୍ମଭୂମିକେ ଭାଲୋ ନା ବାସଲେ ମାକେ ଭାଲୋବାସା ଯାଇ ନା ।

ସୁନୀଲଦା ବଲଲ, 'ସ୍ଵାଧୀନଭାବ ପର ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନୁସ ପାକିସ୍ତାନ ଥେକେ ଏଦେଶେ ଚଲେ ଏଲ ତାଦେର ଜନ୍ମଭୂମି ଉପାରେଇ ପଡ଼େ ରଇଲ । ଏଦେଶେ ଏମେ ତାରା ଦେଶଥେମ ଦେଖାତେ ପାରେ ନା ନିଚବ୍ବଇ । ପଢିଯବାବାଳୀ ତାଦେର ଜନ୍ମଭୂମି ନାୟ, ଯେ-ମାନୁସଗୁଲୋ ନିଜେର ଜନ୍ମଭୂମିତେ ଲଡ଼ାଇ କରେ ନା ଥେକେ ପାଲିଯେ ଏଲ ବାଁଚାର ତାଦିଗେ ଭୂମି କି ତାଦେର ଶନ୍ଦା କରବେ' ।

ଅନିମେସ ବଲଲ, 'କିନ୍ତୁ ଓରା ତୋ ସବାଇ ବାଂଲାଦେଶେର ଲୋକ । ତା ହଲେ ଏଟାଓ ଓଦେର ଜନ୍ମଭୂମି ।'

ସୁନୀଲଦା ବଲଲ, 'ଠିକ ତାଇ । ଆସରା ଆରା ବଡ଼ କରେ ଭାବି । ଆମାଦେର ଜନ୍ମଭୂମି ଗୋଟା ପୃଥିବୀଟା ।' ତାରପର କିଛିକଣ ତୁପ କରେ ଥେକେ ବଲଲ, 'ତୁମି ଯେ-କଥା ବଲଛ ତା ସ୍ଵାଧୀନଭାବ ଅନେକ ଆଗେ ବଲା ହତ । ବିକିମଚନ୍ଦ୍ରର ସେ-ଯୁଗେ ପ୍ରୋଜନ ଛିଲ ହ୍ୟାତୋ, ଏଥନ ତିନି ବ୍ୟାକଡେଟେ ହ୍ୟେ ଗେଛେନ । ଏଥନ ଏତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନା । ତଥନ ଛିଲ ଇଂରେଜଦେର ବିରକ୍ତ ଲଡ଼ାଇ, ଏଥନ ନିଜେଦେର ସଙ୍ଗେ ନିଜେଦେର ସଂଘାମ ।'

ଜଳପାଇଣ୍ଡି ଶହରେ ବାମପର୍ବତୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧ ହିସେବେ ଜୌଡ଼ିଆ କମିଉନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଶି ଏସ ପିର ମଧ୍ୟେ ବେଶ ଏକଟା ରେଷାରେବି ଆଛେ । ସୁନୀଲଦା ଏହି ଦୁଟୀ ଦଲର ସଙ୍ଗେଇ ପରିଚିତ, ତବେ ଅନିମେସର ମନେ ହେଁ, ଓ କମିଉନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସଙ୍ଗେ ବେଶ ମୁକ୍ତ । ଖୋଲାଖୁଲି କଥା ବଲେ ନା କଥନେ । ମାଝେ-ମାଝେ ବେଶ କଦିନେର ଜନ୍ମ ଉଥାଓ ହ୍ୟେ ଯାଇ । ଏବାର ଫିରେ ଏସେ ବଲଲ, 'ତୋମାଦେର ଚା-ବାଗାନେର ନାମ ସ୍ଵର୍ଗଛେଡ଼ା?'

ଅନିମେସ ବଲଲ, 'ହ୍ୟା ।'

ସୁନୀଲଦା ହେସ ବଲଲ, 'ଓଖାନେଇ ଛିଲାମ ଏହି କଯଦିନ ।'

ବେଶ ଅବାକ ହଲ ଅନିମେସ । ସ୍ଵର୍ଗଛେଡ଼ାଯ ଓର କେଉ ଥାକେ ସେଟା ବଲେନି ତୋ କଥନେ ।

'କାର ବାଡ଼ିତେ ଛିଲେ ।'

'ଏକଜନ ଶ୍ରମିକନେତାର ।'

ଆରା ଅବାକ ହ୍ୟେ ଗେଲ ଅନିମେସ, ସ୍ଵର୍ଗଛେଡ଼ାଯ କଥନେ କୋନୋ ଶ୍ରମିକନେତା ଛିଲ ନା । ଓ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲ, ଓର ନାମ କୀ?

'ଜୁଲିଯେନ । ବେଶ ଶିକ୍ଷିତ ଛେଲେ । ଚା-ବାଗାନେର କର୍ତ୍ତ୍ତପକ୍ଷ ଓକେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାକା ସବ୍ରେଓ ବାବୁଦେର ଚାକରି ଦେଇନି । ସେଇ ମୂଳକରାଜ ଆନନ୍ଦେର ଯୁଗ ଏଥନ୍ତି ଚଲେ ଆସିବ ଦେଖଲାମ ।'

ମୂଳକରାଜ ଆନନ୍ଦେର ନାମ ଏର ଆଗେ ଶୋନେନି ଅନିମେସ । କିନ୍ତୁ ତୁରୁ ସର୍ଦାରେର ଛେଲେ ମାଝରା ଯେ ଏଥନ ଶ୍ରମିକନେତା କଲ୍ପନା କରତେ ଓର କଟ ହେଁ ।

ଅନିମେସ ଚେହାରା ପାଲଟେ ଯାବେ ।

ସୁନୀଲଦା ବଲଲ, 'କୀ ଆର୍ଚର୍, ଭୂମି ବାଗାନେ ଛିଲ ଆର ଦେଖନି? ବାଗାନେର କୁଲିଦେର ମାନୁଷେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଓଯା ହ୍ୟା? ଗର୍ଭ-ଛାଗନେର ମତୋ ବାଡ଼ିତେ କାଜ କରାନୋ ହ୍ୟା ନା? କୀ ବେତନ ପଯା ଓରା? ଥାକାର ଜାଯଗା

ଶୌଯାଡ଼େର ଚେଯେ ଅଧିମ !

କଥାଗୁଲୋ ଶୁଣତେ ଶୁଣତେ ଅନିମେଷ ଆଜ ଏତଦିନ ପରେ ଚୋଥେ ଦେଖେ ସମ୍ମେ-ସାଓୟା ସତ୍ୟଟାର ଅର୍ଥ ଆବିକାର କରିଲ । ସୁନୀଲଦା ଯା ବଲେଛେ ତା ମିଥ୍ୟ ନୟ, ଅର୍ଥଚ ଏତଦିନ ଓହାମେ ଥେକେ ଓର କାହେ ଏଟା ଏକଟୁଓ ଅନ୍ୟାଯ ବଲେ ମନେ ହୟନି ।

ଅନିମେଷ ବଲଲ, ‘ଆମୋଳନ ହବେ ?’

‘ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଇ’ ସୁନୀଲଦା ବଲଲ । ତାରପର ଏକଟୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗଲାଯ ଜୁଡ଼େ ଦିଲ, ‘କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ଏହି ବାମପଣ୍ଡି ପାର୍ଟିଗୁଲୋ ଯେରକମ ଶ୍ଵରକଗତିତେ ଚଲଛେ ତାତେ କୋନୋ କାଜ ହବେ ନା । ଏଦେଶେ ଏଭାବେ କୋନୋଦିନ ବିପ୍ଳବ ଆସବେ ନା । ଭିକ୍ଷେ କରେ ଅଧିକାର ପାଓୟା ଯାଯେ ନା ।’

ଅନିମେଷର ଏତଦିନ ବାଦେ ଖୁବ ଇଚ୍ଛେ କରାଇଲ ସର୍ବାଞ୍ଜିତ୍ତା ଗିଯେ ବ୍ୟାପାରଟା ଦେଖତେ । ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଏକଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଇ ହୟ ଗେହେ ଓହାମେ । ଏକଟା ମଜାର ବ୍ୟାପାର ମନେ ପଡ଼େ ଗେହେ ଏରକମ ଭଙ୍ଗିତେ ସୁନୀଲଦା ବଲଲ, ‘ଜାନ, ଆସବାର ସମୟ ଦେଖିଲାମ କିନ୍ତୁ କଂଖେସି ଧନି ଦିଛେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମାତରମ୍ । ଠିକ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦେର ନକଳ କରେ । ଓଦେର ଆର ନିଜିଷ୍ଵ ବଲେ କିନ୍ତୁ ଥାକଲ ନା ।

ଜଳପାଇଗୁଡ଼ି ଶହରେ ଶିରାରଟାକେ ଆଟେପ୍ରତ୍ତେ ବାଂଧିବାର ତୋଡ଼ାଜୋଡ଼ ଶୁରୁ ହୟ ଗେଲ । ଓଥାରେ ଟାଂଦମାରି ଥେକେ ଏଧାରେ ରାଯକତପାଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ ତିର୍ତ୍ତାର ଗୀ-ମେଷେ ଦିନରାତ କାଜ ଚଲାଇ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହର ନିୟମିତ ବନ୍ଦ୍ୟର ହାତ ଥେକେ ଶହର ବାଁଚବେ, ଦଲ ବୈଧେ ମାନୁଷେରା ଆସି ବାଁଧ ଗାଁ ଦେଖତେ । ପ୍ରତ୍ୟାମର ପଡ଼ିଛେ, ବଢ଼ ବଢ଼ କାଠେର ବିମକେ ବାଲିର ଭେତରେ ଠୁକେ ଢିକିଲେ ଦେଉୟାର କାଜ ଚଲାଇ ସାରାଦିନ । ମାନୁଷେରା ଏକଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତା, ଯଦିଓ ଗତ ଦଶ ବହରେ ମଧ୍ୟ ଏକବାରଇ ଶୁଷ୍କ ବଡ଼ସଡ଼ ବନ୍ଦ୍ୟ ହୟେଇଲି ତବୁ ତିର୍ତ୍ତାକେ କେଉ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନା ।

ବାଂଧରେ କାଜ ଶୁରୁ ହବାର ପର ଜଳପାଇଗୁଡ଼ିର ଛେଲେମେଯେଦେର ଏକଟା ବେଡ଼ାବାର ଜାୟଗା ଜୁଟେ ଗେଲ । ଏମାନିତେ କୋନୋ ପାର୍କ ନେଇ ବା ଶହରେ ମଧ୍ୟେ ଯେ-ଖେଳାର ଯାଠଗୁଲୋ ମେଖାନେ ଅଲ୍ଲବସାସ ଛେଲେମେଯେରା ସାହସ କରେ ବସତେ ପାରେ ନା । କାରଣ ଏହି ଶହରେ ମାନୁଷ ପରମ୍ପରକେ ଏତ ଚେନେ ଯେ, ଶୋଭନତାର ବେଡ଼ା ଡିଙ୍ଗାନୋ ଅସ୍ତର । ତବୁ ରାଯକତପାଡ଼ାର ଛେଲେ ସାହସ କରେ ବାବୁପାଡ଼ାର ମେଯେର ସଙ୍ଗେ ମାସକଳାଇବାଡିର ରାତ୍ତ୍ୟାର ପାଂଚ ମିନିଟ ହେଠେ ଆସେ କଥିନୋ-ସଥନୋ । କିନ୍ତୁ ତାଇ ନିଯେ ଧୂର୍ମାର କାଣ ଶୁରୁ ହୟ ଯାଯ । ଦେଖା ଯାଯ ମୋଟାୟୁଟି ଏକଟି ସୁନ୍ଦରୀ ବାଲିକାର ପ୍ରତି ଶହରେ ଏକବିଧିକ କିଶୋର ଆକ୍ଷଟ । ଏବଂ ତାର ପ୍ରୋଜନମତେ ଦୁଟୋ ଶିବିରେ ବିଭଜ । ଏହି ଦୁଟୋ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରେ ଥାକେ ଶହରେ ଦୁଇ ମାତ୍ରାନ, ରାଯକତପାଡ଼ାର ଅନିଲ ଦ୍ୱାରା ପାଦାପାଡ଼ାର ସାଧନ । ଏରା ଅବଶ୍ୟ କନ୍ଦାଚିତ୍ତେ ମୁଖୋମୁଖୀ ହୟ, କିନ୍ତୁ ଯଥିନ ହୟ ତଥନ ଶହରେ ପୁଲିଶବାହିନୀର ହୃଦକଳ୍ପ ଶୁରୁ ହୟ ଯାଯ । ବିରାଟ ଦୁଟୋ ବାହିନୀ ହାତେ ହାନ୍ତର, ଶୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲାଟି ନିଯେ ବୀରଦର୍ପେ ରାତ୍ରା ଦିଯେ ପ୍ରାୟ ଯିଛିଲେ କରେ ଏଗିଯେ ଯାଯ । ଆଗ୍ରେୟାନ୍ତ୍ର ବା ବୋମାର ବ୍ୟବହାର ହୟ ନା । ତବେ ଏଟା ଖୁବ ଆର୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, ଏହି ଦୁଇ ମାତ୍ରାନ ଏବଂ ତାଦେର ଅର୍ଥମ ସାରିର ଶିଥ୍ୟରା ରାଜନୈତିକ ସଂଶ୍ରମ ଥେକେ ଦୂରେ ଥାକେ । ତାଦେର ଏଥିନ ଅବଧି କୋନୋ ରାଜନୈତିକ ଦଲେର ହୟେ ମାରାମାରି କରାତେ ଦେଖା ଯାଇନି । ବାଁଧ ତୈରି ହେୟାର ପର ଥେକେ ଏରା ଆୟଇ ତିର୍ତ୍ତାର ପାଡ଼-ଘେମେ ତହଳ ଦିଛେ ସଙ୍କେନାଗାଦ । କାରଣ ଯେହେତୁ ଏହି ଅଖଳଟା ଶହରେ ବାହିରେ ଅପ୍ରେକ୍ଷକ୍ରତ୍ତ ନିର୍ଜନ ଜାୟଗାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞନ କାଠ ଓ ବୋନ୍ତାରେ ବୋକାଯ ହୟେ ଥାକେ, ପରମ୍ପରେର ସାନ୍ତିଧ୍ୟ ପାଓୟାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା ନଦୀର ଶୀତଳ ବାତାସ ପାଥରେର ଆଡ଼ାଲେ ନିଜେଦେର ଲୁକିଯେ ରେଖେ ଉପଭୋଗ କରାତେ ପଚନ୍ଦ କରାଇ ।

କଂଖେସ ଅଫିସେ ଏହି ନିଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ । ନାଗରିକରା ସହନେ ପଚନ୍ଦମତେ ଜାୟଗାଯ ଯୋରାଫେରା କରାତେ ପାରହେ ନା-ଏଟା ଚଲତେ ଦେଓଯା ଯାଯେ ନା । ଅବଶ୍ୟ ସାଧନ ଏବଂ ଅନିଲ କଥନୋ ଘଟନାହୁଲେ ଯାଇନି । ଏରା କଯେକବାର ଜେଲେ କାଟିଯେ ଏମେହେ ଏବଂ ଏଥନ ବୈଶି ବାମେଲା ପଚନ୍ଦିତ କରାଇ ନା । ଥାନାର ବଡ଼ବାବୁ ତିର୍ତ୍ତାର ପାଡ଼େ ମେପାଇ ମୋତାରେନ କବେହେଲ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧାର ପର ମେହ ବିତ୍ତିର୍ ଏଲାକାଯ ତାଦେର ଥୋଜ ପାଓୟା ମୁଶକିଲ । ଫଳେ ନିତ୍ୟନ୍ତଳ ହାଶମା ଲେଗେଇ ଆଛେ । ଶହର ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ତୁଳ କେଜ୍ଜାର ଖବର ପେଯେ ଜମଜମାଟ ହୟ ଥାକେ ।

ବାଁଧ ତୈରି ଆରାଷ୍ଟ ହେୟାର ସବଚେଯେ ଅସ୍ମବିଧେ ହେଲେ ସରିଦୁଶେଷକରେର । ମେହ କାକଭୋରେ ଲାଟି ମୁଲିଯେ ତିର୍ତ୍ତାର ନିର୍ମଳ ବାତାସେ ତିନି ହନହନ କରେ ହେଠେ ଯେତେ ପାରହେନ ନା । ପ୍ରାତିଦିନ ବନ୍ଦ ହଲେ ଆୟୁ ସଂକଷିତ ହେବେ, ଏରକମ ଏକଟା ଧାରଣା ଥାକାଯ ତିନି ଏଲୋପାତାଡି ଶହରେ ପଥେ ଘୁରେ ଆସେନ । ଇଦାନୀଁ ଅର୍ଥଚିତ୍ତା ବେଦେହେ ତାଁର । ବାଡି ଭାଡା ଦିଯେହେଲ ଦୁଇ ମାସ ହୟେ ଗେଲ ଅର୍ଥଚ ପ୍ରେସା ପାଛେ ନା । ସରକାରେର ହାଜାରରକମ ନିୟମାକାନ୍ତରେ ଜୁଟ୍ ଛାଡ଼ିଯେ ତାଁର କାହେ ପ୍ରେସା ହୟେ ଗେଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରେସା ପାଛେଲା ନା ।

সরকারের হাজাররকম নিয়মকানুনের জট ছাড়িয়ে তার কাছে পয়সা আসতে দেরি হচ্ছে। হেমলতার নামে জমানো টাকা প্রায় শেষ। এদিকে মিউনিসিপ্যালিটি জলের প্রেশার কমিয়ে দেওয়ায় ওপরের ট্যাঙ্কে জল উঠেছে না। ফলে হেমলতা তো বটেই, ভাড়াটোও অনুমোগ করছে।' জয়ার স্বামী তো সেদিন বলে দিলেন, 'একটা-কিছু ব্যবস্থা করুন।'

হেমলতা অনিকে স্কুলের ভাত দিচ্ছিলেন, হস্তদত্ত হয়ে বারান্দায় এসে বললেন, 'কে টাকা পাঠিয়েছে, খ্রিঃ আপনি নিলেন?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন সরিষ্ণেখর, 'মাথা-ব্যারাপ! আমি কি ভিখিরি!'

হেমলতা বললেন, 'ঠিক করেছেন। বাবা, আপনার ছেলেরা কোনোদিন আপনাকে শাস্তি দেবে না।' সরিষ্ণেখর আর দাঢ়াতে পারছিলেন না, বারান্দায় বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। হঠাৎ তার সবকিছু ফাঁকা বলে মনে হতে লাগল। শুধু আলোচাল খেয়ে হেমলতা অস্ত থেকে পেটের যাবতীয় রোগ পেয়েছে বলে তিনি জানতেন, কিন্তু এরকম মনের জোর পায় কী করে! হেমলতা এই মুখ্যভঙ্গি দেখে তিনি ঠিক স্বষ্টি পাচ্ছিলেন না।

বিকেলের দিকে আজকাল আর খেলার মাঠে যায় না অনিমেষরা। উঁচু ঝাসে ওঠার পর থেকেই খেলাধূলা কমে এসেছিল। ইদানীং বিরাম করের বাড়িতেও যাওয়া কমে গেছে। রঞ্জার সঙ্গে সেই ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকে ওর ওখানে যেতে সংকোচ হচ্ছিল। অবশ্য মুভিং ক্যাসেল কয়েকবার ধরে নিয়ে গিয়েছেন ওকে, আদর করে বসিয়েছেন, কিন্তু উর্বরীর দেখা পায়নি। মেনকাদি কলকাতায় চলে গিয়েছে। এখানকার কলেজে পড়াশুনা ভালো হচ্ছে না, হেস্টেলের থেকে কলকাতার কলেজে ভরতি হয়েছে মেনকাদি। মন্টু বলে, নিশীথবাবু নাকি জববর ল্যাং খেয়েছেন। তবে ভেঙ্গে পড়েননি, কারণ এখনও উর্বরী রঞ্জ রয়েছে। সেদিনের ঘটনার পর থেকে আর্থভাবে বদলে গেছে মন্টু। আর একবারও ও মুভিং ক্যাসেলের বাড়িতে যায়নি এবং তপন রঞ্জকে নিয়ে দু একবার ঠাট্টা করার চেষ্টা করলেও ও চুপচাপ থেকেছে। রঞ্জার প্রতি মন্টুর যেন আকর্ষণ নেই। বিকেলে সেনপাড়া ছাড়িয়ে বাঁধের বেন্ডারের ওপর বসে থাকে ওরা। ঝাসে যে নতুন ছেলেটি টাকি থেকে এসেছে সে খুব মেধাবী এবং দাবখেলায় হারে না সহজে। এসে অরূপকে ডিঙিয়ে ফাঁক হয়েছে এবার। ছেলেটির নামটাও অস্তু, অর্ক। অর্ককে দেখে অবাক হয়ে যায় অনিমেষ। ওদের সঙ্গে বিকেলবেলায় তিউনার পাড়ে বসে যখন সে কথা বলে তখন অনর্গল মুখ খারাপ করে যায়। নিজেই বলে, 'বিস্তিতে কোনো শালা আমার সঙ্গে পারবে না।' এমনকি মন্টুকেও নিষ্পত্তি দেখাচ্ছে অর্ক আসার পর থেকে। যে-ছেলে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে লেটার মার্ক পায়ে সে কী করে খিস্তি করে বলে, 'এটা একটা রেয়ার কলেকশন। আর-কারও কাছে খুনবি না।' এই সময় অনিমেষ না-শোনার ভান করে নিলিঙ্গ মুখে তিউনার দিকে চেয়ে থাকে। অর্ক ইংরেজি খাতা দেখে হেডাস্টারমশাই নাকি এত মুশ্ক হয়েছেন যে নিজে গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। ও যে এবার স্কুল ফাইনালে স্ট্যান্ড করবে তা সবাই জানে। সেই অর্ক আজ বিকেলে এসে গঞ্জির ভঙ্গিতে বলল, 'বল তো, আমরা জন্মেছি কেন?'

উত্তরটা দেবে কি না অনিমেষ বুঝতে পারছিল না। মন্টু বলল, 'শহীদ হতে।'

তপন বলল, 'হাফসোল থেকে।'

খুব বিরক্ত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে অর্ক বলল, 'তোদের সঙ্গে সিরিয়স আলোচনা করে সুখ পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের মানুষগুলোর মাথা মোটা হয়। তোর একবার মনেও হয় না কেন জন্মেছি জানতে?'

প্রশ্নটা ওর দিকে তাকিয়ে, তাই অনিমেষ বলল, 'আমি উত্তরটা জানি এবং তা খুব সোজা। আগের জন্মের কর্মফল অনুযায়ী আমরা জন্মগ্রহণ করি।'

অর্ক বলল, 'বুকিশ! জন্মগ্রহণ করি, যেন তুই চাইলেই জন্মাতে পারবি! জন্মগ্রহণ পান্তিগ্রহণ করার মতো ব্যাপার, নাঃ কোনো প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নেই!'

মন্টু বলল, 'কীরকম?'

পকেট থেকে একটা গোটা সিগারেট বের করে অর্ক ধরাল। আগে ও দেশলাই রাখত না, আজ এনেছে। অর্ক আসার পর মন্টুদের এই নতুন অভ্যাসটা হয়েছে। একটা সিগারেট ঘুরে ঘুরে দুএক টান দিয়ে শেষ করে। শহরের বাইরে এরকম নিজিন জায়গায় ধরা পড়ার কোনো ভয় নেই। চাপে পড়ে

অনিমেষ একদিন একটা টান দিয়েছিল, দম বক্ষ হবার যোগাড়! বিশ্বি টেস্ট, কেন যে লোকে সিগারেট খায় কে জানে!

গলগল করে দুই নাক দিয়ে ঘোয়া বের করে অর্ক বলল, ‘জন্মাবার পেছনে আমাদের কোনো ক্রতিত্ব নেই।’

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল! মণ্ডু বলল, ‘উঠলি যে?’

অনিমেষ বলল, ‘এইসব কথা তুতে আমার ফেন্না করে।’

বেশ রাগের মাথায় ও দপদপিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। অর্ক চেঁচিয়ে বলল, ‘সত্য খুব ন্যাংটো রে! তা সিগারেটে টান দিব না, শেষ হয়ে গেল যে?’

অনিমেষ কোনো কথা বলল না। সত্যি, ওদের আভড়া ইদানীং খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। চার-পাঁচজন এক হলেই মেয়েদের শরীর নিয়ে বিশ্বি আলোচনাটা আসবেই। তার চেয়ে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে চৃপচাপ বসে থাকলেও এত খারাপ লাগে না। জয়াদা মামার বাড়ি গিয়েছেন প্রায় দিন-দশেক, বিকেলে বইপড়া বক্ষ। সুনীলদাও কোনোদিন মুখ-খারাপ করেনি। ওর সঙ্গে থাকতে খুব ভালো লাগে অনিমেষের। চা-বাগান অঞ্চলে কীসব সংগঠনের কাজে সুনীলদা ডুব দিয়েছে। সুনীলদার সঙ্গে ওর যেসব কথাবার্তা হয়েছে তা একদিন কংগ্রেস অফিসে বসে নিশীথবাবুকে বলেছিল ও। নিশীথবাবু নির্দেশ দিয়েছেন, সুনীলের সঙ্গে একদম মেলামেশা নয়। কথাটা একদম সমর্থন করতে পারছে না অনিমেষ। একধর তিঙ্গার বাধে মেয়েসংকুষ্ট ঘটনা ঘটলে মণ্ডু কেস বলে তাকে চিহ্নিত করে।

বিরাট একটা পাথরের স্তুপের আড়াল থেকে চিকাগো আসছিল। একটা গলা খুব ধমকাছে আর ঘেয়েটি ‘না না, পায়ে পাড়ি আপনার’ বলে মিনতি করছে। অনিমেষ নিঃশব্দে পাথরগুলোর আড়াল রেখে কাছে যেতেই কী করবে বুবাতে পারল না চট করে। চারটে ওদের বয়সি হেলে এই সঙ্গে হয়ে আসা অঙ্ককারে গুণার মতো মুখ করে হাসছিল। ওদের সামনে যে ছেলেটি শুধুমাত্র জাসিয়া পড়ে দাঁড়িয়ে আছে তাকে অনেকে কষ্টে চিনতে পারল ও। তার জ্বাম্পাট মাটিতে পড়ে রয়েছে। চারজানের যে নেতা সে বলেছিল, ‘ওটুকু আবার কার জন্য রাখলে চাঁদ, খুলে ফ্যালো। তোমাকে মারব না, কিছু বলব না। তিঙ্গার পাড়ে লুকিয়ে প্রেম করতে এসেছ যখন তখন তুমি তো হিরো, একদম ন্যাংটো হয়ে বাড়ি চলে যাও। খোলো।’ শেষ কথাটা ধরকের মতো শোনাল।

ছেলেটি, যাকে একদিন মণ্ডু মেরেছিল, কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ‘প্রিজ, আমি এটা পরেই যাই, আর কোনোদিন করব না, আপনারা যা চান তা-ই দেব।’

অনিমেষ রঞ্জন মতো মুখ্টা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ওদের দিকে পেছন ফিরে রঞ্জ দুহাতে চোখ ঢেকে অনিমেষ যেদিকে দাঁড়িয়ে সেদিকে ফিরে রয়েছে। ওর শরীরটা ফোঁপানির তালে কাপছে। এই সময় চারজনের একজন রঞ্জ দিকে এগিয়ে গেল, ‘তোমার নাম কী?’

রঞ্জ কোনো জবাব দিল না, তেমনি কেঁপাতে লাগল।

‘বাড়ি কোথায়?’ তাও জবাব নেই। ছেলেটি বোধহয় একটু রেগে গেল, ‘আবার ফ্যাচফ্যাচ হচ্ছে! শালা লুকিয়ে এখানে এসে হামু খাবার বেলায় মনে ছিল না! আমারা যে সামনে এসেছি তা খেয়াল হচ্ছিল না! যাক, জামাটামা খুলে ন্যাংটো হয়ে বাড়ি যাও খুকি।’

রঞ্জ সজোরে ঘাড় নাড়ল। ওদের মধ্যে একজন ছেলেটির চিবুক নেড়ে দিয়ে বলল, ‘জশ্পেস মাল পটিয়েছ বাবা! একা খাওয়া কি ভালো।’

প্রথম ছেলেটি এবার চট করে রঞ্জ পিঠে জামার ওপরটা খপ করে ধরে বলল, ‘অ্যাই খোল, নইলে বাপের নাম ত্তুলিয়ে দেব।’

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মাথা গরম হয়ে গেল। একছুটে সে দলটার মধ্যে গিয়ে পড়ল এবং কেউ কিছু বোবার আগেই ছেলেটার হাত মুচড়ে ধরল, ‘কী আরঝ করেছ তোমরা, এটা কি গুণামির জায়গা?’

ব্যাপারটা এত দ্রুত হয়ে গিয়েছিল যে ছেলেটি ভীষণ ঘাবড়ে গেল। রঞ্জ ঘুরে অনিমেষকে দেখতে পেয়ে কী করবে বুবাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল, ‘অনিমেষ, দ্যাখো ওরা আমার ওপর অভ্যাচার করছে। আমি এমনি কথা বলতে এসেছিলাম—আর আমাকে অপমান করছে।’

বোধহয় রঞ্জ গলার স্বরেই বাকি তিনজনের সংবিধি ফিরে এসেছিল। ওরা এক লাফে সামনে

এসে প্রথম ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিল। রঞ্জন হাতের বাঁধন শরীরে থাকায় অনিমেষ নড়তে পারছে না। প্রথম ছেলেটি এবার খেপে গিয়ে বলল, ‘এ-শালা আবার কেঁ দূজনের সঙ্গে এসেছিল নাকি?’

হঠাতে অনিমেষ দেখল একটা শুসি ওর মুখ লক্ষ্য করে ফ্রন্ট এগিয়ে আসছে। কিন্তু বোবার আগেই ও মাথা নিচু করে রঞ্জকে নিয়ে বসে পড়ল। তাল সামলাতে না পেরে রঞ্জ পড়ে যেতে ওর হাত অনিমেষের শরীর থেকে খুলে গেল। অনিমেষ নিজেকে বাঁচাতে আশণপথে ছেলেটার উদ্দেশে একটা লাধি বাড়ল ওই অবস্থায়। ককিয়ে-ওঠা একটা শব্দ কানে ঘেটেই ‘অনিমেষ দেখল’ ওর চারপাশে পাণ্ডলো ঘিরে ফেলেছে। কোনোরকমে মাটি থেকে লাধি-খাওয়া ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘এবার বুবরে আমার গায়ে হাত তুললে কেমন লাগে। শালাকে শেষ করে ফেলব।’ অনিমেষ মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। রঞ্জ খালিক পেছনে উঠে দাঁড়িয়েছে। অনিমেষ বুবাতে পারছিল, ও যদি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তা হলে সব দিক দিয়ে আক্রমণ শুরু হবে। ও স্থির করল যদি মরতে হয় একজনকে মেরে মরবে।

ঠিক এই সময় মন্টুর গলা শুনতে পেল অনিমেষ, ‘কী হচ্ছে কী?’

সঙ্গে সঙ্গে চারটে ছেলেই ঘুরে দাঁড়াল। অনিমেষ ওদের পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখল মন্টু অর্ক আর তপন পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ বুকের মধ্যে যে-টিপ্পিচানিটা শব্দ তুলছিল সেটা চট করে থেমে গেল। এখন ওরা সমান-সমান, ও আর একা নয়। এই সময় এক নবর ছেলেটি বলে উঠল, আরে মন্টু, তুই ওখানে।’

মন্টু বলল, ‘তোরা কী করছিস?’ ওর গলার হৰ গঞ্জি।

ছেলেটি বলল, ‘আরে শালা এখানে লাইলায়জনুব জোর পেয়ার চলছিল। কী হাম খাওয়ার শব্দ! আমরা কেসটা হাতে নিতেই এই মাল ছুটে এল। আবার আমার গায়ে লাধি মারে, বোৰ্ব। জানে না তো আমি কার শিখা!’

মন্টু এগিয়ে এল, ‘সেমসাইড হয়ে যাচ্ছে। ও আমার বক্সু, চিক্কার শুনে ছুটে এসেছে।’

ছেলেটা যেন ভীষণ হতাশ হল, বলল, ‘ঘাঃ শালা!’ তারপর ঝুনিমেষের হাত ধরে তুলে বলল, ‘খুব বেঁচে গেলে ভাই। কিন্তু ফিউচারে এরকম করলে ছাড়ব না।’

এতক্ষণে মন্টু রঞ্জকে ভালো করে লক্ষ করেছে, জাঙ্গিয়া-পরা ছেলেটাকে ও আগেই দেখেছিল। ও অনিমেষের কাছে এসে দাঁড়াল, ‘খুব সাহস তো।’

রঞ্জ কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে উঠল এই সময়, ‘আমি কিছু জানি না।’

এক নবর চাপা গলায় বলল, ‘বুহৎ হারামি মেয়েছেলে মাইরি! একদম বিশ্বাস করবি না। ওর কীর্তি আমি নিজের চোখে দেখেছি।’

মন্টু অনিমেষকে বলল, ‘কী করা যায় রে?’

অনিমেষ কিছু বলার আগেই অর্ক বলল, ‘ছেড়ে দে, বালিকা জানে না ও মরে গেছে।’

হঠাতে মন্টু ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে খুব জোরে চট মারল। বেচারা এমনিই দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, চড় খেয়ে পাথরের ওপর উলটে পড়ল। মন্টু এগিয়ে গিয়ে ওকে আবার তুলে ধরল, ‘এই, ‘এই, তোকে বলছিলাম না যে-এ পাঢ়ায় আসবি না! আবার সাইকেলে কেষ্টের বাঁশি বাজিয়েছে।’

কোনোরকমে ছেলেটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমি আসতে চাইনি, ও জোর করে এনেছে।’

চাপা গলায় মন্টু বলল, ‘কী করে দেবা হল?’

ছেলেটা গড়গড় করে বলে গেল, ‘আমার বোন ওর সঙ্গে পড়ে। বোনের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছিল।’

একটু চিন্তা করল মন্টু, ঠিক আছে। তুই ওকে বিয়ে করবি?’

একটুও বিধা করল না ছেলেটা, ‘না।’

‘কেন? প্রেম করছ আব বিয়ের বেলা না কেন?’ ধূমক দি, মন্টু।

‘ও মিথ্যেবাদী। নিউজেই সব কাজ করে এখন ভান করছে।’

অর্ক বলল, ‘মেয়েছেলে মানেই তা-ই। এই সত্যটা চিরকার মনে রেখো চাঁদ। এখন কেটে পড়ো। রেডি, ওয়ান টু শ্রি-।’ অর্কের কথা শেষ হতেই ছেলেটা তীরের মতো দৌড়াতে লাগল

সেনপাড়ার দিকে।

এক নম্বর ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে বলল, ‘যা চলে, পাখি উড়ে গেল! কিছু আমদানি হত! ’ তারপর ঝুঁকে মাটি থেকে ছেলেটার শার্টপ্যান্ট তুলে তার পক্ষে থেকে একটা মানিব্যাগ বের করল। অনিমেষ দেখল তার মধ্যে বেশকিছু টাকা আছে। অন্ধকারে ছেলেটার ছুট্টে জাঙ্গিয়া-পরা শরীরটা আর দেখা যাচ্ছে না। এই সময় তিস্তার ওপাড়টায় চমৎকার একটা ঠাই উঠে পা ঝুলিয়ে বসে ওদের দিকে চেয়ে রইল। এক নম্বর ছেলেটি টাকাগুলোর পর একটা কাগজ বের করে সামনে ধরে বলল, ‘আরে এ যে লাঞ্ছ-লেটার। আমার প্রাণ-পাপিয়া, আজ বিকেলে বাঁধের পেছনে জেলা স্কুলের শেষে আমায় দেখতে পাবে। তোমাকে বুকভরে আদর না করতে পারলে আমার শান্তি নেই।’

ঠাঁদের আলোয় চিঠিটা পড়ে ফেলল সে।

পড়া শেষ হতেই মণ্টু হাত বাড়িয়ে খপ করে চিঠিটা কেড়ে নিল, ‘এটা আমাকে দে।’

এক নম্বর তাতে একটুও অশুশি হল না। টাকাগুলো পক্ষে পুরে ছেলেটার ফেলে-যাওয়া জামা প্যান্ট ও মানিব্যাগ টান মেরে তিস্তার জলে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বেস্টা তোদের দিয়ে দিলাম। চলি।’ ওর সঙ্গীদের নিয়ে সেনপাড়ার দিকে চলে গেল সে।

এবার মণ্টু অনিমেষকে বলল, ‘চল, আমরা বিরাম করের সঙ্গে দেখা করি।’

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জা চেঁচিয়ে উঠল, ‘না।’

মণ্টু বলল, ‘কেন? বিখ্যাত কংগ্রেসি নেতার কণ্যা তিস্তার ধারে প্রেম করছে—এটা তাঁকে জানাতে হবে না?’

রঞ্জা বলল, ‘আমি অন্যায় করলে আমিই শান্তি পাব। বাবা তার জন্য দায়ী নয়।’

অর্ক বলল, ‘বয়স কত খুঁকি? তেরো না চোদ্দো?’

রঞ্জা বলল, ‘আপনার তাতে কী?’

অর্ক হাসল, ‘আমরা জনোহি বাপ-মায়ের প্রেজার থেকে। অতএব বাপ-মাকে না জানিয়ে কিছু করা তালো?’

হঠাতে রঞ্জা মরিয়া হয়ে গেল, ‘আমার চিঠি ফেরত দিন।’

মণ্টু বলল, ‘ফেরত পাবার জন্য লিখেছ?’

রঞ্জা বলল, ‘যাকে লিখেছি তাকে লিখেছি। আপনাকে লিখতে যাইনি।’

মণ্টু বলল, ‘তা লিখবে কেন? আমি তো তোমার বাবাকে তেল দিয়ে কংগ্রেসি হইনি। আর আমার বাপের জমিদারিও নেই।’

রঞ্জা বলল, ‘নিশ্চয়ই। আপনি তো একটা গুণ। রোজ দুবেলা ড্যাবড্যাবে করে রাস্তা দিয়ে যেতে—যেতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, আমি দেবিনি? এই চিঠি যদি আপনাকে লিখতাম তা হলে আপনার জীবন ধন্য হয়ে যেত।’

মণ্টু চেঁচিয়ে বলল, ‘মুখ সামলে কথা বল, এক চড়ে দাঁত ফেলে দেব, বদমাশ মেয়েছেলে। বাপ কংগ্রেসের নাম করে ঘূৰ থাচ্ছে, মা দিনরাত ছেলে ধরছে আর মেয়ে তিস্তার পাড়ে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়ে চোখ রাঙাচ্ছে। আমি ছিলাম বলে বেঁচে গেলি, বুঝলি! নইলে ওরা তোকে ছুড়ে ছিড়ে খেত। আমি শুণা, না?’ থুঃ থুঃ করে একরাশ ঘূৰু মাটিতে ফেলে ও অনিমেষকে বলল, ‘অনিমেষ, এটাকে বাঢ়ি পৌছে দে, নইলে তোর মুভিং-ক্যাসেল কানাকাটি করবে।’ কথিটা শেষ করে ও দাঁড়াল না। অনিমেষ দেখল অর্ক আর তপন ওর সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে হঠাতে ঘূৰে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, ‘সচিত্র প্রেমপত্র আমিও পড়েছি।’ বলে মুঠো-পাকানো রঞ্জা চিঠিটা ওদের দিকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাঁটতে লাগল। অনিমেষ দেখল কাগজটা ঘন্যে ভাসতে ভাসতে তিস্তার জরে গিয়ে পড়ল। জ্যোৎস্না সমস্ত শরীরে মেখে জলেরা দ্রুত ওটাকে টেনে নিয়ে গেল মঙ্গলঘাটের দিকে।

হঠাতেই যেন সমস্ত চারার শব্দহীন হয়ে গেল। মণ্টুদের শরীরগুলো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, তিস্তার চৰ থেকে উৎখাত-হওয়া শেয়ালগুলো আজ আর ডাকাডাকি করছে না। শরতে পা-দেওয়া আকাশটা নবীন জ্যোৎস্নায় সুখী কিশোরীর মতো আদুরে হয়ে আছে। এমনকি তিস্তার চেউগুলো অবধি নতুন বউ-এর লজ্জা রঞ্জ করেছে। অনিমেষ রঞ্জার দিকে তাকাল। তিস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে দাঁড়িয়ে,

তার দীর্ঘ কেশ নিতম্ব ছাড়িয়ে নেমে এক মাঝামাঝি ছবি হয়ে রয়েছেল রঞ্জা এখনও মহিলা হয়নি, কিন্তু স্বীকৃত ওকে অনেক কিছুই অগ্রিম দান করে বসে আছেন। এই রঞ্জা ওকে চূম্বন করেছিল। তিক্ত সেই স্বাদটা অনিমেষ এখনও বেশ অনুভব করতে পারে। আজকের এই ছেলেটিকে রঞ্জা কি সেই স্বাদ দিয়েছে? একাধিক ছেলের সঙ্গে এইরকম সম্পর্ক যে করে সে কখনোই সৎ নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল রঞ্জা তার কাছে এগিয়ে এলেও সে সায় দেয়নি। বোচার ভালোবাসা পেতে নিশ্চয় এই ছেলেটির শরণাপন হয়েছে। এতে ঠিক ওকে দোষী করা যাচ্ছে না। কিন্তু ছেলেটি তো ওদের বাড়িতে যেতে পারত। বিশেষ করে যে-তিস্তা বাঁধের এত দুর্বাম সেখানে আসার ঝুঁকি ওরা কেন নিল? রঞ্জার বয়সের মেয়েরা কখনোই এত সাহসী হয় না। অস্তত সীতা, বা উর্বশীকে ও এই শ্রেণীতে ফেলতে পারবে না কিছুতেই। হয়তো কোনো কোনো মেয়ে এমন অকালে যৌবন পেয়ে যায় যে কাউকে ভালোবাসতে না পারলে সবকিছু বৃথা হয়ে যায় তাদের কাছে। কিন্তু মন্টুর বেলায়! ওর মনে হল মন্টু আজ বেশ একহাত নিয়ে গেল রঞ্জকে। রঞ্জার জন্য মন্টু ছফ্টফট করত, একবার দেখবার জন্য চারবার সামনের রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করত। কিন্তু সেই যে ওর সঙ্গে মুভিং ক্যাসেলের বাড়িতে গিয়ে চাখেল, ব্যস, তার পর থেকেই ও যেন রঞ্জকে আর চেনে না। আজ এই অবস্থায় পেয়ে রঞ্জকে নিয়ে ও যা ইচ্ছে করতে পারত। বিশেষ করে মন্তানগুলো ওর পরিচিত এবং রঞ্জার চিঠিটা হাতে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেসব কিছুই না করে ও থুতু ফেলে চলে গেল। অনিমেষ এরকম আচরণের কারণটা ঠিক ধরতে পারছিল না। আবার মন্টুর ওপর সব নির্ভর করছে জেনেও রঞ্জা কিন্তু ওর কাছে মাথা নোয়ায়নি। সামনে তর্ক করে গিয়েছে। এমনকি এরকম জেনেও দাঁড়িয়ে মন্টুর মুখের ওপর ওকে গুঞ্জ বলে গালাগালি দিয়েছে। কেন? রঞ্জা যদি পুরুষ বেঁশা হত তা হল নিশ্চয়ই এরকম করত না এবং বিশেষ করে ওর লেখা চিঠিটা যখন মন্টুর মুঠোয়ে তখনও ধরা ছিল। ভাবতে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল অনিমেষের। কী করে যে সব কীরকম হয়ে যায়। ও মুখ তুলে দেখল রঞ্জা পায়ে পায়ে তিউন্নর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানটায় পাথর রয়েছে ছড়নো। কাঠোর বিমণগুলো নদীর গায়ে এখনও পোঁতা হয়নি। ফলে জলে নামা অসুবিধের নয়। পাথরের গা বাঁচিয়ে স্বচ্ছে যাওয়া যায়। অনিমেষ দ্রুত গিয়ে রঞ্জার পাশে দাঁড়াল, ‘কোথায় যাচ্ছ’

রঞ্জা মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল। পাথরের মতো মুখ, কোনো অভিযোগ নেই, শুধু দুচোখ উপচে মোটা জলের রেখা গালের ওপর দিয়ে নিচে নেমে গেছে। অনিমেষ চোখ সরিয়ে নিল। কেউ কাঁদলে ও সহ্য করতে পারে না। কারও জল-টেলমল চোখের দিকে তাকালেই মায়ের মুখটা চট করে মনে এসে যায়। অনিমেষ আবার বলল, ‘বাড়ি চলো, রাত হচ্ছে!’

রঞ্জা কীরকম উদাস গলায় বলল, ‘আমি খারাপ, না?’

অনিমেষ মাথা নাড়ল, ‘জানি না। তবে তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।’

রঞ্জা বলল, ‘কী করব! ওদের বাড়ি খুব কড়া। আর আমাদের বাড়িতে দিদির জন্য আজকাল কারও সঙ্গে ভালো করে কথা বলা যায় না। কিন্তু এখানে এসে কী লাভ হল।’

অনিমেষ বলল, ‘লাভ তো দূরের কথা, তোমার বাবার সশ্মান নষ্ট হয়ে যেত একটু হলে।’

রঞ্জা মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মনে হল ওর গালের ওপর কয়েকটা মুক্তো যেন টেলমল করছে। রঞ্জা বলল, সে যাহোক হত, কিন্তু ওসবার সামনে আমাকে অগমান করে গেল, আমাকে বিয়ে করতে পারবে না। তার মানে সমস্ত সম্পর্ক এখনেই শেষ। অথচ প্রথমে এখানে এসে বসতেই ও-ই হাস্তের মতো করছিল। কত আবদার! হঠাৎ দাঁড়াল রঞ্জা, ওর চোখমুখ পলকেই হিংস্র হয়ে উঠল। অনিমেষ কিছু বোঝার আশেই ওর জামা দুহাতের মুঠোয় ধরে বৌকুনি দিতে-দিতে চিৎকার করে উঠল, ‘তোমরা ছেলেরা সবাই সমান। স্বার্থপর, বিশ্বাসযাতক। তুরি করে মধু খেতে চাও, হীকার করার সাহস নেই।’ বলতে বলতে হহ করে কেঁদে ফেলল ও। কান্নার দমকে ওর মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। অনিমেষ হতভব হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল। ওর বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি; তোমার কাছে চুরি করে কিছু নিতে চাইনি। কিন্তু ও কিছু না বলে রঞ্জাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

অনিমেষ বলল, ‘অনেক রাত হয়েছে। আমাকে বাড়ি যেতে হবে। চলো।’

আর এই সময় সেই উৎখাত-হওয়া শেয়ালগুলো তারবরে ডেকে উঠল! বাঁধের আশপাশ থেকেই

ডাকগুলো আসছিল। সেই কর্কশ শব্দে ভীষণরকম চমকে গিয়ে রংগ অনিমেষের হাত ধরল।

ধীরপায়ে ওরা-হাকিমপাড়ার দিকে হেঁটে আসছিল। এখন এ-অঞ্জলিটায় লোকজন নেই। শুধু কোনো বিরহী রাজবংশী বাঁধের জন ফেলে-রাখা পাথরের ওপর বসে বাঁশিতে একলা কেঁদে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় চারধার বড় কোমল, মোলায়েম লাগছে। খুব নিচুগলায় রংগ বলল, ‘তুমি আমাদের বাড়িতে বলে দেবে না তো?’

অনিমেষ হাসল, ‘মাথা-খারাপ, এসব কথা কাউকে বলে?’

রংগ বলল, তোমার বস্তুরা তো সবাই বলবে।’

অনিমেষ এটা অঙ্গীকার করতে পারল না। কাল বিকেলের মধ্যে সমস্ত শহর নিশ্চয়ই ঘটনাটা জেনে যাবে। ওর রভার জন্য কষ্ট হচ্ছিল।

হঠাতে রংগ বলল, ‘একটা উপকার করবে?’

‘কী?’ অনিমেষ জানতে চাইল।

‘তুমি আমার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে বলো যে আমরা এখানে বেড়াতে এসেছিলাম, এমন সময় কয়েকজন ছেলে আমাদের অপমান করেছে।’ রংগ সাধারে ওর হাত ধরল।

‘সে কী! কেন?’ অনিমেষের সমস্ত শরীর চট করে অবশ হয়ে গেল।

‘তা হলে পরে যার কাছ থেকেই বাবা-মা খনুক বিশ্বাস করবে না। তোমাকে মা খুব ভালোবাসেন। পিলি, এই উপকারটা করো।’

‘কিন্তু তা তো সত্যি নয়। আর খামোকা তোমার সঙ্গে আমি বেড়াতে যাব কেন?’

অনিমেষ ওর হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু রংগ যেন একটা অবলম্বন পেয়ে গেছে, ‘দিদি সেদিন তোমার আমার ব্যাপারটা দেখে ভেবেছে যে আমরা লাভার। একথা ও দিদিভাইকে বলেছে। তাই আমরা বেড়াতে গিয়েছি শুল্লে ওরা সহজেই বিশ্বাস করবে।’

অনিমেষ বলল, ‘রংগ, আমি যিথে কথা বলতে পারব না।’

রংগ বলল, ‘কেন? আমার জন্য বলো। তুমি যা চাও সব পাবে।’

অনিমেষ মাথা নাড়ল, ‘না, সত্যি হলে আমি যেতাম তোমাদের বাড়ি।’

রংগ বলল, ‘বেশ, সত্যি করে নাও।’

অনিমেষ বলল, ‘তা হয় না।’

সঙ্গে সঙ্গে রংগ খেপে উঠল, ‘ও, তুমি খুব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, না?’

অনিমেষ কোনো জবাব দিল না। কথা বলতে বলতে ওরা জেলা কুলের পাশে এসে পড়েছিল। নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রংগ আচমকা দৌড়াতে আরংগ করল। অনিমেষ প্রথমটা বুঝতে পারেনি, ওর তয় হল রংগ বুঝি কিছু-একটা করে ফেলবে। নিজের অজান্তেই সে রংগের পেছন পেছন ছুটতে লাগল। খানিকটা যেতে-যেতে হঠাতে ওর মাথায় একটা ছবি হত্তমুড় করে ঝুঁড়ে এসে বসল। এলো চুল বাতাসে উড়িয়ে দুর্গু ছুটছে, পেছনে অপু।

চট করে থেমে গেল অনিমেষ। রংগের ছুটন্ত শরীরটা ওদের বাড়ির গেটের কাছে চলে গেল। গেট খুলে রংগ ভেতরে চলে গেল।

বাত হয়ে গেছে। সঙ্গের মধ্যে বাড়িতে না চুকলে দাদু রাগ করেন। আজকে যে কীসব ব্যাপারে হয়ে গেল! দ্রুত পা চালাল অনিমেষ। কিছুদূর যেতেই ওর মনে হল কেউ যেন ওর পেছনে আসছে। চট করে ঘাড় ফিরিয়ে ও হাঁ হয়ে গেল। প্রথমে ওর মনে হল বোধহ্য তৃতৃ দেখছে সে। তারপর ছেলেটা কথা বলল, ‘আমাকে একটা কাপড় বা যাহোক কিছু দাও, আমি এভাবে শহরের মধ্যে চুকতে পারব না।’ কেঁদে ফেলল সে। এই জ্যোৎস্নায় জঙ্গিয়া-পরা শরীরটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের ক্রমশ কষ্ট হতে লাগল। বেচারা বোধহ্য এভক্ষণ ওদে কাছাকাছি ছিল, সাহস করেনি কাছে আসতে। এভাবে শহরের মধ্যে দিয়ে হাঁটা যায় না।

অনিমেষ কোনো কথা না বলে ইঙ্গিতে ছেলেটাকে ওর সঙ্গে আসতে বলল। ও হেঁটে যাচ্ছে আর ওর হাতে-ছয়েক দূরে একটি জঙ্গিয়া-পরা শরীর লজ্জায় কুকড়ে গিয়ে হাঁটছে। দৃশ্যটা আর-একবার দেখেই অনিমেষ আর পারল না। ওকে সেখানেই দাঁড়াতে বলে একটা-কিছু এনে দিতে ও জীবনের

সবচেয়ে দ্রুত দোড়টা দোড়ল। বাড়ির কাছাকাছি হতে অনেক মানুষের কথাবার্তা ও কান্নার শব্দ শুনতে পেল সে।

বাগানের শেট খুলে ভেতরে ঢুকে প্রথমে একটু ধর্মকে দাঁড়াল অনিমেষ। কিছু গুজ্জন, এবং একটি পুরুষকষ্টে কানা ভেসে আসছে। ও খুব ক্ষত হয়ে চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কাঁদছে কে? না তো, কল্পনাতেও অনিমেষ সরিথেশের এইরকম গলায় কাঁদছেন ভাবতে পারে না। রান্নাঘরের ভেতর থেকে আলো আসছে। অনিমেষ শব্দ না করে বারান্দায় উঠে এল। ওকে দেখে পিসিমার শেয়ালটা যেন বিরক্ত হয়েই নেমে দাঁড়াল সিঁড়ি থেকে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় বাগানের গাছপালগুলো স্বান করে উঠে এইবার ফুরুরে হাওয়ায় গা মুছে নিচ্ছে। অনিমেষ দেখল রান্নাঘরে কেউ নেই। এমনকি দরজাটা অবধি বাইরে থেকে টেনে দেওয়া, চোর এলে সব ফাঁক হয়ে যাবে। পিসিমা তো এত অসতর্ক হয়ে বাইরে যান না! দানুর ঘরের দিকে যাবার সময় ওর মাথায় উঠোনের তারে ঝুলে-থাকা একটা ময়লা গামছা ঠেকল। দানুর ঘামমোছা এই গামছাটা এখনও শুকোছ-এই বাড়িতে এরকম আগে হয়নি। নিচয়ই গোলমালটা খুব গুরুতর ধরনের। দেরি করে বাড়িতে আসার জন্য যে-সংক্ষেপ এবং কিছুটা ভয় ওর মধ্যে ছিল, তুমশ সেটা করে যাচ্ছিল।

গুণ্টন্টা হচ্ছে বাইরে ভাড়াটের দিকে। কান্নাটা ধ্রুব একটু কমেছে, মাৰো-মাৰে গোজানির শব্দ হচ্ছে। অনিমেষ দ্রুত সেদিকে যেতে গিয়ে ধর্মকে দাঁড়াল। তারপর ফিরে এসে তারে-ৰোলানো ভিজে গামছাটা একটানে নামিয়ে নিয়ে বাগান পেরিয়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। সুপুরিগাছের ছায়া থেকে চট করে ছেলেটা সামনে বেরিয়ে এল, ‘কী হয়েছে?’

অনিমেষ মাথা নেড়ে বলল, ‘জানি না। এটা ছাড়া কিছু পেলাম না।’

ছেলেটা বলল, কেউ মারা গেল এইরকম কাঁদে।

অনিমেষ কথাটা শুনে আরও ব্যক্ত হয়ে পড়ল, ‘ঠিক আছে, এটা নিয়ে এবার কাটো।’

ছেলেটা হাত বাড়িয়ে ভিজে গামছাটা নিয়ে করুণ গলায় বলে উঠল, ‘এ মা, এই ভেজা গামছা পরে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটব।’

অনিমেষের মাথায় তড়ক করে রক্ত উঠে গেল। ও জাঙ্গিয়া-পরা শরীরটার দিকে একবার তাকাল, ‘তা হলে যা পরে আছে তাতেই যাও। প্রেম করতে যাওয়ার সময় খেয়াল ছিল না! বসতে দিলেই শুতে চায়! আর দাঁড়াল না সে। হন্হন করে ফিরে এল একবারও পেছনে না তাকিয়ে।

নতুন বাড়ির বারান্দা দিয়ে এগোতে শব্দটা বাড়তে লাগল। বাইরের বারান্দায় যাবার মুখ্টায় পিসিমা দাঁড়িয়ে আছেন। আঁচলটা এক হাতে মুখে চাপা দেওয়া। ঠিক তাঁর পাশে একটা মোড়ায় দানু হাঁটুর ওপর দুহাত রেখে চুপচাপ বসে। আর সামনের ছোট লনটা লোকে ভরতি হয়ে গিয়েছে। খুব আস্তে সবাই কথা বলছে। কিন্তু সেটাই গুজ্জন বলে ওর এতক্ষণ মনে হচ্ছিল। সবার মুখ ডানদিকের বারান্দার দিকে ফেরানো, অনিমেষ এখন থেকে সেদিকটা দেখতে পাচ্ছিল না। পিসিমার পাশে যেতেই খপ করে তিনি ওর হাত ধরলেন, তারপর অস্বাভাবিক চাপা গলায় বললেন, ‘এতক্ষণ কোথায় ছিলি?’ কী উত্তর দেবে ঠিক করার আগেই তিনি বললেন, ‘চিন্তায় চিন্তায় আমার বুক ধড়ফড় করছিল। বাবা জিজ্ঞাসা করছিল তোর কথা, আমি বলেছি অনেকক্ষণ এসেছিস।’

অনিমেষ খুব লিংগলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘কী হয়েছে, এত লোক কেন?’

মুখ থেকে আঁচল না সরিয়ে তেমনি গলায় পিসিমা বললেন, ‘সুনীল মরে গেছে।’

সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল অনিমেষের। ও কিছুক্ষণ শৃঙ্খলিতে পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ‘কেন?’

পিসিমা বলল, ‘কী জানি, শুনছি মেরে ফেলেছে। প্রিয়র জন্যে ভীষণ ভয় হচ্ছে।’

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না অনিমেষ, দৌড়ে ও লনে নেমে পড়তেই সুনীলদাকে দেখতে পেল। ওদের বারান্দায় প্রচুর মানুষ মাথা নিচু করে বসে আছে, আর তাদের ঠিক মাঝখানে একটা খারিয়ায় সুনীলদা চুপচাপ শয়ে আছে। বুক অবধি সাদা কাপড় টানা, হাত দুটো তার তলায় মাথায় লাল ছোপ-লাগা বাড়েজ। নাক চোখ ঠোঁট জ্যোৎস্নায় মাথায় থাপ্পি হয়ে রয়েছে। সুনীলদার বাবা যাঁকে কোনোদিন কথা বলতে দেখেনি অনিমেষ, তিনি ছেলের মাথার কাছে বসে মাৰো-মাৰে ডুকরে উঠছেন। জয়দিদের দরজা বৰ্ক, ওদের ফিরতে দেরি আছে।

অনিমেষ পায়েপায়ে সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠে এল। সুনীলদার কাছে যাবার জন্য একটা সরু প্যাসেজ করে রেখেছে উপবিষ্ট মানুষেরা। একদলে সুনীলদার বন্ধ চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ ভীষণ কাঁপুনি অনুভব করল। যেন প্রচণ্ড শীত করছে, হাতে পায়ে সাড় নেই, একটা শীতল স্ন্যাত ক্রমশ শিরায়-শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। সুনীলদা মরে গেছে। যে-সুনীলদা ওকে কত কথা বলত, ওর চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়, সুন্দর চেহারার সুনীলদা ঠোঁটের কোণে আলতো হসির তাঁজ রেখে মরে গেছে। কিন্তু কেন? কেন সুনীলদাকে মরতে হল? স্পষ্টই বোৱা যাচ্ছে ওকে কেউ হত্যা করেছে। অনিমেষ মুখ তুলে দেখল, অনেকেই ওর দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে এখানে কোনো কথা বললে সেটা বিছিরি লাগবে এটা অনুভব করতে পারল অনিমেষ। ও আস্তে-আস্তে বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে সুনীলদার খাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সুনীলদার বাবা ওকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রুলোক দুহাত বাড়িয়ে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরলেন, ‘দ্যাখো, দ্যাখো, আমার সুনীলকে তোমরা দ্যাখো।’ চিৎকারটা শেষদিকে কান্নায় জড়িয়ে যেতে অনিমেষ এই প্রেটের হাতে বাধনে দাঁড়িয়ে থেকে হৃত করে কেবলে ফেলল।

কেউ-একজন পাশ থেকে এই প্রথম কথা বলল, ‘মেসোমশাই, একটু শক্ত হন।’

‘শক্ত হব?’ কান্নাটা তখনও শব্দগুলোকে নিয়ে খেলা করছিল, ‘আমি তো শক্ত আছি। আমার ছেলে কমিউনিস্ট পার্টি করে-আমি কিছু বলি না, কলকাতা থেকে বই আনায়-আমি টাকা দিই, দশ-বারো দিন কোথায় গিয়ে সংগঠন করে-আমি চুপ করে থাকি। আমার চেয়ে শক্ত আর কোন বাবা থাকবে?’

অনিমেষ ওর আলিঙ্গনে বন্দি হয়ে পাশে বসে পড়েছিল। সুনীলদার মুখ এখন ওর এক হাতের মধ্যে। সুনীলদা কোথায় গিয়েছিল? স্বর্গছেড়ায়? স্বর্গছেড়াতে কেউ সুনীলদাকে ঝুন করতে পারে? কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না ওর। সুনীলদার কেউ শক্ত হতে পারে। পারে, সুনীলদা বলেছিলেন, শক্ত চারধারে। যারা ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায় তাৰাই আমাদের শক্ত। তা হলে স্বর্গছেড়ায় ক্ষমতা আগলে থাকবে এবং শক্ত হবে-এরকমটা শুধু বাগানের ম্যানেজার ছাড়া আর কাউকে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো পুলিশ আছে। ওই ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ স্পষ্ট শুনতে পেল, এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে হান, মৃত পৃথিবী ভগ্ন ধৰ্মসন্ত্প পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব, তবু দেহে যতক্ষণ আছে প্রাণ, প্রাণপথে এ পৃথিবীর সরাবো জঙ্গল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। এই বারান্দায় এক সঙ্কেবেলায় পায়চারি করতে আবৃত্তি করেছিল সুনীলদা। এখন এই জ্যোৎস্নায়-ধোয়া সুনীলদার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল সুনীলদা হয়তো সামান্য বড় ছিল বয়সে, কিন্তু তার কোনো কথা ও স্পষ্ট বুবাতে পারেনি।

ঠিক এই সময় একটা রিকশা এসে গেটের কাছে থামল। দু-তিনজন লোক সেদিকে এগিয়ে যেতে অনিমেষ দেখল রিকশা থেকে একটা বিরাট ফলের মালার নামিয়ে যিনি আসছেন তাঁকে সে চেনে। এক হাত কাটা অর্থচ কোনো জ্ঞাপন নেই। মালাটা নিয়ে দৃঢ় পায়ে নেমে এসে সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে গেলেন তিনি। সুনীলদার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে কয়েক মুহূর্ত ওর মুখে দিকে একদলে তাকিয়ে থেকে মালাটা সুনীলদার বুকের ওপর এমন আলতো করে নামিয়ে রাখলেন যাতে একটুও না লাগে। তারপর খুব মধুরের বললেন, ‘সুনীল, আমরা আছি, তুই ভাবিস না।’

অনিমেষ ওর দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল, না, চিনতে পারেনি। সেই সন্ধ্যায় ছোটকার সঙ্গে ওর বাড়িতে সে যে গিয়েছিল নিচ্যাই খেয়াল করতে পারেননি। এই মানুষটির হাঁটাচলা এবং কথা বলা তাকে ক্রমশ আচ্ছ করে ফেলছিল। ছোটকাকা কী করে পকেটে থেকে রিভলবার বের করে ওর মুখের ওপর ধরেছিল? তা হরে ছোটকাকা ও কি ওর শক্ত! হ্যাঁ, ছোটকাক তো ক্ষমতাবান মানুষদের একজন-ক্রমশ ঘোলা জলটা থিতিয়ে আসছিল।

প্রায় নিঃশব্দেই সুনীলদাকে ওরা ঠিকঠাক করে নিল। সুনীলদার বাবা হঠাৎ যেন একদম বোৱা হয়ে গেছেন, কোনো কথা বলছেন না। সেই কান্নাটাও যেন আর ওর গলায় নেই। এতক্ষণের নাগাল পেল। না, স্বর্গছেড়ায় নয়, ডুর্যোর্সের অন্য এক চা-বাগানে দুল প্রমিকের মধ্যে সরাসরি সংগঠনকে আরও মজবুত করে আজ সকালে জলপাইগুড়িতে ফিরে আসছিল সে। ভোরবেলায়

বাসন্ত্যাণে আসবার সময় কেউ ওকে ভোজালি দিয়ে মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগানের ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে গাড়িতে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। সুনীলদা ডাক্তারদের কাছে কিন্তু বলতে পারেনি বলে শোনা যাচ্ছে, যেটা এই জনতা রিংশাস করছে না। পুলিশ বিকেলবেলায় অনেকে তারিখ করার পর মৃতদেহ ছেড়েছে। কোনো ধরপাকড়ের কথা শোনা যায়নি এখনও। জনতার ধারণা হরতাল হোক এটা যারা চায়নি তারাই সুনীলদাকে মেরেছে। সুনীল রায়ের মৃত্যুতে আগামীকাল সেই চা-বাগানে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

শেষ মুহূর্তে সুনীলদার বাবা ঘাড় নাড়লেন। না, তিনি শাশানু যাবেন না। অনেকের অনুরোধে তাঁর এক কথা, ‘আমার স্ত্রীকে অমি দাহ করেছি, সুনীলকে আমার সঙ্গে সে রেখে গেছে বলে। সুনীলকে আমি দাহ করে কার জন্যে অপেক্ষা করব?’

শেষ পর্যন্ত সরিংশেখর এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ দূরে বসে তিনি চুপচাপ সব দেখছিলেন। অদ্রলোক শূশানে যাবেন না শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেন হেমলতা নিষেধ সত্ত্বেও, ‘মিঃ রায়, আপনি না গেলে যে ওর অমঙ্গল হবে।’

সুনীলদার বাবা বোধহ্য এখনও মানুষ চিনছিলেন না, ‘না, ও এখন মঙ্গল-অমঙ্গলের রাইরে।’

সরিংশেখর বললেন, ‘কিন্তু পিতা হিসেবে আপনার কর্তব্য তো শেষ হয়নি। আপনি ওকে জন্ম দিয়েছেন, পালন করেছেন, উপযুক্ত করেছেন, তাই তার শেষ যাওয়ার সময় আপনার উপস্থিতি ওকে যুক্তি দেবে।’

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ঘাড় নাড়তে লাগলেন তিনি, ‘হল না, হল না, ও বলত, মরে গেলেও আমি আবার কমিউনিস্ট হব। আচ্ছা, আপনার আঙ্গুল আঙুলে পুড়েছে আপনি সহ্য করতে পারবেন? পারবুন, অমি বড় দুর্বল, পারব না।’

প্রায় নিঃশব্দে সুনীলদাকে বাড়ির গেট খুলে বের করা হল। ওরা যখন যাত্রা শুরু করছিল, অনিমেষ তখন দৌড়ে পিসিমার কাছে গেল। দাদু নেই বারান্দায়। সুনীলদার বাবা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর লনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। অনিমেষ পিসিমাকে বলল, ‘আমি শূশানে যাব।’

ও ভেবেছিল পিসিমা নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন, তাই প্রশ্ন করেনি, নিজের ইচ্ছাটা জানিয়েছিল। কিন্তু ও অবাক হয়ে দেখল পিসিমা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। তারপর বললেন, ‘জামাপ্যান্ট পালটে একটা গামছা নিয়ে যা। কেউ চলে গেলে প্রতিবেশীর শূশানবন্ধু হওয়া উচিত।’ এই প্রথম পিসিমা এরকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দাদুর অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলেন না।

গামছা নিয়ে একটা পুরনো শার্ট গায়ে চাড়িয়ে অনি বারান্দায় এসে দাঁড়ানো দাদুর শরীরের পাশে দিয়ে দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে এল। সুনীলদাকে নিয়ে ওরা এতক্ষণ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। চিঠ্কির করে দাদু যেন কিন্তু বললেন পেছন থেকে, কিন্তু তা শোনার জন্য অনিমেষ অপেক্ষা করল না। টাউন ক্লাবের পাশের রাস্তায় শূশানযাত্রীদের ধরে ফেলল। ওরা তেরাস্তার মোড়ে আসতেই অনিমেষ খাটিয়ার পাশে চলে এল। ওগাশের হাসপাতাল-পাড়ার রাস্তা দিয়ে কয়েকজন ফুল নিয়ে এদিকে আসছিল, তাদের দেখে শূশানযাত্রীরা থামল। যে চার-পাঁচজন এসেছিল তারা ফুলগুলো সুনীলদার বুকে ছড়িয়ে দিতেই একজন বলে উঠল, ‘সুনীল রায়-তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না।’

চাপা গলায় অন্তুল অভিমান নিয়ে বলে-ওঠা এই বাক্যটির জন্য যেন এতক্ষণ সবাই অপেক্ষা করছিল। প্রত্যেকটি মানুষের বুকের এই কথাটা একজনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে সবার মুখ খুলে গেল। চলতে চলতে একজন চাপা গলায় বলল, ‘সুনীল রায়-তোমায় আমরা-’ বাকি কর্তৃগুলো দৃঢ় ভঙ্গিতে পূরণ করল, ‘ভুলছি না, ভুলব না।’

এই স্বপ্নের মতো জোক্সেয়-চুবানো শহরের পথ দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে অনিমেষের বুকের মধ্যে অচূত শিহরন জাগল। আজ রাস্তায় মিউনিসিপালিটির আলো জ্বলছে না। চন্দেব তাঁর সবচূক্ষ সঞ্চয় উজ্জ্বল করে দিয়েছেন, কারণ সুনীলদা শেষব্যাত্র চলেছে। শহরের পথে-পথে যারা জানত না এসবেং কিন্তু তারাও উৎসুক হয়ে এবং কিছুটা শুন্দর সঙ্গে ওদের দেখছিল। শোক্যাত্মা ক্রমশ দ্বিতীয়ের আকার নিয়ে নিল। অনিমেষ গঞ্জির গলায় বলে যাচ্ছিল, ‘ভুলব না, ভুলব না।’ কেন সে ভুলবে না এই মুহূর্তে ভাববার অবকাশ তার নেই।

দিনবাজারের পুল পেরিয়ে বাজারের সামনে দিয়ে ওরা বেগুনটুলির রাস্তায় এসে পড়ল। এতক্ষণ

অনিমেষ চুপচাপ হেঁটে আসছিল, এখন চলতে চলতে একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একে ও সুনীলদার কাছে দুএকদিন যেতে দেখেছে। এতক্ষণ সুনীলদারকে কাঁধে নিয়েছিল বলে শুকে লক্ষ করেনি অনিমেষ। সুনীলদার সঙ্গে খুব বাগড়া হয়েছিল এর সেদিন। সুনীলদা বলেছিল, ‘পার্লামেন্ট’র গণতন্ত্র, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বড়লোকের গণতন্ত্র, সমাজতাত্ত্বিক শাসনব্যবস্থা পালটে বড়লোকদের বাঁচাবার জন্য তাদের প্রয়োজনেই এর সৃষ্টি।’

ছেলেটি বলেছিল, ‘তা হলে আমরা সেটা সমর্থন করেছি কেন? কেন আপনি প্রকাশ্যে তা বলেন না?’

‘বলার সময় এলে নিশ্চয় বলব। ফোড়া না পাকলে অপারেশন করা হয় না।’ সুনীলদার এই কথা নিয়ে ওদের তর্ক উৎপন্ন হয়েছিল। অনিমেষ তার সবটা মাথায় রাখতে পারেনি। এখন হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি নিজের মনে বলল, ‘আর্ক্যু, রমলাদি আসেননি!'

রমলাদি। অনিমেষ ঘাইলাকে মনে করতে পারল। ওই যে হাতকাটা প্রোট নরম চেহারার মানুষটি পেছন পেছন হেঁটে আসছেন। তাঁর চেয়ে রমলাদি অনেক বেশি শক্ত হয়ে ছেটকাকার সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেই রাতে। দলের ছেলে কেউ নিহত হলে কর্মীরা সবাই আসবেই, অতএব স্বাভাবিক কারণেই রমলাদি না আসায় এই ছেলেটিকে ক্ষুপ হতে দেখল অনিমেষ।

না, একবারও হরিধনি দেয়নি কেউ। এতক্ষণ দমবক্ষ-করা পরিবেশে ওকে না-ভোলার অঙ্গীকার করা হচ্ছিল, হঠাত গলাগুলো পালটে গেল। কে যেন চ্যাচাল, ‘লং লিড সুনীল রাই- লং লিড লং লিড।’

‘সুনীল রায়ের হত্যাকারীর কালোহাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙ্গে দাও।’

‘হত্যা করে আদোলন বক্ষ করা-যায় না, যাবে না।’

‘সুনীল রায়কে মারল কারা-কংগ্রেসিয়া জবাব দিও।’

শেষ প্রোগান কানে যেতে থমকে দাঁড়াল অনিমেষ। ওরা হঠাত কী বলতে আরও করেছে? এর মধ্যে কংগ্রেসিয়া আসছে কী করে! সুনীলদারকে কি কংগ্রেসিয়া মেরেছে? কংগ্রেস মানে ভবানী মাট্টার, হরবিলাসবাবু, কংগ্রেস মানে বন্দেমাতরম। আবার চট করে ছেটকাকার মুখ মনে পড়ে গেল ওর, ছেটকাকা কি কংগ্রেস এখন? ছেটকাকার কাছে লিভারভার থাকে যে!

মিছিলটা ওকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন পরে হরবিলাসবাবুর নামটা মনে পড়তেই ওর মনটা কেমন করে উঠল। হরবিলাসবাবুকে সে শহরে আসার পর দেখেছে। এখন আর রাজনীতি করেন না তিনি। প্রথমে নিশ্চিথবাবু পর্যন্ত ওর খবর বলতে পারেনি। কংগ্রেস অফিসে আসেন না। এককালে স্বাধীনতা আদোলনে এই জেলায় সবচেয়ে যে-মানুষ আলোড়ান তুলেছিলেন, তাঁর কথা আজ আর কারও মনে নেই। অনিমেষ এক বিকেলে তাঁকে ডি সি অফিসের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিল। ভীষণ বৃক্ষ হয়ে গেছেন, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে আর দাবিদের ছাগ পোশাক থেকে মুখে ছাড়িয়ে পড়েছে। ভীষণ লোত হয়েছিল সেদিন ছুটে গিয়ে প্রণাম করতে। কিন্তু যদি চিনতে না পারেন, যদি ভুলে গিয়ে থাকেন সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগষ্টের সকালে স্বর্গছেড়ায় তিনি কোন বালককে কী দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা হলো: হরবিলাসবাবু ওর সামনে দিয়ে ঝাঁপ্তপায়ে চলে গেলেন, দমবক্ষ করে অনিমেষ দেখল তিনি ওকে চিনতে পারলেন না।

চাপা আক্ষেপের মতো দূরে-মিলিয়ে-যাওয়া মিছিলটা থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। ক্ষুলের মাঠে একদিন সিনেমা দেখিয়েছিল ওদের। চেন বেঁধে বিরাট এক দুর্ধর জন্তুকে নিয়ে যাওয়ার একটা দৃশ্য ছিল তাতে। প্রচণ্ড আক্রমে সে গজরাঙ্গিল, অথচ বলি থাকায় সেই মুহূর্তে তার কিছুই করার ছিল না। অনিমেষের মনে হল এই মিছিলটা যেন সেইরকম।

এখন রাত কটা কে জানে! কিন্তু একটুও ঝাঁপ্তি লাগচে না ওর। একটায় দোকানপাট কম এবং সেগুলোর ঝীপ বক্ষ হয়ে গিয়েছে। চাঁদটা এখন হেলতে মাথার ওপর এসে টুপির মতো বসে আছে। এই নির্জন রাত্তায় এক একা দাঁড়িয়ে ওর কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। দুপাশে লোকজন নেই, মাঝে-মাঝে এক-আধটা সাইকেল-রিকশা দ্রুত চলে যাচ্ছে। সুনীলদারকে কংগ্রেসিয়া মেরেছে? মাথা নাড়ল ও। কিন্তু অপঘাতে মারা গেলে আঘাতার শাস্তি পায় না। বাড়িকাকুর মুখে শোনা হরিশের গল্পটা মনে পড়তেই ও সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখন যদি সুনীলদা কাছে এসে বলে, হ্যাঁ অনিমেষ, তোমার

কংগ্রেসিরা আমাকে মেরে ফেলেছে, তা হলে সে কী করবে? সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। মিছিলের ধ্বনিটা আর আছে কি না বোৰা যাচ্ছে না। নিজেকে এই মুহূর্তে ভীষণ একা বলে মনে হতে লাগল ওর। সুনীলদা বলেছিল, যারা কংগ্রেস করে তারা সবাই খুনি-একথা আমি বিশ্বাস করি না। তবে তাদের নেতাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র নয়। এই গরিব দেশে কিছু বড়লোক নেতা চিরকাল। লাঠি ঘোরাতে পারে না। অনিমেষের বেয়াল হল, কথাটা আয় সত্তি। কংগ্রেস অফিসে গিয়ে সে দেখেছে সাইই হাজারুরকম গল্প বলে, কন্ট্রাটরদের আশ্বাস দেয়, মন্ত্রীর সুপারিশ ঢায়। কিন্তু এরা তো সেরকম কথা বলে না। যেন একই দেশে দুরকমের মানুষ বাস কুরে। কী ধরনের ক্ষেত্র থাকলে মানুষ এত রাত্রে একই রকম জেহাদ সারা শহরের মানুষকে ঘুণিয়ে যেতে পারে! আচ্ছা, এরা তো সবাই স্বচ্ছন্দে কংগ্রেস হয়ে যেতে পারত। কেন হয়নি? হলে তো এরা সুখেই থাকত।

অনিমেষ পায়েপায়ে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। একা থাকতে ওর ভীষণ তয় করছিল। বেগন্টুলির পাশ দিয়ে গিয়ে ও থমকে দাঁড়াল। বাঁদিকে একটু এগিয়ে গেলে ছোটমায়ের বাপের বাড়ি। আজ অবধি কখনো যায়নি সে ওখানে। কেউ তাকে যাওয়ার কথা বলেনি, আর অগ্রহও হয়নি তার। একমাত্র বাবার বিয়ের দিন-হাসি পেল অনিমেষের। কী মজাই-না সেদিন হয়েছিল! অল্পের জন্য ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল ও। একচুটে পালিয়ে-অনিমেষের মনে পড়ে গেল গলিটার কথা। ওর পা কেটে গিয়েছিল, আনন্দমঠ্টা হারিয়ে গিয়েছিল। আর সেই মেয়েটি-কী যেন নাম তার, আঃ, অনেক করেও নামটা মনে করতে পারল না। পেটে আসছে তো মুখে আসছে না। এটুকু মনে আছে সে ছিল অন্য সবার থেকে একদম আলাদা ধরনের। তাকে বলেছিল এই গলিতে আর কখনো না আসতে। কেন বলেছিল সেটা অনেক পরে বুৰাহে সে। ঝুলের বক্সুরা ইদনীং বেগন্টুলির এই গলিটার অল্প বসিয়ে করে। এদিক দিয়ে শর্টকাটে সোনালুক্কা ঝুলের ফুটবল মাঠে যাওয়া যায়। ওরা দল বেঁধে শর্টকাট করার নাম করে এদের দেখতে-দেখতে যায়। এখন ব্যাপারটা ওর কাছে ঘৃণ্ণ এবং ভীতিকর হওয়া সত্ত্বেও যখনই মনে পড়ে সেই মেয়েটি কী যৰতায় ওর পায়ে ব্যাডেজ বেঁধে দিয়েছিল তখনই সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। আচ্ছা, সেই মেয়েটি, কী যেন তার নাম এখন সেই ঘরটায় আছে তো?

ওকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন রিকশাওলা ঠাঠা করে হেসে উঠল। লাইটপোস্টের পাশে রিকশা রেখে সে তাতে চেপে বসে আছে। চোখাচোখি হতে খুব রাগ হয়ে গেল অনিমেষের। এমন সময় ও দেখল একটা মোটামতন লোক টলতে টলতে গলি থেকে বেরিয়ে আসছে আর তার পেছন পেছন বিভিন্ন বয়েসের কুড়ি-পঁচিশজন ভিখিরি চাঁচামচি করতে করতে আসছে। গলিটার মুখে এসে ওরা লোকটাকে ছেঁকে ধরতের রিকশাওলা চেঁচিয়ে উঠল। তাৰপৰ যে ছুটে গিয়ে লোকটাকে উদ্বার করে রিকশায় বসিয়ে উধাও হয়ে গেল। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে ভিখিরিগুলো কিছু কুরার অবকাশ পেলন না। হতাশ হয়ে ও ওকে গলাগালি দিতে গিয়ে আয় মারামারি বেঁধে গেল ওদের মধ্যে। এমন সময় কয়েকজনের নজর পড়ল অনিমেষের উপর। ওর দিকে তাকিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করতে আরম্ভ করতেই অনিমেষ প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। অবশ্য ওর কাছে কিছুই নেই যা ওরা কেড়ে নিতে পারবে। তুব এই এত রাত্রে মাতাল-ফসকে - ফেলা কুন্দ ভিখিরিদের এই চাহনিকে ও সহ্য করতে পারছিল না। আয় আপের ভয়ে অনিমেষ দৌড়াতে লাগল।

শিল্প সমিতি পাড়ার কাছাকাছি ও মিছিলটাকে ধরে ফেলল। এখন যেন অতো দীর্ঘ নয়, মিছিলের আকার বেশ ছোট হয়ে গেছে। কোনো হরিফনি নেই, শুধু একটি ইলাইন ঘুরে ঘুরে প্রতিতি মানুষের মুখে ফিরছে-‘সুনীল, রায়, আমরা তোমায় ভুলছি না ভুলব না। অমর শহীদ সুনীল রায়, মরছে না মরবে না।’

অনিমেষ মিছিলের পাশাপাশি চলতে চলতে তনল, কে যেন গলা খুলে হাঁটতে হাঁটতে কবতি আবস্তি করছে। কবিতাটি ওর চেনা, সুনীলদা ওকে পূর্বাভাস বলে একটা বই পড়তে দিয়েছিল, তাতে ওটা আছে। ও দেখল সেই ছেলেটি যার সঙ্গে সুনীলদার তর্ক হয়েছিল, সুনীলদার শরীরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে আকশের দিকে তাকিয়ে অনুভূত এক মায়াময় গলায় কবিতাটি বলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিটা আস্তে হয়ে এলে, যেন কবিতার কথাগুলো গান হয়ে গেল আর ধ্বনিটা তার সঙ্গে ন্তৰ হয়ে সঙ্গত করে যেতে লাগল-‘সময় যে হব বিক্ষ্যাল, ছেঁড়া আকাশের উঁচু ত্রিপল, দ্রুত বিদোহে হানো উপল-শত শত। যাথা তোল তুমি বিক্ষ্যাল, মোছ উদ্দগত অঙ্গজল, যে গেল সে গেল, ভেবে কি ফল? ভোল ক্ষত! ’ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল, ভুলছি না, ভুলব না। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্তাধারা

একটা শোকের মুভোয় বাঁধা পড়ে ক্রমশ এক হয়ে যাচ্ছে— অনিমেষ অনুভব করছিল। ওর হঠাতেইচ্ছে করেছিল সুনীলদার খাটিয়াতে কাঁধ দিতে। আজ অবধি কোনোদিন সে কাউকে কাঁধে করে শুশানে নিয়ে যায়নি। সত্যি বলতে কি, শুশানে সে গিয়েছিল একবারই। খুব অস্পষ্ট সেই যাওয়াটা মনে পড়ে। কিন্তু একটা লকলকে চিতার আগুন আর মা তাঁর মধ্যের মতো চুল ছড়িয়ে সেই আগুনে শয়ে আছেন, বুকের মধ্যে জন্মটিকার মতো এ-দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে আছে। আজ এতদিন বাদে শুশানে যাচ্ছে যে-অনিমেষ সুনীলদার পাশে চলে এল। যে-চারজন ওকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে তাকাল সে। প্রক্ষেপের মুখ এত গভীর এবং যেন মহান কোনো কর্ম সম্পন্ন করার নিষ্ঠায় মগ্ন যে অনিমেষ চেষ্টা করেও তাদের নিজের ইচ্ছেটা জানতে পারল না।

মাষকলাইবাড়ি ছাড়িয়ে ওরা শুশানে এসে গেল। ছোট পুলটা পেরিয়ে শুশানচতুরে চুকতেই অনিমেষের চট করে সমস্ত কিছু মনে পড়ে গেল। মাকে নিয়ে ওরা এখানে এসে ওই গাছটার তলায় বসেছিল। চিঁতা সাজানো হয়েছিল এই নদীর ধারটায়। বুকের মধ্যে সেই ব্যাথাটা তিরতির করে ফিরে আসছিল যেন, অনিমেষ অনেকদিন পর মায়ের জন্য কেন্দে ফেলল। কোনো-কোনো সময় চোখের জল ফেলতে এত আরাম লাগে—কখনো জানতে না সে। হঠাৎ একজন ওকে জিজ্ঞাসা করল, ‘সুনীল আপনার কেউ হয়?’ কথাটা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে প্রশ্নটা শুধরে নিল, ‘আঘায়?’

এবার চট করে চোখের জলটা মুছে ফেলল অনিমেষ, ‘আমরা এক বাড়িতে থাকি।’

ভদ্রলোক আর কথা বাঢ়ালেন না। দাহ করার তোড়জোড় চলছে। অনিমেষ ভালো করে নজর করে দেখল সুনীলদার জন্য কেউ কাঁদছে না। সবাই যেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সুনীলদার শেষকৃত্য করে যাচ্ছে। এখন কেউ কোনো ধনি দিচ্ছে না।

খুব অস্থিতি হচ্ছিল অনিমেষের। যেহেতু সুনীলদা হিন্দু, তাই অন্তর এই সময়ে হরিহরনি দেওয়া উচিত। একথাটা কারও মাতায় চুক্তে না কেবল? এই সময় হরিহরনি নেই, কান্না নেই—যদিও সে কখনো দাহ করতে শুশানে আসেনি, তবু পিসিমার কাছ থেকে শুনে-শুনে এটা একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে হচ্ছিল তার। শেষ সময়ে হরিনাম করলে আস্তার শান্তি হয়। কথাটা ও সেই ছেলেটিকে বলল। এতক্ষণ কবিতা আবৃত্তি করার পর শুশানে এসে সে চৃপ্তাপ সিগারেট থেয়ে যাচ্ছিল। কথাটা শুনে সে মান হাসি হাসল, সব মানুষের আঘাত কি এক নিয়মে চলে? কেটিপতি চোরাকারবারি আর সত্যিকারের একজন শহীদ মরার পর হরিনাম শুনলেই যদি আঘাত পায় তা হলে বলার কিছু নেই। সত্যিকারের কমিউনিস্ট তার যতক্ষণ দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ শান্তি পাবে না।’

অনিমেষ হঠাৎ অনুভব করল, ও যেন কথাটা অঙ্গীকার করতে পারছে না। ক্ষুদ্রিম বলেছিলেন দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফিরে জন্ম নেবেন। সত্যি একটা চোর আর শহীদের আঘাত সমান এবং সুবিধে পেতে পারে না।

অনিমেষ অলসভাবে পায়চারি করতে লাগল। দূরে একটা চিতা প্রায় নিবে এসেছে। কাঠগুলো জলে জলে আগুন নির্মিলি। প্রচও কানায় কেউ ভেঙে পড়েছে সেখানে, তাকে সামলাচ্ছে অন্যরা। হরিবোল ধনি দিতে দিতে আর-একটি মৃতদেহ নিয়ে শুশানের দিকে কিছু লোক আসছে। অনিমেষের এখন তাঁর তয় করছিল না। দুধেলা জ্যোৎস্নায় এই শুশানের মাটি গাছ নদী ধ্বনিক করচে। আকাশে এত নীল রঙ দেয়ে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গোল আধুলির মতো ঝুপলি চাঁদ চৃপ্তাপ সরে সরে যাচ্ছে। আচর্য, ঠিক এরকম সময় কিছু মানুষকে পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর শুশানে আনা হয়েছে পুড়িয়ে শেষ করে দেবার জন্য। ওর খুব মন-খারাপ হয়ে গেল, কেন যে ছাই শুশানে ও টাঁদের আলো পড়ে।

স্বান করিয়ে দাহ করার যে-নিয়মটা এখানে চালু আছে তা সকলে মানেন না, সামান্য জল ছিটিয়ে তুক্ত করে নেয় অনেকে—অনিমেষ শুনতে পেল। যে-ডোমাটি তদুর্বল করছিল তার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। এর মুখ দেখে মনে হয় না এইসব শোক দুঃখ একে শৰ্প করে। কখনো কি ও মাথা তুলে আকাশ-ভাসানো টাঁদটাকে ভালো করে দেখেছে মনে হয় না। সুনীলদার উলঙ্গ শরীরটাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে সে যেভাবে পা দুটো সোজা করে দিল তাতে পিসিমার উন্মন ধরানোর ভঙ্গিটা মনে পড়ে গেল ওর। চিতার কাছকাছি গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবাই সুনীলদার

কোমরের পেছনদিকটায় বিরাট জরুলটায় আলো পড়ে চোখ টেনে নিছে। মানুষ মরে গেলে তার কত গোপন জিনিস সবাই সহজে জেনে যায়—সুনীলদার এখন কিছু করার নেই। হঠাৎ ও মাকে দেখতে পেল। মা শয়েছিল সমস্ত চিতা আলো করে—ভীষণ সুনৰ দেখাচ্ছিল সেই চুলগুলো। সুনীলদাকে এই মুহূর্তে খুব দুর্বল, অসহায় বলে মনে হচ্ছিল অনিমেষের।

কে যেন বলল, ‘মুখাপ্তি করবে কে?’

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সুনীলদার বাবা আসেননি, কোনো আঝীয় এই শহরে থাকে না। সমস্যাটা চট করে সমাধান করতে পারছিল না শুশান্যাত্রীরা। এমন সময় অনিমেষ দেখল সেই ছেলেটি, যে আবৃত্তি করেছিল, যার সঙ্গে সুনীলদার খুব তর্ক হত, সে অলসভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে গেল, ‘কই, কী করতে হবে বলুন।’

একজন একটু বিধি নিয়ে বলল, ‘তুমি করবে?’

‘নিশ্চয়ই!’ ছেলেটি জাবাব দিল, ‘সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির, দিন নেই তর্ক ও মুক্তির। আমার চেয়ে বড় আঝীয় আর কে আছে! দিন।’ হাত নেড়ে নেড়ে কথাটা বলে সে পটকাঠির আগুনটা তুলে নিয়ে সুনীলদার বুকে ছুইয়ে মুখের ওপর বুলিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হাত আগুন ছুইয়ে চিটাটাকে জাগিয়ে দিল। কেউ কোনো কথা বলছে না, শুধু ফটফট করে কাঠ ফাটার শব্দ আর আগুনের শিখাগুলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে সুনীলদার দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ ভোমটা চেঁচিয়ে উঠল, বোল হবি হিরিবোল! তার সেই একক কর্তৃ শুশানের আকাশে একবার পাক খেয়ে ফিরে এল আচমকা। অবাক হয়ে সে শুশান্যাত্রীদের দিকে তাকাল, তার অভিজ্ঞতায় এইরকম নৈশঙ্খ্য সে বোধহয় দেখেনি।

নীরবতা এতখানি বুকচাপা হয় এর আগে অনিমেষ এমন করে কখনো বোঝোনি। সেই বাড়ি থেকে বের হবার পর যে-ধৰনি দেওয়া চলছিল, যে-মানুষগুলো সুনীলদাকে কেন্দ্ৰ করে জেহাদ জানাচ্ছিল, এখন এই সময় তারা ছবিৰ মতো মাথা নিচু কৰে দাঁড়িয়ে আছে। কতখানি ভালোবাসা পেলে এৱকমটা হয়—অনিমেষ আঁচ করতে পারছিল না। তবে সুনীলদা কিছু মানুষকে ভীষণৱৰকম আলোড়িত কৰেছিলেন, এখন অনিমেষ নিজেকে তার বাইৱে ফেলতে পারল না। আগুন কাউকে ক্ষমা করে না, সুনীলদার শৰীরটা ক্রমশ গলে গলে পড়ছে। মা'রও এৱকমটা হয়েছিল। হঠাৎ দুচোখে দুহাতে চাপা দিল অনিমেষ। এ-দৃশ্য সে দেখতে পারছে না। কিন্তু চোখ বৰ্জ কৰেও সে যে নিষ্ঠার পাছে না। অজস্র ছোট ছোট চিতা চোখের পাতায়-পাতায় জুলে যাচ্ছে। এটাকে নেভাতে গেলে অন্যটা জুলে উঠে।

চোখ খুলতে সাহস হচ্ছে না, অথচ—। অনিমেষ এই অবস্থায় শুনতে পেল সেই ছেলেটা নিজের মনে কিছু আবৃত্তি করে যাচ্ছে। মনে হয় ঘোরের মধ্যে আছে সে। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ সবাই কথা বলে উঠল। দুর্গঠাকুর বিসর্জনের সময় সাতপাক ঘোরালো হয়ে গেল জলে ক্ষেত্ৰবাৰ মুহূৰ্তটাতেই এইরকম বাস্তু উজ্জ্বলের মধ্যে হয়ে থাকে। অনিমেষ বৰ্ষ-চোখ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল, কুব চাপা এবং রক্ষণ গলায় ছেলেটি বলছে, ‘কমৰেড, তোমায় আমি ভুলছি না, তুলব না।’ চোখ খুল অনিমেষ, খুলে একটু একটু কৰে সাহস এনে চিতার দিকে তাকাল। না, সুনীলদা ওখানে নেই। একটা দল-পকালো কালো কিছু পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই পৃথিবীৰ কোথাও আৱার সুনীলদাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একটু একটু করে মানুষজন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। সামান্য বাতাস দিচ্ছে। কোথা থেকে হালকা মেঘেৰা এসে মাঝে-মাঝে চাঁদৰের মুখ আড়াল কৰে যাচ্ছে। সেই মুহূৰ্তে সমস্ত চৰাচৰে একটা ছায়া দূল দূলে যাচ্ছে। অনিমেষ দেখল সেই ছেলেটি আক্ষেন্তের মতো হেঁটে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। যেতে-যেতে মুখ তুলে চাঁদকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, ‘ঠিক ঠিক। কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি কুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়-পূর্ণিমা চাঁদ যেন জলসানো রঞ্জি।’

অনিমেষ আৱার দাঁড়াল না। ও দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিৰ সঙ্গ নিল। ছেলেটি ওৱ দিকে তাকিয়ে হাসল, ‘পথ অনেকটা, কিন্তু আমাকে একা হাঁটতে হচ্ছে না, তুমি আৱ আমি হাঁটলে পথ আৱ বেশি হবে না। কী বল?’

অনিমেষ কোনো কথা বলল না। হাঁটতে হাঁটতে ব্ৰিজেৰ ওপৰ এসে ওৱ খেয়াল হল, যাঃ, স্নান কৰা হয়নি। পিসিমা বলেন, শুশানে এলে স্নান কৰে যেতে হয়। তাই গামছা নিয়ে ঔসেছে সে। কিন্তু

এই মুহূর্তে স্থান করার কথা ভাবতে পারছে না ও। শরীর নোংরা হলে লোকে স্থান করে। সুনীলদাকে দাহ করার পর স্থান করার কোনো মানে হয়? এই সময় ছেলেটি হঠাতে আকাশের দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘চাঁদটা আজ বড় জ্বালাচ্ছে, না?’

॥ দশ ॥

এবার জলপাইগুড়ি শহরে প্রচণ্ড শীত পড়েছে। প্রবাণেরা এর মদেই বলতে আরঞ্জ করেছেন, সেই চল্পিশ সালের পর এত মারাঘৃত শীত নাকি তাঁরা দেখেননি। অনিমেষের এইসব কথা শুনলে বেশ মজা লাগে। লোকেরা যে কী করে সব কথা মনে রাখে! এই যেমন বর্ষাকালে বামুকাম করে তিনিদিন ধরে আকাশ ফুটো হয়ে বৃষ্টি পড়ল, অথবা জৈষ্ঠমাসে রাতদুরুরেও ঘেমে গিয়ে হাতপাখার বাতাস থেয়ে হল, ব্যস, বৃদ্ধরা বলতে আরঞ্জ করেন সেই অযুক্ত সালের পর নাকি এবারের মতন বৃষ্টি বা গরম এর আগে দেখেননি।

তবে এবারের ঠাভাটা জববর কনকনে। তোরবেলা বিছানা থেকে উঠে মেঝেতে পা রাখতে একদম ইচ্ছে হয় না। সকাল হচ্ছে দেরিতে, সেই আটটা অবধি সামনের মাঠে কুয়াশার চুপচাপ বসে থাকে। আবার সাড়ে চারটে বাজতে—না বাজতেই অঙ্ককার ডালপালা মেলে দেয়। এতদিন ওর কোনো সায়েটার ছিল না। তুম্বের চাদর গায়ে দিয়ে শীতাটা দিব্যি কাটিয়ে দিত। সেই কোন ছেলেবেলার কুলহাতা পলওভারটা এখনও সুটকেসে তোলা আছে। ওর বৰুবাৰুবৰা কত রকমারি সোয়েটার পরে বিকেলে বাঁধের ওপর বেড়াতে হয়—অনিমেষের এতিন ছিল না, পুরার প্রশ্নও পঠেনি। এবার জয়দি ওকে নীল-সাদা-হলুদ-মেশানো একটা সোয়েটার তৈরি করে দিয়েছেন, কথা ছিল টেক্টে অ্যালিউড হলেই ও সেটা পাবে। অনিমেষ জানত টেক্টে সে কখনোই ফেল করবে না, তবু এর আগে তো কখনো টেক্ট দেয়নি, চিৰকাল এসময় আনন্দুল পরীক্ষাই দিয়ে এসেছে, এবার তাই উজ্জেনা ছিল আলাদারকম। কাল ফেল বৈয়ৱেছে, জেলা স্কুল থেকে এই বছর সবাই টেক্টে পাশ করে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। অনিমেষের স্থান চৰ্তৰ্থ: অৰ্ক, অৱৰ্প, মটু এবং অনিমেষ। মন্তুর অবশ্য এই প্রেস পাওয়াতে কিছু যায়—আসে না। তবে ইন্দানীং পড়াশুনায় মনোযোগী হয়ে পড়েছে যেন ও। এবার একটাও প্রশ্ন ইচ্ছে করে ছেড়ে আসেনি।

তিন মাস পর ফাইনাল পরীক্ষা। এবার ফি জমা দিতে হবে। কাল বিকেলে যখন বাড়িতে এসে ও খবরটা দিল তখন জয়দি পিসিমার কাছে বসে ছিলেন। খবর শুনে পিসিমা তো চ্যাচামেটি করে দানুকে ডাকাডাকি করতে আরঞ্জ করলেন। জয়দির সামনে পিসিমার কাও দেখে অনিমেষের লজ্জা-লজ্জা লাগছিল। কিন্তু জয়দি চট করে পিসিমার দলে ভিড়ে গেলেন, ‘ও বাবা, তুমি কোর্পে হয়েছে! জেলা স্কুলের ফোর্ম বয় মানে তো ফার্স্ট ডিভিশন একদম বাঁধা-ইস, এটিসখানি ছেলে কলেজে পড়তে চলল!’

চটির শব্দ হতে জয়দি দৌড়ে চলে গেলেন আচমকা। অনিমেষ দানুকে দেখে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টেক্টে পাশ করলে কি ধূমাম করা উচিত?

সরিৎশেখৰ নাতিৰ মুৰেৰ দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমাদেৱ বৎশে কেউ ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ কৱেনি। তোমার এবারের মাৰ্কস কেমন?’

অনিমেষ মাথা নিচু করে ‘তিন মন্ত্ৰ কিছুই না, একটু পড়াশুনা কৱলে ওটা পেতে অসুবিধে হবে না। তুমি এখন বাইৱেৰ জগৎ থেকে মনটা সরিয়ে নাও। জীবনে বারবাৰ ফাইনাল পরীক্ষা আসে না।’ কথাটা বলে চট করে ঘুৰে ঘৱেৱে ভেতৱে চলে গেলেন। অনিমেষ দানুর এইৱকম নিৰাসস্ত কথাৰাত্তায় অভ্যন্ত, কিন্তু একটু পৱেই চটিৰ আওয়াজ ফিরে এল, ‘এই নাও, রোজ খাওয়াওয়াৰ পৰ দৃঢ়াচ্য কৱে থাবে।’

একটা বড় শিশিতে সিৱাপমতন কিছু তিনি অনিমেষের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হতভবেৰ মতো সেটাকে হাতে নিয়ে অনিমেষ তাৰ গায়ে কোনো লেবেল দেখতে পেল না, ‘এটা কী?’

সরিৎশেখৰ খুব নিচিত গলায় বললেন, ‘ধীৱেশ কৰিবাজকে দিয়ে কৱিয়েছি, ব্ৰাহ্মীশাক থেকে তৰি এই টনিকটা খেলে তোমাৰ ব্ৰেন ভালো হবে, সব ব্যাপাৱে উৎসাহ আসবে। দেখবে তিন নম্বৰ পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।’

অনিমেষ বিহুল হয়ে পড়ল। কত আগে থেকে দাদু তার জন্য এত চিন্তা করেছেন! ও শিশিটাকে আঁকড়ে ধরল। সরিষ্পেখর বললেন, ‘তোমার ফাইল পরীক্ষার ফি কত, জান?’

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল অনিমেষ, ‘না।’ টাকাপয়সায় কথা উঠলেই আজকাল ওর খুব অস্বত্তি হয়।

সরিষ্পেখর বললেন, ‘ঠিক আছে, আমি জেনে নেব। তোমাকে ফার্স্ট ডিভিশন পেতেই হবে অনিমেষ। তোমার মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।’

কথাটা শনে দাদুর দিকে তাকাল অনিমেষ। সরিষ্পেখুর এখন অলসগায়ে ভেতরে চলে যাচ্ছেন। মাকে দাদু কবে কথা দিয়েছিলেন? এতদিন শোনেনি তো সে! স্বর্গহেঁড়া থেকে যখন এসেছিলেন, তখনই কেউ দশ বছর বাদে কাউকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করানোর কথা দিতে পারে না। ওর মনে হল দাদু শুনিয়ে ফেলছেন। সৃতিতে কোনাকিছু গোলমাল হয়ে গেলে মুত ব্যক্তির নাম করে নিজের ইচ্ছেটা স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেওয়া যায়। ধৰা পড়ার ভয় থাকে না এবং সেটা জোরদারও হয়। অনিমেষ হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জয়াদির গলা পেল ও, ‘এ মা, একা একা দাঁড়িয়ে হাসছ যে, পাগল হয়ে গেলে নাকি!’

অনিমেষ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জয়াদি একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসেছেন, ‘কী খটা?’

ফস করে নীল-সাদা-হলুদ-মেশালো সোয়েটারটা বের করে ওর সামনে ধরল, ‘পরে ফ্যালো।’

জয়াদি ওর জন্য সোয়েটার বানাচ্ছেন, মাঝে-মাঝে বুক-পিট্টের মাপ নিয়ে যান, একথা সবাই জানে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে অনিমেষের ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। সে চিৎকার করে পিসিমাকে ডাকল, ‘পিসিমা-তাড়াভাড়ি!’

সরিষ্পেখর যখন কথা বলছিলেন তখন হেমলতা রাম্মাঘরে ফিরে পিয়েছিলেন। চিৎকার শব্দে ছুটে এলেন, ‘ও মা, হয়ে গেছে! বলিসনি তো! কী সুন্দর! আর-জন্মে জয়া তোর কেউ ছিল অনি।’

জয়াদি হেসে বললেন,, ‘ও মা, এ-জন্মে আমি বুঁধি কেউ নই?’

অনিমেষ হাত বাড়িয়ে সোয়েটারটা নিল: কী নরম উল! পিসিমা আর জয়াদিতে মিলে ওকে সোয়েটারটা পরালেন। পিসিমা সমানে জয়াদিল হাতের প্রশংসা করে যাচ্ছেন আর জয়াদি ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে সোয়েটারটা ঠিক করে দিচ্ছেন-অনিমেষের খুব লজ্জা করছিল। সুন্দর ফিট করেছে সোয়েটারটা, পিসিমা বললেন, ‘তুই পাশ করে কলকাতায় গিয়েও এই সোয়েটারটা পরতে পারবি তিন-চার বছর।’

জয়াদি বললেন, ‘তখন দেখবেন এটা পছন্দই হবে না।’

পিসিমা বললেন, ‘আমি তো বাবা এত ভালো সোয়েটার কাউকে পরতে দেবিনি?’

কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। কথাটা ইন্দীং এ-বাড়িতে মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে। মহীতোষ নাকি সরিষ্পেখরকে বলেছেন সেকথা। অনি যদি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে তা হলে কলকাতায় পাঠাবেন। এখানকার এ সি কলেজে পড়াত্মা খুব-একটা সুবিধের হবে না। কলকাতায় যাবার কথা শুনলেই দয় বৰু হয়ে আসে আনন্দে। কলকাতা বাংলাদেশের প্রাণ-। বেশি ভাবতে গেলেই অনেকেরকম চিন্তা আসে। কলকাতার রাস্তায় সিনেমা-স্টোররা ঘুরে বেড়ায়, কবি-লেখকরা সেখানে আড়া দেন। মধুসূন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর কলকাতার রাস্তায় হেটেছেন। অস্তুত একটা রোমান্টিক জগৎ তৈরি হয়ে যায় মনেমনে। ফার্স্ট ডিভিশন পেতেই হবে-যেমন করেই হোক। হাতের শিশি আর বকের সোয়েটারটার দিকে তাকাল সে। সামান্য টেক্টে আলাউড হয়ে যদি এতগুলো মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায়, তা হলে ফাইল পরীক্ষায় সে কেন ডিভিশন পাবে না? সোয়েটারের নরম ওমটা শরীরে জড়িয়ে অনিমেষ পিসিমা আর জয়াদির দিকে তাকিয়ে এই প্রথমবার আবিষ্কার করল, যারা খুব অল্পেই খুশি হয় তাদের জন্য সবকিছু করা যায়।

নতুন সোয়েটারটা পরে অনিমেষ বিকেলবেলায় বেরিয়েছিল। রাত্না দিয়ে যে যাচ্ছে সে-ই একবার ওকে ঘুরে দেবিবে। নতুন স্যার একবার খবর দিয়েছিলেন দেখা করার জন্য। নিরীখবাবুকে ও আজও মাঝে-মাঝে পুরনো নামে ভাবে। বোধহয় সংক্ষারের মধ্যে যেটা একবার চুকে যায় তাকে চট করে ছাড়ানো যায় না। জলপাইগুড়ি শহরে এবার নির্বাচনী প্রচার এখনও শুরু হয়নি। মাঝে-মাঝে কংগ্রেস অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে কিছু পোষ্টার দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস থেকে তেমন গা করবে

না এখন। জেলা থেকে যিনি মন্ত্রিত্ব পান তিনি হেরে যাবেন অতি বড় সমালোচকও আশা করতে পারেন না। তাঁকে কদিন আগে দেখেছে অনিমেষ, বেশ নধরকাঞ্জি, দুখেআলতা রঙ, বয়স হয়েছে। এখন নড়েচড়ে বসতে অসুবিদে হয়। অথচ জেলার মানুষ, বিশেষ করে রাজবংশীরা ভদ্রলোককে ভীষণ সমর্থন করে। সেটাই ওর জোর। অবশ্য কংগ্রেসের জোড়া বলদ নিয়ে নামলেই হল—যে দাঁড়াবে সেই ভাবে আমাকেই সমর্থন করছে।

সুনীলদার সেই বক্র যার সঙ্গে শাশানে আলাপ হয়েছিল, সে বলেছিল পার্টি অফিসে আসতেই হবে তার কোনো মানে নেই। আগে মন্টা তৈরি করো। কথাটা ভালো লেগেছিল অনিমেষের। কমিউনিষ্ট পার্টি, পি.এস.পি ফলোয়ার্ড ব্রক-এই তিনিটি বিরোধী দল এই শহরে বিক্ষেপ করে মাঝে-মাঝে—কিন্তু কেমন যেন দানা বাঁধে না। খবরের কাগজে আজকাল কলকাতার খবর পড়ে অনিমেষ। সেখানে প্রায়ই মিছিল হয়—খাদ্য আস্তেলন হয়, তারপর সব চৃপচাপ হয়ে যায়— যেন আগের দিন কিছুই গুরুতর ব্যাপার হয়নি। এখানেই কেমন খটকা লাগে অনিমেষের। নিশীথবাবুর সঙ্গে একদিন খোলাখুলি আলোচনা করেছিল অনিমেষ। নিশীথবাবু বলেছিলেন, ‘কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের পরিবর্তে ধর্মসংঘক কাজকর্ম করছে। সত্তি কথা বলতে গেলে, ওরা জানেই না ওরা কী চায়।’ তারপর অনিমেষকে দমিয়ে দেবার জন্য বলেছেন, ‘যারা কমিউনিষ্ট পার্টির মাথায় বসে সর্বহারাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে গরম-গরম কথা বলে, খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, তারাই নিজের প্রাসাদে বসে সেটা করে থাকে। যার পেটে খাবার নেই তাকে সহজেই উত্তেজিত করা যায়, কিন্তু তার খিদে মেটানোর রাস্তাটা বলে দেওয়া সহজ নয়। কমিউনিষ্টরা সেটা জানে, তাই ও-পথে যায় না।’

অনিমেষ বলেছিল, ‘কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ তো গরিব-গরিবের কথা কংগ্রেস ভাবে না কেন? গরিবদের জন্য কংগ্রেস কী করেছে?’

বিরক্ত হয়েছিলেন নিশীথবাবু, ‘আট বছরেই একটা দেশকে দেওয়া যায় না। সময় লাগবে অনিমেষ। কমিউনিষ্টরা যখন কোনো কথা বলে, রাশিয়ার কথা আওড়ায়। বড় বড় বোলচাল ছাড়া কোনো কমিউনিষ্টকে বক্তৃতা দিতে শুবে না। তুমি কি ওদের দিকে ঝুকবে, অনিমেষ?’

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেনি অনিমেষ। পরে বলেছিল, ‘আমার যেন কেমন লাগে। কমিউনিষ্টরা যা চায় সেটা ভালো লাগে, কিন্তু যেভাবে চায় সেটা একদম ভালো লাগে না।’

নিশীথবাবু মুখ দেখে অনিমেষ স্পষ্ট বুবাতে পারলে, উত্তর ওর একদম পছন্দ হয়নি। গঙ্গারমুখে বলেছিলেন, ‘অনিমেষ নিজের দেশকে নিজেদের মতো করেই সেবা করা উচিত। মাছনি কংগ্রেসের সবাই ক্রটিমুক্ত নয়, অনেকেই স্বীর্থ নিয়ে আসে, তবু এদের নিয়েই লক্ষ্যে পৌছাতে হবে। অভিজ্ঞতা যত বাড়ে কাজ করতে তত সুবিধা হয়।’

টাকাপয়সা হাতে এলে সরিষ্পেখের আবার আগের মতো হয়ে যান। বাড়িভাড়া নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল সিটা এখন আর নেই, নিয়মিত টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু বাজারদের যেরকম বাড়ছে, তাতে পাল্লা দেওয়া মূল্যক্রিয়। জালের দাম হচ্ছে করে বেড়ে যাচ্ছে। প্রিয়তোষ মাঝে-মাঝে চিঠি দেয়। টাকাপয়সার দরকার হলেই যেন তাকে জানানো হয়—এই ইচ্ছে জানিয়ে সে ঠিকানাসহ চিঠি দিছে, সরিষ্পেখের মাঝে মাঝে লোত হয় টাকা চাইতে, কিন্তু শেষ সময়ে সামলে নিয়ে উত্তর দিছেন না। তাঁর সদেহ হেমলতার সঙ্গে প্রিয়তোষের যোগাযোগ আছে। তবে পরিতোষ একদম মাড়ায় না এন্দিকে। একটুও কষ্ট হয় না তাঁর জন্য সরিষ্পেখেরে। মহীতোষ আসেন মাঝে-মাঝে—নিয়মিত ছেলের নাম করে টাকা পাঠান। মহীতোষের একটা অস্তুত পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং মধ্যে। ভীষণ গভীর হয়ে গেছেন আর চেহারাটা হয়ে গিয়েছে বুড়োটে-বুড়োটে। এ-পক্ষে সন্তানাদি হল না তাঁর। মহীতোষের স্ত্রী শৰ্ষেছেড়া থেকে একদম নড়তে চায় না। তাকে অনেকদিন দেখেননি তিনি। হেমলতা বলতে মহীতোষ বলেছিলেন, ‘সে ও-বাড়ি ছেড়ে নড়বে না।’

‘বয়স তাঁকেও কবজা করেছে। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কিন্তু বড়সড় কোনো অসুখ তাঁর হয়নি, সেই রিকশার ধাক্কায় পড়ে গিয়ে পা—জাঙা ছাড়া। শীত সহ্য করতে আজকাল একটু কষ্ট হয়। লালইমলির সেই পুরনো গেজি, পাজাবি মোটা কাপড়ের কোট আর তুমের চাদরে লড়ে যান প্রণপণে। বাঁচতে খুব ইচ্ছে হয় তাঁর। ২ ত কী জিনিস হচ্ছে পৃথিবীতে, অন্যান্য মানুষের মতো চট করে মরে যাবার কোনো বাসনা হয় না। কিন্তু মুশকিল হল, শীত পড়েছিল শানিয়ে—তা একরকম ছিল, সঙ্গে যে আজ রাত থেকে অসময়ের বৃষ্টি নামল! একদম শ্বাবণ্ঘনাসের বৃষ্টি।’

শীতকালে জলপাইগুড়িতে হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টি আসে। ঠাভাটা বাড়িয়ে দিয়ে যায়। যে সমস্ত মানুষ জরায় থিতোছিল তার টুপটোপ চলে যায় এ-সময়। তিক্তায় তখন টানের সময়। শীতের দাপটে হ্রদয় কুকড়ে যাছে নদীটা। তবু জল এখনও টলমলে। স্নোতের ধার নেই, ঘোবন-ফুরিয়ে যাওয়া মহিলার মতো শুধু জ্বাবর কটো যাওয়া। বাঁধ আয় সম্পূর্ণ। ওপাশে সেনপাড়া ছাড়িয়ে তিক্তার বুকের পুর পুল বানাবার কথাবার্তা চলছে। কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে-বাসে আসাম যাওয়া যাবে। পঙ্কজরাজ ঠ্যাকসিগুলো গা-গতর বেড়েমুছে এই কটা বছর কিছু কামিয়ে নেবার জন্য কিংসাহেবের ঘাটের দিকে আসব-আসব করছে। এই সময় সঙ্গে থেকেই আকশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল।

ভোর হল, ঘড়ি দেখলে বোঝা যায়-আকাশ তেমনি গোমড়াযুক্তো। জল ধরবার চিহ্ন নেই। যেন বর্ষা চলে যাওয়ার সময় এই মেঘগুলোকে হিমালয়ের ভাঙ্গে-ভাঙ্গে ফেলে রেখে গিয়েছিল, নাহলে এই সময়ে এত বৃষ্টি পড়ে কখনো। তিক্তার জল বাঢ়ে। যেন কোনো শুষ্ণ ওষুধে ঘোবন ফিরে এল তার-এরকমটা কখনো হয় না। লক্ষ্মীপুজোর পর এত জল তিক্তায় বয় না। কিন্তু শহরের মানুষ এবার নিশ্চিন্ত। সেই প্রলয়কর বন্যাটাকে রুখে দেবে নতুন-তৈরি বাঁধ। তিক্তা সরাসারি শহরটাকে ধাস করতে পারল না এবার। কিন্তু করলার জল ছিটকে উঠে এল কিছু কিছু নিচু জায়গায়। হাসপাতাল-পাড়াটা এই ঠাণ্ডায় তিনদিন জলের তলায় ছুবে রাইল। আহাদী মেয়ের মতো করলা শিয়ে মুখ ঘষছে কিংসাহেবের ঘাটের পাশে তিক্তার বুকে।

ঠিক তিনদিন তিনরাতের শেষে বৃষ্টি থেমে রোদ উঠল। হেমলতার অবস্থা খুব কাহিল। গরম বন্ত তার বেশি নেই। যতক্ষণ পেরেছেন উন্নুনের পাশে বসে থেকেছেন। চিরকাল এই কাঠকয়লার আশঙ্কগুলো তাকে শীত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আপদমস্তক-মোড়া সরিষ্পেখের রোদ উঠলে উঠলে এসে বসলেন। দুজনে গল্প করছিলেন, আজ সঙ্গে থেকে শীত ডবল হয়ে পড়বে। রোদ উঠলেই শীত বাঢ়ে। অনিয়েষ বাজারে গিয়েছিল। শুধু আলু, টেকিশাক আর ঢ্যাডশ নিয়ে ফিরে এসে বলল, ‘শিকারপুর ফরেস্টের দিকে প্রচণ্ড বল্যা হয়েছে, ভোটপাটি ভেসে গেছে।’

হেমলতা বাজার দেখে বললেন, ‘ইস, তুই এতক্ষণ ধরে এই বাজার আনলি?’

অনিয়েষ বলল, ‘কিছু থাকলে তো আনব! সবাই মারামারি করে নিয়ে নিচে যা পাচ্ছে।’ অনেকদিন পরে বাজারে গিয়ে অনিয়েষ অত্যাশ বিরাগ। ফেরত-টাকাটা সে দাদুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

সরিষ্পেখের টাকা নিয়ে বললেন, ‘মাছ এনেছ?’

অনিয়েষ ঘাড় নাড়ল, ‘না।’

সরিষ্পেখের রাগ করলেন, ‘কী আশ্চর্য! তোমাকে আমি যা বলি শোন না কেন? এখন এই তিনমাস মাছ না থেলে তোমার শরীরে বল হবে কী করে? বেশি পড়াশুন করতে গেলে শরীরে জোর দরকার হয়।’

অনিয়েষ হাসল, ‘ত্রিশ টাকা সের কাটাপোনা খাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। অত দামের মাছ তাই সবাই কিনছে না। মাছ না থেলেও আমার চলবে।’

নিশীথবাবু বললেন, ‘আমাদের আরও দুর্গম জায়গায় যেতে হবে। এখান থেকে জল হয়তো আজ দুগুরেই নেমে যাবে, তা ছাড়া অন্য পার্টি ও রিলিফ নিয়ে আসতে পারে।’

ওরা যে চলে যাচ্ছে মানুষগুলো প্রথমে বুরাতে পারেন। কিন্তু সামা বোঝামাত্র কান-ফাটানে চিক্কার উঠল। কাকুতি-মিনতি থেকে তরু করে কান্না-অনিয়েষের সঙ্গে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। নিশীথবাবু এটা কী করে করলেন! অভুক্ত মানুষগুলোকে কিছু জ্বাবর দিয়ে গেলে এমন কী মহাভারত অঙ্গ হত! তা ছাড়া কাগজের লেবাটা দেখার আগে পর্যন্ত শুধু মুখ দেখে মনে হয়নি আরও দুর্গম জায়গার জন্য এই খাবারগুলোকে রাখতে হবে। ডিঞ্জিনোকো দূরে চলে যাচ্ছে দেখে এবার গালাগালি তরু হল! পৃথিবীর শেষতম অঙ্গীল ভাষ্য গালাগালিগুলো শনতে শনতে অনিয়েষ বলল, ‘স্যার, না থেকে পেলে এরা মরে যাবে। কিছু দিলে ভালো হত-।’

অনিয়েষের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন নিশীথবাবু। জ্বাব দেবার কোনো প্রয়োজন মনে করলেন না যেন। অনিয়েষ দেখল কয়েকজন বোধহ্য আর ধাককে না পেরে গাছ থেকে হলে ঝাপিয়ে পড়ল। তারপর প্রাণপনে সাঁতার কেটে কাছে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নৌকো তখন অনেক দূরে, ওদের নাগালের বাইরে। এর ভাঙা ঘর, ওর উঠোনের পাশ দিয়ে ওর চলেছে। হঠাৎ অনিয়েষের চোখে পড়ল একজন প্রায় পুরুষ হয়ে যাওয়া বুড়ি একটা ভাঙা ঘরের টলে-থাকা খড়ের চালে

কোনোরকমে বসে আছে। কিন্তু-একটা আসছে বুঝতে পেরে চোখে হাতের আড়াল দিয়ে অঙ্গুত খনখনে গলায় বলে উঠল সে, ‘কে যায়-অ মণি-আইলি নাকি?’ ওরা কেউ কোনো কথা বলল, না, নিশ্চকে জায়গাটা পার হয়ে গেল। বুড়ি তখনও কেটে-যাওয়া রেকর্ডের মতো বলে যাচ্ছে, ‘অ মণি-কথা ক, অ মণি-কথা ক’।

নিশীথবাবু এবার অনিমেষের দিকে ফিরে তাকালেন। একটু অবস্থি হচ্ছে ওর মুখ দেখলে বোঝা যায়। যেন নিজের সঙ্গে কথা বললেন উনি, ‘নিজেকে শক্ত করো অনিমেষ। আজকেই ওরা খাবার পেয়ে যাবে। কমিউনিস্টরা গতবার এদের ভোট পেয়েছিল, খাবার ওরাই পোছে দেবে।’

কেউ যেন লক্ষ কাঁটাওয়ালা চাবুক দিয়ে ওকে আচমকা আশাত করেছে, অনিমেষ সোজা হয়ে বসল, ‘আপনি ইঞ্জন ওদের খাবার দিলেন না?’

‘গুরগাছ দেখেছ? যাদের খাবে তারাই সর্বনাশ করবে। কংগ্রেস সরকার এদের আশ্রয় দিয়ে গ্রাম তৈরি করে দিয়েছিল, তার বিনিময়ে ওরা কমিউনিস্টদের ভোট দিচ্ছে। জেনেভানে মানুষ দ্বিতীয়বার ভুল করে না। তা ছাড়া আমাকে হৃক্ষমতো কাজ করতে হচ্ছে।’

অনিমেষ বলতে গেল, ‘কিন্তু—’

‘না, আর কথা নয়। রাখিয়াতে কোনো কমিউনিস্ট যদি এইরকম পরিস্থিতিতে তার দলনেতাকে প্রশংস করত তা হলে তার চরম শাস্তি হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু আমরা বাক-সাধীনতায় বিশ্বাস করি, তাই তুমি প্রশংস্তা করতে পারলে। তফাত বুঝতে চেষ্টা করো।’

অনিমেষ পেছন ফিরে তাকাল। সেই গামটা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। ‘অ মণি কথা ক’ বৃদ্ধার গলাটা ভুলতে পারছে না সে। হঠাৎ ওর মনে হল সুভাষ বোস, গাঙ্কীজি যদি এ-পরিস্থিতিতে পড়তেন তা হলে তারা কী করতেন। নিশ্চয়ই নিশীথবাবুর মতো কথা বলতেন না। মানুষের খাবার নিয়ে, একদম নিঃব-হয়ে-যাওয়া মানুষের বাঁচবার অধিকার নিয়ে যে-রাজনীতি চলছে তা সমর্থন না করলে যদি রাজনীতি না করা যায় তবে দরকার নেই তার রাজনীতি করে। ওর মনে পড়ল নিশীথবাবু অনেকদিন আগে একবার বলেছিলেন, ‘যারা বাস্তুহারা, বন্দেমাতরাম মন্ত্র তাদের মুখে আসতেই পারে না। কথাটা আজ এতদিন বাদে তিনি নিজের আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন নতুন করে। আচ্ছা, কমিউনিস্টরাও কি কোনো কংগ্রেসি গ্রামে গেল রিলিফ দেবে না? কী জানি! অনিমেষ আর তাবতে পারছিল না।

যত ওপরে উঠছে ওরা তত নদী হোট হচ্ছে। সেইসঙ্গে দ্রোতের দাপট বাড়ছে ঘূর্মূল নদী মৌকো বাওয়া অসম্ভব হত। অনিমেষ দেখল অজস্র গাছপালা নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, আজ তাদের ধরতে কোনো মানুষ নদীতে নামেনি। এত বেলা হল, সূর্য মাথার ওপর তার পা রাখল, কিন্তু যিদে পাছে না এতটুকু। খাওয়ার কথা বলছে না কেউ। এমন সময় মাঝি বলছে, ‘বাবু, ওপারে যাওয়া হইব না।’

নিশীথবাবু ঘাড় নাড়লেন, ‘বুঝতে পেরেছি। তা হলে এদিকটাই সেরে যাই। আরও বাঁদিকে একটা গ্রাম আছে সেখানে চলো।’

বাঁদিকটা বেশ জঙ্গল, ভল বোধহয় উঠতে পারেনি সেখানে। কারণ নদী থেকে সেটা অনেকটা উঁচুতে। কিন্তু সেই জঙ্গলে ডাঙ্গির পাশ দিয়ে তিঙ্গির একটা স্নোত ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু যেতেই জঙ্গলের মধ্যে একটা মানুষ চিন্কার করে কিছু বলল। নিশীথবাবু মাঝিকে ভালো জায়গা দেখে মৌকা ভেড়াতে বলতে সে বলল, ‘বাবু, এড় তো কুঠরোগীদের গ্রাম!’

নিশীথবাবু বললেন, ‘হ্যা, সেখানেই যাব। কুঠরোগীরা কি মানুষ নয়?’

ডেঙ্গো জিমিটায় জল ওঠেনি। চারপাশে জলের মধ্যে নৈবেদ্যের চূড়ার মতো মাথা উঁচু করে জেগে রয়েছে জায়গাটা। সূর্য এখন মাথার ওপর থেকে পচিমে সামান্য হেলেছে, কিন্তু আকাশটার চেহারা আবার টসকেছে। বৃষ্টির শেষ নয়, কিন্তু একটু একটু করে ঘোলাটে হয়ে উঠছে আকাশ, রোদের চৰক ফট করে মরে গেল।

অনিমেষ ডাঙ্গির দিকে তাকাল। কুঠরোগীরা থাকে এখানে! একটা চিন্কার অবশ্য শুনেছিল সে, কিন্তু এখন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঘন জঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি বেশি দূরে যায়ও না। সকাল থেকে এত রোদ হল তবু এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে গাছের পাতায় ডালে এখনও স্যাঁতসেতে ভাবটা আছে। কথাবাণি এলাকা নিয়ে ভাঙ্গাটা কে জানে! তবে বেশ উচুতে। কিন্তু এরকম ঘন জঙ্গলে মানুষ থাকে কী করে! বাইরে থেকে তো কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে না, কুঠরোগীরা তো মানুষ-অনিমেষ নিশীথবাবুর দিকে তাকাল।

পরিষ্কারমতো একটা জায়গা দেখে নৌকোটো ভেড়ানো হল। নিশীথবাবু নৌকো থেকে নেমে কয়েক পা হেঁটে তেতের গিয়ে ঘোধহয় কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার খিরে, এলেন, ‘আরে মালঙ্গলো নৌকো থেকে নামাও, চুপচাপ বসে আছ কেন?’

এক এক করে ব্যাগগুলো মাটিতে নামানো হলে মাঝি বলল, ‘বাবু, কত সময় লাগব?’

নিশীথবাবু বললেন, ‘তোমার সঙ্গে তো সারাদিনের ছুঁতি আছে, অপেক্ষা করো।’

এতক্ষণ নৌকোয় বসে শুধু জল দেখতে-দেখতে অনিমেষের একয়ে মনে হচ্ছিল, হাত-পা নাড়তে না পেরে খিল ধরে যাবার যোগাড়-এখন হাঁটতে পেরে স্বত্ত্ব হল। বন্যার্তদের জন্য রিলিফ নিয়ে এসেছে অথচ এখানে তো বন্যার জল ঘোঁষিনি। কথাটা নিশীথবাবু শুনে খুব বিরক্ত হলেন, ‘কী আশ্চর্য, এটুকু তোমার মাথায় চুকল না যে যারা জলে আটক হয়ে থাকে তারা খাবারের অভাবে ডুক্ক থাকবেই। জলবন্দিদ্বাৰা যে বন্যার্ত নয় তা তোমায় কে বলল?’

অনিমেষ উভয় দিল না কিন্তু নিশীথবাবু কথাটা সে মানতে পারছিল না। অনেক ভিখৰি দু-তিনদিন না-বেয়ে থাকে শহরের রাস্তায়, কই, তাদের তো রিলিফ দিতে যাওয়া হয় না! বন্যা এসে যাদের উৎক্ষাত করেছে তারাই তো বন্যার্ত।

এমন সময় নিশীথবাবু বললেন, ‘সবার খাবার দরকার নেই। তোমার তিনজন আমার সঙ্গে এসো।’ আড়ুল দিয়ে তিনি অনিমেষ আৱ দৃজনকে ডাকালেন। বাকিৰা থেকে গেল সেখানেই। ওদের মুখ দেখে অনিমেষ বুৰুতে পারছিল যেতে না হওয়ায় ওৱা খুব সন্তুষ্ট হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, নৌকো থেকে নামতেই সবাই বিধা কুরছিল। যাওয়াৰ আগে একটা ব্যাগ খুলে নিশীথবাবু থেকে-যাওয়া সঙ্গী এবং মারিদের কিছু খাবার দিলেন। চিড়ে শুধু আৱ লালচে পাউৰুটি। এখন এই দুপুর-পেরনো সময়টা এই সামান্য খাবার দেবেই অনিমেষের জিতে জল এসে গেল। ও যেন হঠাতে টের পেল ওৱ প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খিদে একদম সহ্য কৰতে পাৱে না ও। আজ অবধি অসময়ে থেকে হয়নি কখনো। কিন্তু আজ সকাল থেকে এই নৌকোয়-নৌকোয় ঘুৱে আৱ সেই গলায় ফোস দিয়েয়ুলে-থাকা লোকটাকে দেখাৰ পৰ থেকে ওৱ খিদেৰ অনুভূতিটা উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন হঠাতে সেটা ফিরে এল।

কিন্তু নিশীথবাবু ব্যাগেৰ মুখ বক্ষ কৰে প্ৰত্যেকেৰ হাতে ধৰিয়ে দিয়ে ওৱ সঙ্গে এগোতে লাগলেন। অনিমেষেৰ সঙ্গী একটা মোটামতল লোক এমন সময় বলে ফেলল, ‘বন্যার্তদেৱ খাবার দিতে গিয়ে আমৱাই ক্ষুধার্ত হয়ে গেলাম। একটু থেয়ে নিয়ে জোৱ কৰলে হত নাা?’

নিশীথবাবু বললেন, ‘না না, আমৱা এখানে বসে যাওদাওয়া কৰলে যাদেৱ জন্য খাবার এনেছি তারা কী ভাবে! ওদেৱ দিয়ে তবে যাওয়া যাবে।’

লোকটা মাথা নাড়ল, ‘না, সেকথা ছিল না। তিনটে টাকা আৱ খিদেৰ সময় খাবার এইৱকম কথা পেয়ে কাজে এসেছি। এখন উলটোপলাটা বললে চলবে কেন?’

কথাটা শুনে লোকটাকে দিকে অবাক হয়ে তাকাল অনিমেষ। সে কী। বন্যার্তদেৱ সেবা কৰতে সত্যিকাৱে কংঠেসি নয়, শুধু নিশীত্ববাবুৰ মতো দুএকজন ছাড়া।

নিশীথবাবু খুব অবস্থিতে পড়েছেন বোৰা গেল, ‘খিদে পেয়েছে তো এতক্ষণ নৌকোয় বসে থেলে না কেন? কাজেৰ সময় যত বালেনো কৰ?’

‘আমি তো মানুষ! আপনি লোকগুলোকে থেকে দিলেন না, আমি খাই কী কৰেং ঠিক আছে, চলুন, যা বলবেন কৰছি, দেখবেন টাকাটা যেন না মারা যায়।’

লোকটা বাগ নিয়ে হাঁটা শুরু কৰল। নিশীথবাবু চাপা গলায় অনিমেষকে শুনিয়ে বললেন, ‘এইসব লোক নিয়ে দেশে বিপ্লব হবে, ভাবো।’

জঙ্গলেৰ মধ্যে চুকতেই একজন লোকেৰ সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটা বোধহয় অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ওদেৱ দেখছিল, এখন কাছে আসতেই মুখ মুখি হল। বেঁটেমতল, গায়ে কাপড় জড়ানো এবং মুখচোখ ভীষণ ফোলা-ফোলা। ওদেৱ দিকে কিয়ে লোকটা বলে উঠল, ‘কী আছে ব্যাগে, খাবার?’

নিশীথবাবু ঘাড় নাড়লেন, ‘কংঠেস থেকে রিলিফ নিয়ে এসেছি।’

লোকটা ঘাড় নাড়ল, ‘খুব বান এসেছিল, শহৰ ভেসে গেছেং।

নিশীথবাবু বললেন, ‘শহৰে জল ঢেকেনি।’

লোকটা বলল, 'আমাদের এখানেও না। তবে কাল থেকে কেউ কিছু খাইনি, না এলে নৌকো ডবিয়ে দিতাম। আসুন, মোড়ল আপনাদের নিয়ে যেতে বলেছে।'

প্রথমদিকে লোকটার কথাবার্তা ছিল একধরনের, শেষ কথাটা বলার সময় ওকে ঝুব রাণী-রাণী রাগল। লোকটার পিছপিছু ওরা হাঁটতে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা-পথ বেশ পরিষ্কার। কিছুদূর যেতেই আর বাইরের জল চোখে পড়ল না। পথের ধারে ময়লা রক্তমাখা ফেটি পড়ে আছে। দেখেই গা ঘিনঘিন করে উঠল অনিমেষের। নিশীথবাবু নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সেগুলোকে টপকে যেতে বললেন। কিছুটা যেতেই জঙ্গলটা যেন চট করে উধাও হয়ে গেল। সামেন বিরাট মাঠের মতো পরিষ্কার জমি, তার চারধারে ছেট ছেট খেলোর ঘরের মতো ঘর। ঘরগুলোর চালে টিন দেওয়া, দেওয়াল যে যেরকম পেরেছে দিমেছে। যে-কোনো ঘরেই মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। তবে ঠিক মধ্যখানে বেশ শক্তমতন বিরাট চালাঘর। তার তলায় বেঞ্চি করে কাঠের খুঁটি পুঁতে রাখা হয়েছে। মাঠের এক কোণে অনেক মানুষ চুপচাপ বসে আছে। দূর থেকে তাদের ময়লা কাপড়ের স্ফুরণ বলে মনে হচ্ছিল। ওরা খোলা জমিতে এসে পড়তেই লোকটা ওদের সেখানে দাঁড়াতে বলে দ্রুত সেদিকে চলে গেল। নিশীথবাবু চারপাশে একবার চোখ ঝুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'কীভাবে এরা বেঁচে আছে দ্যাখো। আর শোনো, এদের সামনে তোমরা এমন-কিছু কোরো না যাতে এরা আঘাত পায়।'

মোটা লোকটা বলল, 'একদম কুঠরোগীদের ডেরায় নিয়ে এলেন, এরকম কথা ছিল না।'

নিশীথবাবু কথাটা শুনেও যেন তন্তেজন না। অনিমেষ দেখল দুজন লোক সেই জটলা থেকে ওদের চিনিয়ে-নিয়ে-আসা লোকটির সঙ্গে উঠে এসে চালাঘরটার নিচে দাঁড়াল। পথপ্রদর্শকটি এগিয়ে এসে ওদের বলল, 'আসুন, মোড়ল আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে।'

নিশীথবাবুর পেছন পেছন ওরা চালাঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। এখন রোদ নেই, একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সমস্ত মাঠটা জুড়ে জুড়ে অস্তু মায়াময় একটা ছায়া নেমেছে। হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ সেই বাতাসে একটা গুটিকো গঞ্জ পেল। গুঞ্জটা গা গুলিয়ে দেয়। মোটা লোকটি ফ্রিসফিস করে বলল, 'কেউ শালা টেনেছে নির্ধার্ত।'

শহর থেকে এ-জায়গাটা বেশি দূরে নয়, কিন্তু এ-অঞ্চলে অনিমেষরা কখনো আসেনি। তিস্তার তীর ধরে পায়ে হেঁটে নিশ্চয়ই এদিকের মানুষজন যাওয়া-আসা করে। শহরে যেসব কুঠরোগীকে ভিক্ষে করতে দেখা যায় তারাই যে এতটা দূর হেঁটে এই ডেরায় ফিরে আসে আগে জানত না অনিমেষ। ওর মনে পড়ল, কোনোদিন বিকেলবেলায় ও শহরের রাত্তায় একজন কুঠরোগীকেও ভিক্ষে করতে দেখেনি। এক-একজনকে দেখে মনে হত এ নিজে হাঁটতে পারবে না, অথচ কী করে যে সে আসে এবং উধাও যে যায় কিছুতেই ধরতে পারত না সে।

ওদের এগিয়ে যেতে দেখে দূরের জটলার ভেতর থেকে একটা গুঞ্জন উঠল। ব্যাগগুলো যে খাবারের বুরুতে নিশ্চয়ই কারও অসুবিধে হচ্ছে না। চালাঘরের নিচে দাঁড়ানো একজন লোক হাত তুলে নিষেধ করতেই গুঞ্জনটা চট করে থেমে গেল।

চালাঘরের সামনে এসে অনিমেষ মাটিতে চোখ নামিয়ে ফেলল। একটা শীতল স্নোত যেন হঠাৎই নড়েচড়ে পা থেকে মাথায় উঠে এল। একপলক তাকিয়েই আর তাকাবার শক্তিটা খুঁজে পেল না সে। যে-লোকদুটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের গায়ে পা-বুল-শার্ট, শার্টের ওপর ছেঁড়া কোট চাপানো। কোমর থেকে একটা ময়লা চিরকুট কাপড় লঙ্ঘিল মতো হাঁটুর নিচ অবস্থি জড়ানো। পায়ে কাপড়ের জুতো আছে। কিন্তু একটা লোকের বাম হাত কবজির পর শেষ হয়ে গি তে মুখের দিকে তাকালে চোখে এক লক্ষ সূচ ফোটে। কারণ তার নাক সেই চুলগুলোর জয়গায় লাগে চামড়া গদদগ করছে। অন্যজনের বাহ্য আরও বীভৎস। কার কানের লতি যেন ছিঁড়ে পড়েছে। গুপরের ঠোঁট না থাকায় দাঁতগুলো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কারোরই চোখে পাতা নেই, দিতীয়জনের আঙুলগুলো ছেট হয়ে এসেছে, একটা আঙুল গোড়া থেকে খসে গিয়ে চামড়ায় লেগে ঝুলেছে।

চালাঘরের ঠিক মাথাখানে বেঞ্চিগুলোর গায়ে ইটের গোল চৌহদিতে আগুন জলছে। কাঠের আগুন। ইটগুলো উঁচু বলে ওরা দূর থেকে এটাকে লক্ষ করেনি। আগুনটা এইভাবে জলছে, কী কাজে লাগে কে জানে!

'আপনারা কেন এসেছেন?'

‘আমি তো মানুষ! আপনি লোকগুলোকে খেতে দিলেন না, আমি খাই কী করে? ঠিক আছে, চলুন, যা বলবেন করাই, দেখবেন টাকাটা যেন না মারা যায়।’

লোকটা ব্যাগ নিয়ে হাঁটা শুরু করল। নিশীথবাবু চাপা গলায় অনিমেষকে শুনিয়ে বললেন, ‘এইসব লোক নিয়ে দেশে বিপুল হবে, ভাবো!’

জঙ্গলের মধ্যে চুকতেই একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটা বৌধহ্য অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল, এখন কাছে আসতেই মুখেযুবি হল। বেঁটেমতন, গায়ে কাপড় জড়ানো এবং মুখচোখ ভীষণ ফোলা-ফোলা। ওদের দিকে তাকিয়ে লোকটা বলে উঠল, ‘কী আছে ব্যাগে, খাবার?’

নিশীথবাবু ঘাড় নাড়লেন, ‘কংগ্রেস থেকে রিলিফ নিয়ে এসেছি।’

লোকটা ঘাড় নাড়ল, ‘খুব বান এসেছিল, শহর ভেসে গেছে।

নিশীথবাবু বললেন, ‘শহরে জল তোকেনি।’

লোকটা বলল, ‘আমাদের এখানেও না। তবে কাল থেকে কেউ কিছু খাইনি, না এলে নোকো ডবিয়ে দিতাম। আসুন, মোড়ল আপনাদের নিয়ে যেতে বললেছে।’

প্রথমদিকে লোকটার কথাবার্তা ছিল একধরনের, শেষ কথাটা বলার সময় ওকে খুব রাগী-রাগী রাগল। লোকটার পিছুপিছু ওরা হাঁটতে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা-পথ বেশ পরিষ্কার। কিছুদুর যেতেই আর বাইবের জল চোখে পড়ল না। পথের ধারে ময়লা রক্তমাখা ফেটি পড়ে আছে। দেখেই গা ধিনবিন করে উঠল অনিমেষের। নিশীথবাবু নিশ্চলে ঘাড় নেড়ে সেগুলোকে টপকে যেতে বললেন। কিছুটা যেতেই জঙ্গলটা যেন চট করে উধাও হয়ে গেল। সামেন বিরাট মাঠের মতো পরিষ্কার জমি, তার চারধারে ছেট ছেট খেলার ঘরের মতো ঘর। ঘরগুলোর চালে টিন দেওয়া, দেওয়াল যে যেরকম পেরেছে দিয়েছে। যে-কোনো ঘরেই মাথা নিচু করে চুক্তে হয়। তবে ঠিক মধ্যখানে বেশ শক্তমতন বিরাট চালাঘর। তার তলায় বেঞ্চি করে কাঠের খুটি পুঁতে রাখা হয়েছে। মাঠের এক কোণে অনেক মানুষ চুপচাপ বসে আছে। দূর থেকে তাদের ময়লা কাপড়ের স্তুপ বলে মনে হচ্ছিল। ওরা খোলা জমিতে এসে পড়তেই লোকটা ওদের সেখানে দাঁড়াতে বলে দ্রুত সেদিকে চলে গেল। নিশীথবাবু চারপাশে একবার চোখ ঝুলিয়ে নিয়ে বললেন, ‘কীভাবে এরা বেঁচে আছে দ্যাখো। আর শোনো, এদের সামনে তোমরা এমন-কিছু কোরো না যাতে এরা আঘাত পায়।’

মোটা লোকটা বলল, ‘একদম কুঠরোগীদের ডেরায় নিয়ে এলেন, এরকম কথা ছিল না।’

নিশীথবাবু কথাটা শনেও যেন শনলেন না। অনিমেষ দেখল দুজন লোক সেই জটলা থেকে ওদের চিনিয়ে-নিয়ে-আসা লোকটির সঙ্গে উঠে এসে চালাঘরটার নিচে দাঁড়াল। পথপ্রদর্শকটি এগিয়ে এসে ওদের বলল, ‘আসুন, মোড়ল আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে।’

নিশীথবাবুর পেছন পেছন ওরা চালাঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। এখন রোদ নেই, একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সমস্ত মাঠটা জুড়ে জুড়ে অনুভূত মায়াময় একটা ছায়া নেমেছে। হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ সেই বাতাসে একটা উটকো গঞ্জ পেল। গঞ্জটা গা শুলিয়ে দেয়। মোটা লোকটি ফিসফিস করে বলল, ‘কেউ শালা টেসেছে নির্ধার্ত।’

শহর থেকে এ-জায়গাটা বেশি দূরে নয়, কিন্তু এ-অঞ্চলে অনিমেষরা কখনো আসেনি। তিস্তার তীর ধরে পায়ে হেঁটে নিচয়ই এদিকের মানুষজন যাওয়া-আসা করে। শহরে যেসব কুঠরোগীকে ভিক্ষে করতে দেখা যায় তারাই যে এতটা দূর হেঁটে এই ডেরায় ফিরে আসে আগে জানত না অনিমেষ। ওর মনে পড়ল, কোনোদিন বিকেলবেলায় ও শহরের রাস্তায় একজন কুঠরোগীকেও ভিক্ষে করতে দেখিন। এক-একজনকে দেখে মনে হত এ নিজে হাঁটতে পারবে না, অথচ কী করে যে সে আসে এবং উধাও হয়ে থায় কিছুতেই ধরতে পারত না সে।

ওদের এগিয়ে যেতে দেখে দূরের জটলার ভেতর থেকে একটা গুঞ্জন উঠল। ব্যাগগুলো যে খাবারের বুঝতে নিচ্যই কারও অসুবিধে হচ্ছে না। চালাঘরের নিচে দাঁড়ানো একজন লোক হাত তুলে নিয়ে করতেই গুঞ্জনটা চট করে থেমে গেল।

চালাঘরের সামনে এসে অনিমেষ মাটিতে চোখ নামিয়ে ফেলল। একটা শীতল স্নোত যেন হঠাৎই নড়েচড়ে পা থেকে মাথায় উঠে এল। একপলক তাকিয়েই আর তাকাবার শক্তিটা খুঁজে পেল না সে। যে-লোকদুটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের গায়ে পা-বুল-শার্ট, শার্টের ওপর ছেড়া কোট চাপানো। কোমর থেকে একটা ময়লা চিরকুট কাপড় লুঙ্গির মতো হাঁটুর নিচ অবধি জড়ানো। পায়ে

কাপড়ের জুতো আছে। কিন্তু একটা লোকের বাম হাত কবজির পর শেষ হয়ে গিয়েছে, মুখের দিকে তাকালে চোখে এক লক্ষ সূচ ফোটে। কারণ তার নাক সেই, তুলগুলোর জায়গায় লাল চামড়া পদদগ করছে। অন্যজনের বাহ্য আরও বীভৎস। কার কানের লতি যেন ছিঁড়ে পড়েছে। ওপরের ঠোঁট না থাকায় দাঁতগুলো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কারোই চোখে পাতা নেই, ছিটীয়জনের আঙুলগুলো ছেট হয়ে এসেছে, একটা আঙুল গোড়া থেকে খসে গিয়ে চামড়ায় লেগে ঝুলচ্ছে।

চালাঘরের ঠিক মাঝখানে বেঝিগুলোর গায়ে ইটের গোল চৌহদিতে আঙুন জুলচ্ছে। কাঠের আঙুন। ইটগুলো উঁচু বলে ওরা দূর থেকে এটাকে লক্ষ করেনি। আঙুনটা এইভাবে জুলচ্ছে, কী কাজে লাগে কে জানে!

‘আপনারা কেন এসেছেন?’

একটু খোনা-খোনা গলায় দৃঢ়নের একজন কথা বলল। অনিমেষ মুখ তুলে দেখল না, তবে অনুমান করল নিশ্চয়ই হাতহান লোকটি প্রশ্নটা করেছে। নিশীথবাবু নিশ্চয়ই একটু দমে গিয়েছিলেন, কারণ উত্তরটা দিতে তিনি ইতস্তত করছেন বোধ গেল, ‘মানে, চারধারে বন্যার জলে সব ডেসে গেছে, আপনারাও নিশ্চয়ই খাবার পাননি, আমরা রিলিফ নিয়ে বেরিয়েছি— তাই চলে এলাম।’

উত্তরটা ওমে খোনা-খোনা গলা বলল, ‘ভালোই হল। আমাদের অবশ্য দুদিনের খাবার মজুত ছিল—কী আছে ওতে?’

নিশীথবাবুর আদেশের জন্য ওরা অপেক্ষা করল না, ব্যাগগুলো নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখানে বসার কী দরকার, এবার চলে গেলই হয়। অনিমেষ লক্ষ করছিল, নিশীথবাবু আপনি-আপনি করে কথা বলছিলেন। অবশ্য খোনা-গলা লোকটার কথা বলার ধরনে ভিথরিসুলভ কেনোনো ব্যাপারই নেই, বরং বেশ কর্তৃত্বের সুর প্রকাশ পাচ্ছিল।

মোটা লোকটা ব্যাগ নামানের পর যেন মৃত্তি পেয়ে বলল, ‘চলুন যাওয়া যাক।’

নিশীথবাবু এবারও তার কথায় কান দিলেন না। বরং আস্তে-আস্তে চালাঘরের ভেতরে চুকে বেঝিতে বসলেন। অন্য লোক দুটো তাঁর সামনে হেঁটে উলটোদিকের বেঝিতে বসল। তৃতীয় লোকটি, যে ওদের এখানে নিয়ে এসেছে, বিডিগার্ডের মতো পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। নিশীথবাবু বসে ওদের দিকে তাকালেন, ‘কী হল, তোমার ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?’ অগত্যা অনিমেষকে চালাঘরে চুক্তে হল, ও বুরতে পারল মোটা লোকটি বেজারযুথে ওর সঙ্গে আসছে।

বেঝিতে বসামাত্র কাঠের আঙুনের ওম ওদের শরীরে লাগল। বাইরে যে হিম বাতাস বইছিল তার চেয়ে এই উত্তাপ অনিমেষের কাছে আরামদায়ক মনে হল। মোটা লোকটি অনেক ইতস্তত করে বেঝিতে বসল। তার বসবার ধৰনটা সবার নজরে পড়েছিল, কারণ এই সময় খোনা লোকটি বলে উঠল, ‘চিন্তা করবেন না, যে-সমস্ত রোগী সংকামক তারা এই বেঝিতে বসে না। আপনি স্বচ্ছে বসুন।’

অনিমেষ এতক্ষণে সবার সামনের দিকে তাকাল। তার অনুমানই ঠিক, যার নাক নেই সে এতক্ষণ কথা বলছিল। নিশ্চয়ই এ হল মোড়ল, আর দাঁত-বের-করা লোকটি ওর সহকারী। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চেহারাগুলো ক্রমশ ওর সহ্য হয়ে গেল। অভ্যাস হয়ে গেলে সবকিছু একসময় মেনে নেওয়া যায়। এই সময় মোড়ল খোনা গলায় বলল, ‘খোকা, খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে, মৌকো করে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে?’

অনিমেষ চটপট ঘাড় নাড়ল, ‘না।’

নিশীথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আছে, আপনাদের এখানে কতজন আছেন?’

‘একশো তিনজন ছিলাম আজ সকাল পর্যন্ত, একজন একটু আগে মারা গিয়েছে। কেন বলুন তো? আপনারা কি সরকারি লোক?’ লোকটি এখনও একটাও কথা বলেনি, শুধু তখন থেকে সে অন্যমন্ত্রভাবে তার খোলা আঙুলটা মুচড়ে যাচ্ছিল।

নিশীথবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘না না, আমরা কংথেস থেকে রিলিফ দিচ্ছি। সরকারি লেড়েলে এসব করতে সহ্য লাগে।’

মোড়ল বলল, ‘ও একই হল। কংথেস আর সরকার তো আলাদা নয়। তা সরকার তো আমাদের সাহায্য দেয় না; শহরে ভিক্ষে করতে গেলে পুলিশ আমেলা করে।’

নিশীথবাবু বললেন, ‘সবে তো আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখনও সব দিক সামলে ওঠা সম্ভব হয়নি। চিন্তা করবেন না, আমি গিয়ে তি সি’র সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা বলব।’

মোড়ল বলল, 'ভালো থক ভালো।' তারপর সে তার বিডিগার্ডকে বলল, 'এন্দের খাবার ব্যবস্থা করো, এত দূর থেকে এসেছেন আমাদের উপকার করতে।'

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথবাবু বলে উঠলেন, 'না না, আপনাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমরা ফিরে গিয়ে থাব।'

মোড়ল বলল, 'আপনি যিচ্ছিমিছি তয় পাচ্ছেন। তিনজন লোক আমাদের সবার জন্য রাঁধে। তাদের অসুখ আছে, কিন্তু তা একদম সংক্ষিপ্ত নয়। আজ পাঁচ বছর হল অসুখ তাদের বাড়েনি।'

নিশীথবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা এই ঝটি শুড় খাচ্ছি।' মাথা ঘূরিয়ে তিনি মোটা লোকটিকে বললেন, 'কিন্তু ঝটি আর শুড় ব্যাগ থেকে বের করে আনো তো।'

তড়াক করে মোটা লোকটা উঠে গিয়ে ব্যাগের মুখ খুলতে লাগল। যদি এদের রান্না-করা খাবার থেতে হয় সেজন্য সে এক মুহূর্ত ব্যয় করতে রাজি ছিল না। অনিমেষ দেখল আকাশ আবার কালো হয়ে আসছে।

নিশীথবাবু বললেন, 'আছা, আপনাদের এখানে যত লোক আছেন তাদের মধ্যে মোটামুটি সৃষ্টি কর্তনঃ মানে মুখচোখ দেখে বোঝা যায় না তাঁদের অসু। হয়েছে, আমি এরকম লোকের সংখ্যা জানতে চাইছি।'

বিকৃত মুখচোখ হলেও বোঝা গেল মোড়ল খুব অবাক হয়ে গেল কথাটা শনে। কয়েক মুহূর্ত তাকে ভাবতে দেখল অনিমেষ। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'এভাবে বলা মুশকিল।'

নিশীথবাবু বললেন, 'তক্ষণ—'

গোড়ল বলল, 'এই রোগ হয়েছে জানলেই আপনারা সংসার থেকে বার করে দেন, তা আজ মুখচোখ থেবে যায়নি এরকম লোকের সকান করছেন, উদ্দেশ্যটা কী?'

নিশীথবাবু বললেন, 'আমরা একটা জিনিস চিন্তা করেছি, তাতে আপনাদের উপকার হবে।'

মোড়ল বলল, 'উপকার পেলে কে না নিতে চায় বুরুন! তবে তেমন বিশ্বাস হয় না। এই দেখুন, এতদিন কেউ আসেনি এখানে, রাখালগুলো গোরু চরাতে পাশের মাঠে এসে মক্ষ রাখত যেন কোনো গোরু দলছাড়া হয়ে এখানে ন ঢুকে পড়ে। তা এখন এত জল, বৃষ্টি হল, চারধারে ভেসে গেল মানুষ—এই এখন আপনারা এলেন খাবার নিয়ে। আবার শুনছি উপকারও হবে—। কী জানি!'

মোটা লোকটি খাবার নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। ব্যাগের মধ্যে কী কী ছিল দেখেনি অনিমেষ। এখন মোটা লোকটি ওর হাতে একটা লালচে হাফ পউরুটি আর এক চেলা আখের শুড় দিতে ও নিশীথবাবুর দিকে তাকাল। নিশীথবাবুরও তা-ই বরাদ এবং তিনি তা স্বচ্ছে থেতে আরঙ্গ করেছেন। মোটা লোকটি ইচ্ছে করেই চারটে ঝটি এনেছে যাতে নিজেরটা শেষ করে সে চটপট অতিরিক্তটা থেতে পারে। দুপুরবেলায় আজ অবধি সে ভাত চাড়া কোনোদিন অন্যকিছু খায়নি। খুব ছোটবেলায় কারও বাড়িতে দুপুরে ঝটি হলে ও মনে হত তারা খুব গরিব, ভাত খাওয়ার সামর্থ্য নেই। এই পরিবেশে ওর একক্ষণ খিদেবোধটা ছিল না, কিন্তু শুকনো ঝটিতে একটা কামড় দিতেই মনে হল পেটের ভেতর আঙুন জুলছে। এখন এই খিদের মুখে ওর মনে হল এত ভালো খাবার অনেকদিন সে খায়নি।

নিশীথবাবু বললেন, 'আপনারা খাবেন না?'

মোড়ল বলল, 'আমরা দুবার খাই। উদয় এবং অন্তকালে। আপনারা চিন্তা করবেন না। এখানে কত ঝটি আছে?'

নিশীথবাবু একটা আনন্দানিক সংখ্যা বললে মোড়ল হাত নেড়ে বিডিগার্ডকে ডেকে ফিসফিস করে কিছু বলতেই সোজা দ্রুরের জটলার কাছে চলে গেল। শুকনো ঝটি গলায় আটকে যাইল, একটু জলে পেলে হত। কিন্তু মোটা লোকটা ফিসফিস করে বলল, 'ধৰণদার, জল খাবেন না। কলেরা হবে। লচ্ছা দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে গিলে ফেলুন।'

এমন সময় অনিমেষ দেখল বিডিগার্ডটার পেছনে পেছনে সমস্ত কুষ্টরোগী উঠে আসছে। মোটা লোকটা ফিসফিসিয়ে বলল, 'চলেন এইবেলা যাই।'

এগিয়ে-আসা দলটার দিকে তাকিয়ে মোড়ল বলল, 'আমাদের এখানে একুশজন মেয়েছেলে আছে। তার মধ্যে সাতজন বুড়ি-তেমন হাঁটালো করতে পারে না, যে মারা গেছে স্টো মেয়েছেলে-বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল।'

নিশীথবাবু অন্যমনক গলায় বললেন, 'তাঁর স্বামীও এখানে আছেন?'

মোড়ুল বলল, ‘আছে তবে খুঁজে বের করা যাবে না।’

বড়িগার্ড ততক্ষণে ওদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিমেছে। একটা বিরাট সাপের ঘটো হয়েসেটা মাঠময় কিলবিল করছে। অনিমেষ ফোঁসফোঁস শব্দ শব্দে শব্দে দেখল মোটা লোকটি তার পাশে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। এখন অনিমেষের আর সেই ভয়-ভয় ভাবটা নেই। সে হিঁচোখে লোকগুলোকে দেখল। যেরেরা আছে, তবে তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাত-পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা। এতক্ষণ লক্ষ করেনি, এখন অনিমেষ দেখল বড়িগার্ডের ডান হাত থেকে মাঝে-মাঝে টপ্টেপ করে রাস্ত মাটিতে পড়ছে। ওর হঠাৎ সেই অনেকদিন আগের এক সকালবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিন্তাৰ ওপৰ নৌকোৱা বসে সে আঙুলহীন যে-মানুষটিৰ হাত ধৰে বাঁচিয়েছিল দে কি এখানে আছে? কৃষ্ণোগীৱা কতদিন বাঁচে? সেই লোকটা কি এখন দেঁচে নেই? অনিমেষ এখনও চোখ বন্ধ করলে তার সেই চিঢ়কাৰটা শুনতে পায়, 'কেন বাঁচালি?' 'কেন বাঁচালি?' অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে লাইনটাতে ভালো করে সেই মানুষটিকে খুঁজতে লাগল। এমন সময় ওর নজরে পড়ল মাঠের শেষপ্রান্ত যেখানে এতক্ষণ মানুষগুলো বসেছিল সেখানে একটা শৰীর ময়লা কাপড় মুড়ি দিয়ে টানটান হয়ে শওয়ে আছে। যে-মেয়েটিৰ কথা একটু আগে মোড়ল বলছিল সে মাঠের ওপৰ মৰে পড়ে আছে। মৰে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া-মাখিটাৰ সেই কথা এখন ভীষণৰকম সত্যি বলে মনে হল অনিমেষেৰ।

গুণন থেকে হইচই শুরু হয়ে গেল আচমকা । সবাই এগিয়ে এসে আগে ব্যাগটার কাছে পৌছতে চায় । বিডিগার্ড চিকিৎসা করে তাদের সামাল চেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার একার পক্ষে সেটা প্রায় অসম্ভব । অনিমেষ মৃত্যুগুলো দেখল, প্রত্যেকটি মৃত্যু কিছু পাবার আশায় বীভৎস হয়ে উঠেছে । শেষতক মোড়ল উঠে সামনে গিয়ে দাঁড়াল । তাকে দেখে ক্রমশ হইচইটা কমে এল । মোড়ল চিকিৎসা করে তাদের থামতে বলে কথা শুরু করল, ‘এইসব পাবার আমাদের জন্য । এই বাবুরা কংগ্রেস থেকে আমাদের জন্যে এত ভেঙে নিয়ে এসেছেন । কেউ কেড়ে নেবে না, সবাই পাবে । যে বেয়াদপি করবে আমি তাকে ক্ষমা করব না । প্রত্যেকে লাইন দিয়ে খাবার নিয়ে যাও ।’

সাধারণ দেখতে এই লোকটির এত প্রভাব নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না অনিয়েছে। সবাই চৃপচাপ এসে খাবার নিতে লাগল। বডিগার্ড এক-একটা ঝুটিকে কয়েক টুকরো করে কিছু চিড়ের সঙ্গে ওদের হাতে দিচ্ছিল। এই সময় মোড়ল ফিরে এসে নিশীথবাবুকে বলল, ‘এইবেলা আপনি দেখে নিন প্রত্যেককে আপনার কাজে লাগবে কি না?’ নিশীথবাবু বোধহ্য একটু নার্ভস হয়ে গিয়েছিলেন, এখন সোজা হয়ে বসে ওদের লক্ষ করতে লাগলেন। তিনি খুব খুশি হচ্ছে না মুখ দেখে বোৰা গেল।

এক এক করে স্বার নেওয়া হয়ে গেল। শেষের দিকে কয়েকজন বৃষ্টি বোধ হয় খুব কম পেয়েছিল। তারা শুই-শুই করতে টুপটাপ কয়েক ফোটা বৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিশূলো পড়িয়ে করে নিজেদের চালাঘরের দিকে ছুটে গেল। ওদের যাওয়ার ভঙ্গি দেখে কষ্ট হল অনিমেষের। এমন সময় দূর থেকে চিক্কার ভেসে এল। কারা যেন কাউকে ডাকছে। যোড়ল বলল, ‘আপনাদের সঙ্গীরা বৃষ্টি দেখে ভয় পেয়েছে।’

ନିଶ୍ଚିଥାବୁ ମୋଟା ଲୋକଟିକେ ବଲନେନ, ‘ଓଦେର ଗିଯେ ବଲୋ, ଆମରା କମ୍ଯେକ ମିନିଟେର ମଧ୍ୟେ ଈଆସଛି’।

କଥାଟୀ ଶେଷ ହସ୍ତାମାତ୍ର ମୋଟ ଲୋକଟି ଆଗପଦେ ଦୌଡ଼େ ମାଠ ପେରିଯେ ଜୟନ୍ତେର ମଧ୍ୟେ ଚାକେ ଗେଲ । ବୁଢ଼ି ଏଳେ ନୋକୋଯ ଓରା ଫିରବେ କୀ କରେ? ଅନିମେଶ ନିତୀଖ୍ୟାବାବୁ ଦିକେ ତାକାଳ । ତିନି ଉଠେ ଦାଡ଼ିଯେଛେ । ମୋଡଲ ବଲଳ, ‘ଏଥିବୁ ବୁଢ଼ି ହେବି ନା । ତା ଆଗନି ଯା ଚେଯେଛିଲେନ ପେଯେଛେ?’

ନିଶ୍ଚିଥାବୁ ମାଥା ନାଡ଼ିତ ମେ ବଲଲ, ‘ପାଓଯା ଯାଇ ନା କଥନୋ । ଆମରା ଓ ବୋଧହୟ ଆଇ ଆପନାର ଉପକାର ଗୋଲାମ ନା, କୀ ବଲେନ୍?’

ନିଶ୍ଚିଥାବୁ ବୁଲିଲେନ, 'ତା କେନ! ତବେ ଯା ଦେଖିଲାମ ତାତେ ଜନ-ପନ୍ନୋର ବେଶି ଲୋକ ପାଓଯା ଯାବେ ନା । ମେହରା ଅବଶ୍ୟ କାଜେ ଲାଗିଲେ ପାରେ । ତବେ ଦେଖିଲେ ହେବ ହାତେର ଆଙ୍ଗଳଗୁଲେ ଠିକ ଆଛେ କି ନା ।'

মোড়ল বলল, 'তাও হল না, সব মজে গেছে। গিয়ে ভালোই হয়েছে, আগ বেরিয়ে যেত
পুরুষগুলোর কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যটা কী বলবেন বাবু?'

ନିଶ୍ଚିଥବାବ ବଲଲେନ, 'ଡେମନ-କିଛୁ ନୟ, ସଦି ପ୍ରୟୋଜନ ହୟ ଏସେ ବଲେ ଯାବ ।'

মোড়ল হাসল। ‘আপনারা আর আসবেন না। এখান থেকে যে যায় সে আর আসে না।’

ନିଶ୍ଚିଥବାବୁ କଥାଟାର ଜୀବାବ ଦିଲେନ ନା, ଅନିମେଷକେ ଇଞ୍ଚିତ କରେ ଚାଲାଯର ଥେକେ ବେରିଯେ ଏଲେନ ।

তাঁর পেছনে যেতে গিয়ে অনিমেষের নজর পড়ল মোড়লের সঙ্গীর দিকে। এতক্ষণ মে একটা ও কথা বলেনি, শুধু একনাগাড়ে হাতে ছেঁড়া আঙুলটা মুচড়ে যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই এটা ওর মুদ্রাদোষ, কিন্তু এরকম বীভৎস মুদ্রাদোষের ওপর এক্ষণ্ণ চোখ রাখতে পারেনি অনিমেষ। এখন দেখল পাকু খেয়ে খেয়ে আঙুলটার ঝুলে থাকা চামড়াটা চূপচাপ খসে গিয়ে সেটা লোকটার অন্য হাতে উঠে এসেছে। প্রচণ্ড নাড়া খেল অনিমেষ। নিজের একটা আঙুল হাতের তালুতে নিয়ে লোকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সামান্যক্ষণ দেখল, তারপর সেটাকে ছুটে ইটের চৌহানিতে ঝুলা আগনের ভেতর ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চামড়া-পোড়া গঞ্জ বের হল সেখান থেকে। খুব জোর পা চালিয়ে অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। লোকটা তখন আগনের কাছে ঝুকে পড়ে তার আঙুলটা দেখছে। চট করে নিজের আঙুলের দিকে তাকাল অনিমেষ।

মোড়ল বলল, ‘চললেন?’

নিশীথবাবু ধাঢ় নাড়ালেন।

মোড়লের যেন কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, ‘যাওয়ার আগে একটু কষ্ট করতে হবে যে! আমার সঙ্গে একটু আসুন।’

নিশীথবাবু অবাক হলেন, ‘কেন? কী ব্যাপার?’

মোড়ল কোনো উত্তর না দিয়ে ওদের ইঙ্গিতে আসতে বলে সামনের এক ঝুপসিঘরের দিকে ঝুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। ওর বিডিগার্ড তখনও ওদের পাশে দাঁড়িয়ে। নিশীথবাবু যেন বাধ্য হয়েই বললেন, ‘চলো দেখে আসা যাক।’

মাঠটা পেরিয়ে ছেট ঝুপসিঘরটার সামনে পিয়ে দাঁড়াতেই মোড়ল বাইরে থেকে চিন্কার করে ডাকল, ‘ক্ষেত্রি ও ক্ষেত্রি, বাচ্চাটাকে নিয়ে বাইরে আয়।’

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বট বাইরে বেরিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গ কাপড়ে মোড়া, মাথার মোমটা বুক অবধি নেমে আসায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। কোলের ওপর একগাদা কাপড়ের স্তুপের ওপর একটা লালচে রঙের শিশি শয়ে। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে।

মোড়ল একটু দূর থেকে ঝুকে পড়ে বাচ্চাটাকে চুকচুক শব্দ করে আদর করল। তারপর নিশীথবাবুর দিকে ফিরে মাঠের শেষপাণ্ডে ঘয়ে-ধাকা মৃতদেহটিকে দেখিয়ে বলল, ‘ওর যেয়ে। কী সুন্দর মুখখানা দেখুন।’

অনিমেষ দেখল, সত্যি একটা ফুলের মতো মেঝে চুপচাপ ঘুমিয়ে আছে। এত হাত পা মুখ চোখ সব নিখুঁত, কোথাও অসুস্থতার চিহ্ন নেই। পৃথিবীর আর যে-কোনো মানুষের বাচার মতো সম্পূর্ণ সুস্থ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মোড়ল বলল, ‘একে নিয়ে যাবেন?’

নিশীথবাবুর মুখের দিকে তাকাল অনিমেষ, তিনি ভীষণ বিত্রত হয়ে পড়েছেন। মুখচোখ কেমন হোৱে গেছে। কোনোরকম বললেন, ‘দোখ, কথা বলে দেখি।’

মোড়ল বলল, ‘আপনি যেরকম চাইছিলেন ঠিক সেরকম না। তার চেয়ে বেশি বলতে পারেন। মুখ চোখ হাত আঙুল সব ঠিক আছে। বাবু একে নিয়ে যান, নইলে একদিন ও আমাদের মতো হয়ে যাবে! আপনি যা চেয়েছিলেন গেয়ে গেলেন বাবু।’

নিশীথবাবু এবার ঘুরে দাঁড়ালেন, ‘আমি গিয়ে ব্যবর দেব। এসো অনিমেষ।’

আর দাঁড়ালেন না তিনি, ইনহন করে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ওকে যেতে দেখে অনিমেষও পা চালাল। পেছনে মোড়লের গলা ভেসে এল, ‘কী এল, ‘কী হল বাবু, ও বাবু?’ অনিমেষ নিশীথবাবুর সঙ্গে জঙ্গলটার কাছে পৌছে গিয়ে দেখল মোড়ল দুহাতে বাচ্চাটাকে নিয়ে আদর করছে। বিডিগার্ড ওদের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হাসছে আর চালাখরের মধ্যে আগনের সামনে ঝুকে দাঁড়িয়ে। সাই লোকটা এখনও তার আঙুলটাকে পুড়ে যেতে দেখছে।

ক্ষেত্রে অনিমেষ কথা বলল, ‘বাচ্চাটা দেখতে খুব সুন্দর। নিয়ে এলে ওকে বাঁচানো যেত সহজ। আপনি তো এইরকম চাইছিলেন।’

জঙ্গল পেরিয়ে নোকোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিশীথবাবু কেন এলেন কিছুতেই বুরাতে পারছিল না অনিমেষ। জলপাইগুড়ি শহরে বা গ্রামে তো সেরকম মানুষ অনেক আছে। নাকি সেসব মানুষ নিশীথবাবুর কথা সবসময় শুনবে না, এদের পেলে সুবিধে হত? নোকোয় বসে হিয় বাতাসে কি না জানে না, অনিমেষের সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল আচমকা।

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল ভোটে বিরোধীদের পরাজিত করে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। গ্লোকসভার প্রার্থী আপেক্ষাকৃত অধ্যায়ত, কিন্তু তাঁকেও জিততে কিছু রেগ পেত হল না। সেই বন্যার পর থেকে অনিমেষ আর বংশেস অফিসে যায়নি, ফাইনাল পরীক্ষার চাপটা যেন পাহাড়ের মতো রাতারাতি ওর ওপর এসে পড়েছিল। সরিশেখের রাতদিন লক্ষ রেঞ্চেছিলেন বাইরের দিকে যেন ওর মন না যায়। নাতির পরীক্ষা নয়, যেন তিনি নিজেই স্কুল ফাইনাল দিচ্ছেন। নিশীথবাবু কয়েকবার লোক পাঠিয়েছিলেন অনিমেষকে ডাকতে, সরিশেখের স্যাত্তে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বন্যার সময়ে অনিমেষ যে-অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছিল তার ফলে রাজনীতিতে ওর আগ্রহটা যেন হঠাৎই মিহয়ে গেল। ওর খুব মনে হয়েছিল এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী চিততে পারবে না। রাজনীতি করতে গেলে মিথ্যা কথা বলতে হয়, শঠতা ছাড়া রাজনীতি হয় না-এসব ব্যাপার এর আগে এখন চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দেয়নি। নিশীথবাবুর মুখের কথা আর কাজের ধারার মধ্যে এত পার্থক্য-ব্যাপারটা মেনে নিতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

মন্তুরে মন্তু আর তপন মাঝে-মাঝে ওদের বাড়িতে আসত টেট পেপার সল্ভ করতে। মন্তুদের ও সেই অভিজ্ঞতার কথাটা বলেছিল। এই প্রথম সে নিশীথবাবুর সমালোচনা বহুদের কাছে করল। ব্যাপারটা অনিমেষকে যতটা উত্তেজিত করেছিল মন্তুকে তার কিছুই করল না। ইদানীং মন্তু একদম পালটে গেছে। আগের মতো গা-জোয়ারি তাবটা একদম নেই। মেয়েদের আলোচনার আর করে না। একসময় ও দাদার কাছ থেকে শুনে এসে কমিউনিটি পার্টির কথা বলত মাঝে-মাঝে, এখন তাও বলে না। নিশীথবাবুর কথা শুনে ও নির্ণয়ের মতো বলল, ‘এসব ব্যাপার নিয়ে তুই কেন ভাবছিস, তোর ভোট আছে?’

অনিমেষ হকচিয়ে গেল, ‘ভোট নেই বলে আমরা ভাবে না। কংগ্রেসকে কোথায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে বল তো! এই দল একসময় কারা করেছিল, তোবে দ্যাখ!’

মন্তু বলল, ‘আমার মাকে ছেলেবেলায় দেখেছি, কী সুন্দর দেখতে ছিল, চোখ জুড়িয়ে যেত। আর এখন রোগা হয়ে গিয়ে চামড়া ঝুলে গেছে, হাড় বেরিয়ে গেছে-এখন দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না মা এককালে সুন্দরী ছিল। তাই বলে হা-হ্রস্ব করে মাকে আমি আবার সুন্দরী করতে পারব? এখন যেরকম সময় সেরকম ভাবাই ভালো।’

কথাটা ভাবতে ভাবতে অনিমেষ বলল, ‘কিন্তু এরকম চললে আমাদের দেশের কোনো উন্নতি হবে?’

মন্তু খিচিয়ে উঠল, ‘ফ্যাচফ্যাচ করিস না তো! এই দেশ কি তোর পৈতৃক সম্পত্তি যে তুই ভেবে মরছিস! ধর তুই যদি তিবারা স্কুল ফাইনাল ফেল করিস, তোর দাদু যদি আর না পড়ায়, তা হলে কী করছিঃ কংগ্রেস তোকে দেখবে? কোনো বড় নেতার বাড়িতে গেলে তাঁর ছেলেমেয়ে তোকে ভ্যাগাবণ ভাববে। ওসব ছাড় অনিমেষ।’

তপন কিক করে হেসে বলল, ‘হাঁস খেটেখুটে ডিম পাড়ে, আর দারোগবাবু ঘমলেট খায়।’

মন্তু বলল, ‘ঠিক। আগে নিজের কেরিয়ার তৈরি কর, তারপর অন্য কথা। দ্যাখ-না, বিরাম কর কেমন মানেজ করে এখন থেকে কেটে পড়ল। শুনছি কলকাতার বরানগরে বাড়ি কিনেছে। মেনকার বিয়ে হয়ে গেছে এক বড়লোকের সঙ্গে। নিশীথবাবুর কী হল? হোল লাইফ শালা জেলা স্কুলে মাস্টারি করে কাটাবে।’

জীবনে এই প্রথম অনিমেষ চিন্তা করল, ও যদি ভালোভাবে পাশ না করতে পারে তা হল কী হবে? দাদু আজকাল প্রায়ই বলেন, ফার্ট ডিভিশন হলে কলকাতায় পাঠাবেন-বাব নাকি এরকম প্রতিজ্ঞা দাদুর কাছে করে গেছেন। দাদুর ইচ্ছা অনিমেষকে ইংরেজির এম-এ হতে হবে-অথবা আইন পাশ করবে অনিমেষ-এ-বংশে যা কেউ শপেণ্ড ভাবতে পারত না কোনোদিন। এই অবস্থায় যদি ওর রেজাল্ট খারাপ হয়!- অনিমেষ মনেমেনে বলল, তা কখনো হবে না, হতে পারে না। আজ অবধি সে কখনো খারাপ কিছু করেনি, খারাপ কিছু হতে পারে এরকম চিন্তা করতে ওর কষ্ট হয়। মন্তুর দিকে তাকাল সে। কী করে বড়দের মতো ও যে-কোনো কাজ করার আগে দুটো দিক ভেবে নেয়।

হঠাৎ মন্তু বলল, ‘আচ্ছা অনি, তোর জীবনের অ্যারিফিশন কী?’

জু কোঁচকাল অনিমেষ, ‘অ্যারিফিশন?’

মন্তু বলল, ‘হ্যাঁ। তবে এইম অভ লাইফ বলে এসেটা মুখস্থ বলিস না।’

চট করে জবাব দিতে পারল না অনিমেষ। সত্যি তো, কোনোদিন সে ভেবে দেখেনি বড় হয়ে কী করবে। কেউ চাকরি করে, কেউ ডাঙার ইঞ্জিনিয়ার বা উকিল হয়। আবার কেউ-কেউ রাজনীতি করে মন্ত্রী হয়ে যায়। ব্যবসা করে বড়লোক হচ্ছে অনেকে। আবার চাকরি বা ব্যবসা করে সাধারণ মানুষ হয়ে কটেজস্ট দিন কাটাতে অনেককেই সে দেখছে চারপাশে। এককালে কেউ যদি ওকে এই প্রশ্ন করত তা হলে সে চটপট কবাব দিত, দেশের কাজ করব। কিন্তু এখন-অনিমেষের একটা লেখার কথা মনে পড়ল। কার লেখা এই মুহূর্তে মনে নেই। মানুষ এবং জন্মের মূল পার্থক্য হর, জন্ম চিরকাল জন্মই থেকে যায়। দুহাজার বছর আগে একটা গোকৃ যেভাবে ঘাস খেত, দিন কাটাত, আজও সেভাবেই সে ঘাস খায়, দিন কাটায়। কিন্তু মানুষ প্রতিদিন যে-জ্ঞান অর্জন করে সেটা সে তার সত্তানের জন্য রেখে যায়। সে যেখানে শেষ করছে তার সত্তান সেখান থেকে উঠ করে। এই যে এগিয়ে যাওয়া তার নামই হল উত্তরণের পথে পা বাড়ানো এবং সেটা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আফ্রিকার গভীর অয়ন্গে সভ্যতার সংস্কৃতার যে-মানুষ আদিগন্তকাল একইভাবে জীবন কাটাচ্ছে তার মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই। প্রকৃত সভ্য মানুষ এগিয়ে যাবে। তা-ই যদি হয়, তা হলে আমাদের পূর্বপুরুষ যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন আমরা তার চেয়ে আরও উন্নত কোনো উপায়ে কাটাব। যেভাবে ওরা দেশের কথা ভেবেছেন, দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছেন, অথচ সে-সময় প্রতিকূল পরিবেশে তা অসম্ভব থেকে গেছে-আজ আমরা তা সম্ভব করব। কিন্তু শধু একজন ডাঙাৰ, ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যবসায়ী হয়ে কি তা সম্ভব? আমরা যাদের উত্তরাধিকারী ভাদ্রের কাছে কী জবাব দেবঃ সুভাষচন্দ্র, মহারাজা গান্ধী, দেশবন্ধু, ব্রাহ্মণাথ-এঁরা তো কেউ চাকরি করেননি কখনো। অন্যের চাকর হয়ে কি স্ব ধীনভাবে দেশের কথা ভাবা যায়!

মন্তু আর তপন একদৃষ্টিতে অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অনিমেষ যে প্রশ্নটার উত্তর দিকে পারছে না এতে ওরা মজা পাচ্ছিল। মন্তু বলল, ‘কী রে, ধ্যান করছিস নাকি?’

তপন বলল, ‘আমার ঠিকুজিতে লেখা আছে আমিন কি স্ব ব বড় ইঞ্জিনিয়ার হব।’

ঠিকুজির কথা শুনে অনিমেষের চট করে শনিবাবার মুখটা মনে পড়ে গেল। শনিবাবা বলেছিলেন যে, আঠারো বছর বয়সে সে জেলে যাবে। আর অনেক অনেক বছর আগে অনুপ্রাণনের সময় ও শান্তি বই ধরেছিল-দাদু বলেছিলেন, বড় হলে এ আইনজ হবে। এসব নিষ্ঠাতই সেলেমানুষি বলে মনে হয় ওর। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ বলল, ‘ভবিষ্যতে কে কী হবে আগে থেকে বলা যায়?’

মন্তু বলল, ‘তবু লক্ষ্য তো থাকবে একটা, না হলে এগোবি কী করেন?’

অনিমেষ হাসল, ‘ভই এবার সেই রচনার ভাষায় কথা বলছিস।’

মন্তু বলল, ‘আমি ঠিক করেছি যদি ফার্স্ট ডিভিশন পাই তা হলে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়ে আই এসসি পড়ব। আমাকে ডাঙাৰ হতে বলে।’

সেই রাতে অনিমেষ চৃপচাপ ছাদে চলে এল। এখন শীত যাবার মুখে, সামান্য চাদর হলেই চলে যায়। সরিৎশেখৰ হেমলতা অনেকক্ষণ শয়ে পড়েছেন। রাত বারোটা নাগাদ সরিৎশেখৰ পাশের ঘর থেকে একবার গলা তুলে বললেন, ‘এবার ঘয়ে পড়ো।’ ছাদে দাঁড়িয়ে সে একআকাশ তারা দেখতে গেল। এইসব তারার দিকে তাকালে একসময় ও শাকে দেখতে পেত। এখন হঠাৎ ওর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই ছাদেই মা পড়ে গিয়েছিলেন, আঠারো বছর বয়সে জেলে যাবার কথা শুনে মা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। অনিমেষ দূরের বাঁধ পেরিয়ে নিরীহ বাঢ়ার মতো ঘুমি-যথাকি তিত্তা নদীকে দেখল। দুমাসেই কাশগাছ গঁজিয়ে গেছে। কারা যেন মাইকে এখনও শহরের পথে-পথে ভোট চেয়ে আবেদন করে যাচ্ছে। আজ বাত বারোটার পর আর প্রচার চলতে না। অনিমেষ তারাদের দিকে তাকিয়ে নিজের আজন্তেই প্রশ্ন করে ফেলল, ‘আমি বড় হয়ে কী হব?’ এই হিম-মাথা বাত, বকমকে তারার আকাশ, তিত্তাৰ বুক থেকে উঠে-আসা নিষ্পাসন মতো কিছু বাতাস অনিমেষের প্রশ্নটা শুনে গেল চৃপচাপ। স্বৰ গভীর কোনো দুঃখ বুকের মধ্যে গড়াগড়ি থেতে-থেতে যেন চলকে উঠল, অনিমেষ দেখল একটা তারা টুক করে খসে গিয়ে কী দ্রুত নেমে যেতে-যেতে অন্য একটা তারার বুকে মুখ লুকোল। সংশোহিতের মতো ছাদময় পায়চারি করতে করতে একটা শব্দের সঙ্গে মনেমনে মারায়ারি করতে লাগল-জানি না, জানি না।

নির্বাচনে বামপন্থী প্রাথী হেরে যাবার পর কংগ্রেস বিরাট বিজয়মিহিল বের করেছিল। ব্যবরটা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করেনি অনিমেষ। নির্বাচনের আগে অবধি ও শুনে আসছে সবাই কংগ্রেস সশ্চক্ষে বিরূপ ধারণা পোষণ করছে। ইংরেজ আমলে এর চেয়ে সবাই সুখে ছিল, জিনিসপত্রের দাম যেরকম

আকাশছোঁয়া হয়ে গেছে তাতে সাধারণ মানুষ বাঁচতে পারে না। আর এসব কথাই বামপন্থিবা প্রকার করছিল একটু অন্যরকম সংলাপে। ফলে অনিমেষ ভেবেছিল এই নির্বাচনে কংগ্রেস একদম মুছে যাবে। কিন্তু বিপুল সমর্থন পেয়ে জিতেছে তনে প্রথমে যে-স্তুতি ওর এসেছিল, কৃষ্ণ তা খিতিয়ে গেলে নিজের কাছেই নিজে কোনো জবাব পেল না। তা হলে মানুষ যত কষ্ট পাক, যত গালাগালি দিক তবু কংগ্রেসকেই ভোট দেবে। বামপন্থিদের, বোঝাই যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। এমনকি সরিংশেখর পর্যন্ত ভোট দেবার আগে কংগ্রেসকে লক্ষ্যবার গালাগালি করে জোড়া বলদেই চাপ দিয়ে এলেন। জলপাইঙ্গড়িতে কান্তে ধানের শিখে সোনালি রোদ আর পড়ল না। এরকমটা যে হবে তা বোধহয় সবার আগে বামপন্থিই খবর রাখত। তাই নির্বাচন শেষ হবার পরপরই তারা আবার আন্দোলন নেমে পড়ল-যেন নির্বাচনের রায়ে তাদের কিছু এসে যায় না।

এতদিন ধরে জেলা স্কুলে চেনা গওতে পরীক্ষা দিয়েছে অনিমেষ। সেখানকার পরিবেশ একরকম আর এবার ফাইনাল দিতে গিয়েও ভীষণবকম অবাক হয়ে গেল। চার-পাঁচটা স্কুলের ছেলেরা প্রাপ্তিশশ্রাপ পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রথম দিন থেকেই প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে অনিমেষের পামের ছেলেটি সমানে খুঁটিয়ে যাচ্ছে তাকে কাতা দেখাবার জন্য। ছেলেটির গালতরতি দাঢ়ি, বয়স হয়েছে। অনিমেষ বিরক্তি প্রকাশ করতে সে বলল, ‘আট বছর হল তাই, এবার পাশ করতে হবেই।’ বলে কোমর থেকে বই বের করে ওর দিকে বাঢ়িয়ে দিল, ‘উত্তরগুলো দাগিয়ে দাও।’

‘আপনি নকল করবেন?’ কোনোরকমে কথাটা জিজ্ঞাসা করল সে। জেলা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে নকল করার রেওয়াজ নেই। বড়জোর কেউ-কেউ হাতের চেটোয় কিছু-কিছু পয়েন্ট লিখে আনত। একবার একটি ছেলে মুদির দোকানের স্লিপের মতো কাগজে খুদি-খুদি করে উত্তর লিখে এসেছিল, সুশীলবাবু তাকে ধরতে পেরে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ছেলেটিকে ট্রাঙ্কফার নিতে হয়েছিল। ওই ধরনের কাগজকে বলা হয় চোখা, মন্তুর কাছ থেকে জেনেছিল অনিমেষ। অত খুদি-খুদি করে লিখতে যে পরিশ্রম এবং সময় দরকার হয় সে-সময় উত্তরটা সহজেই মুখস্থ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা দেবার সময় এই ছেলেটির দুঃসাহস দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।

ছেলেটি মুখ খিচিয়ে বলল, ‘কোথাকে এলে ঠাঁদ, সতীত্ব দেখানো হচ্ছে। পেছনে চেয়ে দ্যাখো-না, টুকলির বাজার বসে গেছে।’ মাথা ঘূরিয়ে অনিমেষ দেখল কথাটা একবর্ষ মিথ্যে নয়। ফসফস করেই বই-এর পাতা ছেড়ার শব্দ; খাতার তলায় কাগজ চুকিয়ে ঝুঁকে পড়ে যাবা লিখতে তাদের কাছে যাদের কাছে উত্তর নেই তারা ক্রমাগত অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছে শেষ হয়ে গেলে দেবার জন্য। জেলা স্কুলের আরও কয়কটি ছেলে ছিল ঘরটাতে, অনিমেষ দেখল তারা মেল কিছুই ঘটছে না এরকম ভঙ্গিতে উত্তর লিখতে যাচ্ছে। যে-অন্দুলোক গার্ড দিচ্ছিলেন তিনি এখন চেয়ারে বসে মোহন সিরিজের একটা বই পড়ছেন তন্ময় হয়ে। বইটার নাম দেখতে পেল ও, ‘হতভাগিনী রাম’।

সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল অনিমেষের। সবাই যদি বই দেখে নকল করে লেখে তা হলেকে ফেল করবে না। এইসব মুখ কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি-ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার-সব জ্যায়গায় নকল করে পাশ করা যায়। যদি যায় তা হলে ওরা তো কিছুইনা-জেনে যে যার মতো বড় হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের জন্য অনিমেষের মনে হল ওর যাথায় কিছু নেই-ও একটাও উত্তর লিখতে পারবে না। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ কিছুক্ষন বসে থাকল সে। পাশের ছেলেটি বোধহয় তাবগতিক দেখে সুবিধে হবেনা বুঝতে পেরেছিল, নিজের মনেই উচ্চারণ করল, ‘কী মালের পাশেই সিট পড়ল এবার!’

অনিমেষ শুনল সে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, ‘স্যার, পেছাপ করতে যাব।’

গার্ড অন্দুলোক বই থেকে মুখ না তুলে বললেন, ‘এক ঘণ্টা হয়নি এখনও।’

ছেলেটি বলল, ‘এক ঘণ্টা অবধি চেক করতে পারব না।’

‘যাও।;

শোনামাতাই ছেলেটা বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল যাবার সময় সে উত্তরপ্রটা জামার ভেতর ঢুকিয়ে নিল। ছিটায় ঘন্টার শেষে বাথরুমে গিয়েছিল সে। বাথরুমটা যেন পড়ার ঘর হয়ে গিয়েছে। যারা আসছে তারা কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। বিভিন্ন আকারের কাগজের টুকরো থেকে বই-এর পাতার স্ফুর হয়ে গেছে সেখানে। সেই ছেলেটিকে এখান দেখতে পেল না সে। কিছুই বলার

নেই, অনিমেষের মজ্জা ফরছিল সেখানে জলবিয়োগ করতে। কোনো গার্ড বা কর্তৃপক্ষের কেউ একবারও তদারকিতে আসছেন না এদিকে। অনিমেষ ফিরে আসছে, মন্টুর সঙ্গে দেখ্য হয়ে গেল। এক ঝুমে সিট পড়েনি ওদের, মন্টু ওকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কটা বাকি আছে তোর?’

অনিমেষ বলল, ‘তিনটে!’

খুব সিরিয়াস মুখচোখ করে মন্টু বলল, ‘তাড়াতাড়ি কর, সময় নেই বেশি।’

অনিমেষ যাথা নেড়ে বলল, ‘কী অবশ্য দ্যাখ, এরকম টুকলিফাই চলে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।’

মন্টু গভীরমুখে বলল, ‘যারা করছে করুক, তোর কী?’

অনিমেষ ফিরে এসে সিটে বসতেই একটা অভিনব কাণ্ড হয়ে গেল। ও দেখল ওর খাতাটা ডেক্সে নেই। ভ্যাবাচ্যাক থেকে এপাশ-ওপাশ দেখতে ও প্রথমে ঠাওর করতে পারল না খাতাটা কোথায়। এমন সময় পেছনের ছেলেটি চাপা গলায় ওকে বলল, ‘লাস্ট বেথিতে নিয়ে গেছে।’ অনিমেষ দেখল দুটি ছেলে পাশাপাশি শেষ বেথিতে বসে একটা খাতা থেকে খুব দ্রুত ঢুকে যাচ্ছে। ও মোহন সিরিজের দিকে তাকাল, ভদ্রলোক টানটান হয়ে আছেন। ভীষণ রাগ হয়ে গেল অনিমেষের, দ্রুত শেষ বেথিতে গিয়ে চট করে খাতাটা কেড়ে নিল। আচমকা খাতাটা উঠে যাওয়াতে ছেলে দুটি হকচিকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে একজন দ্রুত নিজেকে সামলে বলল, ‘শেষ লাইনটা বলে দাও শুরু।’ কথাটা বলার মধ্যে এমন একটা রোয়ারি ছিল, অনিমেষ থ হয়ে দাঙ্ডিয়ে পড়ল।

ওকে মুখ-লাল করে দাঙ্ডিয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি বলল, ‘কেন ওরকম করছ, আরে আমাকে চিনতে পারছ না? কংগ্রেস অফিসে দেখা হয়েছিল, মনে নেই? আমরা ভাই-বেরাদার।’

এমন সময় পেছন থেকে একটা চিক্কার কানে এল, ‘আয়ি, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং দেয়ার? কী নাম তোমার, নম্বর কত?’ মোহন সিরিজ বইটাকে এক আঙুলে চিহ্নিত করে দ্রুত ছুটে এসে অনিমেষের সামনে দাঁড়ালেন, ‘আয়ি, তোমার সিট কোথায়?’

ভীষণ নার্তাস হয়ে অনিমেষ বলল, ‘সামনের দিকে।’

‘তা এখানে কী করছ? নকলবাজি? আমার ক্লাসে সেসব একদম চলবে না। কোন স্কুল তোমার, নম্বর কত বলো?’ তজনী তুলে গর্জন করলেন ভদ্রলোক।

‘আমার খাতা এরা নিয়ে এসেছিল-আমি কিছু জানি না।’ অনিমেষ কোনোরকম বলল। একটা ভয় আচমকা ওকে ঘিরে ধূরল এইবার। এই ভদ্রলোক যদি রেগেমেগে ওয়েক ক্লাস থেকে বের করে দেন, অথবা ওর নামে নালিশ করেন, তা হলে চিরকালের জন্য ও ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেল। নির্ধার ফেল করিয়ে দেবে ওকে।

‘খাতা নিয়ে এসেছিল আর আমি দেখলাম না, ইয়ার্কি! কে এনেছিল?’ ভদ্রলোক ফুঁসে উঠলেন।

এই সময় সেই এসেছিল আর আমি দেখলাম না, ইয়ার্কি! কে এনেছিল?’ ভদ্রলোক ফুঁসে উঠলেন।

এই সময় সেই কংগ্রেস অফিসের ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, ‘আমি স্যার, এই টেবিলের পাশে কাতাটাকে উঠে আসতে দেখে তুলে রাখলাম। যা বাতাস চারধারে।’

‘বাতাস? বাতাস কোথায়? ফ্যান তো বেঞ্চ। আর উঠে এল যখন তখন আমায় বললে না কেন? আর উড়ল কেন? তুমি কোথায় ছিলে?’

ভদ্রলোক কী করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। অনিমেষ ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল ছেলেটির কথা মুনে। কী চমৎকার মিথ্যে কথা বলে ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিছে। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ছেলেটির কথায় সাথ না দিলে বাচাবার উপায় নেই। ও বলল, ‘বাথরুমে গিয়েছিলাম আমি। সে-সময়-’

‘কী খাও যে এত ঘনঘন বাথরুম পায়া? কিন্তু আমাকে বলনি কেন?’

গার্ড আবার ছেলেটির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। হাসি চেপে ছেলেটি বল, ‘স্যার, আপনার রমার বোধহয় খুব বিপদ তাই ডিস্টাৰ্ব করতে চাইনি।’

হকচিকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, অ্যা, আমার রমা! ওঁ হ্যাঁ; তা বটে। ঠিক আছে, যে যার সিটে ফিরে যাও। আমার ঘরে কোনো আনফেয়ার ব্যাপার চলবে না।’

যেমন এসেছিলেন তেমনি দ্রুত ফিরে গেলেন ভদ্রলোক। অনিমেষ নিজের সিটে যাবার জন্য সময় ছেলেটি আবার ডাকল, ‘কই, লাস্ট লাইনটা হোক, আফটার অল আম্বা এক পার্টির লোক।’

অগত্যা অনিমেষকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃজর খাতা থেকে এক নম্বর প্রশ্নটার শেষ লাইনটা ফিসফিস করে পড়ে যেতে হল।

সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি বরছিল। এটা ঠিক সেই উন্নবদ্ধীয় বৃষ্টি, যা কিনা এটুলির মতো দিনবারাতের গায়ে সেঁটে বসে থাকে। রাস্তিবেলায় ঝুঁঝুমিয়ে আকাশ ডেঙে পড়ে, আবার সকালবেলায় ছিক্কান্দুনে মেয়ের মতো সূচ বেঁধায়। জেলা স্কুলের লো ঢাকা-বারান্দায় অনিমেষেরা সেই সকাল থেকে গুলতানি মারছিল। খবর আছে আজ রেজাল্ট বের হবে।

অবশ্য এরকম গত কয়েক দিন ধরে রোজই আসছে। হঠাৎ কেউ বলল, রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে-ছেট ছেট কোথায় কী! গতকাল রেডিওতে নাকি বলেছে এ-বছর পার্সেন্টেজ খারাপ নয়। আবার আজ সকালে হেডমাস্টার মশায় এসে বললেন, দারুণ খবর আছে তাঁর কাছে, মার্কশিট না এলে তিনি কিছু বলবেন না।

কদিন থেকে উত্তেজনাটা বুকের মধ্যে দলা পাকাছিল-যদি খারাপ হয় তা হলে কী হবে?

সরিষ্ঠেখর গতকাল রেডিওতে কলকাতায় ফল বেরিয়ে গেছে তবে আর ঘূর্মতে পারেননি। সারারাত ছটফট করেছেন। ভোরবেলায় উঠেই অনিমেষকে বলেছেন, রেজাল্ট বের হলে অবশ্যই যেন সে বাড়িতে চলে আসে। আজকে তাঁর বেড়াতে যাওয়া হল না। হেমলতা ভোরবেলায় বাবার হাঁকডাকে উঠে পড়ে একশে আটবার জয়গুরু নাম লিখে একমনে জয়গুরু বলে যাচ্ছেন। অনিমেষ যখন দেরেছে তখন একটা কাগজ ভাঁজ করে তাঁর বুকপক্ষে তুকিয়ে দিলেন। অনিমেষ গেট খুলে বাড়ি থেকে বের হতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখল দাদু আর পিসিমা বাইরের বারান্দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টিতে। দাদুর দুই হাত জোড় করে বুকের ওপর রাখা, পিসিমার ঠোঁট দুটো নড়ে।

হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল ওর। চুপচাপ করে একা বাঁধের ওপর দিয়ে জেলা স্কুলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে সেই ভয়টা চট করে ফিরে এল। যদি সেই গার্ড ভদ্রলোক মুখে কিছু না বলে চুপচাপি ওর নামে রিপোর্ট করে দেন তা হলে কী হবে! আর-এ হয়ে গেলে সে এই বাড়িতে ফিরে আসবে কী করে? অনিমেষ মনেমনে ঠিক করল, যদি সেইরকম হয় তা হলে সে ওই ভদ্রলোককে ছেড়ে দেবে না, তার জন্য যদি তাকে জেলে যেতে হয় তো তা-ই হোক। জেলে যাবার কথা মনে হতেই শনিবারার ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে গেল ওর। যাই, আঠারো বছর হতে ওর তো এখনও দুই বছর বাবি আছে। কিন্তু ভয়টা কিছুতেই ওকে ছেড়ে যাচ্ছিল না, অঙ্গস্তিতা থেকেই গেল।

মুখচোখ সবাই শুকনে। ফিলফিলে বৃষ্টির জলে সবাই জামকাপড় স্যান্ডস্কেট। বেরবার আগে পিসিমা ছাতির কথা বলেছিলেন, ছাতি নিয়ে বের হলে বস্তুরা ব্যাপায়-একখাটা পিসিমাকে বলে-বলে বোবাতে পারে না সে। সকাল নটা বেজে গেল, এমনও মার্কশিট এল না। তপন বলল, ‘আচ্ছ খেলাচ্ছে মাইরি, ভাল্লাগে না! যা করবি করে ফ্যাল!’

অর্ক সিগারেট ধরাল। এই প্রথম স্কুল-ক্ষম্পাউন্ডে বসে অনিমেষ কাউকে সিগারেট থেকে দেখল। তপন বলল, ‘য়াই অর্ক, কী হচ্ছে?’

অর্ক কেয়ার করল না, ‘বেশ করছি, খাবার জিনিস থাচ্ছি। পারলে হেড়কে বল আমায় রাস্টিকেট করতে।’

সেটা আর সম্ভব নয় এখন এই মহুর্জে, সবাই মেনে নিল। জেলা স্কুলের কারওর ওদের ওপর কর্তৃত এখন বুক ফুলিয়ে ঠোঁট গোল করে ও যেভাবে রিং বানাতে লাগল তাতে বোঝাই যায় ও এ-ব্যাপারে বেশ পোক। এই সময় নিশীথবাবু স্কুল এলেন। ওদের সাথনে দিয়ে যেতে-যেতে অনিমেষকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন, ‘তোমাদের রেজাল্ট এসে গেছে। একটু পরেই স্কুলে এসে যাবে।’ অনিমেষকে মাথা নিচু করতে দেখে বললেন, ‘কী, খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে।’ কষ্ট করে ঘাড় নড়ল অনিমেষ। এমন সময় উনি বোধহয় অর্ককে দেখতে পেলেন। অর্ক সেইরকম ভঙ্গিতে সিগারেট থেয়ে যাচ্ছে, নিশীথবাবুকে দেখে একটু সংকোচ করে না। চলে যাওয়ার আগে তিনি একটু হেসে বললেন, ‘আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে পারলো না।’

অনিমেষ দেখল, অর্কের মুখটা হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। নিশীথবাবু চলে যাওয়ার পর ওর হাতেই সিগারেট জুলে-জুলে ছেট হয়ে যেতে লাগল। মুখে কিছু না বললেও আর যেন টানতে পারছিল না। আবার কী আশচর্য, সিগারেটটা ফেলে দিতেও ওর যেন কোথায় আটকাছিল।

শেষ পর্যন্ত ওদের চোখের সামনে দিয়ে একজন স্যার রেজাল্টের কাগজপত্র নিয়ে হেডমাস্টারমশাই-এর ঘরে ঢুকে গেলেন। দমবন্ধ উভেজনায় সবাই ছটফট করছে। স্কুলের স্টোকা দারোয়ান অফিসের গেটে দাঁড়িয়ে, সে কাউকে ভেতে যেতে দেবে না! ওদের পুরো ... টো হেডমাস্টারমশাইর ঘরে সামন দাঁড়িয়ে অথচ কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। এই সময় অনিমেষ লক্ষ করল, ওর হাতের তেলেয় চটচটে ঘাম জমছে-অঙ্গুত দুর্বল লাগছে শরীরটা। এর মধ্যে একজন স্যার এসে বলে গেলেন ওদের রেজাল্ট নাকি ভালো হয়েছে, মার্কশিট দেখে প্রত্যেকের ফলাফল নামের পাশে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে-সেটাই একটু বাদে নোটিসবোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। মন্ত্র, অনিমেষ এবং তপন পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। মন্ত্র বলল, 'লাস্ট ডে ইন স্কুল!'

তপন খাড় নাড়ল, 'যদি শালা গাড়া মারি-অহঙ্কার করলে উলটেটা হয়।' আর এই সময় বৃষ্টিটা নামল আর-একটু জোরে। ছাট আসছিল বারান্দায়-ওরা সবে সবে নিজেদের বাঁচাঞ্চিল। তপন আবার কথা জুড়ল, 'আমাদের কার দুঃখে আকাশ কাঁদছে কে জানে! শুনেছি অমঙ্গল কিছু এলে প্রকৃতি জানিয়ে দেয়।'

তারপর দরজা খুলে গেল হেডমাস্টারমশাই-এর ঘরের। তিনি বাইরে এলেন। এখন বর্ষাকাল, তবু তিনি গলাবন্ধ সাদা লংকোট পরেছেন। ওর পেছনে ডুগোল-স্যার। তাঁর হাতে একটা বিরাট কাণ্ঠে ভাঁজ করা। নোটিসবোর্ডের দিকে ওদের এগিয়ে যেতে সবাই নীরবে পথ করে দিল। সেখানে হেডমাস্টার ঘুরে দাঁড়ালেন। সামনে দাঁড়ানো উদ্ঘীর মুখগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে তিনি যেন সামান্য কাঁপতে লাগলেন, 'এইব্যাপ তোমাদের ফলাফল এসেছে-এ খবর তোমরা নিষ্ক্রয়ই পেয়েছে। আজ আমার, আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন। তোমরা জান, এ-বছর আমি রিটায়ার করব-যাবার আগে আমি যে-গৌরবের মুকুট তোমাদের কাছ থেকে পেলাম তা চিরকাল মনে ধাককে। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি'- এই সময় তাঁর কঠিত্বর ঢড়ায় উঠে কাঁপতে লাগল, 'আমার স্কুলের কেউ অকৃতকার্য হয়নি। তোমরা আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ।' সঙ্গে সঙ্গে যেন পাথরচাপা একরাশ নিষ্পাস আনন্দের অভিযুক্ত হয়ে প্রচণ্ড আওয়াজে ছড়িয়ে পড়ল। হেডমাস্টারমশাই দুহাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললেন। শব্দ একটু হ্রিয়মাণ হলে তিনি বাঁহাতে গলার বোতামটা ঠিক করতে করতে বললেন, 'এ ছাড়া আর-একটি খবর আছে। আমাদের স্কুল থেকে একজন এই বছর স্কুল ফাইনালে বিজীয় হয়েছে-এই জেলা থেকে আজ অবধি কেউ সে-সম্মান পায়নি।'

খবরটা সবাই শুনে খ হয়ে গেল। স্কুল ফাইনালে স্ট্যান্ড করা বীতিমতো চাপ্পলক্যর ঝ্যাপার। এর আগে এফ ডি আই থেকে একজন নিচের দিকে স্ট্যান্ড করতেই শহরের ইইচই পড়ে গিয়েছিল। কে সেই ছেলে? অরুপ? টেস্টে ওর রেজাল্ট সবচেয়ে ভালো ছিল। এই সময় হেডমাস্টারমশাই গলা তুলে ডাকলেন, 'অর্ক-অর্ক আছ এখানে!'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা পেছনে দাঁড়ানো অর্ককে জড়িয়ে ধরল হইচই করে। হেডমাস্টারমশাই দেখলেন এই মুহূর্তে ওকে আলাদা করা অসম্ভব। তিনি একজনকে বলে গেলেন, তা যেন যাবার সময় দেখা করে যাব।

ডুগোল-সার ততক্ষণে নোটিসবোর্ডে কাগজটা টাঙিয়ে দিয়েছেন। সবাই সেটার ওপর বাঁপিয়ে পড়েছে একমাত্র তা ছাড়া। সবাই একসঙ্গে নিজের রেজাল্ট দেখতে চায়। অনিমেষ কিছুতেই ডিড়েচেলে এগাতে পারছিল না। ও দেখল অর্ক দূরে দাঁড়িয়ে মেজাজে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাঙ্গৰ হয়ে গেল অনিমেষ, এই মুহূর্তে কেউ সিগারেট থেকে পারে! ডিড়টার দিকে তাকাল সে- যদি থার্ড ডিভিশন হয়ে যায়-'আর-এ' হ্যানি বোা যাচ্ছে, হলে হেডমাস্টারমশাই নিষ্ক্রয় বলতেন। আর পারল না অনিমেষে অপেক্ষা করতে, ভিড়ের একটা দিক সামান্য ফণাক হতেই সে ঢুকে পড়ল সেইখান দিয়ে। তারপর টেলেচুলে একেবারে নোটিসবোর্ডের ছয় ইঞ্জির মধ্যে ওর চোখ চলে এল। প্রথমে সার-ওদওয়া পিংপড়ের মতো নামগুলো চোখে ভাসল। সহ্য হয়ে এলে ও প্রথম থেকে নামগুলো পড়তে লাগল। অরুপ ফার্স্ট ডিভিশন-একটা দাঁড়ি, অর্ক একটা দাঁড়ি, তারপর দুটো দাঁড়ি-দুটো-একটা-দুটো-নিজের নাম চোখে আসতেই দৃষ্টিটা পিছনে ডানদিকে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পেছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে ওপরে তুলে ধরে চিংকার করে উঠল। নোটিসবোর্ডের ওপরে মাথা উঠে যাওয়ায় নিজের নামের পাশে এক দাঁড়িকে বিরাট লম্বা দেখল সে।

সমস্ত শরীরে লক্ষ কদমস্কুলের জ্বান-তগনের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সময় নিল

অনিমেষ। তপন সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে। এবং মন্ট ফার্স্ট ডিভিশন। বারোজন ফার্স্ট ডিভিশন, আঠারোজন সেকেন্ড, বাকিরা থার্ড ডিভিশন। মন্ট এগিয়ে এসে সাহেবি কায়দায় গঁটীরমুখে ওর সঙ্গে হ্যাঙ্কে করল। তপনের কোনো আপসোস নেই—ও জানত দ্বিতীয় ডিভিশনই ওর বরাদ্দ। ওরা বেশ দৃঢ়পায়ে বাইরে হেঁটে এসে অর্ককে খুজল—না, অর্ক কোথাও নেই। হেডমাস্টারমশাই—এর ঘরেও যায়নি।

তপন বলল, ‘আমরা এখন কলেজ স্টুডেন্ট—আঃ, ফাইন!'

মন্ট বলল, ‘মাইরি, শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে শেলাম। ভাবাই যায় না! শালা আজ যদি রঞ্জারা এখানে থাকত তো ট্যারা হয়ে যেত।'

অনিমেষ কিছু বলল না। স্কুল থেকে বের হবার আগে সে একবার নিশ্চিন্মাবু সঙ্গে দেখা করে যাবে কি না ভাবল। কিন্তু মন্টরো বেরিয়ে যাচ্ছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে কুঠরোগীদের ডেরাটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ও শক্ত হয়ে গেল।

বাইরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। একটুও তোয়াকা না করে ওরা রাস্তায় নেমে পড়ল। মন্ট বলল, ‘চল গার্লস স্কুলটা দেখে আসি—ওখানে ফেলু মেয়েরা আজ হেভি কাঁদবে।'

এখন এই বৃষ্টিতে হাঁটতে অনিমেষের ভীষণ ভালো লাগছিল। ও একবার ভাবল, দাদুকে একচুক্ত বলে আসে থবরটা, কিন্তু বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেটা চেপে গেল। আজ বাংলাদেশে ও একাই শুধু স্কুল ফাইনাশ পায় করেনি। বৃষ্টিতে হাঁটতে হাঁটতে ওরা শহরটাকে ভিজতে দেখল। শহরের লোকরাও বিভিন্ন ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে তিনিটি কাকতিজ্জে তরঙ্গের ব্যাপার দেখে অবাক হল। গার্লস স্কুলের দিকে যেতে—যেতে তপন হঠাৎ গান ধরল, ‘এখন আর দেরি নয়, ধ্ৰুৱ গো তোৱা হাতে হাতে ধৰণো/আজ আপন পথে কিৰতে হবে সামনে মিলন—শৰ্গ।'

ও এক লাইন গাইছে, অনিমেষ আর মন্ট পৰের লাইনটা আবৃত্তি করছে। এই বৃষ্টির জল গায়ে মুখে মেৰে গান গাইতে গাইতে ওরা ঝোলানো পুলের ওপর এসে দাঁড়াল। অনিমেষদের সুরের ঠিক নেই, কিন্তু একটা খুশির জোয়ার বুরকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল। এক দ্রুলোক ছাতি-মাখায় আসছিলেন, মন্টুর চেনা—হাসিমুখে জিঞ্জাসা করলেন, ‘কী, রেজাল্ট বেরিয়েছে? পাশ করেছ মনে হচ্ছে?’ গাইতে গাইতে ঘাড় নাড়ল মন্ট, মুখে জবাব দিল না।

গার্লস স্কুলের কাছে এসে গানটাকা থেমে গেল। আর তখনই ওরা একটা মেয়েকে দেখতে পেল। বৃষ্টির মধ্যে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। ওরা দেখল মেয়েটার মুখ কানায় মুচড়ে গেছে। সামলাতে পারছে না বেচারা। ওদের তিনজনেরই মন-খারাপ হয়ে গেল আচমকা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে মেয়েটার চলে যাওয়া দেখতে—দেখতে মন্ট বলল, ‘চল বাড়ি যাই।’ যেন এই কথাটার জন্যই ওরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তিনজনেই তিনিদিকে কোনো কথা না বলে দৌড়তে লাগল।

বাড়ির গেটে হাত দিতেই অনিমেষ দেখল পিসিমা ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায় যেন সে চলে যাওয়ার পর থেকে একচুরও নড়েননি। দাদুকে দেখতে পেল না সে। পিসিমা ওকে দেখেছেন, তাঁর চোখ দুটো অনিমেষের মুখের ওপর। পায়েপায়ে কাছে এগিয়ে গেল অনিমেষ। হেমলতা ভাইপোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কোনো কথা বলতে পারছিলেন না। অনিমেষ ইচ্ছে করে চুপ করে ছিল। ওর বেশ মজা লাগছিল পিসিমার অবস্থা দেখে। কী বলবেন কী করবেন বুবাতে পারছেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ ঝুকে পড়ে হেমলতাকে প্রণাম করল, ‘আমি পাশ করেছি, ফার্স্ট ডিভিশন হয়েছে।’

সঙ্গে সঙ্গে তিক্কাক করে জড়িয়ে ধরলেন হেমলতা। অনিমেষ দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন, অতিশয়ে তিক্কাকটা কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। অনিমেষ দেখল পিসিমার মুখ ওর বুকের ওপর—ও অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে। কান্না-মেশানো গলায় হেমলতা তখন বলছিলেন, ‘অনিমাবা, তুই পাশ করেছিস—ও মাধু দ্যাখ-তোর অনি ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে—মাধু চোখ-তোর দ্যাখ।’

মায়ের নাম শব্দে থরুৰ করে কাঁপতে লাগল অনিমেষ। এই সময় তুতোর শব্দ তুলে সরিৎশোখের দরজায় খেস দাঁড়ালেন। অনিমেষ তখনও হেমলতার দুহাতের বাঁধনে আটকে। সরিৎশোখের গঁটীরমুখে নাতিকে দেখলেন, তাঁরপর বললেন, ‘আশা করি ফার্স্ট ডিভিশন হয়েছে।’

বাবার গলা শব্দে হেমলতা অনিমেষ ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনার নাতি মুখ রেখেছে—আপনি মাধুকে বথা দিয়েছিলেন।’

নিজের শরীরটাকে যেন অনেক কষ্টে সামলে নিলেন সরিৎশোখের, ‘কথা তো সবাই দিতে পারে, রাখে কয়জন! এই আনন্দের ব্যবের জন্য এতকাল বেঁচে আছি, হেঁ।’

অনিমেষ ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে দাদুকে প্রণাম করল। সরিষ্ঠেখরের হাতটা ওর মাথার উপর এলে অনিমেষ অনুভব করল দাদুর শরীর কাপছে। বিড়াবিড়ি করে কিছু-একটা বলছেন। অনিমেষ উঠে দাঢ়ালে সরিষ্ঠেখর গঁষ্ঠির গলায় বললেন, ‘কিন্তু এতে আমি সন্তুষ্ট নই অনিমেষ, তোমাকে আরও বড় হতে হবে-আমি ততদিন বেঁচে থাকব’।

॥ এগোরো ॥

সরিষ্ঠেখর দিন ঠিক করে রেখেছিলেন পঞ্জিকা দেখে। বিদেশযাত্রা এবং জ্ঞানার্জনের প্রশংস্ত সময় আগামী মঙ্গলবার। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ছাড়ে রাত্রে, কিন্তু বিকেলবেলায় জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকেই যাত্রা শুরু করা যায়। এসব আগবেগাগেই ছকে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হল আজ কাগজে দেখলেন বুধবার কলকাতায় বামপন্থীরা হরতালের ডাক দিয়েছে। বাড়িতে কাগজ রাখা বক্ষ করেছিলেন তিনি, শুধু রবিবার দুটো কাগজ নেন। বাকি ছয়দিন কালীবাড়ির পাশে নিজ কলিবাজের দোকানে বসে পড়ে আসেন। নাতির পাশের খবর সবাইকে দিয়ে সেবানের কাগজটা হাতে তুলতেই সব গোলমাল হয়ে গেল। বাটোরা আর হরতাল ডাকার দিন পেল না! সরিষ্ঠেখরের হঠাতে মনে হল নাতিকে তিনি একটা অনিচ্ছিত এবং অগ্রিম হাঁ-শুধুর দিকে ঠেলে দিছেন। কলকাতা শহরকে বিশ্বাস করতে পারা যায় না, অস্তত এই কাগজগুলো পড়ে মনে হয় কলকাতা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মন্দির। রাতদিন মারামারি, মিছিল, হরতাল, হাত্র-আন্দোলন সেখানে লেগেই আছে। অনিমেষ সেখানে সিয়ে নিজেকে কতটা নিয়াগদে রাখতে পারবে? একেই ছেলেটার মাথায় এই ধরনের একটা ভূত সেই পনেরোই আগষ্ট থেকে চেপে আছে-সেটা উসকে উঠবে না তো? হেমলতার ভয় কলকাতার গেলে মেয়েরা তাঁর ভাইপোকে তিবিয়ে থাবে। শনিবারা বলেছিলেন, এর জীবনে প্রচুর যেয়ে আসবে, তাঁরা সর্বনাশ করবে, আবার তাদের জন্যই ওর উন্নতি হবে। কিন্তু মাথা খেয়ে নিলে তারপর আর কী ছাই হবে! হেমলতার এইসব চিন্তা সরিষ্ঠেখরকে শ্পর্শ করে না। তাঁর নাতির উপর বিশ্বাস আছে। মেয়েছেলে ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তেমন হলে তিনি নিজে কলকাতায় যাবেন। কিশোরী মিত্রের বাড়ি শোভাবাজারে। এককালে এই অঞ্চলে ছেলেন তিনি, সরিষ্ঠেখরকে তাঁর অস্তরঙ্গ। অনিমেষের দেখাশোনার তার তিনি নিয়েছেন চিঠির মাধ্যমে। অতএব তেমন- কিছু হলেই খবর পাবেন সরিষ্ঠেখর। এই সময় তাঁর চট করে বড় ছেলে পতিতোবের কথা মনে পড়ে গেল। তাকে জলপাইগুড়িতে রেখেছিলেন আর-একজনের কাছ থেকে খবরাখবর ঠিকমতো পাবেন এই আশায়। পেয়েছিলেন? সবই কিক, কিন্তু কলকাতায় না গেলে অনিমেষের ভবিষ্যৎ এই শহরের চারপাশেই পাক থাবে। আনন্দস্তু কলেজ থেকে আহা-মরি ফল করে পাশ-করার আশা পাগলও করবে না। অতএব প্রেসিডেন্সি অথবা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অনিমেষকে ভরতি করতে হবেই। তাঁর ইচ্ছা ও সেন্ট জেভিয়ার্সে ভরতি হোক। মিশনার কলেজ, ইংরেজিটা তালো শিখবে, সহবত পাবে। সরিষ্ঠেখর এখনও বিশ্বাস করেন ইংরেজিতে উন্নত ব্যুৎপত্তি না থাকলে জীবনে বড় হওয়া যায় না। তারপর খবরে জেনেছে সে-কলেজে মেয়েরা পড়ে না, হেমলতার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। কোঝড়ুকেশন করে, সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোনো শোভায় নেই। তবে চিকিৎসার চেয়ে সর্তকতাই শ্রেয়। অবশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজে দেশের তালো তালো ছেলেরা পড়ে, বিখ্যাত অধ্যাপকরা পড়ান। ঘোটাঘুটি নিচিন্ত পাকা যায় ছাত্রের পড়াশুনার ব্যাপারে। যদিও সেখানে মেয়েরা পড়ে। তবে এই মেয়েরা যখন মেধাবী এবং কৃতী, নাহলেওই কলেজে ভরতি হতে পারত না, তাই তাদের সময় হবে না ছেলেদের মন্তিক চৰ্ণণ করার। আর করলেও- তাঁর নাতবউ পড়াশুনায় কলার-সরিষ্ঠেখর অতটা আশা করতে পাবেন না। তা ছাড়া প্রেসিডেন্সির গায়েই নাকি বেকার হোটেল। পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করবে অনিমেষ। গাড়িঘোড়ায় চাপার ব্যাপারে কলকাতা শহরকে অবিশ্বাস করেন তিনি। বেকার হোটেল থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স কত দূর-হেঁটে যাওয়া অসম্ভব কি না কিশোরী মিত্রকে জানাতে লিখেছিলেন। অনেকেই যেমন হয়, চিঠি দেবার সময় সব পয়েন্টের কথা খেয়াল করে না- কিশোরী মিত্রও তা-ই করেছেন।

আজ নাতিতে স্বর্গছড়ায় পাঠালেন সরিষ্ঠেখর। যাবার আগে বাপের সঙ্গে দেখা করে আসুক। মাতাপিতার আশীর্বাদ ছাড়া কোনো সন্তান জীবনে উন্নতি করতে পারে না। অনিমেষকে তাই তিনি স্বর্গছড়ায় পাঠালেন, দু-চারদিন থেকে আসুক। সাধারণত ছেলেটা সেখানে যেতে চায় না-এবার

বলতেই রাজি হয়ে গেল। ফাঁকা বাড়িতে সরিষ্পেখর চৃপচাপ বসে অনিমেষের কথা ভাবছিলেন। ওর কলকাতায় পড়তে যাবার ব্যাপারে প্রথমে মহীতোষের ইচ্ছা ছিল না ঠিক, কিন্তু তিনি বরাবর জোর করে এসেছেন। কিন্তু সেখানে ছেলেটার পেছনে প্রতি মাসে যে-ব্যরচ হবে তা যোগানের সামর্থ্য তাঁর নেই। পেশণ আর এই সামান্য বাড়িবাড়া-এতে তাঁকে যেভাবে চলতে হচ্ছে তা খেকে অনিমেষকে সাহায্য করা সভ্য নয়। ওরা পড়াশুনার দায়িত্ব তাই মহীতোষকে নিতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন সে তা নেবে। নিজের সন্তানদের পেছনে তিনি জীবনের কর্তব্যানি উপর্জন দায় করেছেন, সেগুলো থাকলে আজ তিনি অনিমেষকে কারও কাছে পাঠাতেন না। অতএব মহীতোষ তার নিজের ছেলের জন্য টাকা ব্যরচ করবে না কেন? ঠিক এই মূহূর্তে তাঁর মনে হল যে এতদিন তিনি যেন অনিমেষের কেন্দ্রাটেকার হয়ে ছিলেন। সেই স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে চলে আসার সময় বউমার কাছ থেকে যে-ছেলেটার দায়িত্ব হাত পেতে চেয়ে নিরেছিলেন, এত বছর ধরে যাকে বুক দিয়ে আড়াল করে রেখে বড় করলেন, আজ সেই দায়িত্ব তাঁর শেষ হয়ে গেল। এখন তিনি মৃত। কিন্তু এটুকু ভাবতেই তাঁর সমস্ত শরীর কেমন দুর্বল হয়ে গেল। উত্তরের বারান্দায় ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে সরিষ্পেখর অনেক বছর পরে তাঁর জরাপ্রস্ত ঢোক দুটো থেকে উপচে-পড়া জলের ধারাকে অনুভব করলেন। ঢোক মুছতে একটুও ইচ্ছে হব না তাঁর।

কুচবিহার-লেখা বাসে চেপেছিল অনিমেষ। ময়নাগুড়ি রোডে এলে টিকিট কাটার সময় জানতে পারল সেটা স্বর্গছেঁড়ায় যাবে না, ধূপগুড়ি থেকে ঘুরে অন্য পথ ধরবে। এখন নেমে পড়াও যা ধূপগুড়িতে নামাও তা। পিছিমিহি বেশি প্রসা খরচ হয়ে গেল। ধূপগুড়িতে নেমে ও স্বর্গছেঁড়ার দিকে একটা মিটির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ইঁটবার হলে ঘনঘন বাস পেত, কিন্তু আজ বোধহয় অপেক্ষা করতে হবে। বার্নিশ থেকে পরের বাসটা, অথবা মালবাজার মেটেলি থেকে বাস এলে সেটাতে উঠতে হবে। অথচ এখান থেকে স্বর্গছেঁড়া বেশি দূর নয়—মাইল আটেক। দৌড়েই চলে যাওয়া যায়।

অনেকদিন পরে স্বর্গছেঁড়ায় যাচ্ছে সে। অথচ সেই প্রথমবারের মতে। উত্তেজনা হচ্ছে না, এখন সমস্ত মন বসে আছে বুধবার সংস্কেতের দিকে তাকিয়ে। মঙ্গলবার ঠিক ছিল, কিন্তু হরতালের জন্য দানু দিনটা পিছিয়ে দিলেন। বহুস্মিন্তিবার কলকাতায় পৌছাবে সে। ভাবতেই সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। এতদিন ধরে বিভিন্ন বই, ব্যবরের কাগজ আর মানুষের মুখেয়ে শুনে মনের মধ্যে কলকাতা এক স্বপ্নের শহর হয়ে গেছে— সেখানে যেতে পারার সুযোগ পেয়ে অনিমেষ আর-কিছু ভাবতে পারছিল না। ওর মনে পড়ল অনেক অনেক দিন আগে যখন সে ছোট ছিল তখন একদিন দানু ওকে বলেছিলেন, কলকাতায় যখন যাবে যোগায় নিয়ে যাবে। প্রথম তিভিশনে পাশ করলে নিচয়ই যোগ্য হওয়া যায়। অনিমেষের মনটা এখন বেশ ভালো হয়ে গেল। স্বর্গছেঁড়ায় আসবার আগে সামান্য অবস্থি ছিল। মহীতোষের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তার পড়াশুনার খরচ যদি মহীতোষ না দেন তা হলে এসি কলেজেই পড়তে হবে। মনেমনে একটা কুস্তি ও বোধ করছিল সে। সেই ঘটনার পর থেকে মহীতোষের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা একদম হয় না বলেই চলে। জলপাইগুড়িতে তিনি কদাচিৎ আসেন, এলে মুখোমুখি হল দুএকটা ছাড়া-ছাড়া কথা বলে মহীতোষ কর্তব্য শেষ করেন। ছোটমা এর মধ্যে যে-কবার এসেছেন তাঁর বেশির ভাগ সময় কেটেছে বাপের বাড়িতে। মহীতোষ ইদানীং ছোটমাকে নিয়ে শুশ্রবাড়িতে যাচ্ছেন। বাবাকে ও কিছুতেই নিজের বলে ভাবতে পারে না। আজ্ঞা, বাবার সেবৰ অভ্যেস কি চলে গেছে? জী জানিন!

একটু অন্যমনশ্ব হয়ে গিয়েছিল অনিমেষ, কানের কাছে বিকট আওয়াজে একটা হর্ন বেজে উঠতেই ভীষণরকম চমকে উঠল। সামলে নিয়ে ও দেখল একটা কালো গাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হন্ট! বেজেছে ওটাতেই। ঝুকে পড়ে ড্রাইভারকে দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। বিক্রিষ্টা দাঁত বের করে বাপী স্টিয়ারিং-এ বসে হাসছে, চোখাচোপি হতে চেঁচিয়ে বলল, ‘উঠে আয়।’ বাপী গাড়ি চালাচ্ছে—বুবতে-না-বুবতে অনিমেষ বাগ নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। বেশ ঝকঝকে তকতকে গাড়ি তবে নতুন নয়।

বাপী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুই এখানে কী করছিলি?’

অনিমেষ বলল, ‘কুচবিহারের বাসে উঠে পড়েছিলাম। কিন্তু তুই-গাড়ি চালাচ্ছিস?’

‘কেন?’ জু তুলন বাপী, ‘এটা আবার শক্ত কাজ নাকি?’

‘কার গাড়ি এটা?’

‘বীরপাড়ার খোকনদার। আমি মাঝলি সিশেমে চালাই। দুনবর পেট্টোল পেলে ভালো হয়, নাহলে এই ছয়-সাতশো টাকা মাস গেলে-তা-ই-বা কে দেয় বল!’

বাপী ইঞ্জিন স্টার্ট করল। আরও বিস্ময়, অনিমেষ কোনোরকমে বলল, ‘তুই ট্যাঙ্ক চালাস?’
‘ইহেস, প্রাইভেট। এই তো একজনকে বার্নিশে ছেড়ে এলাম।’

বাপীর গাড়ি চলতে শুরু করলে অনিমেষ আড়ষ্ট হয়ে বসে রাইল কিছুক্ষণ। ওর সমবয়সি একজন গাড়ি চালাচ্ছে—কীরকম চালায় কে জানে, যদি অ্যারিঙ্গেট করে। কিন্তু সে দেখল বাপীর গাড়ির চাকা একটু এপাশ-ওপাশ হচ্ছে না। আর মাঝে-মাঝেই ও এক, হাত ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্মুখে বসে আছে—তার মানে বেশ পাকা ড্রাইভার। বাপীটা, চিরকালই দুর্দান্ত, কিন্তু এইরকম হবে এটা কল্পনা করতে পারেনি সে। কিন্তু বাপীর তো এখনও আঠারো বছর হয়নি, তার আগে লাইসেন্স পাওয়া যায়? প্রশ্নটা করতেই বাপী গঁজারমুখে বলল, ‘লাইসেন্স হয়ে গেছে। ডেট অভ বার্থ গণাদা ঠিক করে দিয়েছে। গণাদাকে চিলি? আরে আমাদের এখানকার এম-এল-এ। ইলেকশনের সময় হেভি খেছেছিলাম তো ওর হয়ে, কফিউনিস্ট্রা শালা সব বোন্স আউট হয়ে গিয়েছে। তা গণাদা দুই বছর ম্যানেজ করে লাইসেন্স বের করে দিয়েছে। আমার তো আর পড়াশুনা হল না।’

‘পড়লি না কেন?’ অনিমেষ ওদের ছোটবেলার কথা ভাবল।

দুস! ওসব আমার আসে না। আর পড়েও তো টাকা রোজগারের ধান্দা করতে হবে। বিশ্বটা মাইরি সেকেন্ড ডিভিশন পেরে এখন থেকে বাগানের চাকরির ধান্দায় লেগেছে। কত পাবে? বড়জোড় তিনশো, আমি পাছি ছুর সাত-ব্যস, আর কী চাই?’

‘বিশ্ব সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছে?’

ঘাড় নাড়াল বাপী, ‘ইঁ’ তারপর যেন মনে পঢ়ে থেকে জিজাসা করল, ‘তুই?’

মুখ নামিয়েঅনিমেষে বলল, ‘ফার্স্ট ডিভিশন।’

সঙ্গে সঙ্গে চিন্কার করে জব্বর ব্রেক কষল বাপী। মাথাটা অল্পের জন্য ঠুকে যাওয়া থেকে বেঁচে গেল, কিন্তু তার আগেই হইহই করে ওকে জড়িয়ে ধরল বাপী, ‘আরে বাস, আগে বলিসনি—আমি জানতাম তুই ফার্স্ট ডিভিশন পাবি-উঁ: কী আনন্দ হচ্ছে, আমাদের অনি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে।’ কথাগুলো বলতে সে টপাটপ চুম্ব থেকে লাগল অনিমেষকে। অস্থি হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই মুখ সরিয়ে নিতে পারবে না অনিমেষ, ও বুবতে পারছিল বাপীর উচ্চাসের মধ্যে কোনো কৃতিমতা নেই।

উচ্চাস করে এলে বাপী স্টিয়ারিং-এ ফিরে গিয়ে বলল, ‘তুই মাইরি বহুৎ বড়া অফিসার হবি, না? কলকাতায় পড়তে যাবি, না জলপাইগুড়িতে?’

গঁজীর গলায় অনিমেষ বসল, ‘কলকাতায়।’

‘কী কপাল মাইরি! কত সিনেমা-স্টোর দেখবি-আঁ! নে সিগারেট খা।’

এর মধ্যে ও কখন প্যাকেট বের করেছে দেখেনি অনিমেষ, এখন বাপীকে একটা কড়া সিগারেট ওর দিকে বাড়িয়ে ধরতে দেখল। আন্তে-আন্তে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, ‘না, আমার ঠিক অভ্যাস নেই।’

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল বাপী, যা বাবা, তুই খাস না? একদম শুভ বয়! আরে তুই এখন কুল-বয় নস, কলেজে উচ্চেছিস—একটা সিগারেট খা ভাই। আমার হাতে হাতেখড়ি করতে অনিমেষ হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিল। ফস করে দেশলাই জ্বলে নিজেরটা ধরিয়ে বাপী ওঠটা ধরিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। খুব আন্তে সিগারেটটায় টান দিয়ে ধোয়া ছাড়ল অনিমেষ; একটা ক্ষা স্বাদ জিভটাকে ভারী করে তুলেছে। নাক দিয়ে ধোয়া বের করার সাহস ওর হচ্ছিল না। জানলার পাশে বসে তুঁতয়া নদীকে চলে যেতে দেখল এবার। বাঁক ঘুরলেই স্বর্গছেড়া। উদ্দেজ্ঞায় জ্বারে টানতে গিয়ে ধোয়াটা পেটে চুকে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে থকবকে কাশি এস গেল ওর। দম বৰ্ক হবার যোগাড়। সিগারেটটা রাস্তায় ফেলে দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিল না সে। ব্যাপার দেখে বাপী হেসে বলল, ‘মাইরি অনি, তুই একদম শুভ বয় হয়ে আছিস।’

মুঠো খুললেই হাতের রেখার মতো পরিষ্কার, বাঁক ঘুরতেই চা-বাগানের মাথা ডিঙিয়ে স্বর্গছেড়া চোখ পড়ল। চায়ের পাতা দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন খি গশির করে অনিমেষের। একটু আগে আঙুরাভাসার ওপর দিয়ে পার হবার সময় বাপী বলেছিল, ‘জ স্বর্গছেড়া চা-বাগানে একটা দারুণ ব্যাপার হচ্ছে।’

স্বর্গছেড়া চা-বাগানে কোনো দারুণ ব্যাপার ঘটলে সেটা যেন ঠিক মানায় না। চূপচাপ শান্তভাবে

হৰ্গছেঁড়ার দিনগুলো কেটে যাবে—ভোবেৰায় ট্ৰাকটৱণগুলো শব্দ কৰে চা-বাগানেৰ ভেতৱ দিয়ে ঘৰাফেৰা কৰবে, কুলিৱা দল বেঁধে পাতি তুলতে বা ঝাড়াই-বাছাই-এৰ কাজে ছুটতে, বাবুৱা সাইকেলে হেলতে দুলতে ফ্যাস্টিৰ বা অফিসে যাবেন, আৱ তাৰপৱ গোটা দিন বৰ্গছেঁড়া দেয়ালা কৰে যাবে একা একা। বাপী বলল, ‘আজ লেবাৱাৱা হৰতাল কৰছে—কেউ সকাৱ থেকে বেৱ হয়নি।’

‘সে কী?’ ভীৰণৱকম চমকে গেল অনিমেষ। ওৱ চট কৰে সুনীলদাৰ মুখটা মনে পড়ে গেল। এখানকাৰ কুলিকামিনদেৱ সঙ্গে সুনীলদা এসে কিছুদিন থেকে গেছে। কিন্তু এ-জিনিস স্বৰ্গছেঁড়ায় কখনো হয়নি। দানুৱ চলে যাওয়াৱ দিন যে—কুলিৱা ওৱ পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল তাৰাই আজ ধৰ্মঘট কৰছে—কিছুতেই মেলাতে পাৰছিল না অনিমেষ। ও দেখল রাস্তাৱ দুধাৰে আজ ছুটিৰ দিনেৰ দৃশ্য। কুলিলাইন থেকে বেৱ হয়ে মেয়ে-পুৰুষ পিচেৱ রাস্তায় দুপাশে বসে, দাঁড়িয়ে গল্প কৰছে। অনিমেষ বলল, ‘কী কৰে কৰলঃ কেন কৰলঃ?’

‘পি এস পি আৱ সি পি আই। মাইনে বাড়াবাৱ জন্য, ভালো কোয়ার্টাৱেৰ জন্য, আৱ কী কী যেন সব। গোলমাল হতে পাৱে আজ।’ চিয়াৱিং ঘোৱাতে যোৱাতে বাপী কথা বলছিল। স্বৰ্গছেঁড়া টি একটেৱে নেমপ্ৰেটা চোখে পড়তেই গাড়িৰ গতি কমিয়ে দিল বাপী, ঠিক অনিমেষদেৱ বাড়িৰ সামনে সেটাকে দাঁড় কৰিয়ে বলল, ‘দিকেলে বাজাৱে আসিস। কাল অনেক রাত অবধি খুব খাটুনি গেছে, এখন ঘুৰোৰ।’

দৱজা খুলে অনিমেষ মাটিতে পা দিতেই ইউক্যালিপটাস পাতায় তীব্ৰ গশ্চ ভক কৰে নাকে লাগল। ও দেখল পাশেই একটা বাঁদৱলাঠি গাছে বড়সড় শকুনকে ধিৱে কতকগুলো কাক খুব চিৎকাৱ কৰছে। ও বাপীকে বলল, ‘এত খাটিস না, মাৰা পড়বি।’

বাপী গাড়ি চালিয়ে চলে যাবাৱ সময় বলে গেল, ‘দূৰ শালা! বিয়েবাড়িৰ খাটুনি, কাল এসে তোকেও থাকতে হত। আমাদেৱ সীতাদেৱীকে কাল হৰধনু ভজ কৰে রামবাৰু আজ নিয়ে যাছে।’ একৰাশ ধোয়া হেঁড়ে গাড়িটা চলে যাওয়াৱ পৱ অনিমেষ পাথৰেৱ মতো রাস্তাৱ একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল।

এখান থেকে সাৱ-দেওয়া বাগানেৰ কোয়ার্টাৱণগুলো পৱিকাৱ দেয়া যায়। মাঠ পেৱিয়ে কাঁচলিচঁপা গাছটাৱ পাশ ঘেঁসে সীতাদেৱ কোয়ার্টাৱটাকে আজ একু অন্যৱকম দেখোচ্ছে। বেশকিছু মানুষ সেখানে জটলা কৰছে, তিপল টাঙিয়ে অনেকখনি জায়গা ধিৱে রাখা হয়েছে। পাশেই একটা লৱিতে পাট আলমাৱি তোলা হয়েছে, সেটাৱ পাশ-ধৰে কালো রঞ্জেৰ অস্তিন গাড়ি দাঁড়িয়ে। সীতার বিয়ে গেল। সংবিংঢ়া ফিৱে আসতেই অনিমেষ বুকেৱ ভেতৱে একটা অস্তুত শূন্যতা অনুভৱ কৱল। এই প্ৰথম ওৱ মনে হুল কী—একটা জিনিস যেন হারিয়ে গেল, আৱ কোনোদিন সে ফিৱে পাবে না। শেষবাৱ-দেখা সীতাৱ ঘূমত জোৱো মুখ, অনুত্ত আড়াল রেখে কাছে টেনে নেওয়াৱ মতো কথা—অনিমেষ এই আসাম ৱোডেৱ ওপৱ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবিকাৱ কৱল সীতাকে ও ভালোবেসেছিল। ঠিক যেভাবে রঞ্জ তাকে ভালোবাসাৱ কথা বলেছিল কিবৰ উৰ্বশীৰ চোখেৰ চাহনিতে যে—আহ্বান ছিল এটা সেৱকম নয়। সত্যি বলতে কী, প্ৰেম-ভালোবাসা ওৱ মাথায় কখনোই তেমন জোৱালোভাবে আসেনি, আৱ আসেনি বলে রঞ্জকে ওৱ ভালো লাগেনি একবিলু, উৰ্বশীৰ ব্যাপাৱে সে একটুও উৎসাহ পায়নি। কিন্তু এখন এই মুহূৰ্তে ওৱ মনে হল সীতা ওকে ভালোবাসত এবং একটুও চিষ্টা না কৰে তাৱ মনেৰ ভেতৱ সীতার জন্য একটা নিষিদ্ধ জায়গা তৈৱি কৱা হৈ যখনে বাইৱেৱ কোনো সমস্যাৱ আঁচ লাগাৱ কথা কখনোই কঢ়ান্নায় আসেনি। সীতাটা চট কৰে বিহু কৰে ফেললঃ ওৱ মা তো ওকে পড়াশুনা কৰাতে চেয়েছিলেন। তা হলে কি ও পড়াশুনাৱ ভালো হিল না। সেই সীতা—ছোটবেলায় হাত ধৰলে যে ভ্যাঁ কৰে কেঁদে উঠত, কয় বছৰ আগে ওৱ সঙ্গে কথা বলাৱ সময় যে—সীতা একদম নিজেৱ অনুভূতি ওৱ মনেৰ মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে—তাৱ বিয়ে হয়ে গেল! অথচ ও তো সীতাকে কখনো কোনো চিঠি লেখেনি, মনুৰ মতো মুখ কৰে বলেনি, আই লভ ইউ সীতা। তা হলে ওৱ বুকেৱ ভেতৱ এৱকম কৰছে কেন? সীতা কী কৰে জানবে অনিমেষেৱ মনেৰ মধ্যে এৱকম ব্যাপাৱ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওৱ মনে হল, সীতা জানত, নিচয়ই জানত-- অস্তুত জানা উচিত ছিল! দুপাশেৱ মৱে শুনিয়ে—যাওয়া পাতাবাহাৱেৱ গাছগুলোৱ মধ্যে দিয়ে হাঁটুতে হাঁটুতে ওৱ মনে হল, এই প্ৰথৰীতে তাৱ জন্য কোনো ভালোবাসা অপেক্ষা কৰে নেই।

ক্লাৰবথৰ বৰ্ক। ওপৱেৱ খড়েৱ চাল এলোমেলো। ওদেৱ কোয়ার্টাৱেৱ বারান্দায় উঠে এসে অনিমেষ একটু থমকে দাঁড়াল। এখন বাবাৱ বাড়িতে থাকাৱ কৰ্ণা নয়। এই সময় হোটিমা নিচয়ই

জলখাবার থেতে ব্যস্ত। দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে দূর থেকে উলুধনি ভোসে এল। যেন শুনতে চায় না এইরকম ভঙ্গিতে জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগল।

ভেতর থেকে কোনো শব্দ নেই, কেউ সাড়া দিছে না। খিড়কিদরজার দিকে তাকাল অনিমেষ। বাইরে থেকে আঙুল চুকিয়ে একটু কায়দা করলে দরজাটা খোলা যেত, এখনও সেরকম আছে কি? সিডি দিয়েনিচে নামতে যাবে এমন সময় ও দেখল একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে আসছে ওর দিকে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, ‘আপনাকে ডাকছে’।

‘কে?’

অনিমেষ অবাক হল। ছেলেটির মুখ সে আগে দেখেনি, ওর চলে যাবার পর নিশ্চয়ই ও হয়েছে। ছেলেটির বুক ওঠানামা করছিল, বলল, ‘মাসিমা।’

‘মাসিমা কে?’ অনিমেষদের কোয়ার্টারটা দেখাল সে। ছেটমা ওকে ডাকছে তা হলে। ছেটমা কোথায় আছে? নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে ওকে। অনিমেষকে ইতস্তত করতে দেখে ছেলেটি বলল, ‘দিদিমাও আপনাকে বারবার করে যেতে বলল।’

‘দিদিমা!’

‘ওই যে, যার বিয়ে হচ্ছে তার দিদিমা।’ ছেলেটি বিজ্ঞের মতো হাসল এবার। এতক্ষণে অনিমেষের কাছে ব্যাপারটা দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছে। ওর মনের ভেতরে যে-অভিমানটা এতক্ষণ টলটল করছিল সেটা যেন চট করে গড়িয়ে গেল। সীতাদের বাড়তে সে যাবে কেন? ওকে দেখে ছেটমা তো চলে আসতে পারত। এতদিন পর সে বৰ্গহেঢ়ায় আসছে, অথচ ছেটমা ওখানে বসে থাকল। ও ভাবল ছেলেটিকে বলে দেয় যে সে যাবে না, কিন্তু তার আগেই ছেলেটি মুখ ঘূরিয়ে চিন্কার করে বলে উঠল, ‘আসছে।’

একটু ধীর করল অনিমেষ। এখন সে কী করবে? নিশ্চয়ই কেউ এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে যাকে ছেলেটি জানান দিল। না গেলে ব্যাপারটা খুবই খারাপ দেখাবে। আর এই সময় ওর মনে হল, সীতাকে আর কোনোদিন সে দেখতে পাবে না। কলের বেশে সীতাকে দেখবার লোভ হঠাত ওর মনের মধ্যে চুকে পড়ল। ব্যাগটা হাতে নিয়েই অনিমেষ ছেলেটির সঙ্গে যাঠে নেমে পড়ল। সীতাদের কোয়ার্টারের দিকে ঘূরতেই ও দেখতে পেল দূরে মাঠের ওপর নিজেদের বাড়ির সামনে একটি ছোট মেয়ের কাঁধে হাত রেখে ঠাকুরা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পেছনে ত্রিপলের তলায় সোকজন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনিমেষ ব্যাগটা এক হাতে নিয়ে ঠাকুরাকে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়াতেই খপ করে বুড়ি ওর হাত চেপে ধরলেন, ‘য়াম করেছিস’।

ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল অনিমেষ। ঠাকুরা কী বলতে চাইছেন? ও না-বুঝে সাড় নাড়ল। কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ঠাকুরা বললেন, ‘পাশের খবর এসেছে?’

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

‘ফাটো কেলাস?’

হেসে ফেলল অনিমেষ, ‘হ্যাঁ।’

সঙ্গে সঙ্গে বৃড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ওরে, যিটি নিয়ে আয়, অ বটমা, কোথায় গেলে সব- আমার অনিবাবা ফাটো গ্লাস পাশ করেছে। সে-বেটি থাকলে আজ কী করত-’ বলতে বলতে মুখটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল ঠাকুরার। কানায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ‘সীতুটাকে আজ পার করে দিল রো।’

‘ভালোই তো’, মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ, ‘ভালোই তো। আপনি বলতেন, যেয়েদের জন্য হয়েছে সংসার করবার জন্য।’

ঠাকুরার পায়ে জোর নেই, বোধহয় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আর শরীরটাকে খাড়া রাখতে পারছিলেন না। ওকে টলতে দেখে অনিমেষ একহাতে জড়িয়ে ধরে সামলে দিল। সেভাবেই কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ‘তাই বলে ডবল বয়সের মানুষের সঙ্গে বিয়ে দেবে গো! আমরা কথা শুনল না- পাত্র অফিসার নাকি।’

ঠাকুরার কথা শেষ হবার আগেই পেছনের জটলা থেকে সীতার বাবা উঠে এসে তাঁকে ধরলেন, ‘আঃ মা, কী বলছ তুমি! এখন এসব বলে লাভ আছে?’

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন ঠাকুরা, কিন্তু তাঁর শরীরটা কাঁপতে লাগল থরথর করে। সীতার বাবা ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ‘তুমি তো খুব বড় হয়ে গেছ, কদিন পরে তোমাকে দেখলাম। ফাট

ডিভিশন পেয়েছ? বাঃ বাঃ, বেশ! খুব ভালো হল আজকের দিনে এসেছ। যাও ভেতরে যাও।'

ঠাকুমাই লেংচে লেংচে ওর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন। অনিমেষের খুব অবস্থি ছিল। ত্রিপলের তলার লোকগুলো ওর দিকে উৎসুক-চোখে তাকিয়ে আছে। ঠাকুমার কথাটা শোনার পর ভেতরে যাবার ইচ্ছাটাই উভে গিয়েছিল। এই বিয়ে কি সীতার বাবা জোর করে দিয়েছেন? ওর খেয়াল হল, বিয়ের ব্যাপারে মতামত দেবার বয়স সীতার এখনও হয়নি। হলে পরে কি সীতা প্রতিবাদ করত?

চা-বাগানের বিয়েবাড়িতে অফিশিয়াল তেমন হয় না। জলপাইগুড়ি শহরে বঙ্গদের দানা-দানির বিয়েতে গিয়ে অনিমেষ মাঝে-মাঝে সানাই বা মাইক বাজতে দেখেছে, যেমেরা ছুটোছুটি করে বিয়েবাড়ি জমিয়ে বেগেছে। কিন্তু চা-বাগানের আচার-অনুষ্ঠান পালন হয় আন্তরিকভাবে, কিন্তু বিয়েবাড়ির চটক তেমন থাকে না। সাধারণত কোয়ার্টারের ভেতরে যে উঠোনমতো জায়গা থাকে সেখানেই অনুষ্ঠানটা হয় আর অসমবয়সি মেয়েরা আচার খাওয়ার মতো রাসিয়ে রাসিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করায়। অনিমেষ দেখল ঠাকুমা ওকে ঘর পেরিয়ে উঠানে নিয়ে যাচ্ছে।

ভেতরে পা দিতেই আবার উলুধ্রনিটা কানে এল। কিন্তু সেটাকে ছাপিয়ে ঠাকুমা চিঠ্কার করে সবাইকে ডাকতে লাগলেন। ততক্ষণে ওরা ভেতরের বারান্দায় পৌছে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে উঠানে নজর পড়ল অনিমেষের। ঠিক মধ্যখানে চারদিকে চারটে কলাগাছ পুঁতে মাঝখানে বর-বউ বসে আছ। তাদের মিয়ে মেয়েদের জটলা। ছোটমাকে দেখল অনিমেষ, সীতাকে জড়িয়ে ধরে কিছু-একটা করছেন। ওকে দেখে হাসবার চেষ্টা করলেন। সীতার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে পেল অনিমেষ। একটা জুবথুর কাপড়ের মতো দেখাচ্ছে সীতাকে। মাথা নিউ, বেনারসি কাপড়ের পাড়টা চকচক করছে। সীতার মাথার মুকুট এখন বর্ণার ফলার মতো তার দিকে তাক করা। মুখটা দেখতে পেল না অনিমেষ। সীতার পাশে যিনি বসে আছেন তাঁকে বেশ শক্তসমর্থ বলে মনে হল ওর। নিশ্চিথবাবুদের বয়সি হবেন বোধহ্য। ঠাকুমার হাঁকড়াকে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেশ মোটা গোঁফ আছে সীতার বরের। ঠাকুমার ঢাকে সীতার মা আড়াল থেকে ঘোষটা-মাথায় বেরিয়ে এলেন। এক পলক দেখেই অনিমেষ বুঝে ফেলল উনি একটু আগেও খুব কাঁদছিলেন। সীতার মা এসে ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে আর-একজনের হাতে দিয়ে বললেন, 'কী ভালো লাগছে আজ তুমি এসেছ।' সীতা বারবার তোমার মাকে জিজাসা করছিল তুমি আসবে কি না।' অনিমেষ মাথা নিউ করল। ওর ইঠাঁৎ খেয়াল হল পাশের খবর দিয়েছে যখন তখন এঁদের প্রণাম করা উচিত। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর সীতার বরের সঙ্গে চোখাচোথি হয়ে যেতেই ও মত পালটে ফেলল। ঠাকুমা ততক্ষণে ওর ফার্স্ট ডিভিশনে পাশের খবর, ওর মতো ভালো হলে হয় না, পনেরোই আগস্ট স্বর্গছেড়ার সমস্ত ছেলের মধ্যে থেকে শুধু ওকেই পতাকা তুলতে দেওয়া-এইসব সাতকাহন পাঁচজনকে গর্ব করে শোনাচ্ছেন।

অনিমেষ সীতার ওপর চোখ রেখেছিল। ও দেখল সে এসেছ, সামনে দাঁড়িয়ে আছে শুনেও সীতা একবারও মুখ তুলে ওকে দেখল না। সীতার মা বললেন, 'জানিই তো, ও ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ না করলে কে করবে! তুমি বসো, এখন তো কলকাতায় পড়তে যাবে, আর কবে পেটভরে খাওয়াবার সুযোগ পাব জানি না।'

উনি দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে অনিমেষ দেখল বিয়ের বরকনেকে ছেড়ে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ততক্ষণে ঠাকুমা ওকে টানতে টানতে উঠানে নায়িয়েছেন, 'বিয়েতে এলি না তো কী হয়েছে, বাসি বিয়েতে এলি এই ভাগ্য।' নে আমাদের জামাইকে দ্যাখ। ওগো নাতজামাই, এই যে ছেলেটাকে দেইছ, ভীষণ বিদ্বান। তোমার বউ-এর সঙ্গে ছেলেবেলায় খেল করত।' অদ্বোক এমনিতে খুব অবস্থি নিয়ে বসেছিলেন, কথাটা শুনে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে নমকার করলেন। এতবড় লোক তাকে নমকার করছে দেখে হকচিকিয়ে অনিমেষ হাতজোড় করতেই ঠাকুমা ছেলে ফেললেন, 'ওমা, এইটুকুনি ছেলেকে নমকার করহ কী গো!' এই সময় সীতার পাশে বসে-থাকা ছেটমাকে বলতে শুনল অনিমেষ, 'আমার ছেলে।'

অদ্বোক আবার হাসলেন, হাসিটা ভালো লাগল না অনিমেষের। কেমন বোকাবোকা। ঠাকুমা আবার ডাকলেন, 'ও ছাঁড়ি, দ্যাখ কে এসেছে! লজ্জায় মাথা যে মাটিতে ঠেকল, আমাদের যেন আর কোনোদিন বে হয়নি!'

একটু একটু করে মুখ তুলল সীতা। বেনারসি, মুকুট আর ওড়লার চালচিত্রের সামনে সীতার

মুঠটা ঠিক দুর্গাঠাকুরের মতে। দেখাচ্ছে। বুকের মধ্যেটা হঠাত ধম-ধরা দুপুর হয়ে গেল অনিমেষের, সীতার দুই চোখের পাতা শ্বাবণের আকাশ রয়েছে! অংশ কী সহজ গলায় সীতা কথা বলল, ‘তোমার নাড়ু গোপালকে নাড়ু খাওয়াও ঠাকুমা।’

কথা শেষ হতেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ফেলল সীতা। চোখে জল না এনে বুকভরে কেঁদে যাওয়া যাব- অনিমেষ প্রেইরকম কাঁদতে কাঁদতে সীতার চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়ল। প্রচণ্ড দৃঢ়ের মধ্যে হঠাত একধরনের সুখ মানুষ পেয়ে যায়। অনিমেষের মনে হল বিয়ের খবরটা কানে যেতেই ওর বুকের মধ্যে যে-ইচ্ছাটার খবর ও পেয়েছিল, এই মুহূর্তে সীতা সেটাকে আসনে বিসিয়ে দিল। পায়েপায়ে বারান্দায় উঠে এল অনিমেষ। বাসিবিয়ে আশীর্বাদ বোধহয় বাবা এসে তাড়া দিলেন, ‘ওদের যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে।’

মিষ্টিমুখ না করে সীতার স্বাহাড়লেন না। এদিকে যেয়ে-জামাই চলে যাবে-বাড়িসুন্দ সেসব ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল। এ-বাড়িতে অনিমেষের এখন কেমন একলা একলা লাগতে শুরু করল। কন্যায়ারীদের খাওয়াদাওয়া আগেই চুকে গিয়েছিল। জামাই খেতে বসেছে। সীতাকে খাওয়ানোর জন্য জ্বের চেটো চলেছে, সে খাবে না। অলোমেলো একটু ঘুরে ওর মনে হল এখন এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়াই ভালো। ঠিক এই সময় ছোটমা ওর ব্যাগ হাতে নিয়ে কাছে এল, ‘চলো, এখন বাড়ি যাবে তো।’ ঘাড় নেড়ে ব্যাগটা ওর হাত পেকে নিয়ে অনিমেষ ছোটমার সঙ্গে বেরিলে এল। ছোটমা মাথায় অনেকখানি ঘোমটা টেনে দিয়েছে, চওড়া-পেড়ে টাঙাইল শাড়িতে ছোটমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। ওর হঠাত মনে হল, ছোটমা তেমনি রোগাই আছে।

বাইরে আর-একটা গাড়ি এসেছে যেয়ে-জামাইকে নিতে। লরিতে মালপত্র তোলার কাজ শেষ। ওরা চূপচাপ মাটে নেমে এল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ছোটমা বলল, ‘তৃতীয় খুব রোগ হয়ে গেছে, আর কী লো? অনিমেষ হাসল। ছোটমা আবার বলল, ‘সীতাটা খুব ভালো যেয়ে ছিল, না?’

‘ছিল বলছ কেন? অনিমেষ কথাটা শুধরে দিতে চাইল।

‘বিয়ে হলে মেয়েদের পুনর্জন্ম হয়।’ তারপর একটু থেমে বলল, ‘আমার ওপর তোমার রাগটা করেছে?’

অনিমেষ মুখ তুলল, ‘রাগ কারতে যাব কেন খামোকা?’

‘তা হলে নিজের মুখে আয়ায় তোমার পাশের খবর দিলে না কেন?’

অনিমেষ দেখল ছোটমার মুখটা কেমন হয়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি বলল, ‘ঠাকুমা বগলেন তাই ভাবলাম শুনেছ। সবাই তো ফার্স্ট ডিভিশন পায়-নতুন আর কী?’

‘ইস, বেশি বেশি। তোমার বাবা শুনলে জীবন খুশি হবেন। কদিন থেকেই খবরটা শোনার জন্য ছটফট করছেন। এবার কলকাতায় যাবে তো, দিন ঠিক হয়েছে?’

কথা বলতে বলতে ওরা বাড়ির সামনে চলে এসেছিল। অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, ‘ঝুঁ, বুধবার।’

বারান্দায় উঠে ছোটমা ঘুরে দাঁড়ল। তারপর চট স্ক্রে ডান হাতের মধ্যমা থেকে একটা আংটি খুলে অনিমেষের বাঁ হাতটাকে ধরে ফেলল। অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই ছোটমা আংটিটা ওর বাঁ হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিল, ‘অনিমেষ, আমি তো হাজার হোক তোমার মা, তোমাকে কোনোদিন কিছু দিতে পারিনি-এইটো কখনো হাত থেকে খুলবে না, কথা দাও।’

হাতটা মুখের সামনে তুলে ধৰতেই অনিমেষ দেখল চকচকে নতুন সোনার আংটির বুকে বাল্লায় অ অক্ষরটা লেখা রয়েছে। তার মালে ছোটমা তাকে দেবে বলেই আংটিটা করিয়ে রেখেছিল। অনিমেষের বুকটা তার হয়ে গেল, কোনোরকমে সে বলল, ‘তৃতীয় জানতে আমি ফার্স্ট ডিভিশন পাব?’

আস্তে-আস্তে ছোটমা বলল, ‘আমি রোজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতাম যে!’

ব্যাগটা মাটিতে রেখে অনিমেষ ছোটমাকে প্রণাম করল। খুব শান্ত হয়ে এগাম নিয়ে অনিমেষের নত মাথায় নিজের দুই হাত চেপে ধরল ছোটমা।

চাবি বের করে যখন অনিমেষকে দরজা খুলতে বলল ছোটমা, ঠিক তখন পেছনে সাইকেলের আওয়াজ হল। এতদিন কড়ায় তালা লাগানো হত, অনিমেষ গো-তালাটাকে আগে দেখেনি। সাইকেলের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, মহীতোষ নামছেন। চোবাচোখি হতেই মহীতোষ যেন কী করবেন বুঝতে পারলেন না। সাইকেলটাকে রেখে প্যান্টের পক্ষেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েক গুঁ এগিয়ে এলেন কথা না বলে। অনিমেষ দেখল বাবার চেহারাটা কেমন বুড়ো-বুড়ো হয়ে গিয়েছে, এ কাঁচু রোগা লাগছে। সিডির ধাপে পা দেবার আগেই অনিমেষ দ্রুত নেমে গিয়ে ওকে প্রণাম করল, তারপর উঠে

ଦାଙ୍ଗିଯେ ବଲଲ, 'ଆମି ଫାର୍ଟ ଡିଭିଶନ ପେଯେଛି ।'

କଥାଟା ଶୁଣେଇ ମହିତୋଷ ଦୁଃଖେ ହେଲେକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରଲେନ । ବାବାର ମାଥା ତାର ସମାନ, ଆଲିଙ୍ଗନେ ଦାଙ୍ଗିଯେ ଥାକେ ଓ ଅସୁବିଧେ ହଞ୍ଚିଲ । ମହିତୋଷ ଓକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ଓପରେ ଉଠେ ଏଲେନ, 'ଖୋକାକେ ଥେତେ ଦାଓ ।'

ଚଟପଟ ଅନିମେସ ବଲଲ, 'ଆମି ଥେଯେଛି ।'

ଏଇ ସମୟ ଏକଟା କାନ୍ଦାର ରୋଲ ଉଠିଲ ସୀତାଦେର ବାଡ଼ିତେ । ଓରା ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବାଇରେ ଏଗିଯେ ଏସେ ଦେଖିଲ ପ୍ରଥମେ କାଳେ ଗାଡ଼ି, ପେଛନେ ଲାଇଟ୍‌ସୀତାଦେର ବାଡ଼ି ଛେଡ଼େ ଏଗିଯେ ଆସଛେ । ସୀତାର ଠାରୁମା ମା ପ୍ରଚାନ୍ ଜୋରେ କେଂଦେ-କେଂଦେ ଉଠିଛେ । ସୀତାର ବାବାକେ ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲ ନା । ଗାଡ଼ି ସଥିନ ଓଦେର ବାଡ଼ିର ସାମନେ ଦିଯେ ରାତ୍ରାର ଦିକେ ବାଁକ ନିଛେ, ଠିକ ତଥିନ ଅନିମେସ ସୀତାକେ ଦେଖିତେ ପେଲ । ଜାନଲାର ଧାରେ ଗାଲ ଚେପେ ସୀତା ଏକଦୃଷ୍ଟ ଓଦେର ନିକେ ତାକିଯେ ଆହେ । ଏତ ଦୂର ଥେକେ ଓ ସୀତାର ଚୋଥ ଥେକେ ଜଳ ଗଡ଼ାତେ ଦେଖିଲ ଅନିମେସ ।

ମହିତୋଷ ହଠାତ୍ ବଲେ ଉଠିଲେନ, 'ଭାଗିସ ଆମାଦେର ମେଯେ ନେଇ ।' ତାରପର ଛେଲେ ଆର ଝୀକେ ଦେଖେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ନିଜେକେ ସାମଲେ ନିଲେନ, 'ଦାନ୍ତ ଭାଲୋ ଆହେନ ?'

ଅନିମେସ ଘାଡ଼ ନାଡ଼ିଲ, 'ହ୍ୟା ।'

'ତୋମାର ଥିବା ନିକଟ୍‌ଯି ଖୁଣ୍ଟି ହେଯେଛେ । ଓର ଜନ୍ମେଇ ଏଟା ସମ୍ଭବ ହଲ ।' ତାରପର ଏକଟୁ ଚୁପ କରେ ଥେକେ ବଲଲେନ, 'ଅନିମେସ, ଏଥିନ ତୁମ ବଡ଼ ହେଯେଛ । ଆମରା ତୋ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ଭୁଲ କରି-ଦେଖିଲେ ମନେ ରେଖେ ନା । ସୁଖ ପାଓଯା ଭାଗୋର କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଇ ବଲେ ଦୁଃଖେର କଥା ମନେ ରାଖିଲେ ଶୁଦ୍ଧ କଟ ପେତେ ହୟ ।'

ଅନିମେସ କିଛି ବଲଲ ନା । ବାବା କୀ ବଲତେ ଚାଇଛେ ସେ ବୁଝାତେ ପାରାଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁହଁର୍ତ୍ତ ମେସବ କଥା ତାର ମନେ ଏକଦମ ଆସଛେ ନା । ସୀତାର ଚୋଥ ଦୁଟି ମନ ଥେକେ ସରାତେ ପାରାଇଲ ନା ସେ; ଓ ଦେଖିଲ, ଗାଡ଼ିଶ୍ଵଳେ ଧୂପଗୁଡ଼ିର ରାତ୍ରାଯ ମିଳିଯେ ଗେଲ । ହଠାତ୍ ଯେନ ମନେ ପଡ଼େ ଗେହେ ଏଥିନ ଭାଙ୍ଗିତେ ମହିତୋଷ ବଲଲେନ, 'ଓହୋ ତୋମରା ତାଡ଼ାତାଡ଼ି କରରେ, ବାଗାନେର ଲେବାରରା ଖୁବ ଥେପେ ଗେହେ ଆମରା କାଜ କରେଛି ବଲେ, ଓରା ଏଖାନେ ହାମଲା କରତେ ଆସତେ ପାରେ ।'

ଛୋଟମା ଆତକେ ଉଠେ ବଲଲ, 'ମେ କୀ ! କୀ ହବେ ତା ହଲେ ?'

ମହିତୋଷ ବଲଲେନ, 'ଜରୁରି ଜିନିସପତ୍ର ଶୁଣ୍ଯେ ନାଓ । ବାଜାରେର ସତ୍ୟ ସେନେର ବାଡ଼ିତେ ତୋମାଦେର ରେଖେ ଆସ । ଗୋଲମାଲ ଯିଟି ଗେଲେ ଆବାର ଫିରେ ଆସିବେ ।'

ଛୋଟମା ଦୋଡ଼େ ଦରଜା ଖୁଲିଲେ ଗେଲ । ଏହି ସମୟ ଅନିମେସ ଦେଖିଲ, କିଛି କୁଳିକାମିନ ହଇହଇ କରତେ କରାତେ ଫ୍ୟାଟ୍ରିରିର ନିକେ ଛୁଟେ ଯାଛେ ଆସାମ ରୋଡ ଦିଯେ । ନିଜେର ଶରୀରେର ମତୋ ପରିଚିତ ସ୍ଵଗହେନ୍ଦ୍ରାୟ ଏ-ଧରନେର ଘଟନା ଘଟିଲେ ପାରେ-ଏକଦମ ବିଷ୍ଵାସ ହଞ୍ଚିଲ ନା ଅନିମେସର । ଏହି ମୁହଁର୍ତ୍ତ ଓର ଚୋଥେର ସାମନେ ସୀତା ନେଇ ।

ଭେତରେ ଥେକେ ମହିତୋଷର ଗଲା ତେବେ ଗେଲ, ଅନିମେସକେ ଡାକଛେ । ଅନିମେସ ସାଡା ଦିଯେ ଦେଖିଲ ଚା-ବାଗାନେର ନୁଡ଼ିବିଛାନେ ପଥ ଦିଯେ ସାଇକଲଗୁଲେ ଦ୍ରୁତ ମାଠେର ଦିକେ ଛୁଟେ ଆସଛେ । ଟାଇପାବୁ, ଡାକ୍ତରବାବୁ, ପାତିବାବୁ, ମଶାବାବୁରା ଜୋରେ ଜୋରେ ପ୍ଯାଜେଲ ଘୁରିଯେ ଯେ ଧାର କୋଯାର୍ଟରେର ଦିକେ ଚଲେ ଯାଛେ । ମନୋଜ ହାଲଦାରକେ ଚିନିତେ ପାରିଲ ଅନିମେସ, ସେଇକମ ଚେହାରା ଆହେ ଏଖନେ, ନିଜେର କୋଯାର୍ଟରେର ଦିକେ ଯେତେ-ଯେତେ ହଠାତ୍ ସାଇକେଲ ଘୁରିଯେ ସୀତାଦେର କୋଯାର୍ଟରେର ସାମନେ ଗିଯେ ଉତ୍ସେଜିତ ହେଯେ କିଛି ବଲେ ଗେଲ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୀତାର ବାବାକେ ଓଦେର ଗେଟେ ଦେଖିତେ ପେଲ ଅନିମେସ । ମାତ୍ରା ନେଇ କିଛି କିଜ୍ଞାସ କରେ ଚାଯାମେଚ କରେ ବାଡ଼ିର ଲୋକଦେର କିଛି ବଲତେ ଲାଗଲେନ । ଏହି ସମୟ ଆରା କିଛି ଲେବାରକେ ପତାକା-ହାତେ ଲାଇନ ଥେକେ ଛୁଟେ ଆସତେ ଦେଖିଲ ଅନିମେସ । ବିଭିନ୍ନ ବୟାସର ନାରୀ-ଶୁରୁ ହଇହଇ କରତେ କରାତେ ଚା-ବାଗାନେର ନୁଡ଼ିବିଛାନେ ପଥଟାଯ ଚୁକେ ଯାଛେ । ଏବଂ ଅନିମେସ ଅବାକ ହେଯେ ଶବ୍ଦ କେଟୁ-ଏକଜନ ଚିତ୍କାର କରେ ଉଠିହଇ ବାକିରା ଜାନାନ ଦିଲ, 'ଜିନ୍ଦାବାଦ !' 'ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ !' ବଲାର ଧରନ୍ତା ଶହରେ-ଶୋନ ଧନ୍ତିର ମତୋ ନୟ, ଏବଂ ବେଶ ମଜା ପେଯେ ଗେହେ ଓରା- ଭାବଭିଜିତେ ତା-ଇ ମନେ ହେଲ । ଓରା ଚଲେ ଯାଓଯାର ପର ଅନିମେସ ଦେଖିଲ ଆସାମ ରୋଡ଼େ ଓପାରେ ମାଡ୍ରୋଯାରି ଦୋକାନେର ବୀପ ଶବ୍ଦ କରେ ବନ୍ଧ ହେଯେ ଗେଲ ।

ଅନିମେସ ବ୍ୟାପାରଟାକେ କିଛିତେଇ ମନ ଥେକେ ମେନେ ନିତେ ପାରାଇଲ ନା । ଏହି ଶାନ୍ତ ସରଲ ମାନୁଷଙ୍କଲୋ

ହଠାତ୍ ଏନକମ ଥେପେ ଗେଲ କେନ୍ । ଛେଲେବେଳା ଥେକେ ଦେଖେ ଆସଛେ ବାବୁଦେର ଦେଖିଲେ ଏରା କେନ୍ଦ୍ରୋର ମତୋ

গুটিয়ে যায়, বাবুদের কোয়ার্টারের ছেলেকে বাজে লাগাতে পারলে ধন্য হয়, তারাই এখন খেপে গেল কেন? আর বাবুদের তো এমন ভয় পেতে দেখেনি ও! লোকগুলো কী চাইছে? টাকাপয়সা-খাবারদাবারও! ওর মনে পড়ল সুনীলদা বলেছিল পৃথিবীতে দুটো জাত ছে, একদল হল সর্বহারা, অন্যদল বুর্জোয়া। বুর্জোয়া মানে যার সব আছে, কিন্তু সামান্য বিছু হারাবার ভয়ে যে অনেক বেশি সর্বহারাদের কাছে আদার করে। তা হলে এই লেবারগুলো সর্বহারা? কিন্তু ওর মনে হল বাবা এবং অন্য বাবুরা যিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। এরা আর যা-ই হোক, এই কোয়ার্টারগুলোতে এসে হামলা করবে না। কখনো কোনো মদেসিয়া ওঁরাওকে ও অভদ্র হতে দেখেনি, হাড়িয়া থেয়ে মাতাল হয়ে গেলেও না। অনিমেষ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টারগুলোকে ভাঁলো করে দেখল। সবকটার দরজা বক্স। আসাম বোড দিয়ে ঝশ্বশ করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। হাঁটাঁ ওর মনে হল বৰ্গছেঁড়ার চেহারাটা যেন অনেকখানি পালটে গেছে। এই মাঠের মধ্যে দাঁড়ানো গাছ দুটো কেমন শীর্ষ, পাতাবাহার গাছগুলো শুকিয়ে যাবে যাচ্ছে, বৈশাখমাসের শেষে প্রথর রোদে প্রথর রোদে স্বর্গছেঁড়া এখন পুড়েছে। অথচ চিরকাল এখানে একটা ঠাণ্ডা ভাব থাকত, এই সময় ভূটানের পাহাড় থেকে মেঘগুলো বৃষ্টি নিয়ে আসত।

কোয়ার্টারের বারান্দায় উঠে এল অনিমেষ। আর বাবা তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং এই প্রথম ওর মুখে সে খোকা ডাকটা শুনতে পেল। অন্য সময় হয়তো খোকা শুনলে তার হাসি পেত, কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর ডাকটা ভালো লেগেছিল। এখান থেকে চাল যাওয়ার পর থেকে বাবার সম্পর্কে ওর মনে বে-শৃঙা এবং তিক্ততা বাসা বেঁধেছিল, এই মুহূর্তে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। বাবা যেন আমৃল পালটে গেছেন। শুধু ভার সঙ্গেই নয়, ছেটমার সঙ্গে বাবা কী ভালো ব্যবহার করছেন। মহীতোষের বুকের সঙ্গে পেপটে খাকার সময়কার অঙ্গত্বটা ওর মনে আবার এল। বাল্যকাল থেকে এ-পর্যন্ত এরকম ঘটনা ঘটেছে কি না মনে পড়ে না। কীসব যে চটপট হয়ে যায়! যাকে দেখতে আজ খারাপ লাগল, কাল হয়তো সেটা অন্যরকম হতে পারে।

আশ্চর্য, বসার ঘরটা ঠিক সেইরকম আছে! এই যে এতগুলো বছর কেটে গেল, এই ঘরটার ওপর তার কোনো ছাপ পড়েনি; শুধু সোফার ওপর কভারগুলো এখন পালটে গেছে এবং—। অনিমেষ পায়েপায়ে সোফার পাশে দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। একটা বড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে তার চার-পাঁচ বছরের মুখটা হাসছে। কী ভীষণ দুষ্ট-দুষ্ট লাগছে চোখ দুটো। নিজের যে এরকম একটা ছবি আছে একদল জানা ছিল না, অনিমেষ দেখল এই এত বছর হয়ে গেল, তার মুখ খুব সামান্যই পালটেছে। এই ছবি আগে এখানে ছিল না। বাবা নিশ্চয়ই নতুন করে বাঁধিয়ে এখানে টাঙ্গিয়েছেন। কবে থেকে? অনিমেষের সবচিহ্ন পোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

মাঝের ঘরে পা দিতেই অনিমেষ দেখল বাবা দ্রুত জানলাগুলো বন্ধ করছেন, ছেটমা উরু হয়ে বসে সুটকেসে কীসব ভরছে। ওকে দেখে ছেটমা বলল, ‘তুমি এতদিন পর এলে, আর কী হাস্তামায় পড়তে হল বলো তো।’

অনিমেষ বলল, ‘কিন্তু এখানে গোলমাল হবে কেন?’

মহীতোষ বললেন, ‘লেবারয়া ট্রাইক কল করেছিল যখন তখন আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেনি। আজ যেহেতু আমরা অফিসে গেছি, ওরা থেপে গেছে। ট্রাইকটো যে আমাদের নয় সেটা ওর বুঝতে চাইছে না।’

অনিমেষ বলল, ‘আমাদের বাগানের কুলিরা এমন করবে কোনোদিন কেউ কল্পনা করতে পারিনি!’

মহীতোষ বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘ওদের দাবিগুলো ঠিক আছে, কিন্তু এভাবে কোনো কাজ হয় না। জলপাইটাড়ি থেকে লোক এসে রাতদিন তাতিয়ে এই কাও করেছে, তারপর আমাদের জুলিয়েনবাবু আছেন—তিনিই তো এখন ওদের নেতা।’

‘সুলিয়েন?’ প্রশ্নটা করেই অনিমেষ ভাবল, বাবা কি সুনীলদাকে চেনেন?

‘কুকু সর্দারের ছেলে। তোর দাদুর পেছনে যে-কুকু সর্দার দিনরাত ঘুরে বেড়াত। বকুটা মরে গেছে, ওর ছেলে হল এদের পাণি। আবার মজা হল জুলিয়েন কিন্তু নিজে লেবার নয়—অ্যাসিষ্ট্যান্ট স্টোরিকার-হোট মালবাবু। কোম্পানি এখন মদেসিয়াদের বাবুদের চাকরিতে গেলেন।’

কুলিদের সঙ্গে আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে ওরা এবং বোধাই যাচ্ছে বাগানের সবাই কোয়ার্টার হেড়ে বাজারে দিকে চলে যাবে। যেহেতু বাজার-এলাকাটা চা-বাগানের অঞ্চলতায় পড়ে না,

তাই সেখানে গেলে কুলিরা হামলা করতে পারবে না। এতদিন ধরে যে-মানুষগুলোকে দিনরাত চেথের ওপর দেখে আসছেন এই বাগানের বাবুরা, আজ যেন আর তাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না। অথচ মজার ব্যাপার, দুদলই এই বাগানে কঠী। বিলেতে বসে কলকাতার অফিসের মাধ্যমে কোম্পানি এই বাগানের ওপর কর্তৃত করছে এবং তাৰ সৱাসৱি দায়িত্ব ম্যানেজারের ওপর। কুলিরা দণ্ডিদাওয়া ম্যানেজারকে জনিয়েছে, ম্যানেজার সেটা কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। যতক্ষণ কোনো সিদ্ধান্ত না হবে ধর্মঘট চলবে : ম্যানেজার সকাল থেকে তাঁৰ বালোৰ সামনে একগাদা সিকিউরিটিৰ লোক বসিয়ে রেখেছেন—সবাই জানে সাহেবের কাছে দুটা বন্ধুক আছে। ওখানে হামলা সহজে হবে না। কিন্তু কুলিরা বাবুদের কাজে যাওয়াটা মানতে পারছে না। জুলিয়েন নিজে আজ কুলিরে সঙ্গে আছে। যদিও বাবুদের ইউনিয়ন আলাদা, তবু কুলিরে রাগ ওঁদের ওপরই পড়েছে। এতদিন ধরে যা-কিছু হুরুম ওৱা পেয়েছে তা বাবুদের কাছ থেকেই, ম্যানেজারের সঙ্গে সৱাসৱি যোগাযোগ ওদের হয় না। জুলিয়েন ওদের পরিষ্কার করে না বললেও ওদের বুঝতে কষ্ট হয়নি, যা-কিছু অত্যাচার তা এই বাবুদের গাধ্যমেই সাহেব করেছেন। তাই আজ বাবুরা কাজে গিয়েছে খবর পেয়ে দলেদলে লোক ছুটছে ফ্যাট্টিৰি সামনে।

মহীতোষদের ডেকে ম্যানেজার আগাম খবরটা দিয়েছেন। সাদা-চামড়াৰ এই সাহেব উত্তৰবঙ্গের চা-বাগানগুলোয় ক্ষট্টিশদের শেষ প্রতিনিধি। এখন ভালো হিন্দি বলতে পারেন ভদ্রলোক। অত্যাচারী বলতে যা বোঝায় মহীতোষীরা এঁকে সেৱকম মনে কৰেন না। অবশ্য সাহেবের একটা নিজস্ব গোমেন্দাৰাহিনী আছে, যারা ওকে এই চা-বাগানের সব খবৰ আগাম এনে দেয়। তাই সাহেব যখন মহীতোষের ডেকে কুলিরে সঞ্চাব্য আক্ৰমণেৰ কথা বলছিলেন তখন চট কৰে কেউ বিশ্বাস করতে পাৰিবননি। এতদিনেৰ পৰিচিত মৃখগুলো, যারা সাত ঢেড়ে রা কাড়ে ন, তাৰা আজ আক্ৰমণ কৰবে ভাৰতে পাৰছিলেন না। যদিও বেশ কিছুদিন ধৰে তাৰা খবৰ পাছিলেন, বিভিন্ন পার্টিৰ লোক এসে লাইনে-লাইনে কুলিরে তাৰাছে কিন্তু কেউ সেটায় তেমন গা কৰেননি। দীৰ্ঘকাল ধৰ্মঘট বা আন্দোলন চালাবাৰ মতো মানসিক এবং আৰ্থিক ক্ষমতা এদেৱ নেই-এটা সবাই জানে না। এই চা-বাগানে যে-সমস্ত কুলিকামিনি কাজ কৰে তাদেৱ বেশিৰ ভাগ হণ্টায়-হণ্টায় টাকা পায়। যদিও একটা পৰিবারেৰ একদম শিশু ও বৃদ্ধ ছাড়া ছেলে মেয়ে বাবা সবাই কাজে আসে, কিন্তু হণ্টাৰ টাকা পেলে সেটা ঘৰে পৌছায় খুব সামান্য। শৰ্গছেড়াৰ চৌমাথায় বিৱাট ভাটিখানা তো আছেই, শনিবাৰ রাত্ৰে জুয়োৰ বোৰ্ড বসে যায় ডেৱিউ-এৰ শেষে। ডেৱিউ হল ছোট ছোট বাজাৰ-কিন্তু তাৰপৰ জুয়াড়িয়া এসে সেখানে ফাঁদ পাতে অনেক রাত পৰ্যন্ত পেট্রোম্যাস্ক জুলিয়ে। কুলিৰা যে-টাকা রোজ হিসাবে পায় কমিনৰা পায় তাৰ অৰ্দেক। এই টাকা হাতে এলেই এদেৱ মেজাজ ইঁড়িয়া না হলে শান্ত হয় না। ফলে দুদিন যেতে-না-যেতে ধাৰেৰ মাত্রা বাড়তে থাকে।

এইৱেকম অৰ্থনৈতিক অবস্থা যদিদেৱ, যারা ম্যানেজার তো দূৰেৱ কথা- বাবুদেৱ দেখলেই হাতজোড় কৰে অনুগ্রহেৰ আশায় দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা নিচু কৰে, তাদেৱ কোনো পলিটিক্যার পার্টিৰ লোক খ্যাপালেও কোনো কাজ হবে না এই বিশ্বাস সকলেৰ ছিল। কিন্তু কদিন থেকে উত্তেজনা চৰমে উঠে আজ সকালে যখন মহীতোষীৰ ফ্যাট্টিৰিতে এলেন তখন দেখলেন একটাুও লোক নেই ধাৰেকাছে, আংৱাভাসাৰ বুকে হইলটা গৰ্যন্ত ঘূৰছে ন। নিমুম হয়ে আছে শৰ্গছেড়া চা-বাগানেৰ ফ্যাট্টিৰি এবং অফিস। দু-একজন যারা ভয়ে-ভয়ে এসেছিল, গতিক সুবিধেৰ নয় বল গা-ঢাকা দিয়েছে। ফাঁকা ফ্যাট্টিৰিতে থাকতে ওদেৱ অস্বীকৃতি হচ্ছিল, এমন সময় সাহেব তাৰ কোয়ার্টাৰে বাবুদেৱ ডেকে পাঠিয়ে আক্ৰমণেৰ সংবাদ দিলেন। ডাঙুৱাৰবাৰু কথাটাকে একদম নাকচ কৰে দিয়ে বলেছিলেন, কুলিৰা তাৰ কোনো ক্ষতি কৰতে পাৰে বিশ্বাস কৰতে পাৰেন ন। আজ এত বছৰ তাঁকে দেবতাৰ মতো মেনে এসেছে, এখন ওঁৰ গায়ে হাত তুলবে? অসম্ভব! কিন্তু সাহেবেৰ বললেন, যেহেতু দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে আৱ তাৰ নিজস্ব ক্ষমতা নেই, তাই সেৱকম কিছু হলে তিনি বাবুদেৱ নিৱাপত্তাৰ ব্যবস্থা কৰতে পাৰবেন না। সেজন্যা তিনি ওঁদেৱ বিশ্বন্ত আনুগত্যেৰ কথা শৰণ রেখে আগাম খবৰটা জানিয়ে দিলে এবং যদি সম্ভব হয় বাবুৱা যেন এখনই কোনো নিৱাপত্ত জায়গায় সাময়িকভাৱে চলে যান। গোলমাল মিটে গেলে সাহেবে আশা কৰেন যে তাঁৰা কাজে যোগ দেবেন এবং এই আনুগত্যেৰ কথা সাহেব তাৰ সুপৰিশসহ কোম্পানিকে জানিয়ে দেবেন। একথা শোনাৰ পৰই ওৱা যে যাঁৰ কোয়ার্টাৰে ফিরে এসেছেন।

মহীতোষেৰ অবশ্য মাঝায় আৱ-একটা চিঞ্চা ছটফট কৰছিল। স্কুল ফাইনালেৰ রেজাল্ট বেৱিয়ে

গেছে। অনিমেষ হয়তো আজই স্বর্গছেড়ায় আসবে। ছেলে যদি পাশ না করতে পারে তাঁর বলার কিছু নেই। কারণ মাধুরী চলে যাওয়ার পর তিনি একমাত্র টাকা পাঠানো ছাড়া ওর প্রতি কোনো কর্তব্য করেননি। তা চাড়া কোনোকালেই তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে নিজের করে নিতে পারেননি। বিশেষ করে হিতীয় বিবাহের পর থেকে তাঁর মধ্যে ছেলের সম্পর্কে একটা অস্থিতি এমন দানা বেঁধেছিল যে, ভালোভাবে কথা বলতে যেন কিসে বাধত। তারপর সেই সৈতেন্দ্র দিনগুলো। সন্তানের জন্য তাঁর বিত্তী স্তৰী তাঁকে কোনোদিন বিব্রত করেনি, বরং তিনিই এরকম কিছু হোক চেয়েছিলেন। এ-পক্ষের ছেলেমেয়ে এলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে— সংসারে জড়েয়ে পড়লে অনেক অস্থিতি কেটে যাবে, এইরকম একটা ধারণা মাথায় ঢুকে যাওয়ায় সেই অশান্তির সৰ্বায়টা চলে এল। ওষুধপত্র, টেটকা, মাদুলি-কিছুতেই যখন স্তৰী পুত্রবতী হল না, তখনই যোগাযোগ হল অধর তান্ত্রিকের সঙ্গে। তিনদিন তিনরাত সর্বোচ্চ শৃঙ্খানে ওর সঙ্গে বসে কারণ পান করার পর হাঁচাই তাঁর মনে হল তিনি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। এই স্তৰীকে বিবাহ এবং সন্তান কামনা করে তিনি মাধুরীর প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান দেখিয়েছেন। ফলে সন্তান— ইচ্ছা চট করে মিলিয়ে গেল—তান্ত্রিক তাঁকে শেখালেন কী করে মৃত মাধুরীর আস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অস্তুত গোরের মধ্যে কেটে গেল দিনগুলো। এখনও সব ব্যাপার স্পষ্ট করে মনে পড়তে চায় না। তান্ত্রিক বাড়িতে এসে নিয়মিত দক্ষিণা নিয়ে যেত। সেই সময় মুখ শুভ শুভে কাজ করে গেছে এই স্তৰী, বাড়িকে বাড়ি থেকে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন। জলপাইগুড়িতে গেলে ছটফট করতেন কতক্ষণে স্বর্গছেড়ায় ফিরে আসেন। মাধুরীর দেখা তিনি পেতেন কি? কেমন অশ্পষ্ট ধোয়াটে একটা ধারণা তাঁর এখনও আছে যে অধর তান্ত্রিক মাধুরীর মুখোমুখি ওঁকে করিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। মাধুরীকে খুব দুখি-দুখি মনে হয়েছিল সেদিন। অধর তান্ত্রিক বলেছিল, তাঁর সন্তানকামনাই মাধুরীকে দুঃখী করেছে।

তারপর সেই রাত এল। তিনি অনিমেষকে কী বলেছিলেন খেয়াল নেই, শুধু মনে আছে অনিমেষ ওঁকে ঠেলে দিয়েছিল। যখন জান এল তিনি দেখলেন মাথায় ব্যাঙ্গেজ, সমস্ত শরীর দুর্বল, তিনি কিছুই চিন্তা করতে পারছেন না। ছেলে জলপাইগুড়ি ফিরে যাওয়ায় সময় তিনি স্তৰীকে বলেছিলেন তাকে বলে দিতে যে সরিৎশেখের যেন এসব ঘটনার কথা জানতে না পারেন। ছেলের কারণেই তিনি আঘাত পেয়েছে মাথায় এই বোধ হতেই চট করে গুটিয়ে গেলেন মহীতোয়। অনিমেষ কথা রেখেছিল, তার কারণ এর পর কতবার তিনি জলপাইগুড়ি গিয়েছেন, সরিৎশেখের এসব ব্যাপারে কোনোদিন কিছু জিজ্ঞাসা করেননি। অনিমেষ সম্পর্কে যেটুকু আড়ততা ছিল মনেমনে, সেটা যেন এই ঘটনার পর লজ্জায় ঝল্পাত্তরিত হয়ে গেল। নিজের তৈরি-করা বেড়াটা আর কখনো তাঁর পক্ষে ডিঙানো সন্তু হল না।

বিছনায় শুয়ে থাকার সময়ই বাড়ি এই বাড়িতে ফিরে এল। ওর অবস্থা দেখে সে চিন্কার কান্নাকাটি করে অধর তান্ত্রিককে গালাগালি করতে লাগল। তিনি দেখলেন বাড়ি যেন হাঁচাই অসমসাহসী হয়ে এ-বাড়ির ভালোমন্দ দেখাশুনা করছে। সুন্ত হয়ে শুনলেন অধর তান্ত্রিক আর সর্বোচ্চ শৃঙ্খানে নেই, বিছু লোক এক রাত্রের অন্ধকারে সেখানে গিয়ে মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এত ব্যাপার ঘটে গেল অর্থ তাঁর স্তৰীর যেন কিছুতেই কোনো বিকার নেই। খুব স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে সে-ভুলেও আর ওই সময়ের কথা উচ্চারণ করে না।

আজ বাড়ি ফিরেছিলেন একটা উজ্জেব্ন নিয়ে। ফিরে এসে পুরুকে দেখে ওর অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। অর্থ কিছুই বলতে পারলেন না। এমনকি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরার সময় তাঁর মনে হয়েছিল এ যেন তাঁর সন্তান নয়। যৌবনে এসে-পড়া একটা প্রায় পূর্ণ শরীর, যার গৌফের রেখা স্পষ্ট, গালে সামান্য ত্রন, মাথায় যে তাঁর সম্মান- তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেও দীর্ঘ দূরত্বের বলে বোধ হচ্ছিল। একমাত্র বুকের ভেতর ছাড়া সন্তান কখনো চিরকাল পরিচিত থাকে না—অনিমেষ তো হবেই। বিছু কী খেয়ালে আজ ওকে তিনি খোকা বলে ডেকে উঠলেন। ওর যখন হামাগুড়ি দেবার বয়স, মাধুরীর নকল করে মহীতোষ মাবো-মাবো খেকা বলে ডাকতেন। আধো-বুলি-ওঠা অনিমেষ ডাকটা ওনলেই কা-কা করে উঠত। এটা ছিল একটা মজার খেলা ওঁদের কাছে। আজ সব কথা যা বলা যায়নি এই একটি ডাকের মাধ্যমে যেন বলে ফেলেছেন তিনি—ভেতরটা কেমন শান্তিতে ভরে যাচ্ছিল।

ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করে মহীতোষ দুটে যেতেই অনিমেষ জু কুঁচকে এই ঘরটা দেখল। আশ্চর্য, যায়ের ছবিটা সো আর এখানে নেই! সেই অন্ধকারে ধোয়াটে পরিবেশে মাধুরীর বিষণ্ণ ছবিটা,

মেটা দারুণ চাপ সৃষ্টি করত বুকের মধ্যে—অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল, সেটা কোনোকালে এখানে ছিল কি না বোকা যাচ্ছে না। বরং ঘরটা বেশ পরিষ্কার, দুটো সিঙ্গল খাটো জোড়া দিয়ে বিছানা পাতা আছে। বাবা এবং ছেট্টমা এখানে শোন-বোবাই যাচ্ছে। অনিমেষ নিজের অজান্তেই মাধুরীর ছবিটা এখানে না দেখতে পেয়ে খুশি হল। ধীরপায়ে ও ভেতরের বারান্দায় আসতেই বাবার গলা শুনতে পেল, ‘খোকা, বাড়িকে ডাক—আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।’

কথাটা শুনে কেমন হতভয় হয়ে গেল অনিমেষ। এখানে আসার পর চটপট এমন সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে সে তাল রাখতে পারছে না। বাড়িকাকু এ-বাড়িতে আবার কী করে ফিরে এল। বাবা তো ওকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র তিনি মাইল দূরত্বে থেকে ও এসব ঘটনা জানতে পারল না। বৰ্গচ্ছেড়া থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে ওর সঙ্গে সংযোগ রাখার দায়িত্ব যেন কারও নেই, সে যে এই বাড়ির একমাত্র ছেলে, এই জায়গার সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক—একথা সবাই যেন চট করে ঝুলে গেছেন। অবশ্য সে একা নয়, যে-দাদু চিরকাল এখানে থেকে গেলেন, তাকেও কেউ কোনো কথা জানাবার প্রয়োজন বলে মনে করে না। অভয়নটা বুকের মধ্যে জমতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর খেয়াল হল এখান থেকে চলে যাওয়ার পর সে একটি চিঠি নিজে লেখেন। চিঠি লিখলে ও লিচ্ছয়ই সেব কথা জানতে পারত— চিঠির কথা মনে হলেই সীতার কথা মনে পড়ে যায়।

উঠোনে নেমে এল অনিমেষ। পেয়ারাগাছটায় একগাদা ঢড় ইপাথি হইচই করছে। উঠোনের ওপাশে সেই শুড়ো কাঠলগাছটাকে অ্যান্ডিনে সত্যিই জরাপ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে। গায়ে শ্যাঙ্গো পড়ে জনুয়ার হয়ে রায়েছে গাছটা! নিজের অজান্তেই বুকভয়ে নিষ্পাস নিল অনিমেষ— আঃ! ওর মনে হল এস্ব রক্ষের মতো পরিচিত গাছগাছিল গন্ধ যেন ও বাতাসে পাছে।

এই সংয় ও বাড়িকাকুকে সেখানে দেখতে পেল। সেই খাকি রঙের হাফপ্যান্ট আর ছিটের ফহুয়া পরে বাকিকাকু একটা ঝুড়ি নিয়ে পেছনের বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে। এই ক'বছরে অনেকটা বদলে গেছে বাকিকাকু। চুল পেকে গিয়ে শরীরটা একটু কুঁজো হয়েছে। ও এগিয়ে যেতেই বাকিকাকু থমকে দাঁড়াল। বোধহয় অনিকে এতখানি লম্বা সে আশা করেনি। বিশয়টা কাটিয়ে উঠে পিতলের সেই দাঁতটা বের করে হাসল, ‘পাশ করেছিস?’

ততক্ষণে ওর সামনে এসে পড়েছে, অনিমেষ, ঘাড় নেড়ে দুহাতে বাড়িকাকুর হাত দুটো ধরে বলল, ‘কেমন আছ তুমি?’

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা আরও শুড়োটে হয়ে গেল, মাথা নেড়ে বাকিকাকু বলল, ‘ভালো না রে, দুপায়ে যা বাতের ব্যথা—বেশিদিন বাঁচতে আর ভালোও লাগে না।’

সেকথায় কান কান দিয়ে অনিমেষ বলল, ‘ওঃ, তোমাকে এ-বাড়িতে দেখে কী ভালো লাগছে!’

বাকিকাকু বলল, ‘মহী যদি এখানে জায়গা না দিত, তা হরে না খেয়ে মরেই যেতাম। এই শুড়ো বয়সে ওসব কাজ নাই? তা কর্তব্য কেমন আছেন? বগদিস?’

অনিমেষ বলল, ‘ভালো আছেন, তবে বয়স তো হচ্ছে।’

বাড়িকাকু বলল, ‘হ্যাঁ রে, বয়স না হলে কেউ বুঝতে পারে না সে-জিনিসটা কেমন। তা তুই তো এখন কলকাতায় যাবি পড়তে, না? ফিরে এলে দেখবি তোদের বাড়ি আর নেই। তা না-ই থাকলাম, তুই বড় হ অনি।’ তারপর হাতাং মনে পড়ে যাওয়ায় খবরটা দিল, ‘তোর সেই মাস্টরবশাই—যার কাছে তোতে আমাতে গিয়েছিলাম রে—মরে গেছে।’

চট করে সেই নসিয়ারা যেমো মুখটা যেন সমস্ত আকাশ জুড়ে অনিমেষের চোখের সামনেটা ভরাত করে দিল। এইমাত্র—বেলা বাড়িকাকুর কথাটায় একটা মুখ ভেসে উঠল—ওর সমস্ত বান জুড়ে যিনি বন্দেমাতরম শব্দটা শুনিয়েছিলেন। চুপচাপ দীড়িয়ে অনিমেষ বারবার করে কেঁদে ফেলল। সেটা দেখে বাকিকাকু অন্যদিক মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘কাঁদিস না অনি, ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।’

এমন সময় হস্তদণ্ড হয়ে মহীতোষ ভেতরের বারান্দায় এসে ওদের দেখতে পেলেন, ‘কী করছিস তোরা এখনও, এর পরে অনিমেষের দিকে একবার তাকিয়ে খুব নিজ গলায় জিজাসা করল, ‘কী হয়েছে?’

মহীতোষই দ্রুত বলে গেলেন, ‘বাগানের কুলিরা খেপে গেছে, বাড়িতে এসে হামলা করতে পারে। জিনিসপত্র যেখানে যা আছে পড়ে থাক, এখন বাজা’রে চলো।’

বাড়িকাকু বলল, ‘কুলিরা খামোকা হামলা করতে যাবে কেন?’

‘রেগে গেলে কারও মাথা ঠিক থাকে? আমরা কাজে শিয়েছি বলে ওরা রেগে গেছে। চলো চলো।’ মহীতোষ তাড়া দিয়ে স্বরে দাঁড়ানেন।

কিন্তু বাড়িকাকুর ব্যস্ততার কোনো অঙ্কণ দেখা যাচ্ছিল না। ঘাড় নেড়ে বলল, ‘তোরা যাবি যা, আমি যাব না।’

মহীতোষ বললেন, ‘যদি মারধোর করে?’

‘আমাকে মারবে না। অধি ওদের সবাইকে টিনি। আমি গেল এই বাড়ি দেখবে কে?’

বাড়িকাকু এগিয়ে শিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় ঝুঁটিটাকে নামিয়ে রাখল। মহীতোষ কিন্তু বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত ভেজে চলে গেলেন। সেদিকে তাকিয়ে বাড়িকাকু বলল, ‘মানুষের রকম দেখেছিস, যাদের সঙ্গে এতদিন বাস করল এখন তাদেরই ভয় করছে। এই যদিসিয়াগুলোর মতো সরল মানুষ কথনো কাউকে মারতে পারে?’

বাড়িকাকুর দিকে তাকিয়ে হঠাত অনিমেষের মনে হল এত নির্বিণ্ণ এবং ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে বোধহয় খুব কম মানুষই পারে। বাবার অস্থিরতা ও বাড়িকাকুর স্থিরতা খুব শ্পষ্ট হয়ে ওর চোখে পড়ছিল। হঠাত যেন মনে পড়ে গেছে এরকম ভঙ্গিতে বাড়িকাকু বলল, ‘এই অনি, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা, চলে যা তাড়াতাড়ি।’

অনিমেষ বলল, ‘সত্যি ওরা মারতে পারে? আমরা তো কোনো দোষ করিনি।’

বাড়িকাকু বলল; ‘তা হোক, তবু তোর যাওয়া ভালো।’

‘কিন্তু তুমি যাচ্ছ না কেন?’ বাড়িকাকুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অনিমেষের এইভাবে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

এবার বাড়িকাকু হেসে ফেলল, ‘যতই পাশ কর বাবা, তুই এখনও ছেলেমানুষ আছিস। ওরে, আমি যে বাঞ্ছি নই তা এই বাগানের সব কুলি জানে। আমাকে কিন্তু বলবে না।’

অনিমেষ স্তুত হয়ে গেল। সময়ের সঙ্গে ও একদম ভুলে গিয়েছিল যে বাড়িকাকু বাঞ্ছি নয়। অবশ্য একথা ওকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এখন ওর নিজেরই অবিষ্মাস হচ্ছিল, সেইসঙ্গে ওর মনে একটা বিশ্বাস কোথা থেকে চলে এল। নিজে বাঞ্ছি নয় এই কৃথাটা কি বাড়িকাকু এতকাল স্থায়ে লালন করে এসেছে মনেমনে? তা হলে এই বাড়ির মানুষ হয়ে যায় কী করে? কেন বাবার সমস্যা নিয়ে বাড়িকাকু শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে আজকে। হয়তো এই কারণেই আজ বাঞ্ছিটা রক্ষা পেয়ে যাবে। কোনো—কোনো সময় দুর্বলতাই মানুষের রক্ষকবৎ হয়ে থাকে।

এতদিন বাদে স্বর্গহেড়ায় এল, অথচ এখনই এ—বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কী যে সব ব্যাপার হয়ে যায়। অনিমেষ যেন অতিক্রমে বারান্দায় উঠে এল। ততক্ষণে ছোটমা একটা বিরাট ব্যাগ নিয়ে এদিকে চলে এসেছে। না, বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যাওয়া হবে না। সেটা ভেতর থেকে বুজ করে এদিকের দরজা দিয়ে যাওয়া হবে যাতে বাইরে থেকে কেউ চট করে বুবতে না পাবে কেউ বাড়িতে নেই। অনিমেষের সীতার ঠাকুরার কথা মনে হল। যদি সবাই চলে যায় কোয়ার্টার ছেড়ে কত বাচ্চাকাচা এইসব কোয়ার্টারে নিচ্ছয়ই আছে। ও ছোটমাকে হাত নেড়ে থিড় কিন্দজার দিয়ে একছুটে বাইরে এল। আর আসাতেই একটু অসুস্থ দৃশ্য দেখতে পেল। মাঠ পেরিয়ে বিডিন কোয়ার্টার থেকে বাবুরা ছেলে মেয়ে বউদের সঙ্গে নিয়ে আসাম রোডের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। অনেকক্ষেত্রে ও চিনতে পরিছিল—কেউ—কেউ নতুন। সীতার বাবা—মাকে দেখতে পেল না সে এই দলের মধ্যে। ওরা আসাম রোডের ওপর উঠে বাজারের পথে বাঁক ঘূরতেই অনিমেষ ফিরল। ছোটমা ততক্ষণে উঠোনে নেমে এসেছেন। পেছনে বাবা। বাবার হাতে সুটকেস। অনিমেষ এগিয়ে শিয়ে ছোটমার হাত থেকে ব্যাগটা নিতেই ছোটমা বলল, ‘ঠাকুরকে ফেলে রেখে যুক্তি—জল—বাতাসাও পাবেন না।’

মহীতোষ হাঁটতে হাঁটতে বললেন, ‘রাখো তো তোমার ঠাকুর! বেঁচে থাকলে তোমরা অনেক জল—বাতাসা দেবার সুযোগ পাবে।’

ছোটমা হঠাত সন্দিক্ষ গলায় বলে উঠল, ‘তোমরা সত্যি কী করেছ ওদের বলো তো যে এখন প্রাণের তয় পাচ্ছ?’

মহীতোষ বিরক্ত হলেন, ‘আঃ, এখন বকবক না করে পা চালাও তো।’

বিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে আসতে আসতে অনিমেষ বলল, ‘অন্য বাবুর সবাই একটু আগে চলে গেছে, ওধু ঠাকুরদের দেখলাম না।’

ছোটমা বললেন, ‘সে কী! কী হবে! ওর পক্ষে তো যাওয়াও অসম্ভব। একবার খৌজ নিলে হয় না? বিয়েবাড়ির সব অগোছালো হয়ে পড়ে আছে।’

মহীতোষ হতাশ ভঙ্গি করলেন। বাড়িকাকু পেছন পেছন আসছিল, কথাটা উনে বলল, ‘তোমরা যাও, আমি দেখছি।’

বিয়েবাড়ি শব্দটা কানে যেতেই অনিমেষ কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। আচ্ছ, যদি সীতারা যাবার আগই রাগী কুলিয়া এসে পড়ত? তা হলে সীতা কি নতুন বেনারসি পরে বাবার সঙ্গে একটু-আগে-দেখা বাবুদের মতো দোড়ে পালাত?

মহীতোষ আরেকটু এগিয়ে শিয়েছিলেন। বাড়িকাকুকে সীতাদের বাড়ির দিকে এগোতে দেখে অনিমেষ ছোটমার সঙ্গে বাবার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। ছোটমা বললেন, ‘যা-ই বল বাপু, এই কুলিদের সঙ্গে নিচয়ই বাবুরা ভালো ব্যবহার করত না, নাহলে পালাবৰ কথা মনে আসবেই-বা কেন?’ কথাটাকে মনেমনে সমর্থন করে অনিমেষ পেছন থেকে বাবার শরীরটাকে লক্ষ করল, এই মূহূর্তে অত বড় মানুষটাকে কেমন অসহায়-অসহায় দেখাচ্ছে।

মহীতোষ ঘাড় ফিরিয়ে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনিমেষ চট করে ডানদিকে মাঠের শেষপাতে ফ্যাঞ্চেরিতে যাবার রাস্তার দিকে তাকাল। হইহই শব্দটা জলম্বোতের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে এখন। ক্রমশ কালো কালো মাথাগুলো দেখা গেল।

অসহায়ের মতো ওরা আসাম রোডের দিকে তাকাল, সেখনে পৌছানোর আগেই কুলিয়া নিচয়ই ওদের ফেলবে। কারণ এখন ওরা ঠিক মাঠের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে।

চিংকার ক্রমশ বাড়ছে, সামান্য যে-কজন রাস্তার মুখে গেটের সামনে পৌছেছে তার অনেক অনেক গুণ বেশি লোক যে এখনও আড়ালে রয়েছে এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না ওদের। মহীতোষ দৌড়ে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে এসে হতাশ গলায় বললেন, তখন থেকে তাড়া দিছি তোমরা উন্নলে না। এখন কপালে কী আছে কে বলতে পারে! সব বাবু চলে গেল সময়মতো! কয়েক পা হেঁটে আসতেই ওদের বাড়ির সামনের ক্লাববৰ্টা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মধ্যখানে। এই সময় মাদলের শব্দ শুনতে পেল। অনিমেষ দেখল ছোটমার মুখ একদম সাদা হয়ে গিয়েছে। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে এখনই দ্রুত পা চালিয়ে আসাম রোডে উঠে যাওয়া উচিত। অবশ্য কুলিয়া যদি আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে তা হলে ওরা এই মূহূর্তে শুভ দ্রুতত্বেই থাক ছোটমাকে নিয়ে ওদের হাতের নাগালের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা যে জাতীয়িক আঘাত করবে এমন তো নাও হতে পারে। হয়তো চিংকার চাঁচামেচি করে ক্রোধ প্রকাশ করবে- তারপর বুরিয়ে বললে বুঝতেও পারে। ওদের বাড়িতে আসবার আগে সীতাদের বাড়ি কুলিদের সামনে পড়বে- সীতার মা-বা-ঠুকুমা তো বাড়িতেই আছেন।

খুব দ্রুত এসব কথা চিন্তা করে অনিমেষ বাবাকে বলল, ‘এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলো বাড়িতেই ফিরে যাই।’ মহীতোষও বোধহয় সেরকম চিন্তা করছিলেন, কথাটা উনে দ্রুত খিড়কির দরজার দিকে হাঁটতে লাগলেন। অনিমেষ হাঁটতে গিয়ে দেখল ছোটমা তেমন জোরে পা ছেসতে পারছে না। ওকে সাহায্য করার জন্য অনিমেষ ছোটমার ডান হাতটা ধরল। ধরেই চমকে উঠল, এত শীতল হাত সে এর আগে কোনোদিন ধরেনি।

খিড়কিদরজা বন্ধ করতেই মনে হল একটা বিরাট আড়াল হয়ে গেল-আপাতত কোনো ভয় নেই। এতটুকু হেঁটে আসতেই ছোটমা হাঁপাচ্ছে, অথচ যাবার সময় কোনো অসুবিধে ছিল না। হস্তাটা ক্রমশ বাড়ছে, বোঝাই যাচ্ছে প্রচুর লোক এখন মাঠে জয়ায়েত হয়েছে। তাদের গলায় বিক্ষেপের আওয়াজটা হঠাৎ উল্লাসে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা কী অনিমেষ বুঝতে পারল না। ওর মনে হল এখন বাড়িকাকু এখানে উপস্থিত থাকলে তবু যেন কিছুটা বল পাওয়া যেত। বাবা এই বাড়ির কর্তা-অথচ বাবাকে কী অসহায় লাগছে দেখতে!

মহীতোষ পকেটে হাত ঢুকিয়ে খৌজার ভঙ্গি করে শেষ পর্যন্ত হতাশ গলায় বলে উঠলেন, শাকলে, সিগারেটের প্যাকেটটা ঘরে ফেলে এসেছি।

ছোটমা এতক্ষণে কথা বললেন, ‘এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? দরজা খোলো, আমি ঘরের তেতোর বসব-যা হয় হোক।’

মহীতোষ যেন অন্য কোনো উপায় চিন্তা করছিলেন, কথাটাকে আমল দিতে চাইলেন না, ‘পাগল!'

ছোটমা বলল, ‘সীতার বাবা-মা যদি বাড়িতে থাকতে পারে তো আমরা পারব না কেন?’
মহীতোষ বললেন, ‘সীতার বাবা আজ অফিসে যায়নি, ছুটিতে আছে। তাই ওদের কোনো ভয় নেই, ওকে তাই কিছু বলবে না দেখো।’

অনিমেষ কথাটা শুনে বাবার দিকে তাকাল। সীতার বাবা নিচ্যই মেয়ের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন। সেটাই এখন তাঁর কাজে লাগবে : কুলিদের তিনি বোধাতে পারবেন যে তিনি কাজেইও যাননি এবং মনে কোনো পাপ নেই বলে কোয়ার্টার ছেড়ে কোথাও চলে যাননি। কুলিদা কি শুনবে সেকথা? অস্তত এখন পর্যন্ত সীতাদের বাড়ি থেকে যখন কোনো আর্টনাদ ভেসে আসছে না, তখন এর উলটো ভাবা যাচ্ছে না।

নিজের উটোনে ফিরে ছোটমা ধাতসু হয়েছে। কুলিদের হল্লাটা ক্রমশ বাড়ছে। ওরা টের পেয়ে গেছে বাবুরা তাদের কোয়ার্টার ছেড়ে পালিয়ে গেছে। প্রথম কোয়ার্টারে কাউকে না পেয়ে বোধহয় সেটার ওপর পাথর ছুঁড়ে ওরা। অনিমেষেরা এখান থেকেই টিনের ছাদে-পড়া পাথরের দুমাম শব্দ শুনতে পেল। বোধহয় এই শব্দেই ছোটমার চেতনা অন্যরকম কাজ করল। গোয়ালঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে ছোটমা বলল, ‘চলো পেছনদিকে চলে যাই।’

মহীতোষ বললেন, ‘তুমি নদী পার হতে পারবে? আর নদী পার হলেই তো কুলিলাইন। গিয়ে কী লাভ হবে?’

ছোটমা বলল, ‘এই লাইনের মেয়েদের আমি চিনি। দেখো ওরা আমাদের কিছু বলবে না। সামনে যারা এসেছে তারা অন্য লাইনের লোক।’

মহীতোষ অগত্যা কী করবেন বুঝতে না পেরে ছেলের দিকে তাকালেন। অনিমেষ বলল, ‘এখানে দাঁড়িয়ে তো কোনো লাভ হবে না। তার দেয়ে চলো।’

ওরা এবার পেছনের দরজা দিয়ে বেশ জলদি হাঁটতে লাগল। অনিমেষ দেখল বুনো গাছে বাড়ির পেছনটা হয়ে গেছে। একটিমাত্র সরু পায়ে-চলা-রাস্তা গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে নদীর দিকে চলে গেছে। গোয়ালঘরটা শূণ্য, শুধু একটা লালরঙ গোকুল তার বাচ্চাকে নিয়ে খুঁটিতে বাঁধা হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে সেটা চট করে বাচ্চাটার গা চাটতে লাগল। গোয়ালঘরটা দেখে অনিমেষের কালীগাই-এর কথা মনে পড়ে গেল। ও বুঝতে পারল বোচা মরে গেছে। আঙুল একটা ব্যথা ওর মনটাকে হঠাতে ছুঁয়ে গেল। ও কোনো কথা না বলে চুপচাট হাঁটতে লাগল। এখান দিয়ে চলাফেরা করলেই কালীগাই-এর সেই হাশা ডাকটা যেন কান বক করেও শোনা যায়।

নদীর সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। অনিমেষ দেখল জলেরা এখনও চুপচাপ বয়ে চলে যায়। তবে : এখানে নদীর গতীরভা যেন আরও কমেছে। মাঝে-মাঝে শ্যাওলা বুকে নিয়ে ছেট ছেট চড়া মাঝা তুলেছ। স্নোত আছে-কিন্তু ভীষণ ব্যক্ত দেখাচ্ছে নদীটাকে।

অনিমেষ আগে জলে নামল। হাঁটুর নিচেই জল, ব্যাগ নিয়ে পার হতে কোনো অসুবিধা হল না। জলের তলায় এখনও সেইরকম নানা রঙের নৃত্যাগার পড়ে আছে। ওর পায়ের শব্দেই বোধহয় একটা লাল চিংড়ি লাফিয়ে অন্য ধারে চলে গেল। পার হয়ে অনিমেষ বলল, ‘না, কোনো স্নোতই নেই, চলে এসো।’

ছোটমা মহীতোষের হাত ধরে ধীরে ধীরে পার হয়ে এল। এপারে এসে মহীতোষ হাঁফ ছেড়ে বললেন, ‘ভাগিস কোম্পানি আর নদীটার ওপর নজর দেয় না-নাহলে পার হওয়া যেত না।’

অনিমেষ ভাবল জিঞ্জাসা করে যে নদী বদ্ধ হয়ে গেলে ফ্যাক্টরির হইলটা চলবে কী করে, কিন্তু ঠিক সে-সময় একটা উদোম বাচ্চাকেও ও অবাকচোখে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। বছর ছয়-সাতের মদেসিয়া ছেলেটি দুপাশের বুনো গাছের মধ্যে দিয়ে যে-চলার পথটা কুলিলাইনের দিকে চলে গেছে তার একপাশে একটা হেটকা কুকুরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ভুলভুল করে ওদের দেখছে। মহীতোষও বাচ্চাটাকে দেখেছিলেন, নেহাতই গোবেচোরা একটা কালো ঝোঁপা শিশ। কিন্তু ওর মনে হল এটাই যদি এখনই ছুটে গিয়ে লাইনে ওদের উপস্থিতির কথা সবাইকে জানিয়ে দেয়, তা হলে আর কিছুই করার খাকবে না। কী করবেন বুঝতে না পেরে তিনি ছেলের দিকে তাকালেন। অনিমেষ কিছু বলতে হয় তাই জিঞ্জাসা করল, ‘এই, মরা ঘর কিধার?’

ছেলেটা কোনো উত্তর দিল না, শুধু ওর দুটো হাত কুকুরছানাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল আর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। আর এই সময় পেছনে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের প্রাণে ওদের কোয়ার্টারের সামনে বোধহয় চিৎকারটা এসে পৌছেছে, কারণ এখানে দাঁড়িয়েও ওরা বুঝতে পারছিল

দুরত্বটা বেশি নয়। সেইসঙ্গে মাদলে ভূমা ভূম শব্দ যেন অদ্ভুত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে যাচ্ছিল। শব্দটা প্রকট হতেই ছেলেটার মুখচোখের ভাব বদলে গেল। খুব উত্তেজিত হয়ে সে একটা হাত শব্দটাকে লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরে গোঁগো করে আওয়াজ করতে লাগল। মুহূর্তে অনিমেষরা বুঝতে পারল বেচারা কথা বলতে পারে না। ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, হাতের কুকুরাণাটা ঝুলে পড়েছে। ছেটমা বোধহয় সামলাতে পারল না নিজেকে, চট করে একটা হাত বাচ্চাটার মাথায় রাখল। অনিমেষ দেখল সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা কেমন শান্ত হয়ে গেল, তারপর ছেটমার গা-রেঁয়ে চৃপ্তাপ দাঁড়িয়ে রইল, কিছু ওর চোখ দুটো ভীষণ অব্যুক্ত হয়ে ছেটমার মুখের ওপর সেঁটে রইল। মহীতোষ বেধহয় এ-দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখতে চাইছিলেন না, সুটকেস্টা তুলে বললেন, ‘লাইনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, বরং নদীর ধার দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই চা-বাগান পড়বে, একবার ওতে চুকে পড়লে ‘আর কোনো বয় নেই। বাগান দিয়ে সোজা এগিয়ে খুঁটিমারি ফরেস্টের কাছে বাজারের রাস্তা পেয়ে যাব, চলো।’

ওরা এগোতেই বাচ্চাটা ছেটমার কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করল। এক হাতে কুকুর অন্য হাতে কাপড় ধরে সে গোঁসো শব্দ করে ছেটমাকে লাইনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। ঠিক এই সময় দড়াম দড়াম শব্দ শুরু হয়ে গেল। ক্ষিণ কুলিরা ওদের কোয়ার্টারের টিনের ছাদে পাথর ফেলছে। অনিমেষ নদীর ধারে দিয়ে সামান্য এগিয়ে গিয়েছিল, এবার ফিরে এসে বলল, ‘না, কোনো রাস্তা নেই, কাটাগাছের জঙগলের মধ্যে দিয়ে যা যেতে পারবে না।’

মহীতোষ নিজের পরিকল্পনা বাস্তাল হয়ে যাওয়াটা পছন্দ করছিলেন না, একটু উষ্ণ গলায় বললেন, ‘পারবে না বললে তো হবে না, এ ছাড়া কোনো উপায় নেই।’

ছেটমা বলল, ‘যা কপালে আছে হবে— লাইন দিয়েই চলো।’

মহীতোষ বললেন, ‘যা হলে যিহিমিছি বাড়ি ছেড়ে এলে কেন? কপাল টুকে বাড়িতে থেকে গেলেই তো হত!’

ছেটমার জেদ এসে গেল চট করে, ‘আমি তো তা-ই থাকতে চেয়েছিলাম, তোমরাই তো ত্য পেয়ে দৌড়ে মরছ। আমি এগোছি, এই লাইনের মেয়েরা আমাকে চেনে, কিছু বলবে না। তোমরা আমার পেছনে এসো।’

মহীতোষ কিছু বলার আগেই ছেটমা সরু পায়ে-চলা-পঁথটা দিয়ে বাচ্চাটার সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করল। মহীতোষ চৃপ্তাপ ওদের চল-যাওয়াটা দেখছিলেন। অনিমেষে কাছে এসে বলল, ‘চলো?’

কাঁধ আকালেন মহীতোষ, ‘জেনেভনে এরকম রিস্ক নেবার কোনো মানে হয়? মেই বাচ্চাটা আচল ধরে টেনেছে অমনি মন নরম হয়ে গেল।’ অনিমেষ অনেক কষ্টে হাসি চাপল, বাবা এবং মায়ের এই ঘ্যাপারটা ওর কাছে নতুন— বাবাকে খুব অসহায় দেখাচ্ছে এখন। অগত্যা ছেলের সঙ্গে মহীতোষ ঝীর অনুগাম হলেন। জঙগলটুকু পার হতেই কয়লার গুঁড়ো— বিছানো রাস্তাটা পড়ল। ডানদিকের চা-বাগান থেকে উঠে এসে সোজা ফ্যাট্রির দিকে চলে গিয়েছে। ট্রাইলের ভারী চাকার দাগ রয়েছে এখানে। রাস্তার উপাশে সার দিয়ে কুলিদের ঘরগুলো। বেশির ভাগই খড়ের ছাউনি, মাটির দেওয়াল, দু-একটা ইটের গাঁথুনি ধাকলেও ওপরে খড় চাপানো হচ্ছে। অনিমেষ দেখল সমস্ত লাইনটা থার্বা করছে। কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ বাড়ির দরজা বন্ধ, গুরুগুলো খুঁটিতে বাঁধা, মুরগিগুলো মেজাজে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। মহীতোষও বিশ্বাসে দেখছিলেন। এই অঞ্চলে তিনি অনেক বছর আগে এসেছিলেন। তার কোয়ার্টার থেকে সামান্য দূরত্বের এই লাইনে আসবাব কোনো প্রয়োজন তাঁর পড়ে না। এখন এই নিবৃত্য পরিবেশ তাঁকে ভীষণরকম আক্ষণ্য করল। বোঝাই যাচ্ছে এই লাইনের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-মদ এই মুহূর্তে তাঁর বাড়ির সামনে জমায়েত হয়েছে। বেশ উত্তেজিত গলায় তিনি বললেন, ‘তাড়াতাড়ি এই বেলা লাইনটা পার হয়ে চলো।’

অনিমেষরা কেউই এরকম আশা করেনি, এখন দ্রুত হাঁটা শুরু করে দিল। বাচ্চাটা সঙ্গে আসছিল, মহীতোষ তাকে ধর্মকালেন, ‘এ হোঁড়াটা, ঘর যা।’

সে শুনল কি না বোঝা গেল না, কারণ তার মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরম আনন্দে সে ছেটমার হাত ধরে একটা মাটির বাড়ির দাওয়ার দিকে নেটে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। ছেটমা বলল, ‘অ গেল যা, এ হোঁড়া যে ছাড়ে না।’ আর এর বাপ-মায়ের বুদ্ধি দ্যাখো— একে একা ফেলে পলিয়েছে সব।’ পালানো শব্দটা অনিমেষের কানে গালিলেও সে কিছু বলল না। ছেলেটা ততক্ষনে গৌণো করে আঙুল তুলে কাউকে দেখবার চেষ্টা করছে। একটু এগোতেই ওদের নজরে পড়ল, ঘরটার

দাওয়াতে রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কেউ বসে আছে, তার সামনে অনেকটা গম উক্তে দেওয়া হয়েছে, বসে-থাকা মানুষটার হাতে একটা লাঠি-বোধহয় কাক চিল থেকে পাহারা দেবার জন্য। অনিমেষ দেখল ম্যানুষটা স্তী কি পুরুষ চট করে বোবা যাচ্ছে না, কারণ তার ধারার সাদা চুল গুড়িগুড়ি করে ছাঁটা। গায়ের চামড়া ঝুলে শুটিয়ে এন্দেছে। বেচারা চোখে দ্যাখে না বোধহয়, কারণ ওরা এত কাছে এসেছে তবু তার কোনো ভাবান্তর নেই। বাচ্চাটা হঠাতে ছুটে গিয়ে গৌণো চিক্কার করতে সে একটু নড়েচেতে বসে নিন্দাত মাড়ি বের করে কিছু বলল। মহীতোষ একটু সামনে গিয়ে তালো করে লক্ষ করে বললেন, ‘সেরা বলে মনে হচ্ছে।’

ছোটমা বলল, ‘সেরা? সেই যে তুমি যার গলা বলেছিলেই?’

মহীতোষ মাথা নাড়লেন, তারপর কাছে গিয়ে ডাকলেন, ‘এই তুমার নাম সেরা?’

লোলচর্ম-মুখটা এবার যেন ইদিস পেল তার সামনে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে। অনিমেষ এর আগে কোনোদিন সেরাকে দেখেনি অথবা এরা নামও শোনেনি। মদেসিয়া সাইনে এ-নামের কেউ থাকতে পারে ভাবা যায় না। যদিও বয়স হয়েছে বেশ তবে বোবাই যায় রোগে ভুগে ভুগে এর অবস্থা এইরকম জীৱিতায় এসে ঠেকেছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এর গায়ে রঙ অন্য পোচাটি মদেসিয়ার মতো সাদা হয় কখন কে জানে, বরং যে-কোনো বাঙালি মেয়ের সঙ্গে মিলে যায় চট করে। চোখের পাতা সাদা হয় কখন কে জানে, সাদা চোখের মণি যেন আতিপাতি করে খুজতে চাইল সামনে-দাঁড়ানো মুখগুলোর দিকে চেয়ে, ‘কোন?’

সেরাকে দেখে মহীতোষ পুরনো দিনের শৃতি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আঞ্চলিকচ দিতে গিয়ে পরিস্থিতির কথা মনে পড়ে গিয়ে চট করে শুটিয়ে গেলেন। তারপর স্তী-পুত্রের দিকে আকিন্নে বললেন, ‘বেচারার বয়স হয়ে গেছে বলে চিনতে পরছে না-চলো যাওয়া যাক। ওই তো চা-বাগান দেখা যাচ্ছে।’

কিন্তু ততক্ষণে সেরা উঠে দাঁড়িয়েছে শাঠিতে ভর করে; আর সেই বাচ্চাটা দৌড়ে গিয়ে কুকুরছানাসমতে ওর এক হাতের তলায় অবলম্বন ইয়ে গিয়েছে। মহীতোষ যখন যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছেন ঠিক তখনই সেরা রলে উঠল, ‘বুড়োবাবাকে লেড়কা?’

মহীতোষের পা দুটো যেন শক্ত হয়ে গেল। অনেকদিন বাদে কেউ তাঁকে এই নামে সঙ্ঘেধন করল। তিনি যখন অথবা চাকরিতে ঢুকেছিলেন তখনই সেরার যৌবন-ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু ওর গল্পটা বেশ চালু ছিল। সে-সময় পাতি তোলার কাজ থেকে ছাঁড়িয়ে ওকে ফ্যাট্টিরিতে বাছাই-এর কাজে লাগানো হয়েছিল; মহীতোষ দেখেছিলেন কাজের চেয়ে ও বেশি কথা বলত আর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কৃত্তু ছিল যে যারা পছন্দ করত না তারাও ছায় করে শুনত। সেই সেরা এখন অবর্হ হয়ে ভাঁকে পুরনো নামে ডেকে ফেলল-মহীতোষ একটু রোমাঞ্চিত হলেও তার মনে হল পেছনে বিপদ নিয়ে এখনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় এখন নয়। তবু যাবার সময় তিনি উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ।’

‘ও কোন, বহু, বেটা- আরে কাঁহা ভাগতিস বে ও বুড়োবাবাকে লেড়কা?’

মহীতোষ দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেরার গলা থেকে এরকম আওয়াজ বের হতে পারে কল্পনা করা যায় না। সেরার গলা তবে যদি কেউ থেকে ধাকে আশেপাশে, বেরিয়ে এলেই হয়ে গেল। মহীতোষ সেরার শোনার মতো গলায় বললেন, ‘হ্যাঁ।’

‘বুড়োবাবাকে লাভি! ও ছেউয়া, ইধার আ, মো পানে আ, তুহার মুখ দেবি।’ জোরে জোরে অনিমেষকে ডাকতে লাগল সে।

মহীতোষের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ছোটমা বলল, ‘যাও, তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো।’

অনিমেষ সামনে এগিয়ে যেতেই সেরা বাচ্চাটার মাথা থেকে যায়ে যেতেই সেরা বাচ্চাটার মাথা থেকে সরিয়ে নিজের বুকে হাত রেখে বলল, ‘মেরা মাম সেরা, ফাট্টা কেলাস। বেটা।’ শেষের শব্দটা একটু মনে করে নিয়ে বলল। আর তার পরই ফোকলামুখে হেসে বলল, ‘হাম বুড়ি হো গিয়া।’ তু বুড়োবাবাকে লাভি! তুর জন্ম হল তো বুড়োবাবা মিঠাই খাওয়ালেক, আভি তু জোয়ান হো গিয়া বাপ, হাম বুড়ি হো গিয়া।’ কথাগুলো অসংলগ্ন কিন্তু অনিমেষ অনুভব করছিল আনন্দিকতা না থাকলে এভাবে কথা বলা যায় না। অথবা এই মুহূর্তে অন্য কুলিয়া প্রতিশোধ নিতে তাদের কোয়ার্টারের সামনে হয়া করছে। কেন যে এমন হয়! মৃদু হেসে ও চলে আসতে চাইছিল, কিন্তু সেরা ছাড়বার পাত্র নয়, সামান্য গলা নামিয়ে সেরা বলল, ‘ও জেনানা কৌন হ্যায়ঁ তুর দোসরা মা।’

অনিমেষ বলল, ‘হ্যাঁ। আমরা যাচ্ছি।’

‘কাঁহা যাহাতিস বে?’

‘বাজারে।’

‘বা-জা-র! তুর মৰকা সামনে রাস্তা ছোড়কে ইধাৰসে কাহে?’

অনিমেষ কী জবাব দেবে বুঝতে না পেৰে বাবাৰ দিকে তাকাল। মহীতো ওকে ইশাৱা কৱে চলে আসতে বললেন। আৱ এই সময় নদীৰ ওপৰে চিৎকাৰ চাঁচামেচি বেড়ে গেল সহসা। এমন শব্দ কৱে মাদলগুলো বাজাতে লাগল যে অনিমেষৰ মনে পড়ল রহস্যময় আফ্রিকা বইতে এই ধৱনিতে মাল বাজিয়ে নৰবাদকদেৱ আসবাব গল্প সে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে শুনল সেৱা বলছ, ‘শালা হারামি! হৱতাল কৱবেক, কাম কৱবেক নাই, সাবেৰ পয়সা নেহি দেগো তো খায়গা ক্যাঃ সবকোই নিমকহারাম হো গিয়া!’ বিড়বিড় কৱে যাদেৱ গলাৰ শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনিমেষ আৱ দাঁড়াল না, দৌড়ে মহীতোৰদেৱ সঙ্গ নিল। বাঁদিকে একটা চিউভণ্যেল, সেটা ছাড়াতেই বুপড়ি-হয়ে-থাকা বিৱাট অৰ্থগাছেৰ গা-খেষে চা-বাগানেৰ পৰু। ওৱা যখন চা-বাগানেৰ মধ্যে ঢুকে পড়েছে তখন পেছনে পায়েৰ শব্দ শৰতে পেল-খুব দ্রুত একটা লঘু আওয়াজ ‘এগিয়ে আসছে। চা-গাছ-পদেৱ বুজ- সমান উচ্চ, মাৰো-মাৰো বড় শেডটি আৱ পাতি তোলাৰ সুবিধেয় জন্ম পায়ে-চলাল রাস্তা চলে গেছে বাগানমঞ্জ। মহীতোৰ বললেন, ‘বসে পড়ো, বসে পড়ো।’

ওৱা তিনজনেই বসে পড়ল চটপট। লাইনে এখন জোৱ কথাবাৰ্তা চলছে। সেইসঙ্গে হাসি আৱ চিৎকাৰ। মাদলটা ঘুৰেফিৰে অনেকৰকম বোল তুলছে এখন। এগিয়ে-আসা আওয়াজটা হঠাৎ খেমে গেছে। সামনেৰ ওই বিৱাট অক্ষকাৰ-কৰে রাখা অৰ্থগাছটার জন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যে এসেছে সে কি ওদেৱ সংকান পেয়েছে? অনিমেষৰ মনে হচ্ছিল সেৱা নিচয়ই ওদেৱ কথা ফিৰে-আসা কুলিদেৱ বলবে না। আৱ যদি ওৱা টেৱ পেত তা হলে এতক্ষণে দল বেঁধে এদিকে ছুটে আসত। কিছুক্ষণ এভাবে উৰু হয়ে বসে থেকে অনিমেষৰ অৰ্থষ্টি হতে আৱস্থ কৱল। চাৱাগাছগুলোৰ তলায় চোকাৰ কোনো প্ৰশ্ন নেই কিন্তু ওৱা যেখনে ব্যৱহাৰ কৰেছে তা তলায় অনেক ছুঁলো আগাছা, বাস শৰীৱাটকে বিবৃত কৱছিল। মহীতোৰ যেন ফিসফিসিয়ে ছেটমাকে বললেন, ‘এও কপালে লেখা ছিল।’ ছেটমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, চোখ বৰ্ক কৱে বসে আছে। এই সময় অনিমেষ ওকে দেখতে পেল। পায়েপায়ে এগিয়ে এসে মুখে ঘূৰিয়ে-ঘূৰিয়ে কাউকে খুঁজেছে। মহীতোৰও ওকে দেখেছিলেন। স্বতিৰ নিষ্কাসটা তঁৰ এত জোৱে হয়েছিল যে ছেটমা চোখ খুলে সামনে দেখল এবং সেই সময় বাকাটা এদিকে মুখ ফেৰাল। তিনটে মানুষ যে এভাবে উৰু খুলে সামনে দেখল এবং সেই সময় বাকাটা এদিকে মুখ ফেৰাল। তিনটে মানুষ যে এভাবে উৰু হয়ে বসে আছে সে-দৃশ্যে ওৱা মুখে কোনো ভাবান্তৰ দেখা গেল না। ও অনিমেষৰ মুখৰ দিকে তাৰিয়ে চূপচাপ সামনে এগিয়ে এসে ডান হাতটা এগিয়ে ধৱল। অনিমেষ দেখল ওৱা হাতে একটা কাগজেৰ মোড়ক ধৱা আছে। ভীষণ অবাক হয়ে গেল সে, এইভাবে পেছন ধাওয়া কৱে এসে কী দিতে চাইছে ও? মোড়কটা নিয়ে কাঁপাহাতে সেটাকে খুলুল অনিমেষ। পুৱনো ব্যবেৱ কাগজেৰ ভাঁজগুলো খুলতৈই অনিমেষ তাজ্জব হয়ে গেল। গোটা-চাৱেক ঘড়েৱ বাতাসা রয়েছে তাতে। ও মুখ তুলে তাকাতৈই দেখল ছেলেটা হলদে দাঁত বেৱ কৱে হাসল, তাৱপৰ একটা হাত পেছনদিকে ওদেৱ সাইনেৰ দিকে নিৰ্দেশ কৱেই সেটাকে ফিৱিয়ে অনিমেষৰ দিকে উঠিয়ে ধৱে অবোধ্য শব্দ বৰে চলল। পেছন থেকে মহীতোৰ জিজ্ঞাসা কৱলেন, ‘কী ব্যাপৰ?’

অনিমেষ ওদেৱ বাতাসাগুলো দেখাল। ছেটমা বলল, ‘আহা বে, তোমাকে থেতে দিয়েছে বুড়ি, কী ভালো দায়ো তো।’

মহীতোৰ বললেন, ‘আচ্ছা।’

অনিমেষ এতখানি আপুত হয়ে গিয়েছিল, ও কোনো কথা বলতে পাৱছিল না। যাদেৱ ভয়ে ওৱা বাড়ি ছেড়ে চা-বাগানেৰ মধ্যে লুকিয়ে আছে তাদেৱই একজন তাকে প্ৰথম দেখল বলে চাৱটে বাতাসা পাঠিয়ে দিয়েছে মুহূৰ্মিটি কৱতে। হয়তো এই বাতাসাগুলো সেৱাৰ কাছে মহাৰ্ঘ জিনিস, কিন্তু তা-ই সে পাঠিয়ে দিয়েছে সৱিশেষৰকে সম্মান দেৱাৰ জন্য। এই মুহূৰ্তে অনিমেষ দাদুৰ জন্য গৰ্ব অনুত্ব কৱছিল। ও দুটো বাতাসা বাকাটাৰ হাতে দিতেই সে একসঙ্গে মুখে পুৱল, তাৱপৰ হাত নেড়ে অনিমেষকে ডাকতে লাগল।

অনেকক্ষণ থেকে অনিমেষৰ মনেৰ মধ্যে একটা হীনন্যন্তা তিল তিল কৱে জন্ম নিছিল। এইভাবে বাড়িতে আসামাত্র কিছু গৱিৰ কুলিৰ ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ও মনেমনে আৱ সমৰ্থন কৱতে পাৱছিল না। ওৱা মনে হচ্ছিল আজ কুলিদেৱ এই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠাৰ পেছন নিচয়ই

সুনীলদার পরিশ্রম আছে। সেই সুনীলদার সঙ্গে তার মিত্রতা, সুনীলদার শেষযাত্রার সঙ্গী হওয়া, সর্বহারাদের সম্পর্কে সুনীলদার কথা শুনে অনেক কিছু স্পষ্ট করে দেখা-এখানে এসে এইভাবে পালিয়ে বেড়ানোর ফলে মিথো হয়ে যাচ্ছে। আসলে এখানে আসামাতাই এতসব ঘটনা পরপর ঘটে গেল যে সে মাথা ঠিক করে কোনোকিছু ভিত্তি করতে পারেনি। এখন এই মুহূর্তে বাচ্চাটার হাতে পাঠাদের বৃক্ষ মদেসিয়া রমণীর ভালোবাসা পেয়ে ভীষণভাবে নাড়া খেল। এইভাবে পালিয়ে বেড়াবার কোনো অর্থ হয় না। ওর মনে হল ও নিশ্চয়ই রাগী কুলিদের বেরাবাতে পারবে যে ওদের শক্তি তারা নয়। এই বাচ্চাটা যেন অনিমেষকে শজ্জা দিয়ে গেল। ও আন্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আমি যাচ্ছি।’

মহীতোষ চমকে উঠলেন, ‘সে কী! কোথায় যাচ্ছিস?’

অনিমেষ বাবার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণের ভাবা কথাগুলো বলব-বলব করেও বলল না। ওর মনে হল এসব কথা বাবা বুবদেন না। বাবার যখন মৌবন ছিল তখন তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য কোনো আন্দোলন করেননি। এই ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো নিজের পরিবারের বাইরে আর-কিছু ভাববার মতো মানসিকতা বাবার কখনো তৈরি হয়নি। এখানকার কংগ্রেস কমিউনিস্ট কোনো ব্যাপারেই তাঁকে স্পর্শ করে না। এই চা-বাগানের কুলিদের ওপর তিনি কখনোই অভ্যাচার করেননি বটে, কিন্তু এরা যে মানুষ, মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য এরা চেষ্টা করতে পারে সেটাও তিনি ভাবতে পারেন না। যেন ইষ্টের পৃথিবীতে যাকে যেভাবে চিরকাল রেখে এসেছেন সে সেইভাবে থাকবে। শুধু নিজের এবং পরিবারের মানুষের ওপর কোনো আঘাত হলে তিনি বিচিত্র হয়ে উঠবেন। অনিমেষের মনে হল, তার জানাশোনা মধ্যবিত্ত মানুষের সবই বাবার মতো এক। এক।

ও এইসব কথা বলল না, শুধু বলল, ‘দেখে আসি কী ব্যাপার। এইভাবে কতক্ষণ বসে থাকব।’

মহীতোষ স্পষ্ট বিকল হলেন, কিন্তু ততক্ষণে অনিমেষ এগিয়ে গিয়েছে। মহীতোষ চাপা গলায় বললেন, ‘মরবে মরবে, চিরকাল এইরকম জেদি থেকে গেল, বৃক্ষসুন্দি হল না।’

ছেলেটার হাত ধরে অনিমেষ চা-বাগান থেকে উঠে আসছে এমন সময় পেছন থেকে ছেটমার ডাক শুনতে পেল। পেছন ফিরে সে দেখল ছেটমা এগিয়ে আসছে। ও এটা ভাবতে পারেনি, ভেবেছিল বাবা আর ছেটমা আপাতত এখানে থাকুন, পরিস্থিতি বুঝে পরে ব্যবস্থা করা যাবে।

ছেটমা ‘এসে বলল, ‘চলো।’

‘তুমি যাবে?’ অনিমেষ বিশ্বাস করতে পারছিল না।

‘আমি আর বসে থাকতে পারছি না। তা ছাড়া তোমার যদি কোনো ক্ষতি না হয় আমারও হবে না। আর যা-ই হোক যেয়েদের ওরা কিছু বলবে না। চলো।’

ছেটমাকে হাঁটতে দেখে অনিমেষ বলল, ‘বাবা?’

‘উনি থাকুন। সবাই তো সমান নয়। ওর পক্ষে এটাকে আভাবিকভাবে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং এখানেই ওর মনে হবে বিপদ কম।’ ছেটমার কথা শুনে অনিমেষ চুপচাপ হাঁটতে লাগল। পেছন থেকে মহীতোষের গলায় চাপা ডাক ওরা আর শুনতে পেল না, কারণ ততক্ষণে সেই বিরাট অস্থগাছটা ওরা পেরিয়ে এসেছে। ছেটমার মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের কেমন শুলিয়ে গেল। মানুষের চরিত্র ও এখন কিছুই বুঝতে পারে না।

দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন কুলিলাইনে মেলা বসেছে। প্রচুর মানুষের ভিড়, গোল হয়ে তারা নাচ দেখছে। পরম্পরার কোমর জড়িয়ে ধরে ছেলেমেয়েরা মাদলের তালে আশ্পারিছু হয়ে নাচছে। অথবে ওদের দেখতে পেয়েই অনিমেষের বুকটা কেঁপে উঠেছিল, কী হবে কে জানে! কিন্তু খুব দ্রুত ও নিজেকে সামলে নিল, পরিস্থিতি যা-ই হোক ও তার মোকাবিলা করবে। ছেটমার মুখ দেখে মনে হল না একটুও ডয় পেয়েছে। যারা এইরকম আনন্দ করে নাচতে পারে তারা কি মানুষকে আক্রমণ করতে পারে?

স্বর্গছেড়ার কুলিলাইনে তাদের সীমানায় কোনো বাবুর বউকে আসতে দেখেনি কখনো, ফলে ওদের দেখতে পাওয়ামাত্র ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কোতুল্লী চোখ তুলে ওদের দেখছে। ছেলেটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওদের স মনে এসে অনিমেষ খুব অস্বত্তি বোধ করল। এই মানুষগুলোকে দেখে একটুও রাগী বলে মনে হচ্ছে! কাকে কী কথা বলা যায়—পূর্বস্মৃতি না থাকায় অনিমেষের গোলমাল হয়ে গেল। ও বাচ্চাটার ইঁটার টানে সেরার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ছেটমা বলল, ‘সবাই দেখছে।’

সেরা দাঁড়িয়ে ছিল দাওয়ায়। ওদের ফিরে আসতে দেখে ফোকলামুখে বাচ্চাটাকে কিছু বলতেই

সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, দিয়ে হাসল। লাটিতে ভর রেখে একটু সামনে এগিয়ে সেরা সমবেত জনতাকে দেখাল, ‘বৃঢ়োবাবুকে লাভি।’

একটা গুজ্জন উঠল, যেন মুহূর্তেই জনতা অনিমেষকে চিনতে পারল। ছোটমাকে অনেক কামিন চেনে। তারা ঠারেঠোরে কথা বলছে। এমন সময় ভিড় ঠেলে একজন বয়স্ক মদেসিয়া এগিয়ে এল ওদের দিকে। অনিমেষ ঠিক বুঝতে পারছিল না হাওয়া কোনদিকে, শার্ট-প্যান্ট পরা প্রৌঢ় লোকটিকে দেখলে মনে হয় বেশ ভ্রু। লোকটি সামনে এসে ওদের দেখে বলল, ‘আপনি মহীবাবুর ছেলে! স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণ, কথা বলার মধ্যে একটা কর্তৃত্বের আভাস আছে। অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। ‘এখানে কী করছেন?’

অনিমেষ জবাব দেবার আগেই ছোটমা বলল, ‘বেড়াতে এসেছি।’

উভয়টা বোধহয় আশা করেনি লোকটি, হেসে বলল, ‘এখানে কাউকে বেড়াতে আসতে দেখিনি কখনো। আমার নাম জুলিয়েন, এখানকার লেভার ইউনিয়নের সঙ্গে আছি। আজ হরতাল হবার পর বাবুরা তাদের কোয়ার্টার ছেড়ে বাজারে চলে গেছেন আমাদের ভয়ে আর আপনারা এখানে বেড়াতে এসেছে—এটা ভারি অস্তুত ব্যাপার।’

অনিমেষ এবার কথা বলল, ‘আপনারা ভয় দেখাচ্ছেন কেন? বাবুদের বিরুদ্ধে তো আপনাদের লড়াই নয়।’

‘নিচ্যই নয়। কিন্তু হরতাল জেনেও কাজে গিয়ে উরা ভয় পেয়ে গেছেন। আসলে সাহেবকে হাতে রাখতে চায় সবাই। মিডলক্লাস মেটালিটি। অথচ আমাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ওদের আক্রমণ করার। আমরা এত হাজার শ্রমিক ইচ্ছে করলে—যাক, সাহেব আমাদের বেশির ভাগ দাবি মেনে নিয়েছেন—প্রথম পদক্ষেপে এটা বিরাট জয়। সেই জয়-উৎসব করতে আমরা আপনাদের শুধুমাত্র গিয়ে দেখলাম কোয়ার্টস খালিব’ জুলিয়েন হাসল।

কুর্থাটা মুন তীষণ ভালো লাগল অনিমেষের। হঠাত ও বলে ফেলল, ‘আজ সুনীলদা থাকলে কুব খুশ হতেন।’

‘হ্যা। ওর কাছে আমি অনেক গল্প শনতাম।’

অনিমেষ বরতেই জুলিয়েন ওর দুই হাত জড়িয়ে ধরল, ‘সুনীলবাবু না এলে আমরা অস্তকারে থাকতাম। আপনি যখন সুনীলবাবুর বন্ধু তখন আমাদেরও বন্ধু।’

অনিমেষ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। এই মানুষগুলোকে কী চট করে ওরা ভুল বুঝেছিল! ওর মনে হল একসঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের চেনাশোনা হয় না।

হঠাত ওর চেখে পড়ল ছোটমা অস্বীকারের পাশ দিয়ে চা-বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জুলিয়েনের হাত-ধৰা অবস্থায় ও বলল, ‘আমার বাবা ওখানে আছেন।’

জুলিয়েন ছোটমার যাওয়াটা দেখছিল। একটু চুপ করে থেকে ও বলল, ‘বুঝতে পেরেছি। চলুন আপনি আমার ঘরে বসবেন।’

অনিমেষ বুঝতে পারল, বাবাকে লজ্জা দিতে চাইছে না জুলিয়েন। তীষণ কৃতজ্ঞ হয়ে হাঁটতে লাগল অনিমেষ।

খাওয়াদাওয়া সারতে বিকেল গড়িয়ে এল। ছোটমা মহীতোষকে নিয়ে আগেই বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। অবশ্য মহীতোষ নাকি কুলিলাইনের সামনে দিয়ে পার ফিরতে চান। বাগানের মধ্যে দিয়ে সামান্য এগিয়ে ফ্যাট্টরির পাশ-ধৈরে ছোট সাঁকোটা পেরিয়ে সুরক্ষি-বিছানো থটা দিয়ে উরা ঘুরে এসেছেন। সমস্ত চা-বাগানে আজ খুশির আমেজ লেগেছে, দিনদুপুরে ইঁড়িয়া থেয়ে নাচগান শুরু হয়ে গিয়েছে। ওদের জীবনে এককম ঘটনা এর আগে ঘটেনি, স্বয়ং সাহেবে বাংলোর বারান্দায় জুলিয়েন আর তিনজনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করে ওদের দাবি মেনে নিয়েছেন। ওরা জীবনে কখনো গল্প শোনেনি যে বাঁবুরা ওদের ভয়ে কোয়ার্টার ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। এই আনন্দের প্রকাশ কিছু ছেলের মধ্যে বাঁবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, তারা বাবুদের কোয়ার্টারের উপর টিল ছুড়েছে, গাছপালা ছিঁড়েছে, গাছপালা ছিঁড়েছে—ব্যস, এর বেশি এগোয়ানি। জুলিয়েন সম্পর্কে পুরোনোহৃষি আনন্দদের মনে যে-সন্দেহের মেঘ ছিল তা রাতারাতি কেটে গিয়ে সে এখন নায়ক হয়ে গিয়েছে। অনিমেষ জুলিয়েনদের ঘরে বসে সেটা বেশ টের পাচ্ছিল।

জুলিয়েনের সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালো লাগল অনিমেষের। সরিৎশেখবরকে স্পষ্ট মনে আছে

ওর। ওর বাবা বকু সর্দারের দিনগুলো থেকে এতদিন স্বর্গহেঁড়া খুব-একটা পালটে যায়নি। কালো কালো মানুষগুলো হাঁড়িয়া থেয়ে নিজেদের মধ্যে যতই মারামারি করুক, সাহেব তো দূরের কথা, বাবুদের সামনে পড়লে কেঁচো হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর আগে ওদের একটা দাবি সাহেবদের কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছিল যে কুলিদের যেসব ছেলে কলেজে উঠবে, মিশনারিদের কাছ থেকে তবু আপনি উঠেছিল। জুলিয়েন আর একজন এই চা-বাগানে বাবুর কাজ পেয়ে দেখল ওদের কোয়ার্টার অন্য বাবুদের সঙ্গে নয়—দূরে লাইন-বেমে তৈরি হল। আবার মজার ব্যাপার, অন্য যে লেবার-ছেলেটি বাবুর চাকরি পেল সে বড় কোয়ার্টারে যাবার পর অন্য লেবারের ভালোবাসা। এই সময় সুনীলদা না এসে এখানকার লেবারদের সংগঠিত করা যেতে না। এমনকি জুলিয়েন নিজেও খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল সে-সময়। পি এস পি বা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার যে যোগযোগ ছিল তাতে ওদের সম্পর্কে ভালো ধারণা ও মনেমনে তৈরি করতে পারছিল নাউনীলদা ওকে একটা ছবি দিয়ে গেছে। ছবিটা দেখাল জুলিয়েন। এর আগে ছবি কথনো দেখেনি অনিমেষ। দাড়িওয়ালা এক প্রোচের ছবি। নিচে ইঁরেজিতে নাম দেখা-কার্ল মার্কস। পেছনে সুনীলদার নিজের হাতে লেখা কয়েকটা লাইন-‘যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে, তার মুখে খবর পেলাম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক।’ চট করে সুনীলদার মুখটা মনে শেল অনিমেষের, সেইসঙ্গে ঢড়মুড় করে চলে এস ওকে শ্যাশানে নিয়ে যাবার রাতটার কথা। জুলিয়েন বলল, ‘সুনীলবাবুকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের জানি। বদলা নিতে পারতাম, কিন্তু তা তাঁদের বেশিদিন বাঁচতে দেওয়া হয় না। আবার মজার ব্যাপার হল, তাঁরা নিহত হন বলেই সে-কাজটা দ্রুত হয়ে যায়। আচ্ছা, এই মার্কসও তো সাহেব হিলেন-অথচ দেখুন—।’

ফিরে আসার সময় অনিমেষ চৃপচাপ একা একা হেঁটে এল নদী পেরিয়ে। চারধারে যেন পরবের মেজাজ-মানদ বাজছে-ছেলেমেয়েরা গান গাইছে। মহাদ্বা গাকী, সুভাষচন্দ্র বসু এবং কার্ল মার্কস-অনিমেষ যেন দুটো হাত দিয়ে এই তিনজনকে ছুঁয়ে দেখতে-দেখতে হাঁটেছিল। দেশ বড়, না দেশের মানুষ বড়।

নদী পার হতেই ঝাড়িকাকুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে দেখেই গলা তুলে বকাবকা করতে আরম্ভ করল, ‘এতক্ষণ কোথায় ছিলি-তোর বাবা কখন এসে গিয়েছে-বিকেল হয়ে গেল, খাওয়াদাওয়া করতে হবে না?’

অনিমেষ হেসে ফেলল, খিদেবোধটা ওর একদম হয়নি আজ। সীতাদের বাড়িতে মিষ্টি খাওয়ার পর এতসব উত্তেজনাময় ঘটনা ঘটে গেল যে খাওয়ার কথা আর মনেই হয়নি। কিন্তু ঝাড়িকাকুর ব্যাপারসায়াপার অনেকটা দানুর মতো, বিকেল হতে এখনও অনেক দেরি, তবু বলল বিকেল হয়ে গিয়েছে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ঝাড়িকাকু বলল, ‘তোরা মিছিমিছি চলে গেলি, ওরা আনন্দ করতে এসেছিল। সীতাদের বাড়ি থেমে মিষ্টি খেয়ে গেল।’

অনিমেষ বলল ‘ইঁ। জুলিয়েন বলল।

‘জুলিয়েন? জুলিয়েনকে তুই চিনিস?’ ঝাড়িকাকু ওর মুখের দিকে তাকাল।

‘একটু আগে আলাপ হল। বেশ ভালো লোক।’

‘ভালো লোক?’ বিচিয়ে উঠল ঝাড়িকাকু, ‘ওই তো সব নষ্টের গোড়া। এতদিন ধরে কুলিদের খেপিয়ে খেপিয়ে আজ এইসব করেছে। সবাই বলে ও নাকি কমনিস্ট।’

‘কী বলল?’ হেসে ফেলল অনিমেষ, ‘কম নিষ্ঠ মানে জান?’

‘ওই তো, যারা গরিব মানুষদের খ্যাপায়।’ নিশিষ্ঠ গলায় ঝাড়িকাকু জবাব দিল।

‘দূর। কম নিষ্ঠ মানে হল কোনো কাজে যার আন্তরিকতা নেই। আর তুমি যেটা বলতে চাইছ সেটা হল কমিউনিস্ট।’

অনিমেষ বুঝয়ে বলতেই ঝাড়িকাকু কিছুক্ষণ ভেবে জিজেস করল, ‘আচ্ছা গাঙ্কীবাবা কি কমিউনিস্ট।’

প্রশ্নটা শনে অনিমেষ হকচিয়ে গেল প্রথমটা। ওর মনে হল, হ্যাঁ বলতে পারলে ওর ভালো লাগত। কিন্তু কোথায় যেন আটকে যায়। পরশ্কনেই ওর খেয়াল হল, ঝাড়িকাকু মহাদ্বা গাঙ্কীর নাম জানে তা হলে। যে-মানুষটার নাম এইরকম নির্জন জায়গায় ঝাড়িকাকুর মতো নিরক্ষর মানুষ শুকার সঙ্গে উচ্চারণ করে সে-মানুষ কংগ্রেসি কি কমিউনিস্ট-তাতে কিছু এসে-যায় না। কার্ল মার্কস সম্পর্কে ও তেমন-কিছু জানে না। সুনীলদার মুখে দুই-একবার নামটা শনেছিল। দুনিয়ার সর্বহারাদের কথা

ঘাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের শুরু হলেন কার্ল মার্কস। ছবিটা দেখে শুক্রা জাগে মনে। ওর সম্পর্কে আরও জানতে হবে—অনিমেষ মনেমনে ছির করল। খাওয়াদাওয়া সারতে বিকেল হয়ে গেল। সকালবেলায় রান্নাবাবু হয়নি। কুলিরা চলে গেলে ঝাড়িকাকু বাড়ি ফিরে উনুন জালিয়ে তাত চাপিয়ে দিয়েছিল। ছেটমা সবকিছু অন্যদিনের মতো সেরে নিয়ে রান্না শেষ করলে অবেলায় শুদ্ধের খাওয়া হল। আজ অনিমেষ বাবার সঙ্গে বসে খেল। আজকের এই ব্যাপারটা মহীতোষকে বেশ নড়বড়ে করে দিয়েছে। তিনি যে অথবা ভয় পেয়েছিলেন এটা সীকরণ করতে এখন তিনি প্রস্তুত নন। সাহেব কুলিদের দাবি মেনে নেবে এটা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। বরং গতকালও তিনি সাহেবকে তীষণ একরোখা দেখেছিলেন আর আজ সকালে কুলিদের মুখচোখ দেখে তিনি নিশ্চিত ছিলেন এরা একটা তুরকালাম কাণ্ড করতে পারে। কিন্তু কী ব্যাপার ঘটল যে সাহেব ওদের দাবি মেনে নিল, যাতে কুলিদের জয় হয়ে গেল! এটাই তাঁর বেধগম্য হচ্ছে না। অন্য বাবুদের সঙ্গে কথা বললে অবশ্যই ব্যাপারটা জানা যেত। কিন্তু এরপর কী করে এই বাগানে থাকা যাবে কুলিরা তো বেপরোয়া হয়ে যাবে। একবার অধিকারের স্বাদ পেলে কি আর তাঁদের তোয়াক্কা করবে? এতদিন, সেই ছেলেবেলা থেকে এখানে এই স্বর্গছেঁড়ায় এই সম্মানের সঙ্গে তিনি বসবাস করছেন—আজ মনে হচ্ছে তাতে ফাটল ধরে গেল। ওদের দাবি ছিল, বাস করবার মতো ভালো কোয়ার্টস, রেশনের পূর্ণ পরিমাণ দেওয়া। চাকরির নিরাপত্তা এবং কারও ব্যক্তিগত কাজে কোনো প্রমিককে কাজে লাগানো চলবে না। সাহেব কী কী দাবি মেনে নিয়েছেন জানা নেই—কিন্তু এর পরে ওরাই চোখে রাঙাবে। ওর মনে হল সরিৎশেখর যে—আরামে চাকরি করি গিয়েছেন, তাঁর অনেক সময়ের কাঠার হতে হয়, কিন্তু এখন আর সেটা সংভব হবে না। দুপুর থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিল, যদিও এখনও অনেকদিন চাকরি বাগানে চাকরি পাওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু সেখানেও এই স্বর্গছেঁড়ার হাওয়া যে লাগবে না তা কে বলতে পারে? সারাজীবনে নিজস্ব সংস্কারের পরিমাণ বেশি নয়, তারপর অনিমেষের পড়াশুনা আছে। যদি কলকাতায় ভালো ফল করে তা হলে ওদের ডাক্তানি পড়াবার বাসনা আছে। এই একটি প্রফেসনে এই দেশে কারণ অর্থের অবাব হয় না। ডাক্তানির পড়াবার খরচ অনেক, তিনি জানেন। তাই শুভ অভিনবের পায়ে দোড়াছে ততদিন এইভাবে মুখ বুজে চাকরি করে যেতে হবে।

কেতে বসে তেমন কোনো কথা হয়নি ইবকেলে খবরের কাগজটা দিয়ে গেলে মহীতোষ সিগারেট ধরিয়ে বাইরের ঘরের সোফায় বসেছিলেন কাগজ—হাতে। অনিমেষ বেরতে যাচ্ছিল, তিনি ওকে ডাকলেন। কলকাতায় যাবার ব্যাপারে বাবার সঙ্গে এখন অবধি কোনো কথাই হয়নি। মনের মধ্যে একটা ধূকপুকুনি আছে—কোথায় গিয়ে উটবে, কীভাবে কলেজে গিয়ে তরতি হবে—কত টাকা লাগবে। নিজের থেকে মহীতোষের সঙ্গে আলোচনা করতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল। এখন তিনি ডাকতেই ও ঘুর্দাড়াল। মহীতোষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কবে যাওয়া যেন ঠিক হল?’

‘বাবার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, ‘বুধবার।’

‘টিকিট কাটা হয়েছে?’ মহীতোষ কাগজের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না।

অনিমেষের মনে হল এখন বাবার চেহারাটা যেন আমূল পালটে গেছে, দুপুরে কুলিদের আক্রমণের সময়কার চেহারাটা যেন উঁধাও হয়ে গেছে। কুব গঁষীর এবং চিত্তামগ্নি দেখাচ্ছে। ও বলল, ‘না। হলদিবাড়ি থেকে ফ্রম কোচ আসে সেটায় উঠব।’

‘আর—কেউ যাচ্ছে বস্তুবাক্স?’

‘কয়েকজন যাবে কলকাতায় পড়তে, তবে একসঙ্গে যাকে কি না জানি না।’

‘যেতে পারবে তো একা?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমি সঙ্গে গেলে ভালো হত, তা নিজেই যাও। কেউ দেখিয়ে দিয়ে শেখার চেয়ে নিজে ঠেকে শিখলে লাভ হয় বেশি। আমার এক বন্ধু আছে, বটবাজারের কাছে থাকে, তাকে লিখেছি তোমার কথা। সে সাহায্য করবে। তা ছাড়া তোমার ছেটকাকা এছ কলকাতায়। সে ব্যস্ত লোক—সময় পাবে কি না জানি না। আমাকে হঠাৎ চিটি দিয়েছে তামি পড়তে কলকাতায় গেলে যেন ওকে জানানো হয়। বুধবার রাতেনা হত্তে—উম্, তা হলে এখনই টেলিফোন করে দিতে হয় দেবত্বতকে। কোন কলেজে ভরতি হবে?’

‘জানি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে—’

‘হ্যাঁ, প্রথমে ওখানেই চেষ্টা করবে দেবত্বত, না হলে সেন্ট জেজিয়ার্স কলেজে পড়বে। সায়েশ

নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভরতি হবে, এটাই আমার ইচ্ছা।'

'সায়েস! অনিমেষ ঠোঁটটা কামড়াল, 'আমার ইচ্ছা আর্টস নিয়ে পড়ব। দাদুও চান ইংরেজিতে আমি যেন এম এ পাশ করি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখলেন মহীতোষ, 'না না, আর্টস নিয়ে পড়লে সারাজীবন কষ্ট করতে হবে। এখন সায়েস ছাড়া কদর নেই, তোমাকে ডাঙ্কারি পড়তে হবে।'

অনিমেষ যেন চোখে আতঙ্ক দেখল, 'কিন্তু আমার ফে আর্টস ভালো লাগে।'

হাত নেড়ে যেন মহীতোষ কথাটা উড়িয়ে দিলেন, 'শধৈর ভালো লাগে আর বেঁচে থাকা এক কথা নয়। আর্টস পড়ে এম এ পাশ করে তুমি কী করবে? ক্লিন-কলেজে মাস্টারিং কর টাকা পাবে মাঝেনে? সারাজীবন কষ্ট পাবে, মনে রেখো। তা ছাড়া আমার আর চাকরি করতে ভালো লাগ না। যদিন-না তুমি দাঁড়াছ ততদিন আমাকে করতে হবে। তাই ডাঙ্কারি পাশ করলে তোমার টাকার অভাব হবে না।'

অনিমেষ কোনরকমে ঢোক গিলে বলল, 'আমার অঙ্গ একদম ভালো লাগে না।'

মহীতোষ বললেন, 'চেষ্টা করলে সবকিছু সম্ভব। এই যে আমি, আমার কখনো ইচ্ছে ছিল না এই চা-বাগানের চাকরি করি। কিন্তু তোমার দাদুর পক্ষে আমাকে আর পড়ানো সম্ভব ছিল না তখন, আর আমাকে বাধ্য হয়ে এই চাকরি নিতে হল। তা চেষ্টা করে আমি তো অনেক বছর কাটিয়ে দিলাম। সেদিক দিয়ে তুমি তাগাবান।'

অনিমেষ বলল, 'যদি ভালো রেজাল্ট না হয়া'

এবাব মহীতোষ বড় বড় চোখে ছেলের দিকে তাকালেন, 'তা হলে বুবুর তুমি পড়াশুনায় যত্ন নাওনি। শোনো, তোমার মাঝ ভীষণ সাধ ছিল তোমাকে ডাঙ্কার করাব।'

এই ধরনের একটা বোধা ও ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনিমেষ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এ-ব্যাপারে যেন ওর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। বাবা এবং দাদু যা বলবেন তা-ই একে মেনে নিতে হবে! আর ওঁদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেই অমেঘ অঙ্গের মতো মায়ের নাম করে একটা বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেন মা যা বলে গেছেন, ও তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। অনিমেষের সন্দেহ, মা সত্যিই এইসব বলে গিয়েছেন কি না। ওর ছির বিশ্বাস, মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা হলে নিশ্চয়ই সে তাকে বুবিয়ে রাজি করাতে পারত। ও এখন কী করবে? যদি সে বাবাকে মুখের ওপর বলে দেয় যে সায়েস নিয়ে পড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তা হলে কি বাবা তার কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করে দেবেন? কী জানি! সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ও ঠিক করল, এ-ব্যাপারে দাদুর ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। বাবা নিশ্চয়ই দাদুর মুখের ওপর কোনো কথা বলতে পারবেন না। অতএব এখন চুপ করে থাকিও আলো।

মহীতোষ খবরের কাগজটা আবার তুলে নিলেন, যেন ও-ব্যাপারে যা বলার তা বলা হয়ে গেচে, 'আমি খৌজ নিয়ে তোমাকে মাসে একশো কুড়ি টাকা পাঠালেই ভালোভালো চলে অনিমেষ যাবে। দশ-বারো টাকার বেশি হাত্বরচ লাগা উচিত নয়। আর বুঝে ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবে না। কলকাতা হল এমন একটা জায়গা যেখানে একটু আলগা হলোই নষ্ট হয়ে যেতে বেশি সময় লাগে না। কলেজ ছাড়া হোটেলের বাইরে কোথাও যাবে না, ঔরঁ-কখনেই ইউনিয়ন বা পলিটিক্যাল পার্টির সম্প্রদে যাবে না। রাজনীতি একটি ছাত্রের জীবন যেভাবে বিশিষ্যে দেয় অন্যকিছু সেভাবে পারে না। যাহোক, আমি চাই তুমি মাথা উঁচু করে আমার সামনে ডাঙ্কার হয়ে এসে দাঁড়াও।'

এখন প্রায় সঙ্গে। আসাম রোডের গাছগুলোয় হাজার পাখির চিৎকার যেন রবিবারের হাটের চেহারা নিয়েছে। মাঝে-মাঝে এক-একটা গাঢ়ি হশ্যশ করে ছুটে যাচ্ছে। অনিমেষ শেষ সূর্যের রোদের আভা-মাখা কোয়ার্টারগুলোর দিকে তাকাল। এই ছবির মতো বাড়িগুলো ওপর বুকের ডেতের সেই ছেলেগুলো থেকে একই রকম জায়গায় আছে, শুধু সীতাদের বাড়িটা ছাড়া। ওই ঝিপ্পল, দুটো কলাগাছ-দ্রু তেক্ষণ সরিয়ে নিল অনিমেষ। এই নির্জন রাস্তার অজন্তু পাখির গলা শুনতে শুনতে ও হাঁটচিল। ওর সমস্ত শরীর এখন কেমন ভারী লাগছে। বাজারের সীমা আসার আগেই ও থমকে দাঁড়াল, ওর বুকের মধ্যে চিরকালের চেনা এই স্বর্গছেড়া তিল তিল করে যে-মোচড় দিছে সেটা অনুভব করতে এগিয়ে-আসা মানুষটার দিকে তাকাল। এই এত বছর পরেও ও রেতিয়াকে একই রকম দেখল। সেই যয়লা ছেড়া হাফপ্যান্ট, একটা নোংরা ফুলগুলো শার্ট, চুলগুলো রক্ষ, পা

ଦିଯେ ରାତ୍ରା ମେପେ ଏଗିଯେ ଆସଛେ । ଓର ବସନ୍ତେର ଛାପ-ମାରା ମୁଖଟାଯ ସେଇରକମ ଭୀରୁତ୍ତା ଏବଂ ଲେଣେ ଆହେ ।

ମୁଖୋମୁଖୀ ହତେଇ ଅନିମେଷ ରେତିଆର ଶାମମେ ଗିମେ ଦାଁଲାଳ । ପାଯେର ଶକ୍ତି ଯତ୍ ମୁଦୁଇ ହୋକ-ନା କେନ୍, ରେତିଆ ହଠାତ୍ କୁକଡ଼େ ଶେଳ, ତାରପର ଓର ଅଜ୍ଞ ଚୋଥ ଦୁଟୋ ଟତେ କରେ ସବ୍ କରେ କାନ ଖାଡ଼ା କରେ ଶକ୍ତି ଚିନିତେ ଚାଇଲ । ଅନିମେଷର ସେଇ ଶେଳାଟା ମନେ ପଡ଼ିଲ । ଓ ଏବାର ଗଲାଟା ଭାରୀ କରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଇ, ‘କାହା ଯାହାତିମ ରେ’ ।

সেইভাবে দাঁড়িয়ে রেতিয়া জবাব দিল, ‘ঘর।’

‘ମେହା ନାମ ବୋଲ ।’

ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉନ୍ଦେଇ ରେତିଆର ମୁଖ୍ଯଟା ଆକାଶେର ଦିକେ ଉଠେ ଗେଲ । ସେଇ ବସଣ୍ଡେ-ଖୌଡ଼ା ମୁଖ୍ଯଟା ସହମାହୁଚଳେ ହୟେ ଗିଯେ ଦୁଟୋ ଚୋଥ ଯେଣ ଠିକରେ ବେରିଯେ ଆସାନ୍ତେ ଚାଇଲ । ଅନିମେଷ ବୁକାତେ ପାରଲ ଓ ପ୍ରାଣପଣେ ଗଲାଯ ଝରଟା ମନେ କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରଛେ । କତ ବହର ଦେଖା ହୟନି ଅନିମେଷେ ସେଇ, ତା ଛାଡ଼ା ଗଲା ପାଲାଟେ ଦେ କଥା ବଲେଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ଅନିମେଷ ଏକଥିବ ହୟେ ଆର୍ଥନା କରାଛିଲ ଯେଣ ରେତିଆ ଓକେ ଚିନିତେ ପାରେ । ଆର ସେଇ ମୁହଁତେ ରେତିଆ ଓର ଲାଲ-ଛୋପ-ଧରା-ଦୀତ ବେର କରେ ଏକଗଲ ହାସଲ । ଯେଣ ଓର ଧୀଧୀଟା ମିଟେ ଗେହେ ଏମନ ଉଜ୍ଜିତେ ଓ ହାତ ବାଡ଼ିଯେ ଦିଲ, ‘ଅନି!—

নিজের নামটা রেতিয়ার গলায় শব্দে অস্তুত সুবে অনিমেষের সমন্ত শরীরে একটা কাংপুনি এসে পেল। ও চট করে রেতিয়ার বাড়ানো হাত দুটো ধরতেই বুকের গভীরে দ্রুত-হয়ে-ওঠা মোচড়টা বারবার করে দুচোখ থেকে কান্না হয়ে বারে পড়ল। ও কোনো কথা বলতে পারছিল না। রেতিয়া যেন এরকমটা আশা করেনি, ও অনিমেষের হাত ধরেই জিজ্ঞাসা করল, ‘আনি?’

ଏବାର ହତ୍ତଟା ଛାଡ଼ିଯେ ନିଲ ଅନିମେସ, ତାରପର ଦ୍ରୁତ ଚୋଖ ମୁହଁ ନିଜେକେ ସାମଳେ ନିତେ ନିତେ ବଲଳ,

‘क्या हया तुमहारा? रोता ह्याय काहे?’

কেন কানা এল? রেতিয়ার এই প্রশ্নটির জবাব ও সতীতই চট করে নিজেই ঝুঁজে পেল না। এই
স্বর্গছেড়া থেকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে এই বোধটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র বুক চেপে
ধরেছিল। তাঁরপর সীতাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ঝুকের মধ্যে কী যেন শুন হয়ে গিয়েছিল। রেতিয়ার
মুখে নিজের নামটা শুনতে পেয়েই ওর মধ্যে চট করে কানাটা এসে গেল। অনিমেষ বলল, 'এইসেই
রেতিয়া হাম কল্পকাতামে যাবেঁগো।'

ବ୍ୟେତିଆ ଯେନ ଚିନ୍ତିତ ହୁଲ, ‘ଉଡ଼ୋ ବହୁଂ ଦୟା-ଭଲପାଇ ସେ ଡି-ନା’

ଅନିଯୋଗ ଏକଥାର ଜ୍ଵାବ ଦିଲା ନା । ସେ ଜଳପାଇଣ୍ଡିଟେ ଧାରୁକ କିଂବା ଫଳକାତ୍ୟ-ସର୍ଗଛେଷ୍ଟାର ସଙ୍ଗେ ଧେ-ଦୂରତ୍ୱ ତୈରି ହେଁ ଶେଷେ ତା କୋନୋଦିନ କମାବେ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ଏହି ରେତିଆର ମତୋ କେଉ ଯଥନ ଏତ ବଚର ପରାଣ ତାର ଗଲା ମନେ ଝେଖେ ନାମ ଧରେ ଡେକେ ଓଠେ । ତଥବନ ମନ୍ତା କେମନ ହେଁ ଯାଏ ।

বাজারের দিকে যাবার ইচ্ছ ছিল ওৱ। কাল হয়তো দুপুরের আগেই ওকে চলে যেতে হবে। তাই আজ স্বর্গছেড়াৰ বাজার-এলাকায় ঘুৱে আসাৰ ইচ্ছ ছিল ওৱ। বিশ কিংবা বাপীৰ সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে নিচয়ই ভালো লাগত। কিন্তু এই সন্দে-হয়ে-যাওয়া সময়টা ওৱ মনে রেতিয়াৰ সঙ্গে হেঠো ওকে লাইন পোছে দিলেই বোধহয় ভালো লাগবে। এখন আৰ বছুদেৱ সঙ্গে আড়া দিতে ওৱ একটুও ইচ্ছ কৰলিব না। হঠাৎ ওৱ মনে হল, স্বর্গছেড়াৰ গাপলা মাটি মাঠ আংখাভাসা নদীৰ মতো রেতিয়া যেনে প্ৰকৃতিৰ একটা অক্ষ। ও রেতিয়াৰ হাত ধৰে রাত্তিৰ পাশ ধৰে হাঁটতে লাগল। কুমশ অক্কাৰ সমস্ত চৰাচৰ ছেয়ে যেতে লাগল। মাথার ওপৰ পাৰিৰা এখন গাছে-গাছে জায়গা পেয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ চপচাপ হেঠো অনিমেষ জিঞ্জুসা কৰল, ‘তম ক্যায়সা হ্যায় রেতিয়া?’

ରେତିଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ହୋଁ ଶେଳ କିଛୁଟା, ତାରପର ବଲାଳ, 'ଆଜ ହାମ କୁଛ ନେଇ ଥାଏ-ହାମକୋ
କୁଇ ଖାନେ ନେଇ ଦିଯା ।'

‘সে কী. কেন?’ অবাক হয়ে গেল অনিয়েষ।

ବୋର୍ଦ୍‌ରେ ରେତିଆ ଅକ୍ଷ ବଲେ କାଜ କରତେ ପାରେ ନା ଏବଂ ସର ବାପ ମା ଦାଦାର କାହେ ଥାକେ । ତା ହୁଲେ ତାରା ଓକେ ଖେତେ ଦେଖନି କେନ୍ତି ବିଶ୍ଵରୂପେ ରେତିଆ ବଲଲ, ‘ଆଜ ସୁବେଳେ ସବ ହରତାଳ ପରବ କିମ୍ବା । କଇ ଘରମେ ନେହି ହ୍ୟାଯ । ସାମନେ ସବ ହାତିଆ ପିକେ ବେଣ୍ଟ ହେ ଗିଯା ।’

‘বাজারে গিয়ে চা খাসনি?’

କେବେ ଦେଇନି ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ ନା ଅନିମେଷ, ଶୁଦ୍ଧ ପକେଟେ ହାତ ଢକିଯେ ବେଶକିଛୁ ଖୁଚରୋ ପରୁସା ବେରି

করে না শুনে রেতিয়ার হতের মুঠোয় ঘুঁজে দিল। রেতিয়া চমকে শিয়ে হাতটা ওপরে তুলতেই পয়সাগুলো আঙুলের ফাঁক গলে টুংটাঁক করে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। 'ঘাঃ, গির গিয়া পয়সা!' ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে রেতিয়া মাটিতে বসে পড়ে দুহাতে হাতড়ে পয়সা ঝুঁজতে লাগল। এখন এখানে ঘন অঙ্ককার। সাদাচোখে কিছুই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে-মাঝে ছুটে-যাওয়া এক-টকটো গাড়ি অঙ্ককারকে ছুড়ে ফেলে মুহূর্তের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। এইরকম একবালক আলোয় অনিমেষ দেখল অনেক দূরে রেতিয়ার নাগালের বাইরে একটা এক আনা পড়ে আছে। ও চট করে এগিয়ে শিয়ে সেটা তুলতেই জায়গাটা আবার অঙ্ককার হয়ে গেল। তীব্র আলোর পর অঙ্ককার আরও গাঢ়তর হয়। ছড়িয়ে-থাকা পয়সাগুলো ঝুঁজতে ওকে এখন হাতড়াতে হচ্ছে। অনিমেষ আবিকার করল, ওর সঙ্গে রেতিয়ার এই মুহূর্তে কোনো গার্থক নেই—দুজনেই এই মুহূর্তে অক্ষ।

ছোটমা বোধহয় আগে থেকেই বিছানাপত্র ঠিক করে রেখেছিলেন। মহীতোষের একটা পুরনো হোস্তল ছিল, সেটাই পরিকার করে বিছানাপত্র তুকিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। ঝাড়িকাকু সেটাকে মাথায় নিয়ে ওর সঙ্গে চলল। সকালে মহীতোষ তাঁর বক্স দেববত্তাবুর ঠিকানা-লেখা একটা চিঠি দিয়ে দিয়েছেন অনিমেষকে। টেলিফ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি অবশ্যই টেলেনে আসেন। প্রিয়তমাকে তিনি পরে জানাবেন, যদি ভরতি হতে অসুবিধে হয় তবেই মেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মহীতোষ ভাই—এর সাহায্য নেওয়া ঠিক পছন্দ করছেন না।

টাকাপঞ্চা ষষ্ঠ করে ওর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল। ছোটমা বারবার করে এ-ব্যাপারে সজাগ হতে বললেন ওকে। যাঁবার সময় যখন অনিমেষ ঝুঁদের প্রণাম করল, তখন, মহীতোষ অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'যখন যা দৰকার হবে আমাকে জোনিষ, সংকোচ করবে না।'

কুচবিহার থেকে আসা বাসে জিনিসপত্র তুলে ও যখন উঠতে যাচ্ছে হঠাৎই ঝাড়িকাকু হাউমাউ করে কেন্দে উঠল। এতক্ষণ ধরে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিল অনিমেষ, কিন্তু কান্না বড় হোয়াচে রোগ। তবু সে কোনোরকমে ঝাড়িকাকুকে বলল, 'এই, তুমি কাঁদছ কেন?'

সমস্ত বাসের লোক অবাক হয়ে দেখল, ঝাড়িকাকু কান্না শিলতে শিলতে বলল, 'আমি আর বেশিদিন বাঁচব না রে, তোকে আর আমি দেখতে পাব না—তুই ফিরে এসে দেখবি আমি নেই, মরে গেছি।'

দাঁড়াতে পারল না অনিমেষ, ঠোঁট বামড়ে দ্রুত বাসে উঠে পড়ল। বাসসুন্দর লোক এখন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঝাড়িকাকু সরে রাস্তার পাশে যেতেই বাসটা ছেড়ে দিল। দুহাতে নিজের গাল চেপে সেই বেঁটেখাটো প্রোঢ় মানুষটাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল সে। হঠাৎ ওর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল, সত্যি যদি তার ঝাড়িকাকুকে না দেখতে পায়ঃ চোখ বক্স করে ফেলল অনিমেষ।

হত্ত করে বাসটা ছুটে যাচ্ছে। সেই ইউক্যালিপটাস গাছগুলো—ওদের কোয়ার্টারগুলো, স্বর্গছেঁড়া-লেখা বাগানের বিরাট বৌর্জা মেন দোড়ে দোড়ে পেছনে চলে যেতে লাগল। ওদের বাড়ির বারান্দায় কি ছোটমা দাঁড়িয়েছিলেন? ঠিক বৃত্ততে পারল না অনিমেষ। সবুজ গালচের মতো চা-বাগানটা যেন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। দূরের স্ম্যার্টি-বাড়িটার ছাদ চোখে পড়ল। মহীতোষ বোধহয় এতক্ষণে সেখানে ফিরে শিয়ে কাজ করু করে দিয়েছেন। হঠাৎ এই মুহূর্তে অনিমেষের বাবার জন্য কষ্ট বোধ হল। ওর মনে হল ও যেন বাবাকে ঠিক বুঝতে পারিনি। কেমন একা একা হয়ে আছেন উনি, সেখানে অনিমেষ কেন, ছোটমাও কোনোদিন পৌছাতে পারেন।

মুঠো বক্স করার মতো একসময় স্বর্গছেঁড়া হারিয়ে গেল। আংরাভাসার পুল পেরিয়ে যেতেই অনিমেষ পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিল। ওকে এখন অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দূর। পেছনে এখন স্বর্গছেঁড়া চুপচাপ পড়ে থাক। সেই ছোটবেলার নদীটা এবং তার রঙিন মাছগুলো, সেই কুয়াশার অপস্থি গ্রন্থাগুরুর অঙ্ককারগুলো—তাঁরা এখনে ঘোরাফেরা করুক। নতুন দিনিমণি নেই, ভবানী পুরাণ যেখানে শিয়েছেন সেখানে কি এই স্বর্গছেঁড়ার মতো শাস্তি আছে? জানা নেই, কিন্তু সেই ঘামের গৰুমাখা স্নেহের স্পর্শটুকু তিনি নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে পারেননি। স্বর্গছেঁড়ার বাজার দিনদিন পালটে যাচ্ছে—জলপাইগুড়ি শহরটা যেন ক্রমশ স্বর্গছেঁড়াকে প্রাস করে নিষ্কে-নিক, এখন তার কিছুই এসে যায় না। তবু কেন যে রেতিয়ার এখনও বোকার মতো পায়ে মেপে এক কাপ চায়ের জন্য অতটা পং হেঁটে যায় আর অনেক বছর পরও তার গলা শুনে চট করে চিনে ফেলে। হ্যাতো একদিন আৱ পারবে

না। অনিমেষের খেয়াল হল এই পথ দিয়েই সীতা মাথায় মুক্ত পরে দুটো চোখ-চেয়ে দেখতে-দেখতে চলে গেছে।

॥ বারো ॥

স্বর্গহেঢ়ায় খবর শুনে সরিষ্ণেখৰ চিত্তিত হলেন। বুক সৰ্দারের ছেলে মাংঝা, যে নাকি জুলিয়েন নাম নিয়েছে, সেই কুলিদের খেপিয়ে তুলেছে এরকম একটা চিত্ত তিনি যেন শ্পষ্ট দেখলেন। এরকম কিছু হবে তা তিনি অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন, যখন বাগানের কুলিরা তাদের সভানদের বাবু-চাকরিতে ঢোকাবার জন্য আবাদার শুরু করেছিল। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি হ্রাসিতে পরিণত হবে এরকমটা অবশ্য ভাবেন। এরপর মহীতোমের পক্ষে সেখানে কতদিন নিশ্চিতে চাকরি করা সংব হবে? চা-বাগানের চাকরি ছাড়া ওর তো অন্য কোনো বিদ্যে জানা নেই যে বাইরের চাকরি পাবে! ভীষণ চিত্তিত হয়ে । ১. সরিষ্ণেখৰ। অনিমেষ অবশ্য দাদুর এই দুচিত্তার কারণ ঠিক বুঝতে পারছিল না। ও অনেকক্ষণ দাদুর সঙ্গে তর্ক করে গেল। কুলিরা তো কোনো অন্যায় করেনি। তারা যে-ঘরে থাকে সে-ঘর ওদের পোয়ালোর চেয়ে ভালো নয়। যেরেশন ওরা চাইছে তা তো বাঁচার জন্য যে-কোনো মানুষ আশা করতে পারে। আর কেউ যদি শিক্ষিত হয়, তা হলে তালো চাকরি আশা করতে পারে না? ওরাও তো ভারতের নাগরিক। সরিষ্ণেখৰ অবশ্য সরাসরি এর জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, ‘যে-কোনো সৃষ্টির সময় একদল কয়েকজনের প্রতি বিনোয় এবং অবৃগত যদি না হয়, তা হলে সৃষ্টি সুসম্পন্ন হতে পারে না। যখনই অধিকারে সবাই সমান শক্তি অর্জন করে, তখনই অসম্ভান আসে আর আসল কর্ম লক্ষ্যচূর্ণ হয়, বিশেষ করে আমাদের এই দেশের মানুষ যেহেতু নিরক্ষর তাই অধিকার তাদের মাথা ঘূরিয়ে দেয়।’ দাদুর কথা পুরোপুরি মানতে পারল না অনিমেষ। সরিষ্ণেখৰ প্রসঙ্গটা শেষ করলেন, ‘এখন তোমার বয়স কম। অভিজ্ঞতা হোক, চোখ চেয়ে জীবনটা দ্যাখো, নিজেই বুঝতে পারবে।’

পিতাপুত্রের মধ্যে সন্তোষজনক কথাবার্তা হয়েছে শুনে সরিষ্ণেখৰ ঝুশি হলেন। ঠিক এইরকমটাই চাইছিলেন তিনি। পিতামার আশীর্বাদ ছাড়া কোনো সন্তুন বড় হতে পারে না, এই কথাটা তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন, ‘তোমার মায়ের কাছ থেকে যখন তোমায় আমি চেনে এনেছিলুম তখন তুমি এই একটুখানি ছিলে। সেই থেকে তোমাকে বুকে আগলে এত বড় করেছি। এখন তুমি ভালোভাবে পাশ করেছ, কলকাতায় পড়তে যাচ্ছ, আমার দায়িত্ব শেষ। আমি তো কেয়ারটেকার হয়ে ছিলাম, কাজে ফাঁকি দিইনি কখনো।’

কোথেকে দুধ যোগাড় হল কে জানে, পিসিমা পায়েসের ব্যাপারে বিকেল থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জয়াদি নেই। এখন যে কী হয়েছে, জয়াদি প্রায়ই বাগের বাড়ি যাচ্ছেন। জয়াদির বর একা-একাই থাকেন। সুনীলদা মারা যাবার পর সেই যে তার বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, আর-কোনো নতুন ভাড়াটে আসেনি। শোনা যাচ্ছে সরকার এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। হয়তো তাতে দাদুর ভালোই হবে, কারন দাদু প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে সরকার তাকে কম ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু আবার নতুন ভাড়াটের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং ভাড়া ঠিক করা এবং তাতে যে-সময় যাবে সেটা ম্যানেজ করা-দাদুকে সাহায্য করার কোনো লোক যে এখনে নেই। দাদুর দিকে তাকালেই আজকাল বোঝা যায় যে বয়স তাকে চারপাশ তেকে কামড়ে ধৰেছে। ভীষণ কষ্ট হল অনিমেষের দাদুর জন্য।

বিকেল থেকেই জলপাইগুড়ি শহরে যিছিল বের হল। আগামীকাল সারা বাংলা জুড়ে যে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে, তা সফল করার জন্য আবেদন জানিয়ে যিছিলগুলো শহরের পথে-পথে ঘুরে বেড়তে লাগল। টাউন ক্লাবের সামনে হেটখাটো মিটিং হয়ে গেল। অনিমেষ বিকেলবেলায় বহুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছিল। অর্ক এবং মন্টু কলকাতায় পড়তে যাবে। ওরা যদি কাল ওর সঙ্গে যায় তো খুব ভালো হয়। দাদুর আর তর সহিল না, এ-সত্তাহে নাকি আর ভালো দিন নেই। এখন এসব ব্যাপার আর কেউ মানে? কিন্তু দাদু এমন বিশ্বাস নিয়ে বললেন যে মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

রায়কৃতপাড়ায় মন্টুদের বাড়ি। সেনিকে যাবার জন্য বেরিয়ে ও দেখল টাউন ক্লাবের সামনে বেশ জোরে বক্তৃতা চলছে। কৌতুহলী হয়ে সে রাস্তার একপাশে দাঁড়াল। যিনি বক্তৃতা করছেন, তাকে আর আগে দেখেনি সে, মাথায় টাক, খুব হাত নেড়ে কথা বলছেন, ‘আপনারা জানেন এই দেশের স্বাধীনতা এল কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে গেলাম। স্বাধীনতা কি কংগ্রেসের

ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে তা নিয়ে তারা যা ইচ্ছে করবে? যখন সাধারণ মানুষের মুখে তাত নেই, পরনে বস্তু নেই, যে-দেশের মানুষের গড় দৈনিক আয় মাত্র দুআনা সে-দেশের মন্ত্রীরা কোটিপতি হচ্ছেন, তাঁদের ছেলেরা বিদেশে পড়তে যাচ্ছে। কী করে সম্ভব হচ্ছে কারণ এই দেশ ঢালাজ্জে ওই কংগ্রেসিয়া নয়, তাঁদের প্রভু হয়ে মাত্র চার-পাঁচটা ফ্যামিলি। তাঁদের তুষ্ট করে তাঁদের টাকার পাহাড় আরও বাড়াতে কংগ্রেসিয়া আমাদের শরীর থেকে রজ শুষে নিছে, বিনিয়মে তারাও ছিটকেঠাঁটা পাচ্ছে। কংগ্রেসিয়া জানে ওই চার-পাঁচটা পরিবার যদি বিরুদ্ধ হয়, তা হলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে আর তাদের স্থান হবে ডাষ্টবিনে। তাই ওদের ঘাটানোর সাহস কংগ্রেসিদের নেই। আমরা নানা সময় এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে এসেছি। কিন্তু দেশের মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই সোনার দেশের মানুষ আজ রিক্ত নিঃশ্ব, তাঁদের পেটে ভাত নেই। আমাদের আগামীকালের হরতাল নেই। প্রতিবাদের অথব পদক্ষেপ। আমাদের স্পষ্ট দাবি, খাবার দাও, বস্তু দাও, বাঁচার মতো বাঁচতে দাও। বলুন আপনারা আমার সঙ্গে, খাবার দাও, বস্তু দাও-'।

বক্তা পরবর্তী পাদপুরণের জন্য নীরব হলে দেখা গেল মুষ্টিমেয় কষ্টে মাত্র আওয়াজ উঠল। কিন্তু এই ক্ষটিটা যেন ওরা এড়িয়ে যেতে চাইল, এমন ভঙ্গিতে পরবর্তী বক্তা তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। মোটামুটি একই কথা হাত নেড়ে প্রচণ্ড চিন্তারে তিনি যখন বলছিলেন, তখন পথচলতি জনতা বেশ মজা পাচ্ছিল। এইরকম সিরিয়স ব্যাপারকে হাস্যকর করে তোলার জন্য ভদ্রলোক নির্ঘাত দায়ী। অনিয়েতও দাঁড়াল না।

রাস্তার পাশে গাছগুলোতের, দেওয়ালে হরতালের পোস্টার পড়েছে। ধৰ্মধরা আর করলা নদীর মুখে যে-ব্রিজটা নিচু হয়ে কচুরিপানার ডগা ছুয়ে আছে, সেখানে দাঁড়াল সে। ধৰ্মধরার আসল নাম কি করলায় করলায় মিশছে যকন তখন এরকম নাম হওয়াই উচিত। কিন্তু ছেলেবেলো থেকে সে ধৰ্মধরা নাম ওনে আসছে। করলা যেরকম গভীর এবং গুরুতর ধৰ্মধরা তেমন না। এই ধৰ্মধরার থমকে-চলা জল কোনোরকমে গিয়ে পড়ছে করলায়, করলা সেই জলে স্নোতের টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তিতায়। তিতা তার বিবাট চেত-এ সেই জলকে মিশিয়ে ছুটে যাচ্ছে ব্রহ্মপত্র কিংবা সমুদ্রের দিকে। ধৰ্মধরার এলিয়ে-থাকা জলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শরীরে কেমন কাঁটা! দিয়ে উঠল। মানুষের জীবন ঠিক এইরকম, এই নদীর মতন। সে যখন স্বর্গছেড়া ছিল তখন সেই ইউক্যালিপটাস পাছ, চায়ের বাগান, মাঠ, তবানী মাটার আর নতুন-শেখা বনেমাত্রম ছাড়া কিছুই জানত না। তখন মাতার ওপর ওদের সমস্ত পরিবারটা ছিল, চারধাৰে যেন শপ্পের, আদুরের দেওয়াল তাকে আড়াল করে রেখেছিল। তারপর এই ধৰ্মধরার করলায় মিশে যাওয়ার মতো সে এল জলপাইগুড়িতে। এখানে নতুন স্যার, কংগ্রেস, বিমান কর, রঞ্জ আর সুনীললাল তার চারপাশের দেওয়ালটাকে যেন আন্তে-আন্তে সরিয়ে নিল। ইনকিলাব জিন্দাবাদ এবং সুনীললাল-ছেটমা আর এই বাবা-অনিয়েত মাথা নাড়ল, আর আগামীকাল সে ট্রেনে উঠবে, কলকাতায় যেতে হবে তাকে। ঠিক নদীর সমুদ্রে পড়ার মতন। কলকাতার মানুষ নাকি দয়ায়াহীন, কেউ কারাও বস্তু নয়। সেখানে চোর বদমাশ আর পশ্চিতেরা পাণাপাণি বাস করে, কিন্তু কে যে কী তা চিনে নেওয়া সহজ নয়। কলকাতার মানুষ শিক্ষিত হয় এবং উচ্ছেদে যাবার জন্য সাহায্য পায়। অদ্ভুত রহস্য নিয়ে এখন কলকাতা তার সামনে দুলছে, নদীর সামনে সমুদ্রের চেত-এর মতন। কলকাতা-বিষয়ক অনেক বই পড়েছে সে, না গিয়েও অনেকে রাস্তার নাম সে জানে। কলকাতা এখন তাকে টানছে, কিন্তু যে-স্বর্গছেড়াকে সে ছেড়ে এল, যে-জলপাইগুড়ি থেকে চলে যেতে হচ্ছে, তাকে আর এমনভাবে কখনো ফিরে পাবে না এই বোধ করণ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল অনিয়েতকে। এবার স্বর্গছেড়া গিয়ে সে একটা নগু সত্যের মুখোমুখি হয়ে গেল। দীর্ঘকাল মাটির সঙ্গে বসবাস না করলে শিকড় আলগা হয়ে যায়। ওখানকার নতুন ছেলেদের কাছে সে মেন বাইরের লোক বলে মনে হচ্ছিল। এই জলপাইগুড়িতেও তার একদিন এমন অনুভব হবে- অনিয়েত স্পষ্ট বুঝতে পারছিল।

ধৰ্মধরা-করলার সঙ্গের পাশ ধৈঃষ্মে তপুপিসিদের ক্ষুল। অনেকদিন তপুপিসিকে দেখেনি সে; তপুপিসি এখন কেমন আছে? তপুপিসিকে নিজের পাশের খবর দিয়ে আসার ইচ্ছেটা কোনোরকমে সামাল দিল সে। তার মুখোমুখি হতে হঠাৎ খুব সংকোচ হচ্ছিল ওর, অথচ সে তো আর অন্যায় করেনি। ছেটকাকার ব্যবহারের জন্য সে তো দায়ী নয়। তবু-। অনিয়েত হাসপাতাল-পাড়ার রাস্তায় পা বাড়ান্তদিকে ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টারের সামনে মৃত্যুদেহ রেখে একা একা সে চিৎকার করে কাঁদছে। অনিয়েত মুখ ফিরিয়ে নিল। কানু বড় সঙ্গীকৰণ-নিজেকে ছির রাখতে দেয় না।

দিনবাজারের পোষ্টাফিসের সামনে এসে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াল সে। বিরাট একটা মিছিল আসছে কংগ্রেসের। সামনে চরকার ছবিওয়ালা পতাকা-হাতে একটি বালক, পেছনে জলপাইগুড়ির সমস্ত বয়ক কংগ্রেসের। হরতালের বিরুদ্ধে শ্রেণান দিচ্ছেন তারা। অনেকের হাতেই পোষ্টার। অনিমেষ পড়ল, ‘নেতাজিকে দালাল বলে কারা-হরতাল ডেকেছে যারা’, ‘গড়ার আগেই ভঙ্গতে চায় কারা-হরতালের শরীক যারা’, ‘দেশকে বাঁচান-কমিউনিষ্ট দালালদের থেকে দ্রুর খাকুন’, ‘রক্ত দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতা-হঠকারীদের খেয়ারমতো হারাব না, হারাব না।’

মিছিলের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের পা শক হয়ে গেল। হরবিলাসবাবু। সম্পূর্ণ অশক্ত চেহারা নিয়ে সেই বৃক্ষ অন্য একজনকে অবলম্বন করে মাথা নিচু করে কোনোরকমে হেঁটে যাচ্ছেন। স্পষ্ট, যেন চোখ কান বৃক্ষ করলেও নিজের রক্তে সেই কথাগুলোকে অনিমেষ শুনতে পায়, ‘আমাদের সংগ্রাম শাস্তির জন্য, ভালোবাসার জন্য। আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। এখন সেই ব্রাক্ষযুহূর্তে, আমাদের জাতীয় পতাকা স্বাধীন ভারতের আকাশে মাথা উঁচু করে উড়বে। তাকে তুলে ধরছে আগামীকালের ভারতবর্ষের অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ।’ মুহূর্তেই অনিমেষ সেইসব ঘুলের পাপড়ি যা পতাকা থেকে খুলে পড়েছিল তার স্পর্শ সমস্ত শরীরে অনুভূত করল। বুকের ভেতরে কে যেন সারাঙ্গ চুপচাপ বসে বলে ঘুমোয়, আর হঠাৎ-হঠাৎ ঘুম বেঞ্চে এমন এক বায়না করতে থাকে যে তাকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। অনিমেষ দ্রুত পা ফেলে মিছিলের ভেতর চুকে পড়ল, তারপর হরবিলাসবাবুর পাশে গিয়ে তার অন্য হাত আঁকড়ে ধরল। বুদ্ধের চোখে আয় সাদা-হয়ে-আসা কাটের চশমা, তাঁর শরীর থেকে অনেক কিছু খুবলে খুবলে নিয়ে গিয়েছে, সোজা হয়ে ইটাতে তিনি পারেন না। হঠাৎ একজন-কেউ তাঁর হাত ধরেছে বুঝতে পেরে তিনি শরীর বেঁকিয়ে মুখ কাট করে তাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। চলতে চলতে অনিমেষ একবার অঙ্গিতে পড়ল। হরবিলাসবাবুকে সে চেনে কিছু তিনি তো তাকে মনে নাও রাখতে পারেন! মিছিলটা পোষ্টাফিসের সামনে দিয়ে রায়কতপাড়ার দিকে যাচ্ছে: হরবিলাসবাবুর সঙ্গী একজন তরঙ্গ, অনিমেষকে হাত ধরতে দেখে হেসে বলল, ‘দাদু ছাড়ছিল না, তাই নিয়ে এলাম।’

চলতে চলতে হরবিলাসবাবু কথা বললেন, ফ্যাসফেসে গলার শব্দ স্পষ্ট ‘উচ্চারণ হয় না, ‘তুমি কে বাবা? কী নাম?’

তকনো কাঠির মতো হাত ধরে অনিমেষ বলল, ‘আমার নাম অনিমেষ। আপনার এইরকম চেহারা হল কী করে?’

‘রোগ বাবা, কালব্যাধি। এই মরি কি সেই মরি, তবু মরি না। তা শুলাম-কংগ্রেস একটা ভালো কাজ করছে-দেশগড়ার কাজে সবাইকে ডাকছে, তাই চলে এলাম। হরতাল কার বিরুদ্ধে করছিস? তাই হয়ে ভাইকে ছুরি মারিবি? অবিশ্য কংগ্রেসও আমাকে আর ডাকে না, ঘাটের মড়াকে কে পছন্দ করে?’

কথা বলতে বলতে হাঁফ ধরে যাচ্ছিল এবং নিজের শরীরটাকে ঠিক বুঝতে পারেননি, হরবিলাসবাবু সহসা দাঢ়িয়ে পড়লেন। অনিমেষ দেখল তাঁর বুক জোরে ওঠানামা করছে, চোখ দুটো বড় হয়ে উঠছে। ও খুব ঘাবড়ে গিয়ে হরবিলাসবাবুর সঙ্গীকে বলল, ‘উনি বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, চলুন ওই বারান্দায় ওঁকে একটু বসিয়ে দিই।’

মিছিলের লোকজন ওদের মধ্যে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল। কেউ-কেউ কৌতুহলী চোখে, কেউ শুধুমাত্র জিভ দিয়ে একটা সম্মতির শব্দ বাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। একজন বলল, ‘এই শরীর নিয়ে বামেলা বাড়াবার জন্য আসার কী বাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। একজন বলল, ‘এই শরীর নিয়ে বামেলা বাড়াবার জন্য আসার কী দরকার ছিল! হরবিলাসবাবুর সঙ্গীও খুব বিরক্ত হয়ে পড়ল, ‘বললাম পারবেন না-হল তো। কবে কী করেছেন এখনও সেইসব জাবর কাটা!’

ওরা দুজনে সন্তুষ্ট ও উত্তোলন পাশে এক বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসাল। মিছিলের আর-কোনো মানুষ ওদের সঙ্গে এল না। জেলখানার পাশ দিয়ে মিছিল এবার এগিয়েছে উমাগতি বিদ্যামন্দিরের দিকে। অনিমেষ দেখল মিছিলের শ্রেণাশৈশ্বরি নিশীথাবুরু শ্রেণান দিতে-দিতে হেঁটে যাচ্ছেন। ওর মুখ সামনের দিকে, অনিমেষদের লক্ষ করলেন না। হঠাৎ অনিমেষের মনে হল, নিশীথাবুরুকে খুব বয়ক মনে হচ্ছে। বন্দরের পাঞ্জাবি এবং ধূতিপুরা নিশীথাবুরুর শরীরটা কেমন যেন বৃড়িয়ে গিয়েছে। হরবিলাসবাবুর পক্ষে শুয়ে পড়লেই ভালো হত, তবু খনিকুক্ষণ বসে হাঁপের টানটা কমল। এক হাতে চশমাটা খুলে অন্য হাতের আঙুলে চোখের কোল মুছলেন তিনি। অনিমেষ জিজামা করল, ‘এমন বোধ

করছেন আপনি?

মাথা নাড়লেন হরবিলাসবাবু, 'তাপো।'

কিছু বলা উচিত তাই অনিমেষ বলল, 'এই শরীর নিয়ে আপনার আসা ঠিক হয়নি।'

কেমন বিষ্ণুল মুখ তুলে হরবিলাসবাবু তাকে দেখলেন, 'এখন আর ঠিক-বেঠিক জ্ঞান থাকে না। এই খাই, পরমুহূর্তে মনে হয় থাইনি। এই আমি ইংরেজের সঙ্গে লড়েছি, মাঝে-মাঝে বিশ্বাসই হয় না। শরীর পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মরে যাওয়া উচিত।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি আর কথা বলবেন না। বরং একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যান।'

হরবিলাসবাবুর সঙ্গী বোধহয় ইংরেকম কিছু ভাবছিল, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আপনারা বসুন, আমি একটা রিকশা ডেকে আনি।' বোধহয় হাত নেড়ে বারণ করতে যাচ্ছিলেন হরবিলাসবাবু, কিন্তু সে তা না মনে পোষ্টঅফিসের দিকে এগিয়ে গেল।

এবার যেন হরবিলাসবাবুর খেয়াল হল, 'তোমাকে তো আগে দেখিনি বাবা, কী নাম?' অনিমেষ খুব অবাক হয়ে গেল। এই খালিক আগে সে ওকে নিজের নাম বলেছে, অথচ এই মুহূর্তে তিনি সেটা তুলে গিয়েছেন। ও আবার নাম বলল। 'তুমি আমাকে চেনে?' খেয়াল করতে না পেরে হরবিলাসবাবু বললেন।

'হ্যা, আপনি একসময় এই জেলার অন্যতম কংগ্রেসকর্মী ছিলেন, কতবার জেল খেটেছেন। সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্টের কথা আপনার মনে আছে?' অনিমেষের গায়ে হঠাতে কাঁটা ফুটে উঠল। ও উদ্ঘৃত হয়ে বৃক্ষের মুখের দিকে তাকাল।

হরবিলাসবাবু যেন তারিখটা নিয়ে কয়েকবার ভাবলেন, ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ও-দিনটায় তো আমরা স্বাধীন হলাম।'

'সেদিন আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? খুব ভোরবেলায়?'

আবার খালিক জিঞ্চা করে ঘাড় নাড়লেন হরবিলাসবাবু, 'মনে পড়ছে না তাই। আজকাল সব কেমন শুলিয়ে যায়। অথচ এই তো সেদিনের কথা। আজ্ঞা, সেবার সোদপুরে—।'

ওকে ধারিয়ে দিল অনিমেষ, 'না। আপনি স্বর্গহেঢ়োয় গিয়েছিলেন। সেখানে আপনার উপস্থিতিতে প্রথম জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল।'

আচমকা যেন মনে পড়ে গেল বৃক্ষের, হুঁ হুঁ। সেই প্রথম পতাকা উঠল মাথা উঁচু করে। ওরা ফুল বেঁধে দিয়েছিল। কত ফুল পড়ল আকাশ থেকে, শৰ্খ বাজাল যেয়েরা। মনে পড়ছে, মনে পড়ছে। তুমি সেখানে ছিলে।'

অনিমেষ খুব আস্তে বলল, 'আপনি আমাকে পতাকা তুলতে ডেকেছিলেন, আমি প্রথম সেই পতাকা তুলেছিলাম।'

ওর দিকে উদ্ঘৃত-চোখে কিছুক্ষণ তাকয়ে থেকে হরবিলাসবাবু হঠাতে দুটো শুকনো হাত বাড়িয়ে ওর মুখ চেপে ধরলেন অঙ্গুলির মতো। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'মনে রাখা বড় শক্ত। আমি মনে রাখতে পারি না, আমি মনে শোষি, তুমি মনে রেখেছ-তোমার দায়িত্ব অনেক। দান্ত, তোকে বড় হিংসে হচ্ছে বে!'

ঠিক এই সময়ে রিকশা নিয়ে ছেলেটি ফিরে এল, 'আসুন।'

দুজনে ধোাখির করে হরবিলাসবাবুকে রিকশায় তুলে দিল। অনিমেষ লক্ষ করছিল যে তিনি ওর মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না। অনিমেষের মনে হল, তিনি ওর বুকের ভেতরের দেখতে পাচ্ছেন। ও বুকে পড়ে তাঁকে প্রণাম করল। হরবিলাসবাবু 'জড়সংড় হয়ে রিকশায় বসেছিলেন, বোধহয় ইচ্ছে থাকা সঙ্গেও শরীর নাড়তে পারলেন না। সঙ্গী ছেলেটি নিচে দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'আপনি একা যেতে পারবেন।'

অনিমেষ বলল, 'ওকে একা ছাড়া কি ঠিক হবে?'

ছেলেটি বেজারমুখে বলল 'আমার কাছে পয়সা নেই, রিকশাভাড়া আপনার কাছে আছে?' ভীষণ বিরক্ত হয়ে পড়লেন হরবিলাসবাবু, আড়চোখে অনিমেষ সেটা দেখতে পেল। ও চট করে পকেটে হাত দিয়ে দুটো আধুলি খুঁজে পেল। স্বর্গহেঢ়া থেকে ফিরে ওর কাছে কিছু পয়সা এসেছে। অনিমেষ চট করে সেটা ছেলেটির হাতে পাঁজে দিতে সে দ্বিরুক্ষ না করে নিয়ে নিল।

রিকশাটা চলে গেলে অনিমেষ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। কোথাও যেন একটা খুশির ঘরনা মুখ বুজে বসে ছিল, হঠাতে সামান্য ফাঁক পেয়ে সেটা তিরতির করে ওর সমস্ত খুব ভাসিয়ে

দিছে। হরবিলাসবাবুর জন্য সামান্য কিছু করতে পারায় ওর নিজেকে খুব মূল্যবান বলে মনে হতে লাগল।

মিছিলটা তখন হারিয়ে গিয়েছে। অন্যমনশ্ব হয়ে সে মন্টুদের বাড়ির দিকে হাঁটাচ্ছিল। মন্টুদের বাড়ি উমাগতি বিদ্যামন্দিরের পাশে। মটুর মাকে অনিমেষের খুব ভালো লাগে। মন্টুর বাবা অসুস্থ হয়ে আছেন অনেক দিন, তাই সংসারের হাল ধরে আছেন মাসিমা। এখানকার একটা বাচ্চাদের খুলে তিনি পড়ান, প্রচুর খাটকে পারেন এবং যখনই দেখা হয় এমন মিষ্টি করে হাসেন ভালো না লেগে পারা যায় না। মন্টুদের বাড়ির সামনে এসে অনিমেষ বুরাতে পারল মিছিল ভেঙে গেছে খুলের মাঠে পৌছে। কারণ কন্দুরপরা মানুষগুলো গল্প করতে করতে ফিরে যাচ্ছেন। রিকশাওয়ালারা যেন মেলা বসেছে এমন ভঙ্গিতে হৰ্ম বাজাচ্ছে। টিনের দরজা ঠেলে উঠানে চুকে পড়ল অনিমেষ। বিরাট কঁঠালগাছের সামনে মন্টুদের টিনের চালওয়ালা বাড়ি। অনিমেষ দেখল মাসিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে মিষ্টি খুব হাসিতে ভরে শেল, ‘পাশ করে তোর পিঠে ডানা গজিয়েছে তনলাম, আমাকে প্রণাম করার সময় পাঞ্চিস না!’

কথার ধরন এমন যে না হেসে পারা যায় না। অনিমেষ প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করল। মাসিমা চিরুকে হাত দিয়ে চুম্ব খেলেন, ‘তারপর, এখন তো তোর সব কলকাতার বাবু হতে চললি! আমাদের কথা মনে থাকবে তো?’

‘কেন মনে থাকবে না, বাঃ!’ অনিমেষ প্রতিবাদ করল।

‘বৈস গিয়ে ঘরে, আমি সক্ষেত্র দিয়ে আসি।’ মাসিমা বললেন।

‘মন্টু কোথায় মাসিমা?’ অনিমেষ চারধারে নজর বোলাল। তার গলা শুনলে মন্টু নিশ্চয়ই বাইরে বেরিয়ে আসত।

মাসিমা বললেন, ‘ও আজ সকালে শিলিঙ্গড়ি শেল আমার ছেটদার কাছে। তোর সঙ্গে রেজাল্ট বের হবার পর আর দেখা হয়নি।’

মন্টু বাড়িতে নেই শুনে অনিমেষ হতাশ হল, ‘না। ও কবে যাবে কলকাতায়?’

‘ওই তো হয়েছে মুশকিল। আমার ছেটদার শালার বাড়ি বেহালায়। বউদির ইচ্ছে ও সেখানে থেকে পড়াশুনা করুক। তা এত আগে থেকে গিয়ে কী হবে? মন্টু তাই বউদিকে মার্কশিট দিতে গিয়েছে, ভরতি-টরতি হয়ে গেলেও যাবে। তা তুই কবে যাচ্ছিস রে?’ মাসিমা যেতে-যেতে শূরে দাঁড়ালেন।

‘আগামীকাল।’ অনিমেষ বলল।

‘ওয়া, তাই নাকি! কোথায় উঠবিঃ কার সঙ্গে যাবিঃ?’ মাসিমা আবার এগিয়ে এলেন। যেন এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াটা ওর ধারণায় ছিল না।

‘কার সঙ্গে আবার, একাই যাব! আমি কি ছেট আছি নাকি? ওখানে বাবার এক বক্স আছেন, তাঁর বাড়িতে উঠে হোটেল ঠিক হলে চলে যাব।’ খুব গভীর গলায় অনিমেষ জবাব দিল।

‘সে কী! তোকে বাড়ি থেকে একা ছাড়বে? আর তা ছাড়া কাল হরতাল, কলকাতায় যদি কোনো বিপদ-আপদ হয়? আমার কিন্তু ভালো লাগছে না।’ মাসিমাকে সত্যি সত্যি খুব চিন্তিত দেখাল।

অনিমেষ জোর করে হাসল, ‘কিছু হবে না।’ কিন্তু মনেমনে ও হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ল। কলকাতায় যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে তত যেন একটা অনিচ্ছিত এবং অজন্ম জগতে পা বাড়াবার উভেজনা বুকের মধ্যে ড্রাম বাজাচ্ছে। ও লক্ষ করল এখন ওর হাতের চেটো ঘামছে। কিন্তু খুব গভীর হয়ে সে এই দুর্বলতাকে ঢেকে রাখতে চাইল।

মাসিমা আর সঙ্গে দিতে গেলেন না। যদিও এখনও শেষ বিকলের আলো কোনোরকমে নেতৃত্বে পড়ে আছে আকাশটায়, তবু সঙ্গে বলা যায় না। তবে যে-কোনো মুহূর্তেই রাত নেমে আসতে পড়ে আছে আকাশটায়, তবু সঙ্গে বলা যায় না। তবে যে-কোনো মুহূর্তেই রাত নেমে আসতে পারে। আজ অবশ্য ছাঁটার মধ্যে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। কাল যখন কলকাতায় যাবার জন্য জলপাইগুড়ি ছাড়তেই হবে তখন আজ নিশ্চয়ই দেরি করে গেলে দাদু কিছু মনে করবেন না। এর মধ্যেই ওর নিজেকে বেশ বড় বড় বলে মনে হচ্ছে। এখন ঠোটের ওপর নরম সিঙ্গি চুল বেরিয়ে পৌঁফের আকৃতি নিয়ে নিয়েছে। সে-তুলনায় গালে দাড়ি কম, চিবুকে অবশ্য বেশকিছু বড় হয়েছে।

এখন পর্যন্ত নিয়মিত দাড়ি কামানো অভ্যাস করেনি। একবার পেসিলে ড্রেড চুকিয়ে টেনেছিল, কেমন অস্বস্তি হয়। কলেজে না ভরতি হলে দাড়ি কামাবে না ঠিক করেছিল অনিমেষ। একটা প্রেটে

କିଛୁ ପାଟିସାପଟା ନିଯେ ମାସିମା ବେରିଯେ ଏଲେନ, 'ବୁଝୁ ନେଇ ବଲେ ପାଲାବାର ମତଳବ କରିଛିସ ବୁଝିତେ ପାଞ୍ଚି,
ଏଟା ସେଇଁ ଯା ।'

'ଏଥିନ ପାଟିସାପଟା' ଅନିମେଷେର ଖୁବ ଭାଲୋ ଲାଗଇ ।

'ସାରାଦିନ ବସେ ଛିଲାମ, ଘରେ ଫେଲିଲାମ । ବଡ଼ ହେଲେଟା ଖୁବ ଭାଲୋବାସେ ।' ମାସିମା ଓକେ ଶାମନେ
ବସିଯେ ଓତିଲୋ ଖାଓୟାଲେନ ।

ସଜ୍ଜା ହେଲେ ଗେଛେ । ଟିନେର ଦରଙ୍ଗା ଖୁଲେ ବେଳତେ ବେଳତେ ଓ ମାସିମାର ଶୀଘ୍ର ବାଜାନୋର
ଆଓଯାଇ ପେଲ । ତିନିବାରେର ଆଓଯାଜଟା ଶେଷ ହେତେ ଓ ହାଟା 'ଶୁରୁ କରଲ । ଉମାଗତି ବିଲ୍ୟାମନ୍ଦିରେର ମାଟେ
ଏଥିନି କିଛୁ ଜଟଲା ଆହେ । ଯିଛିଲେର କିଛୁ ଲୋକ ଏଥିନି ଗଲୁ କରଇ ଓଥାନେ । ଦୂର ଥେକେ ଆର-ଏକଟା
ଛେଟ ଦଲ ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଧନି ଦିତେ ଦିତେ ଏଗିଯେ ଆସିଛେ । ଆମାଗାକାଲେର ହରତାଲେର ସମ୍ପଦେ
ଓଦେର ଝୋଗାନ କଂଖ୍ୟେସିଦେର ଦେପେ ଜୋରଦାର ହଲ । ଅନିମେଷ ଖୁବ ଆଶଙ୍କା କରାଇଲ ଏବାର ହୟତୋ
ମୁଖୋମୁଖି ଏକଟା ସଂଘର୍ଷ ବେଧେ ଯାବେ । କିନ୍ତୁ କଂଖ୍ୟେସିରା ଚୁପାଚାପ ଓଦେର ଚଲେ-ଯାଓୟା ଦେବଲ । ଓରାଓ ଖୁବ
ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଏଦେର ଅବଜ୍ଞା କରେଇ ହେଠେ ଗେଲ । ଅନିମେଷ ଫେରାର ଜଣ୍ଯ ପା ବାଡାତେ ଯାଇଁ ଏମନ ସମୟ
ପେଛନ ଥେକେ ଓର ନାମ ଧରେ କେତେ ଓକେ ଡେକେ ଉଠିଲ । ପେଛନେର ମାଟେର ଅନ୍ଧକାର ଥେକେ ଏକଜ୍ଞ ମାନୁଷକେ
ଏଗିଯେ ଆସିତେ ଦେବଲ ସେ । ବାନ୍ତର ଆଲୋ ମୁଖେ ପଡ଼ିଲେଇ ଓ ନିଶୀଥିବାବୁକେ ଚିନିତେ ପାରଲ । ଓକେ ଦେଖେ
ଅନିମେଷ ଖୁବ ଅସ୍ଵତ୍ତିତ ପଡ଼ିଲ । ଇଦାନୀଂ ନିଶୀଥିବାବୁର ସଙ୍ଗେ ଓର ତେମନ ଯୋଗଯୋଗ ନେଇ । ଓର ହୋଟେଲେର
ଘରେ ଆଗେର ମତୋ ନିୟମିତ ଯାଓୟା ଓ ବୁଝ କରେଇ ସେଇ ବଲ୍ୟାର ପର ଥେକେଇ । କୁଳେ ଯତନିନ ଛିଲ
ତତନିନ ମୁଖୋମୁଖି ହଲେ କଥା ବଲେଇ, କିନ୍ତୁ ଆଗେର ମତୋ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଯାଇନି । ଫିନିନାଲ ଇଯାର, ପଢ଼ାନୋର
ଚାପ କୁବ ଏରକମ ଭାନ ଦେଖିଯେ ଓ ସରେ ଥେକେଇ । କିନ୍ତୁ ନିଶୀଥିବାବୁ ଓର ମନେର କଥା ବୁଝିତେ
ପେରେଛେ-ଏହି ଧରନେର ଏକଟା କଥା ଏକଦିନ ବଲେଇ ଛିଲେ ।

'କୀ ବ୍ୟାପାର ଭାଲୋ ରେଜାନ୍ଟ କରେଇ ଅଧିକ ଦେବେ କରିବା ଆସନି ଯେ?' ନିଶୀଥିବାବୁ ଓର ପାଶେ ଏସେ
ଦାଢ଼ାଲେନ ।

ଅନିମେଷ ପାଶାପାଶି ହାଟିତେ ହାଟିତେ ବଲଲ, 'ଆମି ଏଖାନେ ଛିଲାମ ନା, ଶର୍ଗହେଡାଯ ଶିଯେଛିଲାମ ।'

'ତା କୀ ଠିକ ହଲ, ଏଖାନେ ପଡ଼ିବେ, ନା କଲକାତାଯ ଯାବେ?'

ନିଶୀଥିବାବୁର ମୁଖେର ଏକଟା ପାଶ ଦେଖିତେ ପାଞ୍ଜିଲ ସେ, ଖୁବ ସାଭାବିକ ... ଯା କଥା ବଲିଛିଲେନ ତିନି ।
ଅନିମେଷ ବଲଲ, 'କଲକାତାଯ ଯାବ, କାଲ ଯାଓୟା ଠିକ ହୟାଇଁ ।'

'ଖୁବ ଭାଲୋ । ଓଖାନେ ନା ଗେଲେ ଏହି ସମୟକେ, ଏହି ଦେଶକେ ଜାନା ଯାଇ ନା । କୀ ନିଜ, ସାଯେଳ ନା
ଆର୍ଟ୍ସା?'

ନିଶୀଥିବାବୁର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଓନେ ଅନିମେଷେର ଆଚମକା ବାବାର ମୁଖ ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲ । ଇସ, ଏକଦମ ତୁଲେ
ଶିଯେଛିଲ ସେ । ବାବାର ପ୍ରକାର ମେ ଯେ ମେନି ନିତେ ପାରଇଁ ନା ଏବଂ ଦାଦୁକେ ଓର ସମ୍ପଦେ ବାଜି କରିବା
ହବେ ଏକଥାଟା ଏକଦମ ବେଯାଲ ଛିଲ ନା । ଭାଗ୍ୟସ ନିଶୀଥିବାବୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ନା ହେଲ ପରେ ମୁଖକିଲେ
ପଡ଼ିଲେ ହତ । ଦାଦୁର ସଙ୍ଗେ ଯାବାର ଆଗେ କଥା ବଲିବା ହେବେ । ନିଶୀଥିବାବୁକେ ଓ ଜବାବ ଦିଲ, 'ଆର୍ଟ୍ସ ନେବେ ।'

ମାଥା ନାଡିଲେନ ତିନି, 'ଆମି ଏକରମଟାଇ ଭେବେଛିଲାମ । ତା ଓଖାନେ କୋଥାଯ ଥାକବେ? ତୋମାର କାକା
ବୋଧହୃ ଏଥିନ କଲକାତାଯ ଆହେନ୍ ।'

ଅନିମେଷ ବଲଲ, 'ନା, ଆମି ହୋଟେଲେ ଥାକବ । ପ୍ରେସିଡେଲ୍ କଲେଜେ ତୋ ହୋଟେଲ ଆହେ ।'

'ହ୍ୟା, ଇତେବେଳେ ହୋଟେଲ ।' ତାରପର ଦୁଜନେ ଅନେକକଣ ଚୁପାଚାପ ହେଲେ ଏଲ । ଜେଲଖାନା ପେରିଯେ
ପୋଟାଫିଲ୍ସିରେ ସାମନେ ହଠାତ ନିଶୀଥିବାବୁ ଯେନ ନିଜେର ମନେଇ ବଲେ ଉଠିଲେନ, 'କାଲ ହରତାଲ ।'

ଅନିମେଷ ବଲଲ, 'ହ୍ୟା, ସଙ୍କେ ଛଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।'

ନିଶୀଥିବାବୁ ବଲିଲେ, 'ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନଯ । କଥା ହଲ ହରତାଲ ଆଦୌ ହବେ କି ନା । କଲକାତାର କଥା
ଆନି ନା, ଓଖାନକାର ମାନୁଷ ହୁଗେ, ଏଖାନେ ଇଲେକ୍ଷନେର ଯା ରେଜାନ୍ଟ ତାତେ ତୋ ଏଖାନେ ଓଦେର ଡାକେ
କେଉ ସାଡା ଦେବେ ନା । ତୁ ମୀ କୀ ବଲ ।'

ଅନିମେଷ ସହସା ଜବାବ ଦିଲ ନା । ହରତାଲ ହବେ ନା ବଲିଲେ ନିଶୀଥିବାବୁ ନିଶ୍ଚଯିତା ଖୁଶି ହବେନ । କିନ୍ତୁ
ଓ କି ସତି ଜାନେ ଯେ ହରତାଲ ହବେ ନା? ନିଶୀଥିବାବୁ ଆବାର ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, 'ତୁ ମୀ କଥା ବଲଛ ନା ଯେ'

'ମାନେ ଠିକ ବଲା ଯାଇ ନା । କମିଉନିଟ୍ରୋ ସେଇଥାରେ ବେକଥା ବଲଛେ ତା ତୋ ଏକଦମ ମିଥ୍ୟେ ନଯ । ସବ ମାନୁଷ
ତୋ ସମାନ ଖେତେ ପାଇ ନା, ଜାମାକାପଡ଼ ପାଇ ନା । ଆର ଜିନିସପତ୍ରେ ଦାମ ଯା ବେଢେ ଗେଛେ, ସବାଇ ତୋ
କିନିତେ ପାରେ ନା । ସରକାର ଥେକେ ତେମନ କୋନୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା-'

ଅନିମେଷକେ ଥାରିଯେ ଦିଲେନ ନିଶୀଥିବାବୁ, 'ବେଶ, ବେଶ! ଆମାଦେର ଏହି ରାନ୍ଟ୍ରେ ବସିମ କତ? ଏଥିନି

আমরা বালক। এই কথ বছরে রাতাতি ইংরেজদের ছিবড়ে-করে-যাওয়া দেশটাকে বড়লোক করে দেওয়া যায়? এটা ম্যাজিক নাকি? তার জন্য সময় লাগবে না! নিঃস্ব অবস্থা থেকে তিল তিল করে গড়তে হবে নাঃ কমিউনিটদের পক্ষে নেই নেই করে মানুষকে খেপিয়ে তোলা সহজ, তাতে কোনো দায়িত্ব নেই। সাহায্য নয়-শক্তিই ওদের একমাত্র বেঁচে থাকার অবস্থন।'

অনিমেষ এ-ধরনের কথা এর আগেও শনেছে, তাই বলল, 'কিন্তু গরিবদের কিছু লাভ না হলেও বড়লোকরা আরও বড়লোক হচ্ছে। কংগ্রেস নেতাদের নাকি প্রচুর টাকা হচ্ছে।' ও বিরাম করের নামটা বলতে শিয়েও চেপে গেল।

'হতে পারে। তবে ব্যক্তিক্রম কি নিয়ম? এই আমি, কলকাতা ছেড়ে চলে এলাম এখানে, কংগ্রেসকে ভালোবেসে ওর জন্য কাজ করছি, কে আমাকে টাকা দিয়েছে? কতটা বড়লোক কংগ্রেসকে বুর্জীয়াদের পার্টি বলে ওরাঃ দেশের জন্য কাজ করছি এটাই আমার আনন্দ-ওরা যদি সন্দেহ করে করুক। নিন্দে করে বা সন্দেহ করে কেউ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।'

'কিন্তু কমিউনিস্টরা যে সমান অধিকারের কথা বলে—', অনিমেষ হঠাতে থেমে গেল। ও বুবাতে পারছিল শুধু শোনা কথার ওপর একটা দলের যুক্তিগুলো বলা যায় না।

নিশীথবাবু হঠাতে গলা খুলে হাসলেন, তারপর কোনোরকমে স্টোকে সামলে বললেন, 'অনিমেষ, তোমাকে একটা কথা বলি। আমাদের তেতিশ কোটি দেবতার দেশে কখনো কেবলো ইজম চলতে পারে না।' কমিউনিস্টরা এখন যেসব বড় বড় কথা বলছে সেগুলো বলার জনাই। যদি ওরা ক্ষমতা প্রাপ্ত তা হলে আমরা যা করছি ঠিক তা-ই করবে। তখন যদি কেউ হ্রতাল ডাকে, জোর করে তা ভাঙতে চাইবে। ক্ষমতায় বসলে সব মাথায় উঠে যাবে—একথা আমি তোমায় লিখে দিতে পারি—তখন আমার কথা বেরুবে না।'

অনিমেষ ঢট করে জবাৰ দিতে পারল না। কী হবে না-হবে তা সে বলবে কী করে? নিশীথবাবুর নিষিয়ই তার থেকে অভিজ্ঞতা বেশি। অবশ্য এটা ঠিক যে নিশীথবাবুকে চিরকাল এরকমই দেখে এসেছে, বড়লোক হলে অবশ্যই ওরা দের পেত। কিন্তু শুধু বিরামবাবুর বাড়িতে যাওয়া-আসা ছাড়া সেৱকম কিছু চোখে পড়েনি ওর।

'তুমি বিরামদার ঠিকানা জান?' হঠাতে নিশীথবাবু জিজ্ঞাসা কৰলেন।

'না।' অনিমেষ বলল।

'তোমার যদি দৱকার হয় আমার কাছ থেকে ঠিঠি নিয়ে যেও। বিরামদার মতো ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোককে কলকাতায় থাকলে দৱকার হবেই। ওখানে তুমি কাজ কৰার অনেক সুবিধে পাবে। আমাদের ইউনিয়ন তো সব কলেজেই আছে। আর যদি সিনিয়ারলি কাজ কৰা যায় তবে দেশের নেতাদের চোখে সহজেই পড়া যায়, কলকাতায় থাকার এটাই হল সুবিধে। তুমি তো ইডেনে থাকবে বলেছিলে, সেখানে অবশ্য বায়পশ্চি দলগুলো-ছাত্র ফেডারেশনের জোর বেশি।'

অনিমেষ অনেকগুলি কোনো কথা বলছিল না। ওরা দুজন সমস্ত রাস্তাটা চুপচাপ হেঁটে এল। যত সময় যাচ্ছে অনিমেষের বোধ হচ্ছিল নিশীথবাবু যেন গুটিয়ে যাচ্ছেন। নৈশশ্বে যে কখনো-কখনো গোপনে-গোপনে কথা তৈরি করে নেয় এই প্রথম বুবাতে পারল অনিমেষ। এই যে অনিমেষ খুব জোরের সঙ্গে কথা বলেনি, তিনি একাই অনেকক্ষণ বলে গেলেন—এটা চুপচাপ হাঁটতে গিয়ে যেন নিশীথবাবু অবিভাব করে ফেলেছেন। তাই হাকিমপাড়ুর পৌছে দুজনের আলাদা পথের মোড়ে দাঢ়িয়ে নিশীথবাবু একটু থমকে দোড়ালেন। অনিমেষ যাবার সময় তাকে প্রণাম করতেই ভীষণ ধরাগলায় বললেন, 'অনিমেষ, অবিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস করে হারানো অনেক ভালো।'

॥ তেরো ॥

আটটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া চুকে গেল। সরিশেখেরই তাড়া দিচ্ছিলেন। আজ বিকেলে ইলেকট্রিক বিল এসেছে, দেখে মাথায় হাত। প্রথম ঝাঁঝ যিটিয়েছিলেন তিনি হেমলতার ওপরে। এত আলো জাললে তিনি আর কী করে পেরে উঠবেন! হেমলতা তখন রান্নাঘরে বসে পায়েসের শেষ ব্যবস্থা করছিলেন, অনেক কষ্টে বাবার সঙ্গে তর্ক কৰার ঝোকটকে সামলালেন। তর্ক মানেই ঝগড়া, অশান্তি। অন্যদিনে হলে ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু কাল অনিন কলকাতায় চলে যাবে, আজ তাঁর মন ভীষণ অশান্ত, কিছুতেই কিছু ভালো লাগচে না। সেই ছেট্টিবেলা-ছেট্টিবেলা জন্মাল তো ও তাঁরই হাতে। তারপর চোখের সামনে তিলতিল করে ওকে বড় হতে দেখলেন, এই দেখে যে কতটা কষ্টের এখন

এই মুহূর্তে তিনি উপলক্ষ্মি করছেন। নিজের সত্তান নেই, সত্তান-স্বেহ কথাটা লোকমুখে শোনা, কিন্তু হঠাৎ আজ সকাল থেকে তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর শরীরের একটা অশ্রু কাল বিযুক্ত হচ্ছে যাচ্ছে। বাবার চিকিৎসা ঘনেও তিনি এখন কিছু বলতে পারলেন না, তার বদলে দুচোখ উপচে জল এসে গেল। অথচ অনি তাঁর ছেলে নয়, সেই কোকিল এসে যেন ডিম পেড়ে রেখে গেছে—তবু কেন যে ছাই এমন হয়। মৃতা ভাস্তবধূকে মনেমনে ঠিসেতে লাগলেন তিনি, ব'র্তে থাকলে নাজ দেখতাম তুই কী করতিস। ঘরে শিয়ে সব দায় চাপিয়ে গেলি। বী হাতে চোখ মুছলেন তিনি। আজকাল যে কী হয় তাঁর, মাঝে-মাঝে বড়মা, ছেটমা আর মাধুরীর মুখ এক হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। মৃতা এই তিনি মহিলাকে বড় কাছাকাছি মনে হয়।

ভাড়াটে বসাবার পর থেকেই বাড়ির ট্যাঙ্ক বেড়েছিল, কিছুদিন আগে আবার বেড়েছে। সরিষ্ঠেখের তার বিরক্তে আপিল করোছিলেন, বেশ কয়েকবার তিনি মিউনিসিপালিটি অফিসে ঘোরায়ি করেছেন, কিন্তু সেই আবেদন শোনার সময় বাবুদের এখনও হয়নি। ফলে বাড়ির ট্যাঙ্ক দেওয়া বক্ষ করেছেন তিনি। এনিকে জলের সাপ্তাহি শহরে কমে গেছে, যেটুকু আসে তাতে চাপ নেই, ফলে অতি সাধের ওয়াটার-ট্যাঙ্কটা শুকনো থাকে। পুচ্ছুচ করে কয়েক দফায় যে-জল, আসে তাতে মেলতার কিছুই হয় আজকাল, চারধারে অভাবের তীক্ষ্ণলো উঠিয়ে বসে আছে, নড়চড়া করলেই খোঢ়া লাগছে। আজ প্রতি যাবার সময় তাঁর বুকে সামান্য বাথা বোধ হচ্ছে। প্রেশারদ্রেশার কখনো চেক করাননি। শরীর মাঝে-মাঝেই অকেজে হয়ে যাচ্ছে, তখন হেমিওপ্যাথি তরি তাঁকে সাহায্য করে।

একটু আগে হেমলতা মশারি টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেছেন, মাথার কাছে খাটের নিচে ব্যবরের কাগজের ওপর বালির বাক্যে কফ ফেলার জায়গা ঠিক রাখতে ভোলেননি। একটা দিন এই মেয়ে না থাকলে তাঁর শরীরটা বিকল হয়ে যাবে একথা তাঁর চেয়ে আর-কেউ ভালো করে জানে না। তবু কেনো সমস্যায় পড়লেই মেয়ের ওপর হাস্তিত্বি করেন, কারণ এটাই সবচেয়ে নিশ্চিন্ত জায়গা। এখন রাগ করতে পারেন এমন মানুষ তাঁর ধারেকাছে নেই। বুকের ব্যাথার কোনো শুধু তাঁর কাছে নেই, এটা নতুন উপসর্গ। ডান হাত বুকে রাখলেন তিনি। শরীর দ্রুশ শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে। সেইসব মাস্লগুলো কোথায় চলে গেল, চামড়াগুলো শুটিয়ে যাচ্ছে আন্তে-আন্তে। নিজের শরীরের দিকে তাকালে বড় কষ্ট হয় এখন।

পঁচাত্তর বছর অল্প সময়—দেখতে—দেখতে চলে গেল। কিন্তু মৃত্যু অনেক দূরে—আরও পঁচিশটি বছর তাঁর বেঁচে থাকার বড় সাধ। পৃথিবীতে রোজ কত কী খবর হয়—মরে গেলে সেসব থেকে সোজা ব্যাগ-হাতে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফেলেন। বেঁচে থাকার জীবিকার তাঁর আছে, এরকমটা ভেবে মনটা প্রহৃষ্ট হল সরিষ্ঠেখেরে। কিন্তু সে সামান্যক্ষণের জন্য। বুকের মধ্যে হাপ লাগছে। এই যে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে, এই বাড়িটাকে মোজ ভোরে উঠে দেখতে ইচ্ছে করে, সেটা কী জন্মে এত বছর বেঁচে থেকে তিনি কী দেখলেন? দুই স্তৰী—তারা তো অনেকদিন আগেই ঢাঁ-ঢাঁ করে চলে গেল। বড় ছেলের মুখদর্শন এ-জীবনে তিনি করবেন না, ছোট ছেলে—ঝাঁ, তাকেও তিনি বাতিল করেছেন। এক মেয়ে চোরের সামনে মরে গেল, আর-একজন বিধবা হয়ে সারাজীবন ধান পরে তাঁর সংসারে পড়ে রইল। একমাত্র মহীতোষ যে কিনা কোনোদিন তাঁর মূখের ওপর তর্ক করেনি, তাঁকে আঘাত দেয়নি, কিন্তু ওর কাছেও তিনি আপন হতে পারেননি কোনোদিন। মহীর বউ তো জোয়ান বহসেই চলে গেল। অর্ধেক এই এত বছর বয়স তাঁকে শুধু দৃঢ়েই দিয়ে গেছে—বেঁচে থেকে বোধহয় সুবৃত্ত পাওয়া যায় না। এই যদি নীট ফল হয়, তা হলে মনে হয়, এও তো একটু একটু করে সমস্যা হয়ে দাঢ়াচ্ছে। ভাড়াটের অনাদর, ট্যাঙ্কের বোঝা তো আছেই, এতদিনে একবারও তিনি হোয়াইটওয়াশ করাতে পারলেন না। যত্ন না পেলে সবাকিছুই নষ্ট হয়ে যায়, যাচ্ছেও।

এইসব সমস্যার মধ্যে বাস করেও তিনি একটি জায়গায় অভ্যন্তর কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন, সেখানে তাঁর কোনোরকম গাফিলতি ছিলেন না—তা হলে অনিমেষকে মানুষ করা। লোকে যে কেন মানুষ করার কথা বলে, মানুষ কেউ কাউকে করতে পারে না। তিনি তাঁর প্রাত্মের পারেননি। শরীর বড় হওয়া আর আর মানুষ হওয়া যখন এক ব্যাপার নয় তখন এই চলতি কথাটা মনে নেওয়া যায় না। কিন্তু অনিমেষের বেলায় তাঁর আওতায় থেকে একটু একটু করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে, কখনো হেঁচু থায়নি। এই ছেলে প্রথম ডিশিনে পাশ করবে এ অজ বিশ্বাস তাঁর ছিল এবং সেটা মিথ্যে হয়নি। আজ অবধি যখন যা থেকে বা পরতে দিয়েছেন ও কখনো সে নিয়ে অভিযোগ করেনি—এটাই মানুষ

হবার প্রথম পদক্ষেপ। একমাত্র যে-জিনিসটা সরিষ্পেখৰকে ভাবাত, মাৰো-মাৰো ছেট ছলেৱ পৱিণ্ডিৰ কথা মনে কৱিয়ে দিত, তা হল অনিমেষেৱ দেশৰে কাজে আকৃষ্ট হওয়াৰ প্ৰবণতা। সেই ছলে৲ো থেকে ওৱ কংগ্ৰেসৰ প্ৰতি যে-আকৰ্ষণ তা কি এখনও আছে? ইদনীং ওৱ সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা হয় না। অনিমেষেৱ সঙ্গেওৱ সেই নতুন স্যারেৱ সম্পর্ক কী তা তিনি জানেন না। তবে রাজনীতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ সন্দেও যদি এ-ছলে এমন ভালো ফল কৱে পাশ কৱতে পাৰে, তবে তিনি কৰনোই আপত্তি কৰবেন না। আজ রাত্ৰে সরিষ্পেখৰ বিছানায় শয়ে এইসব চিন্তা কৱতে কৱতে আসল জায়গায় শেষ পৰ্যন্ত এলেন- অনিমেষ কাল কলকাতায় চলে যাচ্ছে।

বুকেৱ ব্যাথাৰ জায়গায় এখন যেন কোনো স্পৰ্শ লাগল-কাৰণ উপলক্ষি কৱতে পাৱলেন সরিষ্পেখৰ। এবং এই প্ৰথম তিনি ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। তাৰ শৱীৰ মনেৱ ছক্ষুমে চলে? এবং কোন ঘন, না, যে-মনকে তিনি নিজেই জানতেন না। এমনিতে তাৰ সম্পর্কে নিৰ্দিষ্ট কঠোৰ পাৰ্শণ এইসব বিশেষ ব্যবহৃত হয়, সত্যি বলতে কী, অন্যায়েৱ সঙ্গে তিনি কোনোদিন আপস কৱেননি বলেই তাৰ সম্পর্কে সবাই একথা বলে। কিন্তু অনিমেষকে তিনি বড় কৱেছেন, পড়াশুনা পিছিয়েছেন আৱৰ বড় হবার জন্য-কলকাতায় না গেলে তা সন্ধৰ নয়-এসব তো অনেক দিনেৱ জানা কথা। তা হলে? তা ছাড়া তাৰ বৎশে আজ অবধি কেউ কলকাতায় পড়তে যায়নি-সেদিক দিয়ে তাৰ গৌৰবেৰ ব্যাপৰ।

আজ খেতে বসে অনিমেষ মহীতোষেৱ ইচ্ছাৰ কথা জানিয়েছিল। ওৱ বাবা ওকে ডাঙাৰ হতে বলেছে-সায়েন্স পড়াতে চায়। অপ্রচ নাতিৰ ইচ্ছে সে আটস পড়ে। তাকে সালিশি কৱেছে সে। অনিমেষ ইংৰেজিতে এম এ পাশ কৱে অধ্যাপক হোক এই চিন্তা তাকে খুশি কৱে। মহীতোষ কদিন দেখেছে তাৰ ছলেকে? সে কী কৱে জানবে ওৱ মনেৱ গঠন কেমন? ফট কৱে কিছু চাপিয়ে দিলে ফল ভালো পাওয়া যাবে? তিনি নাতিকে বলেছেন, সায়েন্স পড়তে যদি ভালো না লাগে তো পড়াৰ দৰকাৰ নেই। সেকথা অনেক অনিমেষেৱ মুখ কীৰকম উজ্জ্বল হয়েছিল এখন চোখ বৰু কৱেও তিনি দেখতে পেলেন। আজকাল কোনো সিদ্ধান্ত নেবাৰ জন্য কেউ বড়-একটা তাৰ শৱণাপন্ন হয় মা-সৱিষ্পেখৰেৱ তাই আজ নিজেকে বেশ গুৰুত্বপূৰ্ণ বলে বোধ হচ্ছিল। মহীতোষেৱ সঙ্গে পৰে তিনি এ-ব্যাপৰে কথা বলবেন। অতএব কাল যে-ছেলেটা কলকাতায় যাচ্ছে তাতে তাৰ চেয়ে সুখী আৱ কে পাৰে? তবু যে কেন এমটা হয়? কেন মনে হচ্ছে সেখানে ওৱ কিছু হলে তিনি দেখতে পাৰবেন না! একটা আজনা শহৰে ছেলেটা একা একা কীভাৱে বাস কৱবে? সেইসঙ্গে এতক্ষণ যে-ব্যাপৰটা তিনি মনেৱ আড়ালে-আবডালে রাখিলেন সেটা চট কৱে সামনে এসে দোড়াল-কাল থেকে তিনি সম্পূৰ্ণ একা হয়ে পড়াবেন। কাল থেকে বাড়িটা ফাঁক হয়ে পড়াবে। তিনি কী কৱে বাঁচবেন? ঘোৰনে যে-কোনো সমস্যাৰ মুখোযুৰি তিনি যেভাবে হতে পাৱতেন, এই পঁচাত্তৰ বছৰে এসে তা আৱ সন্ধৰ নয়-এই সত্যটা যেন বুকেৱ ব্যাথাকেআগলে রাখছিল। এখন তিনি বুকতে পাৱেন যে হেমলতা ক্ৰমশ অশক্ত হয়ে পড়ছে-শাৰীৰিক ক্ষমতায় সে আৱ বেশিদিন এভাৱে কাজ কৱে যেতে পাৰবে না। যদি তাৰ আগে হেমলতা চলে যায়, তা হলে তিনি কী কৱবেন? এই বাড়িতে সম্পূৰ্ণ একা একা তিনি কীভাৱে থাকবেন? এখন এই বয়সে আৱ কোথাও যাওয়াৰ জায়গা নেই। মহীতোষেৱ কাছে গিয়ে দুদিন ডিষ্ট্রিক্টে পাৰবেন না তিনি।

কেউ জানে না, কাউকে জানাননি তিনি, বেশ কিছুদিন আগে পোপনে একটা উইল কৱেছেন এই বাড়িৰ ব্যাপৰে। তাৰ অৰ্বত্যামনে এই বাড়িৰ সম্পূৰ্ণ মালিকানা হেমলতাৰ, কিন্তু তিনি এই সম্পত্তি ভোগ কৱতে পাৱবেন, বিক্ৰি কৱতে পাৱবেন না। হেমলতাৰ পৰ অনিমেষ এই বাড়িৰ মালিক হবে। আৱ কেউ নয়-আৱ কাৰণ কথা তিনি চিন্তা কৱতে পাৱেন না। উইল কৱাৰ সময় মনে হয়েছিল, মানুষ যখন বোৱে ঘৃঞ্জ খুব কাছে, চলে যাওয়াৰ সময় আৱ সুযোগ পাওয়া যাবে না, তখনই উইল কৱে। কিন্তু তিনি কৰনোই খুব শিখণ্ডিৰ যাচ্ছেন না, তা হলে উইল কৱা কেন? কিন্তু কৱে ফেলে আৱ পালটানো বা বালিল কৱা হয়নি। এবং যেহেতু এটা একটা দুৰ্বলতা, তাই কাউকে জানানোৱে প্ৰয়োজন বোধ কৱেননি, এমনকি হেমলতাকেও নয়। অনিমেষ কাল চলে যাবে। সে যদি কৃতিত্বেৰ সঙ্গে এম এ পাশ কৱে অধ্যাপনা কৱে তা হলে কি জলপাইগুড়িতে কিমৰবে? না, কৰনোই নয়। এই কথাটা এই মুহূৰ্তে অস্ত বিশ্বাস কৱতে আৱশ্য কৰলে-। কলকাতায় গিয়ে শিখড় গাড়লে কেউ আৱ ফিরে আসে না। ওঁৱ মনে হতে লাগল, অনিমেষেৱ এই চলে যাওয়াটা শেষ যাওয়া। এৱ পৰ ও আসবে ক্ষণিকেৰ জন্য-সাময়িকভাৱে। এই অনিমেষকে আৱ তিনি কখনো ফিরে পাৰবেন না। অতএব এই বাড়িৰ

মালিকানা! গেলে সে কোনোদিনই তার দখল চাইবে না। তখন এত যত্নের বাড়িটার কী অবস্থা হবে? ভীষণ অঙ্গস্থি হতে লাগল তাঁর। চট করে অনেক বছর আগে শোনা শনিবাবার কথা মনে পড়ল। এর কোনো কাজে বাধা দিও না—এই সংসারে সে আটকে থাকবে না। কথাটাকে এই মুহূর্তে তিনি ভীষণ সত্ত্ব বলে মনে করতে লাগলেন। এবং এই প্রথম সরিষ্ঠেশুখের ব্যাথার কারণটা পুরোপুরি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বুকের ভেতর থেকে কী—একটা জিনিস আস্তে-আস্তে খসে যাচ্ছে। তাঁর ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছে সেটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখেন, অর্থ ইচ্ছে ধাকা সত্ত্বেও তিনি বাধা দিতে পারলেন না। তাঁকে তাঁর নিজের দৃষ্টির পূর্ণ রূপ দেখে যেতে হবে। ভীষণ অঙ্গস্থি নিয়ে একা বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে গভীর রাতে সহসা উঠে বসলেন সরিষ্ঠেশুখের।

জিনিসপত্র মোটায়ুটি গোছগাছ হয়ে গেছে। একটা সুটকেস আর ছেট হেল্পল নিয়ে সে যাবে। কাল সঞ্চেবেলায় ট্রেন। শিলিঙ্গড়ি থেকে যে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ছাড়ে তাতে হলদিবাড়ি থেকে আসা একটা কম্পার্টমেন্ট জুড়ে দেওয়া হয়। অনিমেষ জলপাইগুড়ি টেশনে সেই লোকাল ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে উঠবে। সাধারণত জলপাইগুড়ির মানুষ আগেভাগেই লোক পাঠিয়ে হলদিবাড়ি থেকে জায়গা দখল করিয়ে আনে কিন্তু একজনের পক্ষে তেমন কোনো অসুবিধে হবে না। আজ সঞ্চেবেলা ‘বাড়ি ফিরতেই ও জয়দির গলা পেয়েছিল, নিচ্ছয়ই জয়দি বিকেলে বাড়ি ফিরেছেন। যাওয়ার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে ভেবে খুশি হয়েছিল অনিমেষ। সত্ত্ব বলতে, জয়দির প্রথম তাঁকে কলকাতার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। জয়দি না ধাকলে সে জানতেই পারত না জীবননন্দ দাশ নামে সেই বিখ্যাত কবি ট্রামের তলায় চাপা পড়েছিলেন। জয়দির সঙ্গে দেখা করার জন্য সে ওঁদের বারাদ্দায় উঠে আসতেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। খুব চাপা গলায় জয়দি কথা বলছিলেন, ‘এতে যার সম্মোহন পক্ষে বিয়ে করা উচিত হয়নি।’

জয়দির স্বীমীর গলা কিন্তু চড়া ছিল, ‘ওসব নাটুকে কথা ছেড়ে দাও, নবেল পড়ে মাথা বিগড়ে গিয়েছে তোমার। এত ঘনঘন বাপের বাড়ি যাওয়া পছন্দ’ করি না আমি।’

খুব নির্লিপ্তের মতো জয়দি বললেন, ‘বেশ, যাব না।’

‘অ্যা! কী বললে? এককথায় রাজি? তা সেইসব কঠি কঠি ভাইশুলোর মাথা চিবোতে পারবে না বলে মন-খারাপ লাগছে না? তোমার যে পুরুষ-ধরা রোগ ছিল তা যদি জানতাম কোন শালা বিয়ে করতে!’

দ্রুত নেমে এসেছিল অনিমেষ। ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কী ভীষণ নোংরা গলায় জয়দির স্বামী কথা বলছেন! জয়দির এই সমস্যায় জয়দিকে এতখানি নোংরার মধ্যে থাকতে হয় কেনোদিন সে টের পায়নি! ওঁর সঙ্গে কথা বলেও আভাস পায়নি কখনো। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল নেই এটা টের পেয়েছে, কিন্তু তাই বলে এতটা! কঠি কঠি ভাই বলতে উনি কী বোঝাচ্ছিলেন? সে—অর্থে ও নিজেও তো জয়দির ভাই। ভীষণ অসহায় লাগল অনিমেষের। একবার মনে হয়েছিল পিসিমাকে ব্যাপারটা বরবে, কিন্তু চলে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে বাড়ির সবাই এত চিন্তিত যে একথাটা বলার অবকাশ পায়নি।

এখন রাত দশটা হবে। এই সময় জলপাইগুড়ি শহর ক্রমশ নিষ্কুল হয়ে পড়ে। ওদের পাড়াটায় দোকানপাটি নেই, বড় ছাড়া-ছাড়া বাড়ি, তাই গভীর রাস্তাটা খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসে। একদম ঘূম পাচ্ছে না আজ অনিমেষের। কাল চলে যেতে হবে—এই বোথটা মাঝে-মাঝে সেই একাকিন্তের ভয়টাকে উসকে দিছে। অন্যমনশ্ব হয়ে ও সামনের দেওয়ালের দিকে তাকাল। সেখানে সেই ছেট কুরুটা এখনও চুপচাপ বসে আছে। আজ থেকে অনেক বছর আগে এটাকে আবিষ্কার করেছিল সে। দেওয়ালের চুনের আস্তরণ সরে গিয়ে যে-ফাটল হয়েছে সেটাই একটা কুরুরের আকৃতি নিয়ে নিয়েছে। খুব মজা লাগত ছেলেবেলায়। চট করে দেখলে মনে হয় খুব আদুরে ভঙ্গি নিয়ে কুরুটা ঢে়ে আছে। আজ এত রাত্রে ওর কুরুটার জন্য ভীষণ কঠ হল, কাল থেকে সে আর এটাকে দেখতে পাবে না!

আগামীকাল ধর্মবর্ষট। এবার যেভাবে কমিউনিট্যার শহরে র পথে-পথে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, এব আগে কখনো সেরকম দেখা যায়নি। কিন্তু একটা জিনিস অনিমেষে কিছুতেই বুঝতে পারে না, সাধারণত মানুষ একদম উত্তেজিত নয়। বরং তাঁদের মধ্যে নিষ্পত্তি ভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অস্তত ফেরার সময় ও লক্ষ করেছে, কারও মধ্যে তেমন চাঞ্চল্য নেই। অর্থ মানুষের খাবারের জন্য এই

হৰতাল। তা হলে কি জলপাইগুড়ির সমস্ত মানুষ কংগ্রেসের সমর্থক হয়ে গেলো? কী জানি! কিন্তু যদি এই হৰতালের ফলে কাল ট্রেন বক্ষ হয়ে যায়—তা হলো এ-সঙ্গাতে আর নাকি ভালো দিন নেই।

ভোজানো দরজা খুলে বাইরে এল অনিমেষ। ওদের বাগানটা এখন জঙ্গলে ভরে গেছে। সামান্য সৃষ্টি হলৈই গাছগুলো তরতুর করে বড় হয়ে ওঠে। ফুলের গাছ আৰ নেই, বিভিন্ন ফলের গাছেই বিৱৰণ জায়গাটা ভৰাট। এখন সবে চাঁদ উঠেছে। লৰা সুপারিগাছগুলোৱ মাথায় তাৰ জ্যোত্স্না নেতৃত্বে পঞ্জে আছে। চাৰধাৰ একটা আবহা আলো—অস্কৰৱেৰ সঙ্গে মাঝামাঝি হয়ে রয়েছে। চট কৰে তাকালে বোৰা যায় না, কিন্তু চোখ সংৰে এলৈ দেখতে কোনো অসুবিধে হয় না। অনিমেষ দেখল দানুৰ ঘৰে আলো জলছে না, কোনো শব্দ আসছে না সেখান থেকে। পিসিমাৰ রান্নাঘৰ থেকে সামান্য আলো আসছে বাইরে।

উঠোনে নেমে এল সে খালিপায়ে। এখন গৱৰকাল। সময়ে—অসময়ে বৃষ্টি আসে। উঠোনেৰ সামগুলো এখন মাথাড়া দিয়েছে, গোড়ালি তুবে যায়। এভাবে নামা ঠিক হয়নি, কাৰণ এই সুময় সাপেৱো মেজাজে চাৰধাৰে ঘুৰে বেড়াৰে। কখন কে বিৱৰণ হয়ে ছোবল মাৰবে—অনিমেষ সাৰবধানে পা ফেলতে লাগল। দানুৰ ঘৰ পেৱিয়ে পিসিমাৰ রান্নাঘৰেৰ সামনে এসে দাঁড়াল সে। দৰজাৰ কাঠ দিয়ে ইৰুৎ আলো বাইৱে আসছে। এটা ইলেক্ট্ৰিক আলো নহ, নিচ্যাই কুপিৰ আলো। পিসিমা ইলেক্ট্ৰিক আলো বাঁচাতে কুপি জালান রাত্ৰে শোওয়াৰ সময়। এইটো ওৱা বহু পুৰনো অভ্যন্তৰ। স্বৰ্গহীড়া থেকে আসবাৰ সময় পিসিমা ওটা নিয়ে এসেছেন। নিঃশব্দে বাৰাদ্বায় উঠে দৰজাৰ কাছে এসে কাঠ হৰ্যু দাঁড়িয়ে পঢ়ুল অনিমেষ। ভেতৰ থেকে চাপা গলায় পিসিমা কান্নাটা ঘৰেৰ মধ্যে পাক খেতে লাগল। পিসিমা কাঁদছেন কেন? কান্নাটা ও যেন সতৰ্কভাৱে—সৱিশ্বেষৰ বা আৱ-কেড়ে টেৰ পান তিনি চান না। যেন নিজেৰ সঙ্গে বোৱাপড়া কৰে কান্না। আগে চল-যাওয়া, বোধহয় চেহাৱা গুলিয়ে বা ভুল-যাওয়া পিসেমশাইকে অভিযোগ কৰে কেঁদে যাচ্ছেন। কেন তাঁকে একা ফেলে রেখেছেন এতকাল। কৃতদিন তিনি এইভাৱে পৃথিবীতে থাকবেন। এখানে থাকলেই তো দুঃখ পেতে হয়—এই যেমন যে—ছেলেটাকে মা মাৰা যাবাৰ পৰ বুকে কৰে মানুষ কৰেছেন সেও আজ চলে যাচ্ছে তাঁকে ছেড়ে। বাৰাদ্বায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ নিঃশব্দে বাৰবাৰ কৰে কেঁদে ফেলল। ও একবাৰ ভাৰল পিসিমাকে ডাকবে, কিন্তু ওৱা মন যেন সায় দিতে চাইল না। ভীষণ ভাৰবোধ হল তাৰ, কাউকে জানতে না দিয়ে সে আবাৰ উঠোনে নেমে এল।

এখান থেকে চলে গেলে আৱ-কিনু না হোক দুজন মানুষকে ছেড়ে যেতে হবে, যঁৰা তাকে আগলে রেখেছিলেন। পৃথিবীৰ আৱ কোথাও গিয়ে, জীবনেৰ কোনো সময়ে কি আৱ-কাউকে সে পাবে এমন কৰে যে তাকে ভালোবাসবে? খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে সে মুখ তুলে পৰিকাৰ আকাশেৰ দিকে দিকে তাকাল। দূৰে এক কোনায় বাঢ়া যেমেৰ কাঁপা-হাতে-পৰা বাঁকা টিপেৰ মতো অৰ্দেক চাঁদ আকাশে আটকে আছে। মাথাৰ ওপৰ অনেক তাৱার ভিড়। যেন হইচই পড়ে গেছে সেখানে। আজি অনেকদিন পৰ কেন বাৰবাৰ ছেলেটাকে মনে পড়ে যাচ্ছে এইৱৰকম তাৱার রাতে সে বিছানায় ঘয়ে ঘয়ে জানলা দিয়ে আকাশেৰ দিকে তাকিয়ে থাকত। সেখানে অনেক তাৱার মধ্যে একটা তাৱা খুব জুলজুল চোখ কৰে তাৱ দিকে তাকিয়ে থাকত আৱ কিছুক্ষণ চোখাচোখি হওয়াৰ পৰ সেই তাৱটা যখন মায়েৰ মুখ হয়ে গিয়ে তাৱ সঙ্গে কথা বলত, সে—সময় ওই তাৱটাকে না দেখতে পেলৈ ওৱ কান্না পেত। খেন অনিমেষ আকাশেৰ দিকে মুখ কৰে অনেক তাৱার মধ্যে সেই তাৱটাকে বুজতে চাইল। আচৰ্ষণ, তাৱাও পালটে যায় নাকি! কাৰণ ওখানে অনেকগুলো জুলজুলে তাৱা একসঁ। ভুলছে, কাউকে আলাদা কৰা যাচ্ছে না।

অনিমেষ উঠোন পেৱিয়ে পাশেৰ দৰজা খুলে বাড়িৰ সামনে চলে এল। আশেপাশেৰ সব বাড়িৰ আলো নিবে গোছে। এখন আৱ মাইকেৰ শব্দ শোনা যাচ্ছে না যেটা সহজেবেলায় ছিল। অনিমেষ চেকিশাকে জঙ্গলটা ছাড়েৰ ভাড়াটোৱে ঘৰেৰ সামনে ওদেৱ সদৰদৰজাৰ দিকে এগোল। চাঁদটা বোধহয় সামান্য ওপৰে উঠেছে, কাৰণ এখন চাৰদিক মশারিব মধ্যে চুকে দেখলে যেমন দেখায় তেমন দেখাচ্ছে। অন্যমনস্ক হয়ে কয়েক পা হেঁটে সামনে তাকাতে ওৱ চোখ যেন বাপসা দেখাল। জয়াদিৰ ঘৰেৰ সামনে বাৰাদ্বায় কেউ-একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশেৰ থামেৰ গায়ে হেলান দিয়ে যে আকাশেৰ দিকে মুখ কৰে দাঁড়িয়ে সে যে জয়াদি তা বুবাতে দেৱি হল না অনিমেষেৰ। জয়াদি ওখানে কী কৰছে? এভাবে কেন জয়াদি দাঁড়িয়ে থাকবে? মানুষেৰ যখন খুব দুঃখ হয় তখনই এৱকম ভঙ্গিতে সে দাঁড়াতে পাৱে—অনিমেষ এটুকু বুবাতে পাৱছিল। জয়াদিতে তাৰকে গিয়ে খেমে গেল সে। এত

ରାତେ ଓ ଯଦି ଜୟାଦିର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲେ, ତାହଲେ ଜୟାଦିର ଶାମୀ ରାଗ କରବେନ ନା ତୋ? ସଙ୍କେବେଳୋଯ ତିନି ତୋ ଏ-ଧରନେର ଏକଟୋ କଥା ବଲେ ଜୟାଦିତେ ଆଘାତ କରେଛିଲେନ । ଏଥିନ କି ଆର ଆଗେର ମତନ ଜୟାଦିର ସଙ୍ଗେ କତା ବଲା ତାର ମାନାୟ ନା?

ଅନିମେସ ନିଃଶ୍ଵେଦେ ଆବାର ନିଜେର ଘରେର ଦିକେ ଫିରେ ଚଲଲ । ଓ ମନେ ହଲ, ଆର ଯାଇଁ ହେବୁ ଏଥିନ ଜୟାଦିକେ ଏକ ଏକ ଥାରତେ ଦେଓୟା ଉଚ୍ଚିତ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟ ଓର ନିଜେରଇ ଏକ ଥାରତେ ଭାଲୋ ଲାଗେ । ଦରଜା ବସି କରେ ଓ ସଥିନ ଉଠୋନ ପେରିଯେ ନିଜେର ଘରେର ଦିକେ ପା ବାଡ଼ାଙ୍ଗେ ତଥନିଃପରିଷ୍ଣେଖରେର ଘରେର ଦରଜା ଖୁଲେ ଗେଲ । ଅନିମେସ ଦ୍ରୁତ ନିଃଶ୍ଵେଦେ ଜୟାଗାଟୀ ପେରିଯେ ନିଜେର ଘରେ ଢକେ ଶିଯେ ଆଲୋ ନେବାଲ । ଏଥିନ ଏତ ରାତ୍ରେ ଦାଦୁ ତାକେ ଦେଖିଲେ ଅନେକରକମ ପ୍ରଥ୍ରେର ସାମନେ ପଡ଼ତେ ହେବେ । ତାର ଚେଯେ ସେ ମୁୟେ ପଡ଼େଛେ ଏଟା ବୁଝାତେ ଦେଓୟା ଭାଲୋ । ଖାଟେ ଶ୍ରେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ଚପଚାପ କିଛିକଣ ପଡ଼େ ଥାବଳ । ନା, ଆଜ ରାତେ ଓର କିଛିତେହି ଯୁମ ଆସିବେ ନା । ଅନ୍ଧକାର ଘରେର ଦେଓୟାଲେର କାଚେର ଜାନଲାଯ ଚୋଖ ବୋଲାତେ ଶିଯେ ସେ ଶକ୍ତ ହେବେ ଗେଲ । ଏକଟା ଯୁମ୍ବ କାଚେର ଜାନଲାର ବାଇରେ ଥେବେ ଯୁମ୍ବ ଚେପେ ଭେତରଟା ଦେବାର ଚଟ୍ଟା କରାହେ । କେ? ଚୋର ନଯ ତୋ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓର ମେରଦଣେ ଯେନ ଏକଟା ଭୟ ଠାପା ଅନ୍ତରୁତି ନିଯେ ଘୋରାଫେରା କରାତେ ଲାଗଲ । ବିଛାନା ଥେବେ ଖାଟା କ୍ଷମତାଟା ସେ ଏହି ଯୁହୁର୍ତ୍ତ ହାରିଯେ ଫେଲେଛେ, ଗଲା ଥେବେ କୋନୋ ଶବ୍ଦ ବେବୁଛେ ନା । ବାଇରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପଟ୍ଟୁମିତେ ଭେତର ଥେବେ ଏକଟା ଆବହା ଅନ୍ଧକାର-ମେଶାନୋ ଯୁମ୍ବରେ ଛାଯା କାଚେର ଓପର କ୍ଷମତାଟା ସେ ଏହି ଯୁହୁର୍ତ୍ତ ହାରିଯେ ଫେଲେଛେ, ଗଲା ଥେବେ କୋନୋ ଶବ୍ଦ ବେବୁଛେ ନା । ବାଇରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପଟ୍ଟୁମିତେ ଭେତର ଥେବେ ଏକଟା ଆବହା ଅନ୍ଧକାର-ମେଶାନୋ ଯୁମ୍ବରେ ଛାଯା କାଚେର ଓପର ଲେପଟେ ଆହେ ଏବନ୍ତ । ସେ କୀ କରବେ? ଅନିମେସ ପାଶେ ଏସେ ଦାଁଢାଲ । ବାଇରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଯ ଉଠୋନଟା ପରିକାର ହେବେ ଆହେ । ଅନିମେସ ପ୍ରଥମ ଚମକଟା କାଟିଯେ ଉଠେ ଖୁବ ଧୀରେ ହୋଇଟ ଥେତେ-ଥେତେ ଏଗିଯେ-ଯାଓୟା ଶରୀରଟାକେ ଦେଖାତେ ପେଲ । ଏହି ଶରୀରଟାକେ ସେ ଜନ୍ମ ଥେବେ ଜାନେ । ଦାଦୁର ଏଇରକମ ହେଟେ-ଯାଓୟା ଅସହାୟ ଭଙ୍ଗ ନେ ଆଗେ କରିବେ ଦେଖେନି, ଲାଠି ନା ନିଯେ ଦାଦୁ ଏସେଛିଲେନ । ଅନିମେସ ବୁଝାତେ ପାରଛିଲ ନା, ସରିଦିଶେଖାର ଏତ ରାତ୍ରେ ଏହି ଜାନଲାଯ ଯୁମ୍ବ ଦିଯେ କୀ ଦେଖାଇଲେନ ।

ଖାଓୟାଦାଓୟାର ପର ଥେବେଇ ସରିଦିଶେଖାର ତାଡ଼ା ଦିଛିଲେନ । ସେଇ କୋନ ସଙ୍କେବେଳୋଯ ଟ୍ରେନ, ଅଧିଚ ଦାଦୁ ଏମନ କରେ ତାଡ଼ା ଦିଛେନ ଯେନ ଆର ସମୟ ନେଇ । ଜିନିସପତ୍ର ଶୁଣିଯେ ବାଇରେ ରାଖୁ ଆହେ । ଦାଦୁ ଶିଯେ ଏକଜନ ପରିଚିତ ରିକଶାଓୟାଲାକେ ବଲେ ଏସେଛେନ, ସେ ଖାନିକ ଆଗେ ଏସେ ବସେ ଆହେ । ଅନିମେସ ଦେବଳ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିତେ ଏବନ୍ତ ଆଡାଇ ଘଟା ବାକି । ଆଜ ଜଲପାଇଅଟ୍ଟି ଶହରେ ହରତାଳ ବିଜ୍ଞିଭାବେ ହେବେହେ । ଦିନବାଜାର ଏଳାକାଯ ଦୋକାନ ବନ୍ଧ କରା ନିଯେ ମାରାଯାଇ ହେବେହେ । ତବେ ଅନ୍ୟଦିନେର ଚେଯେ ଆଜକେର ଦିନଟା ଅଳାଦା ସେଟା ବୋକା ଶିଯେଛିଲ । ରିକଶା ଚଲେଛେ ତବେ ତା ସଂଖ୍ୟା ଅଳ । ସରକାରି ଅଫିସ ବା ଝୁଲାତମ୍ଭୋ ହସନି । କିନ୍ତୁ ସିନ୍ମେମା ହଲ ଖୋଲା ଛିଲ-ସରିଦିଶେଖାର ରିକଶାଓୟାଲାର କାହିଁ ଥେବେ ଏହିବ ସଂବାଦ ଆରା ବିଶଦଭାବେ ଜେନେ ନିଜିଲେନ ।

ନିଜେର ଘରେ ଅନିମେସ ସଥିନ ଜାମାକାପଡ଼ ପରହେ ତଥନ ହେମଲତା ଦରଜାଯ ଦାଁଡ଼ିଯେ । ତାର ଯୁମ୍ବଟା ସମୟକ କରିଛେ, ଶୈଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିବାରା କଲକାତାଯ ଚଲଲି ।

‘ଶିଯେଇ ଚିଠି ଦିଯେ ଖୁବାଖୁବର ଜାନାବି ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗାହେ ଯେନ ଚିଠି ପାଇଁ’ ହେମଲତା ମନେ କରିଯେ ଦିଜିଲେନ ।

‘ଆଜି’! ଅନିମେସ ଚଲ ଆଂଢାତେ ଲାଗଲ ।

‘ବେଶ ବାଇରେ ଘୁରିବି ନା, ବାଜେ ଆଡା ଦିବି ନା । ଯତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ପଡ଼ାତନା ଶୈଶ କରେ ଚଲେ ଆସତେ ପାରିବ ସେଇ ଚଟ୍ଟା କରିବି । ତୋର ଯା ଖାଓୟାଦାଓୟାର ଧରନ-ଓର୍ବାନେ ପେଟ ପୂରେ ଥେତେ ଦେବେ କି ନା ଜାନି ନା’!

‘ବାଃ, ଥେତେ ଦେବେ ନା କେନ?’ ଅନିମେସ ବଲଲ ।

‘ହୁଅରେ ତୋଦେର କଲେଜେ ଯେଯେବା ପଡ଼େ ନାକି?’

‘ଜାନି ନା’!

‘ଦେବିସ ବାବା । କଲକାତାର ଯେଯେବା ଖୁବ-ମାନେ ଅନ୍ୟରକମ-ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ଏକଦମ ମିଶବି ନା’ । ହେମଲତା ଶୈଶବାର ସତର୍କ କରିଲେନ ।

‘ଆମାର ସଙ୍ଗେ ମିଶବେଇ-ବା କେନ?’ ଅନିମେସ କଥା କରିଲ ।

‘କୀ ଜାନି ବାବା, ଶନିବାରା ତୋ ସେଇରକମ କୀ ବଲେଛିଲ । ଆର ହୁା, ଉସବ ପାର୍ଟି-ଫାର୍ଟ ଏକଦମ କରିବି

না। তোর জেলে যাবার ফাঁড়া আছে, মাধু তো সেই চিত্তায় গেল। আমি কী করব!' ছটফট করতে লাগলেন হেমলতা।

অনিমেষের হয়ে গেলে হেমলতা ওর হাত ধরে ঠাকুরঘরে নিয়ে শিয়ে প্রণাম করতে বললেন। পিসিমার মন বুঝে অনিমেষ মাটিতে মাথা ঠেকাতে ওর চুলে হাত পড়ল। অনিমেষ মূলন, বিড়বিড় করে পিসিমা সেই কাল রাত্রের মজুটা বলে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত একটা ঢুকবে-ওঁচা কান্নার যাবাখানে পিসিমা বললেন, 'ঠাকুরের সামনে বসে তুই আমাকে কথা দে যে এমন-কিছু করবি না যাতে তোর জেল হয়। বল, আমাকে ছুঁয়ে বল।'

গলা বুজে এসছিল অনিমেষে, কোনোরকমে বলল, 'আচ্ছা।'

'আচ্ছা না, আমাকে ছুঁয়ে বল, কথা দিবাম।' পিসিমা ওর হাত ধরলেন।

আর সেই সময় সরিষ্পেখরের চিংকার শোনা গেল, 'কী হর তোমাদের কেন, বাবাকে করবি তো!' বলতে বলতে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। আর সেই মুহূর্তে কান্নার কোনো সঙ্কোচ থাকল না।

সরিষ্পেখর আর অপেক্ষা করতে রাজি নন। পিসিমাকে নিয়ে অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। জয়ন্দি ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আজ সকালে জয়ন্দির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। একবারও কালকের কথা তোলেননি তিনি, অনিমেষেও ঘৃণাক্ষেত্রে জানানিনি কাল রাতে সে ওঁকে দেখেছে। যা-কিছু গল্প কলকাতাকে নিয়ে। এখন চোখাচোষি হতে জয়ন্দি ম্যান হাসলেন, 'চললো!'

মাথা নাড়ুল অনিমেষ। বুকের মধ্যে এমন অকশ্মা সহজ ফুসছে-যে-কোনো মুহূর্তের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। যুখ ফিরিয়ে অনিমেষ দেখল তার জিনিসপত্র রিকশায় তোলা হয়ে শিয়েছে। দানু পিসিমার কেঠে-দেওয়া লঙ্কারের পাঞ্চাবি আর মিলের ধূতি পরে লাঠি-হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে আর-একবার ঘড়ি দেখে নিলেন, 'তাড়াতাড়ি করো। এই সময়যোগটা খুব ভালো আছে।'

জয়ন্দি বললেন, 'আপনি টেক্সেনে যাচ্ছেন তো!'

সরিষ্পেখর রিকশার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'কালীবাড়িতে যেতেই হবে, কাছেই যখন ঘুরে আসি।'

অনিমেষ পিসিমার দিকে ফিরে বলল, 'পিসিমা, আমি যাচ্ছি।'

হেমলতা চট করে থানের আঁচল হাতে জড়িয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সে-অবস্থায় ঘাড় নাড়লেন। ছোট ছোট পা ফেলে অনিমেষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে রিকশায় চাপল, ঘাড় ঘুরিয়ে সে আবার নিজেদের বারান্দার দিকে তাকাল। রিকশা এখন চলতে শুরু করেছে। আচর্য, পিসিমা এখন এই মুহূর্তে আর বারান্দায় নেই। কেমন বাঁধা করছে জায়গাটা। নিঃশব্দে উপটপ করে জল পড়তে লাগল অনিমেষের দুগাল বেঘে। রিকশাটা যখন টাউন ক্লাবের কাছ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তখন অনিমেষ পাশে-বসা সরিষ্পেখরের গলা ওন্তে পেল, 'তোমাকে অনেক দূরে যেতে হবে অনিমেষ। পাশাপাশি রিকশায় বসে সে দানুর শরীর থেকে আর্নিকা হেয়ার অয়েলের গুঁ পেল। গুঁটা ওকেএক লহমায় অনেকদিন আগে যেন টেনে নিয়ে গেল যেদিন সরিষ্পেখর ওর সঙ্গে স্বর্গভূটার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কলকাতায় যাবার স্থপ দেখিয়েছিলেন। এখন জরা এসে শরীর দখল করা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে সেই মানুষটি যেন একটুও পালটাননি। কাল রাত্রে-দেখা সেই সরিষ্পেখরকে এখন জরা এসে শরীর দখল করা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে সেই মানুষটি যেন একটুও পালটাননি। কাল রাত্রে-দেখা সেই সরিষ্পেখরকে এখন চেনা অসম্ভব।'

টাউন ক্লাবের মাঠ, পিড়িউডি'র অফিস, করলা নদীর পুল পেরিয়ে রিকশাটা একডিভাই স্কুলের মোড়ে চলে এল। এখন বিকেল। দোকানপাট এ-চতুরে অন্যদিনের মতো খোলা। হরতাল শেষ হবার কথা ছাঁয়া-কিছু দেখে মনে হয় এখানে হরতাল আদৌ হয়নি। রাস্তাঘাটে লোকজন আড়তা মারছে। এত দূর পথ এল, আচর্য, একটা ও চেনামুখ ওর চোখে পড়ল না!

স্টেশনের সামনেটা জমজমাট। রেডিও বাজছে দোকানে। রিকশা থেকে নেমে ওরা মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এল। সরিষ্পেখর চশমার খাপ থেকে টাকা বের করে ফাঁকা কাউটারে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলেন। ট্রেন আসতে অনেক দেরি। প্ল্যাটফর্মে লোকজন বেশি নেই। কুলিকে জিজ্ঞাসা করে প্রশ্ন কোচ কোথায় দাঁড়ায় জেনে সেখানে মালপত্র নামানো হল। গেছনেই একটা বেঞ্জি, সরিষ্পেখর সাবধানে সেখানে বসে নাড়িকে পাশে ডাকলেন।

'তোমার পিসি যে-খাবার দিয়েছে রাস্তায় তা-ই খেয়ো, বুবলে!' দানুর কথা ওনে অনিমেষ ঘাড়

নাড়ু। দুপায়ের মধ্যখানে লঠিটাকে রেখে হাতলের ওপর গলা চেপে সরিষ্পেখর কথা বলছেন, 'টাকাপয়সা সব সাবধানে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'গিয়েই চিঠি দেবে।'

'আজ্ঞা।'

'যে-ভদ্রলোক তোমায় নিতে আসবেন তিনি তোমাকে চিনবেন কী করে তা-ই ভাবছি, কোনোদিন দেখেনন তো।'

'টেলিফোন বুধের সামনে মালপত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমারবর্ণনা দিয়ে ওঁকে চিঠি লিখেছেন। তা ছাড়া ওঁর ঠিকানা আছে আমার কাছে।'

'জানি না কী হবে। কলকাতায় ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। উটকো শোকের কথায় কান দিও না। তার চেয়ে তোমার কাকাকে শিখলে বোধহয় ভালো হত।'

'কিছু হবে না।'

'তোমার কীসব ফাঁড়া আছে উনিই-বাজনীতি থেকে দূরে থেকো। আমাদের মতো শোকের ওসব মানায় না।'

অনিমেষ কোনো জ্বাব দিল না। অনেকদিন বাদে দাদুর পাশে বসে এইভাবে কথা বলতে ওর ভারি ভালো লাগছিল। এতদিন ধরে এক বাড়িতে ধাকা সঙ্গেও তিল তিল করে যে-ব্যবধান তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেটা এখন হঠাই মেন মিলিয়ে গেছে। অনিমেষে চুপচাপ বসে ধাকল।

কুলিদের ঠিকার, যাজীদের ব্যক্ততার একসময় ট্রেনটা চক্ষু হয়ে উঠল। এত কুলি কোথায় ছিল কে জানে—অনিমেষ ট্রেন-টাইম ছাড়া কখনো অদের দেখতে পায়নি। সরিষ্পেখর বেশি ছেড়ে সামান্য এগিয়ে ঝুকে বাঁদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, সিগনাল দিয়েছে দেখছি, রেডি হও।'

কথাটা মুনেও অনিমেষ উঠতে চেষ্টা করল না। ওর মনে হচ্ছিল বুঝি জ্বর এসে গেছে শরীরে, হাত-পা কেমন ভারী বলে বোধ হচ্ছে। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে—অনিমেষের এখন খুব ইচ্ছে করছিল ট্রেনটা দেরি করে আসুক। অথবা আজ তো ট্রেনটা নাও আসতে পারত। কত কী তো পৃথিবীতে রোজ হয়ে থাকে।

এই সময় বেশিকিছু মালপত্র নিয়ে একটি পরিবার যেন সমস্ত প্যাটফর্মে আলোড়ন তুলে এদিকে এগিয়ে এল। অনিমেষ দেখল কুলিকে শাসন করতে করতে একজন মহিলা আগে-আগে আসছেন, তাঁর মুখ দেখলেই বোৰা যায় মেয়েটি মহিলার কন্যা। ওর সামনে এসে কুলি বলে উঠল, 'খাড়াইয়ে মেমসাৰ। ধূৰু গাড়ি ইহাই লাগে গা।'

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘূরিয়ে ভদ্রলোককে ডাকলেন, 'আঃ, একটু তাড়াতাড়ি এসো-না, ওকে হেলু করো!' কিন্তু ততক্ষণে কুলি নিজেই মালপত্র নামিয়ে নিয়েছে। ভদ্রলোক কাছে এলে মহিলা বললেন, 'পইপই করে বললাম ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটো!-চিরকাল কিটেমি করে কাটালে। এখন এই পাহাড় নিয়ে উঁতোউঁতি করে ছেটলোকের মতো ধার্জ ক্লাসে ওঠো, নিজে তো এখানে ফুর্তি মুটবেন।'

ভদ্রলোক চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'আঃ কী হচ্ছে কী, এটা স্টেশন! আমার পক্ষে যাওয়া সভ্য নয় তুমি জান। আর মেয়েরা একা ধার্জ ক্লাসেই সেফ।'

'সেফ আর সেফ! সারাজীবন পৃতুপৃতু করে কাটালে। ট্রেন এলে তুমি লাফিয়ে উঠে জায়গা করবে—এই আমি বলে দিলাম।' চট করে গলার ব্রহ্মে হক্কমের ঝাঁঝ আনলেন মহিলা।

এই সময় মেয়েটি কথা বলল, ধৰ্মথে গলার ব্রহ্ম, অনলে শরীর কেমন করে, 'গোবিন্দদারা আসবে বলেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর ওর দিকে কিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওমা তা-ই নাকি! তোকে বলেছে আসবে?' মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

তুমি আবার ওইসব লোকারগুলোর সঙ্গে কথা বলেছো বিরক্তি-মেশানো গলায় ভদ্রলোক মেয়েকে ধর্মকলেন।

মাথা নিজু করল মেয়েটি কিন্তু তার মা জ্বাব দিল, 'মেলা বকবক করবে না তো। একটু আধটু কথা বললে মহাভারত অন্তর্জ হয়ে যায় না! তার বদলে ওরা প্রাপ দিয়ে যে-উপকার করবে, পঞ্চাম ফেললে তা পাবে না। একটুও যদি বৃক্ষিভূক্তি ধাকত।'

অনেকক্ষণ থেকেই অনিমেষ সোজা হয়ে বসে ছিল। ওরা যখন প্রথম এদিকে এগিয়ে এসেছিল তখন ও বুঝতে পারিনি, কিন্তু মহিলাকে খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। কোথায় ওঁকে দেখেছে এটাই মনে করতে পারছিল না সে। কিন্তু যেই উনি কথা বলতে শুনে করলেন তখনই তিঙ্গার চরের সেই সকালবেলার ট্যাঙ্গিটা ওর চোখের সামনে এসে দাঢ়াল। সেই কাবুলিওয়ালাদের গান, তার শরীরে ভার রেখে বসা এই মহিলা, সেই শুভবয়-মার্কী ছেলেটি আর সর্বদা হৃকে-কথা-বলা ভদ্রলোক-ও স্পষ্ট দেখতে পেল। অনিমেষ তখনই এই ভদ্রলোকের দিকে লক্ষ করল, কোনো মানুষের চেহারা এত পালটে যায়? কী মোগা এবং কালী হয়ে গেছেন ইনি। পরনে প্যান্ট আর হাওয়াই শর্ট। একে একা দেখলে সে করবেনই চিনতে পারত না। অর্থ মহিলাটি একইরকম আছেন, তেমনি স্বিভালস ব্লাউজ, কড়া প্রসাধন আর মেজাজি কথবার্তা। তুলনায় ভদ্রলোক অনেক নিষ্পত্ত, ওঁকে দেখলেই মনে হয় ইদানীং খুব অর্থকষ্টে রয়েছেন। ওরা ওঁকে চিনতে পারেননি, ‘কয়েক বছর আগে সামান্য এক ঘট্টার সঙ্গীকে মনে রাখার কথাও নয়। অনিমেষের সেই কুকুরোগীটার কথা মনে পড়ল। ওকে হাত দিয়ে জল থেকে টেনে তুলেছিল বলে ভদ্রলোক কাৰ্বলিক সাবান ব্যবহার করতে বলেছিলেন। হাসি পেল অনিমেষের, সেসব না করেও তো ও অক্ষত আছে! সেদিন ভদ্রমহিলা ওর ছোয়াচ বাঁচাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে বাগড়া যিটিয়ে নিয়েছিলেন।

সরিষ্ঠশেখর ফিরে এসে বেঞ্চিতে বসে বললেন, ‘তিড় হচ্ছে, হরতাল বলে লোকে আঞ্জকাল তয় পায় না।’ এই সময় মহিলার বোধহয় বেঞ্চিটা নজরে পড়ল। তিনি মেয়েকে নিয়ে বাঁকি বেঞ্চিটা দখল করলেন। কাছাকাছি হতেই অনিমেষ সেই যিষি গুৰুটা টের পেল, ট্যাঙ্গিতে বসে যেটাতে ফুলের বাগান বলে মনে হয়েছিল। কী আৰ্চ্য, এতগুৰো বছৰেও তিনি গুৰুটাকে স্যাত্তে বাঁচিয়ে রেখে এসেছেন। সরিষ্ঠশেখের মুখের পাশটা দেখতে পাইল অনিমেষ, তিনি অৱস্থা বোধ করছেন।

এই সময় ভদ্রলোক কিছু করতে হবে বলেই যেন যেতে কথা বললেন, ‘আপনারা কলকাতায় যাচ্ছেন?’

সরিষ্ঠশেখর তাঁর দিকে একটু লক্ষ করে ঘাড় নাড়লেন, ‘না, আমার নাতি একাই যাচ্ছে।’

ভদ্রলোক অনিমেষকে জিজাসা করলেন, ‘তুমি বুঝি কলকাতায় পড়?’

সরিষ্ঠশেখরই জবাবটা দিলেন, ‘ও এবার ফার্ট ডিভিলে পাশ করেছে, কলকাতায় কলেজে ভরতি হতে যাচ্ছে।’

‘বাঃ, শুভ! আমার মেয়েও বেরিয়েছে এবার, তবে ও শাস্তিনিকেতনে পড়বে। ওর মা আর ও যাচ্ছে-বোলপুরে নামবে।’

ভদ্রলোক কথা শেষ করা মাঝে মহিলা বলে উঠলেন, ‘বোলপুরে আমার ভাই তাকে, খুব বড় প্রফেসর। তা তুমি ভাই বোলপুর অবধি আমাদের একটু হেল্প কোরো, কী, করবে তো?’

অনিমেষ মাথা নাড়ল। সে দেখল দাদু সামনের দিকে মুখ করে রসে আছেন আর মহিলার হাসিহাসি-মুখের পেছনে ওর মেয়ে জু কুচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ‘কী নাম তোমার, ভাই?’ মহিলা আবার জিজাসা করলেন।

‘অনিমেষ!’ নাম বলে অনিমেষ একটু আশা করল ওঁরা হয়তো চিনতে পারবেন।

এবার কিছুই হল না। বৱং মেয়েটি আকশ্মিকভাবে উন্মেষিত গলায় বলে উঠল, ‘ওই দ্যাখো মা, গোবিন্দদারা আসছে।’

অনিমেষ দেখল তিনটি ওর চেয়ে বড় ছেলে হাসতে হাসতে এসে সামনে দাঢ়াল, ‘কী বউদি, না বলে কখন বেরিয়ে এলেন, বাড়ি গিয়ে আমরা ফল্স খেয়ে গেলাম।’

মহিলা খুব আদুরে ডঙিতে বললেন, ‘ওয়া, কতক্ষণ অগেক্ষা করব? ট্রেন এসে যাবে না? এখন এই তিড় দেখে ভাৰী কী করে গাড়িতে জায়গা পাব।’

রঙিন শার্ট পরা ছেলেটি হাত নাড়ল, ‘এসে গোছি যখন তখন আর তিঙ্গা করবেন না। ট্রেন এলেই বড়ি ফেলে দেব-দুটো শোওয়ার জায়গা কৰজা করতে না পারলে আমার নাম গোবিন্দ না।’

ছেলেগুলো কথা বলছিল আর বারবার মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছিল। মেয়েটির চোখেমুখে নানারকম দং পৰগু ঘোৱাফেৰা কৰছে। অনিমেষ দেখল ওরা এবার ওকেও লক্ষ কৰছে এবং দৃষ্টিটা ভালো নয়। সে মুখ ফিরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তিনি চূপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন এই ছেলেগুলোর উপস্থিতি ওঁর কাছে কিছু নয়। ছেলেরা যে ওঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি সেটা অনিমেষ লক্ষ কৰেছিল। ও এদের সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারছিল না-এদের কাউকেহ ও আগে দেখেনি।

একসময় প্ল্যাটফর্মটা চপ্পল হয়ে উঠল। দূরে আশ্রমগাড়া ছাড়িয়ে কোথাও ইঞ্জিনটা হইসল দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওদিকের আকাশে কালো ধোয়া পাক থাক্কে। সরিষ্পেখের এতক্ষণে কথা বললেন, ‘তোমার ট্রেন এসে গেছে।’

হইহই চ্যাচামেটির মধ্যে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ঝুড়ে দাঁড়াল। গাড়িটা কিন্তু আজ একদম খালি, এমনকি ফ্র-কোচেও ভিড় নেই। তবু গোবিন্দরা সাফিয়ে কম্পার্টমেন্টে উঠে অনাবশ্যক ঠিকার করে জায়গা দখল করল। অনিমেষ নিচিতে জানালার পাশে একটা জায়গা পেয়ে জিনিসপত্র রেখে নিচে নামতে যাবে এই সময় দ্বৃহীলা কল্যাসমেত উপরে উঠে এলুন। অনিমেষকে দেখে বললেন, ‘জায়গা পেয়েছ’ ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল সে। ‘বাথকুমটা কোথায়? জল-টেল আছে কি না কে জানে?’ কথাটা যেন শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গিতে অনিমেষ নিচে নেমে এল। শুর মনে হচ্ছিল যাওয়াটা খুব সুখকর হবে না, এই মহিলা ওকে আছ্ছ করে থাটাবেন।

প্ল্যাটফর্মে দানু দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওকে দেখে বললেন, ‘টিকিটটা তোমাকে দিয়েছি তো?’

অনিমেষ বলল, ‘হ্যাঁ।

‘তুমি গিয়েই চিঠি দেবে।’

‘আছ্ছ।’

‘আর বাইরের লোকের সঙ্গে বেশি আঞ্চায়তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। সবার সঙ্গে মানসিকভায় নাও মিলতে পারে।’ কথাটা শেষ করে তিনি ট্রেনের জানালার দিকে তাকালেন, সেখানে গোবিন্দরা খুব হইচই করছে। অনিমেষ দানুর দিকে তাকাল। ও চলে যাক্ষে অথচ দানুর মুখদেখে মনে হচ্ছে না তিনি একটুও দৃঢ়ভিত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সরিষ্পেখের বললেন, ‘এবার তুমি উঠে পড়ো, এখনই ট্রেন ছেড়ে দেবে। জিনিসপত্র নজরে রাখবে—পথে চুরিটুরি খুব হয়।’

এবার অনিমেষ নিচু হয়ে সরিষ্পেখেরকে প্রণাম করল। ওর হাত তাঁর শুকনো পায়ের চামড়া যেটুকু কাপড়ের জুতোর বাইরে ছিল সেখানে রাখতেই ও মাথায় স্পর্শ পেল। সরিষ্পেখের দুহাত দিয়ে তার মাথা ধরিয়ে বিড়িবিড়ি করে কিছু কথা উচ্চারণ করছেন। অনিমেষ শেষ বাকাটি শুনতে পেল, ‘বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, হৃদয় দাও।’ ও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেই সমস্ত শরীর শিরশিরি করে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল, অনিমেষ আর নিজেকে সামলাতে পারল না, বরবার করে জল দুচোখ থেকে গালে নেমে এল। সরিষ্পেখের সেদিকে তাকিয়ে খুব নিচু গলায় বললেন, ‘চোখ মোছো অনিমেষ, পুরুষমানুষের কাব্য শোভা পায়নি।’

নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল ওর, স্টো বেঁকে যাচ্ছিল। এই মানুষটির সঙ্গে আজন্যাকাল তার ক্ষেত্রে, তার সবকিছু শিক্ষা এর কাছে, অথচ আজ অবধি সে একে ঠিক নিতে পারল না। সরিষ্পেখের ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে অনিমেষের কাঁধে রাখলেন, ‘অনিমেষ, আমি অশিক্ষিত এবং খুব গরিব। কিন্তু আমার পিতাঠাকুর আয়াকে বলেছিলেন মানুষ হতে। আমি চেষ্টা করেছি, তোমাকেও সেই চেষ্টা করতে হবে। তুমি কলকাতায় গিয়ে শিক্ষিত হও, তোমার ছিত্তি হোক সেটাই আমার আনন্দ। আমি যা পারিনি আমার ছেলেরা যা করেনি তুমি তা-ই করো। মানুষের জন্ম পূর্ণতার জন্মে, তোমার মধ্যেই সেটা আমি পেতে পারি। আমার জন্মে ভেবো না, যতদিন তুমি মাথা উঠু করে না ফিরে আসছ ততদিন আমি বেঁচে তাকব। আইন উইল ওয়েট ফর ইউ। যাও, তোমার গাড়ি হইসল দিয়েছে।’

‘হ্যাঁ ভাই, সহ্য করে নিলেই আনন্দ। যে-কোনো সৃষ্টির সময় যন্ত্রণা যদি না আসে, তা হলে সে-সৃষ্টি বথা হয়ে যায়। তোমার আজ নতুন জন্ম হতে যাছে—কষ্ট তো হবেই।’ সরিষ্পেখের বললেন।

এই মহুর্তে অনিমেষের অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, এই মানুষটিকে জাড়িয়ে ধরে ছেলেবেলায় সে যেমন ঘুমোত তেমনি-কিছু করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে কিছুক্ষণ পাথরের মতো মুখটাৰ দিকে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে ফিরে দাঁড়াল। ও দেখল সেই অদ্বলোক ট্রেন থেকে নেমে আসছেন। উনি কখন উঠেছিলেন তা সে লক্ষ করেনি। অদ্বলোক নেমে বললেন, ‘উঠো পড়ো ভাই, গাড়ি এখনই ছাড়বে।’

একটা একটা করে সিড়ি ভেঙে অনিমেষ দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সরিষ্পেখের এগিয়ে এলেন, ‘চিঠি দেবে। আর হ্যাঁ, যাহিকেও রিখবে।’

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। এই সময়ে ট্রেনটা হইসল বাজিয়ে দুলে উঠেছে গোবিন্দরা ওর পাশ দিয়ে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে জানালার কাছে চলে গেল। খুব আস্তে ট্রেনটা চলছে। সরিষ্পেখের লাঠি-

হাতে ওর সামনে হাঁটছেন। অনিমেষ কান্না গিলতে গিলতে বলল, ‘দাদু!’

সরিষ্পেখের বললেন, ‘এসো ভাই! আমি অপেক্ষা করব।’

একসময় আর তাল রাখতে পারলেন না সরিষ্পেখের। ট্রেনটা গতি নিয়েছে। খানিক এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গের অঙ্ককার নেমে এসেছে পথবীতে। অনিমেষ ঝুকে পড়ে দানুকে দেখতে লাগল। অনেক লোকের ডিক্কে নিঃসন্ত মানুষটা একা দাঁড়িয়ে আছেন। ও হাত নাড়তে শিরে ধমকে গেল, সরিষ্পেখের ডান হাতের পাঞ্জবিতে নিজের চোখ মুছে পেচনদি’ক হাঁটতে আরও করেছেন। অনিমেষ আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সমস্ত চারচর যেন অস্পষ্ট, একটা সাদা পর্দার আড়ালে চলে গেল। স্টেশনের আলো, মানুষ সব মিলেমিশে একটা পিণ্ডাপাড়ার রেলক্রসিং বোধহয়। হৃষি করে বেরিয়ে গেল। যে-কালো রাতটা চুপচাপ জলাপাইগুড়ির ওপর নেমে এসেছে, এই ছুটত্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। দুষ্টি যখন অগম্য হত কল্পনা সৃষ্টা হয়ে যায়। কিন্তু চোখের জলের আড়াল চোখের এত কাছে যে অনিমেষ দানুর মুখকেই ভালো করে তৈরি করে নিতে পারছিল না। সঙ্গে পার হওয়ায় বাতাস এসে ওর ভেজা গালে শুধুই শীতলতা এন দিচ্ছিল। অনিমেষ চোখ মোছার চেষ্টা করল না।

নিয়মিত শব্দের আয়োজন রেখে ট্রেনটা যখন আয় ফাটাপুরুরের কাছবরাবর চলে এসেছে ঠিক তখন অনিমেষ পেছনে কারও আসার শব্দ পেল। আরে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ, আর আমি ঝুঁজে মরছি, কোথায় গেল হেলেটা! ও পেছন ফিরে ভুমভিলাকে দেখতে পেল, বেসিনে হাত ধূতে ধূতে বলছেন। বাঁ হাতের কনুই-এ ঘোলানো তোয়ালেটা হাতে নিয়ে মহিলা কয়েক পা এগিয়ে এলেন, ‘ওমা তুমি কাঁদছিলে নাকি, একদম বাচ্চা ছেলে, মন-কেমন করছে বুঝি?’

চোখের জলের কথা খেয়াল ছিল না। অনিমেষ অপ্রস্তুত হয়ে গালে হাত দিল। দরজাটা বঙ্গ করে সে এবার মহিলার পেছন পেছন ভেতরে চলে এল। পুরো কামরায় দশ-বারোজনের বেশি লোক নেই, ফলে যে যার শোওয়ার জ্যায়গা পেয়ে গেছে। মহিলারা একেবারে কোনায় জ্যায়গা দখল করেছেন,, অনিমেষ তার আগের খোপের সামনে দাঁড়াল। মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি এখানে কেন, আগাম ওখানে প্রচুর জ্যায়গা আছে, চলে এসো, আবার কোনো উটকো লোক এসে জুটবে হয়তো। ওকে ইত্তেক করতে দেখে কপট রাগ করলেন মহিলা, ‘কী হবে কী, তনতে পাছ নাঃ চলে এসো!’

এখন কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, চুপচাপ জানলায় বসে অঙ্ককারের দিকে তাকিয়ে থাকলে ভালো লাগবে। অথচ মহিলা যেভাবে কথা বলছেন তাতে মুখের ওপর না বলা যায় না। ও তবু বলল, ‘আপনি বসুন, আমি আসছি।’

নিজের খোপে এল অনিমেষ। ওর ছোট ব্যাগ আর বেড়ি কোনায় দিকে রাখা আছে। সেগুলোকে সরিয়ে জানলার পাশে বসল ও। উলটোদিকের বেঁকিতে একজন বুড়োমতন মানুষ দুটো বাচ্চা নিয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে। চোখাচোবি হতে বলল, ‘শিশিগুড়ি আর কটা স্টেশন বাবুঁ?’

অনিমেষ বলল, ‘তিন-চারটে হবে।’ লোকটা বিড়ি জানলা দিয়ে ফেলে চোখ বঙ্গ করল। হহ করে গাড়ি ছুটছে। বাইরের অঙ্ককারে চোখ রাখল অনিমেষ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না অথচ কালকে আকাশে চাঁদ ছিল। হঠাৎ চটপটি জুলার মতো আকাশটাকে চিরে একটা আলো বলসে উঠতেই মাঠ গাছ পুরু সামনে পলকের জন্য পরিষ্কার হয়ে সিলিয়ে গেল। আকাশ যেমন চেয়ে গেছে, আজ চাঁদ উঠবে না।

জলপাইগুড়ি শহর এখন অনেক পেছনে, ট্রেনের চাকার প্রত্যেকটা আবর্তনে কলকাতা এগিয়ে আসছে। আজ সারা বাংলাদেশে হরতাল হয়ে গেল। কিন্তু এ কেমন হরতাল! জলপাইগুড়িতে এর কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। তা হলে কি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করলে দেশের মানুষ তা সমর্থন করে নাঃ কলকাতা শহরে আজ কী হয়েছে কে জানেঁ। সেখানকার মানুষ আর জলপাইগুড়ির মানুষ কি আলাদা! অনিমেষ অঙ্ককারের দিকে অলসভাবে তাকিয়ে বিদ্যুতের খেলা দেখছিল। জোলো হায়ো দিচ্ছে, বোধহয় বৃষ্টি নামবে। কলকাতায় বৃষ্টি হলে জল জমে যায়, খবরের কাগজে ছবি দেখেছে সে।

সামান্য পায়ের শব্দ সেইসঙ্গে মিটি একটা গঢ়ে অনিমেষ মুখ ফেরাল। ফেরাতেই ঘটপট সোজা হয়ে বসল সে। মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির দুলুনি সামলাতে এক হাতে বাঙ্কটা ধরায় ওকে বেড় বড়সড় দেখাচ্ছে।

‘কী ব্যাপার, আপনার বুঝি আমাদের কাছে আসতেই ইচ্ছে করছে নাঃ’ কথা বলার ভঙ্গি এমন

আদুরে যে বয়সের সঙ্গে মানায় না। শরীর বেশিরকম শ্রীত, কাটের কাপড়ে টান পড়েছে। ওর হাত এবং হাঁটুর ওপর মুক্ত পা ধেকে চোখ সরিয়ে নিল অনিমেষ। মেয়েটি মুখ নেপালি-নেপালি ছাপ আছে, চোখ দিয়ে হাসছে সে। 'কী হল, কথা বলছেন না কেন?'

'যাচ্ছি।' অনিমেষ উঠার চেষ্টা করল।

'যাচ্ছি না, আমার সঙ্গে চলুন, মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।' একটুও নড়েছে না মেয়েটি, 'ফার্স্ট ডিভিনে পাশ করলেই শুভ বয় হতে হয়।'

'আমি মোটেই শুভ বয় নয়।' অগত্যা অনিমেষ ওর জিনিসপত্র দুহাতে তুলে উঠে দাঢ়াল। মেয়েটি সামান্য সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার নাম তো অনিমেষ, আমার নাম জিঙ্গাসা করতে ইচ্ছে করছে না!'

অনিমেষ কোনোরকমে দুলুনি সামলে বলল, 'নাম কী?'

মুখে আঙুলচাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসতে গিয়েই, গিলে ফেলে বুঢ়োর দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করল, 'সুরমা। একদম সেকেলে নাম, না?'

অনিমেষ হেসে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। মেয়েটির পাশ দিয়ে আসবার সময় ওর কুরু অস্তিত্ব হচ্ছিল, কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া হল না সুরমার। অনিমেষ মেয়েটিকে যত দেখছিল তত অবাক হচ্ছিল। এ-মেয়ে সীতার মতো নয়, এমনকি রঞ্জ বা উর্বশীর সঙ্গে এর কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েরা বোধহ্য এক-একজন এক-এক রকম হয়, কেউ বোধহ্য কারও মতন হয় না।

ওদের খোপে এসে অবাক হয়ে গেল অনিমেষ। মুখেয়ে মুখি দুটো বোঝিতে লাশ করে বিছানা পাতা হয়ে গেছে। জিনিসপত্র ওপরের বাকে তোলা। মহিলা বালিশে হেলান দিয়ে একটা রঙিন পত্রিকা পড়ছেন। অবাক হবার পালা অনিমেষের চলছেই, কারণ মহিলার পরনে সেই বাঁড়িটা নেই। এখন পা-কুল একটা আলখাল্লা পরে রয়েছেন উনি। ওকেদেখে পত্রিকা থেকে মুখ তুলে একগাল হাসলেন, 'এসো, সু না গেলে বোধহ্য আসতেই না। আচ্ছা, শুই জিনিসপত্র ওপরের বাকে তুলে দাও।'

বাধ্য হেলের মতো অনিমেষ হৃকুম তামিল করল। ততক্ষণে সুরমা অন্য বেরিকির জানলার ধারে বসে পড়েছে। মহিলা বললেন, 'বসে পড়ো, এখানেই বসো।' হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে চাদর সারিয়ে নিলেন মহিলা। অনিমেষ বসে মহিলার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। ওর চট্ট করে মুভিং ক্যাসেলের মুখটা মনে পড়ল। ঠিক সেই একই দৃশ্য, মহিলার আলখাল্লার ওপরে অনেকখানি খোলা এবং সেখানে বাজহাসের ডিমের মতো দুটো মাংসগুণ উঁচু হয়ে রয়েছে।

'তুমি কি খাবার এনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গেও আছে। তোমারটা আর থেতে হবে না। আমি ভাবছি এই সুখ আর কতক্ষণ কপালে সইবে। শিরিগুড়িতে গিয়ে দেখব হত্ত্বড় করে হাজার লোক উঠে বসেছে। আমি আবার শাড়ি পরে রাত্তি পারি না।' মহিলা আবার পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেন।

অনিমেষ দেখল সুরমা ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। চোখাচোরি হতে বলল, 'শুনলাম আপনি কাঁদছিলেন, মাঝের জন্য-কেমন করছে বুঝি?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়াল, 'না।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা পত্রিকা সরিয়ে চোখ বড় বড় করলেন, 'ওমা, তবে কার জন্যে?' কথা বলার তঙ্গি এমন ছিল যে সুরমা খিলখিল করে হেসে উঠল। মহিলা কপট রাগের তঙ্গি করে মেয়ের দিকে মুখ ফেরালেন, 'এই, তোকে বছি না এমন করে হাসবি না! মেয়েদের এরকম হাসি ভালা না।'

অনিমেষের অস্তি বেড়ে গেল। এরা যেভাবে কথা বলছে তাতে তার সঙ্গে তাল রাখা ওর পক্ষে সজব নয়।

মহিলা জিঙ্গাসা করলেন, 'তুমিকি জেলা স্কুলের চাত্র ছিলে?'

মাথা নাড়ি অনিমেষ, 'হ্যাঁ।'

'ওমা, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছ না কেন? অবসিধে হচ্ছে?'

ঘাড় নেড়ে তাকাল অনিমেষ, সেই একই দৃশ্য। অনিমেষ হজম করার চেষ্টা করতে লাগল।

সুরমা বলল, 'জেলা স্কুল! উর্বশীদের আপনি চেনেন?'

থতমত হয়ে গেল অনিমেষ। তারপর ঘাড় নাড়ল, 'দেখেছি।'

'বাবা, জেলা স্কুলের সব ছেলে তো ওদের বাঁড়িতে সারাক্ষণ পড়ে থাকে।' ঠোঁট বেঁকিয়ে সুরমা

কথা বললে, ‘ওরা তো এখন কলকাতায়। আপনার সঙ্গে আলাপ নেই?’

‘অনিমেষ বলল, ‘সামান্য।’

মহিলা ঘাড় নেড়ে বললেন, ‘ওদের যা আমার বক্স। ভদ্রলোক তো সারাজীবন কঠগ্রেস করে কাটালেন, মিসেস কর না থাকলে যে কী হত? তবু দ্যাখো, লোকে বদনাম দিতে ছাড়ে না। আমাদের এই দেশটাই এরকম। কেউ যদি একটু সাজগোজ করল, কি আধুনিক পোশাক পরল, ব্যস, চারখারে ঘই ফুটতে আরঞ্জ হল। এই আমিহি কি কম শুনেছি!'

শিলিঙ্গড়িতে এসে ওদের গাড়িটা নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো আগে মহিলা জোর করে ওকে পরোটা আর শুকনো মাংস খাইয়েছেন। দারুণ রান্না! একটু বাল, বোধহয় এদের ওয়াটার-বটলটা নিয়ে জল আনতে প্ল্যাটফর্মে নামল। অল্প লোক টেমনে। এত বড় প্ল্যাটফর্ম এর আগে দেখেনি অনিমেষ। চারিধার নিউন আলোয় বকবক করছে। এখনও বৃষ্টি নামেনি। কুলিরা কীসব কথা বলাবলি করছে। যদিও এর আগে কোনোদিন সে এই টেমনে আসেনি, তবু ওর মেন মনে হল এই আবহাওয়া স্বাভাবিক নয়। বেশির ভাগ গাড়িই খালি। জল ভরে নিয়ে হঠাৎ একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করল। এর আগে কখনো একা একা সিগারেট খায়নি অনিমেষ। একটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ও সিগারেট কিনে ধরাতে গিয়ে শুনল একজন লোক খুব উন্নেজিত গলায় বলছে, ‘একটু আগে রেডিওতে বলল, দুজন খুন হয়েছে। কলকাতায় শুলি চালালে মাত্র দুজন মরবে? অসম্ভব! শালারা খবর চাপছে।’

আর-একজন বলল, ‘তা হলে তো কাল কলকাতায় আগুন জ্বলবে। পারিক ছেড়েদেবে নাকিএরকম হলুব।’

‘আরে মশাই, আজ নাকি বাস পুড়িয়েছে তিনটে, রেডিওর খবর-বুরো দেখুন।’

‘হয়ে গেল, এই ট্রেন শেষ পর্যন্ত পৌছাবে কি না দেখুন।’

আরও খবরের আশায় খানিক দাঁড়িয়ে থাকল অনিমেষ। কিন্তু ওরা আর-কিছু বলছেনা দেখে মুখ তুলে তাকাল। লোক দুটো কথা বক্স করে ওর দিকে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই মুখ সরিয়ে নিয়ে দূজনে হাঁটে লাগল। সে স্পষ্ট শুনতে পেল, ওদের একজন চাপা গলায় বলছে, ‘এসব জায়গায় কতো বলা টিক নয়, দিনকাল কারাপ, কে যে কী ধান্দায় পুরছে বলা মুশকিল।’

লোকগুলো কি ওকে সন্দেহ করল? কেন, সন্দেহ কেন? অনিমেষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিন্তুক্ষণ। ওর চেহারার মধ্যে কি এমন কোনো চিহ্ন আছে যে অত বড় দুটো মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তুই বুবাতে না পেরে ও আন্তে-আন্তে ফিরে আসছিল নিজের কামরার দিকে। কলকাতায় আজ পুলিশ শুলি চালাল কেন? লোকেরা বাসই-বা পোড়াতে গেল কেন খামোকা? এই ট্রেন শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাবে না কেন?

কামরায় উঠে ও চমৎকৃত হল। কখন যে একটু একটু করে গাড়িটা বরে পিয়েছে বাইরে থেকে টের পায়নি এবং শুধু মানুষই নয়, চিকার করে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। একজন টাকমাথা মানুষ প্রথম খোপের বেশিতে বসে গলা তুলে বললেন, ‘আরে মশাই, আমি নিজের কানে বাল্লা খবর দেবেছি, লেফটিন্টেন্ট স্ট্রাইক বানচাল হয়ে যাচ্ছে দেবে শুণামি করে ট্রামবাস পুড়িয়ে দিতে পুলিশ যাধ্য হয়ে দুএক রাউন্ড ফায়ারিং করবেছে।’

‘সঙ্গে সঙ্গে একজন চেঁচিয়ে উঠল, ‘দাদু কি স্পষ্টে ছিলেন?’

‘আচ্ছা বৃক্ষি আপনার, দেখছেন এখানে বসে আছি, রেডিওতে বলল!'-টাকমাথা বিচিয়ে উঠলেন।

‘আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক আজকের প্লেনে কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি বললেন, কমপ্লিট স্ট্রাইক হয়েছে কলকাতায়। গরমেন্ট জোর করে ট্রামবাস চালাতে চেষ্টা করে ফেল করবেছে। কোন খবর বিশ্বাস করব বলুন?’ আর-একটি কষ্ট বলে উঠল।

‘আরে মশাই, আমি ভাবছি কাল শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌছাতে পারব কি না কে জানে! যদিপথে ট্রেন আটকে দেয়, অনেক টাকার টেক্সা হাতছাড়া হয়ে যাবে।’

‘প্লেনে গেলে পারতেন।’

‘সে-চেষ্টা কি করিনি, টিকিট সব হাওয়া এই মওকায়া।’

ওয়াটার-বটল নিয়ে অনিমেষ কামরার শেষপাণ্ডে চলে এল। একজন বৃক্ষ ভদ্রলোক ছাড়া

সুরমাদের এখানে কেউ ভিড় করেনি। ওরা দুটো বেঞ্চি বেশ মেজাজেই দখর করে আছে। বৃক্ষ অঙ্গুলোক মহিলার বেঞ্চির একটা কোনায় বসে আছেন। ওকে দেখে সুরমা বলে উঠল, ‘এই, আমারা তাবলাম যে আপনি নিচ্ছয়ই পথ ভূলে গিয়েছেন।’

মহিলা বললেন, ‘বুব কাজের ছেলে দেখছি, এত ভাবাও কেন?’

অনিমেষ উত্তেজিত গলায় বলল, ‘আজ কলকাতায় বুব গোলমাল হয়েছে ট্রাইক নিয়ে, বাস পুড়েছে, শুলিতে লোক মারা গিয়েছে।’

মহিলা আঁতকে উঠলেন, ‘সে কী! হবে?’

এই সময় ট্রেনটা দুলে উঠে চলতে শুরু করল। সুরমা জানলা দিয়ে সরে-যাওয়া টেশনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কালকাতায় হয়েছে তো আমাদের কী, আমরা তো শাস্তিনিকেতনে যাচ্ছি।’

এতক্ষণ বৃক্ষ অঙ্গুলোক চুপচাপ ওদের লক্ষ করছিলেন, এবার উদাস গলায় বললেন, ‘নগর পুড়লে কি দেবালয় এড়ায়? পাথে যখন নেমেছি তখন আর ভেবে কী লাভ, যা হবার তা হবে।’

কথাটা অনিমেষের ভালো লাগল। ওকে সুরমা বসার জায়গা দিয়েছিল। বৃক্ষের মুখোযুথি বসে ও জিজসা করল, ‘আপনি কোথায় যাবেন?’

‘কলকাতায়। তৃতীয় দোলপুরো?’

‘না, আমি কলকাতায় যাব।’

‘কলকাতায় কোথায়?’

ঠিকানাটা স্মরকেসে ধাকলেও রাস্তার নাম ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। অনিমেষ বলল, ‘সাত নম্বর হবেন মল্লিক লেন, কলকাতা বাবো।’

বৃক্ষ হেসে ফেলেন, ‘তৃতীয় কলকাতায় এর আগে যাওনি, না?’

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, ‘না। বাবার এক বৃক্ষ টেশনে আসবেন।’

তোমার ঠিকানা থেকে আমার বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাতা, টেশনের কাছেই বউবাজারে।
কলকাতায় পড়তে যাচ্ছু’
‘হ্যাঁ।’

‘অন্য দিন হলে ট্রেনে জায়গা পাওয়া যেত না, আজ গড়ের মাঠ। প্যানিক একেই বলে। এবার একটু শোয়ার ব্যবস্থা করা যাক। আমি বরং ওপরের বাকে উঠে পড়ি, একদম কাল সকালে মানহারিঘা না এলে উঠেছি না।’ উপযাচক হয়েই অনিমেষ বৃক্ষকে সাহায্য করল। সমস্ত মালপত্র একটা বাকে জমা করে বৃক্ষের জায়গা অন্যটায় কেঁকে দিল। ওর নিচেষ্ট ঠিকানার কাছাকাছি একটা মানুষকে পেয়ে বুকে এখন বেয় সাহস এসেছে। যদি শাবার বন্ধুকে টেশনে চিনতে না পারে তা হলে আর জলে পড়তে হবে না।

রাত বাড়লে ছুটস্ত কামরায় একটা অস্তুত নির্জনতা সৃষ্টি হয়। ফাঁকা মাঠ অথবা নদীর ওপর দিয়ে যেতে-যেতে রাতের রেলগাড়ি গভীর শব্দে চুরাচর কাঁপিয়ে যায়, তখন চুপচাপ বসে ধাকা বড় মুশকিল। এখন কামরাভৱিতি স্থূল, কেউ কোনো কথা বলছে না। মাঝে-মাঝে অজ্ঞান অচেনা টেমনে গাড়ি ধামছে, কখনো কেরিওয়ালার চিকিৎসা, কখনো তাও নেই। এই কামরায় যাত্রীরা সভাব্য ভয়ের হাত থেমে নিচিত হবার জন্য দরজা লক করে রাখায় কাটিহার টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে কেউ-কেউ ধাকা দিয়ে খোলার চেষ্টা করেছিল। নিচ্ছয়ই তখন অবধি দরজার নিকটবর্তীরা জেগে ছিলেন, কিন্তু দরজা খোলা হয়নি। এখন ট্রেনের দুলুনিতে চাকার শব্দ আর বাইরে আকাশভাঙ্গা বৃষ্টির শীতলতায় সমস্ত কামরা গভীর স্থূলে অচেতন।

ওর শোয়ার ব্যবস্থা করার জন্য মহিলা বুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওপরের একটা বাক থেকে মালপত্র নামিয়ে শোয়া যেত কিন্তু অনিমেষের আর পরিশ্রম করতে ইচ্ছে করছিল না। ওর আজকের রাতে স্থুমাতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। শেষ পর্যন্ত মহিলা তাকে পারের কাছে অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, ইচ্ছে করলে আধশোয়া হয়ে গড়িয়ে নিতে পারে। ওপরের বাকে বৃক্ষের নাক ট্রেনের চাকার শব্দের সঙ্গে তাল রেখে চমৎকার ডেকে যাচ্ছে। প্রথম দিকে অসুবিধে হচ্ছিল, এখন এই নির্জনতায় সেটা খুপ থেমে গেছে। মহিলা দেওয়ালের দিকে পাশ কিরে চাদরমুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে ঘুমোচ্ছেন। এখন ওকে একদম অন্যরকম লাগছে। মানুষের দ্বয়ই বোধহয় তাকে সরলতা এনে দিতে পারে। অন্য বেঞ্চিতে সুরমা চিত হয়ে তরে আছে। চাদর গলা অবধি টানা।

বৃষ্টি সমস্ত শরীরে মেখে ছুটস্ত রেলগাড়িতে এখন শীতল বাতাস চুকচে। যদিও জানলার কাছ

নামানো তবু কোথাও বোধহয় ছিদ্র আছে। অনিমেষ অলস ভঙ্গিতে সামনের বেঞ্জিতে পা তুলে দিয়ে জানালায় চোখ রাখল। পুরু জলের ধারা কাটাকে ঘোলাটে করে দিয়েছে। এখন দাঢ়ু নিশ্চয়ই ঘূময়ে পড়েছেন। পিসিমাঃ অত বড় বাড়িতে দুজন বৃক্ষ মানুষ বিছিন্ন দীপের মতো এই রাত্রে-শুধু এই রাত কেন, বাকি জীবন কীভাবে কাটাবেন। আই উইল ওয়েট ফর ইউ! অনিমেষের এই কথাটা মনে আসতেই কেমন কান্না পেয়ে গেল।

হঠাতেও টেরে পেল পায়ের ওপর কিসের স্পর্শ, মৃদু চাপ দিছে। ও ঝাঁকে পা সরিয়ে নিয়ে চোখ খুলতেই কিছু বুঝতে পারল না। সামনে সুরমা ঘূমছে। ঘূমের ঘোরে কি ওর পায়ের সঙ্গে পা লেগেছে? সেই সময় সুরমা চোখ খুল, তারপর খুব চাপা গলায় বলল, ‘ঘূম আসছে না?’

অনিমেষ হেসে মাথা নাড়ল।

‘কার জন্যে মন-কেমন করছে?’

‘কারও জন্যে নয়।’

‘ধৈর্য, যিথে কথা বলা হচ্ছে। আমার যে তা-ই হচ্ছে, একদম ঘূম আসছে না।’

‘কেন?’

লজ্জা-লজ্জা কুশ করল সুরমা, তারপর বলল, ‘সব ছেড়ে যেতে কারও ভালো লাগে?’

‘শাস্তিনিকেতনে গেলে ভালো লাগবে।’

‘মা ঘূমছে?’

হ্যাঁ।’ অনিমেষ মহিলার দিকে তাকাল।

‘গোবিন্দদাকে কেমন লাগল?’ ফিসফিস করে বলল সুরমা।

‘ভালো, কেন?’

‘বাবা বলে, শুগা বদমাশ।’ তারপর একটা দীর্ঘস্থান ফেলে বলল, ‘মা বলে মেয়েরা নাকি কচুরিপানার মতো, যে-কোনো জাঙগায় ঠিক জাঙগা করে নেয়।’

অনিমেষ কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। ওর হঠাতে সীতার কথা মনে পড়ল। সীতা এখন কী করছে? বুকের মধ্যে হড়মড় করে যেন সমস্ত ট্রেনটা ঢুকে পড়ল। ও প্রচণ্ড অঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না। পাশ ফিরতেই ও সোজা হয়ে দাঢ়াল। চাদরের তলায় সু-মার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। ও চট করে সুরমার মুখের দিকে তাকাল। অ একটা হাত তাঁজ করে চোখের ওপর চাপা দেওয়া আর দুটো গাল ভিজিয়ে টিপে রাখা টেরের দিকে জল গড়িয়ে আসছে। অনিমেষ হতভয় হয়ে গেল।

এই সময় কোনো বিরাট নদীর ওপর ট্রেন উঠে এল। চারধারে গমগম আওয়াজ কানে তালা খরিয়ে দিছিল। কারও কান্না দেখলেই চোখে জল এসে যায় কেন? অনেকদিন বাদে হঠাতে সেই লাইনগুলো মাথার মধ্যে ছুটে এল, ‘আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই-আমাদের আছে কেবল সুজলা সুফলা মলবজসমীরা শীতলা-।’ জোরে গলা খুলে এই লাইনগুলো উচ্চারণ করলেও পুরো ওপর ছুটে-যোগ্যা রেলগাড়ির শব্দে কেউ উন্তে পারবে না। কিন্তু মনেমনে লাইনটা মনে করতে গিয়েই ধমকে দাঁড়াল অনিমেষ। এখন আর এই লাইনগুলো একদম সাজ্জনা এনে দেয় না, বুকে জোর পাওয়া যাচ্ছে না একটুকুম। কেন? কেন এরকম হল? হঠাতে যেন অনিমেষ আবিকার করল তার কিছু-একটা খোয়া যেতে বসেছে।

মনিহারিঘাট টেশনে যখন ট্রেন থামল তখন সূর্য উঠব-উঠব করছে, আকাশ পরিষ্কার। মহিলা খুব চটপটে, খালিক আগেই মেয়েকে নিয়ে বাথরুমে শিয়ে ছিমছাম হয়ে এসেছেন। বিছানাপত্র ঘুরিয়ে অনিমেষকে ভাই সোনা বলে সেগুলোকে বাঁদিয়ে জানলার পাশে বসে আকাশ দেখছিলেন। আজ সকালে-পরা চমৎকার কমলারঙের শাড়ির ওর কঢ়ি কলাপাতা রোদ এসে পড়ায় ওঁকে খুব সুন্দরী মনে হচ্ছে। সুরমা পোশাক পালটায়নি, ঝুঁক্ষ চুল কপালের ওপর থেকে সরিয়ে বলল, ‘কী নাইস বালির র, না?’

অনিমেষের কাল নিশ্চয় রাত কেটেছে, এখন ভোরের হাওয়ায় ভালো লাগছিল। বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসেও দেখল দুধারে গাছপালা ঘরবাড়ি কিছুই নেই, যেন মরুভূমির ওর দিয়ে ট্রেনটা ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে চলছে। এই সময় ওপর থেকে বৃক্ষ ভদ্রলোক নেমে এলেন, ‘ঘাট এসে গেছে? আঃ, ফার্স্ট ক্লাস ঘূম হল।’ তারপর নিজু হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই সোজা হয়ে বাথরুমের দিকে

ছুটে গেলেন।

সুরমার কথাটা কানে গিয়েছিল, তাই ও বলল, ‘এখন নদী পার হতে হবে?’

মহিলা মুখ বিকৃত করলেন. ‘বদারেশন! এখনকার কুলিরা খুব ডেজারাস!’

মহিলা যখন এ-ধরনের কথা বলেন তখন তাঁকে মোটাই সুন্দর দেখায় না, বরং খুব কুটিল মনে হয়। কথাটা বলে এই যে উনি উদাস হয়ে সূর্যের দিকে তাকালেন তখন তাঁকে খুব সুন্দরী লাগছে, বিশেষ করে সকালবেলায় এই শাড়িটা পরায় সুরমার মা বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। সুরমার দিকে তাকাল অনিমেষ, কাল রাত্রে ও চূপচাপ অনেকক্ষণ মেঝেটাকে কাঁদতে দেখেছে। অবাক কাণ্ড! খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে হঠাৎ ওইসব কথা বলে কাঁদতে লাগল, আবার কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল। এখন এই সকালে ওকে দেখলে সেসব কেউ বিশ্বাসই করবে না।

গাড়ি মনিহারিঘাটে থামতেই চারধারে ইচ্ছাই ওর হয়ে গেল। গোলমালটা স্বাভাবিক নয়, অনিমেষ জানালা দিয়ে মুখ বের করে দেখল অসংখ্য স্বাস্থ্যবান কুলি সবাইকে ঠেলেঠেলে গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করছে। যাত্রীরা যাঁরা নামতে চাইছেন ওদের বিভক্তের কাছে নাজেহাল হয়ে পড়ছেন। চট করে মনে হয় বুঝি কিছু লোক খেপে গিয়ে ট্রেন আক্রমণ করেছে। এই সময় বৃক্ষ ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, ‘যে যার জ্যায়গায় বসে থাকুন, তিড় করে গেলে নামবেন, নইলে কুলিদের সামলালে পারবেন না।’ ওর কথা শেষ না হতেই চার-পাঁচজন কুলি এসে পড়ল ওদের মধ্যে, প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে মালপত্রের দ্বর নেবার চেষ্টা করছে। মহিলা বোধহয় ভয় পেয়ে অথবা রেঁগে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। সুরমা মুখে হাতচাপা দিয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত বৃক্ষ ভদ্রলোক ওদের সামলালেন না।’ ওর কথা শেষ না হতেই চার-পাঁচজন কুলি এসে পড়ল ওদের মধ্যে, প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে মালপত্রের দ্বর নেবার চেষ্টা করছে। মহিলা বোধহয় ভয় পেয়ে অথবা রেঁগে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। সুরমা মুখে হাতচাপা দিয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত বৃক্ষ ভদ্রলোক ওদের সামলালেন। একটা কুলির মালপত্র দুজনে বয়ে নিয়ে যাবে আবাদার করছে। অনিমেষের জিনিসপত্র সে নিজেই বইতে পারে, কিন্তু কুলি যখন দুজন করতেই হবে তখন মহিলা ওকে আলাদা নিতে দিলেন না। বৃক্ষ বললেন, ‘আগে দর চিক করে তবে মার তুলতে দেবেন।’

কথাটা বলতেই ওরা বিনয়ে গেলে, যা দেবে অনিমেষরা তা-ই ওরা নেবে। বাকি কুলিরা অন্যত্র চলে গেলে শেষ পর্যন্ত ওরা বলল, কুলিপিছু দশ টাকা চাই। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে দরকারাক্ষি করার পর সেটা অর্ধেকে নামিয়ে ওরা ট্রেন থেকে নামল। বৃক্ষ ভদ্রলোক বললেন, ‘শিলিপড়িতে এই মালপত্র আট আনায় বওয়ানো যেতে। এখানে টেন টাইমস বেশি। ভারতবর্ষের ইকোনমি কোনোদিন সমান হবে না।’ অনিমেষ কুলিদের দেখল, বেশি সহজভাবে ওরা হাঁটছে। এরকম চার-পাঁচবার মাল বইলেই ওরা মাসে ছয়-সাতশো টাকা রোজগার করতে পারে। এম এ পাশ করেও এত মাইনে সকলে পায় না। এখানে কোনোদিন হরতাল হয় না বোধহয়।

বৃক্ষ ভদ্রলোকের পাশ্চাপাশি হাঁটছিল অনিমেষ! এখানে কোনো স্টেশন নেই। বোঝাই যায় অস্থায়ী দেলাইন বসানো হয়েছে। বৃক্ষ বললেন, প্রায়ই ঘাট বন্দলায় তাই স্টেশন করার মানে হয় না। এমনকি এই যে দুপাশের চাটাই-এর দোকানগুলো, এরাও ঘাট বুঝে সরে-সরে যায়। ওদের দেখে দোকানদারারা চিৎকার করে ডাকাডাকি করছে চা-শিঙড়ার লোভ দেখিয়ে। বর্ষাকালে ইলিশমাছ আর তাত নাকি এসব দোকানের মতো আর কোথাও পাওয়া যায় না।

পিংপড়ের সারির মতো যাত্রীরা বালির চরে হেঁটে যাচ্ছিল। এদিকে বোধহয় বৃষ্টি হ্যানি। শুকনো বালি বাতাসে উড়ছে। দুটো কলিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে দেখে অনিমেষ ওদের ধরার জন্য দোড়াল। মহিলা আর সুরমা পাশ্চাপাশি দ্রুত হাঁটছেন। টেনিটাকে কাল খালি বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন যাত্রীদের সংখ্যা খুব নগণ্য মনে হচ্ছে না। এখনও ঘাট চোখে পড়ছে না।

কুলিদের ধরে ফেলল অনিমেষ। একজন মহিলা বোধহয় বালিতে হাঁটতে পারছিলেন না, তাঁর স্বামী কোনোরকমে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। একজন বিশালবপু মাড়োয়ারি ইঞ্জিনেয়ারের ওয়ে চারজন কুলির ওপর তর করে চলেছেন। ‘তাঁর দুই হাত বুকের ওপর জোড় করা, চোখ বক্ষ। অনিমেষ সামনে তাকিয়ে স্যুদেবকে লক্ষ করল। বিরাট সোনার থালার মতো দিগন্তরেখার ওপর চূপচাপ দাঁড়ায়ে। চট করে দেললে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। দুপারে খুবু বালির চরে এই যাত্রীরা ছাড়া কোনো মানুষ নেই। নির্জন এই প্রান্ততে চূপচাপ আমাশে উঠে বসে সূর্য আলো ছুড়ে ছুড়ে মরছে। হঠাৎ সেই ছেলেবেলায় দাদুর সঙ্গে তিক্তার তীর ধরে হেঁটে গিয়ে সুর্যদেয়ের দর্শক হবার স্ফুটিটা মনে

পড়ল অনিমেষের। মনটা এত চট করে খারাপ হয়ে যায়! কেন যে কোনো ভালো জিনিস দেখলেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়! সূর্য আন্তে-আন্তে রং পালটাচ্ছে, সেই ছেলেবেলার মতো ওর শরীরে মেন জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে। হাঁটাং অনিমেষের মনে হল এই সময়ের মধ্যে সে কত বড় হয়ে গিয়েছে, দানু আরও বৃক্ষ হয়েছেন, কিন্তু সে-সময়ের সকালবেলাগুলো, সূর্য ওঠার ভঙ্গিটা ঠিক একই রকম রয়েছে। ওদের বোধহয় কখনো বয়স বাড়ে না, মানুষের হার এখানেই।

যেন ওদের দেখেই তাড়াতাড়ি আসার জন্য টিমারটা হাইস্ল বাজাঞ্চিল। বেশ গভীর, জ্যাঠামশাই টাইপেলের গলা। এর আগে কখনো টিমার দেখেনি অনিমেষ। তিস্তায় একবার একটা বোট এসেছিল, তার ইঞ্জিনের ধড়বড় শব্দটা মনে আছে। এখন এই টিমারটাকে দেখতে ওর বেশ ভালো লাগল। অনেকটা লম্বা, লালে হলুদ সূর্যের আলো পড়ায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। পিলপিল করে মানুষেরা পাটাতনের ওপর দিয়ে ওর বুকে চুকে থাকে। এখানে কোনো ঘরবাড়ি নেই, দূরে কিছু খোড়ো জঙ্গল। যাত্রীদের কেউ-কেউ বটপট জলে নেমে দুএকটা খুব দিয়ে নিল গচ্ছায়, কুলিদের পেছন পেছন অনিমেষ ডেকে উঠে এল। চারধারে দড়ি লোহার বিম ছাড়ানো, এর মধ্যেই সবাই জ্যাগা করে নিয়েছে। কুলি দুটো এক জ্যাগায় মালপত্র নামিয়ে পরসার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল, অনিমেষ ওদের অপেক্ষা করতে বলল। সুরমারা মালপত্র নামিয়ে পরসার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল, অনিমেষ ওদের অপেক্ষা করতে বলল। সুরমারা এখনও আসছে না কেন? ক্রমশ ভিঙ্টা বাড়ছে। ও দেখল কিছু সুরেশী মানুষ ভিড় বাঁচিয়ে দোতলায় চলে গেল। সেখানে সবাই উঠেছে না। সুন্দর সোহার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ও অনুমান করে নিল, ওপরটা নিচ্যাই প্রথম ত্রৈমাণ যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত। নিচের তলায় হইচই হচ্ছে খুব। ওপাশে দুটো চায়ের স্টলের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। অনিমেষ লক্ষ করল, যেন পুরো ভারতবর্ষটাই উঠে এসেছে এখানে-বাঙালি, বিহারি, মণ্ডাজি থেকে ভুট্টিয়ারা পর্যন্ত সবাই গায়ে গালাগিয়ে বসে আছে।

শেষ পর্যন্ত সুরমারা এল। তখন টিমার ঘনঘন হাইস্ল দিচ্ছে। ভিড় সরিয়ে মহিলা যখন চারদিকে ওকে খুঁজছিলেন তখন অনেকের ঢোখ ওর ওপর ঝট্ট ছিল। অনিমেষকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে ছেলেমানুষের মতো হেঁসে বললেন, ‘হিমালয় থেকে একজন সাধু এসেছেন, দেখেই মনে হয় খুব খাটি মানুষ।’

সুরমা বলল, ‘সাধুরা খাটি হলে মানুষ থাকে না, মহামানব হয়ে যায়।’

মহিলা ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে যেন মনে পড়ে গেছে এরকম ভঙ্গিতে বললেন, ‘আরে, এখানে মালপত্র নামিয়েছ কেন? ওপরে চলো। এই বাজারের মধ্যে দুষ্টা থাকলে আমি মরে যাব।’

কুলিদের তাগাদা দিয়ে মালপত্র কুলিয়ে ভিনিই প্রথমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চললেন। অনিমেষ সুরমার সঙ্গে ওর পেছনে যেতে-যেতে বলল, ‘ওপরটা বোধহয় ফার্ট ক্লাস! আমাদের উঠতে দেবে?’

সুরমা মুখ টিপে হেসে হলল, ‘মা ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।’

দোতলায় সিঁড়ির মুখে টিমার কোশ্পানির একজন হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহিলা তাঁর সামনে শিয়ে ঘাড়টাকে সামান্য বেঁকিয়ে বললেন, ‘ও, নিচে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওপরে জ্যাগা নেই?’

অদ্বোক থমতম হয়ে কোনোরকমে বললেন, ‘হ্যাঁ, নিচ্যাই। আজকে ফার্ট ক্লাস প্যাসেজার কম। ওপাশটা একদম খালি আছে।’

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা হাত বাড়িয়ে কুলিদের নির্দেশ দিলেন বেলিং-এর ধার-য়েবে একটা খালি সোফার সামনে জিনিসপত্র রাখতে। কুলিরা বিলা বাক্যব্যয়ে হকুম ভালিল করতেই অনিমেষ আর সুরমা ওদের সঙ্গে এসে সোফায় বসল। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মহিলা অদ্বোকের সঙ্গে মিছি করে কীসব কথা বলতেই অদ্বোক হেসে ঘাড় নাড়লেন। যেন এইমাত্র পলাশির যুদ্ধটা জিতে গেছেন এইরকম ভঙ্গিতে ওদের কাছে ফিরে এসে মহিলা বললেন, ‘চিরকাল ফার্ট ক্লাসে যাওয়া-আসা করেছি, এরা সবাই আমাকে চেনে। নিচে নরককুণ্ড।’

এবার একজন কুলি অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, ‘ক্লিপিয়া দিজিয়ে মেহসাব।’

যেন মনে পড়ে শিয়েছে এইরকম একটা ভঙ্গি করে ব্যাগ খুললেন মহিলা, তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে সামনে ধরলেন। কুলি দুটো বেজায় খেপে উঠল। তারা বলতে লাগল দশ টাকা দেবার কথা হয়েছে এবং ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করায় আর মাল বইতে পারেনি আর এখন পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেবার কারণটা কী? মহিলা পুতুলের মতো মাথা নেড়ে বললেন, যে, নোটিশবোর্ডে

ଲେଖା ଆହେ କୁଳିଦେର ରୋଟ କି । ଏଇ ମାଲ ସେଇମତୋ ଓଜନ କରେ ଯା ପଡ଼ବେ ତିନି ତା-ଇ ଦେବେନ । ଅନିମେଷ ସାହିତ୍ୟ ବାଗଡ଼ା ଚଲାତେ ଲାଗଲ । ଅନିମେଷ ଦେଖିଲ ଦୋତାଯ ମୁଣ୍ଡିମେଯ ଯାତୀରା ଓଦେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆହେ । ଖୁବ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହଛିଲ ଅନିମେଷର । ଯଦିଓ କୁଳିରା ବେଶ ନିଜେ ତବୁ ଯଥନ ଏକବାର କଥା ହେଁଇ ଗିଯେହେ ତଥନ ଆର ଆର ଏଥନ କରାର କୋନୋ ଅର୍ଥ ହୟ ନା । ଓ ଓଦେର ବାଗଡ଼ାଯ ମଧ୍ୟେ କୋନୋ କଥା ବଲଛିଲ ନା । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରମାକେ ବଲାତେ ଉନଳ, ‘ଯା, ଟାକାଟା ଦିଯେଇ ଦାଓ ।’

କିନ୍ତୁ କୁଳିଦେର ଅସମ୍ଭବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳିଦେର ହୟ ଟାକାଯ ରାଜି ହେଁଯା ଛାଡ଼ା ଉପାଯ ଛିଲ ନା । ଯାଓଯାର ସମୟ ଅନିମେଷ ଉନଳ, ଓରା ଚାପା ଗଲାଯ ବୋଧହ୍ୟ, ଗଲାଗାଲି ଦିତେ-ଦିତେ ଚଲେ ଗେଲ । ଏବାର ମହିଳା ଧପ କରେ ଓର ପାଶେ ଏଥେ ବସିଲେନ, ‘କୀ ପୂରୁଷମାନୁଷ ବାବା, ଆମି ଏତ୍କଣ ଏକା ବାଗଡ଼ା କରେ ଗୋଲାଯ, ଏକଟା ଓ କଥା ବଲଲେ ନା ।’

ଅନିମେଷ ମୋଜା ହେଁ ବସେ ବଲଲ, ‘ନା ମାନେ, ଆପଣି ତୋ କଥା ବଲଛିଲେନ ତାଇ- ।’ ଏହି ପ୍ରଥମ କୋନୋ ମହିଳା ତାକେ ପୂରୁଷମାନୁଷ ବଲଲ । ଓ ଚଟ କରେ ଏକବାର ସୁରମାକେ ଦେଖେ ନିଲ । ଡାନଦିକେ ରେଲିଂ ଧରେ ଏକଦମ ଖାଟୋ ପ୍ରାଣ୍ତ ଆର ଲାଲଙ୍ଗେଞ୍ଜି-ପରା ଏକଟା ଛୋକରା ସାହେବ ପ୍ରାଣ୍ତ-ପରା ଏକ ମେଘମାହେବେର ସଙ୍ଗେ ଗଞ୍ଜ କରହେ-ସୁରମାର ଚୋଥ ସେମିକ ଥେକେ ସରହେ ନା । ମହିଳା ସମ୍ମତ ଶରୀର ସୋଫାଯ ଏଲିଯେ ଦିଯେ ସାମନେ ତାକାଲେନ । ଓରା ଗଞ୍ଜାର ଦିକେ ମୁଖ କରେ ବସେ, ଘାଟ ଦେଖା ଯାଛେ ନା ଏଥାନ ଥେକେ । ଚଟ କରେ ବୋବା ଯାଯ ନ୍ତି ଏହି ନଦୀର ଅପର ପାଡ଼ ସକରିକୁଳ । ଅନିମେଷର ମନେ ହଳ ସମ୍ମୁଦ୍ର ବୋଧହ୍ୟ ଏହିରକମ । ଓର ହାତେ ନାକି ବିଦେଶ୍ୟାତ୍ମାର ରେଖା ଆହେ । ବେଶ ହତ ସନ୍ଦି ଏହି ଚିମାର ଗଞ୍ଜାନ୍ଦୀ ଦିଯେ ସମ୍ମୁଦ୍ର, ସେଥାନ ଥେକେ ଭାରତ ଯହାଶପର, ଅତିଲାଙ୍ଗିକ ବେଶେ ଇନ୍ଦ୍ରାଜିତ ହେଲେ । ଓ ଦେଖିଲ ଏକଟା ଲୋଟାଟେ ଧରନେର ପାରି ହୋ ଯେବେ ଜଳ ଥେକେ ମାଛ ତୁଳେ ନିଯେ ଡାଳା ଝାପଟାତେ ଝାପଟାତେ ପାଡ଼େର ଦିକେ ଉଡ଼େ ଗେଲ ।

ମହିଳା ବଲଲେନ, ‘ଏବାର ଚା ନା ଥେଲେ ମାଥା ଧରବେ । ଅନିମେଷ, ବେଯାରାକେ ବଲେ ଏମୋ ତୋ ।’

ଚାଯେର କଥାଯ ଅନିମେଷର ଖେଲାଯ ହଳ ସକାଳ ଥେକେ କିଛି ଖାଓଯା ହେଁଯାଇନି । ଏଥାନେ ଜିନିସପତ୍ରେର ଦାମ କୀରକମ ଯଦି ଖୁବ ବେଶ ହୟ ତା ହଲେ ନିଚ ଥେକେ ଥେଯେ ଏଲେଇ ହତ । ଓକେ ଉଠିତେଦେବେ ମହିଳା ବଲଲେନ, ‘ଠିକ ଆହେ ଚଲୋ, ରେଣ୍ଟୋରୀତିହାଇ ଥେଯେ ଆସି । ଜାହାଙ୍ଗଟା ଘୁରେ ଦେଖା ଯାବେ । ହ୍ୟାରେ, ତୁଇ ଚା ଖାବିଁ ।’

ସୁରମା ସାହେବଦେର ଦିକେ ମୁଖ ରେଖେଇ ବଲଲ, ‘ନାଃ! ଆମାର ଜନ୍ୟ ଏକଟା କେକ ଏନୋ । ଆମାର ଉଠୁଟେ ଭାଲୋ ଲାଗେଛ ନା ।’

‘ସକଳବେଳାଯ ଚା ନା ଥେଯେ କୀତାବେ ଥାକିସ ବାବା, କେ ଜାନେ! ଯାକ, ମାଲପତ୍ରଗୁଲୋ ଦେଖିସ ତା ହଲେ, ଆମରା ଆସାଇଁ ।’

ଅନିମେଷ ଉଠିତେଇ କାଳ ଫାଟିଲେ ହିସଲ ବେଜେ ଉଠିଲ । ଚିମାର ଏବାର ଛାଡ଼ିଛେ । ଚିରକାର ଚାନ୍ଦ୍ୟମେଚିର ମଧ୍ୟେ ଓରା ପାରେର ତଳାଯ ଦ୍ଵାରି ଅନୁଭବ କରଲ । ଯତ୍ନଧତ୍ ଶଦେ କୋଥାଓ ଇଞ୍ଜିନ ଚଲଛେ, ରୋଦେ ସମ୍ମତ ଗଞ୍ଜା ଏଥନ ଉତ୍ତରି । ଅନିମେଷ ଦେଖିଲ ଓପରେର ଡେକେ ଯାରା ବସେ ଆହେନ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ କୋନୋ ଉତ୍ୱେଜନା ନେଇ । ଏରୀ କଥା ବସେଲେ ଚାପା ଗଲାଯ । ଏକଜନ ବିରାଟ-ଚେହାରାର ମାଡୋଯାରିକେ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ନିଃଶବ୍ଦ ଶୁଭ୍ୟତେ ଦେଖିଲ । ଏଥାନେ କେଉ କାଟିକେ ଦେଖିବେ ନା, ଯେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକି ଅନ୍ତିତ୍ବ ତୁଲେ ବସେ ଆହେ । ବେଯାରାରା ଚାଯେର ଟ୍ରେ ନିଯେ ଘୋରାଫେରା କରହେ । ଖୁବ ଅସ୍ତିତ୍ବ ହଛିଲ ଅନିମେଷର । ଏହି ପରିବେଶ ଓର କାହେ ଏକବାରେ ନତୁନ ।

ରେଣ୍ଟୋରୀଙ୍କ ଭିତ୍ତି ନେଇ । ମାତ୍ର ଦୁଜନ ମାନୁଷ ବସେ ଆହେନ ଜାନଲାଯ । ଖୁବ ଚାପା ଗଲାଯ ଓରା କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛିଲେ, ଅନିମେଷଦେର ଭାଲୋ ଲାଗଲ ନା । ରେଣ୍ଟୋରୀଙ୍କ ଜାନଲାଯ ବସଲେ ବାଇରେଟା ପରିଷକର ଦେଖା ଯାଯ । ମହିଳା ଆର ଓ ପାଶାପାଶି ବସତେଇ ବୟ ଛୁଟେ ଏହି । ଦୁଟୋ ଓମଲେଟ ଟୋନ୍ ଆର ଚା ବଲଲେ ତିନି, ‘ଜାନ ଅନିମେଷ, ସକଳବେଳୋ ଆମାର ଏକଟା କରେ ତିମ ଚାଇଁ । ଏବିନିତେଇ ଆମି ଖୁବ ଲାଇଟ ଖାବାର ନାଇ । ଓଜନ ବେଡ଼େ ଯାଛେ ଖୁବ । ଆମି ବାବା ମିସେସ କର ହିଂତେ ଚାଇଁ ନା ।’

ଏହି ପ୍ରଥମ ଏବକମ ସାହେବି ରେଣ୍ଟୋରୀତେ ଅନିମେଷ ଏଲ । ପରୀକ୍ଷାର ପର ମଟ୍ଟର ମଧ୍ୟେ ଝପଣ୍ଟାର ପାଶେ ଏକଟା ଦୋକାନେ ଓରା କାଟୀ ଚାମଚ ଦିଯେ ଖାଓଯାର ଅଭ୍ୟେସ କରେଛିଲ । ଖାବାର ଏଲେ ଓ ସେଟାକେ କାଜେ ଲାଗଲ । ମହିଳା ବଲଲେନ, ‘ତୋମାକେ ଯେବେ ଆମି ଏର ଆଗେ କୋଥାଯ ଦେଖେଇ, କିନ୍ତୁ ତେଇ ମନେ କରତେ ପାରେନ ତା ହଲେ ନିଚ୍ୟାଇ ଆର ଏଥାନେ ବସେ ଥାକବେନ ନା । ନାକି ଏତଦିନ ପରେଓ ଅନିମେଷ ସୁନ୍ଦର ଆହେ ଦେଖେ ନିଜେର ବ୍ୟବହାରେର ଜନ୍ୟ ଲାଙ୍ଜିତ ହବେନ । ତବୁ ଅନିମେଷ ଠିକ କରଲ ମେ ଚେନା ଦେବେ ନା । ମହିଳା ନିଜେର ମନେ

ଚଟ କରେ ହାତ କେପେ ଉଠିଲ ଅନିମେଷର । ଓ ମନ ଦିଯେ ଖାଓଯା ମୁକ୍ତ କରଲ । ଏଥନେ ଓ ଚୋଥ କବନେ କଥା ହେଁଇ ଗିଯେହେ ତଥନ ଆର ଆର ଏଥନେ ବସିଲେନ, ‘ଯା ଟାକାଟା ଦିଯେଇ ଦାଓ ।’

বললেন, ‘জলপাইগুড়ির ছেলেরা যা হয়েছে না, আমি অবাক হয়ে যাই। আমাদের সময় এরকম ছিল না। তাই তো আমি সুরমার ভাইকে কাশিয়াং-এ পাঠিয়ে দিয়েছি পড়তে।’

অনিমেষ সেই গোলালুর সঙ্গান পেয়ে মাথা নাড়ল। তখনই তো সে ওর সমান ছিল, এখনও সে ক্ষুলে পড়ছে; বৰশ্য মিশনারি ক্ষুলের নিয়মকানুন ও জানে না।

‘এই ছেলে, একদম মুখ নিচু করে খাচ্ছ যে, কথা বলবে না?’

মুখ তুলল অনিমেষ, আবার সেই দৃশ্য। মহিলা যেভাবে বসে আছেন তাতে তাঁর বুকের কাপড় জ্বায়গাম থাকছে না। অতখনি সাধা উচু জ্বায়গা এমন চট করে লজ্জা এনে দেয় কেন? তিনার পাড়ে অথবা বৰ্গহেঁড়ায় অনেক দেহাতি মেয়ে অথবা ভিখিরিদের নগ্ন বুক দেখেছে ও, তখন তো এরকম হত না! হঠাৎ মহিলা হাসলেন, ‘আমার বয়স কত বলো তো?’

ওমলেট খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, চায়ের কাপ টেনে নিয়ে অনিমেষ বলল, ‘বলতে পারব না।’

এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি যেন অনিমেষকে নিয়ে কী করবেন বুঝতে পারছেন না, ‘ধার্টিফাইভ। আমাকে অতটা দেখায়?’

‘না।’ অনিমেষ হাসল।

‘সুরমা একদম বাপের মতো হচ্ছে, চেহারার দিকে যত্ন না নিলে বেঁচে থেকে লাভ কী? কলকাতায় গিয়ে কোথায় উঠছ?’

‘আমার বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। তারপর হোটেলে চলে যাব।’

‘ওড়। এর মধ্যে তুমি কলকাতাটা ভালো করে ঘুরে দেখে নাও। আমি ভাবছি সুরমাকে শাস্তিনিকেতনে ভরতি করে মাসখানেক পরে কলকাতায় যাব। তখন তুমি আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবে। কী, দেখাবে না�?’

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। বিল মিটিয়ে দিয়ে উনি রেস্তোরাঁ থেকে দুটো কেক কিনলেন, ‘কলকাতার মতো কেক আর কোথাও পাওয়া যায় না।’

ওর বাইরে বেরিয়ে এলে মহিলা সুরমা যেখানে বসেছিল সেকানে না গিয়ে শেকে নিয়ে উলটোদিকের ডেকটা ধরে হাঁটতে লাগল। খুব বাতাস দিছে এখন। নদীর দিকে চোখ রেখে মহিলা বললেন, ‘ওঁ, কতদিন পরে আজ একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম! জলপাইগুড়িতে মানুষ থাকতে পারে! সেই সংস্কার আর সংস্কার! নিজের বলে আর কিছু থাকে না।’ অনিমেষ কিছু বলল না। ও ক্রমশ টের পাছিল এই মহিলার এত সাজেগোজ, এত কথার আড়ালে একটা দুখি মন আছে। কেন কিসের জন্য দৃশ্য তা সে জানে না। দূরে জলের মধ্যে কিছু তেসে-ভেসে উঠছিল। অনিমেষ সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই লক্ষ করল একটা জলচর প্রাণীর কালো পিঠ দেখা যাচ্ছে। ও উত্তেজিত হয়ে মহিলাকে সেটা দেখাতেই তিনি সেদিকে তাকিয়ে ভীষণ নার্ভাস হয়ে অনিমেষকে শক্ত হাতে ধরলেন, ‘ওটা কী? কুমির?’

ততক্ষণে প্রাণীটা বোধহয় সাহস বেড়েছে। গোল হয়ে ডিগবাজি খেতে-খেতে জল থেকে লাফিয়ে উঠেছিল। নিচের ডেকে সবাই বোধহয় দেখেছে। খুব হইচই করে সবাই টিমারের এদিকে আসতে এপাশটা একটু কাত হয়ে গেল। একজন কুলিমতন লোক ডেকের এদিকে আসছিল, অনিমেষদের দেখে একগাল হেসে বলল, ‘শুণক’।

আর এই সময় ইঞ্জিন প্রচল চিকির করে উঠল। ঘনঘন ইইস্ল বাজছে। ওরা এখন নদীর প্রায় মাঝখানে। গঙ্গার বড় বড় টেক্টেগুলো টিমার ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওরা প্রথমে বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা, নিচের চিকিরে বাক হয়ে মহিলা বললেন, ‘কী হয়েছে নিচে?’

টিমারের লোকজন তখন ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। ওরা সুরমার কাছে ফিরে আসতে শুনতে পেল জল কম থাকায় টিমার চৰায় আটকে গেছে। অন্য যাত্রীদের মুখে এখন বিরক্তি, এভাবে টিমার চালানো হয় কেন? কেন জল মেপে আগে থাকতে গভীরতা বোৰা যায় না? ওদের ওপরে রেখে অনিমেষ ব্যাপারটা দেখবার জন্য নিচে নেমে এল। ওপরের বিরক্তিটা এখানে অন্যরকম চেহারা নিয়েছে। লোকে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সারেং মাল্লোরা প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে টিমারটাকে উদ্ধার করার জন্য। যেভাবে হেলে রয়েছে এটা একদিকে, বেশি নড়াচড়া করলে অন্যরকম বিপদ যেতে হতে পারে সেটাও সবাই বুঝে গিয়েছে।

অনিমেষ বুঝতে পারছিল না নদীতে যখন এত ঢেউ তখন চৰায় ঠেকে যায় কী করে টিমার? একজন বলল, জল অল্প বলেই ঢেউ বেশি, খালি পাত্রে বেশি শব্দ হয়। সেই শুণকটাকে আর দেখা

যাচ্ছে না। যদি স্টিমার ডুবে যায় তা হলে কী হবে? ওর নাকি জলে ডোবার ফাঁড়া আছে। সাঁতার না জানার জন্যে এখন আফসোস হচ্ছিল অনিমেষের।

একটু একটু করে পরবর্তী সমস্যাগুলো সবাই জানতে পারছিল। নদী পার হবার জন্য দুটো স্টিমার ছিল, অন্যটাকে জরুরি প্রয়োজনে রাজমহলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এইটাই এখন পারাপার করছে। ট্রেনের যা সময় তাতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না যাত্রীদের। ফলে জল বাড়া অথবা অন্য স্টিমারটিকে রাজমহল থেকে ফিরিয়ে যাত্রীদের উকার না করা পর্যন্ত ওদের এইখানেই আটক থাকতে হবে। এইভাবে বন্দি থাকার কথাটা যতই মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল যাত্রীরা ততই নার্তাস হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্লের খাবারগুলো শেষ হয়ে গেল। অনেক দূরে জলের সীমার শেষে সকরিকলি ঘাট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা অনেক দূর। এখানে দাঁড়িয়ে বস্পের মতো দেখাচ্ছে।

অনিমেষ ওপরে উঠে এল। মহিলা ওকে দেবেই ছুটে এল, ‘কী হবে, অনিমেষ?’

‘বিকেলনাগাদ জোয়ার আসবে বলছে সবাই।’ অনিমেষ বিব্রত হয়ে বলল।

‘বিকেল অবধি এখানে থাকলে আমরা কখন বোলপুরে পৌছাব?’ ওর মুখ কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, কী করবেন বুঁৰে উঠতে পারছিলেন না। অনিমেষের এই ব্যাপারটা একদম ব্যোল ছিল না। ওপারে গিয়ে ট্রেনে উঠলে সেটা দশটায় ছাড়ত, খুব আন্তে গেলেও বিকেলনাগাদ শিয়ালদা টেশনে পৌছাত। এখন যা অবস্থা তাতে কখন ওপারে পৌছাবে কখন ট্রেন ছাড়বে আর কখন সেটা কলকাতায় গিয়ে পৌছাবে কেউ বলতে পারবে না। তা হলে বাবার বস্তুর দেখা সে পাবে কী করে? হঠাৎ যেন সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে। অবশ্য ওর ঠিকানা অনিমেষের কাছে আছে, অসুবিধে আর কতকু হবে?’

কিন্তু এই স্টিমারের অনেকেরই প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দিল। কেউ যাবে রাতের প্রেম ধরতে, কাল ভোরেই অন্যত্র ট্রেন ধরার কথা, কারও ইটারভিউ, কেউ-বা আগামীকাল হাইকোর্টে কেস করতে যাচ্ছে। যদি ট্রেন আগামীকাল সকালের মধ্যেও না পৌছায়। বেলা বাড়তে লাগল। জল বাড়ার কোনো লক্ষণ নেই, নিচের হইচই-এখন অনেকটা কম। সবাই বুঁৰে গিয়েছে কিছুই করার নেই। এবং ‘এই স্টিমারে আর খাবার বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই।’ অনিমেষের একবার মনে পড়ল ওর ব্যাগে পিসিমার দেওয়া খাবার এখনও পুরোটাই রয়েছে। কাল রাত্রে মহিলা ওকে নিজের খাবার খেতে দেননি। কিন্তু এখনও ওর একটুও খিদে পায়নি। মহিলা কয়েকবার খাবার খাবার করছিলেন। অনিমেষ ভাবল একবার বলে, ওরা ঘষ্টা দুয়েক আগে মাত্র জলখাবার খেয়েছে। এখনই খিদে লাগার কোনো কথা নয়। কিন্তু ও কিছু বলল না। খাবার নেই জানলৈ বোধহয় মানুষের খিদেবোধটা চট করে বেড়ে যায়।

অনিমেষ আবার নিচে এল। দুএকটা মাছধরা নৌকো এখন ওদের স্টিমারের কাছাকাছি এসেছে। ওদের একটায় স্টিমারের একজন লোক পাড়ে চলে গেল। সে গিয়ে খবরাখবর দেবে। কই, নৌকোয় এত বড় নদী পার হবার সাহস কারও হল না। সবাই অসহায়ের মতো মুখ করে বসে। ডিডি বাঁচিয়ে কোনোরকমে হাঁটতে গিয়ে অনিমেষ থমকে দাঁড়াল। একটা জ্যাগায় কিছু মানুষ গোল হয়ে বসে, যথিখনে সর্বাঙ্গে ছাইমাঝি জটাধারী একজন সাধু। মুখেচোখ দেখলে শুন্দা করতে ইচ্ছে করে। সিঁফ মুখে হাসি, মাথা নেড়ে শ্রোতাদের কথা শনছেন। কেউ-একজন বলল, ‘বাবা ইচ্ছে করলে স্টিমার চালু করতে পারেন।’ কে জানে হয়তো একটা বাবারই খেলা, নইলে মোজ স্টিমার চলছে, আজ হঠাৎ আটকে যাবে কেন?’ কথাটা যে অনেকের মনে লেগেছে সেটা একটু বাদেই বোঝা গেল। ভজ্জনের সংখ্যা বাড়ছে। কিছু বিহারি ভক্ত ধনি দিয়ে উঠল, ‘গঙ্গা মাঝকি জয়, সাধু বাবাকি জয়।’

খানিক বাদেই স্টিমারের সব মানুষ খাবাখানে জড়ো হয়ে গেল। অনিমেষ শুনল বাবা নাকি রাজি হচ্ছিলেন না কোনো পুজোআচা করতে, কারণ তিনি ম্যাজিক দেখাতে ভালোবাসেন না, কিন্তু ভজ্জনের চাপে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়েছে। অনিমেষ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে আর বাবাকে দেখা যাচ্ছে না। ও কোনোরকমে দোতলায় উঠবার সিডিতে এল, এখান থেকে মানুষের মাথা ডিঙিয়ে বাবাকে দেখা যাচ্ছে। কিছু ভক্ত স্বাইকে সামলাচ্ছে, ‘কসময় দর্শক পাটাতনের ওপর বসে গেল। মুহূর্মুহূর বাবার নামে জয়বন্ধি উঠেছে।’ এর মধ্যে কোথা একে কিছু ফুল বেলপাতা যোগাড় হয়ে গিয়েছে। এগুলো নিয়ে যে মানুষ ট্রেনযাত্রা করতে পারে অনিমেষ বিশ্বিত হয়ে আজ্ঞ আবিষ্কার করল। বাবার নির্দেশে একটা পাত্রে টাটকা গঙ্গাজল তুলে আনা হল। নিজের বোলা থেকে কিছু কাঠ বের করে বাবা শেষ পর্যন্ত পুজোয় বসলেন।

অনিমেষ মহিলাকে ব্যাপারটা বলতে ওপরে উঠে এসে দেখল খৰবটা আগেই এখানে পৌছে গেছে। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা এখন আর ছড়িয়েছিটিয়ে নেই, সবাই প্রায় এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্যায় সমাধানের উপায় ভাবছিলেন। সেই বৃহৎ মাড়োয়ারি তখন কথা বলছিলেন, ‘আরে নেই নেই, সাধুবাবালোগে সবকুচ কর সেকতা।’

একজন সুট-টাই-পরা প্রোচি পাইপ খেতে-খেতে বললেন, ‘আই ডোট থিংক সো, তবে কোনো-কোনো সময় মির্যাকল তো হয়েও যেতে পারে।’

সেই ছেট প্যান্ট-পরা সাহেবটি বলল, ‘ডু ইউ থিংক হি ইজ এ রিমেল সাধুৰ’

সুরমার মা সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন, ‘আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই, প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম একদম থাণ্ডি মানুষ।’

প্রোচি বললেন, ‘আমাকে আজ রাত্রের প্লেন ধরতেই হবে, পারহ্যাপস দিস ম্যান ক্যান হেল্প মি।’

মাড়োয়ারি বললেন, ‘আরে তাই, আজ কলকাতা নেই যানেসে মেরা দো লাখ রুপয়া লোকসান হো যায়েগা।’

কথাবার্তাশুলো আর সেইরকম চাপা গলায় নয়, নিচের তলার মতো গলা খুলে ঢেরা কথা বলছিলেন। অনিমেষকে দেখতে পেয়ে সুরমা বলে উঠল, ‘ওই যে মা, এসে গেছে।’

মহিলা ওকে দেখতে পেয়ে উৎসুক মুখ করে করেক পা এগিয়ে এলেন, ‘নিচু শুলাম সেই সাধুবাবা পুজো করছেন?’

অনিমেষ হাসল, ‘হ্যা, খুব ভিড় হয়েছে।’

মহিলা বললেন, ‘চলো, আমি যাব মা।’

সঙ্গে সঙ্গে সুরমা বলে উঠল, ‘আমিও যাব মা।’

মহিলা একটু ইতস্তত করলেন, যাবি? কিন্তু মারগ্র সব পড়ে রইলয়ে! আজ্ঞা তাই অনিমেষ, তুমি এখানে একটু থাকবে? তোমার তো দেখা হয়ে গেছে।’

অগভ্য অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, যদিও ওর এখানে একটুও থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ওকে রাজি হতে দেখে অন্য সবাই যেন চাঁদ হাতে পেয়ে গেল। সবার মালপত্র পাহারা দেবার ভার নিতে হল ওকে। অনিমেষ দেখল যাহিলার পেছন পেছন দোতলার মানুষগুলো একতলায় নেমে গেল। বিশ্ব বাঢ়িছিল ওর, কী তাড়াতাড়ি মানুষগুলো চেহারা বদলে গেল। কচুক্ষণ ও দোতলার রেলিং ধরে চেয়ে রইল জলের দিকে। ঘোলা জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। আকাশ বেশ মেঘলা, রোদের জৌলুস নেই একটুও, যদিও সূর্য আছে সামান্য ওপরে। ও মালপত্রগুলোর দিকে তাকাল। বেশির ভাগ ব্যাগের ওপর নামধার লেখা। ডুরা কী বিশ্বাসে সবকিছুর দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে গেলেন। যদি ও এগুলো নিয়ে কেটে পাড়ে, ভাবতেই হাসি পেল ওর, কারণ এইরকম মাঝগঙ্গায় আটক থেকে কেউ জিনিসপত্র নিয়ে পালাতে পারবে না। তা ছাড়া নামবাবির সিঁড়ি তো মোটে একটা।

নিচে কী হচ্ছে দেখার কোতুলটা আস্তে-আস্তে বেড়ে যাচ্ছিল। অনিমেষ সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এল, এখান থেকে দেশকে অসুবিধে হচ্ছে না। কালো মাথাগুলোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সরিয়ে ও সাধুবাবার দিকে তাকাল। আর তাকাতেই চমকে উঠল অনিমেষ, পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করে মনে হয় মন্ত্র পড়ছেন সাধুবাবা আর তাঁর সামনে সাঁজাঙে পড়ে আছেন সুরমার মা। তাঁর দামি শাড়ি তেকের ধূলোজেলে লুটোপুটি খাচ্ছে, সুরমা পাশে হাঁটু পেড়ে দুহাত জোড় করে বসে। ওঁদের পেছনে ফার্স্ট ক্লাসের অন্যান্য যাত্রী গদগদ হয়ে বসে আছে। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক তা বাবার পাঁয়ের কাছে থামা নিয়ে গিয়েছেন। চারধার থেকে বাবার নামে জয়ধনি উঠছে। এখন আর ওপর আর নিচতলার যাত্রীদের মধ্যে কোনো ক্ষণক নেই, সবাই গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছেন। হংগে অনিমেষের সামনে সুনীলদার মুখটা ভেসে উঠল। সুনীলদারা কি এইরকম ভারতবর্ষের ব্যপ্ত দেখেন?

আকাশে মেঘ বাড়ছে, একটু একটু করে বাতাসের দাপট বাড়ছে। সুনীলদার কথা মনে হতেই ওর মনে হল গতকাল কলকাতায় বাস পড়েছে, পুলিশের গুলিতে কয়েকজন মারা গিয়েছে। ব্যাপারটা তার মনেই ছিল না সকাল থেকে। দেশের কিছু মানুষ থাবা রদাবি করে ধর্মঘট করছে, কিছু লোক সেটাকে সমর্পন করছে না। এই দুদল যতক্ষণ-না এক হবে-অনিমেষের মনে হল খুব বড়, এই চিমারে যেমন হয়েছে সেরকম সমস্যা না এলে দুদল কখনো এক হাতে পারে না। যাঁরা দেশের কথা চিন্তা করেন তাঁরা এটা কি জানেন না!

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে এখন। খোড়ো বাতাস জাহাজটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে মাঝে-মাঝে। হঠাৎ

স্টিমারটা সামান্য দুলে উঠতেই সবাই চিংকার করে উঠল। এতক্ষণ ইঞ্জিন বৰ্ক ছিল, এবার সেটা শব্দ করে জেগে উঠল। ইঞ্জিন-চালক বোধহয় এই দুলুনিকে অবলম্বন করে স্টিমারটাকে নড়াবার চেষ্টা করছেন। এবং ফৈশ্বরের আশীর্বাদের মতো একসময় স্টিমার সভ্যত্ব নড়ে উঠল। তারপর শব্দটাকে গানের মতো বাজিয়ে এগিয়ে চলল জল কেটে। বাড়ের বেগ খুব বাড়ছে। বৃষ্টির জল এসে দোলার ডেক ভিজিয়ে দিচ্ছে। অনিমেষ দৌড়ে এসে জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে রাখত লাগল। এখন নদীর ওপর বৃষ্টি যেন অজস্র দেওয়াল তৈরি করে ফেলেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর ওঁরা উপরে উঠে এলেন। মহিলা এখন ভক্তিতে আপুত্র, অনিমেষকে সামনে পেয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘দেখলে বাবার কী লীলা, তখনই বলেছিলাম কী জগত সাধু।’

‘হোচ্চ ভুলোক পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, ইটস ও মির্যাকল! যাক, মাত্র তিন ঘণ্টা লেট হয়েছে। নিচয়ত্ব মেকআপ হয়ে যাবে।’

কে-একজন বলল, ‘বৃষ্টি শুরু হল-।’

‘দূর মশায় ট্রেনে উঠলে বৃষ্টি কোনো প্রেরণ নাকি!'

অনিমেষ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। সেই বৃক্ষ অন্দরোক কোথায়? নিচের ভিত্তে এতক্ষণ তাঁকে দেখেনি সে। সাধুবাবা সেই জায়গায় বসে আছেন। তাঁর সম্পত্তিতে আর-একটা পুরুলি যোগ হয়েছে। ভজ্জরা তাদের প্রণাম দিয়েছে। বেশকিছু মানুষ এখনও তাঁকে ঘিরে রয়েছে। কথা বলছেন না তিনি, মুখে প্রশান্তি। ঘট ঘট এগিয়ে আসতে লাগল তত উভেজনা বাড়তে লাগল। কে আগে ঘাটে নামতে পারবে তার জন্য ঠেলাঠেলি চলছে নামবাব মুখটাতে। এখান থেকে বৃষ্টিতে-ভেজা ট্রেনটাকে দেখা যাচ্ছে। স্টিমার আসছে দেখে ড্রাইভার বোধহয় খুশিতে দুবাব হইস্ল বাজিয়ে দিল।

স্টিমার ঘাটে লাগতেই একটা কাঠের পাটাতন নামিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে জলরাশির মতো মানুষ বেরিয়ে যেতে লাগল সেই ছোট রাত্তা দিয়ে। নিচের তলায় সব মানুষ এখন মুখটাতে জড়ে হয়েছেন। স্টিমারের লোকজন বারণ করছে এভাবে দাঁড়াতে কিন্তু কে শোনে কার কথা! সাধুবাবাও এঁদের মধ্যে আছেন। অনিমেষ দেখল বাইরের মাটিতে পা রাখার উভেজনায় কেউ আর তাঁকে খেয়াল করছে না। এই সময় সে বৃক্ষ অন্দরোককে দেখতে পেল। চোখাচোরি হতেই তিনি হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ওকে আসতে বললেন। ওপারে গিয়ে ট্রেনে ভালো জায়গা পেতে আগে যাওয়া দরকার। বৃষ্টিতে ভিজতে হবেই, কোনো উপায় নেই। মানুষেরা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে যাচ্ছে। একজন হমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে ‘পিছনের মানুষের পায়ের তলায় যেতে-যেতে বেঁচে গেল।

অনিমেষ জায়গা রাখতে, আপনারা কুলির সঙ্গে আসুন।’

মহিলারা বললেন, ‘বৃষ্টিতে যাব কী করে?’

অনিমেষ বলল, ‘ওপায় নেই।’ ও আর দাঁড়াল না। দৌড়ে নিচে এসে ভিত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি, কনুইয়ের পুঁতো সামলে সে পাটাতনটার ওপর এসে দেখল দুধারের দড়ির বেলিং-এর ওপর মানুষ হমড়ি খেয়ে পড়েছে, বেতাল হলেই জলের তলায় চলে যাবে। নিজের ব্যাগ সামলাতে গিয়ে হিমশিঙ খেয়ে যাচ্ছিল ও, চারধারে মানুষের আড়াল। সামনে বৃষ্টি হয়ে পথ পিছল থাকায় খুব সম্পর্কে লোক এগুচ্ছে। একসময় হইহই গেল গেল শব্দ উঠল উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে, ততক্ষনে অনিমেষ বৃষ্টিতে নেমে পড়েছে, খেয়ে দাঁড়ালে পায়ের তলায় পড়তে হবে বলে ও দোড়াতে শুরু করল। পেছনে কী হচ্ছে বোঝার আগেই ও সামনে ট্রেনটাকে দেখতে পেল। বৃষ্টির ফেঁটায় সমস্ত শরীর ভিজে একশা। ও অবাক হয়ে দেখল অত বড় ট্রেনটা একদম খালি। যে-যাত্রীরা আজকের ট্রেনের পক্ষে নিতান্তই সামান্য। অথচ কী ভয়েই সবাই এখনও ছুট আসছে! এই সময় একজন কুলি চিংকার করতে করতে ছুটে গেল, ‘সাধুবাবা গির গিয়া, জাহাজকা অন্দর ঘুঁস গিয়া।’

হতভুব হয়ে গেল অনিমেষ। সে-মানুষটাকে বিপদের সময় সবাই আশ্রয় করেছিল তাঁকেই জনতার চাপে জলে পড়তে হল! সেই প্রশান্ত মুখটাকে মনে করে অনিমেষ ছুটস্ত যাত্রীদের দিকে তাকাল। কারও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের অন্য কোনো আকর্ষণ বোধহয় থাকে না। অনিমেষ সামনে-বসা বৃক্ষ অন্দরোকের দিকে তাকাল। তিনি হেসে বললেন, ‘আড়াই ঘণ্টা লেট। তা আমরা নটার মধ্যে শিয়ালদায় পৌছে যাব, বুঝলে?’

যতদূর চোখদেখা যায় মাঠ আর মাঠ, মাছে-মাছে দলবাধা তালগাছগুলো গলাগলি করে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়েছে, এইরকম চির ট্রেনের জানালার বাইরে অনেকক্ষণ স্থির ছিল। জলপাইগুড়ি শহরের বাইরের যে-বাণ্ডাদেশ তার চেহারা এত আলাদা একথা কোনো ভূগোল বইতে অনিমেষ পড়েনি।

সূর্য-চালা বিকেলে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস বোলপুরে এসে জিরোল।

বৃষ্টি শেষ হয়েছিল সাহেবগঞ্জে। চারধারে ঝুক্ষ মাটি, মাটির ঘরের ওপর ধূলোর চাদর, ঠাণ্ডা মেজাজ কোথাও নেই। কলকাতায় আসার পথে অন্য একটা প্রদেশের ওপর দিয়ে খানিকটা আসতে হয় বলে ভালো লাগছিল অনিমেষের। সেই প্রকৃতির চেহারাটা একটু একটু করে বদলাল বীরভূমে ঢুকে, বদলে অন্য চেহারা নিল। ট্রেন গতি বাড়িয়ে বিলব সক্ষেচনের চেষ্টা করে যাচ্ছে, সুখে গরম বাতাসের বাপটানি। অনক যাত্রী ওঠানামা করল রামপুরহাটে। ওখানকার ডাইনিংরুমে ভালো ভাবারের আশায় টুঁ মেরে এল অনেকে। বৃন্দ ভদ্রলোক, যাকে অনিমেষ এখনও কোনো সহোধন করছে না, অনিমেষকে খাওয়ার কতা বলেছিলেন: কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে ট্রেনে উঠে অথবা সেই সাধুবাবার মৃত্যুসংবাদ অনে কিংবা হিনপাহাড় টেশনে মহিলার অনুরোধে চা খেয়ে অনিমেষের ক্ষুধাবোধটাই একদম উৎসাহ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এখনও সঙ্গে পিসিমার তৈরি খাবার আটুট আছে, কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছেটাই নেই। এরকম এর আগে কখনো হয়নি, ট্রেনে উঠলে কি সব নিয়মকানুন বদলে যায়? সুরমারা সারাটা পথ আধুনিক্যে হলে এল। মহিলা এখন রীতিমতো ক্লান্ত, বৃষ্টিতে ভেজার পর ওর চেহারা এখন একাদশীর প্রতিমার মতো। কাল রাত অথবা সকালের জেরা চটে গিয়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। ওঁদের নাকি খিদে নেই। দুপুরে শাস্তিনিকেতনে ভাত তৈরি থাকবে, যখন হোক পৌছে সেটাই খাবেন ইচ্ছে হল। মানুষের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না মহিলা, যে-সাধুবাবার জন্য চিমার প্রাপ্ত পেল তাঁকেই ওর অসাবধানে জলে ফেলে দিল। মহিলা সত্যি সত্যি ব্যথা পেয়েছেন। বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি সাধুবাবাকে তুলে আনার দৃশ্য দেখেছেন। ফলে এখন মাঝে-মাঝে নাক টানছেন, মেয়েদের সর্দি হলে মোটেই ভালো দেখায় না। সুরমা চুপচাপ শুটিসুটি মেরে শয়ে সিনেমার পত্রিকা পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা অজুত। যখন কথা বলে তখন বাচাল বলে মনে হয়, আবার চুপ করলে ওর গার্জীর দেখার মতন। কাল রাত্রের সেই মেয়েটাকে এখন মোটেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি চেহারা বদল করতে পারে। হঠাতে সীতার মুখটা মনে পড়ে গেল ওর। সীতা ওর বদলে-যাওয়া জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিষ্কয়ই, কিন্তু ওর মুখ মনে এলেই বুকের ভেতর এমন অসাড় হয়ে যায় কেন?

বোলপুর টেশনে সুরমারা নেমে গেল। অনিমেষ কুলির সঙ্গে ধরাধরি করে জিনিসপত্র নামিয়ে দিল। গিলে-করা ধূতি-পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক এসেছিলেন ওঁদের নিতে। মহিলা অনিমেষের হাত ধরে বললেন, ‘আমাদের কথা মনে থাকবে তো?’

অনিমেষ ধাড় নাড়ল। ‘তৈমার খবর কী করে পাব?’ মহিলা জিজাসা করলেন।

অনিমেষ বিপদে পড়ল। কলকাতায় সে কোন হোটেলে থাকবে এখন কিন্তুই জানা নেই। কলেজও ঠিক হয়নি। মহিলাই উদ্ধার করলেন, ‘ঠিক আছে, তোমার ঠিকানা ঠিক হলে আমায় চিঠি দিও। সুধাময়, ফরটিফাইভ ব্লক, শাস্তিনিকেতন।’ ঠিকানাটা চটপেট মুখস্থ করে নিয়ে অনিমেষ ধাড় নাড়ল। ট্রেন-ছাড়ার মুহূর্তে সুরমা বলল, ‘আসবেন তো?’ কোনো কথা না বলে অনিমেষ সম্মতির হাসি হেসে দেরজায় দাঁড়িয়ে চলত পাড়ি থেকে ওঁদের দূরে চলে যেতে দেখল। হঠাতে ওর খেয়াল হল মহিলার নাম সে জানে না, কী নামে চিঠি দেবে? সুরমার নামটাকই সহল থাকল। মহিলার অনেককরকম উগ্রতা সন্দেশ এই মুহূর্তে অনিমেষের খারাপ লাগছিল ওঁদের ছেড়ে যেতে। অথচ কতটুকুই-বা পরিচয়, কতক্ষণের?

ভেতরে এসে শুনল বেশ হইচই পড়ে গেছে। এক ভদ্রলোক বোলপুর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে উঠেছেন, তাঁকে যিরে যাত্রীরা ভিড় করেছে। অনিমেষ একটা বেষ্টির কোনায় পা রেখে উঁচু হয়ে হেডলাইনটা পড়ল, ‘গুলি বোমা মৃত্যু-ধর্মস্থটে কলকাতা উত্তোল’। তার নিচেই একটা ভুলস্ত বাসের ছবি। নিজের জায়গায় আসতেই বৃন্দ ভদ্রলোক বললেন, ‘অবস্থা খুব মোরারো হয়েছে মনে হচ্ছে।’

অনিমেষ বলল, ‘কী হয়েছে?’

‘শুনলাম আজ কলকাতায় কারফিউ টিক্রেয়ার করেছে। তার মানে রাস্তায় হাঁটাচলা যাবে না। তা হলে এতসব যাত্রা বাড়ি যাবে কী করে?’

কারফিউ শব্দটার মানে অনুমান করে নিয়ে অনিমেষ বলল, ‘হঠাতে কারফিউ ডিক্রেয়ার করেছে কেন? হৰতাল তো গতকাল শেষ হয়ে গিয়েছে।’

‘তার জ্বেল চলছে। কলকাতায় তো কোনোদিন যাওনি, ওখানকার ব্যাপারই আলাদা। মানুষ

যখন খেপে যায় তখন তাদের সামলানো মুশকিল, আবার খুব মারাত্মক ব্যাপার অত্যন্ত সহজে ভুলে যায় ওখনকার লোক। এরকম চরিত্র আর কোথাও পাবেন না।'

বৃন্দের কথা শেষ হওয়ায় আর-একজন মাঝবয়সি লোক ফোস করে উঠলেন, 'এইজনেই তো দশটার কিছু হল না!'

আর-একজন বৃন্দ, তার কঠিন্দ্বর অঙ্গুত সরু, গলা কাঁপিয়ে বলে চললেন, 'আহা, এইজনেই আমরা স্বাধীনতা এনেছি। তাগিয়স সুভাষ বোস মহাজ্ঞা গাকী নেই, তা হলে নিশ্চয়ই আঘাত্যা করতেন। ঝাঁটা মার ঝাঁটা মার। যেন ভাগড়ে শুকুন পড়েছে, শুটেপুটে খেল সব!'

'কংগ্রেস এইরকম ভুল করছে কী করে? এই দেশ স্বাধীন করার পেছনে কংগ্রেসেরই তো সবচেয়ে বড় ভূমিকা। কমিউনিস্ট পার্টির তখন কোথায় ছিল? তা এত বছর আদোলন করে যখন স্বাধীনতা পাওয়া গেল, কংগ্রেস তার নীতি থেকে সরে যাচ্ছে কেন? কেন দেশের মানুষের বুকে গুলি চালাচ্ছে?'

উত্তোলিত কঠিন্দ্বরকে থামিয়ে আর-একজন বলে উঠল, 'বাঃ বাঃ, আপনরা বাস পোড়াবেন, সম্পত্তি ক্ষতি করবেন আর সরকার আপনাদের দুর্ধুল্য খাওয়াবে? ফার্ডামেন্টাল রাইট মানে দেশের ক্ষতি করার অধিকার নিশ্চয়ই নয়!'

'গলা চড়াবেন না মশাই। যে-সরকার দেশের মানুষকে খেতে দিতে পারে না, তার চোখ রাঙাবার কোনো রাইট নেই। স্বাধীনতার মানে অনাহৰ নয়!'

'আপনার বাপ কম রোজগার করলে ডালভাত খাবেন, তাই বলে কি বাপের জামাকাপড় পুড়েয়ে আদোলন করবেন?'

'খবরদার বলছি, বাপ তুলে কথা বরবেন না। কংগ্রেস সরকার আমাদের বাপাঃ যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দালাল কোথাকার!'

হাঁটাং প্রসঙ্গটা চিক্কার চাঁমেচিতে পৌছে শিয়ে হাতাতলি লাগবার উপক্রম হল। অনিয়েষ বৃন্দ অদলোকের পাশে এসে বাইরের দিকে তাকাল। এই ভৱিকেলে মাঠের ওপর অঙ্গুত শান্ত ছ্যায়া লেংমেছে। এখন প্রকৃতির রং গাঢ় সবুজ। কোথাও-কোথাও ছেটবড় পুরুরে জল টলমল করছে। ছবিতে-দেখা বাংলার গ্রামের মতো বউঝিরা কলসি কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বীরভূমের পর বর্ধমান। কলকাতা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে। এখন বাইরে তাকিয়ে চলস্ত ট্রেন থেকে যতটুকু দেখা যায়, ক্ষণিক থেমে-তাকা স্টেশনে যতটুকু বোৰা যায়, কোথাও কোনো বিক্ষেত্র নেই, ব্যস্ততা নেই। কলকাতা শহরে মানুষের খাবার নিয়ে যে-আদোলন চলছে, এই ফসলের মাঠের মানুষের দিকে তাকালে তার কোনো প্রতিক্রিয়া চোখে পড়বে না।

বর্ধমান স্টেশনে সঙ্গে পেরিয়ে গাড়ি চুক্তেই সমস্ত পরিবেশটা চট করে পালটে গেল। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে খানিকক্ষণ গাড়ি কানফাটানো হইস্ল বাজাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর বাধ্য ছেলের মতো হাঁটি হাঁটি করে এগিয়ে শিয়ে বুড়ি টুল। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আওয়াজ শুনতে পেল। যাঁরা এই স্টেশনে নামবেন তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা। এমবাকি কুলিবা রোজকার মতো ছুটে এল না। কিছু খাকি পুলিশ লাঠি-হাতে ইঞ্জিনের দিকে ছুটে গেল। আওয়াজটাকে ওরা ততক্ষণে বুবাতেপারল। অনেকগুলো কর্ষ এক হয়ে এক শব্দ উচ্চারণ করায় সেটা জড়িয়ে গিয়ে অমন হচ্ছে। কান পাতলে বোৰা যায়, আলাদা করা যায়-'খাদ্য চাই বন্ধ চাই, গুলি করে দমিয়ে রাখা যায় না যায় না।'

ওরা শুনল, গতকাল এবং আজ কলকাতায় গুলি চলার প্রতিবাদে বিক্ষেত্রকারীরা ট্রেন-শাইনের ওপর বসে পড়ে অবরোধ সংষ্ঠি করেছে। এই প্ল্যাটফর্মে হকার নেই। শুধু একজন বুড়ো মাথায় কর কাচের বাক্যে সীতাভোগ-মির্হিদানা বিক্রি করতে করতে খবরগুলো দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনে ৬জন উঠল। অনিয়েষ দেখল যাঁরা এতক্ষণ কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করছিলেন তাঁরাই ব্যাপারটাকে মানতে পারছেন না। এইভাবে ট্রেন আটককে মানুষের ক্ষতি করে কী লাভ-মোটামুটি এইরকম আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল কামরায়। আদোলন যখন মানুষের জন্য তখন মানুষের সহানুভূতি আগে দরকার। এই ট্রেনের যাত্রীদের কথা কেন বিক্ষেত্রকারীরা ভাবছে না? বৃন্দ অদলোক নিচু গলায় বললেন, 'স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষের রাজনৈতিক তত্ত্ব আর আলাদা থাকেনা, বুবলে!'

অনিয়েষ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না। এই মুহূর্তে যেটা ঠিক, পরের মুহূর্তে সেটা নেষ্ঠিক হয়ে যায় কী করে? কংগ্রেস সরকারকে অভিযুক্ত করে যাঁরা কথা বলছিলেন, এই মুহূর্তে ট্রেন-

আটক হয়ে তাঁরা খুশি হচ্ছেন না, অথচ এই আন্দোলনকে উঠা সমর্থন করেন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনিমেষ সামনে তাকাল। লম্বা কামরার সারি ছাড়িয়ে ইঞ্জিনের ওপাশে অনেক লোক এবং প্রচুর পুলিশ। ক্রমাগত ধৰনি দেওয়া চলেছে। একবার প্ল্যাটফর্মে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখে এলে হয়। ও সেকথা বলতে বৃক্ষ ভদ্রলোক নিষেধ করলেন, 'কী দরকার ঝামেলার জড়িয়ে, কখন কী হয় বলা যায় না। অন্যবশ্যক কোতৃহল মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে।'

কথা বলার ধরন এমন নিরাসজুড়ে যে অনিমেষ খুব অস্বাস্তিতে পড়ল। ওই যে ওখানে এরকম হচ্ছেই হচ্ছে, ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীও বিলহের জন্যে আর-এক ধরনের উভেজনায় রয়েছে, অথচ বৃক্ষ ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে বসে আছেন। অনিমেষ শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আপনার দেখতে ইচ্ছে করছে না?'

'না।'

'দেরি করে পৌছলে অসুবিধে হবেনা?'

'হবে। তবে আমি এখানে বসে চেঁচিয়ে সেকথা বলে তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থা করতে পারব না। ট্রেন যখন ছাড়ার তখন চাড়বে-আমার তো কোনো হাত নেই।'

সাহস করে অনিমেষ ঠাণ্টা করার চেষ্টা করল, 'কিন্তু আর-সবাই তো চ্যাচামেটি করছে।'

একটুও বাগলেন না বৃক্ষ ভদ্রলোক, 'এই কামরায় বসে ওসব করা যায়। কিন্তু দ্যাখো তো, কেউ ইঞ্জিনের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ করছে কি না। সে-বেলায় কেউ যাবে না। আমরা সব নিরাপদে থেকে আগন্তনে হাত সেকতে তালোবাসি।'

কথাগুলো এমন চাঁচাহোলা যে অনিমেষ অবাক-গলায় বলল, 'আপনি অনেক দেখেছেন, না!'

'আমার বয়স কত অনুমান করো তো!'

ফাঁপরে পড়ল অনিমেষ, তবু অনুমান করার চেষ্টা করল, 'ষাট!'

'আটবষ্টি।' অর্থাৎ আমার আটান্ন বছর বয়সে ভারত স্বাধীন হয়েছে। অথচ আমি বাল্যকাল যোবন এবং পৌঁছে অবস্থায় কখনো ইংরেজ-তাড়ানো আন্দোলনে যোগ দিইনি। আমার মতো লক্ষ লক্ষ লোক দেয়নি। কিন্তু তাতে কি দশের স্বাধীন হওয়া আটকেছে মোটেই না। এখন বুরাতে পারি, খুব বড়লোক আর অত্যন্ত গরিব মানুষই প্রকৃত কাজ করতে পারে। আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু নিজেকে দিয়ে অন্য মানুষের স্বত্ত্বাব বুরাতে পারি।'

এই সময় আরও একবাক পুলিশ প্ল্যাটফর্মে শব্দ তুলে সামনের দিকে চুটে গেল। বৃক্ষ ভদ্রলেন, 'এবার জানালাটা বক্ষ করে দাও।'

'কেন?'

'নিরাপদে থাকা যাবে তা হলে।' কথাটার মানে বুরাতে-না-বুরাতে গোলমাল বেড়ে গেল বাইরে। খুব ঘনঘন ছাইস্ল বাজাছে ছাইভার। কতগুলো ছেলেকে তাড়া করে ওদের সামনে দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে পুলিশরা চুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম দড়াম করে জানলাগুলো বক্ষ করে দেওয়া হল ওদের কামরায়। দরজা আগেই বক্ষ করা ছিল, একজন উঠে গিয়ে লক করে দিয়ে এলেন। কামরায় এখন কেউ কোনো কথা বলছে না, যে যার জাগরণ চুপচাপ বসে। মাথার ওপর টিমটিমে আলো, একটুও বাতাস নেই পাখাগুলোয়। জানলা বক্ষ হয়ে যাওয়ায় এখন শুমেট গরম লাগছে। বৃক্ষ ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, 'দেখলে তো নিজেকে দিয়ে আমি কেমন বুরাতে পারি! সবকটা জানালা বক্ষ হয়ে গেল।'

মিনিট পেন্নোর বাদে ওদের চমকে দিয়ে ট্রেনটা দুলে উঠল। এটা যেন প্রত্যাশাই করেনি কেউ, হাঁপ ছেড়ে কেউ-একজন বলে উঠল, 'যাক বগাচা গেল।' এতক্ষণ মানুষগুলে নিজেরাই নিজেদের বন্দি করে বসে ছিলেন, কথাটা শুনেই বোধহয় সাড়া এল। প্ল্যাটফর্মে ছোটাছুটি, মাঝে-মাঝে আহত মানুষদের চিংকার তাঁদের একটুও বিচলিত করেনি। বৃক্ষ ভদ্রলোক চাপা গলায় ওকে বুরিয়ে দিলেন, এটা হল একধরনের সাধনালবক্ষ নিরাসকি। মধ্যবিত্ত মানুষ অনেককালের চেষ্টায় তা আয়ও করেছে। অত্যন্ত খারাপ লাগছিল অনিমেষের। ও একবার উঠে দাঁড়াতে অন্য যাত্রীরা যেতাবে নীরবে চোখ তুলে ওর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাতে আর এগোতে সাহস পায়নি সে। পুলিশগুলো কি আন্দোলনকারীদের মারছে দৃশ্যটা কল্পনা করে সে চুপচাপ বসে রইল বক্ষ কামরায়। হঠাৎ ওর খেয়াল হল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এই যে এত আন্দোলন হচ্ছে শুধু খাবারের দাবিতে, তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল থেকে কোনো প্রতিবাদের যিছিল বা আন্দোলন হচ্ছে না তো! এখন পুলিশ না এসে যদি কংগ্রেসিরা যিছিল করে আসত তা হলে ব্যাপারটা কেমন হত? সেটাই স্বাভাবিক বলে মনে হত না

কি? অথচ সেরকম ব্যাপার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, তা হলে পুলিশ আসবে কেন? ট্রেন আচাহিতে দূলে ওঠার সামান্য আগে ওদের দরজায় কেউ বা কারা বাইরে থেকে দুমদুম করে শব্দ করতে লাগল। কেউ-একজন চিকির করে ওদের দরজা খুলতে বলছ। শেষ পর্যন্ত অনুমতি করতে লাগলো সে, অথচ যাত্রীরা নির্বিকার। কেউ যেন অত জোরে আওয়াজ এবং আর্টকস্ট শব্দে পাছেন না। অনিমেষ দখল কেউ কারও দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন না পর্যন্ত, যেন পৃথিবীর কোনো শব্দ তাঁদের স্পর্শ করে নাই। অনিমেষ আর পরল না চুপ করে থাকতে, যে-ই শব্দ করুক দরজায় নিচ্ছয়ই সে খুব বিপদ্ধস্ত এবং এই কামরায় এখন প্রচুর বসার জায়গা খালি পড়ে আছে। ও উঠে এগিয়ে যাচ্ছিল দরজাটা খুলতে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ‘আরে আরে করছ কৈ? খবরদার দরজা খুলবে না। কী মতলব কে জানে, হয়তো পুলিশের তাড়া খেয়ে এখানে ঢুকতে চাইছে, শেষে আমাদের সবাইকে হাজতে পুরুক! কেউ-একজন মন্তব্য করল, ‘ঝেডেপেক’।

বৃক্ষ ভদ্রলোক হাতচানি দিয়ে ওকে ডাকতে অনিমেষ ফিরে এল। তিনি ফিসফিস করে বললেন, ‘মন-খারাপ করো না, অভিজ্ঞতা মানুষকে সম্পদ এনে দেয়। ভবিষ্যতে কাজে লাগিও।’

অনেকক্ষণ ডাকাডকির পর লোকটা ঢেলে গেল। এত বড় গাড়িতে অনেক জায়গা আছে, তা হলে শুধু এখানেই লোকটা ঢুকতে চাইছিল কেন? হঠাৎ ওর খেয়াল হল, সমস্ত ট্রেনের মানুষ জানালা-দরজা বন্ধ করে নেই তো এই কামরার মানুষের মতো? তা হলে লোকটা উঠবে কোথায়?

ট্রেনটা দূলে উঠতেই গাড়ির চেহারা আচমকা বদলে গেল। একজন ঘড়ি দেখে বলল, ‘ঞ্চাটা দুয়েকের মধ্যে শিয়ালদায় পৌছে যাব।’

‘দেখুন আবার পথে গাড়ি আটকায় কি না।’

আর-একজন কুব আশা করতে পারছিল না। প্রথমজন তাকে ভরসা দিল, ‘নন্টপ ট্রেন মশাই, সামনে দাঁড়ালে পিষে যাবে। একদম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দাঁড়াবে। ওখানে যদি আটকায় ক্ষতি নেই। নেমে শিষ্যে বাস ধরব।’

গাড়ি একটা-একটা করে স্পীড নিচ্ছে। বর্ধমান টেশন ছাড়িয়ে গেলে তবেই জানলাগুলো খোলা হল। এখন বাইরে কালো রাত। এখন তো আকাশে চাঁদ থাকার কথা, তবে কি মেঘ করেছে বাতাস। নেই বড়-একটা। অনেক দূরে কোনো ধ্বনির টিমটিমে আলো কাঁপছে। কিছুক্ষণ কথা বলে সামান্য স্বত্ত্বিতে থেকে যাত্রীরা আবার চুপচাপ হয়ে গেল। ট্রেনটা আরও গতি বাড়াক, চট করে কলকাতা এসে যাব, এইরকমটাই সবাই চাইছিল।

বৃক্ষ ভদ্রলোক ঘড়ি দেখে বললেন, ‘এইরকম যদি যায় তবে সাড়ে দশটার মধ্যেই পৌছে যাব মনে হচ্ছে।’

একথা শুনে অনিমেষের সামনে-বসা একজন রোগামতন মানুষ বললেন, ‘এত স্পীড বাড়ালো ঠিক নয়! কেন জানে যদি কোথাও ফিসপ্লেট খোলা থাকে-কিছুই বলা যায় না।’

কথাটা মুহূর্তে কামরার সবার কানে বাজল। এরকম একটা ব্যাপার হবার সভাবনা কেউ উড়িয়ে দিতে পারছিল না। কিন্তু কথা শুনে রোগা ভদ্রলোকের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল সবাই। হ্যা, সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেন ধারিয়ে দিতে না পেরে এইভাবে সরকারের উপর প্রতিশোধ নিতেপারে বিক্ষোভকারীয়া। যারা বাস গোড়াতে পারে তরা ট্রেন উড়িয়ে দেবে না কেন? যে-ভদ্রলোক বোলপুর টেশন থেকে কংগ্রেসের সমালোচনা করছিলেন তিনি বললেন, ‘নেতারা তো সব এখন আন্তরাষ্ট্রে, তাই ক্যাডারদের সামলানো মুশকিল হয়ে পড়েছে!’

আর-একজন বেঁকিয়ে উঠল, ‘রাবুন মশাই, আর ক্যাডার ক্যাডার করবেন না। কমরেড, ক্যাডার-বুকনি আছে মোলোআনা। দেশের ঠাকুর কেলে বিদেশের কুকুরকে মাথায় করে নাচতে নাচতে বলছে, দ্যাখো,-আমি কী হুন। ট্রামবাস পুড়িয়ে বিপুর করবি, ট্রেন ওড়াবি, এদিকে যাদের জন্য করা সেই সাধারণ মানুষ জানল না কিছু, তারা রাজি কি না না-জেনেই বিপুর হয়ে গেল।’

যা-ই বলুন, এই দেশে কমিউনিস্টরা কখনো ক্ষমতায় আসবে না। কংগ্রেসদের আফটার অল একটা প্রতিক্রিয়া আছে। জওহরলাল বিধান রায়ের মতো পার্সোনালিটি কজনার আছে হ্যাঁ, নেতাজি ফিরে এলে আলাদা ব্যাপার হত।

‘নেতাজি মরে ভৃত হয়ে গেছে, তাঁকে নিয়ে আর টানাটানি কেন?’

‘আপনি জানেন নেতাজি মরে গেছেন? এনি প্রক্ষঃ ফটোফট আজেবাজে কথা বলা আমাদের জাতীয় অভেস।’

আবার সবাই সুপ করে গেল। এন্দের কথাবার্তা যেমন দুম করে শুরু হয়, তেমনি চট করেই থেমে যায়। আর কখনোই একটা বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে না। বেশ মজা লাগছিল এইসব কথা শুনতে। অনিমেষ দেখল বৃক্ষ অদ্বৰ্য গাড়ির দুলুনির তালে তালে চুলছেন। মুখচোখ কেমন কড়কড়ে লাগছে অনিমেষের, জিব শুকিয়ে উঠেছে। অনিমেষ অনুভব করল ওর পেটের ভেতরটা চিনচিন করছে। সারাদিন খাওয়া হয়নি, মূখের ভেতরটা বিশ্বাদ হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ চিতা করে নিয়ে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা ওপরের বাক্সে আছে। অনিমেষ চারপাশে একবার চোখ ঝুলিয়ে নিয়ে দুহাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ল বাক্সে। কেউ-কেউ ওর এই উঠে-আসা অলস-চোখে একবার তাকিয়ে দেখল শুধু। ভালো করে বাবু হয়ে বসে পকেট থেকে চাবি বের করে অনিমেষ ব্যাগটা ঝুলল। জামাকাপড় অনেকক্ষণ ব্যাগে থাকলে কেমন যিটি গঙ্গ বের হয়। বাঁদিকের কোণা থেকে সে পলিথিনের ছোট পুটলিটা টেনে বের করল। বাঁধন খুলে খাবারগুলো বের করল অনিমেষ। অনেকগুলো লুচি, কিছু আলুভাজা, সামান্য তরকারি আর শীর। জিবে জল এসে গেল অনিমেষের, খিদেটা যেন এতক্ষণ চুপিসাড়ে বসেছিল, খাবার দেখেই আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। অনিমেষ লুচি ছিঁড়ে তরকারি নিয়ে মুখে দিতেই টকটক গঙ্গ পেল। নষ্ট হয়ে গিয়েছে খাবারটা। বিশ্বী স্বাদ লাগছে। তড়াতড়ি মুখ থেকে খাবারটা বের করে ও পুটলিটাকে মুখের কাছে নিয়ে অন্যগুলোর গঙ্গ শুকলো। বোনেটাই ভালো নেই। গতকালের তৈরি খাবার কাল সারারাত আজ সারাদিন ব্যাগে বন্দি থাকায় এই গরমে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনিমেষ কিছুক্ষণ হতভবের মতো বসে থাকল। পিসিমা এত যত্ন করে এসব তৈরি করলেন আর সে নষ্ট করে ফেলল! এগুলো ফেলে দিতে ওর খুব খারাপ লাগছে, কিছু খাওয়া উচিত নয়। শুধু লুচিগুলো এখনও টকে যায়নি, খিদে মেটাতে অনিমেষ সেগুলোকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে থেতে লাগল। কয়েকটা খাওয়ার পর অনিমেষ শুনল নিচে কেউ বলছেন, ‘বাস-ট্রাম পাব কি না জানি না।’

‘বাস পাবেন কী মশাই, শুনছেন কারফিউ জারি হয়েছে। দিন-দিনে গেলে একরম হত, কিন্তু এত রাত্রে কী হবে কে জানে!’

‘দূর কলকাতায় কখনো কারফিউ মানানো যায়! অত লোককে সামলাবে কে? দেখেন-না, একশো চুয়ালিঙ্গ ধারা জারি হল, কিন্তু লোকজন যেমনকে তেমন চলাফেরা করছে, না বলে দিলে বোৰা যায় না।’

‘আরে কারফিউ হল কারফিউ, ভয়েই লোক বাড়ির বাইরে যাবে না। যুদ্ধের সময় দেখেছি তো! অনিমেষ নিচে নেমে এল। বৃক্ষ অদ্বৰ্য একবার চোখ খুলে আবার বক্ষ করে ফেললেন। প্যাসেজ দিয়ে অনিমেষ দরজার কাছে চলে এল। ভবিষ্যৎ জলতেটা পাছে। দরজার জানলা দিয়ে পুটলিটা বাইরে ফেলে দিতে যিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। এতখানি খাবার ফেলে দেবেও আজকে যখন খাবার নিয়ে এত আন্দোলন হৃতাল হচ্ছে তখন এটা অপচয় নয়! নাহয় সামান্য নষ্ট হয়েছে খাবারগুলো, কিন্তু বোনো ভিত্তিরিকে দিলে সে খুশি হয়ে থেয়ে নেবে। কিছুক্ষণ চিতা করে শেষ পর্যন্ত সে জানলা দিয়ে পুটলিটা বাইরে ফেলে দিল। একজন ভিত্তিরিকে এই খাবার খাইয়ে অসুস্থ করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। বেসিনে হাত ধুয়ে অনেকক্ষণ ঘোলা গরম জল থেতে পেট ভরে গেল অনিমেষের। তবু কেমন যেন অবস্থি হচ্ছে।

নিজের আসনে ফিরে এসে অনিমেষ দেখল, বাইরে আর অঙ্ককার নেই। তিরতিরে জ্যোত্ত্বা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। দূরের বাড়িগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাকা একতলা দোতলা বাড়িতে আলো জ্বলছে। তুহ করে ট্রেন ছুটে যাচ্ছিল এতক্ষণ, এবার হঠাৎ গুমগুম শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ অদ্বৰ্য তড়াক করে উঠে বসেন। তারপর বাঁদিকের জানলার দিকে ঝুকে দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে ঘনঘন প্রণাম করতে লাগলেন। অনিমেষ আবাক হয়ে দেখল, কামরার অন্যান্য যাত্রীও সবাই হড়মুড় করে বাঁদিকের জানরায় চলে গিয়ে নমস্কার করতে লাগলেন, ‘মা, একটু দেখো মা।’

অনিমেষ দেখল খুব বিরাট এক নদী ওপর দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছে। ঘোলা জলে জ্যোত্ত্বা পড়ে চকচকে চেতুগুলোকে অস্তুত দেখাচ্ছে। এপাশে কি কোনো মন্দির আছে? বৃক্ষ অদ্বৰ্য মাথা ধূরিয়ে বললেন, ‘আরে দেখছ কী, প্রণাম করো-মায়ের মন্দির দেখতে পাচ্ছ না?’

‘মাঃ’ অনিমেষ বুবাতে না পেরে জিজাসা করল।

‘দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি। রায়কৃষ্ণদেবের নাম শোনলি? তিনি এখানে পাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আর ওপাশে-, হাত বাড়িয়ে বিপরীত দিকের তীর দেখিয়ে তিনি বললেন, ‘বেলুড়। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা

করেছেন।'

সামনে এত মাথা আড়াল করে রেখেছে যে, অনিমেষ চেষ্টা করে শুধু মন্দিরের চূড়ো দেখতে গেল। দান্ডুর কাছে কথামত আছে, অনিমেষ পড়েছিল। রামকৃষ্ণদেব নাকি কালীঠাকুরের সঙ্গে কথা বললেন। কিছু দেখার আগেই মন্দিরটা ছাড়িয়ে গেল। অনিমেষ যাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবাক হয়ে গেল। এতক্ষণ যাঁরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলছিলেন, তারাই কী দারুণ ভক্ত-ভক্ত মুখ করে নিজের অসনে ফিরে আসছেন। গাড়ির গতি কমে আসছিল এবার। হঠাৎ যাত্রীদের খেয়াল পড়ল, তিন-চারটে গলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'জানলা বক করে দিনু মশাই, জানলা বক করে দিন!'

একজন যাত্রী সুটকেস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি কিন্তু এখানে নামব।'

'দাঁড়ান দাদা, চট করে নেমে পড়বেন না। শেষে আপারও বিপদ, আমাদেরও দফারফা হবে।'

'কিন্তু গাড়ি তো এখানে যোটে তিন মিনিট দাঁড়ায়।' যাত্রীটি প্রতিবাদ করল।

'পাঁচ মিনিট।'

'কক্ষনো নয়। আমি এখানে থাকি আর আমি জানি না!' অদ্বলোক লক খুলে দরজার হাতল ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন যাত্রী উঠে ওঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উনি নামলেই এঁরা দরজা বক করে দেবেন। আস্তে-আস্তে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে চুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম করে কানফাটানো শব্দ হল। কেউ-একজন চাপা গলায় বলে উঠল, 'বোমা পড়ছে।'

অনিমেষ দেখল, নামবার জন্য যিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কী করবেন বুরুতে পারছেন না। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেবার এগই দরজা বক করতে যাওয়া যাত্রীরা চটপট আবার লক তুলে দিল, 'আপনাকে আর নামতে হবে না।'

'কিন্তু—।' অদ্বলোক বিড়বিড় করলেন।

জানলাৰ ফুটো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একজন বলে উঠল, 'প্ল্যাটফর্মটা দেখেছেন, ঘুটঘুটে অন্ধকার। টেশনের বাইরে বোম পড়েছে—বাপের দেওয়া প্রাণটাকে হারাবেন মশাই!'

হতাশ গলায় একজন বলে উঠল, 'অবস্থা খুব যোরালো দেখছি!'

'কিন্তু আমি শিয়ারদার গেলে ফিরব কী করে? না না, যা হয় হবে, আমাকে নামতে দিন।' কথা বলতে বলতে অদ্বলোক লক খুলে দরজার হাতল খুরিয়ে যেন গায়ের জোরে নিচে নেমে গেলেন। অনিমেষ শুনল অদ্বলোক চিংকার করে কুক্লিকে ডাকেছেন। কিন্তু কোনো সাড়া এল না কেখাও থেকে; যাত্রীরা দরজা বক করে ফিরে আসেতই ট্রেনটা আরার চলতে শুরু করল। এখন প্রায়ই বোমের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অদ্বলোক কী করে বাড়ি যাবেন কে জানে!

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে গেল, মানে কলকাতা এসে গেছে। এতক্ষণ অনিমেষ যেটা খুব আমল দেয়লি সেই চিঞ্চীটা মাথায় চুকে পড়ল। যে-সময়ে ট্রেনটা যাচ্ছে তা নির্ধারিত সময়ের সাড়ে তিন ঘণ্টা পার করে। বাবার বুরু, যাকে সে কোনোদিন দেখেনি, যদি এতক্ষণ তার জন্য টেশনে অপেক্ষা না করেন? তা ছাড়া কারফিউ যখন জারি হয়েছে তখন তিনি রাস্তায় বের হবেন কী করে? যদি তিনি টেশনে না আসেন তা হলে সে কী করবে? ক্রমশ অনিমেষ নার্ভাস হয়ে পড়ল। এখন এখানে এত বোমা পড়ছে কেন? জনসাধারণের সঙ্গে কি পুলিশের যুক্ত হচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল, এটা অসম্ভব। কারণ জনসাধারণ মানে তো এই কামরার মানুষেরাই, এঁরা কখনো পুলিশের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন না। সারাবাত কি তা হলে ওকে টেশনে কাটাতে হবে? অবশ্য বৃক্ষ অদ্বলোক ঠিকানাটা শুনে বলেছেন যে টেশন থেকে বেশি দূরে নয় এবং তিনি ওই অঞ্চলেই থাকেন। তা হলে ওঁর সঙ্গে থাকাই ভালো। তবু অনিমেষ হঠাৎ অনেকদিন পরে চটপট আঙুল দিয়ে কপালে 'র' শব্দটা লিখে মা বলে দুই হাতে মুখটা ধরে মনেমনে ঘোম করে নিল। এরকম করে ওর মনে হল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সমাধান হয়ে যাবে। ও শিয়ালদা টেশনে পৌছে নিশ্চয়ই বাবার বক্সকে দেখতে পাবে।

বৃক্ষ অদ্বলোক তাঁর জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে নিচে বেঞ্চির ওপর নামিয়ে রাখলেন। যাত্রীরা সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। অনিমেষ চুপচাপ বসেছিল। এই মানুষগুলোর সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে ও নতুন রকমের অভিজ্ঞতা পেল, হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। অনেক কিছুর মধ্যে একটা ব্যাপার শুধু ওর যন্মে ব্যচেচ করছে, সেই অদ্বলোকের আর্তচিকার সঙ্গেও সে দরজাটা এদের জন্য খুলে দিতে পারেনি। এখন নিজেকে খুব ছেট মনে হতে লাগল অনিমেষের। দেশকে যারা ভালোবাসে তারা কখনও কানুকৰ্ম হতে পারে না। তা হলে কি সে কাপুরুষ? দেশ মানে তো এইসব মানুষ, এঁরাই কী অস্তুত শামুকের মতো ভয়ে-ভয়ে এতটা পথ কাটিয়ে এলেন, এখনও কামরার জানলা বক। কিন্তু এন্দের মুখ

দেখে মনে হচ্ছে না, সেই ভদ্রলোককে উঠতে না দিয়ে এবের মনে কোনো আফসোস আছে। সকলেই যে যার বাড়িতে যাবার জন্য জিনিসপত্র গুচ্ছিয়ে তৈরি, শুধু ট্রেন থামার অপেক্ষা।

বৃক্ষ ভদ্রলোক বললেন, ‘তোমার তো শুধু ওই ব্যাগ আর এই বেডিং। কুলির প্রয়োজন হবে না, কী বল?’

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। গতরাত্রে উনি অনিমেষকে আপনি করে কথা বলেছিলেন, আজ সকাল থেকে সেটা খুচে গেলে অনিমেষের স্বত্তি হয়েছে। সে বলল, ‘আপনি একটু দাঁড়িয়ে যাবেন?’ ‘মানে?’

‘আমার বাবার বন্ধুকে ঝঁজে দেখব।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচ্যই। উনি না এলে আমি তোমায় পৌছে দেব। আরে, ও তো আমারই পাড়া। তুমি নিস্তিত থাকো।’

কলকাতা আসছে। অনিমেষের বুকের মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে যাওয়ার মুখে একটা উন্তেজনা ছটফট করছিল। সেই কোন ছেলেবেলায় সরিণশ্বেত বলেছিলেন, কলকাতায় যখন সে আসবে মাথা উঁচু করে আসবে, কারণ হাত ধরে নয়। আজ তে তা-ই হচ্ছে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ মোসের কলকাতায় সে একটু বাদে পা দেবে; কলকাতা মানে বাংলাদেশের প্রাণ। সেই প্রাণকে সে স্পর্শ করতে যাচ্ছে।

একসময় ট্রেন গতি কমিয়ে আনল। বৃক্ষ ভদ্রলোক জানালা খুলে দিতে দূরে আলোকলম্ব প্ল্যাটফর্ম চোখে পড়ল অনিমেষের। ট্রেনটা যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত মানুষের মাথা চোখে আসেছে। কেন যেন বলল, ‘যাক, শ্যালদা এসে গেল!’

এতেজন্য অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দুচোখ জুলতে লাগল। পরমুহুর্তেই হচ্ছে করে সেই জুলুনি একবার জলে চোখ ভাসিয়ে দিল। কামরার সব মানুষের চোখে হাত কলকাতায় পৌছেই অনিমেষ দুহাতে চোখ চেপে ধরল। বৃক্ষ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ‘টিয়ার গ্যাস।’

ট্রেনটা থামতেই হড়মুড় করে নেমে গেল সবাই। অনিমেষ কিছুতেই নিজের চোখ দুটোকে সামলাতে পারছিল না। বাতাসে অঙ্গুত একটা গুঁজ, আর সেইসঙ্গে চোখ-জুলুনি। কুমালে চোখ চেপে ধরলে কিছুটা স্বত্তি পাওয়া যায়। চোখের জল ফেলতে সে বৃক্ষ ভদ্রলোকের পেচন পেছন কলকাতার মাটিতে পা দিল। দিনের আলোর মতো নিয়নবাতিতে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার। সেখানে তিল ফেলার জয়গা নেই যেন অজস্র মানুষ সুটকেস পেঁয়াটোরা নিয়ে বসে কাঁদছে। এর মধ্যে কেউ জল যোগাড় করে বাচ্চাদের চোখে ঘাপটা দিচ্ছে। ওদের ট্রেনের যাত্রীরা নামতে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাটা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। এত বড় প্ল্যাটফর্ম কলকাতা শহরেই মানায়, অনিমেষ চোখ সামলে চারধার দেখছিল। ওপাশে পরপর অনেকগুলো এরকম প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। সেখানেও মানুষেরা বসে আছে। এত মানুষ অর্থে তেমন চিকিৎসা চ্যাটামেটি হচ্ছে না। অনিমেষ শুনল মাইকে যাত্রীদের শাস্তি হয়ে থাকার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। একটা কুলিমতন লোক সামনে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। মালপত্র তোলার বিনুমাত্র আগ্রহ তার নেই। দুর্বজন তাকে ডাকতে সে ঘাড় নেড়ে বলল, ‘কারফু হো গ্যায়া, নেই যায়েগো।’

বৃক্ষ ভদ্রলোকেরও সেই দশা, চোখে কুমাল চেপে বললেন, ‘বেশি রংগড়িও না, তা হলে কষ্টটা করে যাবে।’ কলকাতায় পা দিয়ে এরকম একটা অভিজ্ঞতা পেয়ে অনিমেষ খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। টিয়ার গ্যাসের নাম কাগজে সে পড়েছে, জিনিসটা কীরকম সে জানে না, তবে তার অতিক্রিয়া যে মারাত্মক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ট্রেনের মানুষগুলোকে টিয়ার গ্যাস ছুড়ে কাঁদানো হচ্ছে কেন? এরা তো সবাই শাস্তি হয়ে বসে আছে। কিছুক্ষণ ওরা চুপাচাপ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার পর বৃক্ষ ভদ্রলোক বললেন, ‘চলো, একটু এগিয়ে দেখা যাক।’

এর মধ্যে অনেকেই বিছানাপত্র বিহিয়ে প্ল্যাটফর্মে শয়ে পড়েছে। অনিমেষবা অনেক সাবধানে ওদের পাশ কাটিয়ে গেটের কাছে চলে এল। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়, সবাই উঁকি মেরে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে। বৃক্ষ বললেন, ‘আজ দেখছি চেকার-টেকার কেউ পেটে দাঁড়িয়ে নেই।’

একজন ফিরিওয়ালা সেকথা শুনে বলল, ‘কলকাতা শহরের যুক্ত তরু হয়ে গেছে এখন, আরা কে টিকিট চাইবে! দেখছেন না কেউ বাইরেই বেরছে না।’

অনিমেষ বলল, ‘কেন, বাইরে বেরলুলে কী হবে?’

‘দুর্যোগ ফটাস।’ মুখ দিয়ে একটি অস্তুত আওয়াজ বের করল লোকটা, ‘মিলিটারি নেমে গেছে, তোরের আগে রাস্তায় কাটিকে দেখছে, সোর্জি মর্গে চালান করে দেবে।’

বাবার বন্ধুর খৌজ নেবার কথাটা এতক্ষণ অনিমেষ এইসব ঝামেলার খেয়াল করেনি, তোর
শেষটা শুনে চট করে মনে পড়ে যেতে ও চক্ষল হয়ে উঠল। বৃন্দকে সেকথা বলতে তিনি বললেন, 'তা
হলে গেটের বাইরে যেতে হয়। কিন্তু তিনি কি আসতে পেরেছেন? মনে হয় না।' অনিমেষ যে-ডায়টা
সারা পথ এড়িয়ে যাছিল এখন সেটা তাকে চারপাশ থেকে যিরে ধরল। সত্যি যদি তিনি না আসতে
পারেন, তা হলে কী হবে? দুচোখ আড়াল করলে মেন জ্বালাটা সামান্য কমে যায়, অনিমেষ বৃক্ষের
সঙ্গে সেইভাবে ডিঙ্গের সামনের সারিতে এসে দাঁড়াল। কয়েক হাত খালি প্ল্যাটফর্মের পর
কোলাপসিবল গেট হাঁ করে খোলা, তার বাইরে বিশাল বারান্দা বা চাতাল খাঁকা করছে। যাত্রীরা সবাই
একটা নিরাপদ দূরত্ব রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে, কেউ এগোতে সাহস করছে না। মাঝে-মাঝে
দূরদূরাত্ম থেকে বোমা পড়ার শব্দ ভেসে আসছে, কাছেপিঠে কিছু হচ্ছে না।

টেলিফোন বুখঠলোকে দেখলেই চেনা যায়, ওপরে ছবি ডাঙানো আছে। তার সামনেই
এনক্যায়ারি-লেখা কাউন্টার, কিন্তু সেখানে কেউ নেই। কোনো মানুষকে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে
দেখা গেল না। যদি সারাদিন এইরকম কারফিউ থাকে শহরে তা হলে তিনি বের হবেন কী করে?
এখন কিন্তুই করার নেই, শুধু এই প্ল্যাটফর্মে এত মানুষের সঙ্গে চৃপ্চাপ ভোরের অপেক্ষা করা ছাড়া।
অনিমেষের মনে পড়ল সাদু অনেক ভেবেচিনি ওর যাত্রার যে-দিন ঠিক করেছিলেন, সেটা এরকম
গোলমুলে হয়ে গেল? টেশনের ভেতরে একটা যে-দিন ঠিক করেছিলেন, সেটা এরকম গোলমেলে
হয়ে গেল? টেশনের ভেতরে একটা বড় ঘড়িতে সময় দেখল যে, এগারোটা বেজে গিয়েছে।

আজ শিয়ালদা থেকে কোনো ট্রেন ছাড়ছে না। শুধু দূরপ্রাণীর মেল্টেনগুলো এসে যাত্রী নামিয়ে
চৃপ্চাপ শেডে ফিরে গিয়েছে। টিয়ার গ্যাসের জ্বলনি কমলে আটক যাত্রীদের গুঞ্জন মিলিয়ে গেল
কেউ বেশি কথা বলছে না। জিনিসপত্র নিচে নামিয়ে অনিমেষ বসে পড়েছিল। বৃক্ষ ভদ্রলোক খুব
অধিক হয়ে পড়েছেন। এখান থেকে তাঁর বাড়ি হেঁটে গেলে মাত্র দশ মিনিটের পথ, অথচ সারারাত
এই প্ল্যাটফর্মে আটকে থাকতে হবে এটা মেন তিনি কিন্তুই মানতে পারছিলেন না। অনিমেষের
কাছে জিনিসপত্র রেখে তিনি খবরাখবর নেবার জন্য অন্য প্ল্যাটফর্মে চলে গেলেন।

কঙ্গড়েই, এ ধরনের ব্যাপার হয়ে গেল, অনিমেষের তালো লাগছিল না। কলকাতা শহরকে
দেখবার জন্য ওর মন ছটফট করছিল, এখন এই পরিবেশে নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগছে। কংগ্রেস
সরকারের সঙ্গে বামপন্থীদের যুদ্ধ হচ্ছে এখানে, কিসের যুদ্ধ? খাবার যদি কারণ হয়, তা হলে সে-যুদ্ধে
তো ও যে-বাংলাদেশ নয়। তা হলে বামপন্থীদের এই যুদ্ধ কতটা সাফল্যলাভ করবে? কংগ্রেস
সরকারের হাতে মিলিটারি আছে, তাদের অস্ত আছে-এভাবে কি খাবার আদায় করা যায়? একে কি
গৃহ্যুক্ত বলে?

আর কংগ্রেস সরকারই বা নিজের দেশের মানুষের ওপর গুলি চালাছে কেন? তারা খাবার
চেয়েছে অল্প দামে, সরকার সেটা দিয়ে দিলেই তো পাবে! তা হলে দেশের মানুষ কংগ্রেসের ওপর
খুশি হবে-আর বেশি বোট পাবে নির্বাচনে। সেটা নিশ্চয়ই কংগ্রেস সরকার জানে এবং জেনেভানে
এরকম উপায়ে মেকাবিলা করছে! অনিমেষ অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত এইরকম একটা সিঙ্কান্তে এল
যে, আজ যে-ঘটনাটা কলকাতা শহরে ঘটছে তা খুব সরল নয়। নিশ্চয়ই তার পেছনে অন্য কোনো
কারণ আছে যা ও বুবাতে পারছে না। এখন আর টিয়ার গ্যাসের সেই জ্বলনিটা নেই, পরিষ্কার মেঝে
চারধারে অনেক সিলেমার বিজ্ঞাপন দেখতে পেল। এখন আলোগুলো কেমন হলুদ-হলুদ দেখাচ্ছে।
রাত যত বাড়ে তত কি আলোগুলোর চেহারা পালটে যায়? অনিমেষ দেখল একটা কালোগতন
মাঝবয়সি মেয়েছেলে সামনে সতরঞ্জি পেতে শুয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে সে
ফিক কর দেঙ্গা-খাওয়া-ইতাসি হাসল। চোখ শিরিয়ে নিল অনিমেষ, কে না জানে কলকাতায় খাবাপ
মেয়ে এবং পুরুষ সবসময় শিকার ধরতে ঘুরে বেড়ায়। এদের থেকে সর্তক না থাকলে এই শহরে
একদিনও বাস কুরতে পারা যাবে না। ও অনুসভাবে নিজের কোমরে হাত বুলিয়ে দেখে নিল,
টাক্কাগুলো ঠিকই আছে।

খুব জলতেটা পাছে। এখানে কাছেপিঠে জলের কল কোথায় আছে? অনিমেষ উঠে দাঁড়াতে
গিয়ে হাল ছেড়ে দিল। এত জিনিসপত্র এখানে রেখেছে জল থেকে যাবে কী করে? নিজেরটা হলে
বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু বন্ধ ভদ্রলোকের ব্যাগও রয়েছে। উনি যে কোথায় পেলেন? মাঝবয়সি
মেয়েছেলেটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আবার, এক হাত কনুই থেকে ভাঁজ করে সুখের
ওপর আড়াল দিয়েছে। কালো দাঁত বের করে বলল, 'ওয়ে পড়ো খোকা, ঘুমিয়ে গেলে সকাল হয়ে

যাবে 'খন !'

অনিমেষ বলতে চাইল, আমি এইরকম পায়ে-চলা জায়গায় জীবনে ওইনি, অতএব আজ বসেই
রাত কাটাৰ, কিন্তু বলতে গিয়েও থমকে গেল সে। তাৰ এই ঘোল-সতোৱে বছৱেৱ জীবনে অনেক
কিছু সে কৰেনি, এখন তো কৰছে। যেমন কোনোদিন সে কলকাতায় আসেনি, এৰ আগে কখনো
দাদু-পিসিয়াকে ছেড়ে একা একা থাকেনি, এইভাৱে টিয়াৱ গ্যাসে কখনো তাৰ চোখ জুলেনি-এগুলো
সব এখন ঘটছে। তাই কোনোদিন কৱিনি বলে কৱৰ না বলা বোধহয় টিক নয়। সে ঘাড় নেড়ে বলল,
'না, ঘূম আসছে না !'

'কোথেকে আসা হল?' কথা বলল মেয়েছেলেটা।

'জলপাইগুড়ি !'

'সে কোথায়-আসামে ?'

'না, তবে ওইদিকেই !'

'সেখানে পাহাড় আছে ?'

হেসে ফেলল অনিমেষ। জলপাইগুড়ি শহৱে বা জেলায় পাহাড় বলতে তেমন-কিছু নেই। জঙ্গল
আছে, পাহাড়ি আবহাওয়া আছে। সে বলল, 'নেই !'

মেন হতাশ হল মেয়েছেলেটা, 'আসামে পাহাড় আছে, সেখানে আমাৰ দেওৱ কাজ কৱে। তবে
লোক ভালো নয়, মাতাল !'

অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে নিল। কী মতলব কে জানে, নাহলে যেতে যেতে নিজেৰ পৰিবাৱেৱ বৰুৱ
ওকে দিতে যাবে কেন? মেয়েছেলেটা অবশ্য একা নেই, ওৱ পাশে একটা ফুকপৱা মেয়ে উলটোদিকে
মুখ কৱে ধৃংয়ে আছে। তাকে ভালো কৱে দেখতে পাছে না অনিমেষ। এই সময় মাইকে আবাৱ
ঘোষণা কৱা হল, 'যাত্ৰীসাধাৱেৰৰ কাছে আবেদন, সময় কলকাতা শহৱে শান্তিবিহুৰে আশক্ষাৱ কাৱফু
জাৰি হওয়ায় আগামীকাল তোৱ ছটাৰ আগে কেউ টেশন-চতুৱেৰ বাইৱে যাবেন না। এতে আপনাৰ
নিৱাপত্তা নিশ্চিত হবে।' বেশ কয়েকবাৰ এই কথাগুলো আওড়ে মাইকটা খেয়ে গেল। এই সময় বৃক্ষ
ভূজুৱাককে হস্তসন্দ হয়ে ফিরতে দেখল অনিমেষ। এক হাতে বাদামৰে ঠোঞ্চা একটা, কাছে এসে
বললেন, 'থিদে পায়নি? অনিমেষ ঘাড় নাড়তে তিনি বললেন, 'একটু আগে ট্ৰেনেই তো খেয়ে নিলে
তুমি !'

ওঁৰ বাদাম-চিবানো মুখটাৰ দিকে তাকিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা কৱল, 'কী দেখলেন?'

'বুৰুজতে পাৱছি না। কোনোৱকমে এই সাৰ্কুলাৰ রোডটা পেৱিয়ে যেতে পাৱলেই বাড়ি পৌছে
যাওয়া যায়। কী যে কৰিব! বৃক্ষেৰ চোয়াল নাচছিল। তাৱপৰ হঠাৎ যেন মনে পড়ে গিয়েছে এমন
ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ্ঞা চলো তো, এক নমৰ প্ল্যাটফৰ্মে যাই !'

'কেন?' অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

'ওখান থেকে সাৰ্কুলাৰ ৰোড পাঁচ পা বাস্তা। কিন্তু বাইৱে দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। গুড়, চলে
এসো এদিকে।' নিজেৰ জিমিস হাতে নিয়ে বৃক্ষ আণে-আগে চললেন, পেছনে অনিমেষ। ওৱা
যাত্ৰীদেৰ মধ্যে দিয়ে প্ল্যাটফৰ্মেৰ পেছনদিকে ফিরে যাচ্ছিল। এদিক দিয়ে কীভাবে বেৱ হওয়া যাবে
অনিমেষ বুৰুজতে পাৱছিল না। প্ল্যাটফৰ্মেৰ শেষপ্রাপ্তে জায়গটা ঢালু হয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে। শেষ
আলোটা ছাড়িয়ে ওৱা নিচে নামল। তাৱপৰ কয়েক পা হেঁটে বাঁদিকে ঘূৱে অনেকগুলো রেললাইন
পেৱিয়ে একদম শেষপ্রাপ্তে চলে এল। এখন কোনো ট্ৰেন আসা-যাওয়া কৰছে না। মাথাৱ ওপৱ ঘূড়িৰ
মতো কোণোটো চাঁদ ঝুলে রয়েছে। তাৱ আলোয় রেললাইনগুলো চকচকে সাপেৱ মতো জড়াজড়ি
কৰছে।

বৃক্ষ কোনো কথা বৱাছিলেন না। এতক্ষণ, এবাৱ আবাৱ ফিরতে ওৰু কৱে বললেন, 'যা-ই বল
বাবা, এভাৱে প্ল্যাটফৰ্মে বসে সামাৱাত কাটাৰ আমি ভাবতেই পাৱি না। হাজাৱ হোক আমৱা
কলকাতাৰ ছেলে, বাড়িৰ দুৱা দূৱ বসে থাকব অথচ বাড়িতে যেতে পাৱব না-এ হতেই পাৱে না।
আঃ, কোনোৱকমে রাস্তাটুকু পাৱ হতে পাৱলেই গলিতে তুকে পড়ব, বাস, সামান্য হাটলেই বাড়ি।
বাড়ি মানে নিজেৰ বিছানা-আঃ!'

কথাগুলো ওনতে ওনতে অনিমেষেৰ মনে হল জলপাইগুড়িতে ওৱ নিজেৰ বিছানাটা এখন খালি
পড়ে আছে। অথচ আজ রাত্রে ওৱ জন্য কোনো বিছানা তৈৰি নেই। এত রাত্রে যদি বাবাৱ বৃক্ষৰ
বাড়িতে গিয়ে সে উপস্থিত হয় তিনি নিশ্চয়ই বিব্ৰত হবেন। আবাৱ এও হতে পাৱে তিনি নিজে টেশনে

আসতে পারলেন না, অনিমেষ একা কী করছে—এই ভেবে বোধহয় তিনি ঘুমতেই পারছেন না। তাই যে যদি এখন বাড়িতে যায় তিনি নিশ্চিত হবেন। কিন্তু রাস্তা যদি জনশূন্য হয়, তা হলে কে তাকে ঠিকানা চিনিয়ে দেবে? কলকাতার রাস্তার নাকি বাড়ির নম্বর পরপর থাকে না। তার চৈয়ে কাল তোরে আলো ফুটলে রাস্তায় লোক বের হলে জিজ্ঞাসা করেটারে গেলেই বোধহয় ভালো হবে। মোটামুটি এইরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে অনিমেষ বৃক্ষের পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। দূর থেকে প্ল্যাটফর্মটাকে ছবিতে—দেখা জাহাজের মতো মনে হচ্ছে, আলো নিয়ে দুলতে দুলতে কাছে এগিয়ে আসছে।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে লোকজন তেমন নেই। কিছু ভিত্তির আর ছান্দাড়া টাইপের মানুষ তায়ে রয়েছে। ওরা ওদের পাশ দিয়ে মূল গেটে চলে গেল। এগিকে মেইন প্ল্যাটফর্মের মতো জোরালো আলো নেই। কোলাপসিবল গেটের সামনে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। সামনে অনেকখানি খোলা জ্বালায়া, ডানদিকে টেশনে ঢোকার গেট, গেটে ছাড়িয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ওপাশটা অঙ্ককার। বৃক্ষ অন্দুরোক অনেকক্ষণ সেদিকে নজর রেখে ফিসফিস করে বললেন, ‘কোনো মানুষজন তো দেখতে পাচ্ছি না। পুলিশও নেই।’

‘ওটা কী রাস্তা?’ অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

‘সার্কুলার রোড। ওটা পোরোলেই হয়ে গেল, পায়েপায়ে বাড়ি পৌছে যাব।’ অঙ্ককার রাস্তার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ প্রথম কলকাতাকে দেখল। বৃক্ষের অঙ্গুরতা বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, ‘চলো আড়ালে পথটুকু পেরিয়ে যাই।’

‘কিন্তু আমি এখন ঠিকানাটা কি খুঁজে বের করতে পারব?’

অনিমেষ কী করবে বুবাতে পারছিল না। এই প্ল্যাটফর্মে রাতটা কাটানোই নিরপদ বলে মনে হচ্ছিল ওর। বৃক্ষ বললেন, ‘আঃ, কলকাতা শহরে ঠিকানা থাকলে বাড়ি খুঁজে পাওয়া খুব সোজা। বলছি তো, ওটা আমারই পাড়া।’

‘আমি তো পথটাট কিছু চিনি না।’ অনিমেষ বিড়াবিড় করল।

‘সে তো ট্রেনে উঠেই গুনেছি। আমার ওপর ভরসা নেই। যদি আজ তোমার সেই ঠিকানা না-ও পাওয়া যায় তুমি তো জলে পড়বে না! আমার বাড়িতে তোকা রাতটুকু কাটিয়ে যেতে পার।’ বৃক্ষ মাথা নাড়লেন, ‘সেটা নিশ্চয়ই প্ল্যাটফর্মের চেয়ে নিরাপদ।’

অনিমেষ অবাক হয়ে বলল, ‘এখানে কী হতে পারে?’

‘তুমি এখনও নাবালক।’ বৃক্ষ ঠোঁট লেটালেন, ‘ওগাদের খুঁজতে পুলিশ এসে হামলা করলে তুমি কী করবে? তোমার বয়সের ছেলেদেরই তখন বিপদ হবে। আমার কী বলো, এতটা পথ একসঙ্গে এলাম, কেমন মায়া পড়ে গেছে বলে এত কথা বলা। একা একা যেতে ঠিক মানে—বুবালে, সঙ্গী থাকলে সাহস পাওয়া যাব।’

বৃক্ষ চলে গেল একা এই এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে থাকার কথা ভেবে অনিমেষ ঘাবড়ে গেল। মেইন প্ল্যাটফর্মে অত লোকের সঙ্গে থাকলে এক কথা ছিল, পুলিশ খামোকা নাজেহাল করতে আসতেই—বা কেন। কিন্তু এই ভিত্তিনিরের সঙ্গে সারাটা রাত থাকা অসুবিধ। এরা যদি হঠাতে দল বেঁধে তার জিনিসপত্র টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেয় ও কিছুই করতে পারবে না। তা ছাড়া পুলিশ এলে আর-কেউ তা দেখার থাকবে না। এক হয়, আবার যে-পথ দিয়ে ওরা মেইন টেশন থেকে এখানে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাওয়া। অনিমেষ একা একা সাহস পালিল না ফিরে যেতে। তার চেয়ে যা ইনি বলছেন তা-ই শোনাই তালো। অন্তত ওর বাড়িতেও রাতটা নিশ্চিতে কাটানো যাবে।

ওকে রাকি হতে দেখে বৃক্ষ খুশি হলেন, ‘কিছু চিন্তা করতে হবে না তোমাকে, শুধু আমার পেছন পেছন চলে এসো।’

কোথাও কোনো শব্দ নেই, ওরা শেডের অঙ্ককারে পা টিপে পিটে মেইন গেটের কাছে চলে এল। বৃক্ষ সাহনে, অনিমেষ পেছনে। সমুদ্রেই বিরাট রাস্তা, মাঝখানে লোহার লাইন পোতা। নিশ্চয়ই ওটা ট্রামলাইন। রাস্তার ওপাশের যেটুকু চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছিল, তাতে বোঝা যায় যে এখন কোনো দোকানপাটা খোলা নেই। বৃক্ষ মুখ বের করে রাস্তাটা দাঁড়িয়ে দেখে নি. নি. না, কেউ নেই, ধূধূ করছে। এসো।’

অনিমেষ আড়ালের আড়ালে ওর সঙ্গে নিঃশব্দ পায়ে বাইরে চলে এল। এতক্ষণ দুহাতে বয়ে-আনা ব্যাগ-বেতিং-এর ওজন সম্পর্কে ওর কোনো খেয়ালই ছিল না, এই বিরাট শহরের চওড়া রাস্তার ধারে নিজের দুটো হাতের টন্টনানি হঠাতেই সে অবৃত্ত করতে লাগল। সামনে আর-একটা বড় রাস্তা

এসে এই রাস্তায় পিশেছে। বৃক্ষ ফিসফিস করে বললেন, ‘এখানে না, ধার দিয়ে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা রাতা পার হব, বুবালে’

‘ওটা কী রাতা?’

‘হাঁরিসন রোড। লোকজন কী প্যানিকি হয়ে গেছে আজকাল, মিছিমিছি ভয় পায়—দেখছ তো পথে একটা পুলিশ নেই।’ ওরা যখন ফুটপাথের গা-ঘেঁষে অনেকটা সামনে এগিয়েছে তখন হঠাৎ দূরে কিছু শব্দ বেজে উঠল। অনিমেষ দেখল কী যেন কালোমতন এগিয়ে আসছে। বৃক্ষ বললেন, ‘আলো নেই—ট্রাম চলছে, ডিপোয় যাচ্ছে বোধহয়। এপশটায় সবে এসো, কেউ দেখতে পাবে না তা হলে।’

দেওয়ালের গায়ে সিটিয়ে দাঁড়িয়ে অনিমেষ অনেক দূরে থাকা ট্রামটাকে দেখছিল। এর আগে কখনো ট্রাম দেখেনি, বিসয় নিয়ে এই বিচ্ছিন্ন পরিবেশে সে অপেক্ষা করছিল। ওদের সামনে রাস্তার উলটোদিকে একটা বিরাট ব্যানার সিনেমার বিজ্ঞাপন। এত বড় বিজ্ঞাপন সে এর আগে কখনো দেখেনি। অনিম চট্টোপাধ্যায়ের মুখটা কী দারুণ জীবত দেখাচ্ছে চান্দের আলোয় মাখামাখি হয়ে! পাশেই একটা বীভৎস মুখ, কী ছবি ওটা?

হঠাৎ বৃক্ষ খপ করে হাত শক্ত করে ধরতেই অনিমেষ চমকে সামনের দিকে আকাল। চার-পাঞ্জন মানুষ খুব দ্রুত এগিয়ে এসে ট্রামের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে। ওদের পরিকার দেখতে পাচ্ছে না অনিমেষের। ট্রামটা আর চলছে না। বৃক্ষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। অনিমেষ অনুভব করল, ওর হাত কাঁপছে। কোনোরকমে কথা বললেন তিনি, ‘এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। চলো রাতা পেরিয়ে যাই এইবেলা।’ কথা শেষ করেই তিনি উর্ধ্বশাসে দৌড়ে রাজাটা টুর হয়ে গেলেন। অনিমেষ তেমন দ্রুত দৌড়ে যেতে পারল না হাতে বোৰা থাকায়। সে যখন পার হয়ে গিয়ে বৃক্ষের কাছে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখন দাউদাউ করে ট্রামটায় আগুন জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়া-ছায়া শরীরগুলো দৌড়ে রাতা পেরিয়ে কোথায় ঝুঁড়াও হয়ে গেল। বৃক্ষ ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, ‘ইস, ওরা ট্রামে আগুন ধনিয়ে দিয়েছে! এখনই পুলিশ আসবে—পালাও।’

অনিমেষ ওর পেছন পেছন ছুটতে চেষ্টা করে বলল, ‘আর কত দূরে?’ বৃক্ষ কী বলতে মুখ ফেরাতে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ‘উঁ, বাবা গো!’ চিৎকারটা আচমকা অনিমেষকে পাথর করে দিল। ফুটপাথের একদিকে বেঁধিগতো পাতা, বোধহয় হকাররা এখানে কেনাবেচা করে, তারই এক পায়ার সঙ্গে দড়ি বাঁধা ছিল, বৃক্ষ তাতেই হোচ্চ খেয়েছেন। অনিমেষ তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ওকে জিজ্ঞসা করল, ‘খুব লেগেছে?’

বৃক্ষ ঘাড় নাড়লেন, ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে বোৰা যাচ্ছিল। সামনে দাউদাউ করে ট্রাম জ্বলছে। কলকাতায় পা দিয়ে অনিমেষ প্রথম যে-ট্রামটাকে পেল তার সর্বাঙ্গে আগুন। বৃক্ষকে নিয়ে কী করা যায় বুবাতে পারছিল না অনিমেষ। ও জিনিসপত্র মাটিতে রেখে ওকে তুলে ধরতে চেষ্টা করল, ‘উঠতে পারবেন?’

বৃক্ষ ঘাড় নাড়লেন, ‘বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি বৱং সামনে গলিতে চুকে বাঁ-হাতি পাঁচ নম্বর বাড়িতে খবর দাও। আমার ছেলের নাম সুজিত।’ সে-ই ভালো। বৃক্ষের বাড়ি তা হলে খুব কাছে। অনিমেষ উঠে মালপত্র নিয়ে কয়েক পা এগোতেই থমকে দাঁড়াল। খুব দ্রুত একটা কালো রঙের ভ্যান ছুটে আসছে এদিকে। পাশাপাশি একটা জিপগাড়ি। পেছনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাঁশয়ে বোধহয় একটা দমকালের গাড়ি আসছে। শব্দ করে ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িগুলো। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো পুলিশ লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে, নেমে ট্রামের দিকে ছুটে গেল। ওদের হাতের বাইকেল সামনের দিকে তাগ করা। জিপের লোকগুলো বোধহয় অফিসার, হাত নেড়ে ওদের কীসব উপদেশ দিচ্ছে। ওরা যদি এদিকে তাকায় তা হলে অনিমেষদের দেখতে পেয়ে যাবে। দেখতে পেলে ওরা মনে করবে সে ট্রামগাড়িতে আগুন দিয়েছে। অস্তত তাকে ওরা প্রশ্ন নিচ্ছাই করবে, আর তা হলেই জানতে পারবে সে এই প্রথম মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কলকাতায় এসেছে, এখনও টিকিট পকেটে আছে আর হাতের সুটকেসগুলো তে জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিন্তু উচানো বন্দুকের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কেমন টিপাড়ি করতে লাগল অনিমেষের। যে-ট্রামটা জ্বলছে এখন সেটার আগুন নেবানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে কতকগুলো লোক। আশেপাশে কোনোমানুষ নেই, কেউ কোতুহ্লী হয়ে দেখছে না এখানে কী হচ্ছে। কলকাতা শহরে নাকি লোক সবসময় গিজগিজ করে, তারা এই মুহূর্তে কোথায় গেল!

অনিমেষ পেছন ফিরে বৃক্ষ ভদ্রলোককে দেখল। তিনি বোধহয় পুলিশদের লক্ষ করেছেন, কারণ

তাঁর শরীর এখন হকারদের বেঞ্চির তলায় অনেকখানি ঢোকানো। চট করে রাস্তা থেকে বোৰা যালে না কেউ ওখানে আছে। অনিমেষ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। ও বুবতে পারছিল, সামন্য নড়াচড়া করলেই পুলিশের নজরে পড়ে যাবে। ওই পাথরের মতো মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বোৰা যায় ধৰা পড়লে তা কখনোই সুখের হবে না। শোকগুলো খামোকা ইই ট্রামটা পোড়াতেই-বা গেল কেন? ট্রাম তো জ্বন্সাধারণের উপকারেই আসে। খাদ্য চাওয়ার সঙ্গে ট্রাম পোড়ানোর কী সম্পর্ক আছে? নাকি ওরা এইভাবেই সরকারকে জড় করতে চায়?

কিন্তু যা-ই হোক, একটা লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা শহরে। সেই লড়াই-এর এক পক্ষ কংগ্রেস সরকার আর তার পুলিশবাহিনী, কিন্তু অন্য পক্ষ কে? অনিমেষ নিজের শরীরের ভার এক পোথেকে অন্য পায়ে আনার জন্য সামন্য নড়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কড়া আলো ওর ঘুৰের ওপর এসে গড়ল আচমকা। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে সে শুনতে পেল, ‘কে ওখানে? হ আর ইউ?’

টর্চের আলো ওর মুখ থেকে সরছে না, কিন্তু কেউ-একজন এদিকে এগিয়ে আসছে। অনিমেষের সর্বসে একটা কাঁপনী এসে গেল। কী করবে ও? চিংকার করে নিজের নাম বলে ওদের দিকে এগিয়ে যাবে? ঠিক সেই সময় ও কয়েকটি ছুট্ট শরীরকে সামনের গলি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। কিছু বোঝার আগেই দুমদুম আওয়াজে সমস্ত কলকাতা যেন কাঁপতে লাগল। যারা ছুটে এসেছিল তারা শব্দটার সঙ্গেই আবার গলির মধ্যে ত্বরিতগতিতে ফিরে গেছে। অনিমেষ তাকিয়ে দেখল যে-পুলিশ অফিসার টর্চ-হাতে ওর দিকে এগিয়ে আসছিল তার শরীর সাটিতে পড়ে আছে। সামনের ভ্যান্টা ধোয়ায় ভরতি। ওরা বোমা ছড়ে গেল। অনিমেষ আর-কোনো চিন্তা করতে পারল না। এইরকম একটা আকর্ষিক ব্যাপার ওপর সমস্ত চেতনাকে নাড়ি দিয়ে গেল। কোনোদিনকে না তাকিয়ে শরীরে যত জোর আছে সব একত্রিত করে ও ছুটতে লাগল পাশের গলিটার দিকে। এক দুই তিন চার পাঁচ নম্বর বাড়িটার সামনে পৌছে গেলেই বিপদ থেকে মৃত্তি পাওয়া যাবে। হঠাৎ একটা তীব্র ব্যাপা এবং কানফাটানো গৰ্জন অনিমেষের সমস্ত শরীরের অসাড় করে দিল। কিছু বোঝার আগেই ওর ছুট্ট শরীরটা হংড়ি থেকে গলির মধ্যে পড়ে গেল, ব্যাগ আর বেডিং ছিটকে চলে পেল দুদিকে। পড়ে যাওয়ার পরও আওয়াজ বৰু হয়নি। একটা হাঁটু ভাঁজ করে অনিমেষ গলির রাস্তায় দুয়ে ছটকট করতে করতে আবিষ্কার করল, উষ্ণ স্নাত নেমে আসছে হাঁটুর ওপর থেকে। চটচটে হয়ে যাচ্ছে হাতের চেটো। সেখান থেকে উঠে ব্যাটা এখন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে চিংকার করে উঠতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল, সমস্ত শরীরের অবশ হয়ে গিয়েছে-সে কথা বলতে পারছে না। ত্রুমশ চোখ গোলাটে হয়ে গিয়ে সমস্ত বলকাতা শহর অদ্ধকার হয়ে গেল অনিমেষের সামনে।

কোনোদিন যোড়ায় অথবা পালকিতে চড়েনি অনিমেষ। হঠাৎ যেন ওর মনে হল সেরকম কিছুতে সে চেপ যাচ্ছে। বেশ দ্রুত। যন্ত্রণা হচ্ছে কেন এত পায়ে? চোখ খুলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেন? ব্র্গহেড়োয় আঙুরাভাসা নদীর হাঁটুজলে চেষ্টা করে তুব দিয়ে চোখ খুলে যেরকম ঘোলাটে জগ্ন্টাকে দেখা যেত এখন কেন সেরকম দেখাচ্ছে কেউ কি ওকে পাঁজকোলা করে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে কে? যে বাবা যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা ওর হাত-পা-ধরে আছে, ওর বুক পেট নিচের সামনে অদ্ধকারটাকে আসতে দেখল।

আর এই সবয় একটা অস্তুত বাঁশির সূর বাজছে কোথাও, এরকম বোধ হল। মাথার ওপর কালীগাই-এর আদুরে চোখ দুনোর মতো আদুর-করতে-চাওয়া আকাশ আর ওর তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গীদের সে কখনো দেখেনি, কিন্তু তাদের মুখচোখ অস্তুত উজ্জ্বল। একটা নীলচে ধোয়া ওদের পাকে পাকে কোমর অবধি ঘিরে রেখেছে। ব্র্গহেডোর মাঠে যে কাঁঠালচাঁপা ফুটে সেইরকম একটা গঞ্জে নাক ভরে যাচ্ছে। কেউ-একজন বলল, এখন তুমি এমন সুন্দর গান শুনতে পাবে যা কোনোদিন শোননি। কোনোদিন শুনবেও না। ওদের সামনে একটু ওপরে আরও কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে, শরীর নীল ধোয়ায় ছেয়ে আছে, কারওর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অপূর্ব জ্যোতি বের হচ্ছে সেখান থেকে। এই নীলাভ আলোয় অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল একটি মুখ ত্রুমশ স্পষ্ট হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। প্রচণ্ড নাড়া থেয়ে সে দুহাত বাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার পা নড়ছে না কেন? যেন তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ও দেখল, মাধুৰীর হাসির মধ্যে যেন তিরক্ষার, নাকি অস্থোগ, অথবা অভিযান! ও মনেমনে বলে উঠল, যাগো মু, আমাকে আসতে দাও। কিন্তু সেই মৃত্তি ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে অস্থৱতি জালানেন। আর সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব সুর

উঠল বাতাসে। একে কি গান বলে? অনিমেষ এরকম গান এর আগে শোনেনি কখনো। তার সামনে থেকে সবকিছি সরে যাচ্ছে, আর এই যাওয়ার জন্য এখন একটুও আফসোস হচ্ছে না তার।

হঠাৎ কেউ কথা বলল চাপা গলায়, 'খোকাকে ঘট করেছে দাদা।'

'খোকাকে?' একটা ভারী গলা এগিয়ে আসতেই অনিমেষ অনুভব করল তাকে শক্তমতো কিছুর ওপর নামিয়ে রাখা হল। যেন কোনো গভীর কুয়োর তলা থেকে তীরবেগে সে ওপরে উঠে আসছে—এইরকম একটা খোখে দূলতে দূলতে অনিমেষ ঢোখ ঝুলল। কিন্তু এত অদ্বিতীয় কেন? ঘরটাই কি অঙ্ককার? ও তনতে পেল ভারী-গলা বলছে, 'সেস আছে, না ডেড?'

আর—একজন খুব কাছ থেকে জবাব দিল, 'না, অঙ্গান হয়ে আছে বোধহ্যা—খুব ব্রিডিং হচ্ছে। ওকে পড়ে যেতে দেখে বোম চার্জ করে পুলিশটাকে হটিয়ে দিয়ে ভুলে নিয়ে এসেছি।'

'ওদিকের অবস্থা কেমন?'

'গলির তেতর পুলিশ ঢুকবে না মনে হয়।'

'কিন্তু খোকা ওখানে কী করতে গেল? ওর তো ওখানে থাকার কথা নয়?' ভারী-গলাকে খুব চিড়িত দেখাল।

একটু একটু করে অঙ্ককার ফিকে হয়ে আসছে, কিন্তু তক্ষণ মনে হল কে যেন ওর ডান উভয়তে পেরেক পুতে দিয়েছে—যত্নগাটা তুবড়ির মতো সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। নিজের দুটো হাত সেখানে রাখতেই চটচটে হয়ে গেল। ওয়ে ওয়ে শরীরটা দৃশ্যড়ে-যুচড়ে ও যত্নগার সঙ্গে লড়তে লাগল। দাতের বাঁধন ছিটকে বেরিয়ে এল, 'মা—মাণো!'

সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলল, 'সেস এসেছে।'

ভারী-গলা কাউকে বলল, 'গুলি যদি পেটে লেগে থাকে কিছু করার নেই, তুমি জলদি শিশু ডাক্তারের কাছে যাও, আমার নাম বলে নিয়ে আসবে।'

দুহাতে খুঁখচাপা দিয়ে অনিমেষ স্থির হয়ে থাকতে চাইছিল। এইটুকু বোধ ওর কাজ করছিল যে, ও পুলিশের হাতে পড়েনি। এরা কারা? একটা শ্বীণ আলো আন্তে-আন্তে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও হাতদুটো মুখের ওপর তুলতেই সেই স্বল্প আলোয় টকটকে লাল রকমাখা আঙুলগুলো দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে একটা দৃশ্য ওর সামনে চলে এল। মাধুরী চিত্কার করে ওকে বলে উঠেছেন, 'ওরে মুছে ফ্যাল, তোর হাত থেকে রক্ত মুছে ফ্যাল!' চোখের সামনে জ্বলা দাউদাউ চিত্কার আগুন ওকে যেন ঠেলে আবার সেই কুয়োটার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। অনিমেষ প্রাণপণে চেষ্টা করছিল জ্বানটাকে আঁকড়ে ধরাব। আলোটা এখন ওর ওপরে। ভারী-গলা হাত দিয়ে ওর পা ছুঁয়ে বলল, 'থাইতে গুলি লেগেছে। যাক, বেঁচে যাবে।' তারপর আলোটা ওর মুখের কাছে এল, 'আরে, এ কে? কাকে আনলে তোমরা? এ তো খোকা নয়!'

'খোকা নয়? খোকার মতো ফিগার—য়া, তা-ই তো! এ তো অন্য লোক!'

ক্রমশ অস্থচ হয়ে যাচ্ছে আলোটা। যত্নগাটা এখন সারা শরীরে নিজের ইচ্ছেমতন খেলা করে যাচ্ছে। অনিমেষ কিছুতেই চোখ খোলা রাখতে পারছিল না। ভারী-গলা ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তোমার নাম কী?'

প্রাণপণে ঠোঁট নাড়তে চাইল অনিমেষ। ওর সমস্ত শরীর কথা বলতে চাইছে, অথচ কোনো শব্দ হচ্ছে না কেন?

ওর দূর্কাধ ধরে কেউ ঝাকুনি দিয়ে যাচ্ছে সমানে। স্বল্পের ওপর অস্পষ্ট একটা মুখ। ক্রমশ কুয়োর গভীরে যেতে-যেতে অনিমেষ দুটো শব্দ তনতে পেল, 'তুমি কে?'

ঠোঁট নাড়ল অনিমেষ। চিত হয়ে ওয়ে থাকা শরীরটার পরে মাথাটাকে সেজ্জা রাখতে চেষ্টা করছিল সে প্রাণপণে।

ঠিক এই সময়ে কেউ—একজন বাইরে থেকে অনিমেষের নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে বেরিয়ে দেখল ওদের পাড়ারই একটি ছেলে, কংগ্রেস করে, দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষকে দেখে সে বলল, 'তাড়াতাড়ি কংগ্রেস অফিসে চলো। মারাত্মক ফ্লাড হয়েছে ওপারের দিকে। নিশীথদা তোমাকে খবর দিতে বললেন—রিলিফ পর্ট যাবে।'

ঠিক এই সময়ে কেউ—একজন বাইরে থেকে অনিমেষের নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে বেরিয়ে দেখল ওদের পাড়ারই একটি ছেলে, কংগ্রেস করে, দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষকে দেখে সে বলল, 'তাড়াতাড়ি কংগ্রেস অফিসে চলো। মারাত্মক ফ্লাড হয়েছে ওপারের দিকে। নিশীথদা তোমাকে খবর

দিতে বললেন—রিলিফ পার্টি যাবে।'

অনিমেষ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে একচুটে দাদুর কাছে ফিরে এল, 'দাদু, বন্যাতে অনেক শোক পূর্ব বিপদে পড়েছে। কংগ্রেস থেকে রিলিফ পার্টি যাচ্ছে, আমাকে ডাকছে।'

হেমলতা কাছেই ছিলেন। সরিষ্পথের কিছু বলার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'তোর যাবার কী দরকার! অনেক বেকার হলে আছে, তারা যাক। দুমাস গেলেই তোর পরীক্ষা।'

অনিমেষ এরকমটাই আশা করেছিল, গো ধরে বলল, 'এখন তো পড়াশুনা শুরু হয়নি, মানুষের বিপদ তবে ঘরে বসে থাকব?'

সরিষ্পথের নাতির দিকে ডাকালেন। হঠাৎ অনেকদিন পরে তাঁর শনিবাবার কথাটা মনে পড়ে গেল। কোনো কাজে একে-বাধা দিও না। তিনি নাতিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন ফিরছ?'

অনিমেষ বুবল আরা বাধা নেই, 'বুঝতে পারছি না, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। তিতার কিছু নেই।'

সরিষ্পথের আর-কিছু বললেন না দেখে হেমলতা গজগজ করতে লাগলেন।

কংগ্রেস অফিসে মানুষ গিজগিজ করছে। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে রিলিফ পার্টি যাচ্ছে। সরকার থেকে স্বাহায্য পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া দলীয় ভাগের থেকে চিড়ে-মুড়ি-গড়ের বড় বড় থলে বোধাই করা হয়েছে। অনিমেষ ব্যতাবতই নিশীথবাবুর দলে যাবে স্থির হল। এর মধ্যে খবর এল বামপক্ষীয়াও রিলিফের জন্য ব্যবস্থা করছে। তবে তারা এখনও বের হয়নি।

অনিমেষ দেখল প্রত্যেকটা দলকে আলাদা-আলাদা করে জাগ্যগা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক যাবার মূর্বটায় বিরামবাবু কংগ্রেস অফিসে এলেন। তিনি সব দেখেতেন নিশীথবাবুকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনে কিছু পরামর্শ এবং একটা কাগজ দিলেন। শেষ পর্যন্ত ওরা রিলিফ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একটা ট্রাকে দুলের রিলিফ নিয়ে শহর ধরে রায়কতপাড়া দিয়ে সেনপাড়া ছড়িয়ে বাঁধের পেছপাণ্ডে উদ্দের নামিয়ে দেওয়া হল। আগে থেকেই সেখানে লো লো ডিনিওকো অঙ্গুত ছিল। দুটো দল নৌকোগুলো ভাগ করে নিল। অনিমেষদের ভাগে তিনটো ডিঙি জুটেল। ওরা থলেযুলা নৌকোকাতে চাপাতে বেশ তারী হয়ে পেল সেগুলো। আঙ্গ অবধি কখনো ডিনিওকাতে চড়েনি অনিমেষ। জলে তুবে মরার একটা চানা নাকি তার আছে যদিও প্রত্যেকটা নৌকোকাতে দূজন করে পাকা মাখি আছে। এক-একটা ডিঙিতে ছয়জন মানুষ বৃক্ষে ঢাকতে পারে। কোনোরকমে ব্যালেস রেখে ওরা নৌকোকাতে উঠল। নিশীথবাবু বললেন, তিনিও কোনোদিন ডিঙিতে চড়েননি।

তিতার চেহারাটা রাতারাতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেচে। বর্ষা সময় এইরকম মাঝে-মাঝে দেখা যায়। যদিও মাথার ওপর এখন কড়া রোদ, কিন্তু যে-বাতাসটা তিতার বুক থেকে ভেসে আসছে সেটা বুঝিতে দিচ্ছে শীতটা বাধা হয়ে দূরে অপেক্ষা করছে। অনিমেষ নিশীথবাবুর পাশে বসে জয়ে-ভয়ে জল দেখছিল। শেকুয়া রঙের চেউগুলো পাক খেতে-খেতে যাচ্ছে। সরু নৌকো বেশ তীরের মতো জল ঠেলে যাচ্ছে তীর ধরে।

নিশীথবাবু বললেন, 'বাড়িতে বলে এসেছে?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

নিশীথবাবু বললেন, 'কখন ফিরব জানি না। আজ দুপুরে আমাদের এইসব খেতে হবে। বুবালে অনিমেষ, এই হল প্রকৃত দেশসেবা। ওধু বিপুবের ফাঁকা বুল নিয়ে দেশসেবা হয় না।'

বাঁধ ছাড়িয়ে কিছুটা ওপরে যেতেই অনিমেষ ঘষ্টিত হয়ে পড়ল। গাছপালা, মাটির ঘরবাড়ি যেন উপড়ে নিয়ে তিতা অনেকটা ভিতরে ঢুকে পড়েছে। নতুন-তৈরি বাঁধ ভেঙে শহরে ঢুকতে পারেনি বলে তার আক্রোশ এইসব খোলা এলাকায় নির্মাতাবে মিটিয়ে নিয়েছে। এখনও জল এন্টিকে ছাড়িয়ে রয়েছে, তিতা ঢুকে পড়েছে অনেকটা। মাঝে-মাঝে কালাগাছ কিংবা দু-একটা খণ্ডের চাল দেখা যাচ্ছে। একটি মানুষ কোথাও নজরে পড়ল না ওদের। অনিমেষ খেয়াল করেনি, নদী ছেড়ে ওরা এখন মাটির ওপর দিয়ে চলেছে। জলের রঙ দেখে ঠাওর করা মুশকিল। কিছুটা দূরে গিয়ে নৌকোগুলো দুভাগ হয়ে গেল। অন্য দলটা বাঁধিক ঘুরে ভেতরে ঢুকে পড়ল, অনিমেষদের নৌকো চলল তিতার শরীরকে পাশে রেখে সোজা ওপরে।

নিশীথবাবু দুহাতে দোখ আড়াল করে নদীর অন্য পাড় দেখার চেষ্টা করছিলেন। সমুদ্র দেখেনি অনিমেষ, কিন্তু ওর মনে হল সমুদ্র নিচয়েই এইরকম হবে। নিশীথবাবু মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

কিন্তু ওর মনে হল সম্মুখ নিচয়ই এইরকম হবে। নিশীথবাবু মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওপারে যাওয়া যাবে মনে হয়?’

মাঝি, যার সামান্য দাঢ়ি দাঢ়ে, বলল, ‘আরও অধ ক্ষেত্র চলেন আগে।’ তুক হিম হয়ে গেল অনিমেষের। ওইরকম পাগলা ফুসে-ওঠা টেওগুলো পার হতে গেলে নৌকো নির্যাত ভূবে যাবে আর এখনে একবার ভূবে গেলে বাঁচবার কোনো চাঙ নেই। হয় ডেডবিডি মঙ্গলঘাটে গিয়ে ঠেকবে, নয় সোজা পাকিস্তানে। সে তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল। সবাই ছুটাপ নৌকো ধরে বসে আছে।

সামনে একটা গ্রাম পড়ল। জল এখনও চালের নিচে। এখনে বোধহয় স্রোতটা মারাঘাক ছিল না, কারণ বাড়িগুলোর কিছু বেঁচে আছে। মাটির ঘর খড়ের চাল। দূর থেকে ওদের দেখে কিছু মানুষ চিন্কার করে উঠল। অনিমেষ দেখল একটা বিরাট বাঁকড়া বটগাছের ডালে-ডালে অনেকগুলো মানুষ ঝুলছে। তারাই আগপথে চিন্কার করে চলেছে। নৌকো কাছাকাছি হতে অনিমেষের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বটগাছের কাছাকাছি একটা আমগাছে একজন নগু মানুষ গলায় কাপড়ের ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। তার শরীরের চামড়া এখন কালচে, একটা বিকট গল্প বেরুচ্ছে শরীরটা থেকে। দুটো শক্ত তার দুই কাঁধের ওপর বসে অনিমেষের দিকে বিরুক্ত চোখে চেয়ে আছে। মানুষটার চোখ দুই, শরীরের নাম আয়গায় নিরস্ত ক্ষত।

প্রায় মানুষটির পায়ের তলা দিয়েই ওরা ডিঙি নিয়ে বটগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। চিন্কারটা ওদের এগোতে দেখে সামান্য করে এল, একটি গলা আর্তনাদের সুরে বলে উঠল, আসেন বাবু, আমাগো বাঁচান; তিনদিন খাই না।’

সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো ভিত্তি কঠে আবৃত্তি করল। নিশীথবাবু সাবধানে নৌকোর ওপরে উঠে দাঢ়ালেন, ‘এই গ্রামে কেউ মারা গেছে?’

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো কঠ সংখ্যাটি বলতে লাগল। বটগাছের ডালে-বসা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অনিমেষ। অনাহার এবং বৃষ্টিতে ভিজে মানুষের চেহারা যে কভটা বীভৎস হতে পারে এদের না দেখলে বোধ যাবে না। ওরা যে গাছ থেকে নামবে তার উপায় নেই। নৌকোটা গাছের জলায় নিয়ে গেলে একদম নিচের ডালে যারা আছে তাদের হাতে খাবারের ব্যাগ পৌছে দেওয়া যায়। নিশীথবাবু মাঝিকে নৌকোটা থামাতে বললেন। তিনজন লোক মারা গেছে। দুজন মহিলা আর একজন বৃদ্ধি। বাকি মানুষ পেছনের দিকে একটা শিবমন্দিরের ভূঢ়ায় আশুয়া নিয়েছে। খাবার জোটেনি কারও। নিশীথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওই লোকটা আঘাত্যা করল কেন?’

‘ওই বাবু বড় বাথা। জল আইলে ঘৰ থিকা ইঞ্জি আর মায়েরে লইয়া হৃহ উঁচু টিবায় রাইখ্যা আইছিল। তারপর জলের মধ্যে ঘৰে ফিইয়া জিনিসপত্র যা পারে লইয়া গিয়া দেখল তারা নাই। জল, ওই রাক্ষসী তিস্তামাণি অগো খাইছে। আমরা তখন যে যার প্রাণ বাঁচাই। একরাত ওই আমগাছে বইস্যা ধাইক্য শেষমেষ পরনের বক্স দিয়া আমাগো সামনে গলায় ফাঁস দিল, বাবু।’

ঘটনা শেষে অনিমেষ চোখের জল সামলাতে ‘পারল না।’ এই তিনদিন তিনরাত ওরা শহরে বসে এসব ঘটনার কিছুই জানতে পারেনি। এতক্ষণ একটানা কথা বলে লোকটার গলা ধরে এসেছিল। এবার সবাই মিলে খাবার চাইতে লাগল। অনিমেষের সঙ্গীর থলির মুখ ঝুলছিল, কিন্তু নিশীথবাবু তাদের হাত নেড়ে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। অনিমেষের সঙ্গীর থলির মুখ ঝুলছিল, কিন্তু নিশীথবাবু তাদের হাত নেড়ে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর লোকগুলোর দিকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই গ্রামটার নাম কী?’

নামটা শেষে নিশীথবাবু চট করে পকেট থেকে বিরামবাবুর দেওয়া কাগজ বের করে তাতে কী দেখে নিলেন। অনিমেষ দেখল, নিশীথবাবুর মুখ বেশ গঞ্জির হয়ে গেছে। খানিক ভেবে নিয়ে মাঝিকে নৌকো ঘোরাতে বললেন। মাঝি বোধহয় একদম আশা করেনি হৃকুমটা, ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসল, ‘অগো খাবার দিবেন না?’